ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ সম্পাদিত

www.pathagar.com

www.pathagar.com

[illegible]
[illegible]
ও বাংলাদেশ। নতুন উদীয়মান সূর্য। [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible] ইতিহাস বিস্মৃত হবে।
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
— [illegible]
— [illegible] ইতিহাস
বিস্মৃত হবে।

— [illegible signature]

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ
ব্যক্তি ও কবি

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ
ব্যক্তি ও কবি

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ সম্পাদিত

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদ ঃ ব্যক্তি ও কবি (পৃষ্ঠা-৫৭৯)
শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত

ইফাবা প্রকাশনা ঃ ১১৪২/২
ইফাবা গ্রন্থাগার ঃ ৯২৮.৯১৪৪
ISBN : 984-06-0731-6

প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৯০ বাংলা

তৃতীয় সংস্করণ
চৈত্র ১৪১০ বাংলা
এপ্রিল ২০০৪ ঈসায়ী
সফর ১৪২৫ হিজরী

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৮০৬৮

প্রচ্ছদ
হাশেম খান

মুদ্রণ ও বাঁধাই
এ. এম. এম. সিরাজুল ইসলাম
প্রকল্প ব্যবস্থাপক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭
মূল্য ঃ ১৪০.০০ টাকা

FARRUKH AHMAD : BEKTI O KABI (Farrukh Ahmad : The Man and the Poet : An Anthology of Memoirs) : Essays and articles on the life and literature of Poet Farrukh Ahmad, one of the great poets of Bengali literature, by sixtyeight prominent poets, critics, writers, intellectuals and others, compiled and edited by Shahabuddin Ahmed and published by Muhammad Abdur Rab, Director of Publication, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Phone : 8128068 April 2004
E-mail : info@islamicfoundation-bd.org
Website : www. islamicfoundation-bd.org
Price : Tk 140.00 ; US $: 5.00

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের কথা

বাংলা সাহিত্যে ইসলামী ঐতিহ্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার হিসেবে কবি ফররুখ আহমদ স্মরণীয় হয়ে আছেন। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে যে স্বতন্ত্র ও ইসলামী ধারাটি আপন বৈশিষ্ট্যে বেগবান, সে ধারায় কবি কাজী নজরুল ইসলামের পরই যার নাম আসে, তিনি কবি ফররুখ আহমদ। তিনি দীর্ঘদিন সাহিত্যক্ষেত্রে সৃজনশীল ছিলেন। এ সময়কালে তিনি যা সৃষ্টি করেছেন, তা অনন্য বৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হয়ে রয়েছে। বস্তুত বাংলা কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির রূপায়ণে তিনি যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তার তুলনা মেলে না। ইসলামের শাশ্বত, সুন্দর রূপ এবং মানবিক আদর্শ তিনি হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাই তাঁর ব্যক্তিজীবনে যেমন তেমনি কাব্যক্ষেত্রেও তার অপূর্ব রূপকল্পময় প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। এ মহান কবি ও তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য যে আমাদের জাতীয় জীবনের এক অমূল্য সম্পদ, সে কথা বলার অপেক্ষা রাখে না।

কবি ফররুখ আহমদের জীবন ও সাহিত্যকে কেন্দ্র করে প্রখ্যাত গবেষক, সমালোচক, সাহিত্যিক শাহাবুদ্দীন আহমদ 'কবি ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি' নামে একটি সংকলন গ্রন্থ তৈরি করেন। ১৯৮৩ সালে উক্ত সংকলনটি ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রথম প্রকাশিত হয় এবং তা সুধী সমাজে বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করে। শুধু কবি ফররুখ আহমদের কবিতার অনুরাগীরাই নন, বাংলা সাহিত্যের আগ্রহী পাঠক, গবেষক ও ছাত্রদের কাছেও এ গ্রন্থটি একটি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ হিসেবে সমাদর লাভ করে। পরবর্তীতে পাঠকদের ক্রমাগত দাবীর মুখে অল্পদিনের মধ্যেই এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এ সংস্করণের সকল কপিও অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার প্রেক্ষিতে বর্তমানে এ গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হলো।

'ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি' গ্রন্থটি সম্মানিত পাঠকদের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ্‌র কাছে শুকরিয়া আদায় করছি।

এ, জেড. এম. শামসুল আলম
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বাংলা সাহিত্যের এক শক্তিমান কবি ফররুখ আহমদ ইন্তেকাল করেন ১৯৭৪ সালে। এর বেশ কয়েক বছর পর ১৯৮৩ সালে প্রখ্যাত গবেষক-সমালোচক শাহাবুদ্দীন আহমদের সম্পাদনায় ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে ইসলামী ঐতিহ্যের অন্যতম রূপকার এ বরেণ্য কবির জীবন ও সাহিত্যকর্মের পরিচয় ও মূল্যায়ন ভিত্তিক 'ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। দেশের সুধীমহলে গ্রন্থটি বিপুলভাবে প্রশংসিত হয়। এমনকি দেশের বাইরেও বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বাংলা-ভাষীদের কাছে গ্রন্থটি ব্যাপকভাবে সমাদৃত হয়।

এখানে উল্লেখ করা যায় যে, ফররুখ আহমদ তাঁর কাব্যে ইসলামের শাশ্বত সৌন্দর্য ও মানবিক কল্যাণময় আদর্শকে শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় অত্যন্ত সাফল্যের সাথে রূপায়িত করতে সক্ষম হয়েছেন। এ সাফল্য তাঁর কাব্যকে যেমন অনন্য করেছে তেমনি তাঁকে করেছে অসাধারণ জনপ্রিয়। 'ফররুখ আহমদ : ব্যক্তি ও কবি' গ্রন্থটি যে কারণেই তাঁর অসংখ্য অনুরাগীর পাশাপাশি দেশের সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সবাই যেন এ ধরনের একটি গ্রন্থের জন্যই আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। ফলে প্রথম মুদ্রণের সকল কপি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। এ কারণে অল্প সময়ের মধ্যে এ গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এ সংস্করণটিও অতি দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমানে এ মূল্যবান গ্রন্থটির তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশ করা হলো। সুধী পাঠকের কাছে গ্রন্থটি পূর্বের ন্যায় সমাদৃত হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মোহাম্মদ আবদুর র

পরিচালক, প্রকাশনা বিভ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদে

www.pathagar.com

প্রসঙ্গ কথা

উপমহাদেশের, বিশেষ করে বাংলাদেশের, মুসলমানদের ইসলামের আদর্শ ও শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত করতে এবং বাংলাদেশে ইসলামী ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে পূর্ণভাবে রূপায়িত করতে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যে নিষ্ঠা, আন্তরিকতা, ত্যাগ ও সাহসের পরিচয় দিয়েছেন, তার তুলনা নেই। তাঁর পূর্বের ও পরের আরও অনেক কবির লেখায় ইসলামী আদর্শের ছাপ দেখা গেলেও আর কোন কবিই ফর্‌রুখের মত তাঁদের সমস্ত চেতনা একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে রাঙিয়ে তুলতে পারেন নি, তাকে একটি যুগের পটভূমিতে নতুন বিপ্লবের দর্শন হিসাবে চিহ্নিত করতে পারেন নি। এ জন্যেই আমি একবার কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে লিখেছিলাম ঃ

স্রষ্টার তুষ্টির আশে
ধ্যানমগ্ন মহান রবি
আমাদের এ কালের
ইসলামী বিপ্লবের
তুমি চারণ কবি।

দুনিয়ায় শান্তি ও মানবিকতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামই যে একমাত্র নিখুঁত আদর্শ, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তা গভীরভাবে উপলব্ধি ও বিশ্বাস করতেন এবং জীবনভর সেই বিশ্বাসকে তিনি অকম্পিত শিখার মত নিজের জীবনে ও কর্মে লালন করে আমাদের জন্যে এক মহান আদর্শের উদাহরণ রেখে গেছেন। ইসলামের অন্তর্নিহিত ভাব-সৌন্দর্যকেই তিনি শুধু তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর কবিতায় রূপায়িত করেছেন তাই নয়, বিশ্ব-মুসলিম ভ্রাতৃত্ব ও মানবতাবোধ তথা ইসলামের সাম্য ও ন্যায়নীতি এবং সেই আদর্শকে তাঁর জীবনেও বাস্তবায়িত করে তিনি একটি শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত আমাদের উপহার দিয়েছেন।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ অবশেষে এই মহান কবির অতুলনীয় জীবন ও সাহিত্যের উপর একটি বৃহৎ সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করেছে বলে আমি আল্লাহ্‌র দরবারে আমার আন্তরিক শুকরিয়া জানাচ্ছি। আমার ধারণা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক এই গ্রন্থের প্রকাশ কবির কাছে বাংলাদেশী মুসলিম সমাজ যে অশেষ ঋণে আবদ্ধ তার অংশবিশেষ পরিশোধের একটি প্রয়াস মাত্র।

এই ধরনের একটি গ্রন্থের পরিকল্পনার কথা শুনে ও তার পাণ্ডুলিপি দেখে এর সম্পাদক জনাব শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদকে আমি উৎসাহিত করি ও গ্রন্থটিকে যত দ্রুত সম্ভব

www.pathagar.com

প্রকাশ করতে তাগিদ দিই। তিনি ও তাঁর সহকর্মীবৃন্দ এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের প্রকাশনা বিভাগ ও প্রেস আন্তরিক প্রচেষ্টা চালিয়ে অতি দ্রুত গ্রন্থটি প্রকাশ করেছেন বলে আমি তাঁদের সবাইকে মোবারকবাদ জানাচ্ছি।

আমি আশা করি, ফর্‌রুখের সাহিত্য ও জীবনের উপর সংকলিত ৬৮ জন খ্যাতনামা লেখকের রচনাবলী সংবলিত এই গ্রন্থ কবির উচ্চ আদর্শনিষ্ঠ জীবন ও কাব্য-উপলব্ধিতে বাংলাভাষাভাষী পাঠকদের প্রচুর সাহায্য করবে এবং কবির মহান জীবন ও সাহিত্যের মর্মবাণী উপলব্ধি ও অনুসরণে অনুপ্রাণিত করবে।

ফাল্গুন ১৩৯০

আবুল ফায়েদ মুহাম্মদ ইয়াহিয়া
সাবেক মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

www.pathagar.com

সূচিপত্র

পূর্বলেখ ঃ শাহাবুদ্দীন আহ্মদ/১৫

ব্যক্তি

তাঁর নাম ফর্‌রুখ আহ্মদ ঃ মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন/৩১
আমার ছাত্র ফর্‌রুখ ঃ আবুল হাশেম/৩৫
অনমনীয় ফর্‌রুখ ঃ মোহাম্মদ আজরফ/৩৯
আমার ভাই ফর্‌রুখ ঃ সৈয়দ সিদ্দীক আহ্মদ/৪৪
অপরাজেয় ফর্‌রুখ ঃ আবু জাফর শামসুদ্দীন/৪৬
ফর্‌রুখ আহ্মদ ঃ আবদুল হক/৪৯
আমার বন্ধু ফর্‌রুখ ঃ আবু রুশদ/৫৭
প্রেমিক ফর্‌রুখ ঃ আবদুল আহাদ/৬০
সংসারে ফর্‌রুখ আহ্মদ ঃ সৈয়দা তৈয়বা খাতুন/৬৪
ফর্‌রুখ ভাই ঃ কামরুল হাসান/৬৭
এক বিস্ময়কর মানুষ ঃ আখতার ফারূক/৭৫
আপোসহীন ফর্‌রুখ ঃ শামসুল হুদা চৌধুরী/৭৭
এমন একটা মানুষ দেখি না ঃ আবদুল লতিফ/৭৯
ফর্‌রুখের গান ঃ আবদুল হালিম চৌধুরী/৮২
সাহিত্যপ্রেমিক ফর্‌রুখ ঃ আশরাফ সিদ্দিকী/৮৪
ব্যক্তি ফর্‌রুখ ঃ আবদুর রশীদ খান/৮৯
আমাদের ফর্‌রুখ ভাই ঃ সরদার জয়েন উদ্‌দীন/৯৫
অন্তরঙ্গ আলোকে ফর্‌রুখ ঃ তৈয়েবুর রহমান/৯৮
ফর্‌রুখ স্মরণে ঃ মুফাখ্‌খারুল ইসলাম/১০১
ফর্‌রুখের আশা ও স্বপ্ন ঃ মুহম্মদ আবু তালিব/১০৪
আতিথ্যে উদার আদর্শে নিরাপোস ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর/১১১
ফর্‌রুখ ভাইয়ের কথা ঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী/১১৭
একটি আদর্শ একটি ব্যক্তিত্ব ঃ কাজী গোলাম আহমদ/১২৩
আমার অনুভব একান্ত আমারই ঃ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়/১২৬

www.pathagar.com

অভ্রভেদী চোখ ঃ আবদুস সাত্তার/১৩১
অন্তরঙ্গ আলাপন ঃ মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌/১৩৬
অনন্য পুরস্কার ঃ রফিকুল ইসলাম/১৪৯
শতাব্দীর অন্যতম সেরা মানুষ ঃ শামসুল আলম/১৫৪
এক বিস্ময়কর নায়ক ঃ মুস্তফা নূরউল ইসলাম/১৬৩
স্বপ্নরাজ্যের দুঃসাহসী সিন্দাবাদ ঃ মুহিউদ্দীন খান/১৬৬
মর্যাদাবোধের প্রতীক ফর্‌রুখ ঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল/১৭৪
অন্তরঙ্গ আলোকে ঃ মীর নূরুল ইসলাম/১৮০
প্রথম ও শেষ আলাপ ঃ শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ/১৮৩
তিনি অসাধারণ ঃ গোলাম সাকলায়েন/১৯১
যুগ-প্রবর্তক কবি ঃ আখতার-উল-আলম/১৯৪
মেজমামা ঃ সুলতান আহমদ/২০৩
অমর ডাহুক ঃ মোবারক হোসেন খান/২০৯
তাঁর তুলনা তিনি নিজেই ঃ ফজল-এ-খোদা/২১৪
আকাশের শাহীন তিনি ঃ ফখ্‌রুজ্জামান চৌধুরী/২২১
শেষ মুহূর্ত ঃ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান/২২৫
কিছু কথা কিছু স্মৃতি ঃ তিতাশ চৌধুরী/২২৮
অশেষ স্মৃতি ঃ হাসি সিদ্দিকী/২৩২
সমুদ্র-নাবিক ফর্‌রুখ ঃ শেখ তোফাজ্জল হোসেন/২৪১
আব্বাকে যেমন দেখেছি ঃ সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু/২৪৬

কবি

এক অমূল্য সম্পদ ঃ মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌/২৭১
ফর্‌রুখের হাতেম তা'য়ী ঃ আবুল কালাম শামসুদ্দীন/২৭৪
কবি ফর্‌রুখ ঃ দুই সমীক্ষা ঃ আবদুল কাদির/২৭৯
বাংলা কাব্যে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ মোহাম্মদ আজরফ/২৮৯
তাঁর বিশ্বাস অকৃত্রিম ঃ আবুল ফজল/৩০১
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা ঃ মুজীবুর রহমান খাঁ/৩০৫
ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ সৈয়দ আলী আহসান/৩১৮
ঐতিহ্যের রূপকার ফর্‌রুখ ঃ মনিরউদ্দীন ইউসুফ/৩২৯
আর এক অগ্নিবীণা ঃ আশরাফ সিদ্দিকী/৩৩৩
ফর্‌রুখ-মানস ঃ তাঁর কবিতা ঃ অধ্যাপক আবদুল গফুর/৩৩৮
ফর্‌রুখের কাব্য-নাটক ঃ আবদুল হাফিজ/৩৫৭
কাব্যনাট্যের নতুন দিগন্ত ঃ সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়/৩৬২

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা ঃ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী/৩৭৫
আধুনিক কবিতা ও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ হাসান হাফিজুর রহমান/৩৯০
চলে গেছেন অপরাজেয় ঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী/৩৯৯
ফর্‌রুখের কবিতা ঃ তার শিল্পরূপ ঃ মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্‌/৪০৬
ব্যতিক্রমী শিল্পী ঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল/৪৩৬
ন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গ কবি ঃ আল মাহমুদ/৪৪০
বিষয় ও ছন্দ-সমীক্ষায় হাতেম তা'য়ী ঃ মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান/৪৪৬
ফর্‌রুখের আকাঙ্ক্ষা ঃ রফিকুল ইসলাম/৪৫৫
ফর্‌রুখের অভিনবত্ব ঃ শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ/৪৬১
দরিয়ায় শেষরাত্রি ঃ প্রতিভূ কবিতা ঃ আবদুল মান্নান সৈয়দ/৪৬৮
কাফেলার ফর্‌রুখ ঃ আফজাল চৌধুরী/৪৭৩
আমাদের চেতনার উচ্চারণে ফর্‌রুখ ঃ হাসান আবদুল কাইয়ুম/৪৮২
একজন স্ববিরোধহীন কবি ঃ মুহম্মদ নূরুল হুদা/৪৮৭
তাঁর স্বপ্নরাজ্যে তিনি একা ঃ সৈয়দ আবুল মকসুদ/৪৯৬
কাল-সচেতন ফর্‌রুখ ঃ তাঁর কবিতা ঃ সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম/৫০৪
ফর্‌রুখ-মানস পরিক্রমা ঃ মুকুল চৌধুরী/৫২১
ফর্‌রুখ-মানস ঃ তাঁর কবিকৃতি ঃ ফাইজুস সালেহীন/৫২৭

কবি অমর

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কি অপরাধ ঃ আহমদ ছফা/৫৩৯
একটি মৃত্যু ঃ একটি জিজ্ঞাসা ঃ ইবনে খালদুন/৫৪৩
নতুন পানিতে সফর এবার ঃ শামসুর রাহমান/৫৫১
জাতীয় চৈতন্যে ফর্‌রুখের প্রভাব ঃ সানাউল্লাহ্‌ নূরী/৫৫৫

জীবনপঞ্জি ও গ্রন্থপঞ্জি

জীবনপঞ্জি/৫৬১
গ্রন্থপঞ্জি/৫৬৭

লেখক ও লেখা-পরিচিতি

লেখক-পরিচিতি/৫৭১
লেখা-পরিচিতি/৫৭৫

এ্যালবাম

আলোকচিত্রে কবি/২৫৩-২৬৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

পূর্বলেখ

১.

লেখা একবার মুদ্রিত হলে অথবা গ্রন্থ একবার প্রকাশিত হলে—দ্রুততার কারণে তা আশানুরূপ সুন্দর হয়নি এবং তাতে ভুলত্রুটি থেকে গেছে, এই কৈফিয়ৎ দিয়ে পাঠকের মুখ বন্ধ করা যায় না—যেমন কৃষিজীবী জমিতে ভাল করে চাষ এবং সার দিতে না পারায় বাজারে তার সরবরাহকৃত সব্জি স্বাস্থ্যোজ্জ্বল হয়নি বললে ক্রেতা তাতে সন্তুষ্ট হয় না। তবু কৈফিয়ৎ হিসেবে এটুকু না বলে আমার উপায় নেই যে, এ ধরনের একটি সংকলনের মুদ্রণে দ্রুততা ও ব্যস্ততা বিপত্তির কারণ ঘটাতে পারে। অথচ এ ধরনের একটি উত্তম কাজের জন্যে কবি-ভক্তদের দারুণ আগ্রহ ও তাগিদে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শুদ্ধ-সুন্দর শিল্প ব্যাপারটির অগ্রাধিকার দেওয়ার ইচ্ছাকে সীমিত অর্থে বন্দী রাখতে হয়েছিল। সে জন্যে এই সংকলনে যদি কোন দোষত্রুটি থাকে, তা'হলে সেটাকে আমার ক্ষমতার সীমা হিসাবে পাঠক বিবেচনা করবেন বলে আশা করি। বলা বাহুল্য, সাত শতাধিক (৬৭২+৩২+১৬=৭২০) পৃষ্ঠার এই গ্রন্থটি ছাপতে সময় লেগেছে অনধিক দেড় মাস। কিন্তু সে কথা থাক, এখন এই সংকলন-গ্রন্থ সম্পর্কে দু-চার কথা বলি ঃ কবি ফররুখ আহ্মদ-এর উপর প্রকাশিত সম্ভবত এটাই প্রথম একটি আংশিক পূর্ণ বৃহৎ সংকলন-গ্রন্থ। কবির মৃত্যুর পর অনেক সুধীজন অনুরূপ একটি সংকলন-গ্রন্থ তাঁর উপর প্রকাশিত হোক এই কামনা করছিলেন। অনেকে উদ্যোগও নিয়েছিলেন এবং উদ্যোগ নিতে চাচ্ছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে দু-একটি পুস্তিকাকৃতির সংকলনও প্রকাশিত হয়েছিল। কিন্তু যে-কোন কারণে এ পর্যন্ত তাঁর উপর এমন ধরনের পূর্ণ সংকলন প্রকাশিত হয়নি। অথচ কবির পূর্ণ জীবনী সংরচিত ও প্রকাশিত হওয়ার আগে এ ধরনের সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশ প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। আমার ধারণা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ এই সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ নিয়ে এবং প্রকাশ করে ফর্‌রুখ-ভক্তদের অন্তরলালিত একটি গভীর আকাঙ্ক্ষার রূপদানে অগ্রপথিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। এই গ্রন্থ ভবিষ্যৎ ফর্‌রুখ-জীবনী রচনায় ও তাঁর কাব্য-প্রতিভা আলোচনায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে সে বিষয়ে আমি সন্দেহ পোষণ করি না। এই গ্রন্থের স্মৃতিকথা পর্যায়ে কবির জীবনীকাররা পাবেন বহু মূল্যবান তথ্য এবং কাব্যালোচনা বিভাগে পাবেন কবি-প্রতিভা বিচারের অমূল্য উপাদান। বলতে দ্বিধা নেই, এই অসামান্য প্রতিভা তাঁর যোগ্য মর্যাদা তাঁর জাতির কাছ থেকে এখনও সম্পূর্ণ পান নি—তাঁর বিজ্ঞ-বিদগ্ধ সমকালীন বন্ধু-লেখকরা যা লিখতে পারতেন তা লেখেন নি। এটা দুর্ভাগ্য ; তবু এই সংকলন দেখে বোঝা যাবে, পৃথিবীর ইতিহাসের অনেক দুঃখী মহৎ শিল্পীর তুলনায় তিনি অল্পাধিক ভাগ্যবান। প্রকৃত মর্যাদা পেতে তাঁকে অনেক মনীষী, কবি ও শিল্পীর মত হাজার বছর বিস্মৃত থাকতে হয়নি। এই সংকলন-গ্রন্থ থেকেই অনুমান করা যাবে, তাঁর ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভায়

www.pathagar.com

মুগ্ধজনের সংখ্যা নিছক আঙুলে গোণার মত সামান্য নয়। তাঁর দিক থেকে যুগের একটা বিপরীত স্রোতের মধ্যেও এতটা শ্রদ্ধা ছিনিয়ে নেওয়া নিশ্চয় অসাধারণ ঘটনা।

ফররুখ আহ্‌মদ বড় কবি—এই কথা সম্ভবত কুণ্ঠিত উচ্চারণে বলার সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। উন্নাসিক অথচ রসজ্ঞ পাঠকও যদি এ ধরনের পঙক্তিতে চোখ রাখেন ঃ

পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে
নামে নির্ভীক সিন্ধু-ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

তাঁর প্রতিভার অমিত শক্তির প্রতি আর সন্দেহ পোষণ করবেন না। ছবি-ছন্দ-ভাব-ভাষা এখানে এমন সংবদ্ধ হয়ে, এবং সে জন্যেই অপরূপ হয়ে উঠেছে যে, অকরুণ-চিত্ত নন্দনতাত্ত্বিকের কুঞ্চিত ভ্রূকেও তা প্রসারিত করে দেয়। আর একটি কথা ঃ অস্থিমজ্জায় তিনি একটি বিশেষ আদর্শে নিমজ্জিত হলেও একই সঙ্গে হৃদয়ব্যাপী তিনি একজন খাঁটি কবি। কবিতার একটা ভিন্ন কৌতূহলোদ্দীপক জগৎ আছে—যার অনেকখানি সম্পর্ক স্বপ্নের সঙ্গে—কল্পনাকে যা খাদ্য যোগাতে সাহায্য করে। ফররুখ সেই কাব্য-জগৎকে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন আরব্য উপন্যাসে, পুঁথিতে—যা তাঁর কল্পনাকে উৎসাহ যোগাতে সাহায্য করেছিল। তাঁর সে জগতে আমরা ভ্রমণকারী অভিযাত্রী সিন্দাবাদকে দেখি, দেখি জাহাজ, নাবিক আর মাল্লাদের, দেখি জ্বিন-পরীদের আর পরীদের আর পরীর মুল্লুক কো'কাফকে। তাঁর কবিতায় ব্যবহৃত হয়েছে ব্যতিক্রমধর্মী ফুল, তার রূপ-গন্ধ, সেই সঙ্গে ঘ্রাণ-উদ্দীপ্তকারী রন্ধনকর্মে ব্যবহৃত মসলা—এলাচী লবঙ্গ দারুচিনি প্রভৃতি ; ব্যবহৃত হয়েছে দৃষ্টিসম্মোহনকারী হরেক রকম উজ্জ্বল রঙীন পাথরের নাম আর এ-ভাবেই এক অভূতপূর্ব কবিতার জগৎ তিনি তৈরি করেছেন যার সঙ্গে আধুনিক বাঙালি পাঠকের পূর্বপরিচয় ছিল না।

এই একটুখানি অপরিচিত ও দূরের সঙ্গে সম্পর্ক রচনার মধ্যেও কবিতার ব্যাপারটি লুকিয়ে আছে। দূর হলেই তা সুন্দর হয় আর সুন্দরই কবিতার সামগ্রী। সংকলনে কয়েকজন বিদগ্ধ সমালোচক এ বিষয় নিয়ে তাঁদের প্রবন্ধে আলোচনা করেছেন। আশা করি, পাঠক এ থেকে ফররুখের পৃথক কাব্য-চরিত্রটির স্বরূপ চিনে নিতে পারবেন।

তবে এ ধরনের একজন সম্পূর্ণ কবি-মানসের অধিকারী হয়েও ফররুখ শুধুই কবি ছিলেন না। রূপ ভাবকে অবলম্বন করে গড়ে ওঠে। ভাব জাগে ভালবাসা থেকে। ফররুখের এই ভালবাসা মানবকেন্দ্রিক। আর যেহেতু ইসলাম আদর্শগত দিক থেকে মানব-প্রীতি-আশ্রয়ী, তাই ফররুখ ইসলামকে ভালবেসেছিলেন। কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি তাঁর সমালোচকদের নিরপেক্ষ সুবিবেচনা লাভ করতে পারেন নি। আত্মকেন্দ্রিক অনিরপেক্ষ বিবেচনা দ্বারা চালিত হওয়াতে অনেকে তাঁকে স্পষ্টত ভুল বুঝেছেন। এ সম্পর্কে আমার বক্তব্য এই ঃ

উপমহাদেশের মুসলমানদের স্বাধীনতা লাভের আকাঙ্ক্ষার সাথে তাদের জাগরণের ইচ্ছাটি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু সত্যিকার স্বাধীনতা কি—স্বাধীনতা বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়—এ বিষয়টি কেবল সাধারণ মুসলমানই নয়—অনেক শিক্ষিত মুসলমানের ধারণায় অস্পষ্ট ছিল। রাষ্ট্রীয়ভাবে ইসলামের মৌল আদর্শটি গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের—সমানাধিকার তথা সাম্যবাদের ; কিন্তু হযরত আলী (রা)-এর মৃত্যুর পর এবং বিশেষ করে হযরত হোসেন

www.pathagar.com

(রা)-এর মৃত্যুর পর ইসলামী রাষ্ট্রের সেই মৌল আদর্শ ধূলিসাৎ হয়ে যায়—তার স্থান দখল করে রাজতন্ত্র। এই রাজতন্ত্রের স্বেচ্ছাচারী শাসন অনেক দীর্ঘকাল ধরে ইসলামের মুখপাত্র হিসেবে দুনিয়ায় রাজত্ব করেছে—যার সঙ্গে ইসলামের ন্যায় ও মানবতাবাদী আদর্শ ধর্মের আদৌ কোন সম্পর্ক নেই। এরই জন্যে ইসলাম সম্পর্কে কেবল ভিন্নধর্মী মানুষেরাই নয়, স্বধর্মীরাও ভ্রান্ত ধারণা পোষণ করে। ফর্‌রুখ এই ভুলটাকে চিন্‌তে পেরে ইসলামের মানব-প্রেমের আদর্শকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে চান। ফর্‌রুখ-মানসকে চিন্‌তে হলে এ ব্যাপারটি ভালভাবে উপলব্ধি করতে হবে। উল্লিখিত কারণে অর্থাৎ ইসলাম সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞান না থাকার জন্যে অনেকে এই ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে তাঁকে গোঁড়া, মোল্লা অভিধায় চিহ্নিত করতে কুণ্ঠিত হন না। এই সংকলন-গ্রন্থেও কয়েকজন সুধী সমালোচক সে ধরনের বিরূপ মন্তব্য করেছেন।

প্রত্যেক কবিরই একটা ব্যক্তিগত আদর্শ আছে, সে আদর্শ থাকলেই যে তিনি সংকীর্ণ হবেন—এ ধরনের ধারণার মধ্যে উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। ইসলাম মানবতাবাদী ধর্ম ; সুতরাং কবির আদর্শ মানবতাবাদ হলে ইসলামী আদর্শে অনুপ্রাণিত হওয়ার মধ্যে সংকীর্ণ বিশেষণটি তাঁর প্রতি কেন প্রযুক্ত হবে ?

প্রশ্ন হবে, শিল্পীর পক্ষে এই রকম একটি বিশেষ আদর্শের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে থাকা শিল্পধর্ম নয়। এখানে একটি ভুলকে চিন্তায় লালন করা হয়েছে। ইসলাম প্রকৃতপক্ষে আর দশটি ধর্মের মত নয়—যা সামাজিক আর সমস্ত বিষয় থেকে মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে, সংসার ও সমাজের প্রতি উদাসীন হয়ে কেবল নিয়মিত আল্লাহ্‌র ধ্যানে নিমগ্ন থাকতে বলে, যা মানবিক সমস্যা সম্বন্ধে মানুষকে চিন্তা করবার সুযোগ দেয় না।

ইসলাম তেমনই একটা ধর্ম, যে মানুষের সব রকম সমস্যার সমাধান দিয়েছে বা দেওয়ার চেষ্টা করেছে। মানুষের জীবনের প্রতিটি ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সমস্যার প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সমাধান সে দিয়েছে ; বিশেষ করে সমাজ ও মানবকল্যাণের সমাধান ; যে সমাধানের দ্বারা মানুষের পরিবারে, সমাজে ও রাষ্ট্রে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। মানব কল্যাণের এই সমাধান আছে বলেই ফর্‌রুখ ইসলামকে তাঁর জীবন এবং তাঁর সাহিত্যের দর্শন হিসেবে নির্বাচন করেছিলেন।

বস্তুত ফর্‌রুখের ইসলাম-প্রীতির কারণ তাঁর মানব-প্রীতি। ফর্‌রুখ মানুষকে ভালবেসেছিলেন বলেই ইসলামকে ভালবেসেছিলেন। কারণ ইসলামের সমস্ত শিক্ষাই মানুষকে ভালবাসার শিক্ষা।

এ প্রসঙ্গে আরেকটি ব্যাপার আলোচিত হতে পারে। সাহিত্যে ফর্‌রুখ কেন ইচ্ছাকৃতভাবে কেবল মুসলিম পুঁথি, মুসলিম পুরাণ ও ইসলামের ইতিহাসকে ঐতিহ্য হিসাবে বেছে নিলেন—দেশীয় প্রকৃতি, দেশজ ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক উপাদান তাঁর সাহিত্যে কেন আশানুরূপ প্রশ্রয় পেল না?

এই সংকলন-গ্রন্থের কয়েকজন লেখক এই বিতর্কিত বিষয়ের উপর তাঁর পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা করেছেন। আমার ধারণা, শিল্পীর মানসলোকের যে নিজস্ব সত্তা থাকে সেই স্বাধীন সত্তার ভালো-লাগাকে সংকীর্ণতার বিশেষণে চিহ্নিত করা অনুচিত। কথাটা অনেকখানি 'মধুসূদন, বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথ কেন মুসলমানদের নিয়ে লিখলেন না'-র মত হয়ে যায়। কিন্তু

www.pathagar.com

তর্কটা যখন এইমাত্র উল্লিখিত নামের বেলায় আসে, তখন সমালোচকরা তাঁদের পক্ষ নিতে মানসিক দিক দিয়ে বাধাগ্রস্ত হন না ; কিন্তু ফর্‌রুখের বেলায় ব্যাপারটা যায় সম্পূর্ণ উল্টে। একজন মার্কসপন্থীর বেলাতেও এই বিতর্ক ততটা সোচ্চার হয় না, যতটা হয় ফর্‌রুখের বেলায়। তাঁরা এটা বোঝেন না, যিনি খাঁটি শিল্পী তিনি সমবায় সমিতির সদস্যদের মত একটিমাত্র বাঁশীতে ফুঁ দেওয়াকে অপছন্দ করেন।

শিল্পীর ব্যক্তি-চরিত্রের ভালো-লাগার ব্যাপারটা সব সময় ব্যতিক্রমধর্মী। বায়রন ইংরেজ হওয়া সত্ত্বেও গ্রীস এবং গ্রীক-প্রিয় ছিলেন। মধুসূদন খৃষ্টান হয়েও রামায়ণ মহাভারত নিয়ে কাব্য রচনা করেছেন। এমনকি মধুসূদন একবার বলেছিলেন—

> As a jolly Christian youth I don't care a pins head for Hinduism, I love the grand mythology of our ancestors. It is full of poetry.

কথাটা একটু রদবদল করে, যেহেতু ব্যক্তি-ফর্‌রুখ চারিত্রিক দিক দিয়ে মধুসূদনের সম্পূর্ণ বিপরীত, বলতে পারতেন—

> As a jolly Muslim youth I care much for Islamism and I also love the grand history, literature and mythology of our ancestors. It is full of poetry.

বর্তমান সংকলন-গ্রন্থে এই বিষয়ের উপর বিশেষভাবে আলোচিত কিছু প্রবন্ধ থাকলে ভাল হত, কিন্তু তা হয়নি। আশা করি, ভবিষ্যতে এ নিয়ে বিশদ আলোচনাসমৃদ্ধ পৃথক গ্রন্থ লিখিত হবে।

আর একটি কথা ঃ ফর্‌রুখের সারা সাহিত্য জুড়ে কেবল আরব-ইরানের সংস্কৃতি ও প্রকৃতি একতরফাভাবে ঠাঁই পেয়েছে একথা সত্য নয়। এই সংকলন-গ্রন্থে মুদ্রিত হাসান হাফিজুর রহমান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী এবং বিশেষ করে অধ্যাপক আবদুল গফুরের প্রবন্ধে আমরা দেখছি, ফর্‌রুখের কবিতায় বাংলার নিসর্গ ও প্রকৃতি বিস্তৃত অংশ জুড়ে ঠাঁই পেয়েছে।

ব্যাপার হল ফর্‌রুখের দু'একটি কাব্য নয়—তাঁকে জানতে হলে তাঁর সমস্ত কাব্য ও কবিতার সঙ্গে পরিচিত হতে হবে ; এবং এই পরিচয়ের পরেই তাঁর সম্বন্ধে কোন উক্তি করলে সেটাই হবে সঠিক উপলব্ধির সমালোচনা।

২.

ফর্‌রুখের কাব্য-মানস বিচার করতে গেলে তাঁর কালের, সমাজের আকাঙ্ক্ষার দিকেও তাকাতে হবে। তাঁর মত বড় প্রতিভা কখনও সাধারণ আত্মকেন্দ্রিক অনুভূতি নিয়ে বৃদ্ধি লাভ করে না বা আপনাকে প্রকাশ করে না। এই সব বড় প্রতিভা বিকশিত হয় সমষ্টির অনুভূতিকে আত্ম-অনুভূতিতে সঞ্চার করে। ফর্‌রুখ বিংশ শতাব্দীর মধ্য-পূর্ববর্তী কালের বাঙালি মুসলমানের মর্মবেদনাকে একাত্ম করে দেখেছিলেন ঃ সে মুসলমান পশ্চাৎপদ, দরিদ্র, নিরাশা-পীড়িত ; কিন্তু সাথে সাথে তন্দ্রার ঘোর ছাড়িয়ে জেগে-ওঠার জন্যে ব্যাকুল।

একদিকে মুন্‌শী মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্‌, কায়কোবাদ, ইসমাইল হোসেন শিরাজী, মোজাম্মেল হক, আকরম খাঁ, নজরুল ইসলাম, গোলাম মোস্তফা, ডক্টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, এয়াকুব আলী চৌধুরী, ইবরাহীম খাঁ, মুজীবুর রহমান, কাজী আবদুল ওদুদ, আবুল হুসেন, আবুল

www.pathagar.com

কালাম শামসুদ্দীন, আব্বাসউদ্দীন প্রমুখ সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মী অন্যদিকে নবাব আবদুল লতিফ, নবাব সলীমুল্লাহ্‌, আবুল কাসেম ফজলুল হক, নাজিমউদ্দিন, সোহ্‌রাওয়ার্দী, মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম প্রমুখ সমাজসেবী ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ তাঁদের ধর্ম ও কর্মপ্রেরণা এবং শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি দ্বারা মুসলিম সমাজকে তখন অনেকখানি এগিয়ে দিয়েছেন। একদিন বাঙালি মুসলমান যে ডানাভাঙ্গা অবস্থায় অথবা চোখ-না-ফোটা পাখির ছানার মত অবস্থায় ছিল সে অবস্থা থেকে তাদের তাঁরা অনেকখানি অগ্রসর অবস্থায়, ঘোর রাত্রির দারুণ বিভীষিকা থেকে তাদের সূর্যোদিত ভোরের কিনারায় পৌছে দিয়েছেন। কিন্তু সমাজ জাগলেও তখন সমাজের গভীর সমস্যা থেকে বাঙালি মুসলমান সম্পূর্ণ মুক্তি পায় নি। একদিকে পরদেশী বৃটিশের শাসন ও শোষণ, অন্যদিকে প্রতিবেশীকে পৃথক শত্রু জাতি বিবেচনা করে হিন্দুদের আত্মকেন্দ্রিক-উচ্চাকাঙ্ক্ষায়-জেগে ওঠা নীতির বঞ্চনা এবং হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের ধনিক-বণিকের শোষণ সমস্ত মুসলিম সমাজের কণ্ঠকে প্রায় বাজের নখের মত আঁকড়ে ধরেছে আর বাঙালি মুসলমান সেই কামড় থেকে অব্যাহতি পাওয়ার জন্যে তখন মরিয়ার মত ব্যাকুল হয়ে উঠেছে। ফর্‌রুখের আবির্ভাব হয় এই ব্যাকুলতা কণ্ঠে নিয়ে। বলা বাহুল্য, সাধারণ মানুষের জাগরণ আর ফর্‌রুখের জাগরণ এক নয়। ধনতান্ত্রিক সমাজের ফাঁকিটা সাম্যবাদী কবিতায় নজরুল দেখিয়েছিলেন ; এই সব সাহিত্য এবং কম্যুনিস্ট ও তাদের সাহিত্যের সংস্পর্শে আসায় ফর্‌রুখের মধ্যে প্রখর সমাজ-সচেতনতার উদ্ভব হয়েছিল। তাঁর মানবপ্রেমিক হৃদয় অকস্মাৎ আবিষ্কার করে যে, মুসলিম সমাজের আপাতউন্নতির মধ্যে ঢের সামাজিক ফাঁকি রয়ে গেছে। গোটা সমাজের সঠিক উন্নতি বলতে যা বোঝায়—যে উন্নতি আসে অর্থনৈতিক সমবণ্টন ব্যবস্থার মাধ্যমে, সে উন্নতি থেকে সমাজ বহুদূরে পিছিয়ে আছে।

সামাজিক এই জটিল সমস্যার তিনি একটা সমাধান খুঁজছিলেন। সমাজ ব্যবস্থা পরিবর্তনের যে সমাধান কম্যুনিজম দিয়েছে সেটা জান্‌তে পেরে, সেটাকে তাঁর দৃষ্ট সমস্যার সমাধান মনে করে, তিনি সেই পথে পা বাড়িয়েছিলেনও বলে শোনা যায়। কিন্তু এই পর্যায়েই অকস্মাৎ তাঁর পরিবর্তন ঘটে যায়। তিনি দেখতে পান, কম্যুনিজম যে সাম্যবাদের মন্ত্র শেখাচ্ছে সে মন্ত্র আদি ও সনাতন ইসলামেরই মন্ত্র ; উপরন্তু কম্যুনিজমে নেই সেই আত্মার ক্ষুধার খাদ্য যা ইসলামে আছে। ইসলামকে কাব্যাদর্শ হিসাবে তাঁর বেছে নেওয়ার এটা অন্যতম প্রধান কারণ।

৩.

প্রত্যেক কবির মানস-ভূমির দুটি দিক থাকে ঃ একটা ভাবগত বিষয়, অন্যটি শিল্পগত বিষয়—যাকে আমরা আঙ্গিক বলি। কবিতার এই অঙ্গ অলঙ্কৃত হতে পারে আবার নিরলঙ্কৃত হতে পারে। চিন্তাকে ভাবোপযোগী করে ব্যক্ত করতে সাহায্য করে এই অলঙ্কার। বলা বাহুল্য, কাব্যের ক্ষেত্রে এই অলঙ্কারের সাহায্য প্রায় অনিবার্য ; এবং কবির ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্য ও স্বরূপ প্রকাশে এই অলঙ্কার বড় রকমের ভূমিকা গ্রহণ করে।

এই সংকলন-গ্রন্থেই অনেকের লেখাতে তাই ফর্‌রুখের কাব্যের বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর কাব্যের ভাষা রূপ ও অঙ্গের বৈশিষ্ট্য আলোচিত হয়েছে। বিষয় ও আঙ্গিকের এই আলোচনায়

www.pathagar.com

অবশ্য পূর্ণ ভারসাম্য রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। এর কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলা যায়, ফর্‌রুখ সম্বন্ধে আলোচনার ক্ষেত্রটি এখনও পর্যাপ্তভাবে বিকশিত হয়নি—এখনও তা শুরুর পর্যায়ে রয়ে গেছে। এখানে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবদুল কাদির, সৈয়দ আলী আহসান, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, আবদুল মান্নান সৈয়দ, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম, মুহম্মদ নূরুল হুদা ফর্‌রুখ কাব্যের আঙ্গিক ও রূপালঙ্কার নিয়ে বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা করেছেন—ফর্‌রুখকে বোঝার জন্যে যা পাঠককে যথেষ্ট সহায়তা করবে। ফর্‌রুখ-কাব্যের দর্শন ও তাত্ত্বিক দিক নিয়ে যাঁরা আলোচনা করেছেন তাঁদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, আবদুল হক, আবদুল গফুর, আল মাহমুদ, আফজাল চৌধুরী প্রমুখ।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপর তাঁর জীবিতকালে এককভাবে সম্ভবত প্রথম প্রবন্ধ লেখেন কবি আবদুল কাদির—যেটি কলকাতা বেতার থেকে প্রথমে প্রচারিত হয় ও পরে 'সওগাত'-এর ১৩৫৪ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'নবীন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে ছাপা হয়।

এর পরে ফর্‌রুখের উপর যে বিশদ আলোচনা লেখা হয় তার লেখক হলেন মোহাম্মদ আজরফ। ১৯৫২ সালের সাময়িক পত্রিকা 'দ্যুতি'র ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় প্রবন্ধটি 'বাংলা কাব্যে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে মুদ্রিত হয়। ফর্‌রুখ আহমদের উপর এর পরে আর একটি প্রবন্ধ লেখেন কবি শামসুর রাহমান। 'দৈনিক মিল্লাত'-এর এক রবিবাসরীয় সংখ্যায় 'একজন আধুনিক কবি প্রসঙ্গে' শিরোনামে এটি ১৯৫৩ সালে ছাপা হয়েছিল।

বর্তমান সংকলনে আমরা প্রথম প্রবন্ধ দুটি অন্তর্ভুক্ত করেছি, কিন্তু তৃতীয়টিকে পারি নি। কারণ মিল্লাতের ঐ সংখ্যা আমরা অনেক চেষ্টা করেও সংগ্রহ করতে সমর্থ হই নি।

এককভাবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপর আর একটি বিশিষ্ট লেখা মুজীবুর রহমান খাঁ-র প্রবন্ধ 'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা'। এটি প্রথমে 'পাকিস্তান কাউন্সিল'-এ পঠিত হয় ও পরে 'পাকিস্তানী খবর'-এ প্রবন্ধাকারে ছাপা হয়। প্রবন্ধটিকে এ সংকলনভুক্ত করা হয়েছে।

ফর্‌রুখ আহমদের জীবিতকালে তাঁর উপর গ্রন্থ রচনার একক দৃষ্টান্ত সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ'। এ গ্রন্থটি থেকে এখানে আমরা একটিমাত্র প্রবন্ধ গ্রহণ করেছি।

ফর্‌রুখকে নিয়ে সবচেয়ে যিনি বেশী লিখেছেন, সুনীল মুখোপাধ্যায়ের পরে, তিনি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্। এখানে বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, ফর্‌রুখ-চর্চায় বাংলাদেশে ও বাংলা সাহিত্যে কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র অবদান অনেকখানি ; তিনি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, তাঁর বিভিন্ন কাব্যগ্রন্থ ও তাঁর সামগ্রিক কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখেছেন। এখানে আমরা তাঁর তিনটি প্রবন্ধের সমন্বিত একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছি। বলা বাহুল্য, তাঁর এই প্রবন্ধগুলি ফর্‌রুখের কাব্য বিষয়, আঙ্গিক ও রূপ পরিচয়ে পাঠকের ফর্‌রুখ-উপলব্ধির ক্ষেত্রে যথেষ্ট সাহায্য করবে।

৪.

ফর্‌রুখের জীবিতকালে এবং তাঁর কাব্যসাধনার প্রাথমিক পর্বেই তাঁর প্রতিভা স্বীকৃতি পেয়েছিল। অনেক বেশি প্রবন্ধ ও গ্রন্থ তাঁর উপর লিখিত না হলেও আধুনিক বাংলা কবিতার

www.pathagar.com

উপর আলোচনা করতে গেলেই বিদগ্ধ সমালোচকেরা অন্তত ফর্‌রুখের কাব্যপ্রতিভাকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। সৈয়দ এমদাদ আলী, কাজী আবদুল ওদুদ, শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মজুমদার, নরহরি কবিরাজ, কবি আবদুল কাদির, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আবু রুশ্‌দ বিভিন্নভাবে তাঁর প্রশংসামূলক আলোচনা করেন। তা ছাড়া ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'সাত সাগরের মাঝি' প্রকাশিত হলে 'মোহাম্মদী' ও 'সওগাত'-এ বিশদ আলোচনা করেন মুজীবর রহমান এম.এ. ও বসুধা চক্রবর্তী।

বিভাগোত্তরকালে তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' পুনর্বার প্রকাশিত হলে এবং 'সিরাজাম মুনীরা' প্রথম প্রকাশিত হলে প্রবন্ধাকারে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ 'দ্যুতি'তে তার আলোচনা করেন, সে কথা পূর্বে উল্লেখ করেছি।

পরবর্তীকালে তাঁর সনেট সংকলন 'মুহূর্তের কবিতা', তাঁর কাব্যনাট্য 'নৌফেল ও হাতেম' ও তাঁর কাহিনীকাব্য 'হাতেম তা'য়ী' প্রকাশিত হলে তা কাব্যানুরাগী সুধীবৃন্দের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেগুলি বিশদভাবে আলোচিত ও সমালোচিত হয়। তখনকার 'মাহে-নও', 'পূবালী', 'পরিক্রম', 'পাকিস্তানী খবর', 'সমকাল' এবং অন্যান্য অনেক সাময়িক পত্রিকায় ঐসব গ্রন্থের বহু রিভিউ ছাপা হয়। ঐ সব সমালোচকের মধ্যে আছেন প্রখ্যাত সমালোচক আবুল কালাম শামসুদ্দীন, মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্‌, কবি আবদুল কাদির, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবদুল হাফিজ, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ প্রমুখ।

আমরা এখানে এই ধরনের কয়েকটি প্রবন্ধ-আকৃতির রিভিউকে প্রবন্ধ হিসেবে সংকলন করেছি। যার মধ্যে আছে মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবদুল হাফিজ ও মোহাম্মদ মনিরুজ্জামানের প্রবন্ধ। এই চারটি প্রবন্ধের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থটি ফর্‌রুখের 'হাতেম তা'য়ী'র রিভিউ এবং তৃতীয়টি 'নৌ'ফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যের রিভিউ।

৫.

ফর্‌রুখ আহমদের মৃত্যুর পরই তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা বৃদ্ধি পেতে থাকে। সমকালের সমপেশাজীবীরা অবচেতন মনে ব্যক্তিত্বের লড়াইয়ে শরীক হওয়ার ফলে গুণীর প্রকৃত মর্যাদা দিতে কুণ্ঠিত হন। কিন্তু যে প্রতিভা একবার গুণগত মানে স্বর্ণমূল্য লাভ করে জনতার কাছে, তাঁর জনপ্রিয়তা হ্রাস পায় না—বিশেষ করে মৃত্যু-পরবর্তী সময়ে তা অধিকতর শক্তির প্রশ্রয় পায়। ফর্‌রুখের বেলায়ও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। আপন ব্যক্তিত্ব ও মানসিকতার কারণে বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করলে অতি অল্প সময়ের জন্যে ফর্‌রুখ-প্রতিভা সাময়িক অস্বীকৃতির শিকারে পরিণত হলেও তা ছিল অতি দীর্ঘদিন পরে চন্দ্রের রাহুগ্রস্ত হওয়ার ঘটনার মত। যে দেশের প্রায় নব্বই ভাগ লোক মুসলিম, সে দেশের মানুষের মানস-আকাঙ্ক্ষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হয়েও তাদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কল্যাণকামী জনকের ভূমিকা গ্রহণ করে তিনি দীর্ঘকাল অবহেলিত থাকতে পারেন না।

এর প্রতিক্রিয়া বিস্ফোরিত হতে সময় লাগে নি। জীবিতকালে তাঁর মৃত্যুর অনতিপূর্বে তদানীন্তন দৈনিক 'গণকণ্ঠ'-এর পোস্ট-এডিটরিয়ালে কবি-সমালোচক আহমদ ছফা ফর্‌রুখের

www.pathagar.com

প্রতি দেশবাসীর অশেষ অবহেলা ও উপেক্ষা লক্ষ্য করে এক আক্রমণাত্মক প্রতিবাদী উচ্চারণে ভাষা দেন। এই একটি লেখা [এ-গ্রন্থের 'কবি অমর' অংশে মুদ্রিত] কবির প্রতি অনীহার নিদ্রিত চেতনায় ভীষণ আঘাত হানে এবং বুদ্ধিজীবীদের কোণঠাসা অংশটি সম্বিৎ ফিরে পান।

এই ঘটনাকে প্রসারিত করে ফর্‌রুখের আদর্শে উজ্জীবিত লেখক ও কবিরা এবং তথাকথিত বিপরীত মানসের মেরুবাসীরাও প্রায় প্লাবনের মত ফর্‌রুখকে রক্ষা করতে বেরিয়ে আসেন। ফর্‌রুখের মৃত্যুর পর সেই প্লাবনও উচ্ছ্বাসে পরিণত হয়। প্রতিটি দৈনিকের এডিটরিয়াল ও পোস্ট-এডিটরিয়ালে হতে থাকে তাঁর ব্যক্তিত্বের গুণকীর্তন। সাময়িক পত্রিকা, সাপ্তাহিক, দৈনিক পত্রিকাতে তাঁর উপর প্রবন্ধ লিখিত হতে থাকে এবং কয়েকজন তরুণের বিশ্রামহীন পরিশ্রমের ফলে আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় প্রায় রাতারাতি বেরিয়ে আসে 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' নামক সংকলন। যে সংকলনের ভূমিকা লেখেন মরহুম সাহিত্যিক আবুল ফজল।

আমরা এই সংকলন-গ্রন্থে ঐ সব লেখার মধ্য থেকে অনেকগুলো রচনা সংকলন করেছি, যার কয়েকটি স্মৃতিধর্মী। এই সংকলনের 'ব্যক্তি' অংশে এগুলো সংকলিত হয়েছে। বলা বাহুল্য, 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় আবুল ফজল লিখিত ভূমিকাটিও আমাদের এ সংকলনের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। সংকলনের 'কবি অমর' অংশে তাঁর মৃত্যু-পরবর্তীকালে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর ১৩৮১-এর ১লা অগ্রহায়ণ ইব্‌নে খালদুন (ডক্‌টর হাসান জামান)-এর এবং 'দৈনিক দেশ' ও 'দৈনিক বাংলা'র পোস্ট-এডিটরিয়ালে লেখা জনাব সানাউল্লাহ্ নূরী, কবি শামসুর রাহমানের দু'টি লেখা উদ্ধৃত করে দিয়েছি। কবির মৃত্যুতে বিদগ্ধ সুধীজনের হৃদয়ে কি ধরনের প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, এই লেখা তিনটি থেকে আমরা তা জানতে পারব।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মৃত্যু-পরবর্তীকালে সাময়িকীতে যেসব প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় তাদের মধ্যে আবদুল হক, অধ্যাপক আবদুল গফুর, ডক্‌টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্, আল মাহমুদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ, আফজাল চৌধুরী, সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও সৈয়দ আবুল মকসুদ-এর প্রবন্ধগুলি ফর্‌রুখের মানস ও কাব্যবিচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী তাঁর প্রবন্ধ-গ্রন্থ 'শব্দের সীমানা'য় একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন; ফর্‌রুখের কাব্য-বিচারে এই দীর্ঘ প্রবন্ধটিও নিঃসন্দেহে মূল্যবান। কবি আল মাহমুদ ইসলামিক ফাউন্ডেশনে ফর্‌রুখের উপর 'ন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গ কবি' নামে একটি প্রবন্ধ পড়েন। একই নামে তরুণ প্রবন্ধকার মুকুল চৌধুরীও একটি প্রবন্ধ পড়েন। এই প্রবন্ধ দু'টিও এখানে সংকলিত হয়েছে। ভিন্ন স্বাদের এই প্রবন্ধে ফর্‌রুখকে নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে পাওয়া যাবে।

সংখ্যা-গাণিতিক হিসাবে দেখা যাবে, মৃত্যু-উত্তর ফর্‌রুখের জনপ্রিয়তা কি পরিমাণ বেড়েছে। বলা বাহুল্য যে, এ যাবত ফর্‌রুখের উপর লিখিত আরও অনেক প্রবন্ধ গ্রন্থটির অতিদ্রুত মুদ্রণ এবং স্থান সংকুলানের অভাবে এই সংকলনে গ্রহণ করতে পারি নি। আমরা আশা করছি, এই গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ কালে যে সব প্রবন্ধ আমরা এই সংকলনে দিতে পারি নি সেগুলি অন্তর্ভুক্ত করতে পারব।

www.pathagar.com

৬.

এই সংকলন-গ্রন্থে আমরা কয়েকজন লেখকের দু'তিনটি বিচ্ছিন্ন লেখা সংযুক্ত করে একটি প্রবন্ধ হিসেবে ছেপেছি। এঁদের মধ্যে আছেন আবদুল কাদির, আবুল ফজল, অধ্যাপক আবদুল গফুর ও মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌। ফর্‌রুখের উপর আবদুল কাদিরের এই সংযুক্তকৃত লেখাটির আমরা নাম দিয়েছি—"কবি ফর্‌রুখ ঃ দুই সমীক্ষা"। প্রথম সমীক্ষার লেখাটি 'নবীন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয় এবং দ্বিতীয়টি প্রকাশিত হয় ফর্‌রুখের মৃত্যুর পরে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এ (১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৫)। আবুল ফজলের লেখাটির নামকরণ করা হয়েছে 'তার বিশ্বাস অকৃত্রিম'। এর প্রথমটি 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকা এবং দ্বিতীয়টি 'কবি ফর্‌রুখ আহমদ' নামে 'জনপদ' পত্রিকায় প্রকাশিত ক্ষুদ্র নিবন্ধ।

অধ্যাপক আবদুল গফুরের প্রবন্ধটি 'পূর্বাচল'-এ প্রকাশিত দু'টি প্রবন্ধ এবং তাঁর একটি সদ্য-রচিত রচনার সমন্বয়। কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র প্রবন্ধটিও তাঁর তিনটি প্রবন্ধের সমাহার।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপর কবি আশরাফ সিদ্দিকীর একটি প্রবন্ধ তাঁর স্মৃতিধর্মী প্রবন্ধ সংকলন 'যা দেখেছি যা পেয়েছি যা জেনেছি'তে ছাপা হয়েছিল। সেটিকে দু'খণ্ডে ভাগ করে 'সাহিত্যপ্রেমিক ফর্‌রুখ' ও 'আর এক অগ্নিবীণা' নামে যথাক্রমে গ্রন্থের 'ব্যক্তি' ও 'কবি' এই দু'অংশে ছেপেছি।

সংকলন-গ্রন্থটিকে আমরা মূলত দু'টি ভাগ করেছি। এর প্রথমটি ব্যক্তি ফর্‌রুখ সম্বন্ধে স্মৃতিচারণা, দ্বিতীয় অংশটি ফর্‌রুখের কাব্যপ্রতিভার আলোচনা। গুরুত্বের দিক দিয়ে সব ক'টিই সমমূল্যের ; কারণ ব্যক্তির পরিচয় বাদ দিয়ে কাব্য প্রতিভার পরিচয় সম্পূর্ণ হয় না। একটি অন্যটির পরিপূরক। তবু এই সংকলন তৈরির সময় আমরা ব্যক্তি-ফর্‌রুখের পরিচয়টির উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছি, এই জন্যে যে, কবির কাব্যের আর বিলুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা নেই ; কিন্তু তাঁর স্মৃতিবাহী তাঁর সমকালীন বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলেই মরণশীল। সময় থাকতেই তাঁদের কাছ থেকে কবি সম্পর্কিত কিছু তথ্য জেনে নিয়ে তা মুদ্রিত করলে কবির জীবনী রচনায় তা ভবিষ্যত গবেষকদের বিরাট সাহায্য করতে পারবে।

আর এ কথাও সত্য—ফর্‌রুখের কবিতার উপলব্ধিতে সেই ব্যক্তি-মানুষের স্বরূপটির সঙ্গেও আমাদের পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। কেননা, আমরা জানি, একমাত্র মহৎ হৃদয়ই মহৎবাণী উচ্চারণ করতে পারে।

স্মৃতিকথাধর্মী এই সব লেখা আমরা এত বেশী পাব তা প্রথমটায় ধারণা করতে পারি নি। কিন্তু কাজে নেমে আমরা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছি। ঐ সব লেখককে ধন্যবাদ যাঁরা ফর্‌রুখের স্মৃতিকথা লিখে আমাদের সাহায্য করেছেন। আমরা দ্রুত গ্রন্থ প্রকাশের সংকল্প করেছিলাম এবং সেজন্যে অনেককেই দ্রুত লেখা দিতে বলেছিলাম। এই দ্রুততায় সাড়া দিতে অনেকেই কার্পণ্য করেন নি। স্মৃতিকথাধর্মী এইসব লেখার কতকগুলো পূর্বপ্রকাশিত। যেমন মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন, কামরুল হাসান, আবদুল হক, মুস্তফা নূরউল ইসলাম, আখতার ফারুক, কাজী গোলাম আহ্‌মদ, তিতাশ চৌধুরী, হাবীবুর রহমান, মোহাম্মদ মাহফুজ্‌উল্লাহ্‌, সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু প্রমুখের লেখা। ঐ লেখাগুলো বাদে বাকি সমস্ত স্মৃতিধর্মী লেখা নতুন রচনা।

www.pathagar.com

আমাদের সংকলনের জন্যে তৈরী তিনটি লেখা, আবু রশদ, শামসুল হুদা চৌধুরী ও আবদুল লতিফ-এর লেখা, 'সচিত্র স্বদেশ'-এ সাক্ষাৎকার হিসেবে মুদ্রিত হয়েছিল। এ বিভাগে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ-এর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সৈয়দ সিদ্দীক আহমদ ও ফর্‌রুখ-পত্নী সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের লেখা দু'টি তাঁদের সাক্ষাৎকার থেকে প্রবন্ধে রূপান্তরিত করতে সাহায্য করেছেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদের চতুর্থ পুত্র আহ্‌মদ আখতার ও 'সচিত্র স্বদেশ'-এর সাহিত্য বিভাগের সম্পাদক ফাইজুস সালেহীন। সৈয়দ সিদ্দীক আহমদের সাক্ষাৎকার সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা'য় ২৫শে জুন ১৯৮২-তে মুদ্রিত হয়। আর সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের সাক্ষাৎকারটি মুদ্রিত হয় 'সচিত্র স্বদেশ'-এ।

ফর্‌রুখের কাব্য-বিচারে অথবা তাঁর মানস-বিচারে যাঁরা তাঁদের লেখায় বিতর্কিত সিদ্ধান্ত দিয়েছেন, আমরা তাঁদের সে সিদ্ধান্ত বদলের চেষ্টা করি নি। এখানে একই সঙ্গে অনুকূল ও প্রতিকূল আলোচনা ঠাঁই পেয়েছে। আমরা আশা করি, ফর্‌রুখের মানস-বিশ্লেষণে এই উভয় ধরনের আলোচনা বিশেষ সহায়ক হবে। —এই সব আলোচনা তাঁর কার্বের উপর পূর্ণায়ত আলোচনার বৃত্তটিকে প্রসারিত করবে।

ফর্‌রুখের কোন্ কবিতাটি শ্রেষ্ঠ সে সম্বন্ধে বিভিন্ন সমালোচক ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কারো মতে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা 'সাত সাগরের মাঝি', কারো মতে 'পাঞ্জেরী' আবার কারো মতে 'ডাহুক'। তাঁর কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কিত এমনি নানা রকম মত প্রকাশ করতে দেখা যাচ্ছে। অধিকাংশ লেখকই ফর্‌রুখের 'সাত সাগরের মাঝি'কে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা-গ্রন্থ বলে রায় দিয়েছেন। কিন্তু সম্মানিত কয়েকজন বিখ্যাত সমালোচক, যাঁদের মধ্যে কবি আবদুল কাদির পর্যন্ত আছেন, তাঁদের মতে ফর্‌রুখের 'হাতেম তা'য়ীই' তাঁর শ্রেষ্ঠতম কাব্য। কোন কোন সমালোচক এই কাব্যটিকে মহাকাব্য পর্যন্ত বলতে কুণ্ঠিত হন নি—যাঁদের মধ্যে আছেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন।

আবার এমনও দেখা যাবে, 'মহাকাব্য' বলে উক্ত এই কাব্য-গ্রন্থটিকে কেউ কেউ প্রায় অকাব্য বলতে উৎসাহিত হয়েছেন ; কারণ তাঁদের মতে জীবনবোধে ফর্‌রুখ তখন কাব্যপ্রীতি থেকে দূরে সরে গেছেন এবং ধর্মপ্রীতিকে জীবনাদর্শের শ্রেষ্ঠ নীতি বলে গ্রহণ করেছেন।

স্বীকার করতেই হবে যে, 'সাত সাগরের মাঝি'তে মাত্রাবৃত্তের বিলম্বিত লয়ে যে সুর, ছন্দ ও চিত্রের সমাবেশ ঘটেছিল, সেই ইন্দ্রিয়-জাগ্রতকারী সৌরভ, সুর ও চিত্রের স্বপ্নিল আবেশ তূরীয় আবেগে 'হাতেম তা'য়ী'তে উচ্ছ্রিত হয় নি। তবে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কুশলী ব্যবহারে 'হাতেম তা'য়ী'তে ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে অধিকতর সংযত ও পরিণত শিল্পী বলে মনে হয়। মানুষের রহস্যময় জীবনকে এই ছন্দের মধ্যে উপস্থাপন করার কৃতিত্বে এখানে কবি 'সাত সাগরের মাঝি'র কবির চেয়ে অভিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, নিরুদ্বেল ও বাস্তব দৃষ্টিসম্পন্ন। বলা বাহুল্য, 'হাতেম তা'য়ী'র আঙ্গিক রোমান্টিক কবির নয়—ধ্রুপদী শিল্পীর।

ধ্রুপদী পরিবেশের মধ্যে রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনার উপস্থাপনার জন্যে এই কাব্যটির রসনিষ্পত্তিতে বিঘ্নের সৃষ্টি ঘটলেও আমার ধারণা, 'সাত সাগরের মাঝি'র কবির চেয়ে 'হাতেম তায়ী'র কবি ছোট নন। 'সাত সাগরের মাঝি'তে' ফর্‌রুখ সৌন্দর্য ও জাগরণের কবি ; কিন্তু

www.pathagar.com

'হাতেম তা'য়ী'র কবি কেবল সৌন্দর্যের সঙ্গীতের ও চিত্রের কবি নন, তিনি জীবন-রহস্য সন্ধানী প্রাজ্ঞ কবি। এ ছাড়া দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া 'সাত সাগরের মাঝি' সমকালীন চিন্তাশ্রয়ী আর 'হাতেম তা'য়ী' চিরকালের সমস্যা-জটিল জীবনের চিন্তা।

যাহোক, এই বিতর্কিত ব্যাপারটি এ সংকলনের দু'একজন লেখক ঈষৎ ছুঁয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু এর পূর্ণ সমাধানের বিশ্লেষণে কেউ তেমন মনোযোগী হন নি। আমরা আশা করি, ফর্‌রুখ কাব্য-আলোচনা অগ্রসর হতে থাকলে এ আলোচনা ক্রমোন্নতি লাভ করবে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ফর্‌রুখের সাহিত্য-প্রতিভা রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের মত বহুমাত্রিক নয়, সে-জন্যে তাঁর সাহিত্যে বৈচিত্র্য সে তুলনায় কম। তবু তিনি একতারা বাজিয়ে কবিদের মতও নন—নানা ধরনের ছন্দে কবিতা রচনায় তিনি যে সিদ্ধহস্ত ছিলেন, সে উদাহরণ তিনি তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা' এবং 'হাতেম তা'য়ী'তে প্রদর্শন করেছেন। এ ছাড়াও তিনি কাব্যনাট্য লেখার আঙ্গিক সৃষ্টি করেছেন এবং সৃষ্টি করেছেন ১৮ মাত্রার অমিত্রাক্ষরের—যা মধুসূদনের অনুসরণ হলেও এক নতুন আবিষ্কার। বলা বাহুল্য, ফর্‌রুখ বৈচিত্র্য সৃষ্টিতেও মনোযোগী হয়েছিলেন। ফর্‌রুখের সৃষ্টির সে বৈচিত্র্য রূপায়িত হয়েছে তাঁর অজস্র ব্যঙ্গ ও শিশুতোষ কবিতায়। দুঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে যে, তাঁর এই বহুখ্যাত ব্যঙ্গ কবিতা শিশুতোষ ও কবিতা সম্পর্কে এ সংকলনে কোন আলোচনা দিতে পারলাম না। কারণ সেই একটাই : দ্রুততার জন্যে অনেককে অনুরোধ করলেও যথাসময়ে তাঁরা ঐ সব বিষয়ে লিখতে পারেন নি। লেখকদের দিক থেকে অবশ্য কৈফিয়ৎ দেওয়ার কারণও আছে ঃ ফর্‌রুখের ব্যঙ্গ কবিতা ও শিশুতোষ কবিতা-গ্রন্থ দুর্লভ।

৮.

এই সংকলনগ্রন্থ অনেকের চোখে অসম্পূর্ণ ঠেকবে; সেটা খুবই স্বাভাবিক। কেননা, ফর্‌রুখের উপর সংকলন-গ্রন্থ তৈরীর এটি প্রথম প্রয়াস—এবং সে জন্যে অনিচ্ছাকৃতভাবে অনেকগুলো লেখা আমাদের বাদ দিতে হয়েছে। আমরা যদি এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করার সুযোগ পাই, তখন সংকলনটির সম্পূর্ণতা প্রদানে সর্বতোভাবে সচেষ্ট হব।

বইটির শেষাংশে ব্যতিক্রমধর্মী চারটি লেখা সংযোজিত হল। গ্রন্থের মূল বিষয়ের চরিত্রের সঙ্গে মেলে না বলেই এটিকে পৃথক বিভাগে নিতে হয়েছে। ফর্‌রুখের মৃত্যুর আগে ও পরে বুদ্ধিজীবীদের মনে যে প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়, এই লেখা তিনটিতে তার অনবদ্য প্রতিফলন আছে।

একটি কথা বলা আবশ্যক, সংকলন-গ্রন্থের দু'টি বিভাগের লেখাগুলোকে আমরা বয়ঃক্রম অনুসারে ছাপবার চেষ্টা করেছি। তবে তা যে সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিকভাবে করতে পেরেছি তা বলতে পারি না ; আর এর কারণ যথাসময়ে লেখা হাতে না আসা—অন্যদিকে দ্রুতগতিতে মুদ্রণ।

সংকলন-গ্রন্থে কবির একটি এ্যালবাম ছাপা হলো। এ্যালবামে কবির ছবি ও কবির স্বহস্তে লিখিত পাণ্ডুলিপিগুলো সংগ্রহ করে দিয়েছে কবিপুত্র আহমদ আখতার।

এ্যালবামে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে কবির যে ছবি আছে সেই গ্রুপ ফটোটিতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, গোলাম মোস্তফা, জসীম উদ্‌দীনের সঙ্গে আছেন পাকিস্তানের কয়েকজন বিখ্যাত কবি ও লেখক : হাফিজ জলন্ধরী, কুদ্‌রুতুল্লাহ্‌ শাহাব, ইবরাহীম জালীস

www.pathagar.com

প্রমুখ। এ্যালবাম মুদ্রিত হওয়ার সময় এঁদের পরিচয় জানতে না পারায় ক্যাপশনে এঁদের নাম ব্যবহার না করতে পারার জন্যে দুঃখিত।

সংকলন-গ্রন্থে কোন কোন্ লেখকের দু'টি-তিনটি লেখাও ছাপা হয়েছে। যিনি ব্যক্তি বিভাগে স্মৃতিকথাধর্মী লেখা লিখেছেন, তাঁর লিখিত ফর্‌রুখের কাব্যালোচনাও আমরা ছেপেছি। আমাদের পরিকল্পিত উদ্দেশ্য পূরণের জন্যেই এটা করতে হয়েছে। পূর্বে বলেছি, জীবনী লেখার প্রাথমিক উপাদান ও তথ্যগুলো সংরক্ষণ করা আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আর সেজন্যেই আমাদের এই পথ বেছে নিতে হয়েছে।

কয়েকজন লেখকের কাছে আমাদের ক্ষমা চাইতে হচ্ছে, তাঁদের লেখা প্রকাশ করার আগে আমরা তাঁদের কাছ থেকে অনুমতি নিতে পারি নি। আর কয়েকজনের লেখার সম্পূর্ণ অংশ আমরা ছাপতে পারি নি স্থানাভাবে ; বিশেষ করে সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ও সৈয়দ মনজুরুল ইসলামের সুন্দর আলোচনা দু'টিকে আমাদের সংক্ষিপ্ত করতে হয়েছে। অবশ্য আমরা প্রবন্ধকারের মূল উদ্দেশ্য যাতে ব্যাহত না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে চেষ্টা করেছি। কৌতূহলী পাঠক মূল লেখাগুলি পড়ে নিতে পারেন। গ্রন্থটির শেষাংশে আমরা একটা লেখা-পরিচিতি দিয়েছি এবং তাতে মূল লেখাটি প্রথম কোথায় মুদ্রিত হয় তার পরিচয় ব্যক্ত করেছি।

৯.

সম্পাদক হিসাবে আমার পক্ষ থেকে কয়েকজনকে আন্তরিক মোবারকবাদ না জানালে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হবে। এই সংকলন-গ্রন্থ প্রস্তুত করার জন্যে প্রাথমিক পরামর্শ দিয়েছিলেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা-পরিচালক অধ্যাপক আবদুল গফুর। তাঁর সমর্থন, সহযোগিতা ও প্রেরণা কাজটিকে ত্বরান্বিত করেছে। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর মহাপরিচালক জনাব আ. ফ. ম. ইয়াহিয়া এর পাণ্ডুলিপি দেখে যে গভীর আনন্দ ও আগ্রহ প্রকাশ করেন তা বিস্ময়কর। সংকলনের রচনা, ছবি ও পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের কাজে নিষ্কণ্ঠ আন্তরিকতায় সহযোগিতা করে স্নেহাস্পদ মুকুল চৌধুরী ও কবিপুত্র আহমদ আখতার। প্রাথমিক প্রুফ সংশোধনে আহমদ আখতার অন্যদের সঙ্গে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। বলতে দ্বিধা নেই, এখানে উদ্ধৃত কবির কাব্যাংশের শুদ্ধির ব্যাপারে আমি আখতারের প্রশংসনীয় স্মৃতিশক্তির সাহায্য নিয়েছি।

সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশের জন্যে আরেকজনের পরামর্শ আমাদের সাফল্যের প্রেরণা ছিলো— তিনি কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কিত প্রায় প্রতিটি কাজেই তিনি কোন-না-কোনভাবে অংশগ্রহণ করেছেন। এ সংকলনেও তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমাদের নানাভাবে সহযোগিতা করতে এগিয়ে এসেছেন। অতি দ্রুত প্রচ্ছদ অংকন ও সংকলন-গ্রন্থের এ্যালবাম সজ্জিতকরণে শিল্পী হাশেম খান আমাদের আবেদনে সাড়া দিয়েছেন। সাধারণ ধন্যবাদ এঁদের জন্যে যথেষ্ট নয়।

সংকলন-গ্রন্থটির মুদ্রণ প্রক্রিয়ায় আমাকে সাহায্য করেছেন ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা-এর প্রকাশনা কার্যক্রমের সহ-সম্পাদক, প্রকাশনা শিল্পে অভিজ্ঞ এ সংকলনের মুদ্রণ-তত্ত্বাবধায়ক হাস্‌নাইন ইমতিয়াজ ও ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ প্রকাশিত শিশু-কিশোর

www.pathagar.com

পত্রিকার সহ-সম্পাদক মসউদ-উশ-শহীদ। মুদ্রণকার্য ত্বরান্বিত করায় সহযোগিতা করেছেন ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেসের সহকারী ম্যানেজার জনাব শেখ আবদুর রহীম ও তত্ত্বাবধায়ক আবুল কালাম আযাদ এবং তাঁদের সহকর্মীবৃন্দ—এঁদেরকেও আমি অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

আর একজনকেও আমার এই সঙ্গে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হচ্ছে। তিনি প্রকাশনা অফিসার আবুল খায়ের আহমেদ আলী। মহাপরিচালক বইটি যখন মাত্র একমাসের মধ্যে প্রকাশ করতে নির্দেশ দেন, তখন বাজারে কর্ণফুলী পেপার মিলের হোয়াইট প্রিন্ট ছিল না। এ অবস্থায় বইটির যাবতীয় কাগজ সংগ্রহের জন্যে তিনি সার্বিক প্রচেষ্টা চালান এবং যথাসময়ে কাগজের ব্যবস্থা করে গ্রন্থটি মুদ্রণে অশেষ সাহায্য করেন।

৩৭৫/এ উত্তর শাহ্‌জাহানপুর
ঢাকা-১৭
৭. ৩. ১৯৮৪

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ব্যক্তি

www.pathagar.com

সে দায়িত্ব নিয়ে চলে 'য়েমনের শাহজাদা একা
নিঃসঙ্গ (কেননা এই শিলাবর্ত্মে আসে না কখনো
রঙমহলের সঙ্গী--সমতল পথের বন্ধুরা :
প্রমোদ-বিলাসী আর সুখান্বেষী আসে না এ পথে)।
এ পথে মেলে না যাত্রী সহগামী ; নিঃস্বার্থ, নির্ভীক
পথের দিশারী, মেলে না ক্ষুধার মুখে আব-দানা
অথবা আশ্রয়। যারা গেছে এই পথে--চিরকাল
গেছে সঙ্গীহীন। পেয়েছে লাঞ্ছনা কেউ প্রতিদান,
পেয়েছে গঞ্জনা ; অপমান ; পিপাসার্ত ওষ্ঠপুটে
কত যাত্রী এই পথে জহরের পেয়ালা পেয়েছে,
পেয়েছে দুঃসহ জ্বালা তিক্ততম দারিদ্র্যের, আর
পেয়েছে অলক্ষ্যে কেউ জালিমের সুতীক্ষ্ণ খঞ্জর।

[নূররেজ ফুলের সন্ধানে ॥ চার ॥ ঃ হাতেম তা'য়ী]

www.pathagar.com

মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন

তাঁর নাম ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

আমার সাথে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রথম পরিচয় 'সওগাত'-এ প্রকাশিত তাঁর কবিতার মাধ্যমে। ১৩৪৪ সালের (ডিসেম্বর ১৯৩৮) পৌষ মাসে ২১শ বর্ষ ২য় সংখ্যা 'সওগাত'-এ তাঁর 'আঁধারের স্বপ্ন' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়। এটিই 'সওগাত'-এ তাঁর প্রথম লেখা। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৯ কি ২০ বছর। উক্ত ২১শ বর্ষের 'সওগাত'-এ পরপর তাঁর আরো চারটি কবিতা ছাপা হয়। এরপর ১৩৪৫ থেকে ১৩৫৪ (১৯৪৭) সাল পর্যন্ত দশ বছর তিনি 'সওগাত'-এ কবিতা লিখেছেন।

'সওগাত'-এ প্রকাশিত তাঁর ৬০তম ও সর্বশেষ কবিতার নাম 'ময়নামতির মাঠে'। এ কবিতাটি ছাপা হয় 'সওগাত' যখন ঢাকা থেকে বের হয় সে সময়ে। অবশিষ্ট সব ক'টি লেখাই দেশ বিভাগের সময় পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত 'সওগাত'-এ প্রকাশিত হয়। কলকাতার 'সওগাত'-এ প্রকাশিত ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতাগুলি সম্পর্কে ইতিপূর্বে বাংলাদেশে কোন আলোচনা দেখা যায় নি। তাঁর কবিজীবনের প্রথম দিকের লেখা বলে এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য রয়েছে।

১৩৪৫ সাল থেকে 'সওগাত'-এ কবিতা লেখা আরম্ভ করলেও ১৩৫০ সালের পূর্বে আমি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সাথে সাক্ষাৎভাবে পরিচিত হইনি। কলকাতায় থেকেও তাঁর কবিতা নিয়ে তা প্রকাশের জন্য কোনদিন 'সওগাত' অফিসে আসেন নি। হয় ডাকযোগে, না হয় লোক মারফত তিনি লেখা পাঠাতেন। নিজের লেখার উপর তাঁর আস্থা ছিল, সেজন্য তা পত্রস্থ করবার জন্য কখনো কোন অনুরোধপত্রও পাঠান নি।

১৩৫০ সালের অগ্রহায়ণ মাসে হঠাৎ একজন যুবক অতি উত্তেজিত অবস্থায় 'সওগাত' অফিসে এসে হাজির হন এবং জনৈক প্রভাবশালী ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে গালিবর্ষণ করতে থাকেন। তাঁর চোখ দু'টি জবাফুলের মত লাল, মাথার ঝাঁকড়া চুল এদিক-ওদিক ঝাঁকিয়ে পায়চারী করছেন আর যা মনে আসছে বলে যাচ্ছেন। ইতিপূর্বে তাঁকে কোনদিন দেখি নি ; তাই তাঁর পরিচয় জানতে চাইলাম এবং উত্তেজিত অবস্থায় আমার অফিসে ঢুকে এভাবে অন্য একজনকে গালাগালি করার কারণ জিজ্ঞাসা করলাম। তাঁকে আমি শান্ত হতে বললাম। কিন্তু তিনি থামলেন না। বললেন, "বেটাকে আমি দেখে নেবো, আমি তাকে জেলে দেবো।"

www.pathagar.com

আমি তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে তাঁর হাত ধরে সামনের চেয়ারে বসিয়ে দিলাম। তিনি জানালেন, তাঁর নাম ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। উক্ত প্রভাবশালী ব্যক্তি নাকি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের লেখা একটি গান নিজের নাম দিয়ে তাঁর কাগজে ছাপিয়েছেন, তাই উত্তেজিত হয়ে তিনি ছুটে এসেছেন 'সওগাত' অফিসে।

আমি সস্নেহে বললাম, "সত্যি এটা গুরুতর অপরাধের কাজ। আপনি সহ্য করতে পারেন নি, তাই এতটা উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। একটু শান্ত হোন, সব কথা শুনব। এর আগে একটু চা-নাশতা খেয়ে নিন।"

এভাবে একটি অপ্রীতিকর অবস্থার মাঝে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সাথে আমার সাক্ষাৎ হয়।

চা খাওয়ার পর ফর্‌রুখ আহ্‌মদ একটু শান্তভাবে কথা বলতে শুরু করলেন। বললেন, "গানটি লিখে আমি টেবিলের উপর রেখে এসেছি, পরে দেখি নিজ নামে সেটি তিনি তাঁর কাগজে ছেপে দিয়েছেন। গিয়েছিলাম তাঁর অফিসে; তাঁকে ধরবার জন্য, কিন্তু দেখা পাই নি। এইমাত্র সলিসিটরের অফিস থেকে ফিরলাম। সলিসিটর বললেন যে মামলা চলবে। তাঁকে এর জন্য এখন এক শ' টাকা দিতে হবে। আমার হাতে আজ টাকা নেই, আপনি আমাকে এক শ' টাকা দিন। আমি প্রত্যেক মাসে আপনার সওগাতে লেখা দেবো।"

আমি বললাম, "এখন মুসলিম লীগের রাজত্ব, যাঁর নামে নালিশ করবেন সে ব্যক্তি মুসলিম লীগের অন্যতম কর্ণধার। তা' ছাড়া পত্রিকার মালিক, কাজেই মামলা করে ফল হবে না।"

ফর্‌রুখ মানলেন না। বললেন, "এত বড় অন্যায় আমি সহ্য করতে পারব না। সলিসিটর বলেছেন, এর বিচার হবে।" অন্যায়ের সাথে তাঁর মনোভাব আপোসমূলক নয় দেখে তাঁকে শান্ত করবার জন্য এক শ' টাকা দিয়ে দিলাম। তিনি চলে গেলেন। পরে জানতে পারলাম, সলিসিটর একটা নোটিশ দিয়েই তাঁর কর্তব্য শেষ করেছেন। তিনি মামলা দায়ের করার জন্য প্রচুর টাকা চেয়েছেন। কাজেই মামলা আর হয় নি।

এ ঘটনার পর ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সাথে আর আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি, কিন্তু তাঁর প্রতিশ্রুতি মত প্রতি মাসে নিয়মিত 'সওগাত'-এর জন্য লেখা আসতে লাগলো। আমার সাথে কথা বলতে গিয়েই তিনি ২৬শ বর্ষ ২য় সংখ্যার (১৩৫০ সালের পৌষ সংখ্যা) জন্য লিখলেন 'সিন্দাবাদ'। এর পর ২৯শ বর্ষ, ১৩৫৪ সালের আশ্বিন সংখ্যা অর্থাৎ ভারত বিভক্ত হবার সময় পর্যন্ত নিয়মিত 'সওগাত'-এ লেখা দিয়েছেন; দেশ বিভক্ত হবার পর তিনি ঢাকা চলে আসেন এবং এখানেই আরম্ভ করেন তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের কাব্য-সাধনা।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আত্মসচেতন ধার্মিক প্রকৃতির লোক ছিলেন। কিন্তু কারো অন্যায় কাজ বা অবিচার দেখলেই তিনি রাগান্বিত হয়ে উঠতেন। তাঁর কবিতা ছিল অন্যায়, অত্যাচার ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক এবং তাতে মানবতাবোধ সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠত। অতীতের অনেক বিখ্যাত কবির মত জাতীয় জাগরণ তাঁর বহু কাব্যের লক্ষ্যবস্তু ছিল। কাজী নজরুল ইসলামের ন্যায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদও বাংলার পুঁথিসাহিত্য থেকে শব্দ চয়ন করে 'জনভাষা'য় নব কাব্যের সৃষ্টি করেছেন। কাব্য রচনায় নিজের মৌলিক আদর্শে তিনি সুমহান ছিলেন।

১৩৫৪ সালের ভাদ্র মাসে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সে মাসেই তিনি 'সওগাত'-এর জন্য একটি প্রবন্ধ লিখলেন—'পাকিস্তান, রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' নাম দিয়ে। এ প্রবন্ধটি পরবর্তী সংখ্যা আশ্বিনের 'সওগাত'-এ ছাপা হয়। প্রবন্ধের প্রারম্ভেই তিনি লিখেছেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে, এ নিয়ে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আলোচনা হয়েছে। জনগণ ও ছাত্রসমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয়, তবে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাংলাভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে।" ভাষা সম্পর্কে আন্দোলন আরম্ভ হবার পূর্বেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এ মতামত ব্যক্ত করেছিলেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অবান্তর কথা বলে বৃথা সময় নষ্ট করতেন না। বেশীর ভাগ বন্ধু-বান্ধবের সাথে সাহিত্যালোচনাই করতেন। সংসারের অভাব-অনটন থাকা সত্ত্বেও আর্থিক লালসা তাঁকে কখনও স্পর্শ করতে পারে নি।

প্রকৃত ইসলামসেবীদের সন্ধান করতে গিয়ে তিনি অতীতের মহামানবদের আদর্শ নিপুণতার সাথে ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর কাব্যে—মহাকাব্যে। একটা জাগ্রত জাতির জন্যে এর বিশেষ প্রয়োজন। তিনি সৃজনশীল কবি বলে এ সব রচনা তাঁর কাব্যপ্রতিভাকে কোন সীমাবদ্ধ গণ্ডীর ভিতর আবদ্ধ রাখে নি।

এই সেদিন কবি নজরুল ইসলামের ৭৫তম জন্মদিবস উপলক্ষে 'সওগাত সাহিত্য মজলিস' আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগদান করবার জন্য দাওয়াতপত্র নিয়ে আমি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বাসস্থান ইস্কাটন গার্ডেনে গিয়েছিলাম। দীর্ঘ পঁচিশ বছর পর তাঁর সাথে আমার এই সাক্ষাৎ। তিনি অত্যন্ত উৎফুল্ল হয়ে আমাকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। দেখলাম ঘরের আসবাবপত্র অনাড়ম্বর আর তাঁর দেহ শীর্ণ। আমি তাঁকে নজরুল জয়ন্তী উৎসবে যোগদানের আমন্ত্রণ জানালে তিনি একটু হেসে নিরুত্তর রইলেন এবং পুরনো দিনের কথা নিয়ে আলোচনা শুরু করলেন। তিনি তাঁর নিজের কোন অসুবিধা বা অভাব-অভিযোগের কথা কিছুই বললেন না। চা খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন। আমি

www.pathagar.com

বললাম, এই বৃদ্ধ বয়সে আমার খাওয়া-দাওয়া অত্যন্ত সীমিত। চা ছেড়ে দিচ্ছি। আপনি যে খেতে বলেছেন এতেই সন্তুষ্ট হয়েছি, ধন্যবাদ!"

তিনি দোতলার ঘর থেকে বেরিয়ে আমাকে রাস্তা পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। পথ চলতে চলতেও অমায়িক আলাপ-আলোচনা করলেন। আমি বললাম, "সভায় বহু কবি-সাহিত্যিক আসবেন, আপনি অবশ্যই যাবার চেষ্টা করবেন।" কিন্তু তিনি এ বিষয়ে কোন আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। "আবার দেখা হবে" বলে সেদিন তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এলাম। এটাই যে হবে আমাদের শেষ সাক্ষাৎ, তা ছিল কল্পনাতীত। কারণ, তখন তিনি অসুস্থ ছিলেন না।

বিগত ২২শে জুন (১৯৭৪) নজরুল জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে 'সওগাত সাহিত্য মজলিস'-এর অনুষ্ঠানে বহু কবি-সাহিত্যিকের সমাগম হয়েছিল। কিন্তু এ অনুষ্ঠানে ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে পাই নি। একজন প্রখ্যাত কবিকে জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এলেন না কেন?" তিনি বললেন, "কবি আজকাল ঘর থেকে বড় বেশী বের হন না। তিনি নাকি ইসলামী তমুদ্দনের কবি, তাই অপরাধী। জানি না, কবে পর্যন্ত তাঁর অপরাধের সমাপ্তি হবে এবং তিনি আমাদের সাথে আবার মিলিত হবেন।"

অকস্মাৎ খবরের কাগজে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মৃত্যুর খবর বেরুল। অনাহার অর্ধাহারে বিনা চিকিৎসায় তিনি মৃত্যুবরণ করেছেন। তিনি মৃত্যুবরণ করলেন নীরবে, কিন্তু তাঁর ধারণা ও বিশ্বাসে অটল হয়ে রইলেন; টললেন না, নিজের ও পরিবারের লোকদের জীবনরক্ষার তাগিদেও না।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মৃত্যুর সাথে সাথেই কাগজপত্রে, সভা-সমিতিতে তাঁর মৌলিক কাব্য সৃষ্টি সম্বন্ধে আলোচনা শুরু হয়েছে। তিনি যে বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ একজন কবি, এ বিষয়ে সকলেই একমত। কাব্য-জগতে তাঁর অমূল্য অবদান নিয়ে আলোচনা ও অনুসন্ধান বহুদিন ধরে চলবে সন্দেহ নেই।

www.pathagar.com

আবুল হাশেম

আমার ছাত্র ফর্‌রুখ

১৯৩৬ সালে বদলি হলাম খুলনা জেলা স্কুলে। সেখানে অজানা মুখের মধ্যে দেখতে পেলাম একমাত্র চেনা মুখ বন্ধু আবুল ফজলের। ইতিপূর্বেই তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। খুলনা জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনখানার ভার তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল। আমি সে স্কুলে যোগ দিতেই সে ভারটা তিনি আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে এম.এ. পরীক্ষা দেবার জন্য তোড়জোড় শুরু করলেন।

ভারটা নিয়ে দেখি কাজটা তত সোজা নয়। একে তো পাঠ্য ছাড়া আর কিছু খোকাদের কলমের মুখে আসতেই চায় না, তার উপর আবার টোকাই বাছার বিপদ। ভারি ঝামেলায় পড়েছিলাম। এর মধ্যে একটা ছেলে এসে একটা লেখা হাতে দিল। ছেলেটাকে দেখতাম ক্লাসের অন্য ছেলেরা যখন মাস্টার সাহেবদের জব্দ করবার জন্য ফন্দি আঁটতে থাকতো, তখন সে বসে থাকতো নির্বাক মুখে, বই মেলে, তার ডাগর চোখ দু'টি ঢেকে। লেখাটা পড়ে দেখলাম। চমৎকার লাগল। একটু ঘষামাজা করে সেটা প্রেসে পাঠিয়ে দিলাম।

এই ছেলেটিই হল ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। সে সেই বছরেই ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দিয়ে খুলনা ছেড়ে চলে গেল। এর বন্ধুরা বলতো, কলকাতার বড় পরিবেশে গিয়ে সে নাকি কবিতায় তীর ছুঁড়বার স্থান পেয়েছিল। এর বেশী আর কোন খবর তার সম্বন্ধে রাখতে পারি নি।

তারপর দশ বছর কেটে গেল। অসহ্য পেটের বেদনায় অস্থির হয়ে নাড়ি কাটাবার জন্য ছুটে গিয়েছিলাম কলকাতায়। আশ্রয় নিয়েছিলাম ধর্মতলাতে আমার স্ত্রীর অগ্রজের বাসায়। সেখানে গিয়ে দেখি প্রিন্সিপাল ইবরাহীম খাঁও কয়েকদিন হল অতিথি হয়ে আছেন অনুরূপ আত্মীয়তা সূত্রে। প্রিন্সিপাল সাহেব সে বছর এ্যাসেমব্লিতে আসন নেবার জন্য আয়োজন করছিলেন।

একদিন প্রিন্সিপাল সাহেব বাইরে থেকে ঘর্মাক্ত কলেবরে ঘরে এসে দু'খানা বই টেবিলের উপর রাখলেন। সেই বই দু'খানির একখানি ছিল 'সাত সাগরের মাঝি'। প্রিন্সিপাল সাহেব বললেন, "কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আপনাকে সালাম জানিয়েছেন।" খবরটা শুনে খুশী হলাম। ফর্‌রুখ আমার প্রতি স্বাভাবিক সৌজন্যটুকু দেখাতে ভোলেনি বলে। হাত বাড়িয়ে 'সাত সাগরের মাঝি'খানা তুলে নিলাম। আগাগোড়া তুলোট

www.pathagar.com

কাগজে ছাপা। তখন তুলোট ছাড়া আর কাগজ মিলত না কলকাতা শহরে। বইখানা কবিতায় সাজানো। খুলতেই চোখে পড়ল 'সিন্দাবাদ'। তার শুরুতে আছে —

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;

পড়েই কেমন যেন একটা নতুন আমেজ অনুভব করলাম। একটা নতুন ছবি চোখের ওপর ভেসে উঠল। নতুন ছন্দের কাঁপন লাগল মনে।

এ ঘটনার বেশ কয়েক বছর পরে যখন মুসলিম লীগের জয়-জয়কার ধ্বনিত হচ্ছিল সারা দেশ জুড়ে, তখন একটা গান প্রায়শ কানের কাছে ড্রাম বাজাতো 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' বলে। কিছুদিন পরে শুনতে পেলাম, বিরাট ব্যক্তিত্বশালী স্বয়ং আকরম খাঁ সাহেবের সঙ্গে নাকি ঝগড়া বেধেছে ফর্‌রুখের ঐ গানটির রচনা-স্বত্ব নিয়ে। আরো নাকি একজন প্রকাশকের সাথে তার মামলা হয়েছিল কোন পাঠ্যবইয়ের গ্রন্থস্বত্ব নিয়ে। মামলায় কি হয়েছিল জানি না। দরিদ্র গ্রন্থকারদের কয়জনই বা পেরেছে প্রবলপ্রতাপ প্রকাশকদের সঙ্গে মামলা করে। সে সব কথা যাক।

তারপর বহু পানি গড়িয়ে গেছে পদ্মা-মেঘনা দিয়ে। এর মধ্যে দেশ হয়েছে ভাগাভাগি—জেগে উঠেছে পূর্ব পাকিস্তান।

সেগুনবাগিচায় তখন 'মাহেনও'-এর অফিস খোলা হয়েছিল। আমি মাঝে মাঝে সুযোগ পেলেই আবদুল কাদির সাহেবের দরবারে গিয়ে বসতাম। আরো কেউ কেউ আসতেন, আবদুল কাদির সাহেবের সরস রহস্যে দিনটি বেশ কেটে যেত। এর মধ্যে একদিন দেখতে পেলাম কোমল শ্মশ্রুমণ্ডিত একখানি সুন্দর মুখ। আবদুল কাদির সাহেব পরিচয় করে দিয়ে বললেন, "কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ।" ফর্‌রুখ বলল, "আস্‌সালামু আলাইকুম, স্যার।" আমি তো চিনতেই পারি নি তাকে। আবদুল কাদির সাহেবের সাথে তার আলাপ-আলোচনা শুনে বুঝতে পারলাম, সেই খুলনা স্কুলে যে ফর্‌রুখকে আমি দেখেছিলাম এ সে ফর্‌রুখ নয়, এখন সুদূরপ্রসারী তার কর্মবলয়।

এরপরে আর একদিন তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল কবি জসীম উদ্‌দীন-এর বাড়ী যেতে রাস্তার উপরে। রাস্তায় দাঁড়িয়েই সে অনেকক্ষণ আলাপ করল। আমাকে সে জিজ্ঞেস করল, "আপনার 'হাতেম তাই' কোথায় পাওয়া যাবে স্যার?" আমি বললাম, 'হাতেম তাই' বলে আমার কোন স্বতন্ত্র বই নেই, একটা কবিতা আছে আমার 'কথিকা'য়। সে জানতে চাইল যে আমি তখন কোথায় যাচ্ছিলাম। আমি বললাম, "কবি জসীম উদ্‌দীনের সঙ্গে দেখা করে আসি, চলো না যাই।" কিন্তু তার অনীহা দেখে মনে হল, নিজের স্বাতন্ত্র্য আচ্ছন্ন করতে সে ইচ্ছুক নয়।

www.pathagar.com

এই ঘটনার কিছুদিন পরেই প্রকাশিত হয়েছিল তার কাব্য-নাটিকা 'নৌফেল ও হাতেম'।

দারিদ্র্যের যষ্টি-আঘাত কবি নজরুল ইসলামকে তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল হিজ মাস্টার্স ভয়েসে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদকেও আশ্রয় নিতে বাধ্য করেছিল রেডিও পাকিস্তান, ঢাকায়। সেখানে একদিন সে আমাকে পেয়ে জোর করে নাশতা খাইয়ে দিয়েছিল। আরো একদিন সেখানে তার দেখা পেয়েছিলাম। সেই আমাদের শেষ দেখা। সে আমাকে বলল, "আপনার জীবনীটা লিখুন না, স্যার।" আমি বললাম, "সেটা কে পড়বে, বলো ?" সে উত্তর দিয়েছিল, "কেউ পড়ুন আর নাই পড়ুন, আপনি তো কালের পাতায় রেখে গেলেন আপনার কর্মের কিছু চিহ্ন।"

তখন তার কথাটায় তেমন আমল দিই নি। কিন্তু তার মৃত্যুর পর কেমন করে যেন নিসপিস করে উঠলো আমার হাতটা। সেই কথাটা আমি উল্লেখ করেছি আমার 'কাহিনী ও কিংবদন্তী'র (সচিত্র বাংলাদেশ, ৩০ ডিসেম্বর ১৯৮২) গোড়াতেই।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের স্মৃতির টুকরোগুলো আমার মনে যে প্রভাব কেটেছিল, তার ফলে পরবর্তীকালে আমি একটা কবিতাই লিখে ফেলেছিলাম। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করে দিলাম ঃ

আমার গর্ব

ধর্মতলার স্ট্রীটে একদিন গুমোট সন্ধ্যাবেলা,
তালপাখা নিয়ে গ্রীষ্মের সাথে হচ্ছিল মোকাবেলা।
এমন সময় হাতে এসে গেল 'সাত সাগরের মাঝি'
তুলোট কাগজে নিখুঁত সাজানো যেন কবিতার সাজি।
হাতে নিয়ে দেখি, এ কি অদ্ভুত সাগরের গর্জন!
ঢেউয়ে ঢেউয়ে ওঠে ক্ষুদ্র মনের কি এক আস্ফালন।
তুচ্ছ করে সে ঝঞ্ঝা-ঝাপট অশনির সংঘাত
ক্ষিপ্ত সাগরে পাল তুলে ছোটে বাহ্‌রী সিন্দাবাদ।
দশ বছরের স্মৃতির ফলক পলকেই গেল খুলে
মন চলে গেল খুলনা শহরে রূপসা নদীর কূলে।
জেলা স্কুলের ম্যাগাজিনখানা সম্পাদনার তাড়া
আমার মগজে গজগজ করে দিচ্ছিল বেশ নাড়া।
এমন সময় কিশোর বালক চোখ দুটো টানা টানা,
টেবিলের কোণে রেখে গেল তার ক্ষুদ্র কবিতাখানা।
ক্ষুদ্র হলেও পড়ে দেখি, এ কি ! নতুন ছন্দদোলা
দোলাইয়া গেল নিভৃত মনের অনুভূতি চঞ্চলা!

www.pathagar.com

ভাবলাম মনে কোথা হতে হবে হয়তো পাচার করা
অনেকেই করে সে শুভ কাজের কয়জন পড়ে ধরা!
এই ভেবে অবশেষে
কবিতাটি তার পাঠিয়ে দিলাম প্রেসে!
এতদিন পরে কানে এল সেই সিন্ধুর গর্জন
বাহ্‌রী ছুটেছে লক্ষ্য যে তার হেরার রাজতোরণ।
রক পাখি যেন উড়ে চলে যায় শোনে না সে কারো মানা,
সাইমুম যেন মনসুন সাথে জড়ায়ে নিয়েছে ডানা।
দিজলা যেন রে পদ্মার সাথে এ দেশে নহর তোলে
দিলরুবা আর সেতার বীণায় বাংলার নদী দোলে।
গর্বে আমার বুকখানা ওঠে ফুলে
সেই পথিকের প্রথম তোরণ আমিই দিয়েছি খুলে।

আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আর একবার হাতে নিলাম 'সাত সাগরের মাঝি'। বইটিতে কোন নিগূঢ় তত্ত্ব অনুসন্ধানের আনন্দ অনুভব করি নি, যা করেছি সেটা হলো তার যাদুকরী ছন্দের দোলা। যেমন ঃ

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।

নারঙ্গী বনের দৃশ্য কখনো চোখে দেখি নি, কিন্তু কবিতাটি পড়তেই যেন সেই সবুজ পাতার কাঁপন মনের কোণে নাচন তুলে দেয়।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার গায়ে এমন সব চুমকির কাজ চোখে পড়ে যা সমগ্র কবিতা-বস্ত্রটিকেই অপরূপ রূপে ঝলমলে করে তোলে। যেমন, 'নীল আকাশে চমকায় তলোয়ার' (বার দরিয়ায়), 'নিকষ-আকিক বিছানো' (সিন্দাবাদ), 'মখমল দিন' (ঐ), 'জীবনের তাজা ঘ্রাণ' (ঐ), 'রাত পোহাবার কত দেরী, পাঞ্জেরী ?' (পাঞ্জেরী), 'প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা বাতাসে উঠিছে বাজি' (সাত সাগরের মাঝি) 'তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজতোরণ' (সাত সাগরের মাঝি), প্রভৃতি। অদ্ভুত তার রচনাশৈলী। পড়বার সঙ্গে সঙ্গেই মনের চোখে ফুটে ওঠে তরুরাজিনীলা মসলাদ্বীপের ছবি—তার সামনে নেমে পড়েছে বিরাট পাখা মেলে সিন্ধু-ঈগল। এ ছবি অপূর্ব! সুদূর সিন্ধুপারে হেরার রাজতোরণ অভিমুখে সিন্দাবাদের অভিযাত্রা যেন জীবন্ত আমেজে অভিষিক্ত করে পাঠকের মন।

আরবী-ফারসী শব্দ মিশিয়ে লেখা কবিতায় যে অপরূপ মাধুর্য ফুটে উঠতে পারে বাংলা কবিতার গায়ে তার নমুনা আমরা পেয়েছি সত্যেন দত্ত, কাজী নজরুল ইসলাম ও মোহিতলালের কবিতায়। অবশেষে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় ফুটেছে যে বর্ণালী, তা যেন আর কারো সঙ্গে মেলে না—অথচ তা সুন্দর।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আজরফ

অনমনীয় ফর্‌রুখ

আমি কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রথম খোঁজ পেলাম সিলেটের আমার আত্মীয় আমীনূর রশীদ চৌধুরীর নিকটে। তিনি আমায় বললেন,—তাঁরই আত্মীয়া বেগম সুফিয়া হোসেনের (কলকাতাস্থিত) বাড়ীতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে তিনি দেখেছেন। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ফিলোসফিতে অনার্স পড়ে,—একটা নিতান্ত ছেলে-মানুষ। সুফিয়া আপাকে আম্মা বলে সম্বোধন করে।

ইতিমধ্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনেকগুলো কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় ছাপা হয়েছে, এবং ফর্‌রুখ ক্রমেই প্রতিষ্ঠা লাভ করছেন। তিনি যতই প্রতিষ্ঠিত হতে লাগলেন, তাঁকে দেখার জন্য আগ্রহ তত বেড়েই চলল। কলকাতাতে ঘনঘন যাতায়াত করলেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কোন ঠিকানা কেউ দিতে পারেন নি। তাই আগ্রহ থাকলেও তা চেপেই যেতে হল। ভারত বিভাগের পরে কলকাতা থেকে প্রায় সকল মুসলিম সাহিত্যিকই ঢাকা এসে জড়ো হলেন। পত্র-পত্রিকায় তাঁদের লেখা ছাপা হওয়ার পর, স্পষ্ট বোঝা গেল তাঁরা খোশহালে ও বহাল তবিয়তে ঢাকায় আছেন। ১৯৪৭ সালে, অধ্যাপক আবুল কাসেমের কর্মতৎপরতার ফলে ঢাকায় 'পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস' প্রতিষ্ঠিত হওয়ার প্রায় বৎসর কাল পরে, আমি সে মজলিসের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়ি। ১৯৪৯ সালে সে মজলিসের উদ্যোক্তাগণ আমাকে তার সভাপতি নির্বাচিত করেন। তখন আমার কর্মক্ষেত্র সুনামগঞ্জ হলেও মজলিসের সেক্রেটারী অধ্যাপক আবুল কাসেমের আহবানে আমাকে ঘনঘন ঢাকায় আসতে হত এবং সে অনুষ্ঠানের নানা সভায় যোগদান করতে হত। অধ্যাপক আবুল কাসেম হঠাৎ সংকল্প করে বসলেন 'বিপ্লবী উমর' নামে একখানা সংকলন বের করে হযরত উমর ফারূক (রা)-এর অতুলনীয় জীবনকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকসাধারণের সামনে তুলে ধরতে হবে। এজন্য আমায় হযরত উমর ফারূক (রা) সম্বন্ধে একটা গবেষণামূলক প্রবন্ধ লিখতে হবে। অধ্যাপক আবুল কাসেম তথা তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে তাগিদ দিলেন তমদ্দুন মজলিসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'সৈনিক' পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক তরুণ ছাত্র আবদুল গফুর। কোনরূপ দেরী না করেই আমার প্রবন্ধটা আমি পাঠিয়ে দিলাম এবং মাস খানেকের মধ্যেই স্বয়ং ঢাকায় চলে এলাম। তখন অধ্যাপক আবুল কাসেম থাকতেন ১৯

www.pathagar.com

আজিমপুর রোডে। তিনি 'সৈনিক' পত্রিকাকে সুচারুরূপে সম্পাদনা করে প্রকাশের উদ্দেশ্যে একটা প্রেস বসিয়েছেন—তাঁর বাড়ির ঠিক পাশেই।' তাতে পশ্চিমদিকে অতিথি-অভ্যাগত এলে তাদের থাকারও বন্দোবস্ত করা হত। আমি সেখানে যেয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গেই অধ্যাপক আবুল কাসেমের পাশে উপবিষ্ট একজন সৌম্যদর্শন যুবককে দেখে বুঝতে পারলাম—ইনি সাধারণ লোক নন। কি এক অপূর্ব জ্যোতি তাঁর মুখমণ্ডলে, এবং চোখ দু'টোতে কী স্বপ্নিল আবেশ! আমাকে দেখেই কাসেম সাহেব বললেন, "এই যে আজরফ সাহেব এসে গেছেন, আপনার আর চিন্তার কোন কারণ নেই।" তারপরে উক্ত যুবকের দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "ইনি হচ্ছেন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ—'সাত সাগরের মাঝি'র কবি। আপনি ঢাকায় আসবেন জেনে আমার এখানে এসে আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন।" তাঁর মত একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি কেন আমার মত একজন অখ্যাতনামা লোককে খুঁজছেন, এ প্রশ্ন ভাষায় না করলেও, আবুল কাসেম সাহেব আমার অব্যক্ত জিজ্ঞাসার মর্ম বুঝতে পেরে বললেন, "তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ—'সাত সাগরের মাঝি'র দ্বিতীয় সংস্করণ হয়েছে, তার উপর তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'ও প্রকাশিত হয়েছে। তিনি চান, যেন দু'খানা কাব্যেরই সমালোচনা আপনি করেন।" একথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর কাব্যগ্রন্থ দুটি আমার হাতে দিয়ে বললেন, "অনেকেই এ দু'খানা বই সমালোচনা করতে চেয়েছিলেন, আমি তাতে রাজি হইনি—তাই আপনার জন্যই অপেক্ষা করছি। আপনি ছাড়া অন্য কাউকে দিয়ে আমি এ পুস্তকগুলোর কোন সমালোচনা করাতে চাইনে।" এরূপ উক্তিও এক তাজ্জবের ব্যাপার। তিনি কি 'পূর্ব-পাকিস্তানে'র মধ্যে আমাকেই সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচক বলে গণ্য করেন? যাক, অত্যন্ত সংকোচের সঙ্গেই তাঁর এ দু'খানা কাব্য গ্রহণ করে আমার সুটকেসে পুরে নিলাম।

সে সময় তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক 'দ্যুতি' নামক একখানা মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। ফর্‌রুখ আগ্রহ সহকারে বললেন, "আপনি 'দ্যুতি'তে কাব্য দুটির সমালোচনা করলে খুশী হব।" আমি তথাস্তু বলে তাতে সম্মতি প্রকাশ করলাম। তারপরে দীর্ঘকাল যাবৎ যতবার ঢাকায় এসেছি, কোন কোন সময় ১৯ আজিমপুরাতে, না হয় অন্য কোথাও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। দেখা হলেই তখনকার দিনের মুসলিম সমাজের অবস্থা, আমাদের সাহিত্যিকদের মানসিকতা ইত্যাদি বিষয় নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা হত।—আমি লক্ষ্য করতাম, মওলানা আকরম খাঁ, ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌, ডঃ মোতাহের হোসেন ইসলাম সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করতেন, ফর্‌রুখ তার সাথে ভিন্নমত পোষণ করেন। তিনি খুলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকেই ইসলামের প্রকৃত রূপ বলে দৃঢ়মত প্রকাশ করতেন।

www.pathagar.com

পরবর্তীকালের কথা। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তখন থাকতেন পশ্চিম মালিবাগে,—আর আমার পরিবারের লোকেরা থাকতো পূর্ব মালিবাগে। তখন আমি সুনামগঞ্জ থেকে নরসিংদি কলেজের প্রিন্সিপাল হয়ে চলে এসেছি। আমি প্রত্যেক শুক্রবারে ঢাকা আসতাম এবং পশ্চিম মালিবাগে গিয়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা করতাম। স্পষ্ট বুঝতে পারতাম, তাঁর মন ইসলামী সংস্কৃতিতে লালিত ও পালিত, এবং এতে বিজাতীয় বা বিদেশী কোন কিছু নেই। ১৯৬০-৬৪ সাল পর্যন্ত রেডিও পাকিস্তানের আমন্ত্রণক্রমে আমি প্রত্যেক মাসেই রেডিওতে এক-একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করতাম। এ সময় ইসলামী নীতি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়িত করার সম্ভাবনা নিয়ে ফর্‌রুখের সঙ্গে আমার আলোচনা হত। প্রথমে তিনি খুবই উৎসাহিত ছিলেন। তবে তৎকালীন পাকিস্তান সরকারের কার্যকলাপ দেখে তিনি হতাশ হয়ে পড়েন।

কিছুদিন পরে ফর্‌রুখ কমলাপুরের এক বাড়ীতে চলে যান। সেখানেও তাঁর সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ হয়েছে। দেখেছি, তাঁর মনের ভালো লাগার বিরুদ্ধে কোন কিছু দেখলে তিনি ক্ষুব্ধ হতেন। একবার আমরা কয়েকজন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে একটি তরুণের প্রতি তাঁকে ক্ষুব্ধ হতে দেখি। রাজশাহীর তরুণটি তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' পড়ে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে অভিনন্দন জানাতে এবং কাব্য সম্পর্কে তাঁর সঙ্গে কিছু অজানা বিষয়ে আলোচনা করতে ঢাকায় আসে। ফর্‌রুখ নিজের প্রশংসা শোনা পছন্দ করতেন না। ছেলেটির প্রশংসা শুনে তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁর সঙ্গে কোন কিছু আলোচনা করতেই অস্বীকার করলেন। হতাশ হয়ে ছেলেটি চলে যায়। আমরা ফর্‌রুখের ঘরে ঢুকে দেখি তিনি রাগে ফুঁসছেন এবং বলছেন, "আমি এ-সব সস্তা প্রশংসা শোনা পছন্দ করি না। আমি এ-ধরনের প্রশংসার জন্য কলম ধরি নি। আমি লিখেছি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে, তাঁকে সন্তুষ্ট করার জন্যে। কোন মানুষের শ্রদ্ধা, ভালোবাসা পাওয়া তো আমার কাম্য নয়। আমায় কত প্রতিষ্ঠান থেকে সম্বর্ধনা দেবার জন্য প্রস্তাব করেছে, আমি তাতে সম্মত হইনি। যারা সম্বর্ধনা গ্রহণ করে, তারা প্রকারান্তরে ফেরাউনের দলে মিশে যায়।" আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম—কিন্তু আমার সঙ্গীদের মধ্যে একজন আমাকে বারণ করলেন।

তারপরে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ চলে এলেন শান্তিনগর। তিনি ও মওলানা মুহিউদ্দীন খান পাশাপাশি বাসাতেই থাকতেন। বোধ হয় উভয় বাসার মালিক ছিলেন সাহিত্যিক চৌধুরী শামসুর রহমান। সেখানেও তাঁর সঙ্গে কয়েকবার মিলিত হয়ে, আলাপ-আলোচনার সুযোগ হয়েছে। ইসলামের রীতিনীতিকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করে যদি কোন কিছু করা যায় তাহলে তা করবো, নাহলে উপোস করে মরে যেতে প্রস্তুত আছি, তবুও কোন গায়ের-ইসলামী কাজ করবো না, এই ছিল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের জীবন-নীতি। তাঁর জীবনের দ্বিতীয় নীতি ছিল, একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই হাত পাতবো, এ দুনিয়ার কোন মানুষের কাছেই হাত পাতবো না। মুসলিম হয়ে আমি অপরের কাছে হাত পাততে পারি

www.pathagar.com

না, অপরের কাছে কোন সাহায্যও চাইতে পারি না। আমার মাথা একমাত্র আল্লাহ্‌র কাছেই নত করতে পারি।

মরহুম ডঃ হাসান জামান ছিলেন আমার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। তাঁর কাছে শুনতে পেলাম, ফর্‌রুখ অত্যন্ত অর্থকষ্টের মধ্যে দিন-গুজরান করছেন। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে, দু'শ টাকা নিয়ে গেলাম তাঁকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য করতে। হাসান জামান বলেছিলেন, "সাহায্যের প্রস্তাব করার আগে এ সম্বন্ধে তাঁর মানসিক প্রস্তুতি সম্বন্ধে একটু অবগত হবেন এবং তাঁর মেজাজ বুঝেই প্রস্তাব করবেন।" ফর্‌রুখ তখন থাকতেন ইসকাটন রোডে মসজিদের পাশের এক সরকারী দালানের দোতলায়। সেখানে যেয়ে একথা-সেকথার পরে তাঁর আর্থিক অবস্থার বিষয় জানতে চাইলে তিনি হঠাৎ যেন ছিলা-ছেঁড়া ধনুকের মত সটান হয়ে নিতান্ত তিরিক্ষি সুরে বলতে লাগলেন, "দেখুন, আমাকে নিয়ে ঢাকা শহরে নানা গল্প-গুজব রচিত হচ্ছে। আমি নাকি রোজই উপোস করি, রোজই পান্তা খেয়ে অফিসে যাই ইত্যাদি। কী আশ্চর্য ব্যাপার! আমার তো কোন অসুবিধাই হচ্ছে না! অথচ ইনি আসেন আমায় সাহায্য করতে, উনি আসেন আমায় সাহায্য করতে। আমার তো কারো সাহায্যের দরকার নেই। আমি তো কোন লোকের কাছে কোন সাহায্যই চাইনে।" বুঝতে পারলাম, কথাগুলো যেন আমাকে সাবধান করার উদ্দেশ্যেই বলা হচ্ছে। কাজেই সাহায্যের কথা বলার মত দুঃসাহস আর হল না। উল্টো তাঁর ছেলেদের দ্বারা পরিবেশিত ফিরনী খেয়ে বাসায় চলে এলাম।

এ জীবনে যে ক'জন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক দেখেছি, তার মধ্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সর্বকনিষ্ঠ। এঁদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ কাজী আবদুল ওদুদ, দ্বিতীয় মোহিতলাল মজুমদার এবং তৃতীয় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। কাজী আবদুল ওদুদ আজীবন ব্যক্তিত্বের চরম বিকাশের উদাহরণ অন্বেষণে রত ছিলেন। তিনি প্রথমে সে উদাহরণ পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের মধ্যে, পরে রামমোহনের মধ্যে, তারপরে গ্যেটের মধ্যে এবং সর্বশেষে হযরত মুহম্মদ (সা)-এর মধ্যে। মোহিতলাল মজুমদার ছিলেন আজীবন সনাতন হিন্দু ধর্মের উপাসক। তিনি বাংলা সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ ও অরবিন্দের সে ধারাকে আবার প্রবাহিত করতে চেয়েছিলেন। ফর্‌রুখের একান্ত কামনা ছিলো, বাংলার আউশ ধানের ক্ষেতে আবার মদীনার সৌরভ নিয়ে আসা। এঁরা তিনজন ছিলেন নিষ্ঠাবান সাহিত্যিক এবং এজন্য এঁদের তিনজনকেই নানা দুঃখ-কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। তবে এঁদের মধ্যে চিন্তাগত আদর্শে বেশী সহিষ্ণু ছিলেন কাজী আবদুল ওদুদ। তিনি তাঁর প্রত্যয়ের বিপরীতমুখীন ধারণাকে সহ্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। অপরদিকে মোহিতলাল মজুমদার ও ফর্‌রুখ ছিলেন এককেন্দ্রিক। তাঁদের এককেন্দ্রিকতার মূলে রয়েছে তাঁদের প্রত্যয়ের প্রতি অটুট শ্রদ্ধা ও সর্বতোভাবে জীবনকে সুসমঞ্জস করার প্রতি অত্যুগ্র আগ্রহ। এরা আমেরিকার কবি ওয়াল্‌ট, হুইটম্যানের শৈলীর আদর্শের সম্পূর্ণ ভিন্নমুখীন আদর্শের

www.pathagar.com

অনুসারী ছিলেন। হুইটম্যানের কাব্যে নানা অসঙ্গতি রয়েছে এবং এক পর্যায়ের কাব্যের সঙ্গে অপর পর্যায়ের কাব্যের কোন সঙ্গতি নেই। তাঁকে এ সম্বন্ধে অবহিত করা হলে তিনি খুবই আনন্দ প্রকাশ করে বললেন, "যদি তা'ই হয় তাহলে নিজেকে আমি একজন সার্থক কবি বলেই জ্ঞান করব। কারণ জীবনেও তো কোন অসঙ্গতি নেই। যদি আমার কাব্যে কোন সঙ্গতি না থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, আমার কাব্য জীবনধর্মী।"

মোহিতলাল বা ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে যদি বলা হত, "আপনাদের কাব্য একরৈখিক," তাহলে তাঁরা বোধ হয় এ মন্তব্যকে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করতেন এবং বলতেন, "তা'হলে বুঝতে হবে আমাদের কাব্যে বহুরূপীর খেয়ালীপনা প্রকাশ পায়নি। আমরা সংস্কৃতিজগতের বহুরূপী নই।"

তবে একথা স্বীকার্য, জীবন চলেছে তার আপনার ছন্দে ও তালে, কখনও ভৈরবী, কখনও বা পূরবী, আবার কখনও বা বেদন-বেহাগ রাগিণী গেয়ে। তাতে সহ অনুধ্যান, অথবা আরোহ-অবরোহ পদ্ধতির কার্যকারিতা সাময়িকভাবে দেখা দিতে পারে, তবে তা চিরস্থায়ী নয়।

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এ স্বল্পঃপরিসর জীবনে তিনি আমাদের সামনে যে আদর্শনিষ্ঠার আলোকবর্তিকা জ্বেলেছেন, তা বহুদিন পর্যন্ত জ্বলতে থাকবে। তাঁর সঙ্গে অনেকেরই মতের মিল নাও হতে পারে, তবে তাঁর নিষ্কলঙ্ক চারিত্রগৌরব ও আদর্শের প্রতি অটুট শ্রদ্ধার জন্য তিনি বাংলাদেশের কাব্য-গগনে ভাস্বর হয়ে বিরাজ করবেন।

www.pathagar.com

সৈয়দ সিদ্দীক আহমদ

আমার ভাই ফর্‌রুখ

ফর্‌রুখ আমার ছোট ভাই। অত্যন্ত দুঃখের কথা, আজ আমাকে তার স্মৃতিকথা লিখতে হচ্ছে। ফর্‌রুখ সম্বন্ধে কিছু বলতে গেলে আমাদের পরিবারের সামান্য পরিচয় দিতে হয়।

আমাদের দাদা সাবরেজিস্ট্রার অফিসে কাজ করতেন। কুড়ি টাকা বেতন ছিল। পাঁচ-সাত রকম তরকারী না হলে তাঁর খাওয়াই হত না। তিনি শেষমেষ দেনা করে মারা গেছেন।

আব্বা সৈয়দ হাতেম আলী পুলিশ ইন্‌সপেক্টর ছিলেন। তিনি কখনও খুলনা জেলায়, কখনও ময়মনসিংহে কাজ করেছেন। মাঝে মাঝে কলকাতায় আই.জি. পুলিশ অফিসে রিপোর্ট দাখিল করতেন। তিনি অত্যন্ত ন্যায়পরায়ণ লোক ছিলেন। কখনো ঘুষ খেতেন না।

আমাদের গ্রামের বাড়ী যশোরের মাঝআইল গ্রামে। গ্রামের পরিবেশ ভালই ছিল। আব্বা আই.এ. পাস করে চাকুরিতে ঢোকেন। আমার চাচা সৈয়দ কাসেম আলী ডাক্তার ছিলেন। এঁরা ছাড়া আমাদের গ্রামে সামান্য লেখাপড়া জানা পাঁচ-ছ'জন লোক ছিল। গ্রামে একটা মসজিদ ছিল। কোন মক্তব ছিল না।

আমাদের গ্রামে ছোট একটা পাঠশালা ছিল। ফর্‌রুখ প্রথমে সেই পাঠশালায় ভর্তি হয়। পরে কোলকাতায় যায়।

ফর্‌রুখ বছর দুই গ্রামে পড়েছে গ্রাম-সম্পর্কে আমার এক দাদা মোল্লাজী আবদুস সামাদ-এর কাছে। মোল্লাজীর এক ছেলের নাম আবদুল খালেক। খুব সম্ভব সে এখনও বেঁচে আছে।

এরপর ফর্‌রুখ কলকাতা মডেল স্কুলে ভর্তি হয়। পরে বালিগঞ্জ হাইস্কুলে পড়ে। ম্যাট্রিক পরীক্ষার সময় তার জলবসন্ত হয়, তাই পরীক্ষা দেয়া হয়নি। পরে খুলনা জেলা স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেয় এবং ভালভাবেই পাস করে।

বাল্যে আরবী-ফারসী পড়ার সুযোগ পায় নি ফর্‌রুখ। লেখাপড়ার প্রতি ঝোঁক ছিল খুব। বাংলার প্রতি ঝোঁক একটু বেশিই ছিল।

ফর্‌রুখ কলেজে পড়াকালেই তার সাহিত্যপ্রতিভার কথা জানতে পারি।

ফর্‌রুখের সাহিত্য-চর্চা ঐতিহ্যগত কিনা বলা মুশকিল। তবে আমার চাচা সৈয়দ কাসেম আলী সাহিত্য-চর্চা করতেন এবং বিভিন্ন ধরনের বই-পত্তর পড়তেন।

আমিও এক কালে সাহিত্য-চর্চা করতাম। কিন্তু আব্বা ও আত্মীয়দের ধমকে ও-পথে আর পা বাড়াইনি।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ ছোটবেলায় আপনভোলা ছিলো। পথে চলতে চলতে সে মাথা নাড়তে নাড়তে যেতো। আবার রাত্রে বড় একটা ঘুমোতো না। সারারাত জাগতো প্রায়ই। ঘুম কম ছিল ওর। ছোটবেলার এই অভ্যাস তার শেষ পর্যন্ত ছিল। রাত জেগে জেগে লিখত ফর্‌রুখ।

ফর্‌রুখের ছোটবেলার কথাই বলছি। একদিন সকাল বেলায় ফর্‌রুখকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। কোথায় গেল ? পরে দেখা গেল, চৌকীর তলায় মুর্গীর বাচ্চা দেখছে। "কিরে, এখানে কি করছিস ?" জিজ্ঞেস করায় ফর্‌রুখ বললো, "মুর্গীর বাচ্চা দেখতে খুব ভাল লাগে।" আর একদিন দাদীজান সকাল বেলায় উঠে ওর বিছানা ভরা ভাঙা ডিম দেখতে পেলেন। "হ্যাঁরে ডিম কোত্থেকে এল ?" জবাবে ফর্‌রুখ বললো, "পিঠের তলায় দিয়ে শুয়েছিলাম বাচ্চা ফোটাবার জন্যে।"

আমার তিন দাদী ছিলেন। একজন আপন দাদী। আর অন্য দুই দাদী। একদিন তাঁরা গল্প করছেন অমুকে বিধবা হয়েছে, তারপর তাকে আবার নিকে দিয়েছে। সেখানে সে খুব ভাল আছে। ফর্‌রুখ তখন ছোট। বললো, "তা দাদী, আপনি কেন নিকে বসলেন না? ভাল থাকতে পারতেন।" একথা শুনে দাদীজান বললেন, "দেখরে হাতেম, তোর ছেলে কি বলে আমাকে।"

বিদ্রোহী কবি নজরুলের সাথে একদিন ফর্‌রুখের দেখা। কবি বললেন, "ফর্‌রুখ, তুই এসেছিস্ ?"

"হ্যাঁ এসেছি।"

বিদ্রোহী কবি বললেন, "আমি দেখতে পাচ্ছি, খিজির তোকে পথ দেখাচ্ছে। খিজির (আ) তোকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। যা, ঠিক আছে।"

১৯৬৬ সালের আগস্ট মাস। আমি খুব অসুস্থ। ফর্‌রুখ আমাকে দেখতে ফরিদপুর এসেছিল।

আমি তখন নিমতলীর বাসায় থাকতাম। ও একদিন মাত্র ছিল। ওর আসার খবর পেয়ে কবি সূফী মোতাহের হোসেনও ছুটে এসেছিলেন। সূফী মোতাহের হোসেনের সাথে ফর্‌রুখের খুব ভাল সম্পর্ক ছিল।

সূফী সাহেব কি করে যেন জানতে পেরেছিলেন ও আসছে। আর মুহূর্ত দেরী না করে চলে এসেছিলেন।

শেষ দিকে লেখা নিয়ে অবিরাম মেতে থাকত বলে বাড়ীতে সে ঘন ঘন আসতে পারত না। কিন্তু আত্মীয়জনের সে বরাবর শুভ কামনা করত এবং যখনই সময় পেত তাঁদের খোঁজ নিত।

আমি লেখক মানুষ নই। গুছিয়ে তার সম্পর্কে বেশি কিছু লেখা সম্ভব নয়। আমার দুঃখ, সে আমার পরে এসেছিল, কিন্তু বিদায় নিল আমার আগে। এবং তারই স্মৃতি আমাকে লিখতে হচ্ছে। সে সাচ্চা মুসলমান ছিল। আল্লাহ্ তাকে বেহেশত নসীব করুন।

www.pathagar.com

আবু জাফর শামসুদ্দীন

অপরাজেয় ফর্‌রুখ

ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে কিছুতেই ভুলতে পারছি না। কেমন করেই বা ভুলি ? কবিতা অনেকেই লেখেন, সাহিত্যসাধকেরও অভাব নেই। মানুষের সুকুমার বৃত্তিকে জাগরিত করার উদ্দেশ্যে যাঁরা ভাষা ও সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন, তাঁরা সবাই স্মরণীয়। স্মরণীয় বলেই আমরা তাঁদের কাউকে ভুলি না। শত-সহস্র বৎসর পরেও জীবনের কোন-না-কোন সংকট অথবা আনন্দের মুহূর্তে স্মরণ করি। তবু স্মরণীয়দের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য খুঁজে ফিরি। সে বৈশিষ্ট্য কি, কেমন তার রূপ ও গন্ধ, তা সব সময় ব্যাখ্যা করে বলা যায় না। কেননা অপরাপর বৈশিষ্ট্যের সাথে শিল্প-সাহিত্যক্ষেত্রের বৈশিষ্ট্য তুলনীয় নয়। স্পর্শ দ্বারা শিল্প-সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করা যায় না। শিল্প-সাহিত্য ইতিহাস এবং পরিবেশের প্রতিক্রিয়া হলেও অন্তরের গভীর উপলব্ধি হতে তার সৃষ্টি। সুতরাং তার রূপ রস গন্ধ সব কিছুই উপলব্ধির বস্তু। ফর্‌রুখ আহমদের কাব্যের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। এই মুহূর্তে আরো সম্ভব নয়, কেননা আমি শোকার্ত। এই মুহূর্তে বার বার আমার শুধু এ কথাই মনে পড়ছে যে, তিনি ছিলেন প্রকৃতই নির্যাতিত মানবতার কবি; দয়া দাক্ষিণ্য সততা এবং ধর্মের মুখোশধারী নরপিশাচদের দ্বারা সতত পীড়িত অত্যাচারিত দুঃখী মানুষের কবি ; সেই সঙ্গে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন সুস্থ সবল জীবনধর্মেরও কবি। অর্থবিত্ত সচ্ছলতার জীবন তাঁর ছিল না। তাঁর কবি জীবনের পরিবেশও ছিল প্রতিকূল ঃ দুর্ভিক্ষ জরা মৃত্যু দাঙ্গা মহামারী রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা ইত্যাদির মধ্যে বাস করেই তাঁকে লিখতে হয়েছে। কিন্তু তিনি নৈরাশ্যের কবি ছিলেন না। মৃত্যু যদি পরাজয় হয়, তবে সে পরাজয় তাঁকে মানতে হয়েছে। কিন্তু বেঁচে থাকা অবস্থায় তিনি মৃত্যুর সঙ্গীত পরিবেশন করেন নি। ব্যক্তিগত জীবনে যেমন তিনি ছিলেন উন্নত শির, অপরাজেয়, তেমনি শৈল্পিক জীবনেও ছিলেন মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আশাবাদী। লোভী মানুষের সৃষ্ট দুর্ভিক্ষে মৃতের শব তাঁকে পীড়িত ও ব্যথিত করেছে, কিন্তু তাতে তিনি মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হন নি। তাই তিনি লিখতে পেরেছিলেন ঃ

তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়

www.pathagar.com

তোমার শৃৎখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি'
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও ঃ
ধ্বংস হও—
তুমি ধ্বংস হও।

যে জড় সভ্যতা এবং মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজকে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ 'পদাঘাত হানি' 'জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে' টেনে নেয়ার সংকল্প বাংলা তেরোশ' পঞ্চাশে প্রকাশ করেছিলেন, তারা এখনও পৃথিবীর সর্বত্র ছোবল মারছে, বিড়ম্বিত বিপর্যস্ত করছে অগণিত সাধারণ মানুষের জীবন; কিন্তু তাদের দিন ঘনিয়ে আসছে বলেই মনে হয়। সেদিন তিনি আকাশে চাঁদ দেখেছিলেন। দেখেছিলেন 'দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালির বাঁধ।' তাই তিনি আহবান জানিয়েছিলেন, 'ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ', 'নতুন পানিতে হাল খুলে দাও হে মাঝি সিন্দাবাদ'; এবং 'যদিও সূর্য বন্দী এখন আঁধারের ঝরোকাতে', তবু তিনি পূর্ব দিগন্তে আলোর গান শুনতে পেয়েছিলেন। অন্ধকার অমানিশার মধ্যেও আলোর গান শুনতে পাওয়ার নামই যদি জীবন-বন্দনা হয়, তাহলে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অবশ্যই ছিলেন জীবন-শিল্পী।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্য-বৈশিষ্ট্য বলতে আমি এই বুঝি।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে আমার যখন পরিচয় হয় তখন তিনি কলেজের ছাত্র। তখন তাঁর কবিতা কলকাতার খ্যাতনামা পত্র-পত্রিকায় সবে প্রকাশিত হচ্ছে। সে সময়ে একবার তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। তিনি তখন যাদবপুরে তাঁর ভাইয়ের বাড়ীতে থাকতেন। আজও মনে পড়ে, কবি বেনজীর আহমদ এবং প্রখ্যাত লেখক বসুধা চক্রবর্তীর সঙ্গে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর 'মাসিক মোহাম্মদী'র অফিস এবং কলকাতার বিভিন্ন আড্ডায় কফি হাউসে এবং রাস্তাঘাটে তাঁর সঙ্গে অসংখ্যবার দেখা হয়েছে। কখনও তাঁর মধ্যে বিমর্ষভাব দেখিনি, দেখিনি উন্নাসিকতা। বয়সের দিক থেকে তিনি ছিলেন আমার চাইতে প্রায় ছ'বছরের ছোট। কিন্তু তাঁর সঙ্গে স্থাপিত হয় বন্ধুত্বের সম্পর্ক। কলকাতার জীবন সংক্ষিপ্ত হলো। ঢাকায় আসার পর তাঁর সঙ্গে নাজিমুদ্দীন রোডের এবং পরে নতুন রেডিও অফিসে প্রায়ই দেখা-সাক্ষাৎ হতো। মালিবাগের এক মশকাকীর্ণ অন্ধকার গলির কেরোসিনের হারিকেন আলোকিত চালাঘরের ছোট একটি কামরায় প্রায়ই তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং দীর্ঘ সময় আলাপ-আলোচনা হতো। সেখানেই তিনি সপরিবারে বাস করতেন। কি রেডিও অফিস সংলগ্ন রেস্তোরাঁ, কি তাঁর বাসাবাড়ি, কোথাও থেকে বিনা চা নাশ্‌তায় কারো পক্ষে ফিরে আসা সম্ভব হতো না। তিনি জর্দা পান ভালবাসতেন। সেই পানের ভাগও পানখোর মাত্রই পেতো। তিনি আমার বাড়ীতেও মাঝে মাঝে আসতেন। আমার সামনে রয়েছে আমার বড় মেয়ের বিয়েতে উপহার দেয়া

www.pathagar.com

তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি'। তাঁর স্বাক্ষরের মধ্যেও যেন দেখতে পাচ্ছি মৃত্যুহীন অপরাজেয় প্রাণের দীপ্তি। বহু বিষয়ে আমরা একমত ছিলাম না। কিন্তু একটি বিষয়ে তাঁর সঙ্গে বোধ করি কোন সচেতন শিল্পী-সাহিত্যিকের মতভেদ ছিল না। তিনি সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তি চাইতেন। তিনি বিশ্বাস করতেন, অর্থনৈতিক মুক্তি ব্যতিরেকে আত্মার মুক্তিও সম্ভব নয়, সম্ভব নয় পৃথিবীকে কলুষমুক্ত করা। রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন বা বিপ্লবের পথ সম্পর্কে তিনি যে ধারণা পোষণ করতেন তদ্বিষয়ে আমি বা অন্যেরা একমত পোষণ না করলেও তাঁর বিশ্বাস ও নিষ্ঠা সম্বন্ধে সন্দেহের কোন সুযোগ তিনি কখনও দেন নি। তিনি নিজে যা বিশ্বাস করতেন, ব্যক্তিগত জীবনেও তা পালন করতেন। তাঁর কবি খ্যাতি নিয়ে আইয়ুবী আমলে ধনৈশ্বর্যের মালিক হওয়া অত্যন্ত সহজ ছিল। তার চাইতে অল্প খ্যাতিমান অনেক লোক সে আমলীয় সুযোগের সদ্ব্যবহার করে যার যার ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছিলেন; কিন্তু তিনি সে পথ ঘৃণাভরে বর্জন করেন। রাও ফরমান আলী, আলতাফ গওহর প্রমুখ ব্যক্তি তাঁর মালিবাগের অন্ধকার খুপ্‌রিতে নানা প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছেন। আমি ব্যক্তিগতভাবে এসব ঘটনার দু'একটি জানি, কিন্তু তিনি ঘৃণাভরে সেসব উদ্দেশ্যমূলক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছেন। এমন কি তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তান ভ্রমণে অতি সাধারণ প্রস্তাবও তিনি প্রত্যাখ্যান করেন।

তখন আমি বাংলা একাডেমীতে চাকুরী করি। তার আগে কয়েক মাস লেখক সংঘেও চাকুরী করেছিলাম। ১৯৬০-৬৫ সালের কথা বোধ করি। তখন তিনি 'নৌফেল ও হাতেম' এবং 'হাতেম তায়ী' রচনায় ব্যাপৃত। তাছাড়াও তিনি শিশু সাহিত্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। ঐ সময়েও তাঁর অর্থাভাব ছিল। বাংলা একাডেমীতে গেলে তিনি কখনও আমার সঙ্গে দেখা না করে আসতেন না। অর্থাভাবের মধ্যেও তিনি কখনও রচনায় বিরতি দেন নি। তাঁর মনের দার্ঢ্য দেখে বিস্মিত হয়েছি। মত ও পথের পার্থক্য থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু আপন আদর্শের প্রতি তাঁর যে অবিচলিত নিষ্ঠা ছিল, সেটা তাঁর প্রতি সকলের শ্রদ্ধা জাগিয়েছে। সর্বপ্রকার মোনাফেকী এবং কৃত্রিমতাকে তিনি ঘৃণা করতেন। নিজের জীবন দিয়ে তিনি তার প্রমাণ দিয়ে গেছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আজ আমাদের মধ্যে নেই ঃ যেতে না দিতে চাইলেও যেতে দিতেই হয়। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্মদ তাঁর কাব্য এবং চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে বেঁচে আছেন এবং বেঁচে থাকবেন।

www.pathagar.com

আবদুল হক

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় উনিশ শো পঁয়তাল্লিশ সালের কোন এক সময় কলকাতায়। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। সম্পর্কটা ছিল সাহিত্য; তবে শুধু সাহিত্য নয়, রাজনৈতিক আদর্শও।

তখন পাকিস্তান আন্দোলনের সময়। এ আন্দোলনকে মুসলিম সমাজের একেক শ্রেণী একেক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতো ঃ শ্রেণীস্বার্থের দিক থেকে। এই শ্রেণীস্বার্থ পরে যেমন সুস্পষ্ট রূপ পেয়েছিল, তখন তেমন পায়নি। তখন ছাত্র এবং অছাত্র যুব সম্প্রদায় প্রায় সমগ্রভাবেই পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করতো স্বপ্ন এবং সংকল্প নিয়ে। পাকিস্তান পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হবে না এই ছিল স্বপ্ন; একে পুঁজিবাদী রাষ্ট্র হতে দেওয়া হবে না এই ছিল সংকল্প। সমগ্র যুব সম্প্রদায়ের না, সচেতন অংশের। সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা তখন দ্রুত মুসলিম যুব সমাজে প্রসার লাভ করছে। লীগনেতা আবুল হাশিম এবং আরো কিছু তরুণ নেতা ও নব্য বুদ্ধিজীবীর প্রচারণার ফলে সেই সময়ে এরকম একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে, সমাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং ইসলামী রাষ্ট্রাদর্শের মধ্যে সাদৃশ্যই বেশী, বিরোধ সামান্য। সেই সঙ্গে এই চেতনাও বেশ খানিকটা ছিল যে, মুসলিম লীগ নেতৃত্বের বড় অংশই প্রতিক্রিয়াশীল এবং ধনতন্ত্রের সমর্থক, অথবা সমর্থক হবেন। ধনতন্ত্র পাকিস্তানের মৌলিক লক্ষ্যের বিরোধী, এবং এ ব্যাপারে রাজনৈতিক কর্মীদের মতো লেখকদেরও কর্তব্য আছে, এ বিষয়ে ফর্‌রুখ আহমদ এবং আমি একমত ছিলাম। ভারতীয় সমাজে যে সামাজিক এবং মানবিক বৈষম্য আছে তা পাকিস্তানে সম্ভব হবে না, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পাকিস্তান অধিকতর অগ্রসর রাষ্ট্র হবে, হওয়া উচিত, এই ছিল আমাদের ধারণা । আরো অনেকের মতে গোটা পাকিস্তান আন্দোলনই আমাদের চোখে একটা রোমান্টিকতায় মণ্ডিত ছিল।

রাজনৈতিক আদর্শের এইসব প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা হতো এবং এই সূত্রেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা। এই আদর্শের মধ্যেও যে অনেক ব্যাপারে চিন্তার বৈষম্য ছিল তা পরে ধরা পড়েছিল। কিন্তু তা পরের কথা। তাঁর পরিচিতদের সকলেই জানেন, তিনি খুব মজলিসী এবং সদালাপী ছিলেন, তবে যেখানে মতের মিল হতো সেখানে। কলকাতায় পরপর কয়েক জায়গায় আমি থেকেছি—৫৫ মীর্জাপুর স্ট্রীট (প্রেসিডেন্সি কলেজ হোস্টেলে), কলিন স্ট্রীটের এক মেসে, সার্কাস রো-

www.pathagar.com

তে, এবং আরও কয়েক জায়গায়; তবে মতবিরোধ হওয়ার আগে ঐ তিন ঠিকানাতেই তিনি গিয়েছেন। মীর্জাপুর স্ট্রীট-এ তাঁর সঙ্গে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীও গিয়েছেন, তিনি বর্তমানে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের চেয়ারম্যান। তাঁর বয়স তখন অল্প। কথাটা আমার মনেই ছিল না, সম্প্রতি তিনি স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

উনিশ শো ছেচল্লিশের ডিসেম্বরে পরীক্ষার হল থেকে বেরিয়ে সোজা দৈনিক 'আজাদ' অফিসে গিয়ে বার্তা বিভাগে চাকুরীর চেষ্টা করেছিলাম এবং সঙ্গে সঙ্গে পেয়েও ছিলাম, কেননা সেখানে আগে থেকে পরিচয় ছিল। কিন্তু ঐ চাকুরী ছিল নিতান্ত গরজের। দৈনিক পত্রিকার বার্তা বিভাগে চাকুরী আমার মনঃপুত ছিল না। আমার মূল আকর্ষণ সাহিত্যের প্রতি, সাহিত্য এবং সাহিত্যিক সংস্পর্শে থাকা যাবে এমন কোন চাকুরী হলে ভালো হয় এই ইচ্ছার কথা ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে বলেছিলাম। তাঁর চেষ্টায় সপ্তাহ দু'একের মধ্যে 'আজাদ' ছেড়ে আমি 'সওগাত'-এ যোগদান করি, সাতচল্লিশের জানুয়ারীর একেবারে শুরুতে। তিনি নিজে কিছুকাল আগে মাসিক 'মোহাম্মদী' ছেড়ে দিয়েছেন, তাঁর 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' নামক কবিতা আজাদে মওলানা আকরম খাঁর নামে ছাপার জন্যে প্রতিবাদ করে। তিনি মওলানা সাহেবের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দিয়েছিলেন (অথবা তার ব্যবস্থা করেছিলেন); ঐ মামলার তদবির উপলক্ষে তিনি একদিন আমাকে সঙ্গে নিয়ে এক ব্যারিস্টারের কাছে গিয়েছিলেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তখন পার্ক সার্কাস এলাকায় একটি প্রেস প্রতিষ্ঠায় কোন বিত্তবান ব্যক্তিকে সহায়তা করেছেন। নিশ্চয়ই এজন্য তিনি বেতন পেতেন, নইলে তিনি নিজেই 'সওগাত'-এ যোগ দিতেন। সেই ব্যক্তি তাঁকে একটি প্রকাশনালয় স্থাপনের আশ্বাস দিয়েছিলেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বেশ কিছু দিন ঐ কাজ করেছিলেন। প্রকাশনালয়ের অফিসও আমাকে দেখিয়েছিলেন। বলেছিলেন, তিনি আমার এবং আর সব লেখকের বই নেবেন দস্তুরমতো লিখিত চুক্তি করে, যাতে লেখকরা পরে না ঠকেন। অবহেলিত মুসলিম লেখকদের সাহিত্য সাধনায় তিনি বড় রকমের সহায়তা করতে পারবেন এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। কয়েক মাস পরে তিনি জানিয়েছিলেন প্রেসটা স্থাপিত হয়েছে বটে, তবে প্রেসের মালিক গ্রন্থ প্রকাশনার ইচ্ছা ত্যাগ করে বিড়ি এবং মনিহারী দ্রব্যাদির লেবেল মুদ্রণে আত্মনিয়োগ করেছেন।

আমি যখন 'সওগাত'-এ যোগদান করি তখন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যাদবপুরে কোথাও থাকতেন। মাঝে মাঝে বিকেলের দিকে আসতেন, আমার কাজ শেষ হলে ইডেন গার্ডেনে চলে যেতাম, সেখানে সন্ধ্যার পরে পর্যন্ত গল্প-গুজব করতাম, প্রধানত সাহিত্য ও রাজনীতি নিয়ে। 'সওগাত'-এর জন্য লেখা চাইলে গল্প-গুজবের মধ্যেই অবলীলাক্রমে কবিতা অথবা সনেট লিখে দিতেন। এসব কবিতায় অথবা সনেটে কাটাকুটি বিশেষ থাকতো না। এটা শক্তিমান কবির লক্ষণ। অন্তত তখন এ বিষয়ে

www.pathagar.com

আমার সন্দেহ ছিল না। এর বিশেষ কারণটি এই যে, আমি নিজে তখনও কবিতা লিখতাম। আমার লেখা দু'একটা কবিতা তিনি মাসিক 'মোহাম্মদী'তে ছেপেছেন, কিন্তু আমার কবিতা লেখা ছিল যথেষ্ট পরিশ্রমের ব্যাপার।

'সওগাত'-এ যোগদানের পরেই সনেটের কারুকার্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার কিছু তর্ক হয়েছিল। তাঁর এবং আরও কোনো কোনো কবির সনেটের সংগঠন সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণা নেই, এই ছিল আমার বক্তব্য। তাঁরা পেত্রার্কান এবং শেক্সপীয়রিয়ান সনেটের মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটান যা রীতি-বিরুদ্ধ। ঐ বিতর্কের পর আমার বক্তব্য নিয়ে 'সনেটের টেকনিক' নামে 'সওগাত'-এর মাঘ ১৩৫৩ সংখ্যায় আমি একটা প্রবন্ধ লিখেছিলাম। প্রবন্ধটা কিছু প্রাথমিক ধরনের বলে এখনও আমার কোনো প্রবন্ধ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত করি নি, তবে ঐ বক্তব্য অন্যান্য প্রসঙ্গে আমার বিভিন্ন প্রবন্ধ সংকলনে ছড়িয়ে আছে। ফররুখ আহ্‌মদের উপর ঐ বিতর্কের কিছু ক্রিয়া হয়েছিল, তিনি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলেন। সম্প্রতি 'সওগাত'-এর আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১ সংখ্যায় ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর যাবতীয় কবিতা পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। নিরীক্ষণ করলে দেখা যাবে, ঐ বিতর্কের পর অন্তত 'সওগাত'-এ প্রকাশিত তাঁর সনেটগুলোতে তিনি পেত্রার্কান এবং শেক্সপীয়রিয়ান রীতির মধ্যে সংমিশ্রণ ঘটান নি, সনেট রচনার এই যুগল রীতি বিশ্বস্ততার সঙ্গে অনুসরণ করেছেন। পরে এবং অন্যত্র করেছিলেন কিনা তা গবেষণাযোগ্য। তবে কোনো কবি সনেটের বিশুদ্ধ গঠনরীতি অনুসরণ করুন অথবা নাই করুন, তাঁর এরূপ রচনার চূড়ান্ত বিচার কবিতা হিসাবে। ফররুখ আহ্‌মদের চতুর্দশ পঙক্তির সব রচনাকেই সনেট ধরলে, তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ সনেটকারদের অন্যতম। বোধ হয় বাংলা ভাষার কোনো সনেটকারই (কৃচিৎ ব্যতিক্রম ব্যতীত) কোনো রীতির বিশুদ্ধতা রক্ষা করেন নি। সঙ্করজাতীয় সনেট লিখেছেন। এবং এই ব্যাপারটি শুধু বাংলা কবিতায় ঘটে নি, ইংরেজী কবিতায়ও ঘটেছে। সনেট হয়ে দাঁড়িয়েছে যে কোনো মিল-পদ্ধতিতে রচিত চৌদ্দ লাইনের কবিতা।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষণার পরেই উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার জন্য পশ্চিমাদের পক্ষ থেকে যে প্রস্তাব করা হয়েছিল, আমরা উভয়ে তার বিরোধিতা করার সংকল্প নিয়েছিলাম। সাতচল্লিশের জুন মাসেই আমরা যুক্তভাবে বাংলার সপক্ষে ব্যক্তিগত পর্যায়ে কিছু প্রচারকার্য চালিয়েছিলাম, এবং উভয়েই বাংলার সপক্ষে পত্র-পত্রিকায় লিখেছিলাম। একথা আমি অন্যত্র বলেছি। কিন্তু কিছুকাল পরে পাকিস্তানের অন্যান্য মৌলিক আদর্শে তাঁর সঙ্গে আমার মতানৈক্য ধরা পড়লো। ৬ সার্কাস রো-তে আমি এবং কবি হাবীবুর রহমান একটি ঘর ভাড়া নিয়ে কিছুদিন ছিলাম। পরে হাবীবুর রহমান অন্যত্র গিয়েছিলেন। সেইখানে আটচল্লিশের কোনো এক সময় পাকিস্তানের রাষ্ট্রাদর্শ কি হওয়া উচিত, এই আলোচনায় আমার বক্তব্য দাঁড়ালো সংক্ষেপে

www.pathagar.com

সমাজতন্ত্র, তাঁর বক্তব্য দাঁড়ালো 'তবলীগ'। এই শব্দটিও তিনি ব্যবহার করেছিলেন। অবশ্য নিছক ধর্ম প্রচারের অর্থে তিনি বলেন নি ঃ অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সকল ক্ষেত্রে ইসলামী আদর্শ প্রচারের অর্থে বলেছিলেন। খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শকে পাকিস্তানের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করলে সে রাষ্ট্র সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রই হবে, অধিকন্তু কমিউনিজমের জড়বাদ থেকে মুক্ত হওয়ায় পাকিস্তান সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে উন্নততর রাষ্ট্র হবে—এই ছিল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের দৃঢ় বিশ্বাস। তিনি ছিলেন জড়বাদের ঘোর বিরোধী। তাঁর কবিতায় নিন্দার্থে 'জড়বাদ' শব্দটি প্রচুর ব্যবহৃত হয়েছে। এই জড়বাদ শুধু পশ্চিমী সভ্যতার নয়, কমিউনিস্ট মতবাদের জড়বাদও। প্রথম জীবনে তিনি অর্থনৈতিক আদর্শের আকর্ষণে কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি স্বল্পকালের জন্য আকৃষ্ট হয়েছিলেন। তাঁর কাছেই একথা শুনেছিলাম। কিন্তু প্রধানত ঐ জড়বাদের জন্যই তিনি কমিউনিস্ট পার্টি ও মতবাদ থেকে বিকর্ষিত হয়েছিলেন। ইসলামী আদর্শের রূপায়ণ এবং প্রচার পাকিস্তানের রাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হওয়া উচিত, এই ছিল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের দৃঢ় অভিমত। সোভিয়েত ইউনিয়ন যদি সমগ্র পৃথিবীতে কমিউনিজম প্রচারের নীতি গ্রহণ করতে পারে, তাহলে পাকিস্তান সমগ্র পৃথিবীতে ইসলামী আদর্শ প্রচারের নীতি গ্রহণ করবে না কেন, এই ছিল তাঁর যুক্তি। নিজের রচনায় এই কাজই তিনি আমৃত্যু করেছেন। কোনো একটা বিশেষ ধর্মের প্রতি পক্ষপাত এবং ধর্মীয় আদর্শ প্রচার কোনো ন্যায়নিষ্ঠ রাষ্ট্রেরই উচিত নয়, এটা তিনি কোনদিনই স্বীকার করেন নি।

সাতচল্লিশের শেষদিকে 'সওগাত' ছেড়ে আমি নানা কারণে পুনরায় 'আজাদ'-এ যোগদান করি। সেখানে পাকিস্তানী এবং অন্যান্য যাবতীয় রাজনীতিকে অনেকটা ঘনিষ্ঠভাবে বিশ্লেষণের সুযোগ পেয়েছিলাম, যা সচেতন সব সাংবাদিকই পেয়ে থাকেন। এর ফলে আমার অনেক ধোঁয়াটে চিন্তাধারা ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে যায়। এই কারণে,এবং আরো অনেক ব্যক্তিগত এবং সামাজিক কারণে আমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে একটা পরিবর্তন আসে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বেলায় এটা ঘটে নি। তার ফলে আমাদের চিন্তার বৈষম্য ক্রমে ক্রমে মতবিরোধের রূপ নিয়েছিল। এই মতবিরোধের ফলে ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে হৃদ্যতার এবং পরে ব্যক্তিগত সম্পর্কেরও অবসান হয়, তাঁর দিক থেকে, আমার দিক থেকে নয়। সম্ভবত তাঁর ধারণা ছিল, আমি কমিউনিস্ট। কোনো ব্যক্তি পাকিস্তান সরকারের এবং মুসলিম লীগের অনুরূপ আদর্শ সমর্থন না করলেই এক সময় সরকারী বেসরকারী সকল মহলেই তাঁকে বলা হতো কমিউনিস্ট। ক্রমে ক্রমে তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপও বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ক্বচিৎ ব্যতিক্রম ব্যতীত। ঐ রকম ব্যতিক্রম হলে সদালাপই হতো, ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে, কিন্তু ব্যতিক্রমের বেশী তা ছিল না।

মতবিরোধ হওয়ার আগে যখন তিনি বেকার, এবং কলকাতার বাইরে, তখন তাঁর সঙ্গে কিছু পত্রালাপ হয়েছিল। সাতচল্লিশের সেপ্টেম্বরে এক চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

দুর্গাপুর
১৩-৯-৪৭

বন্ধুবরেষু,

আপনার ৮-৯-৪৭ তারিখের লেখা চিঠি বারো তারিখে হাতে এল। বর্তমানে কি কারণে আমার পক্ষে কলকাতা যাওয়া অসম্ভব তা' আপনি ভালো করেই জানেন। 'কাফেলা' কর্তৃপক্ষের কাছে আমার ৪০/- টাকা পাওনা আছে, টাকাটা পেলে আমার যাওয়ায় আপত্তি নেই।

'কাফেলা'র পরিচালকবর্গকে আমি যে চিঠি লিখেছিলাম (যা আপনি পৌঁছে দিয়েছেন) তাতে সেপ্টেম্বরের আগে 'কাফেলা'র ভার গ্রহণ করতে আমি অসম্মতি জানিয়েছিলাম। তাঁদের কাছে আমার ঠিকানা ছিল। এ পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে কোন সংবাদ না পাওয়ায় 'কাফেলা'য় যোগ দেওয়ার কোন কথাই আমার মনে ওঠে নি। অথচ ব্যাপারটা বহুদূর গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে যে, আমি নতুন পত্রিকা সম্পাদনা করছি। সুদূর পল্লীতেও বর্তমানে পত্রিকার যে প্রকার চাহিদা দেখা যাচ্ছে তা আনন্দদায়ক।

...সুতরাং সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে কাজ করার জন্য নতুনভাবে উৎসাহ বোধ করছি। আপনি অনুগ্রহ করে 'কাফেলা' অফিসে গিয়ে তাঁদের মনোভাব অবগত হতে পারেন। আমার কাছে টাকা পাঠালেই আমি কলকাতা রওয়ানা হতে পারি। অন্যত্র কাগজের অফিসে কাজ করতেও আমার আপত্তি নাই। অকারণে বসে থাকা কষ্টকর। তাড়াতাড়ি চিঠির উত্তর দেবেন।

ফর্‌রুখ

দুর্গাপুর সম্ভবত তাঁর স্বগ্রাম। একই ঠিকানা থেকে কয়েক মাস পরে তিনি লিখেছিলেন ঃ

দুর্গাপুর
৫-১-৪৮

বন্ধুবরেষু,

বহুদিন পরে আপনার উৎসাহব্যঞ্জক চিঠি পেয়ে উল্লসিত হয়েছি। কারণ আমার অবস্থা বর্তমানে সেই রূপকথার শেয়ালের মত, যাকে প্রহরান্তে আধমরা অবস্থায় গলায় দড়ি দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছিল। অবশ্য শেয়ালের সঙ্গে আমার পার্থক্য এইটুকু যে, শেয়ালের অন্নচিন্তা থাকলেও বস্ত্র-সমস্যা ছিল না। আমারও ও দুটো তো আছেই, তার উপর আছে পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণ চিন্তা। ঐ চিন্তাতেই বিশেষ বিব্রত এবং প্রয়োজনমতো চেষ্টিত ছিলাম বলে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করতে হয়েছিল।

www.pathagar.com

আপনি যে আত্মবিলোপের কথা লিখেছেন, তা অনেকাংশে ভুল; কারণ আত্মরক্ষারূপ সংগ্রামে আমাকে কালাতিপাত করতে হচ্ছে।

লেখার দিক থেকে অবশ্য এই কয় মাস একেবারে ফাঁকা যায় নি। ক'দিনের মধ্যেই অনেকগুলো ব্যঙ্গ কবিতা (Satire) [ধনতন্ত্র ও অন্যান্য সামাজিক বিস্ফোটকের পক্ষে যা মূল্যবান ওষুধ হতে পারে] এবং দুই-চারটি সামান্য সীরিয়াস কবিতা লিখেছি। কাগজের অভাবে এতদিন প্রকাশ করা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এইবার প্রকাশ করার সুযোগ এসেছে। ট্যাঁকের অসচ্ছলতার দরুন আমাকে বাধ্য হয়ে বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে পত্রালাপ অথবা সংশ্রব বর্জন করতে হয়েছিল (কারণ পোস্টকার্ড কেনার মত পয়সা প্রচুর সংখ্যায় হামেশাই থাকতো না)। ঐ একই কারণে আপনাকে একখানা অর্ধ-ব্যবহৃত কাগজে বর্জাইস অক্ষরে চিঠি লিখছি, কারণ পরিষ্কার কাগজ আমার তহবিলে নাই।

যাই হোক, কলকাতা যাওয়ার পাথেয় জোগাড় করেছি, কয়েক দিন আহারের বন্দোবস্ত করতে পারলেই আমি অনতিবিলম্বে কলকাতা অভিমুখে পদচালনা করব। হয়তো এ চিঠি পাওয়ার কয়েকদিন পরেই আপনারা এই মহাকবির মুখচন্দ্র (দাড়ি আবৃত) দর্শন করে কৃতার্থ হবেন। এই উপলক্ষে প্রাথমিক আয়োজন প্রায় শেষ করে ফেলেছি। নগদ আট আনা খরচ করে জুতো সেলাই এবং কয়েকটি পট্টি সংযোগ করা হয়েছে। এমন কি একটা নতুন কামিজের যোগাড়ও হয়ে যেতে পারে। পুরানো শীত বস্ত্রগুলো বর্তমানে খুব কাজে লাগছে—সুতরাং যতদিন ধনতন্ত্রের কবর খোঁড়া না হচ্ছে, ততদিন বাধ্য হয়ে বলতে হবে ঃ ধনতন্ত্র জিন্দাবাদ।

প্রীতিমুগ্ধ
ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

এর কিছুদিন পরেই তিনি কলকাতা আসেন। উঠেছিলেন পার্ক সার্কাস এলাকায় সিকান্দার আবু জাফর সাহেবের বাসায়। সেইখানে কিছুদিন থাকার পর সৈয়দ আলী আহসান সাহেবের চেষ্টায় (তিনি তখন ঢাকা বেতারের অনুষ্ঠান সহকারী) তিনি স্টাফ আর্টিস্টের চাকুরী পেয়ে ঢাকায় চলে আসেন। পাকিস্তানের আদর্শ সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গে মতামতের বৈষম্য দেখা দিয়েছিল সেই সময়েই।

ফর্‌রুখ আহমদের এই দুটি চিঠিতেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে অনেক কিছুই প্রকাশ পাচ্ছে, যা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অন্তরঙ্গদের সকলেরই জ্ঞাত। এখানে যা উল্লেখনীয় তা হচ্ছে, তিনি দারিদ্র্যকে বেশ খানিকটা পরিহাসের সঙ্গে মেনে নিয়েছিলেন এবং ধনতন্ত্রকে তিনি ঘৃণা করতেন। দারিদ্র্যের মধ্যে আত্মাকে অমলিন রেখে সৎজীবন-যাপন করতে আমি তাঁকে দেখেছি। বাধ্য হয়ে ধনতন্ত্র জিন্দাবাদ তিনি করেছেন এবং আমরা অনেকেই করেছি, এখনও করছি। ধনতন্ত্রের প্রতি তাঁর তীব্র ঘৃণা সম্বন্ধে

www.pathagar.com

সন্দেহের কোন কারণ অন্তত আমি স্বল্পকয়েক বছরের অন্তরঙ্গতার কালে দেখি নি। কিন্তু ধনতেন্ত্রর শোষণ পদ্ধতির মেকানিজম তিনি শেষদিন অবধিও বুঝে উঠতে পারেন নি। আর এই কারণেই তাঁর রাজনৈতিক আদর্শে এবং সাংস্কৃতিক ধ্যান-ধারণায় যে কোন ভ্রান্তি থাকতে পারে, একথা জীবনের শেষদিন অবধিও তিনি বুঝে ওঠেন নি, এমন কি হয়তো ভেবেও দেখতে চান নি।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্য বিচারকালে সব সময় মনে রাখতে হবে, বস্তুত তাঁর সমালোচকদের মনে রাখতে হবে, তিনি একান্তভাবে পাকিস্তান আন্দোলনের সৃষ্টি। কিন্তু এ আন্দোলনের যাবতীয় তাৎপর্য সম্বন্ধে তিনি সচেতন ছিলেন একথা বলা কঠিন। পাকিস্তান আন্দোলন ছিল সাম্প্রদায়িক জাতীয়তার আবরণে বিশুদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন, ধর্মীয় আন্দোলন নয়। এর মূল কথা ছিল প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সঙ্গে রাজনৈতিক ক্ষমতা, অর্থনৈতিক স্বার্থ এবং সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধের সংঘাত। কিন্তু এ সম্বন্ধে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের পরিষ্কার ধারণা ছিল না (অনেকদিন আমারও ছিল না)। ভারত-বিভাগের আগে পাকিস্তান আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধির জন্য এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে শোষক শ্রেণীর সুবিধার উদ্দেশ্যে ক্রমেই বর্ধিত পরিমাণে ধর্মকে হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। তিনি এটা দেখেও দেখেন নি যে, পাকিস্তান আন্দোলনের নেতৃত্ব ছিল পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত নেতৃবর্গের হাতে; চিন্তায় এবং ব্যবহারিক জীবনে ধর্মের সঙ্গে যাঁদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক ছিল নগণ্য এবং ধর্মীয় নেতৃবর্গ পরিচালিত জমিয়তে ওলেমা-ই-হিন্দ এবং জামায়াতে ইসলামীর মতো ধর্মবাদী প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে (পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরে অবশ্য জামায়াতে ইসলামী তার ভূমিকা পরিবর্তন করেছিল)। তথাপি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ শেষ অবধি বিশ্বাস করেছেন, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অর্থই ইসলামী আদর্শাবলীর পুনরুজ্জীবন। অথচ ব্যবহারিক জীবনে তিনি পাক্কা মুসল্লী ছিলেন তাও নয়: আমি যতোটা দেখেছি। তাঁর জীবনের শেষ পর্যায়ের তথ্য এখনও অপ্রকাশিত, কিন্তু যতদূর জানা গেছে, তিনি জীবনের শেষ মুহূর্ত অবধি আরও একটি রুঢ় বাস্তবকে স্বীকার করতে চান নি : তা হচ্ছে, পাকিস্তানী আমলের পঁচিশ বছরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মিথ্যা হয়ে গিয়েছিল এবং এদেশ ক্রমে ক্রমে পাকিস্তানের উপনিবেশে পরিণত হয়েছিল। সেই সঙ্গে জাতীয়তার ধারণাও বদলে গিয়েছিল। অবিভক্ত ভারতের সাম্প্রদায়িক সংঘাতের মুখে বাঙালী মুসলমান (এবং অবিভক্ত ভারতের অবশিষ্ট মুসলমান) নিজেদের মুসলিম জাতি (এবং পরে পাকিস্তানী জাতি) বলে বিশ্বাস করেছিল; কিন্তু পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের শোষণে সেই বাঙালী মুসলমানই বাঙালী জাতীয়তাবাদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছে এবং একটা নতুন জাতি, বাঙালী জাতিতে পরিণত হয়েছে। এটা কোন সাময়িক ভাবাবেগের ব্যাপার নয়। বরং বাঙালী মুসলমানের জন্য পাকিস্তানী ভাবাবেগই সাময়িক বলে প্রমাণিত হয়েছে। দেশ, ভাষা,

www.pathagar.com

সাহিত্য, ইতিহাস, অর্থনীতি, সমাজ এবং এই সবের পরিপ্রেক্ষিতে বিকশিত সংস্কৃতির দিক দিয়ে বাঙালী জাতীয়তার একটা ধারা বহু শতাব্দী যাবৎ প্রবহমান। পাকিস্তানী উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের মধ্য দিয়ে সেই জাতীয়তা আত্ম-প্রতিষ্ঠা করেছে। এ প্রতিরোধ, সংগ্রাম এবং বাঙালী জাতির আত্ম-প্রতিষ্ঠা মূলত বাঙালী মুসলিম সম্প্রদায়ের নেতৃত্বেই ঘটেছে, যদিও ঐ সংগ্রাম ছিল সাম্প্রদায়িকতাবর্জিত।

জাতীয় জীবনের এরূপ মৌলিক রূপান্তর কালে, বস্তুত জাতির জীবন-মরণ সংগ্রামে শ্রেষ্ঠ প্রতিভাবৃন্দ সাধারণত উদাসীন থাকেন না, বরং তাঁরা অগ্রগামী নকীবের ভূমিকা গ্রহণ করেন। জাতীয় জাগরণের দিনে রবীন্দ্রনাথ করেছেন, নজরুল করেছেন। (এক হিসাবে এক সময় কবি ইকবালও করেছেন। কিন্তু পঞ্চাশের দশকের শেষ অবধি বেঁচে থাকলে তাঁর ভূমিকা কী হতো বলা কঠিন।) ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন প্রতিভাবান, বস্তুত তাঁর প্রজন্মের কবিদের মধ্যে তিনিই ছিলেন কবি হিসাবে যথার্থ প্রতিভাবান, কিন্তু তাঁর নিজের সমাজের নবজাগরণকে, তাঁর দৃপ্ত অগ্রযাত্রাকে তিনি উপলব্ধি করে উঠতে পারেন নি। বরং ঐ নবজাগরণের তিনি বিরোধিতা করেছেন।

পাকিস্তানের জন্মের জন্য ইকবাল যে ভূমিকা নিয়েছিলেন, চল্লিশের দশকে তাঁর অনুসরণে ফর্‌রুখ আহ্‌মদও সেই ভূমিকাই নিয়েছিলেন, কিন্তু ইকবাল যতটা ভবিষ্যৎমুখী ছিলেন, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ততটা ভবিষ্যৎমুখী ছিলেন না। কালের দিক দিয়ে তাঁর দৃষ্টি ছিল দূর অতীতের প্রতি, দেশের দিক দিয়ে দূর পশ্চিমের প্রতি। রাজনৈতিক প্রেরণার দিক দিয়ে শুধু নয়, কাব্যের প্রেরণার দিক দিয়েও। কাব্যের শরীরে ও আত্মার বিষয়বস্তুতে ও ভাববস্তুতে, অলংকরণে ও শব্দচয়নে বিশেষভাবে যা লক্ষণীয় তা হচ্ছে পশ্চিমমুখীনতা এবং অতীতমুখীনতা। কখনো কখনো তিনি আধুনিক। তাঁর অনেক সনেট এবং কবিতা দৃঢ় সংবদ্ধ, অনবদ্য, নিপুণ শিল্পকর্ম ঃ তা সত্ত্বেও সমগ্রভাবে সংবেদনে ও কাব্যপ্রকরণে তিনি সাম্প্রতিক, আধুনিক নন। কাব্যবিচারে সাম্প্রতিকতা এবং আধুনিকতা অবশ্য বহুলাংশে আপেক্ষিক ধারণা। পর্বতচূড়া থেকে অসমতল ভূমিকে সমতল মনে হয়। কালের দূরত্বে সাম্প্রতিকতা এবং আধুনিকতার বৈষম্য এক সময় মসৃণ মনে হওয়া সম্ভব, তথাপি তাঁর মানসপ্রকৃতি এবং কাঙ্ক্ষিত আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি যতোটা পাকিস্তানের কবি, ততোটা বাংলাদেশের নন। কখনো সক্রিয় রাজনীতি না করলেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের চেতনার শিকড় এ দেশের রাজনীতিতে প্রোথিত, কিন্তু সে এক বিশেষ রাজনীতি ঃ বাংলাদেশের দিক থেকে দেখতে গেলে তাঁর চেতনা চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলনের লক্ষণগুলিকে অতিক্রম করে আর বিশেষ অগ্রসর হতে পারেনি। তিনি ঐ এক বিশেষ কালের শিকার।

www.pathagar.com

আবু রুশদ

আমার বন্ধু ফর্‌রুখ

ফর্‌রুখের সাথে আমার যখন প্রথম দেখা, তখন আমরা দু'জনেই স্কুলের ছাত্র। আমি পড়তাম তালতলা হাইস্কুলে। আর ফর্‌রুখ দক্ষিণ কলকাতার বিখ্যাত বালিগঞ্জ হাইস্কুলে। আমরা দুজনই কলকাতার পার্ক সার্কাস অঞ্চলে ৩৮ দিলখুশা স্ট্রীটে থাকতাম। দালানটা ছিল দোতলা ম্যানসনের মতো। ফর্‌রুখরা দোতলার যে ফেলাটে ছিলো, তার ডানদিকেই এক মসজিদ আর তার সাথে লাগা গোরস্তান।

ঠিক সামনের একতলা বাসাতে শেরে বাংলা ফজলুল হকের এক মেয়ে থাকতেন, পরে সেখানে সেকান্দর আলী বলে এক ব্যারিস্টার ভদ্রলোক থাকা আরম্ভ করলেন। তাঁকে প্রায়ই আমরা তাঁর বাসা-সংলগ্ন ছোট লনে স্যুট পরা অবস্থায় বসে থাকতে দেখতাম। তা নিয়ে ফর্‌রুখ আর আমার কৌতূহলের অন্ত ছিলো না। তার ডানদিকে আর একটা একতলা বাসা ছিলো, সেখানে থাকতেন তখনকার নামকরা অভিনেতা ছবি বিশ্বাস। সেই দীর্ঘদেহী সুপুরুষকে তাঁর বাসার বারান্দায় ইজি চেয়ারে আরাম করা অবস্থায় দেখতাম। তার পেছনে গোলাপী রং-এর যে দোতলা বাড়ী ছিলো, সেখানে থাকতেন সিটি কলেজের অধ্যাপক ও তখনকার কলকাতা ব্রাহ্ম সমাজের নামকরা ব্যক্তিত্ব রজনীকান্ত সেন।

সেকান্দর সাহেবের বাড়ীর পেছনেই যে বিরাট দোতলা বাড়ী ছিলো, তার মালিক ছিলেন খান বাহাদুর আতাওয়ার রহমান। তিনি তখনকার কেন্দ্রীয় সরকারের এ্যাসিস্ট্যান্ট ইনকাম ট্যাক্স কমিশনার ছিলেন। তিনি নিজেই সপরিবারে তাঁর বাড়ীতে থাকতেন। আমার মনে পড়ে, খান বাহাদুর সাহেবের সুদর্শনা তনয়ার সঙ্গে ফর্‌রুখের নাম জড়িয়ে আমরা মাঝে-মধ্যে বেশ কৌতুক উপভোগ করতাম।

দিলকুশা স্ট্রীটের ভূগোল আর-একটু বিস্তৃতভাবে বলা দরকার। সেখানে পাকা দালান ছিলো খুবই কম, খোলা ঘরই বেশী। রাস্তা প্রথমদিকে কাঁচা ছিলো। পরে অবশ্য পাকা হয়। মোড়ে রুটি-বিস্কুটের এক দোকান ছিলো, সেখানে খুব মচমচে ও নবনীত কুলী চা ও নানখাতাই পাওয়া যেতো। রুটিও বেশ উপাদেয় ছিলো। আর একটি ছিলো উড়ের দোকান। সেখানকার পিঁয়াজ, বেগুনী, আলুবড়া পাড়ায় খুব জনপ্রিয় ছিলো। রাস্তার প্রান্তে ছিলো দিলখুশা ইনসটিটিউট নামে এক পাঠাগার। পাঠাগারটি সন্ধ্যা ছ'টা থেকে রাত দশটা পর্যন্ত খোলা থাকতো, কারণ সেখানকার যিনি কর্তা ছিলেন, তিনি দিনে সরকারী

www.pathagar.com

চাকরি করতেন। ফর্‌রুখ আর আমি দুজনেই প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় ওই পাঠাগারে গিয়ে বাংলা উপন্যাস ও গল্পের বই পড়তাম। আর সেখানেই শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, বিভূতিভুষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে আমাদের পরিচয়।

আমাদের উভয়েরই দিলখুশা স্ট্রীটে এক বন্ধু ছিলো, তাঁর নাম বাদশাহ্। আমরা তিনজনে মিলে রাস্তার এককোণে গুলিডাণ্ডা আর লাট্টু অনেকবার খেলেছি। ফর্‌রুখের অবশ্য ঐসব খেলায় মন একটু কম ছিলো।

আমরা তখন সাহিত্য নিয়ে আলাপ করতাম বটে, কিন্তু লেখক হিসাবে কেউ তখনো আবির্ভূত হইনি। পরে ফর্‌রুখরা সার্কাস রেঞ্জের এক বাসায় উঠে যায়। আর আমি আমাদের নতুন তৈরী কর্ণেল বিশ্বাস রোডের বাড়ীতে থাকতে আরম্ভ করি। ফর্‌রুখের সঙ্গে যোগাযোগ তখন কিছুটা কমে গিয়েছিলো। কিন্তু কলেজ জীবনের প্রায় শুরুতেই আমরা দুজনেই লেখক হিসাবে পরিচিত হতে আরম্ভ করি এবং আমাদের লেখা "বুলবুল", "মোহাম্মদী", "সওগাত" পত্রিকায় নিয়মিত বেরুতে শুরু করে। মাঝে-মধ্যে ফর্‌রুখের সাথে দেখা হলে আমরা হেঁটে গড়ের মাঠের দিকে কিংবা বালীগঞ্জের লেকের দিকে বেরিয়ে পড়তাম আর রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এবং কীটস নিয়ে প্রবল উৎসাহের সঙ্গে আলাপ করতাম। তখন ফর্‌রুখের সাহচর্যে আমি বেশ এক প্রত্যয় ও আনন্দ খুঁজে পেতাম।

দুজনেই লেখক হিসাবে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকি। দেশ বিভাগের পর ঢাকায় চলে আসি।

দেশবিভাগের পর থেকে ফর্‌রুখের সাথে আমার যোগাযোগ অনেকটা কমে আসে। কারণ সরকারী কলেজে অধ্যাপনা উপলক্ষে আমাকে প্রায়ই ঢাকার বাইরে থাকতে হয়েছে। আর ফর্‌রুখ কাজ করতেন নাজিমুদ্দীন রোডে অবস্থিত রেডিও পাকিস্তানে। তিনি আদমজী পুরস্কার পেয়েছেন, প্রেসিডেন্টের পদক পেয়েছেন—এই সব খবর পেয়ে কৃতী কবির যথাযোগ্য মর্যাদা হচ্ছে বলে নির্ভেজাল আনন্দ উপভোগ করতাম।

তারপরে বাংলাদেশ। বাংলাদেশের উদ্ভবের ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা নিয়ে অনিশ্চিত ভাব এখনো রয়ে গেলেও তাঁর কবিসত্তা কিন্তু তাতে বিপর্যস্ত হয় নি। আমি যখন সরকারী কাজে লন্ডনে বাংলাদেশ হাই কমিশনে ছিলাম, তখন ফর্‌রুখের হঠাৎ মৃত্যু-সংবাদ পেয়ে বড়ই বিমর্ষ হয়ে পড়েছিলাম। বিশেষ করে জীবনের শেষ দিকে তাঁকে অনেক দুঃখ-দুর্দশার সম্মুখীন হতে হয়েছে, তা জেনে আমার এই বাল্য-বন্ধুর নানান স্মৃতিতে আমার মন বেদনার্ত হয়ে উঠেছিলো। তাঁর জন্য কিছু করতে পারিনি বলে বড় অনুশোচনা বোধ করেছি।

www.pathagar.com

আমি বিশ্বাস করি যে, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে নিছক কাব্যশক্তিতে ও শৈল্পিক দক্ষতায় ফররুখ কারুর চেয়ে খাটো ছিলো না। ইসলামী ভাবধারায় তাঁর কাব্যিক নিমজ্জন মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমান অনেক পাঠকের কাছে গ্রহণীয় নাও হতে পারে, কিন্তু তাঁরা ভুলে যান যে, ফর্‌রুখের সামাজিক সচেতনতা এবং দুঃস্থ ও বঞ্চিত জনগণের প্রতি গভীর মমতা এবং সবরকম সামাজিক অনাচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রবল সোচ্চার প্রতিবাদ তাঁর অনেক কবিতায় ছড়িয়ে আছে। এই দুই ভিন্নমুখী ধারার এমন নিপুণ সংমিশ্রণ সমপরিমাণে আমাদের কোনো কবির লেখায় বড় একটা চোখে পড়ে না।

www.pathagar.com

আবদুল আহাদ

প্রেমিক ফর্‌রুখ

সময়টা ছিল ১৯৪৬ সাল। আমি ও ফতেহ লোহানী প্রায়ই সিকান্‌দার আবু জাফ্‌রের পার্ল রোডের বাসায় আড্ডা জমাতাম। পার্ল রোড ছিল পার্ক সার্কাসে। আমরা সবাই পার্ক সার্কাসেই থাকতাম। একদিন জাফরের বাসায় ফর্‌রুখ আহমদের সঙ্গে জাফর আমাকে পরিচয় করিয়ে দিল। ফর্‌রুখ তখন মাঝে মধ্যে জাফরের বাসায় আসত। পাতলা ছিপছিপে ছিল সে তখন। রং ছিল ফর্সা, মুখে দাড়ি ছিল না। এই আমার প্রথম পরিচয় ফর্‌রুখের সাথে। এরপর আরো দু'একবার জাফরের বাসায় দেখা হয়েছে, তবে তেমন ঘনিষ্ঠতা হয়নি।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভাল, আমার সাথে যখন ফর্‌রুখের প্রথম দেখা, তার বেশ আগেই সে অনেকখানি পরিবর্তিত হয়েছিল। মানসিক দিক দিয়ে যেমন, বেশভূষার দিক দিয়েও তেমন একটি পরিবর্তন তার এসেছিল। একথা অবশ্য পরবর্তীতে ফতেহ লোহানী আমাকে জানিয়েছে। সে আরো বলেছে, ফর্‌রুখ যে সময়ে স্কটিশে পড়ে, তখন সে খুবই রোমান্টিক ছিল। তার শরীরে তখন শোভা পেত লম্বা আদ্দির পাঞ্জাবী। ধুতি মাটিতে লুটাতো। উল্টিয়ে আঁচড়ানো বড়বড় চুল কিছুটা এলোমেলোই থাকত।

প্রথম সাক্ষাতের কিছু দিন পরেই শুরু হ'ল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। সে কী ভয়াবহ সময়! আর ফর্‌রুখের সাথে দেখা হয় নি। ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগ হয়ে গেল। ফতেহ লোহানী চলে এল ঢাকায় খবর পাঠক হিসাবে। আমি কিছুদিন পরে ১৯৪৮-এ ঢাকা এসে বেতারে যোগ দিলাম। আমি চলে আসার অল্পদিনের মধ্যেই সিকান্‌দার আবু জাফরও চলে এল। ফর্‌রুখ আমাদের কিছু আগেই চলে এসেছিল এবং ঢাকা বেতারে স্ক্রীপ্ট রাইটার হিসেবে যোগ দিয়েছিল। জাফরও তাই ছিল।

সেই সময় ঢাকা বেতারের বড় করুণ অবস্থা। শিল্পী নেই, ভাল গান নেই। তখন এই কবিদের অনুরোধ করা হ'ল বেতারের প্রয়োজনে গান লেখার জন্য।

ঢাকায় আসার প্রথম থেকেই আমি ফর্‌রুখকে নাম ধরে ডাকতাম। ফর্‌রুখও আমাকে নাম ধরে ডাকত। গান লেখার মধ্য দিয়েই ফর্‌রুখের সাথে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠতর হয়ে ওঠে।

তখন ঢাকা বেতারে একটি সুন্দর পরিবেশ ছিল। আমি, ফতেহ লোহানী, নাজির আহমদ ও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। আমরা একত্রে বসে কত না গল্পই করেছি। তবে আমার

www.pathagar.com

সাথে ফর্‌রুখের অন্য সময়েও দীর্ঘক্ষণ গল্প চলত, রাস্তার ওপারে আবনের চায়ের দোকানে বসে।

ঢাকা বেতার তখন নাজিমুদ্দিন রোডে ছিল। ফর্‌রুখকে দিয়ে আমি জোর করে কত ধরনের গানই লিখিয়ে নিয়েছি। ফর্‌রুখ প্রথম দিকে লিখতে চাইত না। তবু আমার পীড়াপীড়িতে অনেক গানই সে লিখেছিল। আমি যতটুকু অনুভব করেছি, ফর্‌রুখ যেন তার প্রেমিক মনকে স্তব্ধ করে দেয়ার চেষ্টা করেছে। সত্যি কথা বলতে কি, ফর্‌রুখের মনটা ছিল প্রেমিকের। এই ফর্‌রুখের হাত থেকেই একদিন 'ডাহুক' কবিতা বেরিয়েছে।

ফর্‌রুখের কাছে তখন ধর্ম এবং নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান এইটিই বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল। তবু পীড়াপীড়ি করে ফর্‌রুখকে দিয়ে আমি অনেক প্রেমের গান লিখিয়ে নিয়েছি। সে গানগুলি কাব্যের দিক থেকে খুবই উন্নতমানের ছিল। ফর্‌রুখ আগে কখনো গান লেখেনি। কিন্তু গান লিখতে যখন আরম্ভ করল, দেখলাম, গান লেখার ব্যাপারে ফর্‌রুখের দক্ষতা রয়েছে। কেননা, মূলত সে তো কবি।

ফর্‌রুখের কয়েকটি প্রেমের গানের অংশ এখানে তুলে দিচ্ছি ঃ

যে বসন্ত ফিরে যায়
জীবনে সে ফিরবে না হায়
শেষ হবে তার সাথে
এ দিনের সব গান।
এদিনের সব সুর
হয়ে যাবে অবসান।
এ দিনের সব আলো
মুছে যাবে নিশি-ছায়।

আর একটি গান--

ঝরে যায় শবনব ভোরের হাওয়ায়
বেদনার সব রাতি বুঝি না ফুরায়!
* * *
অভিশাপসম জাগিব তোমার প্রাণে
তোমার ব্যথায়, তোমার ছন্দ গানে।
* * *
আকাশের আলো আকাশে মিলালো
ধরণীর ছায়া ম্লান
হের পিঙ্গল মোর নভতল
শোনে মরণের গান।।

www.pathagar.com

*　　*　　*

জ্বলি শামাদানে,
জ্বলি বেদনার দাহে
শত জ্বালা সয়ে
এ হৃদয় থাকে
পড়িয়া তোমার রাহে।

*　　*　　*

হায়রে বসন্ত যায়
বনেরও ফুলদল কাঁদিয়া লুটায়।
জীবনের সুর অম্লান
বুঝি সে হল অবসান
চঞ্চল ফাল্গুন-দিন সুদূরে হারায়।

হৃদয়ের মণিদীপ জ্বালি
এতদিন সাজায়েছি ডালি
ফাল্গুন শেষে আজি হায় কোথা সে মিলায়।।
শুক্তি বক্ষে রেখেছে মুক্তা
সিন্ধুর প্রাণকণা
এতটুকু মিলিল না।
ঊর্মি-উতল জীবনে তোমার
খোলে না দুয়ার মেলে না তো পাখা
নিশীতে আঁধারে হারায়ে দু'ধারে
বিরল সম্ভাবনা।

*　　*　　*

আমার শেষ হল না আশা
আমার মিটল না পিপাসা

*　　*　　*

উঠলো যদি আঁখির পলক
একটি নিমেষ অনন্তকাল।

এমনিভাবে আরো অনেক প্রেমের গান ফর্‌রুখকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছি। ফর্‌রুখের অন্য ধরনের গানও আছে। যেমন—

দূর দিগন্তের ডাক এল, চল বীর চল নির্ভয়,
নবসৃষ্টির বুনিয়াদ হল শুরু,

www.pathagar.com

ইত্যাদি গান ফর্‌রুখ আমার জন্য লিখেছিল। ফর্‌রুখকে তখন বেশ গানের নেশায় পেয়েছিল এবং সে নেশা আমি ধরিয়ে দিয়েছিলাম। এ ছাড়া ফর্‌রুখ কবি ইকবালের বেশ কিছু কবিতা অনুবাদ করে। এই অনুবাদ অনেক জায়গায় ইকবালের মূল কবিতাকে হার মানিয়েছে বলে আমার ধারণা। এ অনুবাদের একটিতে আমি সুরারোপ করেছিলাম। কবি ইকবালের লেখা ছিল ঃ

ফির চেরাগে লা'লা সে
রওশন হুয়ে কোহো দমন

যার তর্জমা ফর্‌রুখ করেছিল এইভাবে ঃ

রঙিন লালার দীপশিখাতে
হল উজল শিলা কানন।

ফর্‌রুখের চরিত্রের সবচেয়ে বড় গুণ যেটা ছিল, সেটা হল সত্যকে সে নির্ভীকভাবে প্রকাশ করত। ফর্‌রুখ প্রায়ই আমাকে নানা কথার মাঝে বলত, "কবিতায় আমরা পশ্চিম বাংলার চেয়ে পিছিয়ে নেই, কিন্তু গদ্যে আমরা বেশ পিছিয়ে আছি। আমাদের গদ্যে ঐ সাবলীল ভঙ্গী আসতে দীর্ঘ সময় লাগবে।"

সাহিত্যের আলোচনা যখন করতাম, ফর্‌রুখ বঙ্কিমের প্রশংসা করত, বলত, "আমাদের জন্য হয়ত বঙ্কিম ভাল নন, কিন্তু বঙ্কিমের একটি গান কিভাবে সমস্ত হিন্দু জাতিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল এবং স্বদেশী আন্দোলনকে প্রেরণা যুগিয়েছিল, তার নজীর নেই।" 'বন্দে মাতরম' নামক সে গানটি অনেকেই জানেন।

একটা কথা ফর্‌রুখ আমাকে বলত, "আমাকে অনেকেই গোঁড়া মনে করে, কিন্তু জানো, আমার বিছানার একপাশে রবীন্দ্রনাথের 'সঞ্চয়িতা' থাকে এবং অন্যপাশে থাকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের 'মেঘনাদ বধ কাব্য'।"

ফর্‌রুখ যে জিনিসটাকে বিশ্বাস করেছিল, সে বিশ্বাসে সে অটল ছিল জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত। তাঁর মত এই ধরনের বিশ্বাসী মানুষ আমাদের সমাজে বিরল।

www.pathagar.com

সৈয়দা তৈয়বা খাতুন

সংসারে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আমার স্বামী। তিনি বড় কবি, বড় লেখক ছিলেন। কিন্তু আমি ত লেখক নই। সুতরাং তাঁর সম্বন্ধে আমার লেখা নিছক কিছু কথা ছাড়া আর কিই বা হ'তে পারে!

কবি প্রচুর লেখাপড়া করতেন। লেখাপড়ার ব্যাপারে তাঁর কোন ধরা বাঁধা সময় ছিল না। যখন মন চাইতো, তখন বসে যেতেন কাগজ-কলম নিয়ে। তাই বলে, সংসার ছেলে-মেয়ে সম্পর্কে কখনও উদাসীন ছিলেন না। গৃহকর্তা হিসাবে, পিতা হিসাবে তিনি তাঁর দায়িত্ব পালন করেছেন সচেতনতার সঙ্গে। ছেলেমেয়েদের লেখাপড়া কেমন হচ্ছে—এসব খবর সবসময়ই রাখতেন তিনি।

তাঁর রোজগার খুব বেশী ছিলো না, তাই আমাদের সংসারে প্রাচুর্য ছিলো ন কখনই। কিন্তু সুখ ছিলো, অভাব-অনটনের মধ্যেও সংসারে প্রশান্তি ছিলো। ইচ্ছে করলে তিনি হয়তো আরও বেশী রোজগার করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা চান নি। আভিজাত্যের মোহ তাঁর ছিলো না। তাঁর সংসারের জন্য সম্ভবত আমাদের সংসারের কারো মধ্যেই সেই মোহ দানা বেঁধে উঠতে পারে নি। তাঁর মতো আমরাও অল্পতেই সন্তুষ্ট হতে পারতাম। সেই কারণেই আমাদের ঘরে সুখ ছিলো অন্তরের। হাতে টাকা এলে কবি কিছুটা বেহিসাবী হয়ে উঠতেন। বড় রুই, চিতল, বড় কৈ, গলদা চিংড়ি আর পনির, হালুয়া, খেজুর, ফজলী আম, আনারস ও কাবাব তাঁর পসন্দের খাবার ছিলো। সুযোগ পেলেই এসব কিনে আনতেন।

অন্যদিকে অনাড়ম্বর জীবন-যাপনে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন। আগেই বলেছি, আভিজাত্য বা বিলাসিতার প্রতি তাঁর সামান্য মোহও ছিলো না। আমাদের ঘরে আসবাবপত্র তেমন এখনও নেই, আগেও ছিলো না। সত্যিকথা বলতে কি, আমার মাঝে মাঝে সাধ জাগতো আসবাবপত্র করবার। কিন্তু তা প্রকাশ করা হতো না বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই। সংসার চালাতেই আমাদের বেশ কষ্ট হতো। এ অবস্থায় আসবাবপত্রের কথা তোলবার অবকাশ কোথায়? অবশ্য ঘরে যথেষ্ট আসবাবপত্র ছিল না বলে তিনি কখনো দুঃখবোধ করেছেন, এমন মনে হয় নি।

ঢাকায় খুব সুন্দর একটি বাড়ীর স্বপ্ন ছিলো তাঁর। তিনি বলতেন, এমন একটি বাড়ী বানাবেন, যে বাড়ীর সামনে থাকবে পুকুর, থাকবে চমৎকার একটি বাগান। কিন্তু তাঁর

www.pathagar.com

সে স্বপ্ন বাস্তবে রূপ পায়নি। ঢাকায় জমি কিনবার মত সামর্থ্য তাঁর ছিলো না। তবুও হয়তো পারতেন, ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে জমি কিনতে, পারতেন বাড়ী বানাতে। কিন্তু তাঁর ধর্মপ্রাণ মানস এতে সায় দেয় নি। ইসলামী মূল্যবোধ তিনি পরিহার করতে পারেন নি। ব্যাংকের ঋণ নিলে সুদ দিতে হবে। সুদ তো ইসলামে হারাম। সুতরাং তিনি এ পথে পা বাড়ান নি। এ জন্য তাঁর কোনো আক্ষেপও ছিলো না। কারণ তিনি ধর্মের ব্যাপারে ছিলেন নিরাপোস। ধর্মীয় বিধি-বিধান তিনি নিজে যেমন অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন, পরিবারের অন্যদেরও সেদিকে অনুপ্রাণিত করতেন।

আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন আমার বয়স মাত্র ষোল। আমরা গ্রামেই থাকতাম। সম্পর্কে কবি ছিলেন আমার খালাতো ভাই। সে কারণেই তাঁকে চিনতাম ছোটবেলা থেকেই। তিনি কবিতা লিখতেন, তাও জানতাম। আমাদের বাড়ীতে তাঁকে নিয়ে আলোচনা হতো। অবশ্য বিয়ের আগে তাঁর কবিতা পড়বার সৌভাগ্য আমার হয় নি। গ্রামে থাকতাম, তাই সাহিত্যের সঙ্গে খুব পরিচয়ও ছিলো না আমার। তবে রবীন্দ্রনাথ, প্রভাত মুখোপাধ্যায় ও শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখের রচনার সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত ছিলাম।

তাঁর জীবনের সঙ্গে আমার জীবন বাঁধা পড়ে যাবে, এমন কথা শৈশবে কখনও ভেবেছি বলে মনে পড়ে না। কিন্তু, আল্লাহ্‌র কি অসীম কৃপা, তাঁর সঙ্গে আমার বিয়ে হলো! আমাদের বিয়ের ব্যাপারে আমার নানা মৌলভী মোহাম্মদ হুরমাতুল্লার উৎসাহই ছিলো সবচেয়ে বেশী।

কবি আমার চাইতে বছর আটেকের বড় হবেন। আমাদের যখন বিয়ে হয়, তখন তিনি লেখাপড়া শেষ করে ফেলেছেন, কিন্তু চাকুরী হয়নি তখনও। একজন বেকারের সঙ্গে আমার বিয়েতে মুরব্বীরা কেউই কোন আপত্তি করেন নি। তাঁদের হয়তো বিশ্বাস ছিলো যে, অচিরেই ফর্‌রুখ চাকুরী পেয়ে যাবে। তাঁদের বিশ্বাস মিথ্যা হয়নি। তিনি অচিরেই কলকাতায় সিভিল সাপ্লাই অফিসে একটা চাকুরী পেয়ে যান। চাকুরী পাবার কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আমাকে কলকাতায় নিয়ে যান।

১৯৪৯ সাল পর্যন্ত কবি কলকাতায় ছিলেন। কিন্তু, তখন সেখানকার পরিস্থিতি ছিলো গোলযোগপূর্ণ। এই অবস্থায় তিনি আব্বার (সৈয়দ মোহাম্মদ নূরুল হুদা) সাথে আমাদের দেশের বাড়ী চলে আসেন। পরে ঢাকায় এসে কবি বেনজীর আহমদের আগামসি লেনস্থ বাসায় ওঠেন। সেখানে কিছুদিন থাকার পর কমলাপুরে তিনি একটি বাসা ভাড়া নেন। সে বাসায় তিনি আমাদেরও নিয়ে আসেন। কমলাপুরের বাসায় আমরা একনাগাড়ে বারো বছরের মত ছিলাম। পরে বছর খানেক ছিলাম সাহিত্যিক- সাংবাদিক চৌধুরী শামসুর রহমান সাহেবের শান্তিনগরের বাসায়। তারপর মালিবাগে। কবির সাথে

www.pathagar.com

সর্বশেষে ইসকাটন গার্ডেনস্থ কলোনীতে থাকি। এ বাসাতেই কবি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন।

একটা কথা বিশেষ করে বলতে হয়। কবি হিসাব-নিকাশের কোন ধার না ধারলেও সংসারবিমুখ ছিলেন না। পিতা হিসাবে তিনি ছিলেন দায়িত্বশীল। ছেলেমেয়েদের প্রতি কর্তব্যপালনে বিন্দুমাত্র অমনোযোগী ছিলেন না। ছেলেমেয়েদের লেখা-পড়ার ব্যাপারেও ছিলেন খুবই যত্নশীল। সংসারী তিনি যতটা ছিলেন, তার চেয়ে বেশী ছিলেন ছেলে-মেয়ের শিক্ষার ব্যাপারে মনোযোগী। ছেলেমেয়েরা পরীক্ষায় ভালো ফল করলে তিনি ভীষণ খুশী হ'তেন। আনন্দে তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করত।

আর তিনি আনন্দিত হ'তেন যখন একটি কবিতা লেখা শেষ করতেন। কবিতা ও কবিতার বই প্রকাশিত হ'লে তিনি আনন্দে বিহ্বল হ'য়ে উঠতেন।

ইন্তেকালের পূর্বে তাঁর জ্বর হ'য়েছিল। যৌবনে তাঁর তেমন অসুখ-বিসুখ হ'ত না। কিন্তু শেষদিকে তাঁর ডিসেন্ট্রি হয় এবং শরীর ভেঙে পড়ে। বড় মেয়েটির মৃত্যুর পরে তাঁর শরীর আরও ভেঙে যায়। শেষের বার যখন জ্বর হ'ল, জ্বর আর ছাড়লো না। এতে তিনি ভীষণ দুর্বল হয়ে পড়লেন এবং শেষ পর্যন্ত শয্যাশায়ী হ'য়ে পড়লেন। সত্য কথা বলতে কি, তাঁর উপযুক্ত চিকিৎসা করা সম্ভব হয় নি। এই অসুস্থতা তিনি আর কাটিয়ে উঠতে পারলেন না। ১৯৭৪-এর ১৯শে অক্‌টোবরে তিনি আমাদের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

কামরুল হাসান

ফর্‌রুখ ভাই

আজ কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নেই। প্রায় সকলের চোখের অন্তরালে থেকেই তিনি চিরঅমরত্বের লীলাভূমিতে চলে গেলেন, চলে গেলেন বিনা নোটিশেই। কবি ফর্‌রুখ আহমদ বাংলাদেশের সাহিত্যিক জগতে যেমন ছিলেন একক এবং অদ্বিতীয়, তেমনি ছিলেন বিতর্কের উজানে শক্ত পেশীবহুল বৈঠা মেরে নৌকা বেয়ে যাওয়ার নাইয়া।

ফর্‌রুখ আহমদের সাহিত্য বা তাঁর বিতর্কিত আদর্শ, দর্শনের বিষয়বস্তু নিয়ে লেখা আমার উপপাদ্য নয়। আমার লেখার বিষয় যাকে নিয়ে তিনি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নন, তিনি আমার ফর্‌রুখ ভাই। এখানে আমার বলার পিছনে কারণ আছে; কারণ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর অনুজ সকলেরই ফর্‌রুখ ভাই। কিন্তু তা সাহিত্যিক-শিল্পী সমাজের সকলের কাছে।

বলা বাহুল্য, কবি ফর্‌রুখ আহমদ যখন থেকে আমার ফর্‌রুখ ভাই, তখন তিনিও কবিখ্যাতি লাভ করেন নি। কেবল খ্যাতি লাভ করাই নয়, বরং তখন তাঁর লেখার মশ্‌ক চলছে। এবং আমারও তখন শিল্পী খ্যাতিলাভ তো দূরের কথা, ক্লাসে ড্রইং পরীক্ষায় সবচেয়ে বেশী নাম্বার পাওয়ার প্রতিযোগিতার মাঝেই বিচরণক্ষেত্র। এমনতরো সময় এবং বয়সেই আমি পেয়েছিলাম ফর্‌রুখ ভাইকে। সে ১৯৩০ সালের কথা। আমি তখন শিশু ক্লাসে ভর্তি হলাম যে স্কুলে, সেটি সে সময়ের বাংলাদেশের অন্যতম এম. ই. স্কুলের মধ্যে একটি। কলকাতার তালতলা এলাকার ইউরোপিয়ান এ্যাসাইলাম লেনে এই স্কুল অবস্থিত ছিল। মডেল এন. ই. স্কুল নামে এক ডাকে সকলেই জানতো। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের মডেল স্কুল স্কীমের সেটাই ছিল শেষ সরকারী স্কুল।

বিরাট এক পুরাতন জমিদার বাড়ি নিয়ে এই স্কুল। একই বাড়িতেই ছিলো নর্মাল ট্রেনিং স্কুল। নর্মাল ট্রেনিং-এ যাঁরা আসতেন, তাঁরা তিন বছরের জন্যে আসতেন এবং তাঁরা বোর্ডিং-এ থাকতেন এবং বোর্ডিংও ছিল ঐ একই বাড়িতেই। তাও হিন্দু এবং মুসলমান ছাত্রদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা। তার মধ্যেই ফুটবল এবং বাস্কেট বল খেলার মাঠ এবং তা পুরো সিমেন্ট-এর।

নর্মাল ট্রেনিং–এর শিক্ষার্থীরা যেহেতু স্কুল সংলগ্ন বোর্ডিং-এ থাকতেন এবং যেহেতু তাঁরা মাঝে মাঝে তাঁদের প্র্যাকটিস টিচিং-এ আমাদেরকে পড়াতেন, সেহেতুই আমরা তাঁদেরকে বলতাম বোর্ডিং স্যার। সোজা হিসাব আর কি, যারা পড়াবেন তাঁদের স্যার

www.pathagar.com

বলতে হবে; অতএব যেহেতু তাঁরা বোর্ডিং থেকে পড়াতে আসেন কাজেই তাঁরা হয়ে গেলেন বোর্ডিং স্যার।

কবি ফর্‌রুখ আহমদ-এর ব্যক্তিগত সম্পর্কে যখন থেকে এসেছি, তখনকার কথা বলতে গেলে এই মডেল এম. ই. স্কুলের কথা বলা। আমার কেবল ইতিহাস রচনা বা কেবল স্মৃতিচারণই নয়, বরং ফর্‌রুখ ভাই আমার সাথে দেখা হলেই মডেল স্কুলের গল্প করতেন এবং সে যে কি অভিব্যক্তি ও অনুভূতি এবং হৃদয়ে কি আবেগ নিয়ে বলতেন, তা ভাষায় প্রকাশ করা আজ সম্ভব নয়: তবুও আমাকে লিখতে হচ্ছে এইজন্য যে, ফর্‌রুখ ভাই বারবার আমাকে বলতেন,মডেল স্কুল নিয়ে লেখ, অমন স্কুল আর হয় না। তাই তাঁর আদেশ পালন করছি।

রবীন্দ্রনাথ এই স্কুলে ছেলেবেলায় কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলেন এবং ঐ মডেল স্কুলেই এ কথা আমরা জানতে পারি, ঐ স্কুলের ছাত্র থাকতেই। কারণ ঐ স্কুলে ক্লাসে কাঠের গ্যালারী ছিল, স্লোপিং গ্যালারী। একবার কথা উঠেছিল, সরকার ঐ গ্যালারিটি নিলাম করে দেবেন। তার প্রতিবাদ-প্রচারেই আমরা জানতে পারি, এই গ্যালারীতে বসে রবীন্দ্রনাথ ছেলেবেলায় পা ঝুলিয়ে এবং মাথা দুলিয়ে বসে বসে পড়ে গেছেন এবং ঐখানে বসেই বোধ হয় তাঁর প্রথম কবিতা লেখা। এটা আমার অবশ্য তখন শিক্ষকদের কাছে শোনা, সত্যাসত্য জানি না। তবে রবীন্দ্রনাথ যে ঐ স্কুলের ছাত্র ছিলেন এবং তিনি যে ঐ গ্যালারীতে বসতেন তাতে কোন বিতর্কের অবকাশ ছিল না। কারণ তখনকার মত সেই গ্যালারী আর নিলাম হয় নি। মরহুম এ. টি. এম. মুস্তফা, জনাব আবুল খায়ের (প্রাক্তন সচিব, বাংলাদেশ বাণিজ্য মন্ত্রণালয়), শিল্প বিভাগের বর্তমান যুগ্ম সচিব জনাব নূরুজ্জামান, কবি হাবীবুর রহমান, বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের ডিরেকটর ডঃ নাজিমুদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ ব্যাংক-এর কবীর সাহেব, শহীদ শহীদুল্লাহ্ কায়সার, খুলনা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আবুল হাশেম প্রমুখ—এঁরা সকলেই সেই মডেল এম. ই. স্কুলের ছাত্র। আমার বড় ভাই জনাব-আবুল হাসনাত প্রথমেই ঐ স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন প্রায় চার বছর পূর্বে। আমি ঢুকলাম ১৯৩১ সালে। সে সময় কে. জি. ক্লাস বলে কোন কিছু ছিল না। তার জায়গায় বলা হত ইনফ্যান্ট ক্লাস। সেই বাচ্চা বয়সে সাথী হিসাবে পেলাম ফর্‌রুখ ভাইয়ের ছোট ভাই মুশীর আহমদকে। সে আর একটি চরিত্র। শরৎচন্দ্রের ইন্দ্রনাথের জীবন্ত সংস্করণ। ফর্‌রুখ ভাইয়ের মতই একরোখা, তবে লেখাপড়া কিছুই করে নি—ঐ মডেল স্কুল পর্যন্তই ইতি। কিন্তু কেন জানি না, আমার সঙ্গ সে ছাড়ে নি। কলকাতার আর্ট স্কুলেও আমার পিছু পিছু এক বছর পরে ভর্তি হয়েছিল। মাত্র এক বছরই ছিল।

পরবর্তীকালে ঢাকা কলাভবনে মডেল হিসাবে বহুদিন লাইফ ক্লাসে সে সিটিং দিয়েছিল। মুশীর আমার সহপাঠী এবং আমার বড় ভাই ফর্‌রুখ ভাইয়ের সহপাঠী।

www.pathagar.com

অতএব খুব সহজেই অগ্রজ এবং অনুজের সম্পর্ক গড়ে উঠলো। আমাদের স্কুলের বকুলতলায় আমি আর মুশীর গুলি খেলছি, ফর্‌রুখ ভাই এসে বললেন, "কিরে, তুই নাকি হাসনাতের ভাই?" মুখ তুলে বললাম, "হ্যাঁ।" সেই থেকেই ১৯৭৪ সালের আগস্ট মাস পর্যন্ত তুই সম্বোধনেই স্নেহের ডাক দিয়ে গেছেন।

ফর্‌রুখ ভাইরা তিন ভাই ছিলেন। তাঁর বড়ভাই সিদ্দীক আহমদ। তিনি আজও ফরিদপুরে বসবাস করছেন। সিদ্দীক ভাইয়েরই ছেলে শহীদ সূফী। মোনেম-বিরোধী আন্দোলনে ১৯৬৭ সালে সে নিহত হয়। তার স্মৃতিস্তম্ভ আজ ফরিদপুর শহরে রয়েছে। ফর্‌রুখ ভাই ছিলেন ইসলাম এবং শরীয়াতের গোঁড়া অনুসারী এবং তা এতো গোঁড়া এবং অন্ধ যে, আমৃত্যু তিনি তাকে যুক্তি-তর্কের বাইরেই রেখে গেলেন। তিনি পাকিস্তানী আদর্শের একজন পর্বতকঠিন স্তম্ভ। কিন্তু তাও তাঁর আপন দর্শনে রচিত পর্বত, যে পর্বতের ধারে-কাছে পাকিস্তানের কোন জাঁদরেল শাসকই ঘেঁষতে পারে নি। আপন বিবেকের দিকে দৃষ্টি রেখে বলতেই হবে, আপত্তি সত্ত্বেও পাকিস্তান আমলের বহু কিছু আমরা মেনে নিয়েছিলাম। আমরা যারা ১৯৭১ সালের সংগ্রামে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলাম, তাদের বহুসংখ্যক মহারথীই পশ্চিম পাকিস্তানে বহুবার পাকিস্তান সরকারের আমন্ত্রণে ঘুরে এসেছিলাম। কিন্তু নীতির যুদ্ধে যে লোকটিকে আমরা চিরকাল শত্রু শিবিরের লোক বলেই চিহ্নিত করে এলাম, সেই ফর্‌রুখ ভাইকে গত তেইশ বছরের পাকিস্তানে একটি দিনের জন্যেও পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যেতে পারে নি। এটা আপনাদের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও এটাই বাস্তব ঘটনা এবং পর্বত-শিখরের মতই এমনি নিজের একান্ত মতবাদে অটল ছিলেন ফর্‌রুখ ভাই।

পরম বেদনা এবং অসহনীয় যন্ত্রণার ব্যাপার এই যে, বাংলাদেশের এতবড় একজন আদর্শের পর্বতকে বাংলার সাধারণ মানুষের চোখের আড়াল ক'রে রেখেছিল ফর্‌রুখ ভাইয়ের ধর্ম এবং শরীয়ত। পাকা সেগুন কাঠকেও যেমন ভিতরে ভিতরে উইয়ে কেটে দেয়, ফর্‌রুখ ভাইকেও তেমনি তাঁর ধর্মান্ধতার উই-এ খেয়ে শেষ করে ফেলল। বাইরে থেকে কিছুই বোঝা যায় না। অকস্মাৎ ঘর ভেঙে পড়লে দেখা যায়, সকলের অলক্ষ্যে ঘরের খুঁটিতে উই বাসা বেঁধেছিল, ফর্‌রুখ ভাই যেন ঠিক তেমনিভাবেই আমাদের সামনে থেকেই ভেঙে পড়লেন। তাঁর মৃত্যুর মাত্র আধ ঘন্টা আগে আমি তাঁর ফেলাটের নিচের ফেলাটে গায়ক আবদুল লতিফের বাসায় গিয়ে শুনলাম, আজ চারদিন ফর্‌রুখ ভাইয়ের কথা বন্ধ হয়ে গেছে। স্যালাইন দেওয়া হচ্ছে।

আমি প্রায় প্রতিদিনই লতিফের বাসার একজন আড্ডাধারী মানুষ। লতিফের স্ত্রী আমার মামাত বোন, সেই সুবাদেই ফর্‌রুখ ভাইয়েরও বোন; এবং লতিফ আমারই মত অগ্রজ-প্রতিম। লতিফ তখন শিল্পী হয়ে গিয়েছিল। আশ্চর্য, আমি কাজের ব্যস্ততার জন্যে গত এক সপ্তাহ ধরে লতিফের বাসায় যেতে পারি নি। লতিফের স্ত্রী আমাকে

www.pathagar.com

একবার অনুরোধ করল, ফর্‌রুখ ভাইকে দেখতে যাওয়ার জন্যে। খুব চিন্তায় পড়লাম। আমি ফর্‌রুখ ভাইয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়াব, তিনি আমাকে দেখতে পাবেন অথচ কথা বলতে পারবেন না, এ যন্ত্রণা তাঁর এবং আমার দু'জনেরই। বললাম, "কাল সকালে অবস্থা বুঝে আসব।" বাড়ী ফিরে জামা-কাপড় ছেড়েছি মাত্র, লতিফের ছেলে এসে সংবাদ দিল। সেই সংবাদই রাত্রের বেতারে এবং টেলিভিশনে প্রচারিত হল ঃ কবি ফর্‌রুখ আহমদ ইন্‌তিকাল করেছেন। আমাদের তথাকথিত আদর্শের বিপরীত তীরের বিরাট বটগাছটা গোড়া উপরে পড়ে গেল। ফর্‌রুখ ভাই তাঁর আদর্শ, না তাঁর একগুঁয়েমি জানি না, যার জন্যে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মানুষ হিসাবে সকলের ভ্রান্ত ধারণা নিয়েই চলে গেলেন।

অথচ ফর্‌রুখ ভাই ছিলেন সত্যিকারের নিপীড়িত আদম সন্তানদেরই অতি আপনজন। না হলে সেই পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই একজন বৃটিশ সরকারের সনদ পাওয়া পুলিশ অফিসার এবং সৈয়দ পুত্র নিজের নামের আগে 'সৈয়দ' লেখা ত্যাগ করেছিলেন? কারো নির্দেশে নয়, কোন প্রভাবশালী নেতার ভয়েও নয়। হঠাৎ এক সময় আমরা দেখলাম, ফর্‌রুখ ভাই আর সৈয়দ লেখেন না। প্রশ্ন করলাম একদিন। ফর্‌রুখ ভাইয়ের ভাষাতেই বলি, তিনি উত্তর দিলেন, "অনেক ভেবে দেখলাম, ও শালার সৈয়দের গোষ্ঠির মধ্যে থাকলে সত্যিকারের মানুষের গোষ্ঠির বাইরেই থাকতে হবে আমাকে। তোরা কি মনে করিস? ও শালার ফালতু ল্যাজটা কেটে বাদ দিয়ে দিলাম।"

ফর্‌রুখ ভাই-এর আব্বা ছিলেন পুলিশ অফিসার এবং খান বাহাদুর বা খান সাহেব ঠিক আমার স্মরণে নেই, সনদ পেয়েছিলেন। তাঁরা তখন থাকতেন পার্ক সার্কাসের ছয় নম্বর সার্কাস রোডে। একদিন দেখা গেল, ফর্‌রুখ ভাই-এর আব্বার সনদ, যেটা ঘরের দেয়ালে অতি সমাদরের সাথে কাচের ফ্রেমে ঝুলছিল, সেটা সার্কাস রোডের কালো পীচঢালা রাস্তায় ছিটকে পড়ল। কীর্তিটা ফর্‌রুখ ভাইয়ের। এ নিয়ে বহু কাণ্ড নাকি হয়েছিল। ফর্‌রুখ ভাইরা ছেলেবেলাতেই মাকে হারিয়েছিলেন। তাঁদের বাড়ীতে আর কোন দ্বিতীয় নারীর অস্তিত্ব ছিল না বলেই আমি জানি। এ নিয়ে একটা মজার ঘটনা আছে। ফর্‌রুখ ভাইয়ের ছোট ভাই মুশীর, স্বাভাবিকভাবেই মাতৃস্নেহ বঞ্চিত কিশোর বালকের মতই থাকত। একদিন আমাদের ক্লাস টিচার মুশীরের শার্টের দিকে লক্ষ্য করে বললেন, "কি ব্যাপার, তোমার জামায় বোতাম নেই কেন; বাড়ীতে কি কোন মেয়েছেলে নেই যিনি বোতামগুলো টেকে দেবেন?" মুশীরের পত্রপাঠ উত্তরদান, "না স্যার, কেউ নেই; একটা বেড়াল আছে সেটাও আবার হুলো।" এ রসিকতা নির্ঘাৎ ফর্‌রুখ ভাই-এর অবদান। ফর্‌রুখ ভাই এবং মুশীর দুজনেই অসম্ভব রকম বিড়াল-প্রিয় ছিলেন।

www.pathagar.com

'নাসির আলি কি কম? বি. কম.।' ফর্‌রুখ ভাইয়ের এ রসিকতা কত দিন কত রকমভাবে যে উপভোগ করেছি, তার লেখা-জোখা নাই। ফর্‌রুখ ভাইয়ের কথা গুছিয়ে লেখা যায় না। আপনারা হয়ত অনেকেই জানেন যে, আমি চিত্র এবং ব্যায়ামচর্চা একসাথেই চালিয়েছি এককালে—সেটাও কিন্তু ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাল। আপনারা আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, ফর্‌রুখ ভাই শুধু আমাকেই উৎসাহ দিতেন না। তিনি সত্যিই ছিলেন মাটির মানুষের কাছাকাছি। কলকাতার যাঁরা পুরাতন বাসিন্দা, তাঁরা নিশ্চয়ই খেয়াল করে থাকবেন, লোয়ার সার্কুলার রোড এবং পার্ক স্ট্রীটের চৌমাথা থেকে একটু দক্ষিণ দিকে এগিয়েই ডান হাতের ফুটপাতের উপর বাঁশের বেড়া এবং টিনের চালা দিয়ে গড়ে উঠেছিল কড়েয়া এ্যামেচার জিমনাস্টিক ক্লাব। জনাব আলি নামে একজন আধা বয়সী লোকের পরিচালনায় এই ব্যায়ামশালা চলত। বস্তির একটা অন্ধকার ঘর থেকে বড় রাস্তার উপর এই ক্লাবকে আনতে যথেষ্ট কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল এবং এর পিছনে সবটাই ছিলো ফর্‌রুখ ভাইয়ের দান। কড়েয়া এ্যামেচার জিমনাস্টিক ক্লাবের অধিকাংশ সদস্যই ছিল গরীব মুসলমান। কেউ পার্ক শো হাউস সিনেমা হলের গেট কিপার, কেউ আজাদ অফিসের দারোয়ান। এরা অদম্য উৎসাহ নিয়ে ব্যায়াম করত। অথচ সেই অনুপাতে এদের খাবার জুটতো না। দু'ছটাক দুধ বা ছোলা খাবারও পয়সা জুটত না। দিস্তা দিস্তা ডালপুরী আর চা অপরদিকে কলকাতার অন্যান্য ব্যায়ামশালায় বিরলা পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতিদিন একমণ করে দুধ সরবরাহ করা হত। অথচ ৩৮-৩৯ সালে দেখা গেল, এই কড়েয়ার গরীব ছেলেরাই নিখিল ভারত প্রতিযোগিতায় বেশীর ভাগ শীর্ষস্থানগুলি দখল করে নিয়েছে। 'এফ. আহমদ' নাম দিয়ে ফর্‌রুখ ভাইই এদের উপর মাসিক "মোহাম্মদী"তে সচিত্র প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন। এই ছিল জনতার ফর্‌রুখ ভাই।

ফর্‌রুখ ভাইরা কলকাতার শহরতলী যাদবপুরে বাড়ী করেছিলেন। ছায়া-ঢাকা, পাখী-ডাকা, প্রাণজুড়ানো গ্রাম তখন আজকের যাদবপুর। একতলা একটি ছবির মত বাড়ী। বাড়ীর নাম অলোকপুরী। নামকরণ কার, তা প্রকাশ নিষ্প্রয়োজন। এ বাড়ীর সামনেই আমগাছের নীচে সেগুন কাঠের তৈরী প্যারালাল বার। মুশীর ব্যায়াম করবে। আমি গেলেও যেন অসুবিধা না হয়। এই ছিলেন কবিতা ও সনেট লিখিয়ে ফর্‌রুখ আহমদ। অলোকপুরীর বাসিন্দার পোশাক তখন ছিলো শান্তিপুরী ধুতি এবং ফিনফিনে পাঞ্জাবী কিংবা সিল্ক টুইলের ফুলহাতা শার্ট।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের সেই তারুণ্যের জ্যোতি আজও আমার চোখে ভাসছে। যেন দাঁড়িপাল্লায় ওজন করা সমস্ত শরীরটা। পৌরুষের জৌলুস শুধু চোখে-মুখে নয়, বুকের ছাতিতেই না, সারা অঙ্গ জুড়ে। ফর্‌রুখ ভাই তখন কবি হচ্ছেন, নানাজনের মুখে আমরা দুই কিশোর শুনি, আমি আর মুশীর। কলেজে নাকি অধ্যাপকদের সাথে বাংলা

সাহিত্য নিয়ে লড়াই চলছে। ১৯৩৫/৩৬-এর কথা, হাশেম ভাই—বর্তমানে (১৯৭৪-এ) তিনি খুলনা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধ্যক্ষ, তখন ইসলামিয়া কলেজের ছাত্র। 'অভিযান' নাম দিয়ে একটি হাতে লেখা পত্রিকা তিনি বের করতেন প্রতি মাসে। মডেল স্কুলে দু'জন সহপাঠী ছিলেন—ফর্‌রুখ ভাই আর হাশেম ভাই।

কবি হাবীবুর রহমানের সনেট লেখাও বোধ হয় ফর্‌রুখ ভাইয়ের প্রভাব। ত্রিশ দশকের শেষের দিকে ভারতের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আরম্ভ। ফর্‌রুখ ভাই পাল্টে গেলেন সম্পূর্ণভাবে। পরতে লাগলেন পায়জামা-পাঞ্জাবী, আর বলতে লাগলেন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান।' কিন্তু এক সময় ফর্‌রুখ ভাই ছিলেন মার্কসপন্থী। অনেকে বিশ্বাস করেন না। সে বোধ হয় ১৯৩৫ সালের কথা। তখন স্বদেশী আন্দোলনের রেশ। আমরা কেবল এটা-ওটা শুনি আর থ্রিল অনুভব করি। এমনি একদিন মুশীর সন্ধ্যাবেলা আমাদের বেনে পুকুরের বাড়ীতে এসে, যেন সাংঘাতিক একটা ঘটনা এমনি ভাব নিয়ে, অতি গোপনে আমাকে ডেকে বলল, "জানিস ফর্‌রুখ ভাই কম্যুনিস্ট হয়ে গেছে।" কোন মতেই আমাদের উপলব্ধি করার বয়স সেটা নয়, তবে ব্যাপার বেশ ঘোরতর সেটা বুঝলাম। পুলিশের বাড়ীর ছেলে বলছে। নিশ্চয়ই কিছু শুনে বা কোন ঘটনা দেখে এসেই মুশীর আমাকে বলছিল। সেই ফর্‌রুখ তাই অন্য মানুষ হয়ে গেলেন।

পাকিস্তান হবে হবে পরিস্থিতি। কিশোর আন্দোলন হিসাবে মুকুলফৌজ তখন মুসলমান সমাজের মূলে আসন গেড়ে বসেছে। পরিচালনা করি আমি, "আজাদ"-এর মুকুলের মহফিলের সভ্য-সভ্যাদের নিয়েই মুকুল-ফৌজ। মহফিলের পরিচালক মোদাব্বের ভাই 'বাগবান' নামে চিঠি লেখেন এবং সাহিত্য বিভাগ দেখাশোনা করেন। কিন্তু ফৌজের সর্বাধিনায়ক আমি। নতুন গান চাই, একেবারে নতুন: ফর্‌রুখ ভাই আমার ভরসা। সে আমলের তাঁর দুটি গান 'সামনে চল, সামনে চল, এবং 'ওড়াও ঝাণ্ডা, খুনেরা লাল'। সে সময় মুসলিম লীগের মত অনেকে মুকুল-ফৌজকে পুরোপুরি ধর্মের খাঁচার মধ্যে পুরে ফেলতে চেয়েছিলেন। এ ব্যাপারে তখনকার মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড আমাদের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করে এবং একদিন সন্ধ্যায় পার্ক সার্কাস ময়দানে মুকুল-ফৌজের উপর মুসলিম ন্যাশনাল গার্ড সদস্যরা হামলাও করে। মুসলমানদের মধ্যে অনেকেই তখন ফর্‌রুখ ভাইকে তাদের দলের মনে করে আমার বিরুদ্ধে দাঁড় করাবার চেষ্টা চালিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁরা দ্বিতীয়বার আর ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাছে আমার এবং মুকুল-ফৌজের বিরুদ্ধে কথা বলার সাহস পান নি।

অনেক ঘটনা আজ এলোমেলোভাবে মনের জালে ধরা পড়ছে। কিন্তু মনের এই অবস্থায় গুছিয়ে তোলা সম্ভব নয়। আমি, সরদার জয়েনউদ্দীন, বন্ধুবর আবদুল গনি হাজারী, কবি হাবীবুর রহমান বলতে গেলে এক পরিবারের ছিলাম। পাকিস্তান হয়ে গেছে, আমরা সব ঢাকায় হিজরত করেছি, থাকি ৩৬ র‍্যাংকিন স্ট্রীটের মরহুম আনোয়ার

www.pathagar.com

ভাইয়ের বাসার বাইরের মহলে, টিনের ঘরগুলোর মধ্যে, দুটো ঘর নিয়ে। আমরা সকলেই তখন বেকার। তবে আজও অবাক লাগে, সেই চরম আর্থিক অনটনের সময় আমাদের মনের সমুদ্রের উচ্ছলতার জোয়ারের দোলায় সব কিছু কেমনভাবে ভুলে থাকতাম। ৩৬ নং-এর একটি ঘরে হাজারী এবং আবুল হাশেম থাকতেন। অন্য ঘরে থাকতাম আমি, সরদার জয়েন উদ্দীন এবং কবি হাবীবুর রহমান।

এটা ১৯৫০-এর গোড়ার দিকে। তখন মোটামুটি আমরা বেকারত্বের আইবুড়ো অবস্থা থেকে মুক্ত। হাবীবুর রহমান কাজ করতেন আজাদে। তাঁর ডিউটি রাতে, অতএব তিনি দিনে এসে যে চৌকিতে ঘুমাতেন, রাতে আমি আর জয়েনউদ্দীন সেই চৌকিতে ঘুমাতাম। একটি চৌকি, শোবার লোক তিনজন। ব্যবস্থা রাত এবং দিনের ভাগাভাগি। জয়েন উদ্‌দীন-এর ছিল একটি মিলিটারী কম্বল। ঘরের মাপ আট ফিট দশ ফিট। এমনি অবস্থায় একদিন রাত প্রায় এগারোটায় ফর্‌রুখ ভাই এসে উপস্থিত। আমি আর জয়েনউদ্দীন মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি। অবস্থা বুঝে ফর্‌রুখ ভাই বললেন, "তোদের চিন্তার কোন কারণ নেই। গল্প আর ঘরের মধ্যে পায়চারী করেই কাটিয়ে দেবো।" বললাম, "পায়চারী যদি করতে হয়, তাহলে আমরাও করব এবং সোজা রাস্তায় রাস্তায়।" আমাদের এই প্রস্তাব যেন ফর্‌রুখ ভাইয়ের আসল মনের দরজায় কড়া-নাড়া দিল। "অতি উত্তম প্রস্তাব দিয়েছিস রে" বলেই সে কি আনন্দোচ্ছল হাসি! "তবে আর কি, উর্দি পরে নাও। রুট মার্চে বেরিয়ে পড়ি।" ফর্‌রুখ ভাইয়ের কম্যান্ড। লুঙ্গি শার্ট আর চাদর গায়ে জড়িয়ে আমরাও প্রস্তুত। বের হয়ে পড়লাম, এ-রাস্তা ও-রাস্তা ঘুরে রাত সাড়ে বারোটা নাগাদ চা-পানের ইচ্ছা জাগলো ফর্‌রুখ ভাইয়ের।

তখনকার দিনে রাত প্রায় একটার দিকে চা পাওয়া যাবে কোথায়? শেষ অবধি সুরাহা হল, সেই আমলের ঢাকার পুরানো রেল ক্রসিং-এর কথা কল্পনা করুন। সেই জায়গাতেই পয়েন্টসম্যানদের চা-খাবার একটা ব্যবস্থা ছিল, বিশেষ করে সাইট ডিউটি যাদের তাদের জন্যেই। কোন রকম ঝুপড়ির মধ্যে এই ব্যবস্থা। তবে তার মধ্যেই মার্বেল পাথরের টেবিল। সে সময়ে রেলওয়ের এই সব কর্মচারীরা প্রায়ই অবাঙালী ছিল; বুঝতে অসুবিধা হলো না, তাদের ঝুপড়িতে মার্বেল টপ-এর টেবিল কিভাবে আসতে পারে। যাই হোক, ফর্‌রুখ ভাই পরম তৃপ্তির সাথে আমাদের নিয়ে সেখানে বসে পড়েই চায়ের অর্ডার দিলেন,"তিন কাপ মালাই চা নিয়ে এসো তো বাবা। মোরা মুসাফির মানুষ, বড়ই হালেকান হয়ে আছি।"

কলকেতিয়া মুসলমানদের কথ্য বাংলা এই ধরনের। ফর্‌রুখ ভাই আমাকে আর কলকাতার কোন মানুষ পেলে প্রায় এই ভাষাতে কথা বলে হাসির প্রস্রবণ বইয়ে দিতেন এবং অনর্গলভাবে। সেই ঢাকার পুরাতন রেলওয়ের গুমটি ঘরের কাছে বসেই রাত ফর্সা হয়ে গেল। এর মাঝে আমরা তিনজন প্রায় পঁচিশ কাপ চা খেয়েছি।

www.pathagar.com

ফজরের আজানের শব্দে ফর্‌রুখ ভাই উঠে দাঁড়ালেন। সুবেহ সাদেক। ফর্‌রুখ ভাই মসজিদের দিকে পা বাড়ালেন। বললেন, "এখান থেকেই রেডিওতে চলে যাবো।" আমরা পা বাড়ালাম র‍্যাংকিন স্ট্রীটের দিকে। ফর্‌রুখ ভাই আর আমরা আদর্শ এবং নীতির নদীর দুই তীরের মানুষ দুই দিকে চলে গেলাম সেই শিশিরভেজা প্রভাতটুকুতেই মাত্র; কিন্তু ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত দুই তীর থেকে মাঝ দরিয়ায় এসে সবার উর্ধ্বে যখনই মিলেছি, তখনই ফর্‌রুখ ভাইকে দেখেছি, শুধু বাংলারই নয়, পৃথিবীর অতি সাধারণ মানুষদেরই এক অতি আপনজন ফর্‌রুখ ভাই। আজ আমার কলম আর চলতে চাইছে না। কারণ যতই হিসেব মেলাচ্ছি, ততই দেখছি, নীতির প্রশ্নে তিনি ছিলেন সীমান্তের ওপারে পশ্চিম দিগন্তে। অন্যদিকে আত্মার আত্মীয় হিসেবে তিনি ছিলেন আমাদের হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দুতে।

www.pathagar.com

আখতার ফারূক

এক বিস্ময়কর মানুষ

ফর্‌রুখ ভাইকে স্মরণ করতে গিয়ে আজ অনেক কথাই মনে পড়ে। তাঁর সাথে পয়লা দেখা আজকের বোরহানুদ্দীন কলেজের রেস্টুরেন্টে। কলেজটিই ছিল তখন রেডিও ভবন। জনৈক কবিকে তাঁর কয়েকটি আরবী কাব্যানুবাদ সঙ্গে নিয়ে পৌঁছলাম তাঁর কাছে। তিনি ধৈর্যের সাথে শুনলেন। শুনছিলেন আর মুখে হাসি ফুটিয়ে রাখছিলেন। শোনা শেষ হলে বললেন, "আরবীকে কি ফাঁকি দিয়েছেন, তা ফারূক বলবে। কাব্যানুবাদে যে আপনি কানকে ফাঁকি দিয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। মনে রাখবেন, ছন্দের সঠিক মানদণ্ড হল সচেতন কান।" সত্যি বলতে কি, ছন্দের এ নতুন মানদণ্ড শুনে সেদিন অবাক হয়েছিলাম।

তারপর থেকে এ বিস্ময়কর মানুষটির সাথে অনেকবার মিশেছি, গল্প করেছি, চা খেয়েছি, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করেছি। এমন সদালাপী নিষ্কলুষ চরিত্রের সিংহ-হৃদয় মানুষটিকে কতই কাছ থেকে দেখেছি। যতই তাঁর সাথে বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে আলাপ করেছি, ততই অবাক হয়েছি, মুগ্ধ হয়েছি, অনুরক্ত হয়েছি। একমাত্র আল্লাহ্‌ভীতি ছাড়া এ মানুষটির অন্তরে অন্য কোন ভীতির লেশমাত্র খুঁজে পাই নি। তাঁর গোটা জীবনে তিনি এক মর্দে মুমিন-এর নিখুঁত চিত্র আঁকতে চেয়েছিলেন; তিনি নিজেই ছিলেন যেন তার মূর্ত প্রতীক। পাপের প্রতি ছিল তাঁর চরম ঘৃণা, অথচ পাপীর প্রতি ছিল তার পরম সহানুভূতি। কি করে পাপীদের পাপের অতল গহবর থেকে তুলে আনা যায়, এ নিয়ে তাঁর চিন্তা-ভাবনার অন্ত ছিল না। তাঁর দরাজ দিলের অট্টহাসি অহরহ তাঁকে সব জটিলতা ও কুটিলতার ঊর্ধ্বে বলে ঘোষণা করত। দরাজ-হস্তও ছিলেন তিনি। তাই তাঁর কাছে হাত পেতে কেউ খালি হাতে ফিরেছে বলে জানা নেই। না চাইতেও অনেক বিপন্ন ঘরে বসে তাঁর সাহায্য পেয়ে ধন্য হয়েছে এরূপ নজীরেরও অভাব নেই।

বর্তমান হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টাল সংলগ্ন রেডিও ভবনে আসার পর থেকে তাঁর আবার আসর জমত আবুল মিয়ার রেস্টুরেন্টে। বড় পেয়ার করতেন তিনি আবুল মিয়াকে। আবুল মিয়াও ছিল তাঁর জন্যে নিবেদিতপ্রাণ। আবুল মিয়া জানত, এ অজাতশত্রু কবির অশেষ বন্ধু-বান্ধবের কার কি রুচি। আসামাত্রই সে তা সরবরাহ করতে কখনও ভুল করত না। সে জানত, ভুল হলে তার সেরা খদ্দেরটি ভয়ানক বিগড়ে

www.pathagar.com

যাবে। আমরাও সেই সেরা খদ্দেরের উপ-খদ্দেররা জানতাম, খালি মুখে ফেরার জো নেই এ আসর থেকে। এও জানতাম, সেরা খদ্দেরটির মাসিক বেতনের গোটাটাই আবুল মিয়ার হিসাবে উঠে যাবে। তারপর এ প্রশ্ন তুললেও অট্টহাস্যে ফেটে পড়তেন তিনি। বলতেন, "খোদার মুল্লুক থোড়া নয়। ফকিরের কপাল পোড়া নয়।"

এ আত্মভোলা মানুষটিকেই আদর্শের প্রশ্নে দেখতাম যেন একটা নিশ্ছিদ্র সীসার প্রাচীর। জীবনে না কোথাও আপোস করেছেন, না কারো কাছে মাথা নত করেছেন। যা সত্য তা নির্ভীক কণ্ঠে বলতে কাউকে ছাড়তেন না। বাঘের মত ভয় করতো তাঁকে ওপরওয়ালারা। সামনা-সামনি তাঁদের তিনি যেভাবে এক্স-রে করতেন তাতে সবাই শিউরে উঠতেন। কখন এ লোকটা থেকে রেহাই পাবেন, সে ভাবনায় তাঁরা ইয়া-নফসী জিগির শুরু করতেন। দু'একবার রাজ-দরবারে ডেকে রাজনৈতিক কর্তাদের যে করুণ অভিজ্ঞতা জন্মেছিল, তাতে তাঁরা আর কখনও কোন ব্যাপারে তাঁকে ডাকতে সাহসী হতেন না।

একাত্তরের সামরিক পদক্ষেপের পর মাঝে মাঝে আমরা মিলতাম। তিনি একদিকে পাঞ্জাবীদের মূর্খতাজনিত বাড়াবাড়ি ও অন্যদিকে ভারতের ষড়যন্ত্রমূলক কারসাজি, দুটারই তীব্র সমালোচনা করতেন। বলতেন,"এ শয়তানীর খেসারত দু'পক্ষকেই সুদে-আসলে দিতে হবে।"

জেল থেকে বেরিয়ে তাঁর সাথে আমার শেষবারের মত দেখা হল। আলাপ চলল একাধারে তিন-চার ঘন্টা। তবু তাঁর খেয়াল নেই। ঘর থেকে স্মরণ করিয়ে দিতে হল, রাত অনেক হয়েছে। সেই সুদীর্ঘ আলোচনায় দেশ, জাতি, ধর্ম, সংস্কৃতি, সাহিত্য সব অংগনের পরিক্রমা ঘটেছিল। তিনি বললেন, 'দেখ ফারূক, আমরা বড় অপ্রয়োজনীয় কাজে মেতে উঠেছিলাম। আল্লাহ তাই আমাদের এক থাপ্পড় দিয়ে বসিয়ে দিলেন কাজের কাজ করার জন্যে। এই দেখ, আমি শিশুদের অ. আ. ক. খ. থেকে এম. এ. ক্লাস পর্যন্ত পাঠ্য বইয়ের পুরো পরিকল্পনা দাঁড় করিয়ে ফেলেছি। শুধু ইসলাম- ইসলাম শ্লোগানই চলেছে এতদিন। ইসলাম বাস্তবায়নে নিখুঁত পরিকল্পনা নেয়া হয় নি। নেবে কে? নেবেই বা কেন? পঁচিশ বছর তো শুধু মোনাফেকের রাজত্ব চলেছে। আল্লাহ মোনাফেকদের বিদায় দিয়েছেন এবার সঠিক ইসলামের অভ্যুদয় ঘটবে; তারই প্রস্তুতিপর্ব আমাদের সম্পাদন করতে হবে। সময় কম, কাজ অনেক। পুরোদমে কাজ করে যাও।"

ফর্‌রুখ ভাইয়ের সে ব্যাকুল ডাক আজও যেন কানে বাজছে।

www.pathagar.com

শামসুল হুদা চৌধুরী

আপোসহীন ফর্‌রুখ

কলকাতায় বালিগঞ্জ স্কুলে পড়ার সময় ফর্‌রুখের সাথে আমার প্রথম পরিচয় ঘটে। পরিচয়ের সূত্র ধরেই বন্ধুত্ব। ফর্‌রুখ ছিলেন দারুণ মেধাবী ছাত্র। ক্লাসে প্রায়ই প্রথম হতেন ফর্‌রুখ। তাঁর আব্বা-আম্মার ইচ্ছা ছিলো ফর্‌রুখ সিভিল সার্ভিসে যোগ দেবেন। কিন্তু তিনি শুরু থেকে এ বিরোধিতা করেছেন। এর কারণ হিসাবে তিনি সরকারী চাকুরির প্রতি তাঁর অনীহার কথাই বলতেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যখন কিশোর তখন অবিভক্ত বাংলায় মুসলিম জাগরণের কাল। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগ সরকার গঠিত হয়েছে। খেলার মাঠে তখন মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবের দোর্দণ্ড প্রতাপ; সঙ্গীত জগতে আব্বাসউদ্দীন। পত্র-পত্রিকায় মাসিক "মোহাম্মদী", "সওগাত", "বুলবুল" ও দৈনিক "আজাদ"-এর যুগ। সবকিছু মিলে তখন ছিলো বাঙালী মুসলমানের অগ্রযাত্রার কাল। আর এ যুগেই কেটেছে ফর্‌রুখের কৈশোর। তাই তাঁর ধ্যান-ধারণায় মুসলিম ঐতিহ্য, সমাজ ও রাজনীতি দাগ কেটেছিলো প্রবলভাবে।

কবি ফর্‌রুখই লিখেছিলেন "লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান"। ফর্‌রুখকে কিন্তু সাম্প্রদায়িক বলা যাবে না কোনক্রমেই। তবে সাহিত্যে-শিল্পে, ধ্যান-ধারণায় মুসলিম ঐতিহ্যকে তিনি তুলে ধরতে চেয়েছিলেন।

তিনি বলতেন, "৫০০ বছর ধরে বাংলা ভাষা উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। এই ভাষা আরবী, ফারসী, পর্তুগীজ, ফরাসী, ইংরেজী সব ভাষা থেকে শব্দ সঞ্চয় করে সমৃদ্ধ হয়েছে।" এই পটভূমিতে তিনি তাঁর কবিতায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন যা বাংলা ভাষায় বহুল প্রচলিত।

দুঃখজনক হলেও অনেকে ফর্‌রুখকে 'প্রতিক্রিয়াশীল' কবি বলে কোণঠাসা করে রাখতে চান। কিন্তু কাব্যে ও কবিতায় ফর্‌রুখ ছিলেন প্রকৃত সর্বহারাদের কবি। তিনি ছিলেন সাধারণ মানুষের কবি। তাই তাঁর কবিতায় বারবার ফুটে উঠেছে উৎপীড়িত, অত্যাচারিত মানুষের কথা। যে মানুষ গভীর মমতায় সর্বহারা শ্রেণীর কথা বলেন, তিনি কখনোই প্রতিক্রিয়াশীল হতে পারেন না, একথা আমি জোর দিয়ে বলতে পারি।

কর্মজীবনে এসে আমি ফর্‌রুখকে আমার সহকর্মী হিসাবে পেয়েছি। তাঁকে ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ আমার হয়েছিলো। নিজের জন্যে তাঁর কখনোই কিছু

www.pathagar.com

চাওয়ার ছিলো না। ইনক্রিমেন্ট কিম্বা প্রমোশন কোনো কিছুই তিনি দাবী করেন নি কখনো।

ফর্‌রুখের চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিলো অপরিসীম। প্রচণ্ড ব্যক্তিত্বশালী ছিলেন তিনি। এ ব্যাপারে একটি কথা আমার মনে দাগ কেটে আছে। সাবেক আইয়ুব আমলে আমি যখন রেডিওর পরিচালক তখন সরকারী খরচে ফর্‌রুখকে হজ্জে গমন এবং পরে তিন মাস মুসলিম দেশ ভ্রমণের আহবান জানানো হলো। আমি তাঁকে এ সংবাদ জানিয়ে মিষ্টি দাবী করলাম। ফর্‌রুখ কিছুক্ষণ নির্বিকার থেকে বললেন যে, আইয়ুব সরকারের খরচে হজ্জে যোগ দেবার ও মুসলিম বিশ্বভ্রমণের কোন ইচ্ছাই তাঁর নেই। পরে অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়েও তাঁকে রাজী করতে পারি নি।

ফর্‌রুখ ছিলেন আদর্শবাদী পুরুষ। তাঁর চিন্তা-চেতনা একই খাতে প্রবাহিত হয়েছে আজীবন। সর্বোপরি কবি ফর্‌রুখ ছিলেন ঈমানের উজ্জ্বল প্রতীক। যে কোনো মূল্যে ঈমানের দিক থেকে তিনি আজীবন থেকেছেন অবিচল। জীবনে কোনো আপোস করেন নি ফর্‌রুখ।

www.pathagar.com

আবদুল লতিফ

এমন একটি মানুষ দেখি না

ব্যক্তি হিসাবে ফর্‌রুখ ভাই আমার মতে লাখে এক অর্থাৎ আজকালকার দিনে যেমনটি একদমই দেখা যায় না। তাঁর আচার-ব্যবহার, চাল-চলন, স্পষ্টবাদিতা, সত্যভাষণ—এক কথায় বলতে গেলে সৎ মানুষ বলতে যা বোঝায় ফর্‌রুখ ভাই ছিলেন তাই। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তাই বলতেন ও করতেন। অন্য কোনো কথায় বা প্ররোচনায়, প্রলোভনে তিনি কখনো নিজের মতবাদ বিসর্জন দিতেন না। নিজের মতটাও কারো উপর চাপিয়ে দিতেন না। আমি বর্তমানে এমন একটি মানুষ দেখি না, যার ব্যক্তিত্ব বা চরিত্র ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাছাকাছি যেতে পারে। তিনি আমাকে 'শা সাহেব' বলে ডাকতেন। আদর করতেন ছোট ভাইয়ের মতো। কোনো কোনো সময় এমন বিষয়বস্তু নিয়ে আমার সঙ্গে আলাপ করতেন, যার মর্ম আমার পক্ষে তখনকার দিনে বোঝা খুবই শক্ত ছিলো।

১৯৫৩-৫৪ সালের কথা বলছি, নাজিমুদ্দীন রোডের রেডিও অফিস থেকে কমলাপুরের বাসায় ফিরতাম আমরা এক সাথে। প্রায়ই রাত দশটা-সাড়ে দশটা হতো। বর্তমান ডি. আই. টি. বিল্ডিং এবং বঙ্গভবনের মাঝখান দিয়ে জঙ্গলে ঘেরা একটি রাস্তা ছিলো। আমার মনে পড়ছে রাত্রে ওইখানে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে তিনি আমাকে প্রায়ই "হাতেম তায়ী"-এর কিছু কিছু অংশ উচ্ছ্বাসে আবেগে আবৃত্তি করে শোনাতেন। মুখস্থ বলে যেতেন, কখনও আধা ঘন্টা, কখনও তারও বেশী সময় ধরে। যখন "হাতেম তায়ী" কাব্যটি প্রকাশিত হয় এবং আমার হাতে আসে, কখন পড়তে গিয়ে দেখি যে, এর অনেক কবিতা আমি তাঁর মুখে আগেই শুনেছি এবং এই "হাতেম তায়ী"-এর কিস্‌সা আমি রেডিওতে যখন নিয়মিত প্রচার করতাম, তখন তিনি এতই খুশী হতেন যে, আমাকে বলতেন, "আজকের দিনের সমস্ত চা খরচ আমার।"

আমি ভুলতে পারছি না সেসব দিনের কথা।

আমি নিজে কিছু কিছু রবীন্দ্র, নজরুল এবং ফর্‌রুখ ভাই-এর কবিতা আবৃত্তি করতাম। জানি না, সে কারণেই কিনা, তিনি মাঝে মাঝেই আমাকে বলতেন, "শা' সাহেব, তুমি ওই কবিতাটা পড় তো, আমি শুনি।" তাঁকে আবেগ-বিহ্বল হ'তে দেখেছি মাইকেলের "মেঘনাদ বধ কাব্য" আবৃত্তি করতে করতে। রবীন্দ্রনাথের কত কবিতা যে তাঁর মুখস্থ ছিলো তা বুঝতে পারতাম তখনই যখন আমার দু'একটি কথা ভুল হলে শুধরে দিতেন।

www.pathagar.com

কেন জানি না, তিনি তাঁর অনেক গান আমাকে দিয়ে সুর করিয়েছেন। আমার দেয়া সুর অনেক নামকরা সুরকারের চেয়েও তিনি বেশী পসন্দ করতেন। তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় আমি যখন সুরারোপ করেছি, তখন দেখেছি, বক্তব্য ঠিক রেখে তাঁর কবিতার রূপ বদলে কি সুন্দর ছন্দে লিখে দিতেন। তাছাড়া তার একটি গানের কথা আমার মনে পড়ছে, "শুনেছি এ বাণী পথে ঊষার/ ঈমান, একতা, শৃঙ্খলার"-এই গানটিতে দুটি সমান অন্তরা ছিলো। রেডিওতে রেকর্ড করতে গিয়ে দেখলাম যে, আড়াই মিনিটেই গানটি শেষ হয়ে যাবে। একটু চিন্তায় পড়লাম। বাইরে বেরিয়ে দেখি আবুল মিয়ার রেস্টুরেন্টে বসে চা খাচ্ছেন ফর্‌রুখ ভাই। কথাটা বলতেই তিনি বললেন, তাহলে তো একটি স্তবক যোগ করতে হয়। বিশ্বাস করুন, ঐ গানটির নীচে তক্ষুণি তিনি লিখলেন, "চলিছে কাফেলা দূর পথের/ চোখে ছবি তার মঞ্জিলের/স্বর্ণ উজ্জ্বল সফলতার'।

ফর্‌রুখ ভাই গান লিখেছেন বিভিন্ন ধরনের। হামদ, নাত, গজল এবং আধুনিক মেজাজের গান রচনাতেও তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। ছন্দের এতই মাধুর্য ছিলো যে, চোখের সামনে ধরলেই সুর আপনি বেরিয়ে আসতো। বাচ্চাদের জন্যেও তিনি অনেক গান লিখেছেন। তাঁর দু'একটি নমুনা স্বরূপ উল্লেখ করা যায় ঃ

১. তোরা চাসনে কিছু কারো কাছে খোদার মদদ ছাড়া;

২. ডালে ডালে পাখির বাসা
মিষ্টি মধুর পাখির ভাষা
সাত সাগরে নদীর বাসা
কুলুকুলু নদীর ভাষা ।
হাজার সুরে হাজার ভাষায়
এ দুনিয়া ঘেরা
আর মাতৃভাষা বাংলা আমার
সকল ভাষার সেরা।

৩. দেশ-বিদেশের ভাই-বোনেরা
শোন কান পেতে আজ ধীর
জেহাদ হবে এই আশাতে
বাঁশের কেল্লা গড়েন তিতুমীর।

আপনারা জানেন ১৯৫৩ সালে 'ওরা আমার মুখের কথা কাইড়া নিতে চায়" এই গানটি আমি লিখি। কমলাপুরে বসেই। আমি বুঝতে পারছিলাম না, গানটি আসলেই কোনো গান হয়েছে কিনা, তাই এদেশের একজন বিখ্যাত কবিকে গানটি পড়ে

www.pathagar.com

শোনালাম। বর্তমানে তিনি মরহুম। তিনি বললেন,'গান বলিস কি রে, এটা আসলে কিছুই হয়নি।'

এ কথায় মন খারাপ করে বাড়িতে আসার পর আমার স্ত্রী আমাকে বললেন যে, "তুমি বরং গানটা ফর্‌রুখ ভাইকে দেখাও।" আমিও তাই করলাম। অবশ্যই অনেক ভেবে-চিন্তে ও ভয়ে গানটি তাঁকে পড়ে শোনালাম। যখন পড়া শেষ হলো, তখন দেখলাম ফর্‌রুখ ভাইয়ের চোখে পানি। আমাকে জড়িয়ে ধরে বললেন, "ওরে, আমি বলে দিলাম, এই গানের জন্যেই তুই অমর হয়ে থাকবি।"

দু একটি বিশেষ কথা বলে আমার বক্তব্য শেষ করবো। তাঁর মতবাদে যাঁরা বিশ্বাস করতেন না, তাঁরা ইচ্ছায় হোক কিংবা অনিচ্ছায় হোক তাঁর কবিসত্তাকেও অস্বীকার করেছেন। নানা রকম অশ্লীল ভাষায় তাঁকে যা-তা গালাগালি করতে তাঁদের আমি দেখেছি, তাঁর মৃত্যুর পর তাঁরাই এসে কুম্ভীরাশ্রু বর্ষণ করেছেন, লোক-দেখানো শোক প্রকাশ করেছেন। আজকাল অনেকেই ফররুখ আহ্‌মদের স্মরণসভায় তাঁর প্রশংসা করতে উপস্থিত হন। ফর্‌রুখ ভাই যেদিন মারা গেলেন, সেদিন আমি ঢাকার বাইরে ছিলাম। ফিরে এসে আমার স্ত্রীর কাছে শুনলাম যে, ফর্‌রুখ ভাইয়ের লাশ ঢাকা হয়েছিলো আমারই একখানা চাদর দিয়ে। অর্থাৎ লাশ-ঢাকার মতো একখানা চাদরও তার ঘরে ছিলো না। ফর্‌রুখ ভাইয়ের কবরের জায়গা দিয়েছিলেন এদেশের বিখ্যাত বিপ্লবী কবি বেনজীর আহমদ। অন্যথায় আমরা কোথায় কি ভাবে ফর্‌রুখ ভাইয়ের লাশ দাফন করতাম জানি না। আজ তাঁর পবিত্র আত্মার শান্তি কামনা করছি।

www.pathagar.com

আবদুল হালিম চৌধুরী

ফর্‌রুখের গান

উনিশ'শ তেতাল্লিশে ফর্‌রুখ ভাইয়ের সাথে আমার প্রথম পরিচয় তৎকালীন সং পাবলিসিটি অফিসে—কলকাতায়। সেখানে তখন কবি জসীম উদ্দীন ও শিল্পী আব্বাসউদ্দীন বিভিন্ন দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী ও এক থান চাদর তখন ফর্‌রুখ ভাইয়ের পরনে শোভা পেত।

এরপর দেশ বিভাগের পর আমিও ফর্‌রুখ ভাইয়ের মতই ঢাকা রেডিও-তে যোগ দিই।

ঢাকা বেতারের অবস্থা তখন খুবই করুণ। শিল্পী ও গীতিকারের অভাব। তারপরে রেকর্ডের কোন ব্যবস্থা ছিল না। সব অনুষ্ঠানই Life Programme করতে হত। যার জন্যে অসুবিধাটা একটু বেশীই হত।

কর্তৃপক্ষের নির্দেশ—শিল্পীদের নতুন গান শিখিয়ে দিতে হবে। এ-সময় ফর্‌রুখ আহমদ, সায়ীদ সিদ্দিকী, আজিজুর রহমান, কাজী গোলাম আকবর, আনিসুল হক চৌধুরী, মোদাসসের আলী রচিত গানে আমরা সুর দিলাম, গাইলাম।

আমার সহকর্মী আবদুল আহাদ ও আমি ফর্‌রুখ ভাইয়ের অনেক গানে সুর দিই। সেসব গান তখন অনেক জনপ্রিয়তাও লাভ করেছিল। মনে পড়ে, আমি সুর দিয়েছিলাম ফর্‌রুখ ভাইয়ের লেখা 'আল্লাহ্‌র দেয়া বিশ্ববিধান ইসলামী শরীয়ত' ও আরো অনেক কওমী গানে।

তাঁর লেখা অনেক আধুনিক গানেও সুর দিয়েছি। তার একটি হল 'চাঁদ ছিল জেগে রাতের মিনারে প্রভাতের কিনারায়'। গানটি খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল, আমি এটি গান শেখাবার আসরে এক সময়ে শিখিয়েছিলাম।

তখন যাঁরা আমাদের দেয়া সুরে ফর্‌রুখ ভাইয়ের গান গেয়েছেন, তাঁদের মধ্যে যাঁদের কথা এ মুহূর্তে মনে পড়ছে তাঁরা হলেন শামসুন্নাহার করীম, মাহবুবা রহমান, আবদুল লতিফ, নীরু শামসুন্নাহার।

বায়ান্নের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষিতে গাইলাম ফর্‌রুখ ভাইয়ের লেখা 'মধুর চেয়ে মধুর যে ভাই আমার দেশের ভাষা'। ফর্‌রুখ ভাইয়ের সামনে বসে হয়ত তাঁর কোন

www.pathagar.com

গানে সুর দিতে বসেছি—সুর ও কথায় আত্মীয়তা জমে উঠেছে অর্থাৎ দু'টোর খাপ খেয়েছে সুষ্ঠুভাবে, অমনি ফর্‌রুখ ভাই শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছেন।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের গানের আরো দু'একটির সামান্য উদাহরণ না দিয়ে পারছি না এ কারণে যে, ফর্‌রুখ ভাইয়ের অনেক গান তখন শ্রোতাদের মনে দাগ কেটেছিল, অথচ আজ সেসব গানের কোন খোঁজই নেই। কিছু কিছু হয়ত সেকালের কণ্ঠশিল্পীদের ব্যক্তিগত সংগ্রহে রয়েছে। সেগুলো সংগ্রহ করে সুর ও বাণী ধরে রাখতে না পারলে সঙ্গীতের ক্ষেত্রে আমরা যে ক্ষতিগ্রস্ত হব, এটুকু বুঝবারও হয়ত সময় খুব বেশী থাকবে না।

একটি নাতে রসূল (সঃ)-এর কথা মনে পড়ছে। এই সেদিনও মঞ্চে গেয়েছি,--'দ্বীন-দুনিয়ার সাথী আমার নূরনবী হযরত'।

আল্লামা ইকবালের বেশ কিছু গান ও গজল ফর্‌রুখ ভাই তর্জমা করেছিলেন। তার একটির প্রথম দু-চরণ হ'ল এ রকম-'মোর প্রেমও ভীরু নহে সে ডরে না সমনে/ খঞ্জর তলওয়ারে তৃণসম সে গণে।'

সঙ্গীত সম্পর্কে ফর্‌রুখ ভাইয়ের ভাল জ্ঞান ছিল। এ বিষয়ে পড়াশোনা করতেন। ফর্‌রুখ ভাই ক্লাসিক্যাল মিউজিকের সাথে আরবীয় সুর মিশিয়ে নতুন সুর সৃষ্টিতে উৎসাহী ছিলেন। গজলের খুব সমঝদার ছিলেন তিনি।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাছে মরহুম আবদুল গণি হাজারীসহ অনেক কবি-সাহিত্যিককে ভীড় জমাতে দেখেছি। আজকের কবি-সমালোচক মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ্‌উল্লাহ তখন অল্পবয়সী; তাঁকেও অনেক সময়ে ফর্‌রুখ ভাইয়ের পাশে বসে থাকতে দেখেছি।

কাজী নজরুল ইসলামের সংস্পর্শে আসার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। ফর্‌রুখ ভাইয়ের চলবার সময় কথা বলবার সময় বারবার কাজীদার সেই পঙক্তিটি আমার স্মরণে এসেছে--"চির উন্নত মম শির।" কাজীদার মত ফর্‌রুখ ভাইও জর্দা-পান খেতেন। জাগতিক দুঃখ-বেদনা থাকা সত্ত্বেও শিশুর মত উচ্ছ্বসিত হয়ে আনন্দের হাসি হাসতেন।

এক আল্লাহ্‌ ছাড়া আর কারো কাছে ফর্‌রুখ ভাই একটুও নত হন নি। ভাবতে অবাক লাগে, এই ফর্‌রুখ ভাইয়ের মনের অপর পিঠটি ছিল মমতায় ভরা।

দেখেছি, কেউ অভাব-অভিযোগের কথা জানালে ফর্‌রুখ ভাই যদ্দুর সম্ভব তার একটা প্রতিকারের ব্যবস্থা করতেন। শিল্পীদের প্রতি ফর্‌রুখ ভাইয়ের দরদের সীমা ছিল না। তখনকার দিনে কোন কোন অফিসার শিল্পীদেরকে দু'চারটি কটু কথা না বলে পারতেন না—ফর্‌রুখ ভাই জানলে তার একটা কড়া জবাব অন্তত হত।

www.pathagar.com

আশরাফ সিদ্দিকী

সাহিত্যপ্রেমিক ফর্‌রুখ

ফর্‌রুখ আহমদের সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় ১৯৪৪-এ নিতান্ত ঘরোয়া পরিবেশে। হাতে তৈরী টিটাগড়ের একরূপ অমসৃণ কাগজে মুদ্রিত হ'ল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি"—কবি বেনজীর আহমদের অর্থানুকূল্যে। সেই গ্রন্থের একটি কপি তিনি দিতে এসেছিলেন ৩৯ সৈয়দ আমীর আলী এভিনিউতে (পার্ক সার্কাস, কলকাতা) তদানীন্তন তরুণ মুসলিম ছাত্র আন্দোলনের অন্যতম নেতা ও প্রেসিডেন্সী কলেজের একদা সাহিত্য-বার্ষিকী এবং "রূপায়ণ" পত্রিকার সম্পাদক জনাব আবু সাঈদ চৌধুরীকে। পরিধানে ছিল তাঁর পাজামা এবং শেরোয়ানী। চা খেলেন। চা শেষে চেয়ে পান খেলেন। নামাযের সময় হয়েছিল, মাগরিবের নামাযও আদায় করলেন। কবি কামাল চৌধুরীকে (প্রাক্তন মন্ত্রী ডঃ মফিজ চৌধুরীর ভ্রাতা) দিয়ে একটি সমালোচনারও অনুরোধ জানিয়ে গেলেন কোন সাময়িকীতে।

কিছুদিন পরই একদিন সন্ধ্যায় আবার দেখা "আজাদ"-এর বার্তা সম্পাদক জনাব মোহাম্মদ মোদাব্বেরের (বাগবান) কক্ষে, ৮৬-এ লোয়ার সার্কুলার রোডে। চা খেলেন, পান খেলেন। কবিকে খুব যেন উচ্ছ্বাস-প্রবণ মনে হ'ল। জানলাম, তখনও থাকেন তিনি তাঁর বাবার তৈরী যাদবপুরের নিভৃত সেই অলোকপুরীতে, সেখান থেকেই কলকাতা আসেন কার্যোপলক্ষে। এরি মধ্যে সম্ভবত এপ্রিল-মে মাসে (১৯৪৫) কলকাতা বেড়াতে গিয়ে শুনলাম আমাদের প্রিয় কবি ফর্‌রুখ মাসিক "মোহাম্মদী"র ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক বা একটিনি হয়েছেন। "আজাদ"-এর বার্তা সম্পাদক মোদাব্বের সাহেবের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে ফর্‌রুখের সাথেও দেখা করে এলাম। দোতলার দক্ষিণ দিকের রুমে স্মোকী-গ্লাসের অর্ধ-দরজাওয়ালা রুমে পায়জামা-পাঞ্জাবী পরিহিত কবি মাসিক "মোহাম্মদী"-র সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত। চা আর পান খান বিস্তর—সিগারেট ছোঁন্ না (কোনদিন সম্ভবত ছোঁন্ নি)। আমার হাতে কিছু কবিতা ছিল—দিলাম, পড়লেন। একবার-দু'বার।

—আচ্ছা—ঠিক আছে—আস্তে আস্তে যাবে। যাবে—যাবে—"মোহাম্মদী"তে। শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে নানা কথা-বিশেষ করে আদমউদ্দীন আহমদ, পুঁথি-সাহিত্যের কলেক্‌শন কেমন, কি ভাবে পড়াশোনা হয়, গাছের নীচে পড়তে অসুবিধা হয় কিনা, বৃষ্টি এলে কি করতে হয়—ইত্যাদি নানা কথা জিজ্ঞেস করলেন বলে মনে পড়ে।

www.pathagar.com

তাঁর সেদিন খুব জলি-মুড্‌ বলেই যেন মনে হ'ল। আমি বললাম,"বৃষ্টিতে খুব অসুবিধা হয় না, কিন্তু ঘন পত্রশোভিত বৃক্ষরাজির উপরে অবোধ পক্ষীকুল মধ্যে মধ্যে বড় উৎপাত করে—এতে করে শুভ্রবসনা আমাদের মহিলাদের বড় বেকায়দায় পড়তে হয়।"

হো-হো করে দরাজ হাসি হেসে উঠলেন ফর্‌রুখ। "তাই তো—পক্ষীকুল বড় বেরসিক দেখি—কবির শান্তিনিকেতনের শান্তিভঙ্গের দূত! যেতে হ'বে ত' একবার! হঁ—হাঁ নিশ্চয়ই যাবো একবার বুড়োর (রবীন্দ্রনাথ) শান্তিনিকেতন দেখতে। কামরুল (শিল্পী কামরুল হাসান) আর হাবীবও (কবি হাবীবুর রহমান) যাবে—জায়গা ঠিক করে রাখবেন। আর হ্যাঁ-ওখান থেকে মোফাজ্জল হায়দার নামে একজনও মধ্যে মধ্যে কবিতা পাঠান।"

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, 'কাঁঠালী চাঁপা' শীর্ষক হায়দারের একটি কবিতাও কিন্তু একবার মাসিক "মোহাম্মদী"তে প্রকাশিত হয়।

শান্তিনিকেতন থেকে একবার পত্র দিলাম। কামরুল ভাই ও হাবীবুরকে নিয়ে আসছে বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসবে আসার জন্যে।

পত্রোত্তর এলো একটু দেরীতে। মাসিক "মোহাম্মদী"র মুদ্রিত প্যাডে ঃ খাড়া খাড়া বড় বড় হাতের লেখা। নাম সইটি আরবী কায়দায় লেখা-দেখার মত!

Masik Mohammadi (Illustrated Monthly) Journal,
86A, Lower Circular Road,
Gram: Daily Azad, Calcutta,
Phone:465,466
৩১-৭-৪৫

তসলিম বাদ আরজ,

আপনার চিঠি পেয়েছি। ঈদ-সংখ্যা 'আজাদ' সম্পাদনা করছেন এবনে খল্‌দুনের লেখক আবদুল হাই সাহেব। নতুন লেখকদের সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সজাগ এবং সহানুভূতিশীল। তবুও আপনার লেখার জন্যে আমি বিশেষভাবে তাঁকে বলব। কাজের চাপে খুব ব্যস্ত আছি, শান্তিনিকেতনে যাওয়া হয়তো সম্ভব হবে না। আদমউদ্দীন সাহেবকে আমার সালাম দেবেন। তাঁর পুঁথিসাহিত্যের ইতিহাস ইতিমধ্যেই সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

ইতি—
আপনাদের
ফর্‌রুখ আহমদ

এই পত্রে সহজ সরল স্নেহশীল মনটির দর্শন পাওয়া যাচ্ছে, ব্যক্তি ফর্‌রুখও ছিলেন ঠিক তেমনি। আমরা যারা নতুন এসেছিলাম, তখন এতটুকু ভণিতা বা ফর্মালিটি না

www.pathagar.com

দেখিয়ে তিনি সকলকেই অকৃত্রিম অবারিত স্নেহডোরে বেঁধে ফেলেছেন। প্রথমে 'আপনি', তারপর 'তুমি' এবং পরিশেষে একদম 'তুই'। তাঁর কাছেই গল্প শুনেছিলাম, একবার এক সাহিত্য-যশোপ্রার্থী হবু কবি তাঁর কবিতা ছাপার জন্যে ব্যস্ত। কিন্তু সে কবিতা পত্রস্থ করা যায় না। অগত্যা নিজেই নাকি কবিতা লিখে তার নামে ছাপিয়ে তাকে তৃপ্ত করতে হয়েছিল। একেই বলে সম্পাদকের বিড়ম্বনা! প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মাসিক "মোহাম্মদী"-এর মুদ্রিত পৃষ্ঠার শূন্যস্থান পূরণের জন্যে 'ফ' নামেও এই সময় তাঁকে ছোট ছোট কবিতা লিখতে হ'ত। সম্পাদক হিসাবে, যতদূর শুনেছি, কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন। নতুন শিল্পী সাহিত্যিকদের প্রতি পূর্বেই বলেছি, ছিল তাঁর অকৃত্রিম দরদ। তিনি নিজেই বারবার বলেছেন, যাঁরা নতুন এসেছেন তাঁদের প্রতিষ্ঠা করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব। চিঠিপত্রেও এ-সব কথা বলেছেন। আমার যতদূর মনে পড়ে, কবি সিকান্‌দার আবু জাফর প্রভৃতি অনেককে তিনি তাড়া দিয়ে লেখা এবং জয়নুল আবেদীন, সফীউদ্দীন ও কামরুল হাসানের কাছ থেকে ছবি আদায় করেছেন। সিকান্‌দার আবু জাফরের এই সময়ে "মোহাম্মদী"তে প্রকাশিত অনবদ্য কবিতাগুলো আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করেছিল। লেখক হিসাবে আবু রুশদ, শওকত ওসমান, কাজী আফসার উদ্দীন, আহসান হাবীব এঁদের সকলের প্রতিই আমি তাঁর সশ্রদ্ধ ভালোবাসা লক্ষ্য করেছি। তিনি বারবার আমাদের বলেছেন, শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, আফসারউদ্দীনের মত মননশীল লেখা লিখুন। এঁদের সাহিত্যকর্মের প্রচার করুন তরুণ সমাজে। কিন্তু নিজের কাব্য-কলার কথা কখনো ঘুণাক্ষরেও বলতে শুনেছি বলে মনে পড়ে না।

দুঃখের বিষয়, মাসিক "মোহাম্মদী"তে তাঁর চাকুরীকাল দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। কেন হয় নাই সে অন্য প্রসঙ্গ।

১৯৪৮-এ ঢাকা এসে ফর্‌রুখ-এর সঙ্গে দেখা হল নাজিমুদ্দীন রোডের সেকালের বেতার ভবনের সামনে আবুল মিয়ার চায়ের দোকানে। দেখা হতেই তাঁর সহজ স্নেহপ্রবণ উল্লাসে বললেন—"আ-রে এসে গেছিস্! তোর 'তালেব মাস্টার' পড়েছি। লেখ—লেখ আরও লেখ্। কবিতাটা ভালো হয়েছে। তা' কি করবি—কোথায় আছিস ?"

বললাম, "আছি আমার মামাতো ভাই আবু সাঈদ চৌধুরীর বাসায়, রোজেন্ডেলে, ১০৩ ময়মনসিংহ রোডে। অনার্স পরীক্ষার ফল বের হ'লে সম্ভবত হোস্টেলে যাবো। পরীক্ষার ফল বের হ'ল—সলিমুল্লাহ হলের বাসিন্দা হলাম আর দেখা হ'তে লাগলো পুরোনো বেতার ভবনে অথবা আবুল মিয়ার চায়ের দোকানে। সে সময়ে ফর্‌রুখ ভাইকে কিছু জানাতে হ'লে বা তাঁর খবর নিতে হ'লে আবুল মিয়া ছিল নির্ভরযোগ্য অবধায়ক। কাব্যালোচনায় উচ্ছল হয়েছেন নবীন থেকে প্রবীণ সকলের সঙ্গেই, কবিতা

www.pathagar.com

আবৃত্তি করেছেন—দরাজ কণ্ঠে চায়ের দোকানে, বাসায় বা বেতার তরঙ্গে। লিখতেন যত্র-তত্র বসে, এতটুকু গরিমা বা অহঙ্কার নেই। বাহবা দিয়েছেন অন্যকে, কিন্তু নিজে নেন নি। পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত, কখনো ঘাড়ের উপর একটি সাধারণ আচকান—সামনে ঝুঁকে দ্রুতপায়ে হেঁটে চলেছেন কখনো, মুখে পান, চুনের বোটাটি কখনো ডান হাতের তর্জনীর ফাঁকে ধরা। উচিত বক্তা, কিন্তু তাঁর প্রতিপক্ষকেও চা পানের আহ্বানে মুক্তপ্রাণ। অগোচরে নিন্দা নয়–যাকে যা বলার মুখের উপরে বলেছেন–তা সে খুশীই হোক আর বেজারই হোক; শুধু বলা নয়, কবিতা বা গানের ব্যঙ্গের চাবুকেও জর্জরিত করেছেন। যার জন্যে কিছু কিছু প্রগতিশীল সাহিত্যব্রতী তাঁর প্রতি বিরূপ হয়ে উঠতে থাকেন। বিরূপ হন সরকারও, ছেড়ে কথা বলেন নি সরকারকেও, এমনকি তা যদি আইয়ূবের মিলিটারী সরকারও হয়! এবং রাষ্ট্রভাষা হবে বাংলা– একমাত্র বাংলা–এ মত তাঁর ১৯৪৭-এর সেপ্টেম্বর থেকেই স্পষ্ট মত প্রকাশ করেন "সওগাত"-এর প্রবন্ধে, এই মাসেই।

সাহিত্য-সাধনার পথে আমার ব্যক্তিগত মতামত স্পষ্ট—যে যা পারেন–যেদিকে যাকে খাপ খায়—সেই পথেই হাঁটুন তিনি—বিরাট বিস্তৃত ময়দান—কেউ ত' কারো পথে দাঁড়িয়ে নেই। পূর্বসূরীদের প্রতি (তিনি যে মত বা পথেরই হোন্ না কেন) আমাদের যেমন কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা থাকা প্রয়োজন, পূর্বসূরীদেরও তেমনি দায়িত্ব হ'ল উত্তরসূরীদের নিয়ে বসা, তাদের জিজ্ঞেস করা কেমন আছি, কি ভাবছি, কি লিখছি। আমি এসব কথা ফর্‌রুখ ভাইকেও বারবার বলেছি। পরবর্তী সময়ে তের জন কবির কবিতা নিয়ে যখন আমার ও আবদুর রশীদ খানের সম্পাদনায় আর মোহাম্মদ মামুন (মরহুম)-এর সর্বক্ষণের তত্ত্বাবধানে "নতুন কবিতা" সংকলন (১৯৫১) বের হ'ল, তখন তাঁর কাছ থেকে যে উৎসাহ পেয়েছিলাম তা' ভোলার নয়। লালবাগের তমদ্দুন প্রেসের মালিক তৈয়েবর রহমান সাহেবকে বলে তিনি যদি ছাপার খরচ কমিয়ে দেবার ওকালতি না করতেন, তা হ'লে ১৯৫১-এ আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থ "তালেব মাষ্টার ও অন্যান্য কবিতা" বের হ'ত কিনা সন্দেহ। বয়োকনিষ্ঠ সাহিত্যব্রতীদের প্রতি তাঁর এই স্নেহ আজকের এই দলমত সংকুল আবহাওয়ায় একরূপ বিরল বললেই চলে। অর্থ, পদ বা বাহবা নেবার মোহ তাঁর ছিল না। বহুবার তিনি তদানীন্তন রাজধানী করাচী বা পিন্ডি যাওয়ার দাওয়াৎ পেয়েও যান নাই। উৎসাহ দেখান নাই ইউনেস্‌কোর টাকায় বিদেশ সফরের ইশারা পেয়েও। "ইত্তেফাক"-এর কার্যনির্বাহী সম্পাদক সুলেখক মুহম্মদ আসফউদ্দৌলা সাহেবের কাছে শুনেছি, একাত্তরের পঁচিশে মার্চের অন্ধকারে স্বৈরাচারী ইয়াহিয়া সরকার যখন "ইত্তেফাক" অফিস ভস্মীভূত করে, সে সময় সহায়-সম্বলহীন আসফউদ্দৌলা এবং সিরাজউদ্দীন হোসেন (শহীদ এবং প্রাক্তন কার্যনির্বাহী সম্পাদক)-এর নিকট পৌঁছালো দু'টি খাম—তাতে একশ' করে টাকা। পাঠিয়েছেন কবি ফর্‌রুখ, লিখেছেন, থাকলে আরও অনেক বেশীই পাঠাতেন।

www.pathagar.com

এতদিন ঢাকা থেকেও না করতে পেরেছিলেন একটি বাসস্থান, না একটি বাড়ী। মৃত্যুর পর তাঁর বাড়ীতে কাফনের টাকা ছিল কিনা সন্দেহ। অগ্রজ কবি বেনজীর আহমদ যদি দয়া করে "সাড়ে তিন হাত জমিন" না দিতেন, তবে 'লাশ' কবিতার অসংখ্য লাশের মত তাঁর দেহও বারোয়ারী গোরস্থানে একদিন নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত কিনা কে বলতে পারতো!

আমি নিজে যা বুঝি, মহাজনদের কাছে যা শুনেছি এবং যা পড়ে শুনে শিখেছি, তাতে একটা সরল সিদ্ধান্তে এসেছি এই যে একজন লেখক বা শিল্পী বেঁচে থাকেন তাঁর শিল্প-কর্মের ভেতর দিয়ে। কোন বিশেষ রাজনৈতিক মতবাদের মধ্য দিয়ে নয়। একজন লেখকের বড় গুণ হ'ল তার মানবতার প্রতি মমত্ববোধ, অত্যাচারিত, লাঞ্ছিত, ভাগ্যাহতদের জন্যে অশ্রু, সর্বোপরি বিশ্বমানবতা। পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজে দেখা গেছে, বহু স্বপ্নদ্রষ্টা কবির স্বপ্নই স্বার্থপর রাজনীতির খেলোয়াড়দের হাতে পড়ে সফল হ'তে পারে নি। সে যুগের দান্তে বা এ-যুগের প্যাস্টারনাক, কেউই সমালোচনার উর্ধ্বে ছিলেন না। হুইটম্যানও স্বপ্ন দেখেছিলেন, তাঁর স্বপ্নের আমেরিকা কালো-ধলোতে গলাগলি করে গান গাইবে। কিন্তু মেলানো, এই মিলন—মহামিলনের ব্যাপারটি অত সহজ নয়। তাহলে কি করণীয় একজন লেখকের ? মহাজনরা বলেন, যা সত্য সব যুগে সব দেশে—তাই বলো; যদি সেজন্যে তোমার ক্রুসিফিকেশন হয়, গর্দান যায়, হেমলক বিষপান করতে হয়, করো। তোমার জয়গাথা গাইবার জন্য ইতিহাস তৈরী থাকবে। পৃথিবীর এমন কোন শক্তি নাই তোমাকে মলিন করতে পারে। সে মৃত্যু পৃথিবীর যে কোন স্বৈরাচারী জল্লাদ অথবা ইয়াহিয়ার নরঘাতক পশুদের, বুলেট-বেয়নেটকেও কোনদিনই পরোয়া করে না। যে কবি 'লাশ' বা 'আওলাদ'-এর মত কবিতা লিখতে পারতেন, যে কবির এখনো দেবার ছিল, যে কবির প্রায় ২২/২৩টি গ্রন্থ এখনো প্রকাশনার সূর্যালোক দেখে নাই, যিনি সর্বাধিক সনেট লিখেছেন, যিনি উপোস করে এক ডজন পরিবার-পরিজন (শিশুসহ) নিয়ে মরবেন, কিন্তু কারো কাছে ভিক্ষা চাইবেন না, যিনি অর্ধাহারী বা অনাহারী, কিন্তু দান গ্রহণ করবেন না, যাঁর কন্যা বিনা চিকিৎসায় মরবে, কিন্তু ডাক্তারের ভিজিট দেবার ক্ষমতা নাই বলে ডাক্তারের কাছে ঔষধের জন্যে পাঠাবেন না, যাঁর স্বপ্নের দুলাল অর্থাভাবে ডাক্তারী পড়া ছেড়ে কেরানী হয়; বড় দুঃখ হয় সেই একগুঁয়ে, অভিমানী, বজ্র-সদৃশ চরিত্রটির পাশে গিয়ে সময় থাকতে আমরা কেউ বসলাম না; বললাম না, "যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দুর্ভিক্ষ–পীড়িত দেশ তোমার কাছে কবিতা চায়, সঙ্গীত চায়। এক স্বপ্নভঙ্গ হয়েছে, কিন্তু শত স্বপ্ন তোমার সামনে। বাস্তব '৭১-এর রক্ত পিচ্ছিল পথে আবার যাত্রা শুরু কর; বলার আছে , লেখার আছে, এসো—ওঠো —"

না, অতো দেরী তাঁর সইলো না! একগুঁয়ে অভিমানী, ক্ষুধার্ত কবি তার আগেই বীরের মত নাটকীয়ভাবে 'গুড্ বাই' দিয়ে চলে গেলেন!

www.pathagar.com

আবদুর রশীদ খান

ব্যক্তি ফর্‌রুখ

১৯৪৮ সালের দিকের কথা। তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। দু'চারটি কবিতা এদিক-ওদিক প্রকাশ পাচ্ছে। আশরাফ সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী, আলাউদ্দিন-আল আজাদ, হাসান হাফিজুর রহমান, মোহাম্মদ মামুন, শামসুর রাহমান ইত্যাদি সতীর্থ ও বন্ধু-বান্ধব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নের ফাঁকে ফাঁকে আড্ডা দিই। সে আড্ডা কোন সময়ে আরমানিটোলা ময়দানে, কোন সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় বা মধুর ক্যানটিনে কিংবা কখনও নাজিমুদ্দীন রোডের রেডিও অফিসের ক্যানটিনে।

ফর্‌রুখ আহমদের "সাত সাগরের মাঝি"র আবেগ ও উন্মাদনা আমাদের মনকে আলোড়িত রেখেছে। ফর্‌রুখ আহমদ আমাদের কাব্যের নায়ক। এ সময়েই কবি শাহাদাৎ হোসেন ঢাকা রেডিওতে যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের আড্ডার ফাঁকে ফাঁকে হঠাৎ কখনও কখনও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ও কবি শাহাদাৎ হোসেন, এই দুই ব্যক্তিত্বের দেখা মিলতো। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের তীব্র ও তীক্ষ্ণ সম্মোহনী দৃষ্টির আকর্ষণ আমার কাছে ছিল দুর্বার। দেখা হলেই সেই প্রাণখোলা হাসির সঙ্গে জিজ্ঞেস করতেন, "কেমন আছিস? লিখছিস কেমন?"

সেই শুরু। মাঝে-মধ্যে দেখা হয়। রেডিও ক্যান্টিনে চা পানের আড্ডা হয়। কোন লেখা ভাল হলে প্রাপ্তির অতিরিক্ত উৎসাহ দেন। এভাবেই কোন অলক্ষিত বন্ধনে তাঁর সঙ্গে নিবিড়ভাবে জড়িয়ে গেলাম। ১৯৪৯ সালের শেষ দিকে যখন আমরা পূর্ব বাংলার প্রথম কাব্য-সংকলন 'নতুন কবিতা' প্রকাশের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলাম, তখন ফর্‌রুখ ভাইয়ের উৎসাহ ও উদ্দীপনা আমাদের প্রাণে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি করলো। তখন তাঁর কাছেই শোনা কথা, প্রবীণেরা আমাদের এই প্রচেষ্টাকে খুব বেশী সুনজরে দেখছেন না। তিনি আমাদের সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে সংকলন বের করার জন্য এগিয়ে যেতে বললেন! তাঁর সেই উৎসাহ প্রদান আজও আমাদের মনে চির-অম্লান রয়েছে।

১৯৫০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে গেলাম। সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপনার কাজ পেলাম পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে। ফর্‌রুখ ভাই চিঠি-পত্র খুব কমই লিখতেন। আমি যোগাযোগ রক্ষার জন্যে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে পত্র দিতাম। তাঁর কাছ থেকে আমি যেসব চিঠি-পত্র পেয়েছি, তার মধ্যে ৩/৪টি এখনও আমার কাছে রয়ে গেছে। ১৭-২-৫১ তারিখে তিনি লিখেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

আস্‌সালামু আলায়কুম

ভাই,

আবদুর রশীদ, তোমার 'রাত্রি' কবিতাটা আমার ভালো লেগেছে। খুঁটি-নাটি সমালোচনা করার সময় এখানে নাই, "তাহ্‌জীবে" ছাপা হ'লে পরে আলোচনা করা যাবে।

মুফাখখারকে বলে দিও, তার 'আস্‌পে তাজী' (নয়া জামাত চতুর্থ খণ্ডে মুদ্রিত) মানুষের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তোমরা দু'জনেরই আমার স্নেহ নিও। দু'জনের কাছ থেকে আরো লেখা চাই।

ইতি—

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

মজার ব্যাপার হলো, ফর্‌রুখ ভাই প্রায়ই তাঁর চিঠিতে তারিখ লিখতেন না। ফলে তারিখ বের করা খুবই মুশকিল। যেমন হেবোকে (কবি হাবিবুর রহমান) লেখা চিঠিটি কিংবা আমাকে লেখা অন্য দু'টো চিঠি। একটার পাশে আমি প্রাপ্তি তারিখ ২৩-৭-৫২ লিখে রেখেছি। তাঁর লেখা পাঠ্য-পুস্তক "নয়া জামাত" সম্পর্কিত চিঠিটি ১৯৫৭ সালের কোন এক সময়ে লেখা; কেননা চিঠির ভেতরে এক জায়গায় উল্লেখ আছে, "গত বৎসর ১৯৫৬" কথাটি—তার অর্থ চিঠিটি ১৯৫৭ সালে লেখা।

আমার প্রথম কাব্য-গ্রন্থ "নক্ষত্র মানুষ মন" ১৯৫২ সালে বের হয়। সেই গ্রন্থ সম্পর্কে তিনি যে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন তাতে এখন বুঝতে পারছি, এক তরুণ কবিকে হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবার আকাঙ্ক্ষাই তাঁকে এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসার ভাষা যুগিয়েছে। এ সম্পর্কিত চিঠিটি নিম্নে পেশ করা হলো ঃ

(প্রাপ্তি তারিখ ২৩-৭-১৯৫২)

রেডিও পাকিস্তান

ঢাকা।

(আবদুর রশীদ খান)

ঈদের সালাম, স্নেহ ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

এর আগেও তোমার কাছে আর একখানা চিঠি লিখেছিলাম; কিন্তু রোজার ছুটিতে তোমার বর্তমান ঠিকানা কি এবং কোথায়, না জানার দরুন চিঠি পোস্ট করা হয়নি।

তোমার কবিতা সম্পর্কে আমার আগে যে উঁচু ধারণা ছিল, পুস্তকাকারে বাছাই করা কবিতাগুলো পড়ে সে ধারণা আরো উঁচু হয়েছে। সমালোচনা করার মত পাণ্ডিত্য আর কলম আমার নাই। নইলে আমি নিজেই সমালোচনা করতাম। তবু আমাদের সংকীর্ণ কবি ও ক্রিটিক মহলে তোমার বই সম্পর্কে আলোচনার অবতারণা করেছি। তুমি শুনে আনন্দিত হবে যে, সৈয়দ আলী আহসানের মত কড়া সমালোচকও মন্তব্যে সায়

www.pathagar.com

দিয়েছেন। । অতঃপর "নক্ষত্র-মানুষ-মন"-এর কবির কবিতা আগামী দিনের যে কোন বাংলা এ্যানথলজির জন্যে নির্দিষ্ট থাকবে, এটাই আমার বিশ্বাস।

বইয়ের দু'একটা সমালোচনা আমি পড়েছি। কিন্তু তৃপ্তি পাই নি। সমালোচনার চাইতে স্বকীয় বাহাদুরী অথবা অজ্ঞতা এঁদের আলোচনায় প্রকাশ পেয়েছে। তা সত্ত্বেও "নক্ষত্র-মানুষ-মন" সর্বত্র গৃহীত হয়েছে দেখে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। তোমার কবিতা আরো অনেক বেশী উজ্জ্বল হোক, এটাই আমার ঐকান্তিক প্রার্থনা।

'দ্যুতি', 'সৈনিক' ও অন্যান্য কাগজে সমালোচনার জন্যে একটু তৎপর হতে হবে। আমার মনে হয় যে, সৈনিকের আবদুল গফুর এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে পূর্ণ সহযোগিতা করবে। সাহিত্য ও কাব্য সমালোচকের অভাব আমাদের এত বেশী যে, এখন থেকেই আমাদের এ বিষয়ে হুঁশিয়ার হওয়া দরকার।

চিঠি শেষ করার আগে আর একটা কথা বলতে চাই, আশা করি, ক্ষুণ্ন হবে না। "নক্ষত্র-মানুষ-মন"কে তুমি তোমার সাফল্যের প্রথম ধাপ হিসেবেই গণ্য করবে, আশা করি। মহত্তর কবিতা রচনার জন্যে এখন থেকেই তোমাকে সচেষ্ট হতে হবে। তোমার শেক্সপীয়ারের অনুবাদ আমি পড়েছি। মৌলিক প্রচেষ্টায় তোমার হাতে নাট্যকাব্য অথবা মনোলগ জাতীয় লেখা ইনশাআল্লাহ্ আরো ভালো হবে বলেই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সবশেষে, আমাদের জাতীয় ইতিহাস ও পুঁথি সাহিত্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। সুলতানা রিজিয়ার কাহিনী একদা মাইকেলের মত মহাকবিকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। এ রকম অসংখ্য কাহিনী আছে যা আধুনিক কবিতার আঙ্গিকে চমৎকারভাবে রসোত্তীর্ণ হতে পারে। চেষ্টা করো। কথা আরো ছিল, দেখা হলে বলবো।

খোদা হাফেজ

ফর্‌রুখ আহমদ

পুনশ্চঃ কবে ঢাকায় আসছো জানিও। চিঠি লেখায় আমার স্বাভাবিক উদাসীনতার জন্যে কিছু মনে করো না। "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা" ছাপা হয়ে গেছে। পাঠিয়ে দেবো।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কোনদিনই হিসেবি ছিলেন না। তাঁর আত্মসম্মান জ্ঞান নিজের জীবন দিয়েই তিনি প্রমাণ করে গেছেন। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ তলোয়ার। কি রেডিও অফিসের স্টাফ আর্টিস্টদের ধর্মঘটের সময়ে, কি তাঁর "নয়া জামাত"-এর প্রকাশকের হিসাব প্রদানের ছল-চাতুরীতে, তিনি ন্যায়ের জন্যে সংগ্রাম করেছেন। "নয়া জামাত" সম্পর্কিত ১৯৫৭ সালের দিকে লেখা চিঠি থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে।

১ নং হুসনে আলম ভিলা

পোঃ ওয়ারী

ঢাকা

www.pathagar.com

ভাই আবদুর রশীদ,

তোমার কথামত উকিলের নিকট যাইয়া গত বছরের (১৯৫৬) প্রদত্ত প্রকাশকের প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় হিসাব কপি করিয়া আনিয়াছি। প্রথম মুদ্রণ (সাবমিশনের জন্য) উল্লেখ করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সামান্য সংখ্যক হইলেও আজ হুবহু উদ্ধৃত করিলাম।

অতঃপর ১ম ও ২য় ভাগের (৫ম ও ৬ষ্ঠ শ্রেণীর) দ্বিতীয় ও ৩য় মুদ্রণ এবং ৪র্থ ভাগের মাত্র দ্বিতীয় মুদ্রণ হইয়াছিল বলিয়া প্রকাশক উল্লেখ করিয়াছেন। এগুলি সবই ১৩৫৭ সন বা ১৯৫১ সালের মধ্যে ছাপা হইয়াছিল। অতঃপর আর কোন মুদ্রণ হইয়াছে কি না জানি না। গত শুক্রবার তোমার নিকট মামলার পুরা খবর বলিতে পারি নাই।

হাইকোর্টে আমার আপীল গৃহীত হইয়াছে। কেস এ মাসের কজ লিস্টে উঠিয়াছে। এ্যাডভোকেটের নিকট শুনিলাম যে, এ সপ্তাহের যে কোন দিন মামলার শুনানী হইতে পারে।

কাজেই তুমি যদি আল্লাহ্‌র ওয়াস্তে যথাশীঘ্র (আজ বিকালের মধ্যে হইলে খুব ভাল হয়) আমার হিসাবটা বাহির করিয়া দাও, তাহা হইলে বিশেষভাবে উপকৃত হইব। হিসাবের দুইটা কপি দরকার হইবে। ভাইয়ের কাছে টাকা আছে। তাহার নিকটই সবকিছু জানিতে পারিবে এবং হিসাবের কাগজ দিবে।

নিতান্ত প্রয়োজনেই তোমাকে খাটাইয়া লইতেছি। আশা করি, এটুকু দাবী আমার আছে।

দোওয়াগো

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

নয়া জামাত

	Total upto date
১ম ভাগ (৫ম শ্রেণী)	২০,০০০
২য় ভাগ (৬ষ্ঠ শ্রেণী)	১৭,০০০
৪র্থ ভাগ (৮ম শ্রেণী)	১০,০০০

[Printed in 1951 and onward]

১৯৫২ সালের নভেম্বরে আমি ঢাকা কলেজে যোগদান করি। আমি থাকতাম আরমানিটোলা মাঠের কাছে বান্ধব কুটিরের ছাত্রাবাসের একটি কামরায়। ফর্‌রুখ ভাই মাঝে মাঝে এখানে এসে আমাকে ধন্য করেছেন; ১৯৫৩ সালের মাঝামাঝি সময়ে আমি ঢাকা জেলের পূর্ব পাশে আলী নকীর দেউড়িতে বাসা করে সপরিবারে বসবাস করতে থাকি। রেডিও অফিস খুব কাছেই। সুতরাং ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ

www.pathagar.com

আরো নিবিড় হয়ে উঠলো। আমি প্রায়ই তাঁর কমলাপুরের বাসায় যেতাম। রেডিও অফিস ও কেন্টিন, রমনার উন্মুক্ত মাঠ ও রাস্তা, কমলাপুরের বাসস্থান এবং আমার নিজের বাসায় কত সময় তাঁর মধুর সান্নিধ্যে কেটেছে। ১৯৫৩ সালে আমি নববিবাহিত। তিনি আমার স্ত্রীকে খুবই স্নেহ করতেন এবং তাকে দেখার জন্যে প্রায়ই আমার বাসায় আসতেন। মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল সাহিত্য আলোচনা, ভবিষ্যৎ সম্পর্কে পরিকল্পনা ও আমাকে উৎসাহ প্রদান। তাঁরই ঐকান্তিক উৎসাহে আমি মোমেনশাহী গীতিকার "মহুয়া" দৃশ্যকাব্যকে সনেট সিকোয়েন্সে রূপ দিয়ে ধারাবাহিকভাবে "মোহাম্মদী"তে প্রকাশ করি। তাঁর কাছ থেকে কেবল গ্রহণই করেছি। তিনি কোন দিন কোন প্রতিদানের আশা করতেন না। যাকে তিনি কাছে টেনে নিতেন, তাকে তিনি তাঁর হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা উজাড় করে দিতেন। তাঁর বড় ভাই বাংলাদেশ সচিবালয়ে কাজ করতেন। তিনি অবসর গ্রহণের পর তাঁর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। তাঁর এই বড় ভাই মাঝে মাঝে ফর্‌রুখ ভাই ও আমার মধ্যে যোগসূত্রের কাজ করতেন।

মাঝে মাঝে ব্যক্তিগত পর্যায়ের আলোচনার সূত্রপাত হলে, কেন তিনি বংশের পদবী 'সৈয়দ' বাদ দিয়েছেন, কিভাবে নিকট-আত্মীয়ার সঙ্গে বিবাহে আবদ্ধ হয়েছেন, কেমন করে টেররিস্ট মুভমেন্টে যোগ দিয়েছিলেন, এসব গল্প করতেন।

তাঁর করুণ মৃত্যুর পর আমি যে কবিতাটি লিখেছিলাম, এখানে তার পুনরুল্লেখ করে আমি তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি আমার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি ঃ

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মৃত্যুতে

[১৯ অক্টোবর ১৯৭৪]

এমন প্রশান্তি আমি কোনদিন দেখি নি তোমার
দু'চোখে, ঠোঁটের ফাঁকে কোনদিন এমন তৃপ্তির
পরশ দেখি নি আর। মনে হয়, সাত সাগরের
উদ্দাম পাড়ির শেষে পথশ্রান্ত সিন্দাবাদ তার
দু'চোখে পেয়েছে আজ প্রশান্তির ঘুমভরা রাত।
চোখ নয়—যেন তীব্র দ্যুতি, যেন তীক্ষ্ন তলোয়ার।
স্থির বিদ্যুতের প্রভা এই চোখ ছড়াবে না আর।
জাগাবে না প্রত্যয়ের স্বর্ণদ্বীপ দু'চোখে আমার।
দুস্তর পাড়ির শেষে এইমাত্র ক্লান্তির শরীর
এলায়েছ শেষবার। সাত সাগরের নোনা জলে,
হাজারো লবংগ দ্বীপে, মুহূর্তের অতুল বৈভবে,

রূপ-কাহিনীর দেশে কী সহজে গেছো বারবার
দৃশ্য থেকে দৃশ্যান্তরে নিপুণ কথার জাদুকর।
সিরাজাম্‌ মুনীরায় উদ্ভাসিত এই চোখ আর
হবে না আশ্বাসময়। দৈনন্দিন তুচ্ছ দীনতার
অসম্মান পৃথিবীর মুখে ছুঁড়ে আত্মার ডাহুক
দু'ডানায় অলৌকিক আলো মেখে এখন উধাও।
বেদনা কি অপমান, অযোগ্যের হীন আস্ফালন
সাগরে রাখে নি ছাপ। চিরদিন সাত সাগরের
সমস্ত বৈরিতা পেয়ে জীবনের পরম সত্যের
ঝিনুকে নিমগ্ন ছিলে। অথচ কী নির্মম আঘাতে
অন্যায়ের শৃংখলের শোষণের কাঁপায়েছে ভিত!
কথা যেন সৈনিকের উদ্ভাসিত নাঙ্গা তলোয়ার।
মানুষের কাছে তুমি পাতো নাই করুণার হাত,
ঊর্ধ্বমুখী ইশারায় জানায়েছ ঃ সব আকাঙ্ক্ষার
কেবল একটি ঠাঁই, আর সব ভিখারীর পাত।

তুমি তো একক দ্বীপ। দূর থেকে আমরা তোমার
ঐশ্বর্যে ঈর্ষিত প্রাণ। ঐতিহ্যের বিচিত্র সম্ভার
মানি নি আপন ব'লে। কী আশ্চর্য! আকণ্ঠ পিপাসা
মিটায়ে সুপেয় জলে, মন ভরে নারাঙ্গী দোলায়
আমরা দিয়েছি পাড়ি অন্য কোন দ্বীপের সন্ধানে।

উপেক্ষা বাংলার ভাগ্য। প্রতিভাকে নটীর সম্পদ
বানাতে হও নি রাজী, তাই আজ তোমার করুণ
অকাল নিভৃত মৃত্যু। মুখপাত্র ছিলে জনতার।
জনতা কাতারবন্দী এ মুহূর্তে দুয়ারে তোমার।

www.pathagar.com

সরদার জয়েন উদ্‌দীন

আমাদের ফর্‌রুখ ভাই

প্রতিভা-দীপ্ত কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা এবং কবিসত্তা সম্বন্ধে পণ্ডিতেরা অনেক আলোচনা করেছেন এবং ভবিষ্যতে আরো অনেক আলোচনা হবে বলে আমার বিশ্বাস। গত তিন যুগের মধ্যে কাব্যসম্ভারে প্রতিভা-ভাস্বর এই কবির আমি একজন পাঠক মাত্র। তাঁর কাব্য-দ্যোতনা আমার হৃদয়কে উদ্বেলিত করে, তাই আমি তাঁর ভক্ত—এটুকু বলতে পারলেই আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। কিন্তু এ ছাড়াও এই কবির সাথে আমার এক অনন্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছিল। আমি তাঁর অনুজপ্রতিম—তাঁর স্নেহ, ভালবাসায় সিক্ত হয়েছি ১৯৪৫-এর শেষের দিকে তাঁর সান্নিধ্যে আসার পর থেকে আমৃত্যু।

তখনকার দিনে বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যপ্রতিভা আলোড়ন সৃষ্টি করে রেখেছিল। আমরা এই আলোড়নে মগ্ন। 'লাশ' তখন কলকাতাকেন্দ্রিক সাহিত্যক্ষেত্রে এক অনবদ্য পাঠ-স্পৃহা জাগানো কবিতা। এ তো গেল তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু সম্বন্ধে। আমি পূর্বেই বলেছি যে, তাঁর কবিতা বা কাব্য সম্পর্কে আমার মত লোকের বক্তব্য রাখা ঠিক হবে না বলেই মনে হয়। এ কাজ কাব্য বিষয়ে চেতনাদীপ্ত পণ্ডিতের। আমি শুধু তাঁর সান্নিধ্যে এসে ছোট-খাটো বিষয়ে তাঁকে যেভাবে দেখেছি, তার দু'একটা প্রসঙ্গ সম্পর্কে বক্তব্য রাখব।

এক সময়ে, ১৯৪৮ হবে বোধ হয়, তখন আমরা তিনজন– কামরুল হাসান, হাবীবুর রহমান ও আমি ৩৬ নম্বর র‍্যাংকিন স্ট্রীটের এক বাড়ীতে এক সাথে থাকতাম। যে ঘরে থাকতাম সে ঘরের পরিধি ছিল ৮'x৮' ফুট। এখানে একদিন ফর্‌রুখ ভাই এলেন। তখন রাত প্রায় এগারোটা। শীতের রাত। আমরা তিনজন শুয়ে পড়েছিলাম। বাইরে থেকে ফর্‌রুখ ভাই 'কামরুল' 'কামরুল' বলে ডাকছেন। শিল্পী কামরুল হাসান উঠে দরজা খুলে ফর্‌রুখ ভাইকে ভেতরে নিয়ে এলেন। ঘরে এসেই ফর্‌রুখ ভাই ঘুমন্ত কবি হাবীবুর রহমানকে টেনে তুললেন। যে তক্ত-পোষে আমরা শুয়েছিলাম তার পরিসর যেমন তিনজনের পক্ষে কম, বিছানা-পত্রেরও তেমনি এতীম অবস্থা। তাই ফর্‌রুখ ভাইকে আমরা শুতে দিতে পারছিলাম না। কিন্তু ফর্‌রুখ ভাই 'আমার ঠাণ্ডা লেগেছে' বলে জোর করে শুয়ে পড়লেন। আমি আর হাবীবুর রহমান বসে রইলাম।

www.pathagar.com

কিছু সময় বাদে ফর্‌রুখ ভাই উঠে বললেন, "নাহ্‌, এই 'ম্যালচ' কামরুলের কাছে শোওয়া যাবে না।"

একটি কথা এ প্রসঙ্গ বলে রাখি, কোন কিছুকে ঘৃণা প্রকাশ করতে যেয়ে ফর্‌রুখ ভাই সচরাচর এ ক'টি শব্দ বেশ ব্যবহার করতেন—'খবিস', 'ইবলিস' এবং 'ম্যালচ'। তা' হলে কি করা যায়, বসে থেকে তো আর রাত কাটানো যায় না। ফর্‌রুখ ভাই নিজেই প্রস্তাব দিলেন, "চল, চা খেয়ে আসি"।

"চা ? এই রাত বারোটায় চা! পাওয়া যাবে কোথায়!"

ফর্‌রুখ ভাই বললেন, "চল, সেই ফুলবাড়িয়া স্টেশনের ঝুপড়ি রেস্টুরেন্টে।" কিন্তু পয়সা ? আমাদের তিনজনের কারো কাছে পয়সা নেই। ফর্‌রুখ ভাই চট করে পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা রূপার টাকা বের করে বাজিয়ে বললেন, "এই যে এক টাকা আছে। চল, ষোল কাপ চা হবে।" আমরা চললাম এবং সারারাত সেই ফুলবাড়িয়া স্টেশনের ঝুপড়ি রেস্টুরেন্টে বসে সিংগল কাপ চা খেয়ে খেয়ে রাত কাটিয়ে দিলাম। ভোরে আজান পড়লে আবার ফিরে এলাম।

এইসব সময়ে ফর্‌রুখ ভাই অনেক গল্প বলতেন এবং কবিতা করে বলতেন, ছড়া বেঁধে বলতেন। তাঁর অনেক ছড়া কবিতা এত তীক্ষ্ণ সমালোচনায় মুখর যে, তা পাঠযোগ্যই নয়। কিছু কিছু ছড়া-কবিতা, যেগুলোর মধ্যে সহিষ্ণুতা আছে, কাব্যমানে যেগুলো ফর্‌রুখ ভাইয়ের বিবেচনায় উত্তীর্ণ হয়েছে, সেগুলো তিনি 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' এই নামে প্রকাশ করতেন। সে সময়ে হায়াত দারাজ খানের ছড়া বা কবিতা অনেকেই তৃপ্তি সহকারে পাঠ করতেন। যাদের একথা মনে আছে তাঁরা জানেন, অত্যন্ত গম্ভীর হলেও ফর্‌রুখ ভাই হাস্য-রসে টইটুম্বুর ছিলেন। সব আমার মনে নেই। এমনকি সামান্যও মনে নেই। সে অনেক দিনের কথা। কোথাও ছাপাও হয় নি এসব ছড়া-কবিতা। স্মৃতি থেকে দু'একটা পঙক্তি উদ্ধৃত করছি, এতে হয়তো বোঝা যাবে কি রকম রসিক তিনি ছিলেন।

পাকিস্তানী আমলে 'খান' উপাধির বেশ জমজমাট ব্যবহার ছিল। পশ্চিমাদের দেখে বাঙালী মুসলমানদের অনেকেও নামের শেষে 'খান' শব্দ ব্যবহার করত। এ দেখে ফর্‌রুখ ভাই ছড়া কাটলেন—

একে খান, ওকে খান
আগে খান পিছে খান
যাকে পান তাকে খান।।

মানুষ হিসাবে তাঁর তুলনা মেলা ভার। যে পাকিস্তানের জন্যে তিনি লড়াই করেছিলেন এবং যার প্রবল প্রবক্তা তিনি, সেই পাকিস্তানের মন্ত্রীদের সম্বন্ধেই উক্ত ছড়া ফর্‌রুখ ভাই কেটেছিলেন।

www.pathagar.com

একবার ফর্‌রুখ ভাইয়ের পাশে বসেছিলাম। বসেছিলাম কথাটা ঠিক নয়, বসে বসে রসগোল্লা খাচ্ছিলাম। রেডিওতে যাওয়া এবং ফর্‌রুখ ভাইয়ের পাশে বসা মানেই তো রসগোল্লা আর চা খাওয়া। তা আবার ঈদের পরে। এমন সময় দেখলাম, রেডিওর একজন কর্তা ব্যক্তি আসছেন। ফর্‌রুখ ভাই উঠে কোলাকুলি করবেন বলে এগিয়ে গেলেন। তারপর হঠাৎ ফিরে এসে আমার পাশে রাখা ছাতাটা হাতে নিয়ে ফিরে যাবার সময় স্বগতোক্তি ক'রে বললেন, "ছাতাটা নিয়ে যাই, শত্রুর সাথে কোলাকুলি—বলা যায় না।" অর্থাৎ তখন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মচারীদের পক্ষ হয়ে ফর্‌রুখ ভাই আন্দোলন চালাচ্ছিলেন।

সময়টা সম্ভবত তেষট্টি কি চৌষট্টি সাল হবে। তখন কবি জসীম উদ্‌দীন সম্বন্ধে কে যেন খবরের কাগজে বিরূপ মন্তব্য করেছিল। ফর্‌রুখ ভাই সে কাগজটি নিয়ে বাংলা একাডেমীতে উপস্থিত। এমনিতেই তাঁর চোখ লাল ছিল। ক্রোধে যেন তা আরো রক্তাভ হয়ে উঠেছিল। বললেন, "এর প্রতিবাদ করা দরকার। একজন কবি সম্বন্ধে এরূপ বক্তব্যের জন্য ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন।" এরূপ ছিল ফর্‌রুখ ভাইয়ের মন।

কথা অনেক আছে, যা বলে শেষ করা যাবে না। কিন্তু ফর্‌রুখ ভাইয়ের যে বিষয়টা আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করেছিল, তা হচ্ছে তাঁর কবিসত্তার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিসত্তা এক হয়ে মিশে যাওয়া। তিনি যেমন ইসলামের প্রবক্তা ছিলেন তেমনি নিজ জীবনে ইসলামী ভাবধারার অনুসারী ছিলেন। তিনি যেমন দরিদ্র জনসাধারণের জন্যে সমমর্মিতা অনুভব করতেন, নিজেও তেমনি দারিদ্র্যের মধ্যে কঠোর জীবন-যাপন করতেন। অথচ ইচ্ছে করলে তিনি সুখী জীবনে ফিরে যেতে পারতেন। তিনি যান নি বা চান নি। এমনকি প্রলোভনেরও শিকার হন নি। এ যুগে এ ধরনের মুসলমান বিরল। মনে-মুখে, আচরণে-বিচরণে ফর্‌রুখ ভাই ছিলেন খাঁটি মুসলমান এবং খাঁটি কবি। তাঁর কবিসত্তা যেমন ইসলামী কাব্যাদের্শে মহীয়ান, তাঁর জীবনও তেমনি ইসলামী আচরণে উজ্জীবিত। এ জন্যে ফর্‌রুখ ভাই সবার শ্রদ্ধা পেয়েছেন।

www.pathagar.com

তৈয়েবুর রহমান

অন্তরঙ্গ আলোকে ফররুখ

ছাত্রাবস্থায় কলকাতা জীবনেই আমি কবি ফররুখ আহ্‌মদ নামটির সাথে পরিচিত হই। সে সময়ে তাঁর লেখা 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান" নামক গানটি নিয়ে মওলানা মোহাম্মদ আকরাম খাঁর সাথে তাঁর যে তিক্ত সম্পর্ক সৃষ্টি হয়েছিল সে কথা জানতে পারি। তবে ফররুখ আহ্‌মদের সাথে সাক্ষাৎ পরিচয় তখনও হয়ে ওঠে নি। দেশবিভাগের পর ঢাকাতেই তাঁর সাথে প্রথম পরিচিত হতে পারলাম।

ব্যক্তি ফররুখ আহ্‌মদের দেখা পাবার আগেই তাঁর কবিসত্তা আমাকে মুগ্ধ করে।

সবেমাত্র দেশ স্বাধীন হয়েছে। আমরা সবাই আপন আপন কাজে ব্যস্ত। আমি তখন আমার ব্যবসা সাজিয়ে নেবার কোশেশ করছি। ঢাকায় তখন আবাসিক সমস্যা প্রকট। একে তো থাকবার জায়গার অভাব, দ্বিতীয়ত সব কিছু সম্পূর্ণ নতুন, অপরিচিত। তাই কলকাতা ফেরত অনেকেই সে সময় বন্ধু-বান্ধবদের বাসায় মাথা গোঁজার ঠাঁই করে নেন।

"আসরারে খুদী"র দক্ষ অনুবাদক হিসেবে খ্যাত সৈয়দ আবদুল মান্নানও একই কারণে আমার বাসায় ওঠেন। তখন আমি 'তমদ্দুন প্রেস" সদ্য স্থাপন করেছি। একদিন কথা প্রসঙ্গে সৈয়দ আবদুল মান্নান আমাকে ফররুখ আহ্‌মদের "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থটি ছাপাবার জন্যে বললেন। এর কিছু দিন পর সৈয়দ আবদুল মান্নানই আমার বাসায় কবি ফররুখ আহ্‌মদের সাথে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন।

প্রেসের প্রাথমিক অবস্থা ও মুদ্রণ বিষয়ক নানা জটিলতা থাকা সত্ত্বেও এর কিছুদিন পর আমি "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা" কাব্যগ্রন্থ দুটি প্রায় একই সাথে প্রকাশ করি। যদিও "সাত সাগরের মাঝি" বিভাগপূর্ব কালে প্রথম প্রকাশিত হয়, তবুও দ্বিতীয় সংস্করণেও গ্রন্থটি সাহিত্যাঙ্গনে ব্যাপক সাড়া তোলে। এর প্রচ্ছদপট এঁকেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। অবশ্য কাব্যগ্রন্থ দুটি ব্যবসায়িক দিক দিয়ে তেমন লাভবান হয় নি।

ছাত্রাবস্থাতেই রাজনীতির সাথে আমার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। তাই যুক্তফ্রন্টের আহ্বানে আমি আবার প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ি ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হই। স্বাভাবিকভাবেই তখন প্রেসের কাজের দিকে তেমন একটা মনোযোগ দিতে পারছিলাম না।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ ভাই এজন্যে আমাকে একদিন অনেকটা রাগত স্বরেই বলেছিলেন, "কেউ যদি আপনাকে আইয়ুব খানের গদিতেও বসিয়ে দেয় তাহলেও আপনি সেখানে বসবেন না।" রাজনীতির সাথে আমার প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়াটা তিনি তেমন পছন্দ করতেন না।

মজলিসী কথায় তাঁর কোন জুড়ি ছিল না। ফর্‌রুখ ভাই অনর্গল কথা বলে যেতে পারতেন। তাঁর বাচন-ভঙ্গি যেমন ছিল রসময়, তেমনি বক্তব্যের দিক দিয়েও তা ছিল তাত্ত্বিক। একেবারে হাল্কা কথায় ফর্‌রুখ ভাই বিরক্ত বোধ করতেন।

বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য-চর্চা ও অনগ্রসরতা তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। তিনি প্রায়ই বলতেন, "এখানকার শিল্পী-সাহিত্যিকরা সুযোগ পেলে বিকশিত হতে পারত।"

সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ব্যাপারে স্বকীয় সাহিত্য সৃষ্টি প্রসঙ্গে বলতেন, "হিন্দুরা তাদের সাহিত্যের সোর্স পেয়েছে "রামায়ণ", "মহাভারত" থেকে। বাঙালী মুসলমানকেও সাহিত্যের উৎস খুঁজে নিতে হবে তাদের নিজস্ব ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি থেকে।

নিজের প্রসঙ্গ টেনে একদিন বললেন, "আমি অবশ্য হাতেম তায়ীকে কেন্দ্র করে লেখা শুরু করেছি।" কখনো কখনো বলতেন, "দেখুন, গ্রামে-গঞ্জে যে "কাসাসুল আম্বিয়া" পড়া হয়, তাকে কেন্দ্র করেই অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টি হতে পারে।"

কাজী সাহেব অর্থাৎ কবি কাজী নজরুল ইসলাম প্রসঙ্গে বলতেন, "রবীন্দ্রনাথের সাহিত্যকর্ম নিয়ে যত আলোচনা-সমালোচনা হয়, তার সামান্যও যদি নজরুলের সাহিত্য সম্পর্কে হ'ত, তা'হলে কত ভালই না হত!" কবি গোলাম মোস্তফার মৌলিকতাহীন কাব্যচর্চা তাঁর খুব একটা পছন্দ হত না। আল্লামা ইকবালের প্রতি ছিল তাঁর সুগভীর শ্রদ্ধাবোধ। মওলানা রুমীর মসনবীর প্রতিও ছিল তাঁর সুতীব্র আকর্ষণ। তাই তাঁকে একদিন বলেছিলাম মসনবী শরীফের তর্জমা করতে। ফর্‌রুখ ভাই বলেছিলেন, "এটা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ক্লাসিক্যাল ফারসীতে লেখা মূল পাঠ্য থেকে তর্জমা করা অত্যন্ত কঠিন কাজ।"

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অনেক কথাই বলতেন। একদিন বললেন, "আমি একটি খাব দেখলাম। যেন আকাশ থেকে একটা রে (আলোক রশ্মি) আপনার ঘরে এসে পড়ছে।" খাবের তাবীর করে নিজেই বললেন, "এর অর্থ হ'ল আপনার ঘরে নতুন কোন মেহ্‌মান আসছে।" কিছুদিন পর আমার প্রথম সন্তান জন্ম নিলে তিনি হেসে বললেন, "বলেছিলাম না!"

বন্ধুসুলভ পরিবেশে আমাদের দিন কাটলেও তিনি আমাকে সব সময় 'আপনি" সম্বোধন করেছেন, আমিও তাঁকে 'আপনি' বলেছি।

আমার এখান থেকে দুটি পত্রিকা বেরুত, "তাহ্‌জীব" ও "সবুজ নিশান"। "তাহ্‌জীব" সাহিত্য পত্রিকা। এর সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ আবদুল মান্নান। "সবুজ

www.pathagar.com

নিশান" শিশু-কিশোরদের জন্যে বেরোয়। ফর্‌রুখ ভাই-ই এর নামকরণ করেছিলেন। কবি হাবীবুর রহমান সহ অনেককেই তিনি যুক্ত করেছিলেন পত্রিকাটির সঙ্গে।

অবশ্য অর্থকরী দিক দিয়ে পত্রিকা দুটি সফল হতে পারে নি। তবে বিশ্বাস ও দায়িত্ববোধই সেদিন এ ব্যাপারে আমাকে আগ্রহী করে তুলেছিল।

শিশু-কিশোরদের জন্যে একটি পাণ্ডুলিপি তিনি আমাকে তৈরী করে দিয়েছিলেন— "কাগাবগা" নামে বই হিসেবে বের করার জন্যে। বইটির ইলাস্ট্রেশন করেছিলেন বিশিষ্ট শিল্পী আবুল কাসেম। "কাগাবগা"র জন্যে আঁকা ছবিগুলো তাঁর তেমন পছন্দ হয়নি। বইটির জমিও তৈরী হয়ে গিয়েছিল। কেন যে সে সময় বইটি প্রকাশ পায় নি, আজ সে কথা ভুলে গেছি।

শেষ অবধি নানা কারণে তাঁর সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়ে ওঠে নি। তবুও যদ্দুর পেরেছি, খোঁজ-খবর নেবার চেষ্টা করেছি। যখন জানতে পেরেছি কবির বড় মেয়ে মারা গেছেন, কবিও অর্থকষ্টে আছেন, তাঁর কাছে ছুটে গেছি। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তখনও নিজের অভাব-অভিযোগের কথা বলতে নারাজ। বলেছেন ভিন্ন প্রসঙ্গে কথা বলতে। বাংলাদেশ হবার পর যখন প্রথম তাঁকে দেখতে গিয়েছি, তখনও তিনি আমাকে দেখে উচ্ছ্বসিত হ'য়েছেন। ভাবীকে ডেকে বলেছেন, "দ্যাখ, তৈয়ব ভাই এসেছেন।" জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও তাঁকে হতাশ হতে দেখি নি। মৃত্যুর মাসখানেক আগে তাঁর সাথে আমার শেষ দেখা। ওলী-আউলিয়াদের কথার উদ্ধৃতি টেনে বললেন, "তাঁরা বলছেন, ভয় নেই। পরিস্থিতি বদলাবে।"

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আমাদের ছেড়ে গেছেন, তবুও সেই পুরোনো দিনগুলোর কথা যখনই স্মরণে আসে, তখনই মন আনন্দে ভরে ওঠে। অমন প্রাণবান মানুষের সান্নিধ্যের উষ্ণতা আজও যেন একটুও ম্লান হয় নি।

www.pathagar.com

মুফাখ্খারুল ইসলাম

ফর্রুখ স্মরণে

কবি জসীম উদ্‌দীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক থাকা কালে খুব আনন্দের সঙ্গে আমাকে মাসিক "মোহাম্মদী"তে প্রকাশিত ফর্রুখ আহ্‌মদের "হে নিশানবাহী" কবিতাটি দেখান। আমার কয়েকটি লেখা পত্র-পত্রিকায় পড়ে জসীম উদ্দীন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত আমাদের এলাকার ছাত্রদের কাছ থেকে আমার বাড়ীর ঠিকানা নিয়ে ১৯৪৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আমাকে বেশ উৎসাহ দিয়ে চিঠি লিখেছিলেন। তাতে আই. এ. পাস করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার আমন্ত্রণ তো ছিলই, তাঁর বাসায় এসে দেখা করার দাওয়াতও ছিল। তদনুযায়ী আমি ১৯৪৩ সালের ৩রা জুলাই শুক্রবারে কবির সিদ্দিক বাজারস্থিত ফুলবাড়ী বাসায় এসে দেখা করেছিলাম। সেখানেই তিনি ফর্রুখ আহ্‌মদের সদ্য প্রকাশিত কবিতাটি আমাদের দেখিয়েছিলেন।

বিশ শতকের তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময়ে প্রিন্সিপাল ইব্‌রাহীম খাঁ ও কাজী নজরুল ইসলামের মধ্যকার অবিস্মরণীয় ঐতিহাসিক পত্রবিনিময় থেকে আমাদের টাংগাইল করটিয়ার সাহিত্যিক আবহাওয়ার পরিচয় সুস্পষ্ট। সেভাবেই আমরা মানুষ। আমাদের সাহিত্য-চর্চার ধারাও সেজন্যে নিজস্ব সম্পদ ও নিজস্ব বুলি নিয়ে। সে ধারায় আমার লিখিত দু'একটি কবিতা তখন মাসিক "মোহাম্মদী"তে প্রকাশ হয়ে গেছে। এতকাল প্রগতিশীল ধারার অনুসারী কবি ফর্রুখ আহ্‌মদ আমাদের নিজস্ব ধারায় ফিরে আসায় আমরা যুগপৎ বিস্মিত ও আনন্দিত হয়েছিলাম। কবির সঙ্গে দেখা করার সুযোগ খুঁজছিলাম। বলা বাহুল্য, আমাদের করটিয়ার হাওয়ায় ছিল বাংলা সাহিত্যে ইসলাম ও মুসলিমকে সাহিত্য পদবাচ্যরূপে তুলে ধরার উদ্দীপনা।

১৯৪৪ সালের গরমের ছুটিতে কবি এ. এস. এম. আবদুল জলীলের সঙ্গে আমি প্রথম কলকাতায় যাই। সেবার যখন শারদীয় ছুটিতে আবার কলকাতায় যাই, তখন 'আজাদ' অফিসের দোতলায় ফর্রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে প্রথম দেখা হয়। সম্পাদনার অথবা অফিস সংক্রান্ত কোন কাজে বিশেষ ব্যস্ত থাকার জন্যেই তিনি খুব বেশী সময় আমাদের সঙ্গে আলাপ করতে পারেন নি।

এরপরে ১৯৪৮ সালের শেষার্ধে যখন ফর্রুখ আহ্‌মদ ঢাকায় আসেন, তখন আবার দেখা ও আলাপ-সালাম শুরু হয়। আমরা ইতিপূর্বেই ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসের শেষে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েছি। হলে সিট না পেয়ে নানা জায়গায় থাকতে

www.pathagar.com

হচ্ছে। বলিয়াদী প্রিন্টিং হাউসে থাকতে পূর্বপরিচিত সুসাহিত্যিক কাজী আফসারউদ্দীন আহমদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়। তিনি পাকিস্তান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঢাকায় এসে বলিয়াদী প্রিন্টিং হাউস থেকে দৈনিক 'জিন্দেগী' পত্রিকা প্রকাশ করতেন। ১৯৪৭ সালের শেষ ভাগেই ঢাকা রেডিওতে কথক হিসাবে তিনি আমার নাম দিয়ে আসেন। সেই সূত্রে কখনো কখনো রেডিওতে যাতায়াত করতে হচ্ছে। তখন নাজিমুদ্দীন রোডের রেডিও অফিস আমাদের বিশ্বাবদ্যালয়ের (এখনকার মেডিক্যাল কলেজ আউটডোর) কাছে ছিল। দরকার পড়লে সহজেই আসা যেত। ১৯৪৮ সালের শেষার্ধে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঢাকায় এসে কবি বেনজীর আহমদের আগমসী লেনস্থ ভাড়াটিয়া বাসায় উঠেছিলেন। থাকছিলেনও সেখানে। মাঝে মাঝে রেডিও অফিসের সামনের চা খানায়ই আলাপ হত। ফর্‌রুখ আমাকে কবি বেনজীর আহমদের বাসায় নিয়ে যান। বেনজীর আহমদ সাহেব বাইরে থেকে ফিরে এলে তাঁর সঙ্গে ফর্‌রুখ আমার পরিচয় করিয়ে দেন। পরে সে পরিচয় যথেষ্ট ঘনিষ্ঠ হয়েছিল।

কবি বেনজীর আহমদ ও কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ উভয়েই আমাকে খুব অকৃত্রিম ও বিশ্বস্ত বলে বুঝে নিয়েছিলেন।

১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারী থেকে আমি প্রিন্সিপাল ইব্‌রাহীম খাঁর (তখন পূর্ববঙ্গ শিক্ষা বোর্ডের প্রেসিডেন্ট) ৫ গোয়ালনগর রোডের বাসায় কয়েকমাস থাকি। ফর্‌রুখ আহমদ আমার সঙ্গে আলাপ করতে করতে সেখানেও গিয়েছেন।

এরি মধ্যে রেডিওতে কোনো নিয়মিত কাজ নেওয়ার ব্যাপারে চেষ্টা করতে করতে পরিচিত কারো কারো উদাসীনতায় বাধা হচ্ছে বলে বিরক্ত হয়ে ফর্‌রুখ আমাকে হঠাৎ একদিন বললেন, "আর পারা যাচ্ছে না, এখানে কিছুই হবে না। গ্রামেই ফিরে যাব।"

দুনিয়ার বাস্তবতা তাঁকে এমন কঠোর স্পর্শ দিয়েছে দেখে আমি চমকে উঠলাম। কিন্তু তাঁর মুখের দিকে তীব্রভাবে তাকিয়ে কঠিন কণ্ঠে বললাম,"উহু, সে হবে না। ঢাকার এই মাটি কামড়েও যদি থাকতে হয়, তাই আপনাকে থাকতে হবে। তবু গ্রামে ফিরে যাওয়া চলবে না। আপনার ঢাকার প্রয়োজন না থাকতে পারে, কিন্তু ঢাকার আপনার প্রয়োজন আছে।"

কথাটায় বোধ হয় কাজ হয়েছিল। ঐ সময়েই কি কারণে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আমাকে একটি শিল্পী মজলিস করতে বললেন। সেই গণতন্ত্রের ডামাডোলের দিনে (সে গণতন্ত্র কাকে বলে, তা আমি মানুষের ইতিহাস থেকে জেনেছি) আমি বললাম, "মজলিস করতে পারি। সকলের সঙ্গে আলোচনাও করতে পারি। সেখান থেকে নিজের অভিমত গঠন করতে পারি।" তবে এ-দেশে সংঘ গ'ড়ে তোলা সহজ নয়। সম-মানসিকতার লোক পাওয়া গেলেও উদার মানসিকতার মানুষ বড় একটা পাওয়া যায় না। আমাদের সে সংঘ স্বপ্নজগতে থেকে গিয়েছিল—তা আর বাস্তবে রূপ পায় নি।

www.pathagar.com

১৯৫০ সালে আমি ঢাকা ছেড়ে পাবনা এডওয়ার্ড কলেজে অধ্যাপনায় যোগদান করি। তখন থেকে ঢাকায় না এলে আর ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা হত না। রেডিও-তে তিনি স্থান করে নিয়েছিলেন। সেখানেই দেখা করার সুবিধা হত। সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সমাজের অবস্থা সম্পর্কে আলাপ হত।

রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকে ১৯৬৩ সালে ঢাকা কলেজে বদলী করার পর মাঝে মাঝে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা হয়েছে। রেডিওর কথিকা প্রচারের জন্যে গেলে সেই সুযোগে অনেক কথা হত।

বাংলাদেশ হওয়ার পরেও কাওরান বাজারে বাজার করে ফিরে আসার সময় অনেকদিন দেখা হয়েছে। পথে দাঁড়িয়ে অনেক আলাপ হয়েছে দেশের সাহিত্য-সংস্কৃতি ও শিল্প নিয়ে। মনের কথা বেশী প্রকাশ করা তিনি পছন্দ করতেন না। সেজন্যে কবিতাকেই তিনি প্রশস্ত মনে করতেন। আগেকার মত উৎসাহ না থাকলেও কথায় তিনি নৈরাশ্য প্রকাশ করেন নি। জীবনে তাঁর নৈরাশ্য থাকলেও তাঁর লেখায় নৈরাশ্য ছায়াপাত করেছিল বলে আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

মুহম্মদ আবূ তালিব

ফর্‌রুখের আশা ও স্বপ্ন

তাঁর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা কবে হয়, ঠিক মনে নেই; তবে শেষ দেখা হয় ২৬ রমযান, ১৩৯৪হিঃ/১৯৭৪ ঈসায়ী সন্ধ্যায়।

আকস্মিকভাবে হলেও সে রাতটি ছিল পবিত্র শব-ই-কদরের। এর অল্পদিন পরেই তাঁর ইন্তিকাল হয় (১৯ অক্‌টোবর ১৯৭৪ ঈসায়ী)। উল্লেখ্য, এর পূর্ব-বৎসরও একই সন্ধ্যায় তাঁর সঙ্গে আরও একবার দেখা হয়। মানে, সেই রাতটিও ছিল শব-ই-কদরের। তখন তিনি ঢাকা শহরের ইস্কাটন গার্ডেনের সরকারী আবাসে থাকতেন (শেষ নিশ্বাসও তিনি এখানেই ফেলেন)। ঠিক যোহরের ওয়াক্ত তাঁর বাসায় যাই। রমযানের মাস বলে খাওয়া-দাওয়ার কোনো বালাই ছিল না। যদিও জানতাম, ইফতার না করে ফেরা যাবে না, তথাপি সংকল্প করেছিলাম বাসায় ফিরে ইফতার করার।

কিন্তু ফেরা হয় নি। কবি কিছুতেই ছাড়লেন না। বললেন, "আজ ইফতার না করে যেতে পারবেন না। অনেকদিন ধরে কোনো বন্ধু-বান্ধব আসেন না। শরীরের অবস্থাও ভালো যাচ্ছে না কিছুদিন। হায়াতে মুলাকাত আর হয় কি না হয়। অবশ্য আল্লাহ্ তায়ালাই ভালো জানেন।"

বললাম, "এ অবস্থায় আপনার রোযা রাখা কি ঠিক হচ্ছে?"

বললাম, "আর ক'টা দিনই বা আছি! পারতপক্ষে রোযা কোনোদিন ছাড়ি নি।" তখন বুঝতে পারি নি, এই দেখাই তাঁর সঙ্গে শেষ দেখা হবে!

সেদিন বেশ কিছু সময় তাঁর সঙ্গে কাটাবার সুযোগ হয়েছিল। অনেক কথা হয়েছিল, অনেক পুরোনো প্রসঙ্গও এসেছিল।

প্রথম দেখাতেই তিনি অভিযোগ করলেন, "আপনাকে কতদিন ধরে বলছি, 'কাসাসুল আম্বিয়া' পুথিখানি সম্পাদনা করে দিন। তা দিলেন না! আমার পক্ষে হয়ত তা দেখে যাওয়া আর সম্ভব হবে না।"

বললাম, "আমি তো কাজে হাত দিয়েছিলাম। অনেক বড় পুথি, নবীদের কাহিনী; সম্পাদনা করা সহজসাধ্য নয়। সম্পাদনা করে যদি দেখি, ছাপা হচ্ছে না, তাহলে সে দুঃখ রাখবার জায়গা থাকবে না। আপনি তো তা ছাপার কোনো ভরসা দিতে পারলেন না!"

কবি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কেন জানি নে, পরিচালক সাহেবরা এত বড় বই ছাপাতে আগ্রহ প্রকাশ করেন না।" পরিচালক মানে, বাংলা একাডেমীর তদানীন্তন

www.pathagar.com

পরিচালক—বর্তমানের মহাপরিচালক নন। বাংলাদেশ হওয়ার পর এ বিষয়ে তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করার সুযোগ তিনি পান নি। বলা বাহুল্য, পাকিস্তান আমলে যখনই তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছে, "কাসাসুল আম্বিয়া"র প্রসঙ্গ উঠেছে; এবং একইভাবে সে কথার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। কবির চোখে-মুখে হতাশার ছাপ দেখেছি।

তাঁর কাব্য-সাহিত্যে "কাসাসুল আম্বিয়া" তথা পুথি–সাহিত্যের গভীর ছায়াপাত ঘটেছে। তাঁর "সাত সাগরের মাঝি"র (১৯৪৪) খণ্ড কবিতাগুলিতে তো বটেই, শ্রেষ্ঠ কাব্য "হাতেম তায়ী" (১৯৬৬), কাব্য-নাট্য "নৌফেল ও হাতেম"-এও (১৯৬৭) তার ধারা বহমান। সে ভিন্ন কথা।

আর একদিনের ঘটনা।

তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা অফিসে গেছি। দেখি, তিনি কি একটি কাজে ব্যস্ত আছেন। আমাকে দেখেই বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, আজ আপনাকে মিষ্টি খাওয়াবো।" হঠাৎ মিষ্টি খাওয়ানোর কথা কেন, বুঝতে পারলাম না, তাই বললাম, "না, মিষ্টি খাবো না।" তিনি বললেন, "বসুন, মিষ্টি আপনার পাওনা হয়েছে।"

বুঝতে পারলাম, অল্পদিন আগেই আমার "লালন শাহ ও লালন গীতিকা" ১ম খণ্ড (১৯৬৮) ও "বাংলা সাহিত্যের ধারা" (১৯৬৮) বই দু'খানি বের হয়েছে। এ পাওনা হয়ত তারই জন্যে। তাই একটু বসলাম।

কবির কাজ সেরে উঠতে বেশ দেরী হ'ল। তাই কাফেটেরিয়ায় গিয়ে দেখা গেল মিষ্টি ফুরিয়ে গেছে। কবি এতটুকু ইতস্তত না করে বললেন, "আপনাকে রসগোল্লা খাওয়াবো ভেবেছিলাম, কিন্তু আপনার নসিবে নেই, তা আমি কি করব! এখন গরম সিঙাড়া খান।"

গরম সিঙাড়া আর চা খেয়ে উঠতে গেছি, এমন সময় কবি বললেন, "একটু বসুন, কিছু আলাপ করা যাক।"

কি আলাপ? তিনিই শুরু করলেন। বললেন, শুনেছেন, কলির ব্রাহ্মণেরা আবার গো-মাংস খাওয়া শুরু করেছে?"

বললাম, "তাই নাকি? এ আর নতুন কথা কি, শাস্ত্রেই তো আছে—

ব্রাহ্মণে রাখিবে দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা পায়ে নড়ি হাতে কামান ধরিবে।।
মসনবি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকাচুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর।।"

তিনি হেসে বললেন, 'তাই নাকি? এ কোন শাস্ত্রের কথা?'

বললাম, "বাংলার বৈষ্ণব শাস্ত্রের কথা—কবি জয়ানন্দের শ্রীচৈতন্য মঙ্গলের। নিতান্তই হালের শাস্ত্র, এবং বিশুদ্ধ বাংলা ভাষায় লেখা।"

www.pathagar.com

তিনি হেসে বললেন, "তাহ'লে তো শাস্ত্রমতই কাজ হয়েছে। আর শাস্ত্রটি যখন খাস বাংলাদেশেরই তখন তো আর কথা চলে না।

আবার বললেন, "শুনেছেন বোধ হয়—শ্রী সুনীল কুমার মুখোপাধ্যায় কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে একখানি বই লিখেছেন।"

বললাম, "বেশ তো। সুনীল বাবু এক সময়ে আমার সহকর্মী ছিলেন। তাঁকে তো বর্তমান বাংলাদেশের 'ভাই গিরিশচন্দ্র সেন' নামে অভিহিত করা যায়। বাঙালী মুসলমান সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের বিষয়ে তাঁর আগ্রহ প্রচুর। কিন্তু তাঁর বিশ্লেষণ কি আপনার ভালো লাগবে?"

বললেন, "না লাগলেই বা ক্ষতি কি? সাহিত্য তো পাঠকদের জন্য এবং সকল পাঠকের রুচি সমান নয়।"

বললাম, "আপনি একজন বড় কবি, তবে আপনার দৃষ্টিকোণ বড় সংকীর্ণ।"

বললেন, "কি রকম"?

বললাম, "আপনার দৃষ্টি নাকি 'হেরার রাজতোরণে'র বাইরে যায় না!"

শুনে তিনি যে অট্টহাসি হেসেছিলেন, সে হাসি যেন আমি আজও শুনতে পাচ্ছি। সেদিন কবিকে বেশ উৎফুল্ল দেখাচ্ছিল।

তিনি হঠাৎ জিজ্ঞেস করে বসলেন, "আচ্ছা প্রফেসর সাহেব, বলুন তো, আমাদের দেশে লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনির আবাদ হতে পারে না?" ঐ সময়ে তিনি এ-সব বিষয় নিয়ে বেশ মাথা ঘামাচ্ছিলেন। তাঁর কেমন যেন ধারণা হয়েছিল, বাংলার উপকূলীয় এলাকায় এ সব মসলার ফসল সহজেই ফলতে পারে। আমি একটু রহস্য করে বললাম,

তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গফুল এলাচির মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি।
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমীনের শুভ্র ললাট চুমি
পরীর দেশের স্বপ্নসেহেলী জাগে গুলে বকাওলি।

কবি বললেন, "না না, ঠাট্টা নয়, আমার সত্যি বিশ্বাস হয়, বাংলাদেশে এসব প্রচুর ফলতে পারে, সে জন্যে বিদেশের পরে আমাদের নির্ভর আর না করলেও চলতে পারে, কি বলেন?"

আমি আর কি বলব, বিশেষ করে ও-সব বিষয়ে আমার কোনো অভিজ্ঞতাই ছিল না। তাই বললাম, "কি জানি!"

'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা'।

কবির স্বপ্ন সফল হতেও পারে।

তাঁর যুক্তি, সিলেট এলাকায় কমলা জন্মে। লবঙ্গ, এলাচি, দারুচিনিই বা হবে না কেন? কমলাকে আরবী ভাষায় 'নারাঙ্গ' বলে। ইংরাজিতে নারাঙ্গ বা নারাঞ্জ থেকে

www.pathagar.com

অরেঞ্জ (Orange) হয়েছে। একটি কমলা—ইংরাজি ভাষায় A Narange'; লোক-ব্যুৎপত্তির ফলে An Orange হয়েছে; ভাষাতত্ত্ববিদদের এই মত।

কবির কবিতায় ভাবানুষঙ্গে লবঙ্গ, নারাঙ্গী, জাফরান, এলাচি, দারুচিনি বন প্রভৃতি শব্দ এসেছে।

এ-সব নিয়ে কবির সঙ্গে আরও আলাপ হয়েছিল, সে সবের উল্লেখ প্রয়োজন নেই। তবে তিনি এ-বিষয়ে চট্টগ্রাম ও সিলেটের উল্লেখ করে বলেছিলেন যে, ঐ সব এলাকার খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীতেও চন্দন কাঠ পাওয়া যেতো। আরবীয় বণিকেরা তাঁদের জাহাজ বোঝাই ক'রে এদেশের হরিতকী, আমলকী, বহেরা (ত্রিফলা) ইত্যাদি স্বদেশে নিয়ে যেতেন, এ বিষয়ে সাক্ষ্য আছে। আমি বললাম, "নবম শতকের আরবীয় কাপ্তান সুলায়মানের বাংলাদেশ সম্বন্ধীয় আরবী ভাষায় লিখিত বিবরণীতে (সিলসিলাতুত্ তাওয়ারীখ-ই-রাহ্‌মা বা দারহামী) সমকালীন বাংলাদেশের এই সব পণ্যদ্রব্যের রফতানীর কথা উল্লিখিত হয়েছে। ইনি বাংলার রাজা ধর্মপালের সময়ে বাংলায় এসেছিলেন বলে জানা যায়।" রাত্রি অনেক হয়ে আসছিল, এদিক তারাবী নামাযের সময়ও এসে গেল, তাই তাড়াতাড়ি বিদায় নিলাম।

আরও একদিনের কথা। স্বপ্নের 'তা'বীর' নিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার আলোচনা হয়েছিল। তা'বীর মানে ব্যাখ্যা (স্বপ্নফল সংক্রান্ত)।

আমি বললাম, "আপনি স্বপ্নে বিশ্বাস করেন?"

তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই।"

আমি বললাম, "অনেকে বিশ্বাস করেন না।"

তিনি বললেন, "মুসলমানদের স্বপ্নে বিশ্বাস করতে হয়।"

বললাম, "কেন, কি ভাবে?"

তিনি বললেন, "হযরত ইউসুফের স্বপ্ন কি সফল হয় নি? হযরত ইবরাহীমের (আ) স্বপ্নও তো সত্য ছিল।"

আমি বললাম,"সে তো নবীদের স্বপ্ন!"

তিনি বললেন, 'নবীরাও মানুষ ছাড়া অন্য কিছু নন।"

এ নিয়ে আর বাড়াবাড়ি না করে বললাম, "আপনি স্বপ্নের তা'বীর' বলতে পারেন?"

বললেন, "বলেই দেখুন না একটি।"

আমি তখন আমার ব্যক্তিগত দেখা কয়েকটি স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি শুনে কিছুক্ষণ গম্ভীর থেকে বললেন, "আপনি কোনো পীরের মুরীদ হয়েছেন?"

আমি বললাম, "না।"

তিনি বললেন, "অবিলম্বেই মুরীদ হোন।"

আমি বললাম, "কেন?"

www.pathagar.com

তিনি বললেন, "আপনার স্বপ্ন খুব শুভ। তার নির্দেশই এইরূপ। মুরীদ না হলে জীবনের পূর্ণাঙ্গতা আসে না। আল্লাহ আপনার জন্য ইমামতী রেখেছেন, আর আপনি দূরে দূরে ঘুরছেন।"

আমি বললাম, "ভালো পীর কোথায় পাই?"

তিনি বললেন, "কামিল পীর কি আর ঘরে বসে পাওয়া যায়? তবে হাতের কাছে ফুরফুরা শরীফে যেতে পারেন। এ কালে কামিল পীরের সন্ধান পাওয়া মুশকিল।"

আমি সবিনয়ে বললাম, "আমার মরহুম আব্বা ফুরফুরা শরীফের মরহুম পীর হযরত আবূবকর সিদ্দিকীর মুরীদ ছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় উস্তাদ আল্লামা ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সাহেবও তাঁর মুরীদই নন শুধু, তাঁর অন্যতম খলীফাও ছিলেন। আমি জানি, তাঁর কয়েকজন মুরীদও ছিল। আমি তো ব্যক্তিগতভাবে তাঁর সংস্পর্শে বহুদিন কাটিয়েছি। বর্তমানেও তাঁর আদর্শেই পথ চলতে চেষ্টা করছি; তাই যদি বলি, আমি তাঁরই মুরীদ, তাহলে কি ভুল বলা হবে?

তিনি বললেন,"মনে মনে মুরীদ হলে চলে না। মুরীদ মানে, 'বাইআত' হওয়া। 'বাইআত' হওয়া মানে বিক্রি হয়ে যাওয়া। মহাকবি হাফিযের ভাষায় "বামায় সাজ্জাদা রঙ্গীন কুন" ইত্যাদি। মানে হাফিয বলেছিলেন, পীর যদি ইরশাদ করেন তবে জায়নামাযে শারাব (মদ) ঢেলে দাও। কারণ, যিনি পথ দেখান, তাঁর পথের আদি অন্ত জানা আছে। তাই কামিল পীরের সন্ধানই কাম্য।"

আমার স্বপ্ন-কাহিনীটি বলা হয় নি। কাহিনীটি এইরূপ—

স্বপ্নে দেখলাম, কোনো এক নামাযের জামাতে ইমামতী করছি। হঠাৎ দেখি, মুক্তাদীরা কিসের যেন ভয়ে নিয়ত ছেড়ে দিয়েছে। কোনো হিংস্র শ্বাপদ সামনে দেখলে যেমন হয়, তাদের চেহারাতেও তেমনি ভীতির চিহ্ন প্রতিফলিত হচ্ছে। মনে হ'ল, যেন ঘরে কোনো বিষাক্ত সাপ ঢুকেছে, তার দিকে তারা ভীত ও সন্ত্রস্ত হয়ে তাকাচ্ছে। আমিও সভয়ে নামায ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। কী আশ্চর্য! চেয়ে দেখি, আমার মাথায় লাল রুমী টুপিটি শোভমান কিন্তু পরনে কোনো কাপড় নেই! এই সঙ্গে আরও একটি স্বপ্নের কথা বলেছিলাম। সেদিন দেখেছিলাম, যেন একটি মীলাদ মাহফিলে হাযির হয়েছি। মীলাদ পড়াচ্ছিলেন ডক্‌টর মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। আমার মাথায় টুপি ছিল না। ডক্‌টর সাহেব আমার মাথায় একটি লাল রঙের (রুমী টুপি) টুপি পরিয়ে দিয়েছিলেন।

কবির ব্যাখ্যার কথা আগেই বলা হয়েছে, তাই আর নতুন করে বলার কিছু নেই।

ফেরার জন্যে পা বাড়াচ্ছি, এমন সময় তিনি প্রশ্ন করলেন, "আপনার ডাক্তারীর কতদূর?"

হেসে বললাম, "রাত পোহাবার কত দেরী, পাঞ্জেরী?" ডাক্তারী মানে পিএইচ.ডি. ডিগ্রী, যা আজও আমি পাইনি। আরো বললাম, "ডাক্তারী? সে গুড়ে বালি।"

www.pathagar.com

বললেন "কেন?"

বললাম, "মুসলমানী পুঁথি নিয়ে গবেষণা করলে কি ডাক্তারী হয়? বাংলা সাহিত্যে মুসলমানীর কোনো স্থান নেই।"

তিনি একটু রাগতস্বরে বললেন, "কে বলেছে? বাংলা সাহিত্যের বুনিয়াদই তো মুসলমানদের হাতে হয়েছে।"

বললাম, "তা হয়ত হয়েছে, কিন্তু সে তো 'আণ্ডাভাজা'; আণ্ডাভাজা'কে কে কবে 'মামলেট' বলেছে?"

বললেন, "গিন্নির হাতের আণ্ডাভাজা, আর কাফেটেরিয়ার মামলেটের স্বাদ কি এক?"

বললাম, "তা হয়ত নয়, কিন্তু আণ্ডাভাজা 'আণ্ডাভাজা'ই, আর মামলেট 'মামলেট'ই।"

বললেন, "তাই যদি হয়, আমার কাছে আণ্ডাভাজার মূল্যই বেশী।"

আমার ডক্‌টরেট কবি-কথিত 'ডাক্তারী' ডিগ্রীর একটু ইতিহাস আছে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রিসার্চ ফেলো হিসাবে যোগদান কালে (১৯৬৪) কবিকে একখানি চিঠি লিখেছিলাম, তাতে ডক্‌টরেট ডিগ্রী বলতে আমি রহস্য ক'রে 'ডাক্তারী' ডিগ্রীর কথা উল্লেখ করেছিলাম।

কবির 'ডাক্তারী' শব্দ ব্যবহারে তার প্রতি ইঙ্গিত আছে।

কবি আমার প্রতি বড় আশাবাদী ছিলেন। কিন্তু আমি তার কিছুই করতে পারি নি।

জানতে পারা গেল, আমার লেখা সেই চিঠিখানি কবির বংশধরদের কাছে আছে। কবি কিন্তু তার কোনো জওয়াব দেন নি। বলা বাহুল্য, চিঠিপত্রের জবাব তিনি বড় একটা দিতেন না। ওটি তাঁর ধাতেই সইত না। নেহায়েৎ জরুরী না হলে তিনি চিঠির জবাব দিতেন না। রাত বেশী হওয়ার কারণে আর আলাপ বাড়ানো গেল না। তাই সা' জানিয়ে উঠে পড়লাম।

যদি জানতাম, সেই সাক্ষাৎই জীবনের শেষ সাক্ষাৎ হবে, তা হলে হয়ত আ৯ কিছুক্ষণ তাঁর সঙ্গে কাটাতাম। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা তা নয়, তাই চলে এলাম। আজ তিনি নেই। আল্লাহ্ তাঁর পরলোকগত রূহের মাগফিরাত করুন।

পরিশেষে একটি বেদনাদায়ক স্মৃতি স্মরণ করে এ আলোচনার সমাপ্তি টানা যাক।

তখন পাকিস্তানী শাসকচক্রের আওতা থেকে সবেমাত্র মুক্ত হয়ে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ কায়েম হয়েছে। কবি হলেন তার শিকার। তাঁর বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কোনো অভিযোগ নেই, অথচ নিয়মিত বেতন পাওয়ার পক্ষে তাঁর বাধা ঘটলো। কি করবেন তিনি, ভেবে সারা হলেন। বিনা চিকিৎসায় তাঁর এক সন্তানের মৃত্যু হ'ল।

www.pathagar.com

আমি তখন ঢাকায়। জনৈক কবি-বন্ধুর কাছে শুনে আমিও বিচলিত হ'লাম। ঢাকা শহরে তাঁর বন্ধুর অভাব নেই। অথচ কোনো বন্ধুই আজ কাছে নেই। যাঁরা নিত্যনিয়ত তাঁর কাছে ঘোরাফেরা করতেন, তাঁরাও আর কাছে ঘেঁষছেন না। এখন কি করা! কবিও নিতান্ত নির্বিকার। এ জন্যে একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া আর কাউকে কিছু বলতে নারায। অগত্যা আমাকেই সচেষ্ট হতে হ'ল। বলতে লজ্জা নেই, এ ব্যাপারে জীবনে যা করি নি, তাই করতে হ'ল। সমকালীন জনৈক মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে ধর্ণা দিলাম। তাঁর বেতনপ্রাপ্তির ব্যাপারে কিছু করা যায় কিনা! মন্ত্রী মহোদয় ধৈর্যের সঙ্গে সব শুনলেন, তাঁর পারিবারিক দুরবস্থার কথাও শুনলেন ঃ কিন্তু কী আশ্চর্য! তিনি সামান্যতম মানবিক বোধের পরিচয় দিতেও ব্যর্থ হলেন। আমি ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলাম। কিন্তু রহমানুর রহীমের অশেষ অনুগ্রহ যে, একদিন পরেই রাজশাহী ফিরে খবরের কাগজে দেখলাম, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী মহলের শুভবুদ্ধির উদয় হয়েছে, তাঁরা একটি যুক্ত বিবৃতিতে কবি ও তাঁর পরিবারের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের জন্যে সরকারী ও বে-সরকারী পর্যায়ের কর্মচারী, উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ও জাগ্রত দেশবাসীর প্রতি আহবান জানিয়েছেন। তারপরের ইতিহাস আমাদের সকলেরই জানা। তবে প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখা প্রয়োজন, এর পরেও সর্বশেষ খবর জানিয়ে, খবরের কাগজের উক্ত বিবৃতির দোহাই দিয়ে লেখা আমার ব্যক্তিগত পত্রের মামুলি জবাব দিতেও ব্যর্থ হয়েছেন উক্ত মন্ত্রী সাহেব। একেই বলে নসিবের গর্দেশ।

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবদুল গফুর

আতিথ্যে উদার আদর্শে নিরাপোস

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় উনিশ শো পঁয়তাল্লিশে তাঁর কবিতার মাধ্যমে। সবে হাই মাদ্রাসা পাস করে ফরিদপুর থেকে ঢাকা এসে গভর্নমেন্ট ইসলামিক ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ভর্তি হয়েছি। থাকি নওয়াববাড়ীর লাগোয়া, আহসানউল্লাহ্‌ রোডের প্যারাডাইস হোস্টেলে। কলেজ জীবনে প্রবেশের পূর্বেই সাহিত্য-চর্চার একটু-আধটু অভ্যাস ছিল। "আজাদ", "মোহাম্মদী", "সওগাত" প্রভৃতি পত্রিকায় নবীন-প্রবীণ মুসলমান লেখকদের রচনা গোগ্রাসে গিলতাম। নবীনদের মধ্যে যাঁদের রচনা সেই বয়সেই আমার মন কেড়ে নিয়েছিল তাঁদের অন্যতম ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। 'ফর্‌রুখ' নামটা ছিল যেমন নতুন ধাঁচের, তাঁর কবিতাও ছিল তেমনি নতুন স্বাদের: নতুন আঙ্গিক ও ছন্দ-দ্যোতনার কারণে আমাকে তা গভীরভাবে মুগ্ধ করত।

কলেজে এসে সাহিত্য-চর্চার ক্ষেত্রে যাঁদের অন্তরঙ্গ সঙ্গী হিসাবে পেয়েছিলাম, তাঁদের অন্যতম ছিলেন মুহাম্মদ আবু বকর। বাড়ী যশোর। অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র। উনিশ শো চুয়াল্লিশ সালে বাংলা-আসামের মধ্যে তিনি হাই মাদ্রাসা পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেছিলেন। আমার এক ক্লাস উপরে পড়লে কি হবে, অল্প দিনের মধ্যেই তাঁর সঙ্গে আমার হৃদ্যতা জমে ওঠে। কথায় কথায় ইংরেজী ও বাংলা কবিতা আবৃত্তি করা ছিল তাঁর নেশার মত। আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁর বিশেষ প্রিয় কবি ছিলেন আহসান হাবীব ও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। আবু বকরের কণ্ঠে যখন শুনতাম আহসান হাবীবের সেই বিখ্যাত পঙক্তিদ্বয় ঃ

ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীর,
তবু বারবার সবুজ পাতার স্বপ্নেরা করে ভীড়!

অথবা ফর্‌রুখের—

আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙ্গা মাস্তুল দেখে দিক করতালি,
তবুও জাহাজ আজ ছোটাতেই হবে।

তখন তন্ময় হয়ে যেতাম তাঁর আবেগ-মেশানো আবৃত্তিতে।

www.pathagar.com

একদিনের ঘটনা কিছুতেই ভুলতে পারি না। তখন গোয়ালন্দ ঘাট থেকে স্টীমারে উঠে নারায়ণগঞ্জ হয়ে ট্রেনে ঢাকা আসতাম। বড় বড় স্টীমার ভিড়ত গোয়ালন্দে। পদ্মা দিয়ে পাটনা এবং যমুনা দিয়ে ধুবড়ী, আসাম যেত সেসব স্টীমার। কলকাতা মেলে অথবা প্যাসেঞ্জার ট্রেনে গোয়ালন্দ ঘাটে এসে স্টীমারে উঠবার পরও অনেক সময় হাতে থাকত স্টীমার ছাড়বার আগে। কারণ স্টীমার ছাড়ত মধ্যরাতে। এই বাড়তি সময়টা যাত্রীদের অনেকেই স্টীমারের ডেকে বিছানা পেতে জায়গা দখল নেবার পর নীচে যেয়ে বেড়িয়ে আসত। যে দিনের কথা বলছি, সন্ধ্যা-রাতের ট্রেনে গোয়ালন্দ ঘাটে নেমে তড়িঘড়ি করে স্টীমারে ওঠার পরই আবু বকরের সাথে দেখা। তিনিও ঢাকা যাবেন। আবু বকরই প্রস্তাব দিলেন নীচে বেড়িয়ে আসতে। সঙ্গে সঙ্গে রাজী হলাম। দুই বন্ধু মিলে স্টীমার ঘাটের অদূরে একটি লাইটপোস্টের নীচে ঠিক কিসের উপরে আজ এতদিনে মনে পড়ছে না, বসে পড়লাম। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। জ্যোৎস্না রাতের আকাশ। যেখানে বসেছি তার প্রায় তিনদিকেই পানি। আমাদের পায়ের কাছে আছড়ে পড়ছে পদ্মার উচ্ছল ঢেউ। এমনি এক অপূর্ব পরিবেশে আবু বকর তাঁর জামার মধ্য থেকে রহস্যময় ভঙ্গিতে বের করলেন একখানা সদ্য প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের "সাত সাগরের মাঝি"। তারপর যা হবার তাই হল। আবু বকর তাঁর ভরাট গলায় আবৃত্তি করে চললেন "সাত সাগরের মাঝি'র একটির পর একটি কবিতা। আর আমি হারিয়ে গেলাম সেই কাব্যের ছন্দ-মাধুরীতে। আবু বকরের রুচির প্রশংসা করতে হয়। সেই পরিবেশে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের "সাত সাগরের মাঝি"র কবিতাগুলো সেদিন আমার প্রাণে কি যে সাড়া জাগিয়েছিল, তার মধ্যে কি যে এক অনির্বচনীয় আনন্দের আস্বাদ পেয়েছিলাম, সেই অপূর্ব অনুভূতি, সেই দৃশ্য আর সেই ঘটনা এখনও আমার মনে গেঁথে আছে।

সেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। আমাদের সেই স্বপ্নের কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। অথচ তখনও আমি তাঁকে দেখি নি। দেখলাম আরও এক বছর পরে। কলকাতায় গিয়েছিলাম আমার আর এক অগ্রজতুল্য বন্ধু এনামুল হকের (আবু বকরের সহপাঠী, বর্তমানে রেডিও বাংলাদেশের মহাপরিচালক) সঙ্গে। তখন পাকিস্তান আন্দোলন তুঙ্গে, আর আমরা সে আন্দোলনের তরুণ উৎসাহী কর্মী। সাঁইত্রিশ নম্বর রিপন স্ট্রীট ছিল পাকিস্তান আন্দোলনের বিপ্লবী মুখপত্র সাপ্তাহিক "মিল্লাত"-এর অফিস। সেই অফিসে ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে দেখলাম। না, কথা হয় নি, শুধু চোখের দেখা । শেরওয়ানী পরা একমাথা ঝাঁকড়া চুল, থুতনিতে সামান্য দাঁড়ি, বড় বড় দু'টি চোখ—যেন চোখ দুটি থেকে আলো ঠিকরে বেরুচ্ছে। মুখভর্তি পান, বন্ধুদের সাথে কথা বলছিলেন।

কবির সঙ্গে আলাপ হয় অবশ্য তারও অনেক পরে। এর মধ্যে পাকিস্তান হয়ে গেছে। সময়টা ছিল উনিশ শো আটচল্লিশ-উনপঞ্চাশ সালের কোনো একটা দিন।

www.pathagar.com

ইতিমধ্যে কথাশিল্পী শাহেদ আলীর সাথে আমার পরিচয় হয়েছে। তিনি এক দিন নিয়ে গেলেন আমাকে সদ্যপ্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান তমদ্দুন মজলিসের অফিসে—১৯ নং আজিমপুর রোডে। এটা ছিল তখন মজলিসের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক আবুল কাসেমের বাসা। তমদ্দুন মজলিসে যোগদান করি নি, অথচ এ সময়ই মজলিসের একটা সাহিত্যসভা উপলক্ষে জনাব শাহেদ আলী আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন কলকাতা থেকে সদ্য আগত কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে। উদ্দেশ্য, উল্লেখিত সাহিত্যসভায় কবিকে দাওয়াত দেওয়া। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তখন থাকতেন কবি বেনজীর আহ্‌মদের আগামসী লেনস্থ বাসায়। আবার দেখা হল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে। বড় বড় চোখ, ধারালো নাক, ততোধিক ধারালো কথাবার্তা। প্রথমেই প্রশ্ন করে বসলেন উদ্যোক্তা সংস্থা সম্পর্কে, "তমদ্দুন মজলিস ? কিসের তমদ্দুন ? তমদ্দুনে হনুদ, তমদ্দুনে নাসারা, না তমদ্দুনে ইসলাম ?"

এই ধরনের আকস্মিক প্রশ্নাঘাতের জন্যে বোধ করি শাহেদ আলী প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি কি উত্তর দিলেন, এত দিনের ব্যবধানে আজ আমার সম্পূর্ণ মনে নেই। তবে মনে হল, কবি সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট হলেন না। আমার আজও মনে আছে, তখন আমি মজলিসের সদস্য বা কর্মী কিছু না হওয়া সত্ত্বেও গায়ে পড়ে তমদ্দুন মজলিসের সপক্ষে কথা বলতে চেষ্টা করলাম, "তমদ্দুনে হনুদ বা নাসারা নয়, তমদ্দুনে ইসলাম।"

সেই যে সম্পর্কের সূত্রপাত হলো, এ সম্পর্ক অক্ষয় হয়েছিলো এবং তা অটুট থাকল শেষদিন পর্যন্ত। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কোনদিন মজলিসের সদস্য হন নি, অথচ নাম দস্তখত করা সদস্যদের তুলনায় তাঁর স্থান আগাগোড়াই নির্দিষ্ট ছিল অনেক উপরে। তিনি বাস্তব ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছিলেন আমাদের সকলের " ফ্রেন্ড, ফিলোসফার, গাইড।" কী মজলিস, কী 'সৈনিক" কী অন্য কোন ব্যাপারে যখনই কোন প্রয়োজন দেখা দিয়েছে, ছুটে গিয়েছি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে—পরিচয়ের অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন আমাদের সকলের 'ফর্‌রুখ ভাই'। জাতীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের হেন সমস্যা নেই যা তাঁর সাথে আলোচনা হত না এবং যার সমাধানের পথনির্দেশ তিনি দিতেন না। এসব আলোচনা কখনও হত আমাদের অফিসে, যখন তিনি নিজেই চলে আসতেন ১৯ নং আজিমপুর রোডে, কখনও তাঁর বাসায় বা বাসার কাছে কোন চায়ের দোকানে, অথবা নাজিমুদ্দীন রোডে—সাবেক রেডিও অফিসের বিপরীত দিকের সেই আবন মিয়ার বিখ্যাত চায়ের দোকানে। আর বিষয়বস্তু? শুধু কবিতা বা সাহিত্যই নয়, অনায়াসে এ সব বিষয়বস্তুর মধ্যে স্থান লাভ করত দেশের গোটা সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি, এমনকি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি। কারণ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তো একজন কবি মাত্র ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সচেতন সাহিত্য ও সংস্কৃতিকর্মী,

www.pathagar.com

তিনি ছিলেন একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মূল প্রেরণা ও নায়ক। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন একটি প্রতিষ্ঠান।

"সৈনিক" বা "দ্যুতি"-তে কখন কি বিষয়ে লেখা প্রকাশ করা প্রয়োজন, সাংস্কৃতিক ফ্রণ্টে কখন কোন কর্মসূচী গ্রহণ করতে হবে, এসব বিষয়ে আমরা যেমন নির্দ্বিধায় পরামর্শ চাইতাম তাঁর, তিনিও তেমনি দিক-নির্দেশনা দেয়াকে বিনা সঙ্কোচে তাঁর এখতিয়ারভুক্ত মনে করতেন। যখনই প্রয়োজন বোধ করেছেন, কবিতা নিয়ে নিজেই এসেছেন সৈনিক অফিসে, আবার কখনও খবর পেয়ে আমরা তা সংগ্রহ করেছি তাঁর বাসা বা অফিস থেকে।

তিনি সাহিত্য, সাহিত্য-চর্চা, সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রভৃতি সম্বন্ধে প্রবল উৎসাহী থাকলেও সাহিত্যসভা-সমাবেশ প্রভৃতি পারতপক্ষে এড়িয়ে চলতেন। তবে হ্যাঁ, প্রয়োজন দেখা দিলে এসব ব্যাপারে তিনি উদ্যোগ গ্রহণেও কুণ্ঠিত হতেন না। শিল্প-সাহিত্য মজলিস, পাক সাহিত্য মজলিস, রওনক, পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি প্রভৃতি সাহিত্য সংস্থা গঠনে, ১৯৫২ সালের ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলন ও ১৯৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী সংগঠনে এবং ১৯৬৫ সালে রেডিওতে লেখক-ফ্রন্ট গঠনে তিনি ছিলেন অন্যতম প্রধান প্রেরণা।

ফর্‌রুখ ভাই স্তাবকতাকে প্রবলভাবে ঘৃণা করতেন। তিনি ছিলেন কঠোরভাবে আত্ম প্রচারবিমুখ। তাঁর সময়ে এবং বর্তমান কালে প্রচুর নামকরা কবি-সাহিত্যিককে দেখা গেছে—জন্ম দিবসের প্রস্তাবে খুশীই হন। কিন্তু ফর্‌রুখ ভাইয়ের জন্মদিবস পালনের প্রস্তাব দিয়ে কেউ কোনদিন তাঁর কাছ থেকে সসম্মানে ফিরে যেতে পারেন নি। অথচ তাঁর সমসাময়িক কালের বিশেষ করে আদর্শবাদী ভাবধারার কবি-সাহিত্যিকদের জন্যে তাঁর উৎসাহে কোনদিন এতটুকু কমতি দেখা দেয় নি। পঞ্চাশের দশকে তাঁর উৎসাহেই তাঁর "সাত সাগরের মাঝি"-র দ্বিতীয় সংস্করণ এবং "সিরাজাম মুনীরা"র সঙ্গে কথাশিল্পী শাহেদ আলীর প্রথম গল্পগ্রন্থ "জিবরাইলের ডানা" প্রকাশিত হয় ৫০ লালবাগ রোড থেকে। লালবাগ রোডের তমদ্দুন প্রেস থেকে সৈয়দ আবদুল মান্নান সম্পাদিত মাসিক "তাহজীব", কৈলাশ ঘোষ লেন থেকে মুহিউদ্দীন খান সম্পাদিত সাপ্তাহিক "আজ" ও মাসিক "মদীনা" এবং বাবুবাজার কালাচারাল প্রেস থেকে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ সম্পাদিত মাসিক "পূবালী" প্রভৃতি পত্রিকা প্রকাশের পেছনে ফর্‌রুখ ভাইয়ের প্রেরণা ছিল একেবারেই প্রত্যক্ষ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী ভাবধারার দু'জন লেখক-অধ্যাপক কাজী দীন মুহম্মদ ও হাসান জামান বহু ঘাত-প্রতিঘাতের পর ডক্টরেটকরণের উদ্দেশ্যে লন্ডন যাবার জন্যে মনোনীত হলে প্রধানত কবি ফর্‌রুখ ভাইয়ের প্রেরণাতেই বিশ্ববিদ্যালয় ভবনে তাঁদের জন্যে সংবর্ধনা সভা আয়োজিত হয়েছিল। সে যুগের কত লেখক-সাহিত্যিক যে ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাছে তাঁদের সাহিত্যপ্রতিভা বিকাশের প্রত্যক্ষ প্রেরণা লাভ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ ভাইয়ের আতিথেয়তা ছিল একেবারেই অতুলনীয়। কোনদিনই তাঁর অবস্থা সচ্ছল ছিল না, অথচ এতে তাঁর আতিথেয়তায় এতটুকু ব্যত্যয় ঘটত না। বাইরে যারা তাঁর সমালোচনায় পঞ্চমুখ থাকত—তাদেরকেও নিয়মিত আড্ডা দিতে দেখা গেছে তাঁর সঙ্গে। এমনিতে বন্ধু বাৎসল্যে যিনি ছিলেন দিল-দরাজ, আদর্শের প্রশ্নে তিনি ছিলেন একেবারেই আপোসহীন। সেখানে তিনি ছিলেন কোষমুক্ত তরবারীর মতই শাণিত। আদর্শ, দেশ ও জাতির প্রয়োজনে তিনি অনায়াসে যে-কোন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিরও মুখের উপর কঠোর সত্য উচ্চারণে এতটুকু কুণ্ঠাবোধ করতেন না। তাঁর চরিত্রের এদিকটা অনেকেই পছন্দ করতেন না। এ কারণে তাঁর পার্থিব উন্নতি ও সুযোগ-সুবিধা লাভও সম্ভব হয়ে ওঠে নি কোনদিন। বাংলা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি হয়েও এ জন্যেই অসহনীয় দারিদ্র্য ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী।

মনে পড়ে, রেডিও-শিল্পীদের দাবী-দাওয়ার সেই সংগ্রামী দিনগুলোর কথা। রেডিও অফিস তখন নাজিমুদ্দীন রোডে। শিল্পীদের বিভিন্ন দাবী-দাওয়া নিয়ে সংগ্রাম শুরু হল। কমিটির তিনি সভাপতি বা সম্পাদক কিছুই না—কিন্তু সকলেই জানত, এই সংগ্রামের পেছনকার মূল প্রেরণা তিনি। রেডিওর জাঁদরেল মহাপরিচালক বোখারী সাহেব করাচী থেকে ছুটে এলেন। হুমকি ও প্রলোভনের মুখে সংগ্রামের পিচ্ছিল পথ থেকে বহু অফিসার আর নেতাই ভেসে যাবার উপক্রম। কিন্তু রেডিওর একজন ক্ষুদে কর্মচারী—যিনি বুকটান করে দাঁড়িয়ে থেকে শিল্পীদের দাবী-দাওয়া অজেয় প্রমাণ করেছিলেন তিনি ফর্‌রুখ ভাই। শুনেছি, বৃটিশ রাজত্বের শেষভাগে এমনি একটি নীতিগত প্রশ্নে ফর্‌রুখ ভাইয়ের অনমনীয় ভূমিকা তাঁর ছাত্রজীবনের অকাল সমাপ্তি ঘটার অন্যতম কারণ ছিল।

ফর্‌রুখ ভাই কোনদিন ধর্মান্ধ বা অতীতমুখী যাকে বলে তা ছিলেন না, ছিলেন না সাম্প্রদায়িক বা প্রতিক্রিয়াশীল অথচ যতদিন ফর্‌রুখ ভাই বেঁচেছিলেন, ততদিন এসব কত ইলজাম যে তাঁর বিরুদ্ধে দেয়া হয়েছে, তার লেখাজোখা নেই। এঁদের কেউ কেউ তাঁর জীবনকালে, যারা 'দয়া করে' তাঁর প্রতিভাকে স্বীকার করতেন, তাঁরাও ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাব্যপ্রতিভা "সাত সাগরের মাঝি"-র পর নিঃশেষিত হয়ে গেছে, এমন কথাও বলেছেন। উদ্দেশ্য একটাই—ফর্‌রুখ ভাইকে মানুষের মন থেকে সরিয়ে রাখা। বহুদিন ধরে স্কুল-কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যপুস্তকে কত চুনোপুটির কবিতা স্থান পেয়েছে, পায় নি ফর্‌রুখ ভাইয়ের কবিতা। পারস্পরিক পিঠ-চুলকানি ফর্মুলার সূত্রে কত তৃতীয় শ্রেণীর কবি সমালোচকের কল্যাণে প্রথম শ্রেণীর মর্যাদায় উন্নীত হয়েছেন, কিন্তু ফর্‌রুখ ভাইয়ের কপালে জুটেছে অবহেলা ও নিন্দাবাদ। ফর্‌রুখের কপাল ভালো, অবশেষে মৃত্যুবরণ করে তিনি বেঁচে গেলেন। কারণ মৃত্যুর পর সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন, তাঁর মত কবি হয় না, তাঁর মত মানুষ হয় না।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ হবার পর সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্রের মাধ্যমেই তাকে বেকারত্বের অভিশাপে জর্জরিত হতে হয়। অথচ এই অবস্থাতেও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল তাঁর পর্বতপ্রমাণ। তাঁর চরম অর্থ সংকটের সময় একদিন তাঁর বাসায় যেয়ে এ প্রসঙ্গ তুলতেই তিনি ফোঁস করে উঠলেন, "আপনি খুব ভাল আছেন, না?" আর অগ্রসর হতে সাহস পেলাম না। বলা বাহুল্য, সেই সংকটকালেও সেদিন তাঁর বাসা থেকে 'গোলগুল্লা' না খেয়ে আসতে পারি নি।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের মৃত্যুর পূর্বে বেশ কিছুদিন আমি তাঁর বাসায় যেতে পারি নি। আমার আব্বা তখন গ্রামের বাড়ীতে মৃত্যু-শয্যায়। কিছুদিন পরপরই তাঁকে দেখতে যেতে হত বাড়ীতে। ইতোমধ্যে আমার আর-এক মুরুব্বী আল্লামা আবুল হাশিম ইন্তেকাল করলেন ৫ই অক্‌টোবর। তাঁর দাফন ও কুলখানি সারবার পরপরই খবর এলো আব্বার ইন্তেকালের। ছুটে গেলাম বাড়ী। শোকাহত পরিবেশে কাটলো কয়েকটা দিন। ইতোমধ্যে রাজবাড়ীতে বসে একুশে অক্‌টোবর তারিখে পত্রিকায় পড়লাম নির্মম সংবাদটি ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নেই।' দুঃখে বুক ভেঙে গেল। ইতোমধ্যে ফর্‌রুখ ভাই কবে যে মরণ রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন সে খবরও রাখতে পারিনি জেনে দুঃখের অবধি রইল না।

আমি তখন দৈনিক "পিপ্‌ল"-এর সহকারী সম্পাদক। ফর্‌রুখ ভাইয়ের উপর "পিপ্‌ল"-এ সম্পাদকীয় লিখব, কিন্তু বাদ সাধলেন এক সহকর্মী। জিদ ধরলেন, তিনি নিজেই লিখবেন এ সম্পাদকীয়। তিনি বললেন, "আদর্শের প্রশ্নে আমরা ছিলাম উত্তর আর দক্ষিণ মেরুতে, কিন্তু নিজের বিশ্বাসে অটল আর এমন নিষ্ঠাবান মানুষ যে কোন সমাজের গৌরব।"

আসলেই ফর্‌রুখ ছিলেন এক নিরোপোস ব্যক্তিত্ব, যার আদর্শবাদিতা ছিল একেবারেই হিমালয়ের মত দুর্লংঘ্য, দুরতিক্রম্য। এভারেস্ট বিজিত হয়েছে, কিন্তু আমাদের পরিচয়ের পরিধিতে কেউই ফর্‌রুখের পর্বতপ্রধান ব্যক্তিত্বকে অতিক্রম করতে পারে নি। ফর্‌রুখের শত্রু-মিত্র সবার জন্যেই বোধ করি একথা খাটে। এখানেই ফর্‌রুখ অনন্য।

ফর্‌রুখকে প্রথম দেখেছিলাম উনিশ শো ছেচল্লিশ সালে কলকাতায় আবুল হাশিম সম্পাদিত "মিল্লাত" অফিসে। সেদিন দূর থেকেই শুধু তাঁকে দেখেছিলাম, কথা হয় নি। পরবর্তীকালে তাঁর সঙ্গে এত বছর ধরে এত কথা বলা এবং তাঁর এত সান্নিধ্যে যাবার পরও আজ মনে হয়—ফর্‌রুখ ভাইকে যেন আমরা কেউই চিনি নি, তাঁকে সম্পূর্ণভাবে বুঝি নি। তাঁকে যেন প্রথম দিনের মতই শুধু দূর থেকে দেখেছি, তাঁর কাছে পৌঁছুতে পারি নি।

www.pathagar.com

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

ফর্‌রুখ ভাইয়ের কথা

পারিবারিক সূত্রে জেনেছি, কলকাতা থেকে ফর্‌রুখ ভাই আমাকে, আমার জন্মের খবর পেয়ে, দেখতে এসেছিলেন, আমাদের গ্রামের বাড়ীতে। আরও শুনেছি, ছেলেবেলায় মাতৃহীন হওয়ার পর মাঝেমধ্যেই ওঁরা আসতেন। কারণ ওদের আব্বা, আমার ফুফা বলতেন, ওদের জন্যে দুর্গাপুরই নাকি দার্জিলিং। আমাদের বাড়ীটা ছিল গ্রামের একটু বাইরে, মাঠ ঘেঁসে, খুবই খোলামেলা। গ্রামের বাড়ী হিসেবে ছিল রীতিমত ছিমছাম। বাড়ীতে গরু-ছাগল পোষা হত না।

যখন আমি পাঠশালায় পড়ছি—আমাদের বাড়ীর উপরই ছিল পাঠশালা—তখন ওঁদের মামাবাড়ীতে যাতায়াত প্রায় বন্ধ। আমার দাদী বেঁচে থাকলে হয়তো এমন হতো না। কিন্তু সেই ভদ্রমহিলা খুবই ফাঁকি দিয়েছিলেন আমাদের সবাইকে—তাঁর সকল নাতি-পুতিকে। আমার চোখ খুলবার আগেই তিনি চোখ বুঁজেছিলেন। শুনেছি, কলকাতার বাসায় ওদের রেখে আমার ফুফা—পুলিশ অফিসার, মফস্বল করে বেড়াতেন। কলকাতায় ওঁদের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করতেন আমার আব্বা। কাজটা নাকি মোটেই সহজ ছিল না। কারণ ওঁদের রক্তে ছিল বিদ্রোহের বীজ।

আরও একটা জিনিস ছিল; তিন ভাই-এর মধ্যে—শিল্পী স্বভাব। বড় জন, সিদ্দিক ভাই পেয়েছিলেন তাঁর পিতার মিষ্টভাষিতা। তাঁর হাতের লেখা চিঠির অক্ষরগুলো যেন মুক্তোর মত—আমরা তাকিয়ে দেখতাম। তাঁর ছেলেবেলায়, আমাদের বাড়ীতে এক বিয়েতে তিনি যে গান বেঁধেছিলেন, এবং হাত নেড়ে নেড়ে সে গান গেয়ে বরযাত্রীদের শুনিয়েছিলেন, সে গল্প বাড়ীর মেয়ে-মহলে আমরা প্রায়ই শুনতাম।

এই মিষ্টভাষিতা ও শিল্পী স্বভাব মেজোভাই ফর্‌রুখ ও ছোটভাই মুশীরও পেয়েছিলেন। মুশীর কেমন করে শিল্পী হতে হতেও হতে পারলেন না, সেই দারুণ দুঃখের কথা আমার চেয়ে অনেক ভালো বলতে পারবেন আর্ট কলেজে তাঁর সহপাঠী বন্ধু কামরুল হাসান। ফর্‌রুখের প্রবণতা গেল কবিতার দিকে। তাঁর কলেজ বয়সে কবিতা তাঁকে এমনভাবে পেয়ে বসলো যে, একজন মেধাবী ছাত্র হারিয়ে গেল কবিতার তোড়ে। বালিগঞ্জ সরকারী স্কুলে ক্লাসের ফার্স্টবয় ফর্‌রুখের এই পরিণতির কথা বলতে গিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে দেখেছি আমার আব্বাকে ও সে স্কুলের হেড মাস্টার কবি গোলাম মোস্তফাকে।

www.pathagar.com

কলেজেও আছেন, কবিতাও লিখছেন, রাজনীতির গোপন গলিতেও চলাফেরা হচ্ছে; হাতে সেতার, পরনে শৌখিন ধুতি-পাঞ্জাবী উনিশ-বিশ বছরের এই ফর্‌রুখ আহমদকে একবার দেখেছিলাম ওঁদের যাদবপুরের বাড়ীতে। বড় ভাই সিদ্দীক আহমদকে এই বাড়ীটি তৈরী করতে সাহায্য করেছিলেন তাঁর আব্বা। তখনকার যাদবপুর, ট্রেনে শিয়ালদা থেকে একটি কি দু'টি স্টেশন দূরে ছিল, ভালো করে মনে নেই। তবে মনে আছে, যাদবপুর একটা গ্রামই মনে হয়েছিল, যদিও সেই মাটির ঘরগুলো ছিল তকতকে নিকোনো—এতোই পরিচ্ছন্ন যে, জুতা খুলে ঘরের বারান্দায় উঠতে হয়েছিলো। মাটির ঘরের এমন পরিচ্ছন্নতার সঙ্গে আমার পূর্ব পরিচয় ছিল না।

যাদবপুরের সেই বাড়ীতে "আলোকপুরী"তে আমাকে এক কৃশকায় বালককে, তার ঢিলে পাজামা পরিহিত পোশাকে, খুবই হাস্যকর মনে হয়েছিল ফর্‌রুখ ভাইয়ের। বহু বছর পরেও সেটা তিনি মনে রেখেছিলেন, সেই মজার দৃশ্যটি। তিন ভাইয়ের মধ্যেই ছিল এক সহজাত কৌতুকবোধ। সম্ভবত এটা ছিল ওঁদের বংশগত। কলকাতায় বড় হলেও ওঁরা সবাই যশোরের মাগুরা এলাকার গ্রাম্য উচ্চারণে যখন কথা বলতেন, মনে হত যেন নিজের সঙ্গেই রসিকতা করছেন। বিশেষত ফর্‌রুখ ভাইয়ের সরস সকৌতুক উচ্চারণে তাঁর গ্রাম্য ভাষা এক ভিন্ন স্বাদে ভিন্ন সৌন্দর্যে ধরা দিত। গ্রাম্য ভাষার কথায় কথা এসে পড়লো—ছেলেবেলায়, ঈষৎ পরিমার্জিত রূপে, আমারও মুখের ভাষা ছিল এটাই; কিন্তু বহু দিনের অনভ্যাসে এখন আমি ইচ্ছা করলেও সে ভাষায় কথা বলতে পারব না। সেজন্যেই হবে, যখন ফর্‌রুখ ভাইকে সানন্দে ও সচ্ছন্দে সেই আঞ্চলিক উচ্চারণে কথা বলতে শুনেছি, তখন সেটাকে সহজ হতে পারার বা সহজ থাকতে পারার এক আশ্চর্য ক্ষমতা বলে মনে হয়েছে, যা আমার আয়ত্তের বাইরে। তবে যে বিশেষ ভঙ্গিতে তিনি এটা বলতেন, সেটা তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা থেকেই উদ্ভূত—আমার এখনো মনে হয়।

এর কয়েক বছর পর, তখন আমি স্কুলের উঁচু শ্রেণীর ছাত্র, নেপথ্য থেকে তাঁর অস্তিত্ব ঘোষণা করলেন ফর্‌রুখ ভাই। আমার দাদাজান এক সেট শরৎচন্দ্র আনিয়েছিলেন তাঁর এই অধম পৌত্রের সাহিত্যযাত্রা সুগম করবার জন্য। ততোদিনে পারিবারিক লাইব্রেরীর বঙ্কিম ও অন্যান্য গ্রন্থাবলী শেষ করে বসে আছি। আমার ভিক্টোরিও দাদাজান মাইকেল ও বঙ্কিমে উৎসাহী ছিলেন। শরৎচন্দ্র নিজে পড়েন নি, তবে এই আধুনিক লেখকের উপন্যাসের সঙ্গে তাঁর এ-যুগের নাতির পরিচয় ঘটুক, সেই শুভেচ্ছার বশবর্তী হয়ে বইগুলো কেনা হয়েছিল। কিন্তু কলকাতায় সেই খবর পেয়ে, ফর্‌রুখ ভাই তাঁর সন্ত্রস্ত পরামর্শ পাঠিয়ে দিলেন বইগুলোর সঙ্গে সঙ্গে,—যেন এই অপোগণ্ড বালককে ওগুলো পড়তে না দেওয়া হয়। বই এলো, এবং সোজা পিতামহলের শয়নকক্ষের আলমারীতে গা ঢাকা দিল।

www.pathagar.com

দাদাজানের সেক্রেটারী ও প্রায় নিত্যসঙ্গিনী ছিলেন তাঁর এক নাতনী, আমার এক বছরের বড়ো এক ফুফাতো বোন, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ভাবী স্ত্রী। আমার ছেলেবেলার খেলার সাথী,—যিনি পারিবারিক গ্রন্থাগারের বইগুলো, বিশেষত উপন্যাসগুলি, আমার সঙ্গে সমান তালে পড়েছিলেন। নানাজানের চাবির গুচ্ছ নাতনীরই হাতে ছিল জানতাম, এতে কোনদিন ঈর্ষাবোধ করি নি। করলাম সেদিন, যেদিন তিনি বিজয়িনীর মতো মুচকি হেসে জানালেন যে, শরৎচন্দ্র তিনি চুপি চুপি পড়ে শেষ করেছেন। একটা তীক্ষ্ণ ছুরির ফলা আমাকে যেন এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিয়ে গেল। শরৎচন্দ্র তখনও আমার নাগালের বাইরে।

আরও কিছুদিন পর,—দূর থেকে ফর্‌রুখ ভাই তাঁর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নিলেন। আমার বয়ঃপ্রাপ্তির বিষয়ে কিছুটা নিঃসন্দেহ হয়ে। গ্রন্থাবলীর সব ক'টি খণ্ড পাওয়া যায় নি। যেগুলো এসেছিল,পড়া হয়ে গেল। শরৎচন্দ্রের উপন্যাস পাঠের সঙ্গে ফর্‌রুখ ভাইয়ের নির্মম রসিকতা একাত্ম হয়ে মিশে থাকলো আমার স্মৃতিতে।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের পড়াশোনায় ছেদ পড়েছিল। ছোটভাই মুশীর আর্ট কলেজ ছেড়ে দিয়ে, ছাড়তে বাধ্য হয়ে, সৈন্যদলে নাম লেখালেন। ছেলেদের সঙ্গে পিতার সম্পর্ক জটিল থেকে জটিলতর হচ্ছে, ব্যবধান বেড়ে চলেছে। তখন যুদ্ধ চলছে, দেশে ভয়াবহ মন্বন্তর ঘটে গিয়েছে। 'সাত সাগরের মাঝি'র কবি, 'লাশে'র কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, পরিবারের গর্বের পাত্র হয়ে উঠেছেন। হঠাৎ তাঁর ছোট একটি চিঠি এলে বাড়ীতে সাড়া পড়ে যায়। এমন সময় একদিন '৪৩-'৪৪ সালের দিকে, বিনা নোটিশে আমাদের যশোরের বাসায় ফর্‌রুখ ভাই এসে হাজির। আমাদের গ্রামের বাড়ী থেকে কলকাতার পথে, যশোরে যাত্রা বিরতি।

একজন বিস্মিত, আনন্দিত, উৎসাহিত আমি,—সামনে ম্যাট্রিকুলেশন, নবম কি দশম শ্রেণীর ছাত্র, ঠিক মনে পড়ছে না–প্রতিভাদীপ্ত এক উদীয়মান কবির সঙ্গে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত কি আলাপ করেছিলাম, সব ভুলে গেছি। তবে এই সংলাপ এতই অস্বাভাবিকভাবে দীর্ঘ মনে হয়েছিল আমার নিয়মনিষ্ঠ আব্বার কাছে, যে তিনি সেই মধ্যরাত্রিতে সংক্ষিপ্ত আদেশ জারী করেছিলেন, শয্যা গ্রহণ করার জন্যে। ফর্‌রুখ ভাইয়ের প্রতি সেদিন আমার যে মুগ্ধতা আব্বা লক্ষ্য করেছিলেন, তাতে সম্ভবত কিছুটা শঙ্কিত হয়েছিলেন তিনি। তাঁর বিচারে এই ভাগিনেয়টি ছিল এক কক্ষচ্যুত উল্কার মত। কবিতার মোহে এবং অজানার আকর্ষণে একজন মেধাবী যুবকের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ার শোচনীয় নিদর্শন। নিজের ছেলেকে তিনি সতর্ক করতে ভোলেন নি। আমার মনে এ বিষয়ে কোন দুর্ভাবনা ছিল না। বীর পূজার আস্বাদ কেবল পেয়েছি, এত কাছে থেকে একজন কবির সান্নিধ্য পেয়ে, যিনি কবিতার রসে একেবারে আকণ্ঠ ডুবে আছেন, আমার অপরিণত রুচি ও বুদ্ধি নিয়েও আমি তাঁর পরিপূর্ণ মনোযোগ আকর্ষণ করেছি,

www.pathagar.com

বয়সে দশ বছরের ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি আমাকে ছোট ভাবছেন না, কবিতা প্রসঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আলাপ করছেন, ওই বয়সে এটা আশাতীত ছিল আমার জন্যে। এ সময়ে অথবা এর অল্পদিন পরে তিনি মওলানা আকরম খাঁর মাসিক "মোহাম্মদী"তে সম্পাদকের কাজ পেয়েছিলেন। যদিও সম্পাদক হিসাবে মওলানা সাহেবের নামই ছাপা হতো। বছরখানেকের মধ্যেই আমার প্রথম কবিতা মুদ্রিত হলো মাসিক "মোহাম্মদী"তে, 'একটি সনেট'। ফর্‌রুখ ভাইয়ের উৎসাহ না পেলে এটা সম্ভব হতো না।

বস্তুত প্রশংসার ব্যাপারে ফর্‌রুখ ভাই একটু বেশী দরাজ ছিলেন বরাবরই। কনিষ্ঠদের প্রতি তাঁর এই ছিল এক দুর্বলতা। মেপে-জুঁকে সমালোচকের ভাষায় কথা বলতেন না। একটি শব্দের ব্যবহার, গদ্য রচনায় একটি সুঠাম বাক্য তাঁর অব্যর্থ দৃষ্টি কেড়ে নিত। পুরো রচনাটি কেমন হলো, বা কোথায় তার দুর্বলতা, এ নিয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। যেখানে যে অংশে কিছু একটা ঝলমল করে উঠেছে, তিনি সেটাই লুফে নিতেন, এবং তাঁর সানন্দ সমর্থন ঘোষণা করতেন। তিনি রুচির চর্চা করেছিলেন তাঁর নিজস্ব মূলধন নিয়ে, সমালোচক হতে চান নি। তবে চেয়েছিলেন যেন আমরা, অন্তত কেউ কেউ সমালোচনাকে নিষ্ঠার সাথে চর্চা করি।

এই ঘটনার অল্পদিন পরেই ফর্‌রুখ ভাই আবার ফিরে এলেন দুর্গাপুরে। এবার আমাদেরও ডাক পড়ল। একটা বিস্ময় অপেক্ষা করছিল বিশেষত আমার জন্যে। আমার বাল্যসঙ্গিনী, আমার খেলার ও পড়ার সাথীকে দেখলাম ফর্‌রুখ ভাইয়ের বধূবেশে। একটা ছোট্ট, একেবারেই পারিবারিক অনুষ্ঠান। আমাদের কাছারী ঘর রূপান্তরিত হয়েছে বিয়ের মজলিসে। আমার বৃদ্ধ দাদাজান তাঁর এক নাতিকে তাঁর এক অতি স্নেহের পাত্রী এক নাতনীর সঙ্গে বিয়ে দিলেন। রাশভারী, অশীতিপর মানুষটি সম্ভবত এরপর বছরখানেক বেঁচেছিলেন—নিজের মনে মনে এ-রকম বেশ কিছু পরিকল্পনা তৈরী করতেন, এবং যথাসময়ে নির্ভুল নিয়মে তা সম্পাদন করতেন। পরিকল্পনাগুলি অনেকদিন ধরে, সবার অলক্ষ্যে গড়ে উঠত, এবং তাঁর শেষ চালটা যখন চালতেন, এতো সহজে সেটা হতো যে, পেছনের পরিকল্পনার কথা কেউ টেরটি পেত না। আমার মনে হয়, সারাক্ষণ তিনি সৃষ্টিকর্তার সাথেই শলাপরামর্শ করতেন।

পঁয়তাল্লিশের মাঝামাঝি। কলকাতায় পড়তে এসেছি। ফর্‌রুখ ভাই এ সময়ে মওলানা আকরম খাঁ সাহেবের সঙ্গে এক মামলায় জড়িয়ে পড়েছেন। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর সেই সুবিদিত কাহিনী এখানে না বললেও চলবে। কলকাতায় ফর্‌রুখ ভাইয়ের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসার কোন ইচ্ছা থাকলেও তা পূরণ হল না, মূলত তাঁর দুষ্প্রাপ্যতার কারণেই। তাছাড়া আমার—ওই কলেজ বয়সে কলকাতায় এত কিছু গ্রহণের ও অর্জনের ছিল যে, আমিও এই আশাভঙ্গ অনুভব করি নি। অনুভব করি নি,

www.pathagar.com

তার আর একটা কারণ ছিল। এ সময়ে ফর্‌রুখ ভাই দ্রুত রূপান্তরিত হচ্ছিলেন। তাঁর সম্পূর্ণ ব্যক্তিসত্তাই তখন ভেঙেচুরে এক নতুন রূপ নিতে চলেছে। এক কথায় তখন তাঁর 'কনভার্শন'-এর শেষ পর্যায়। 'কনভার্শন' একটা আত্মিক প্রক্রিয়া, এর কোন বাংলা প্রতিশব্দ আমার জানা নেই। আমি এই প্রক্রিয়া সম্বন্ধে শুনেছি ও পড়েছি; তবে অভিজ্ঞতা হিসেবে এটা এতোই দূরবর্তী যে, এ বিষয়ে আমি কথা বলতে সংকোচ বোধ করি। যিনি ফর্‌রুখ ভাইয়ের এই 'কনভার্শনের' মুখ্য পুরুষ, সেই শ্রদ্ধেয় ব্যক্তিটি মওলানা আবদুল খালেক—ঘটনাচক্রে—আমাদের টেইলর হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন। তাঁর পরিচয় হিসেবে এটা একেবারেই তুচ্ছ। তিনি অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তখন কোন একটা গ্রন্থ রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। এবং তাঁকে ভাষার পরিমার্জনায় সাহায্য করছিলেন ফর্‌রুখ ভাই। এ উপলক্ষে তাঁকে মাঝে মধ্যে টেইলর হোস্টেলে আসতে দেখেছি, এবং সব সময় তাঁর মধ্যে একটা অস্থিরতা লক্ষ্য করেছি। কলকাতায় দু'বছর আমি কাছে থেকেও ফর্‌রুখ ভাই থেকে বেশ দূরেই ছিলাম।

পাকিস্তান আন্দোলনে ফর্‌রুখ ভাই ভয়ানক মেতেছিলেন। যখন র‍্যাডক্লিফ রোয়েদাদ চলছে, এ সময় তিনি আমাদের গ্রামের বাড়ীতে, ইস্কুল থেকে ভারতবর্ষের ম্যাপ এনে, পাকিস্তানের ভৌগোলিক চেহারাটা কি দাঁড়ালো, ঘন্টার পর ঘন্টা সেই আলাপে ডুবে থাকতেন। পাকিস্তান আমাদের সকলের মনেই উত্তেজনার ঢেউ তুলেছিল। ওই সময়ে পাকিস্তানের আদর্শটাই মাতিয়েছিল সকলকে। এর ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র ধারণা ছিল না। ফর্‌রুখ ভাই তখন 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর পর্বে আছেন—'হায়াত দরাজ খান পাকিস্তানী' হতে বছর দশেক লেগেছিল।

যখন দেশবিভাগ চলছে এবং তার অব্যবহিত পরেও বেশ কিছুদিন, ফর্‌রুখ ভাইয়ের কোন চাকরি ছিল না। একদিন দেখলাম তিনি ঢাকায় এসেছেন। আশ্রয়স্থানটি ছিল কবি বেনজীর আহমদের বাড়ী। সলিমুল্লাহ্‌ মুসলিম হল থেকে আমি প্রায়ই সেখানে গিয়েছি। কাছেই সম্ভবত কাজী আলাউদ্দীন রোডের এক রেস্তোরাঁয় তিনি খেতেন। রেস্তোরাঁয় খাওয়া ও মনোমত সঙ্গী পেলে খাওয়ার টেবিলে আড্ডা জমানো, ফর্‌রুখ ভাইয়ের অভ্যাসের মধ্যে ছিল। যাঁরা এর অল্পদিন পরে, তাঁকে নাজিমুদ্দীন রোডের, রেডিও ভবনের উল্টোদিকে, চা-খানায় দেখেছেন, তাঁরা জানেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এই মজলিসী পরিচয়। এতে মনে পড়ছে, ছেলেবেলায় মাঝাইলে, ওঁদের দেশের বাড়ীতে ওঁর আব্বাকেও দেখেছি এক মজলিসী ব্যক্তিত্ব হিসেবে। একাই জমিয়ে রেখেছেন অনর্গল কথা বলে। রেকাবী ভর্তি পান আসছে অন্দর থেকে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, এবং আবার আসছে—ঘন্টার পর ঘন্টা এই চল্‌ছে।

বায়ান্ন থেকে তিয়াত্তর,—একুশ বছর আমি ঢাকার বাইরে কাটিয়েছি। ফর্‌রুখ ভাই বরাবর ঢাকাতেই থেকেছেন, এবং চুয়াত্তরে তিনি ইন্‌তিকাল করেছেন। দূরত্বের কারণে

www.pathagar.com

স্বভাবতই যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে গিয়েছিল। তবে, ঢাকায় তাঁর বাসায় যখনই গিয়েছি, তাঁর সেই সহজ উচ্ছলতায় গ্রহণ করেছেন। ব্যক্তিগত বা পারিবারিক কোন দুশ্চিন্তা বা সমস্যার কথা কোনদিন বলতে শুনি নি। শুধু লেখা ও যারা লিখছে তাদের প্রসঙ্গেই আলাপ হতো। আলাপের এই ধারাটা ছিল সম্পূর্ণ তাঁর নিয়ন্ত্রণে, যে কারণে ইচ্ছা থাকলেও কোনরূপ ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ উত্থাপন করা সহজ ছিল না। নিজের লেখা সম্বন্ধে কেন জানি না, খুব বেশী মতামত চাইতে শুনি নি। অন্যের লেখার প্রশংসা বা সমালোচনায় তিনি অকুণ্ঠ ছিলেন, তবে তাঁর প্রশংসায় কোনরূপ বিদ্বেষ লক্ষ্য করি নি। আমার সম্বন্ধে তাঁর খুব উচ্চাশা ছিল, এবং সেটা পূরণ হচ্ছে না বলে তিনি কারও কারও কাছে আক্ষেপ করেছেন, আমি জানতাম। একষট্টি কি বাষট্টি সালের কথা। বন্ধু মুস্তাফা নূরউল ইসলাম ঢাকায় এসেছিলেন রাজশাহী থেকে কোন কাজে। ফিরে এসে বললেন, "ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হল, লেখার প্রসঙ্গে বল্‌লেন, কি আর লিখব, বল্‌ (স্নেহভাজনদেরকে তিনি সব সময় 'তুই' সম্বোধন করতেন, যেমন আমাকে), দেশের এই তো অবস্থা—কিছু লিখতে ইচ্ছা করে না।" কথাটা আমার মনে বিঁধে থাকলো। "প্রহরের গান' (ফর্‌রুখ আহমদের জন্যে) তারই ফসল। কবিতাটা ফর্‌রুখ ভাইকে একটু বিভ্রান্ত করেছিল। তিনি এর বক্তব্য বুঝতে পারেন নি, তাছাড়া তিনি তো জানতেন না কবিতা লেখার পিছনের এই ছোট্ট ঘটনাটি।

মৃত্যু তাঁকে এখন আরও দূরবর্তী করেছে, কিন্তু আমার মনে হয়, তিনি কাছেই আছেন, এবং এখন কে লিখছে, কার লেখা কেমন লাগল, যেন সেই পুরনো প্রসঙ্গেই এখনো সেই আলাপই চলছে।

www.pathagar.com

কাজী গোলাম আহমদ

একটি আদর্শ একটি ব্যক্তিত্ব

১৯শে অক্টোবর। সন্ধ্যা। সংবাদ শোনার জন্যে রেডিওটা খুলেছি। হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রপাতের মত ঘোষকের কণ্ঠে শুনলাম কবি ফর্‌রুখ আহমদের ইন্তেকালের সংবাদ। চমকে উঠলাম। অবিশ্বাস্য সংবাদ। মাসখানেক আগেও যাঁকে দেখেছি। শরীর ভাঙলে মন ভাঙার কোন আভাসই যাঁর মধ্যে পাইনি, যাঁর দেহে রোগ প্রকাশের কোন চিহ্ন দেখিনি। দেখেছি সেই চিরাচরিত হাসি, সহজ-সরল উচ্ছ্বাস, সাদর সম্ভাষণ সত্যের আভায় উদ্ভাসিত হিংসাদ্বেষহীন উজ্জ্বল দু'টি চোখ। এত সত্বর তিনি চলে যাবেন এ যেন কল্পনার বাইরে। সিন্দাবাদের মতই তিনি পাড়ি দিলেন মৃত্যুর অজানা, সমুদ্দুরে নতুনের অন্বেষায়। সিন্দাবাদের মতই তিনি বাংলা সাহিত্যে ছিলেন এক দুঃসাহসী নাবিক—নতুন নতুন ঘাটে ভিড়েছেন, ঝড়-ঝঞ্ঝাকে হাসিমুখে উপেক্ষা করেছেন, তারপর আমাদের জন্যে সঞ্চয় করে এনেছেন নতুন নতুন মূল্যবোধ-মণিমাণিক্য।

কবি ফর্‌রুখ আহমদের সাথে প্রথম পরিচয় আমার ১৯৫৮ অথবা ১৯৫৯ সালের দিকে। তারপর থেকে দেখা হলেই প্রথমে কুশল বিনিময় করতেন; তারপরই কাছে কোন হোটেল বা রেস্টুরেন্ট থাকলে টেনে নিয়ে যেতেন, নয়তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই আলাপ করতেন। এই আলাপের মধ্যে থাকতো আমাদের সাহিত্য-সংস্কৃতির গতিধারা সম্পর্কে। জীবনের প্রয়োজনেই তাঁর কাব্য, তাঁর সাহিত্য। আদর্শ জীবন যেমন আদর্শ মানব তৈরীর জন্য কাম্য, তেমনি আদর্শ জাতির জন্য আদর্শ সাহিত্য সৃষ্টিই ছিল তাঁর কাম্য—তাঁর সাধনা। যে জীবন, যে সাহিত্য মানুষকে শান্তির পথে, সত্যের পথে, ন্যায়ের পথে, সুন্দরের পথে আকর্ষণ করে, স্রষ্টার সান্নিধ্যে উপনীত করে, তিনি তাই চাইতেন, তাই ভালবাসতেন। অশ্লীলতাকে, সংকীর্ণতাকে, দলাদলিকে ব্যক্তিজীবনে ঘৃণা করতেন, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তেমনি। স্রষ্টার সৃষ্টিতে অসত্য, অসুন্দর, কলুষতার স্থান নেই। অপ্রয়োজনে তিনি কোন কিছুই সৃষ্টি করেননি। কবি-সাহিত্যিকও স্রষ্টা। তাঁদের সৃষ্টিও তেমনি নিষ্কলুষ হ'তে হবে, জীবনের প্রয়োজনে হতে হবে। জীবনকে জাতিকে যা সর্বদা গতিশীল থাকতে সাহায্য করবে। অন্যায়, অবিচার অত্যাচার ও পাপ থেকে মুক্ত রাখবে। 'শিল্পের খাতিরে শিল্প—তিনি ছিলেন এ নীতির বিরোধী।

www.pathagar.com

কবি চাইতেন লেখকদের একটা সাধারণ প্লাটফরম। যেখানে তাঁরা একত্রিত হতে পারবেন, পারস্পরিক চিন্তাধারা ও মতবিনিময়ের সুযোগ পাবেন। তাই আইয়ুব খানের সামরিক সরকারের ইচ্ছায় যখন রাইটার্‌স্ গিল্ড বা লেখক সংঘ গঠিত হল, তখন একদিন কথা প্রসঙ্গে বললেন, "এই সংঘে সবার প্রবেশ করা উচিত। কারণ লেখকদের একত্রিত হওয়ার এই একটা সুবর্ণ সুযোগ। সরকারকে আমরা পছন্দ না করতে পারি, কিন্তু তাদের দেয়া ভালো জিনিসটাকে আমাদের গ্রহণ করা উচিত।" তারপর হাসতে হাসতে বললেন, "বানর মুক্তামালার কদর বোঝে না, হাতে পেলে নাড়াচাড়া করে, দাঁত দিয়ে কামড়ায়, তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেয়। মানুষ দেখতে পেলে লুফে নেয়। কারণ সে তার মূল্য বোঝে। ওদের হাত দিয়ে ভালো জিনিস এলে আমরা তা গ্রহণ করব।"

বিভিন্ন চরিত্রের মানুষের বিভিন্ন চিন্তাধারা থাকাটাই স্বাভাবিক। কিন্তু দলাদলি কেন? সাহিত্যের ক্ষেত্রে দলাদলি বা সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে ছিলেন তিনি। কারো নিন্দা বা প্রশংসার ধার ধারতেন না। আপন পছন্দমত রূপ-রঙ-রস ঢেলে আপন মনে সৃষ্টি করে যেতেন; সে রূপ সে রঙ সে রস আহরণ করতেন সত্য আর সুন্দরের বাগান থেকে। আজকের যুগে অনুকরণীয় ভিন্ন চরিত্রের মানুষ এই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ শুধু একজন মানুষের নাম নয়, একজন কবির নাম নয়, একজন মুসলমানের নাম নয়,— একটি আদর্শের নাম, একটি ব্যক্তিত্বের নাম। ব্যক্তিজীবনে তিনি ছিলেন আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি পূর্ণ আত্মসমর্পিত। কুরআনের শিক্ষা ও ইসলামের আদর্শের প্রতি অবিচল নিষ্ঠাবান একজন পাক্কা ঈমানদার, প্রকৃত মুসলমান। আর প্রকৃত মুসলমান কোন দিনই সাম্প্রদায়িক হতে পারে না। তিনিও ছিলেন প্রকৃতপক্ষে অসাম্প্রদায়িক। কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বলেও ছিলেন যে, তাঁর শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের কিছু অংশ হিন্দুদের সাথেই কেটেছে। তারাই ছিলেন তাঁর একমাত্র সাথী। কবি হিসেবে তিনি ছিলেন আপন ক্ষেত্রে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, অনন্য। মানুষ হিসেবে সহজ সরল-অনাড়ম্বর বন্ধু-বৎসল। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকলের আত্মার আত্মীয়। ব্যক্তিত্বের দিক দিয়ে আপন বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট। এক কথায় আজকের এই অপূর্ণতা ও নীতিভ্রষ্টতার যুগে তিনি ছিলেন একজন পরিপূর্ণ মানুষ, কামেল ইনসান। আদর্শের প্রশ্নে নীতির প্রশ্নে, তিনি কারো সাথে আপোস করেননি। শক্তির কাছে মাথা নত করেন নি। সুখ-সম্পদ, লোভ-লালসার মোহ তাঁকে আদর্শচ্যুত করতে পারে নি, আপন বিবেককে তিনি বিসর্জন দেন নি। যে মত যে পথকে তিনি সত্য বলে জেনেছেন, সেই মত পথের উপরই তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত হিমালয়ের মত অটল ছিলেন। সেখান থেকে কেউ তাঁকে এক চুল পরিমাণ টলাতে পারে নি। আর পারে নি বলেই তাঁর জীবনের এই করুণ হৃদয়বিদারক পরিসমাপ্তি,

www.pathagar.com

পরিবারের সদস্যদের সম্মুখে হতাশার এই অমানিশা, শোকার্ত ভক্ত ও গুণগ্রাহীদের দিকে দিকে শোকসভার মাধ্যমে সত্য প্রকাশের প্রচেষ্টা, সমালোচকদের অনুতপ্ত হৃদয়ের বহিঃপ্রকাশ।

এই বাংলার মাইকেল আর এই বাংলার ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অনন্য দুই প্রতিভা একইভাবে বিদায় নিলেন। সেদিনের বাংলা আর আজকের বাংলায় যেন কোন তফাতই নেই। সেই একই ট্রাডিশন আজো আমরা বয়ে চলছি। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সত্যের পথে বিবেকের নির্দেশে তাঁর কর্তব্য পালন করে গেছেন। সত্যই তাঁকে পুরস্কৃত করবে। পরম কারুণিক ন্যায়বিচারক আল্লাহ্‌র দরবারে আমরা নই, তাঁর সৃষ্টিই তাঁর হয়ে সাক্ষ্য দেবে - তিনি লেখনীর মাধ্যমে জাতিকে শান্তির পথে, সত্যের পথে, সুন্দরের পথে চালাতে চেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

আমার অনুভব একান্ত আমারই

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের সূত্র তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' নামক কবিতাটি। সে ১৯৫০ সালের কথা। সবে বি.এ. পরীক্ষা দিয়ে বসে আছি। সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিনগুলো। ডাক এলো মুন্‌শীগঞ্জ হাই স্কুল থেকে শিক্ষকতা গ্রহণের। উপরের ক্লাসগুলোতে বাংলা পড়াতে হবে। বলা বাহুল্য, সামান্য ষাট টাকা মাইনের ঐ চাকুরিটি পেয়ে যেন হাতে আকাশ পেলাম। প্রথম দিনই একেবারে দশম শ্রেণীর ক্লাস নিতে হল। ছাত্রদের কাছে বাংলা পড়ানোর ব্যাপারে তাদের সমস্যার কথা জান্‌তে চাইতেই তারা দুটো কবিতার কথা বিশেষভাবে আমার কাছে উল্লেখ করল, এক, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'সাত সাগরের মাঝি', দুই, মোহিতলাল মজুমদারের 'কালাপাহাড়'। এ দুটি কবিতা ইতিপূর্বে একজন শিক্ষকের কাছে পড়লেও এদের মানে তাদের কাছে পরিষ্কার হয় নি। তাই নতুন করে কবিতা দুটোর ব্যাখ্যা করার দায়িত্ব নিতে হল। আর ঐখানে শুরু হল কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে আমার পরিচয়-পর্ব। কবিতাটি পড়াতে গিয়ে কবির শক্তিমত্তার পরিচয় পেলাম, তাঁর কবি-সত্তার বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরিচিত হলাম। বাংলা কাব্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যে কেন একটি বিশিষ্ট কবিকণ্ঠ বলে স্বীকৃত তার আভাস আমি পেলাম ঐ কবিতা পঠন-পাঠনের ফলে।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে আমার প্রাথমিক আগ্রহ ঐখানেই স্থির হয়ে থেকেছিল বেশ কিছুকাল। আমার তখনকার জীবন-যাত্রার বেড়া বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ঐ বিষয়ে আর বেশী দূর এগোবার। সে যাই হোক, ঐ সময় থেকেই বাংলাদেশের মুসলমান সমাজের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে আমার ভাবনার সূত্রপাত হয়। স্বাধীনতার সঞ্জীবনী মন্ত্রে তখন সবাই কিছুটা উজ্জীবিত, সকলেরই জীবনাগ্রহ কিছুটা বেড়ে গিয়েছে। ঐ পরিবেশে আমি মুসলমান সমাজ, কৃষ্টি, ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে যেমন কৌতূহলী হয়ে উঠি, তেমনি বাঙালী মুসলমানদের সাহিত্য সাধনা সম্পর্কেও খোঁজ-খবর নিতে থাকি। সে যাই হোক, ১৯৫৫ সালে বাংলায় এম. এ. পড়তে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই, তার আগ পর্যন্ত ছিটে ফোঁটা সাহিত্য সম্পর্কে পত্র-পত্রিকায় যাই লিখে থাকি, সেটা নিতান্তই ছিল আমার সে-সব বিষয়ে ভাসা ভাসা জ্ঞানের ফল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে বিশেষভাবে কৌতূহলী কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজ উল্লাহ্‌কে আমি সহপাঠী হিসেবে পাই। ওঁরই সঙ্গে মাঝে মাঝে দীর্ঘ আলোচনা হত এ নিয়ে।

www.pathagar.com

বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আমি থাকতাম শ্রোতা, তিনি বক্তা। কথা প্রসঙ্গে একদিন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রসঙ্গ আমি তুলে ধরতেই মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ খুব উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। ফর্‌রুখ সম্পর্কে আমার ধারণা শুনে, মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ শুধু খুশীই হলেন না, আমাকে তাঁর সম্পর্কে কিছু লিখতে অনুরোধ জানালেন, প্রয়োজনে বই-পত্র দিয়ে আমাকে সাহায্য করতেও তিনি প্রতিশ্রুত হলেন। তখন ফর্‌রুখ আহ্‌মদের "সাত সাগরের মাঝি" ও "সিরাজাম মুনীরা" এ দু'টি বই সম্ভবত প্রকাশিত হয়েছে। তার বাইরে লেখা অজস্র কবিতা পত্র-পত্রিকায় ছড়িয়ে রয়েছে।

তবু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে সে যাত্রায়ও আমি বেশীদূর অগ্রসর হতে পারি নি। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র সঙ্গে আলোচনার পর কবির সম্পর্কে কিছু লিখ্‌বার ইচ্ছা জাগ্‌লেও তা তখনকার মত মনেই চেপে রাখতে হয়েছে। কারণ সময় ও সুযোগ করে লিখ্‌তে বসা তখন সহজ ছিল না। পাঠ্য কেতাবের বাইরে বিচরণে বাস্তব কারণেই যথেষ্ট অনীহা ছিল। তার পরে বেশ কিছু দিন গিয়েছে। ১৯৫৮ সালে রাজশাহী কলেজে লেকচারার পদের চাকুরি পেয়ে আমি রাজশাহী চলে যাই। সেখান থেকেই পূর্বসংকল্প অনুযায়ী মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র তাগিদে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ ফাঁদি। 'বাংলা কাব্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে সেই সুদীর্ঘ প্রবন্ধে আমি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশিত কবিকর্মের এক বিস্তৃত পরিচয় দানের প্রয়াস পাই। মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র প্রচেষ্টায় প্রবন্ধটি তিন পর্যায়ে যথাক্রমে মাসিক "মোহাম্মদী", "মাসিক সওগাত" ও "বিবর্তন" নামের পত্রিকাত্রয়ে প্রকাশিত হয়। বলা বাহুল্য, সাহিত্যিক মহলে প্রবন্ধটি বেশ সাড়া জাগায়। অনেকে আমাকে সাধুবাদ দেন। কেউ কেউ কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে অত বড় প্রবন্ধ প্রয়োজন ছিল কিনা, সন্দেহ প্রকাশ করেন। সে যাই হোক, ঐ সময়েই কেউ কেউ আমাকে 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' সম্পর্কে একটি বই লিখতে অনুরোধ করেন। লেখার ভাবনাটা তখন আমার মাথায় ছিল না। কারণ কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রকাশিত রচনার অনেকটাই তখনও বইয়ের আকারে পাঠকদের হাতে পৌঁছে নি। আমার বিবেচনায় কবির শিল্পীসত্তার পরিণতির জন্য আরও কিছুকাল অপেক্ষা করা অপরিহার্য ছিল। তাই ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের পর দীর্ঘদিন আমি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে নীরব থেকেছি।

ইতিমধ্যে নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লেখার ফাঁকে ফাঁকে কবি জসীম উদ্‌দীনের সাহিত্যকর্ম সম্পর্কেও ভাবতে শুরু করি। ১৯৬৩-৬৪ সালে চট্টগ্রাম কলেজে প্রফেসর হিসেবে চাকুরী করার কারণে সহকর্মীদের উৎসাহ ও প্রেরণায় জসীম উদ্‌দীন সম্পর্কে গ্রন্থ রচনায় হাত দেই। ঐ গ্রন্থ ১৯৬৭ সালে ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় এবং আমি ঐ বইয়ের বদৌলতে সাহিত্য মহলে কিছুটা পরিচিতি লাভ করি। এরপরই আমার কাছে আবার তাগিদ আসে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে বই লিখবার। ইতিমধ্যে তাঁর বেশ

www.pathagar.com

কয়েকটি বই বেরিয়ে গেছে। আমারও মনে হল, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ইতিমধ্যেই তাঁর পরিণত প্রতিভার ফসল আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন। তাই এখন একটি বই লেখা যেতে পারে। বই তো লেখা হবে; কিন্তু প্রকাশক জুটবে তো? কারণ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তখনও আমাদের দেশে ব্যাপকভাবে পাঠ্য কবি হয়ে ওঠেন নি। কিন্তু সে বাধাও দূর হল। কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ জানালেন, নওরোজ কিতাবিস্তানের অন্যতম পরিচালক মোহাম্মদ নাসির আলী বইটি প্রকাশের দায়িত্ব নিতে স্বীকৃত হয়েছেন। অগত্যা সমস্ত মানসিক বাধা কাটিয়ে বই লেখার কাজে লেগে গেলাম। বক্তব্য প্রকাশে আমি বাস্তব কারণেই পুরোপুরি স্বনির্ভর রইলাম আর তখন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে বাইরে ছিটে-ফোঁটা যা লেখা হয়েছিল, তার প্রায় সবটাই ছিল আয়ত্তের বাইরে। স্বনির্ভর হওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না। কবির সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের সুযোগও তখন হয় নি।

ইতিমধ্যে কর্মক্ষেত্র বদল হয়েছে। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি আমি সরকারী চাকুরী ছেড়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলাম। ঐখানে থেকেই 'জসীম উদ্‌দীন' বইয়ের পাণ্ডুলিপির বড় অংশটা তৈরী করে ঢাকার প্রকাশককে পাঠিয়েছিলাম। 'জসীম উদ্‌দীন' গ্রন্থ প্রকাশের পরে পরেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কিত গ্রন্থটি রচনায় হাত দিই। ১৯৬৮ সালের জুন মাসে দাউদ পুরস্কার বিতরণী সভায় যোগ দিতে লাহোরে যাবার আগেই 'কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ'-এর পাণ্ডুলিপি প্রকাশকের কাছে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। এই ঘটনার মাস কয়েক আগে, আমার মনে নেই, ঠিক কখন, পাঠ্য পুস্তক সংক্রান্ত কাজে আমি একবার ঢাকা এসেছিলাম আমার প্রকাশক ইস্টবেঙ্গল পাব্‌লিশার্সের কাছে। তখন হঠাৎ করেই একরকম ঢাকা বেতার কেন্দ্রে 'এলান'-এর তৎকালীন সম্পাদক হেমায়েত হোসেনের সৌজন্যে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক বন্ধুবর আলিমুজ্জামান চৌধুরীর কক্ষে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে যায়। আকস্মিক এ সাক্ষাৎকার আমার জন্যে ছিল এক দুর্লভ অভিজ্ঞতা!

কবিকে ঐ প্রথম আমি স্বচক্ষে দেখি এবং ঐ শেষবারের মত। কারণ দ্বিতীয় সাক্ষাৎকারের সুযোগ আর ঘটে নি। ১৯৬৯ সালে "কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ" গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবেও তিনি অনুপস্থিত ছিলেন। সে যাই হোক, প্রথম সাক্ষাতের সময় আমাকে ধুতি চাদর পরিহিতি ভদ্রলোক হিসেবে দেখবার সুযোগটি হয় নি বলে কৃত্রিম হতাশা প্রকাশ করে, অত্যন্ত আন্তরিকভাবেই আহবান জানালেন তাঁর গরীবের ডেরায় আতিথ্য গ্রহণ করতে। কথায় কথায় কখন তিনি অফিস থেকে কেটে পড়লেন মনে নাই। দুপুরের দিকে হেমায়েত হোসেন ও সাংবাদিক আখতার-উল-আলমকে সঙ্গে করে ইস্কাটনে কবির বাসায় গেলাম। কবি তৈরীই ছিলেন। হাসিমুখে হাত বাড়িয়ে সবাইকে গ্রহণ করলেন। কবির আতিথেয়তার কোন ত্রুটি ছিল না। খাওয়া-দাওয়ার পর নানা কথা আলাপ হল; কিন্তু তাঁর সম্পর্কে আমার লিখিত প্রবন্ধ এবং প্রায় সদ্য প্রস্তুত

www.pathagar.com

বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে কোন কথা হল না। তিনিও কোন কৌতূহল প্রকাশ করলেন না। আর আমিও সঙ্কোচ বোধ করে ঐ প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলতে বিরত রইলাম। বন্ধুদের ইঙ্গিত সত্ত্বেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে বিশেষ কিছু প্রশ্ন করলাম না। শুধু মানুষটিকে গভীরভাবে লক্ষ্য করলাম। তিনি নিজেই এক সময় কথা প্রসঙ্গে পুঁথি সাহিত্যের কথা তুললেন। কথা বলতে বলতে এক সময় উঠে গিয়ে বিরাট কয়েক খণ্ড বাঁধানো পুঁথি নিয়ে এলেন। তার মধ্যে মোহাম্মদ খাতেরের 'শাহ্‌নামা'র পুঁথিও ছিল। তিনি অত্যন্ত আবেগভরে এই পুঁথিগুলোর বিষয়-বৈভব ও লোকায়ত ভাষা-সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে বলছিলেন। এই পুঁথির সম্পদকে তিনি বাঙালী মুসলমানের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের একটা মূল্যবান অংশ বলে মনে করতেন। "হাতেম ও নৌফেল" কাব্যনাট্য, "হাতেম তা'য়ী" নামক সাহিত্যিক মহাকাব্য বা কাব্যকাহিনী তিনি এ পুঁথির আশ্রয়েই রচনা করেছিলেন। তা ছাড়া তাঁর কাব্যের মনোযোগী পাঠক মাত্রই লক্ষ্য করবেন; তিনি কিভাবে পুঁথিতে ব্যবহৃত বহু অপরিচিত শব্দকে অবলীলায় তাঁর কাব্যদেহে প্রয়োগ করেছেন।

মোট কথা, তাঁর সঙ্গে আলোচনায় আমার এ ধারণা হয়েছিল যে তাঁর স্বপ্নের জগতের অনেকটাই পুঁথির ভুবন থেকে মাল-মসলা দিয়ে তৈরী। তবু পুঁথির জগতেই তিনি নিবদ্ধ ছিলেন না। আধুনিক মুসলমানের বিশ্বব্যাপী জাগরণ কামনার তিনি এক উৎসাহী অংশীদার ছিলেন। তিনি ইসলামী মানবতাবাদী জীবনবিধানকে যাবতীয় সমস্যা সমাধানে সমর্থ একটি মজবুত আদর্শ বলে মনে করতেন।

সময় হাতে বেশী ছিল না। আলোচনা তাই দীর্ঘায়িত হল না। তবু এরই ফাঁকে দু'একটি প্রশ্ন করে কবির সাহিত্যিক মানসিকতার মূলগত চেহারাটি চিনে নেবার চেষ্টা করলাম। কবিকর্মে বিশেষ আদর্শের পরিপোষক কর্তব্যের প্রতি ঝোঁক দিতে গিয়ে তিনি কি গণ্ডীবদ্ধ হয়ে পড়ছেন না? তিনি কি সমসাময়িক জীবনের তোড় থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের প্রতিভাকে সংকুচিত করছেন না? তাঁর সাহিত্যকর্মের সমসাময়িক জীবন-চেতনাপুষ্ট ধারার প্রতি তাঁর সাম্প্রতিক অনাগ্রহের কারণ কি? তিনি কি নিজেকে আর একটু ব্যাপ্ত করে দিতে পারেন না? সমসাময়িক তথাকথিত সাহিত্যিক বিতর্কে তাঁর নাম ওভাবে জড়িত হওয়া ঠিক হয়েছে কি? এসব প্রশ্নের জবাব আমিও চাই নি, তিনিও দেন নি। কিন্তু এর যে সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া তাঁর মধ্যে লক্ষ্য করেছি, তাই আমার জন্যে যথেষ্ট ছিল। সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে পথে তিনি প্রথম যাত্রা শুরু করেছিলেন, সে পথকে তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের বলে আঁকড়ে ধরতে পারেন নি। চারদিকের পৃথিবীতে আদর্শহীন মতবাদের কলহে তিনি অতিষ্ঠ হয়ে উঠে, ধর্মীয় মূল্যবোধ-আশ্রিত এক মানবিক জীবনাদর্শকে বেছে নিয়েছিলেন তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মে। এ পথ থেকে সরে আসা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁকে গ্রহণ করতে হবে তাঁরই জীবন-চিন্তার বৈশিষ্ট্যসহ।

www.pathagar.com

অন্যভাবে নয়। সমসাময়িক কিছু কিছু সাহিত্যিক বিতর্কে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। অনেক ক্ষেত্রেই বন্ধু-বান্ধবদের চাপে পড়ে, স্বেচ্ছায় নয়।

আর কি কথা হয়েছিল মনে নেই। যথাসময়ে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আস্তানায় ফিরেছিলাম। সে ভিন্ন প্রসঙ্গ। ফিরতে ফিরতে বারবার যেটা মনে হচ্ছিল, কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর কবি-কর্মকে নেহাত শিল্পকর্ম বলে ভাবেন নি বা তাকে জীবনসংগ্রামের একটা বড় হাতিয়ার করে তুলতে চান নি। তিনি বিশ্বপথিক মানুষের চলার পথের সামনে একটি আদর্শের দীপ-বর্তিকা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। সে কাজে তিনি কতটা সার্থক বা ব্যর্থ হয়েছিলেন, তাঁর বিচার করবে মহাকাল। এই মুহূর্তে আমরা তাঁকে দেখছি এক মহা স্বাপ্নিক, আদর্শে অনড় এক কবিরূপে, যিনি শত বিতর্কের মধ্যে মাথা তুলে শুধু বলে যাচ্ছেন ঃ 'আমার অনুভব একান্ত আমারই; যদি কারও সঙ্গে এর মিল খুঁজে না পাওয়া যায়, আমার কিছু করার নেই। আমি বিশ্বাস করি, আমার এ বিশ্বাস ও প্রত্যয়ই শেষ পর্যন্ত আমার কবি-কর্মের প্রতিষ্ঠাকে সম্ভব করে তুলবে।'

কবি এ বিশ্বাস নিয়েই পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন। আগেই বলেছি, কবির সঙ্গে ঐ আমার প্রথম ও শেষ দেখা। দ্বিতীয় বার সাক্ষাতের সুযোগ আর আসে নি। তাই স্মৃতিচর্যা করতে গিয়ে কবি সম্পর্কে আমি আর কতটুকুই বা বলতে পারি।

www.pathagar.com

আবদুস সাত্তার

অভ্রভেদী চোখ

আমার বাবা যখন তাঁর আত্মীয়-স্বজন কিংবা বন্ধু-বান্ধবদের বাড়ীতে বেড়াতে যেতেন, তখন সেই আত্মীয়-স্বজন এবং বন্ধু-বান্ধবদের রুচিমাফিক জিনিস-পত্র নিয়ে যেতেন। এতে নাকি ঘনিষ্ঠ-স্বজনদের মনে আনন্দের সৃষ্টি হয়। আমি যেদিন প্রথম ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, তখন আমি কোনো জিনিস-পত্র নিয়ে যাই নি। তবে আমার লেবাস এবং মনটা এমনভাবে তৈরী করে নিয়ে গিয়েছিলাম যে, অন্তত ফর্‌রুখ ভাই যেন খুশী হন এবং আমার সম্পর্কে বিরূপ ধারণা পোষণ না করেন।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল স্কুল জীবন থেকেই এবং তাঁর আলিফের মত সটান ব্যক্তিত্বের খবর জেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে একটু সংযত হয়েই গিয়েছিলাম ১৯৫২ সালে, তাঁর কমলাপুরের বাসায়। প্রথম দিনই পরিচয়ের পর সম্বোধন ছিল 'তুই' এবং এই 'তুই' উচ্চারণটিই তাঁর মুখে মানাত ভালো। অন্য কোনো সম্বোধন আমাদের জন্যে তাঁর স্নেহের কাছে সত্যি বেমানান ছিল। তাঁর 'তুই' শব্দটি আমার অন্তরে আনন্দের কোড়া ডাকাতো।

প্রথম পরিচয়ের সূত্র এমনভাবে শক্ত দড়িতে পরিণত হয়েছিল যে, সেই দড়ি কোনোদিন আর নরম হয় নি, ঠিক তেমনি শক্তই রয়ে গিয়েছিল। তাই ফর্‌রুখ ভাইকে যেখানে যেভাবে পেয়েছি, সেভাবেই তাঁর সাথে মিশেছি। কোনোদিন তাঁর মুখে বিরক্তির ছাপ দেখি নি। প্রথম দিকে তাঁর সঙ্গে বেশী করে মিশবার সুযোগ হয়েছে পুরনো রেডিও অফিসে কাজী আলাউদ্দীন রোডে, এবং বিশেষ করে রেডিও অফিসের পাশের রেস্তোরাঁয়। ওখানে যে ফর্‌রুখ ভাইয়ের কত চা-সিঙাড়া ধ্বংস করেছি তার ইয়ত্তা নেই। এই সদালাপী এবং সরলপ্রাণ মানুষটির কাছে বসলে আর কিছুতেই উঠতে ইচ্ছে হতো না। তাঁর ব্যবহারে এমনি যাদু ছিল।

হ্যাঁ, ফর্‌রুখ ভাইয়ের অসাধারণ দু'টি চোখ ছিল। সেই চোখের সামনে দাঁড়ালে মনে হতো, আমাদের ভেতরের সবখানে তাঁর চোখের টর্চ ফেলছেন। তাই, আগেই বলেছি, তাঁর কাছে গেলে সংযত হয়েই যেতাম। শুধু তাই নয়, কোথাও কোনো পত্রিকায় আমার কবিতা প্রকাশিত হলেও তাঁর সেই অভ্রভেদী দৃষ্টি এড়াতো না। শব্দের অপপ্রয়োগ হ'লে এবং কোথাও কোনো ছন্দপতন থাকলে তিনি ডেকে বলে দিতেন। আমার স্পষ্ট মনে আছে, "মাহে-নও" পত্রিকায় আমার একটি কবিতা প্রকাশিত হলো

www.pathagar.com

'দিনরাত্রির কাব্য' শিরোনামে। ওতে কিছু চিত্রকল্প ছিল, যা ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাছে অভিনব ঠেকেছিল। যেমন, "সন্ধ্যার একটু আগে সূর্যের লালটুপি মাথায়/ পৃথিবীর বিস্তৃত জায়নামাযে/দিনের সিজদা দেখলাম পশ্চিম দিকে।" ইত্যাদি। একদিন অফিস থেকে হেঁটে হেঁটে বাসায় ফিরছি, হঠাৎ ফর্‌রুখ ভাইয়ের কণ্ঠ শুনলাম, "এই শোন্।"

আমি এদিক-ওদিক চেয়ে দেখি, ফর্‌রুখ ভাই। তাঁর কাছে যেতেই তিনি বললেন, 'তোর 'দিনরাত্রির কাব্য' পড়লাম। কবিতাটির বিষয়বস্তু সত্যি অভিনব। তা তুই কবিতাটি গদ্যে না লিখে ছন্দোবদ্ধ করতে পারলি না? একটু চিন্তা করে দেখিস।"

এমনি ধরনের বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা ছিল প্রায় তিরিশ বছর এবং এই তিরিশ বছরের স্মৃতিবিজড়িত শ্রদ্ধার সূত্র অনেক দীর্ঘ। সেই দীর্ঘ সূত্র গুছিয়ে একত্র করা এই মুহূর্তে সম্ভব নয়। আমার 'ফর্‌রুখ ভাই' কবিতায় আমি তাঁকে উপমা দিয়েছি সটান আলিফ-এর সঙ্গে। নামাযে দাঁড়ালে যেমন আমরা সটান আলিফ হয়ে যাই এবং সেই আলিফ আল্লাহ্ ছাড়া কারও কাছে নত হয় না, ফর্‌রুখ ভাইও ছিলেন তাই। তিনি সত্যের কাছে ভাঙতে রাজি ছিলেন, কিন্তু বাঁকা হতে রাজী ছিলেন না। এর প্রমাণ আমরা বহুবার দেখেছি এবং মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত।

সাবেক পাকিস্তান আমলে রেডিও অফিসে পে-স্কেল কিংবা অনুরূপ ব্যাপারে কর্মচারীদের মধ্যে গোলযোগ চলছিল। এই খবর গেল হেড অফিস করাচী পর্যন্ত। ওখান থেকে চলে এলেন ডিরেক্টর জেনারেল। তিনি এসেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে ডেকে পাঠালেন এবং লম্বা গোঁফ নেড়ে নাকের পশম টানতে টানতে বললেন, "শায়ের সাহাব, ম্যায় এ সোস রাহা কে আপ এ কলমবন্দ স্ট্রাইক কা লীড দেতা হ্যায়। আপ কা নোকরী টুট জায়েগা।"

ফর্‌রুখ ভাই সোজা আলিফের মতো খাড়া হয়ে বললেন, "রিযিক কা মালেক আল্লাহ্ হ্যায়—আপ নেহী।" বলেই ছাতাটা হাতে নিয়ে হাঁটা ধরলেন। পরে সেই ডিরেকটর জেনারেল সব কিছু জেনে এবং ফর্‌রুখ ভাইয়ের ন্যায়নিষ্ঠায় মুগ্ধ হয়ে মাফ চেয়েছিলেন।

তখন আমি "মাহে-নও" পত্রিকা অফিসে চাকরী করি। কি একটা কবিতার সম্মানী নিয়ে ফর্‌রুখ ভাই চটে গেলেন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে। তাঁর বক্তব্য—"সম্মানীর একটি মান থাকা দরকার। কবি ও কবিতার মান উভয়দিকই বিচার করতে হবে। টাকার পরিমাণ কম হোক আপত্তি নেই, কিন্তু তাঁর চেয়ে একজন জুনিয়র কবিকে টাকা বেশী দেওয়া চলবে না। তা যতো এ্যাসাইনমেন্ট দিয়েই লেখানো হোক কিংবা প্রচারধর্মী কবিতাই হোক।" তিনি অফিসে এলেন এবং প্রতিবাদ রেখে টাকা গ্রহণ করলেন না। পরে সেই টাকা মনি-অর্ডার করে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ফর্‌রুখ ভাই ওই এক কথার মানুষ।

www.pathagar.com

মনি অর্ডার ফেরৎ এলো এবং কূপনে তাঁর সই ছিল ছোট্ট একটা মন্তব্যসহ ঃ 'রিটার্নড উইথ থ্যাংক্স।'

ফর্‌রুখ ভাইয়ের আর্থিক সচ্ছলতা যে ছিল এ কথা কেউ স্বীকার করবে না। তাই বলে তিনি কৃপণ ছিলেন, এ কথাও কেউ মানবে না। এমন উদার হস্তে খরচ করতে খুব কম লোককে দেখেছি। তাঁর বেতনের সিংহভাগ চলে যেতো অতিথি আপ্যায়নে। এখানেই শেষ নয়। বন্ধু-বান্ধবদের সাহায্য করার কাজে এগিয়ে আসতেও তিনি ছিলেন দরাজ-দিল। একবার কি এক কারণে দৈনিক ইত্তেফাকের কর্মচারীদের বেতন বন্ধ করে দেওয়া হলো। মরহুম সিরাজউদ্দিন হোসেন ও মরহুম আসফউদ্‌দৌলা রেজার কথা চিন্তা করে তিনি শঙ্কিত হলেন। কারণ এ দু'জনের পারিবারিক সদস্য ছিল বেশী। দু'জনের নামে পরিচিত লোক দিয়ে দুটো খাম পাঠিয়ে দিলেন। তাঁরা খাম খুলে দেখেন, প্রত্যেক খামে দুটো একশ' টাকার নোট এবং সঙ্গে একই ধরনের ছোট্ট দুটি চিঠি। চিঠিতে লেখা, "তোদের প্রয়োজনের তুলনায় খুব সামান্য এই উপহার। আশা করি, এই বিপদের মুহূর্তে প্রত্যাখ্যান করবি না।" মহৎপ্রাণ না হলে নিজের আর্থিক সচ্ছলতা না থাকা সত্ত্বেও এমনভাবে কেউ অন্যকে সাহায্য করে? এমনি আরও অনেক নজির পেশ করা যায়।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের সটান 'আলিফ'-এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেখেছি তাঁর মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্তে। বলা-বাহুল্য, ঘটনাটা ১৯৭৪ সালের। আমরা বরাবরই পরীবাগ মসজিদে ঈদের নামায পড়তাম। সকাল সাড়ে আট-নয়টার মধ্যে নামায শেষ হয়ে যেতো। সারাদিন আত্মীয়-বান্ধব করে কাটাতে পারতাম। নামাযের পর আমার বাসায় এলেন সৈয়দ সাদিকুর রহমান। তিনি পিআইডিতে চাকরী করেন। বর্তমানে বিদেশে আছেন। তিনি এসেই আমার টেবিল থেকে মওলানা মুহিউদ্দীন খান সম্পাদিত মাসিক "মদীনা" পত্রিকার কয়েকটা পুরনো কপি টেনে নিলেন। ওতে সূরা আর-রাহমানের ফর্‌রুখ ভাই কৃত অনুবাদ ছিল। সেই অনুবাদ পড়ে সাদিকুর রহমান সাহেব আমাকে স্মরণ করিয়ে দিলেন, "আরে সাত্তার ভাই, বেশ কিছুদিন যাবৎ ফর্‌রুখ ভাইয়ের ওখানে যাই না। চলুন, তাঁকে দেখে আসি।"

আমরা তার ইস্কাটনের বাসায় গেলাম। ফর্‌রুখ ভাইয়ের ছেলে মাহমুদ এলো। তাঁর কাছে ফর্‌রুখ ভাইয়ের কথা জিজ্ঞেস করায় সে কোনো কথা না বলে ব্যথিত চিত্তে আমাদেরকে নিয়ে গেলো সোজা শোবার কক্ষে। গিয়ে দেখি, তিনি টেবিলে ডান পা-টা তুলে দিয়ে চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন এবং ঠোঁট দু'টি আল্লাহ্‌র জেকেরে কেবল নড়ছে। আমি জোরে জোরে দু'বার "আস্‌সালামু আলায়কুম, ফর্‌রুখ ভাই" বলতে তিনি চোখ মেলে চাইলেন এবং বললেন, "কেমন আছেন, বসেন।" 'আপনি' সম্বোধনে কথা

www.pathagar.com

বলায় আমরা চমকে উঠলাম এবং কানের কাছে গিয়ে বললাম, "ভাই, আমি আবদুস্ সাত্তার। আমাকে আপনি 'আপনি' বলছেন কেন?" তিনি প্রায় অচেতন অবস্থায় বললেন, "তুই কখন এলি? কেমন আছিস?" এবার একটু আশ্বস্ত হলেও তাঁর সেই অভ্রভেদী চোখের দিকে চেয়ে কান্নায় চোখ ভরে এলো। মাহ্‌মুদকে বললাম, "তোমরা ডাক্তার ডাকো। এই, আমরা আসছি। টাকার দরকার পড়লে নিঃসঙ্কোচে বলো।"

সাদিক সাহেব ও আমি দৌড়ে খবর দিলাম পার্শ্ববর্তী কবি তালিব হোসেনের বাসায় এবং তাঁকে ফর্‌রুখ ভাইয়ের ওখানে পাঠিয়ে দিয়ে আমরা গেলাম স্বাস্থ্য-মন্ত্রী মান্নান ভাইয়ের কাছে, হাসপাতালে সিটের কথা বলতে। মান্নান ভাই আমার বাল্যবন্ধু এবং তাঁকে বলামাত্র সঙ্গে সঙ্গে তিনি পি জি-তে টেলিফোনে সিটের ব্যবস্থা করেছিলেন। আমি ও সাদিক পি জি-তে চলে গেলাম। পি জি-র আর. পি. আমাদের জিজ্ঞেস করলেন, "কেস সার্জিক্যাল না মেডিসিনের?" আমার জানা ছিল বলে বললাম, "কেস মেডিসিনের।" আর. পি. সাহেব তৎক্ষণাৎ আমাদের ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলেন এবং সেখানে সঙ্গে সঙ্গে সিটের ব্যবস্থা হলো। আমি ওখানে রয়ে গেলাম এবং সাদিকুর রহমান সাহেবকে পাঠালাম আদ্যোপান্ত খরচ দিয়ে তাড়াতাড়ি ফর্‌রুখ ভাইকে হাসপাতালে নিয়ে আসতে। বিকেলের দিকে যখন আর কেউই আসলেন না, আমি ফিরে গেলাম ইস্কাটনে। গিয়ে শুনি যেই ফর্‌রুখ ভাই বুঝতে পেরেছেন যে, তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে তিনি বেঁকে বসলেন। তাঁর মন্তব্য ছিল ঃ "আমি বাসাতেই মরবো, কিন্তু - - - ।" পরের দিনই তিনি মারা গেলেন। তাই বলছিলাম, তিনি সটান 'আলিফ' হয়েই রইলেন।

আগেই বলেছি, ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে প্রায় তিরিশ বছরের ঘনিষ্ঠতার অনেক কথাই মনের বাতায়নে উঁকি দেয়। তাঁর খুব ইচ্ছে ছিল শিশু-কিশোরদের জন্য একটা পত্রিকা বের করার এবং পত্রিকার নাম হবে "সাম্পান"। "সাম্পান" নামের তিনি পক্ষপাতী ছিলেন এই কারণে যে, চট্টগ্রামের ঐতিহ্যবাহী এই সাম্পানে চড়েই ওলীয়ে কামেলগণ পাড়ি জমিয়েছিলেন এই দেশে। আর তাঁর আরও ইচ্ছে ছিল, সেই পত্রিকার সম্পাদনা করবো আমি ও মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্। এ ব্যাপারে তিনি একদিন আমাদের নিয়ে বসলেন এবং পত্রিকার রূপ ও আঙ্গিক নিয়ে আলাপ-আলোচনা করলেন। প্রথম সংখ্যার জন্যে তিনি একটি কবিতাও দিয়েছিলেন। সেই কবিতা এবং ফর্‌রুখ ভাইয়ের হাতের লেখা "সাম্পান"-এর খসড়া এখনো সযত্নে আমি আঁকড়ে রেখেছি। ১৯৭০ সালের দিকে অন্য হাতে সম্পাদিত হয়ে তৎকালীন বি. এন. আর. থেকে "সাম্পান" নামে একটি পত্রিকা অবশ্যি বের হয়েছিল। কিন্তু ফর্‌রুখ ভাই তাতে কোনো লেখাও দেন নি এবং আমাদের মতের বিরুদ্ধে কাজ হয়েছিল বলে সেই "সাম্পান"-এর সঙ্গে

www.pathagar.com

কোনো সহযোগিতাও করেন নি। কোনো কোনো ব্যাপারে ফর্‌রুখ ভাই ছিলেন ভীষণ একরোখা এবং এই "সাম্পান"-এর ব্যাপারেও ছিলেন তাই। এই সঙ্গে আরও যোগ করা যায় যে, যাঁরা মুখে মুখে ইসলাম-ইসলাম করতেন আর কাজের সঙ্গে কোনো মিল ছিল না, তাদের তিনি দুই চোখে দেখতে পারতেন না। তাঁদের জন্যে ফর্‌রুখ ভাইয়ের সুন্দর একটা গালি ছিল—'খান্নাস্'।

অনেক সময় ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়েছি। যুক্তির আলোকে তিনি তর্কের অন্ধকার দূর করতেন। একদিন হাতেম তায়ী সম্পর্কে বলেছিলাম, "ঐতিহাসিক চরিত্রের মধ্যে হাতেম আপনার খুব প্রিয়, তাই না? হাতেম তো অমুসলিম ছিলেন।"

ফর্‌রুখ ভাইয়ের উত্তর ছিল, "পারস্যের নওশেরোআঁ বাদশাহ্‌ও অমুসলিম ছিলেন। কিন্তু রসূলে করীম (স) চার কারণে গৌরব বোধ করতেন, সে সবের মধ্যে একটি হলো তিনি নওশেরোআঁর সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।' এর পরেও কি তাঁর হাতেম-প্রীতি সম্পর্কে বলার অপেক্ষা রাখে?

হাতেম তায়ীর যে গুণটি ফর্‌রুখ ভাইকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল তা হচ্ছে হাতেম অগাধ ধন-সম্পদের মালিক হয়েও ধন-সম্পদের অনুগত ছিলেন না, বরং ধন-সম্পদই ছিল তাঁর অনুগত দাস। হাতেমের ভাষায় ঃ 'ফা ইন্নি মাল-ই-মাবুদ' অর্থাৎ নিশ্চয়ই আমার ধন-সম্পদ আমার অনুগত দাস। ফর্‌রুখ ভাই এই গুণ রপ্ত করতে পেরেছিলেন বলেই অর্থের লোভে তিনি আক্রান্ত হন নি। বরং অর্থাভাবে থেকেও তিনি দান করতেন। অর্থের লোভ দেখিয়ে কেউ তাঁকে কাবু করতে পারতো না। আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারতো না। মওলানা রূমীর ভাষায় ঃ 'বেহ্‌ দাম ও দানাহ্‌ না গীরান্দ মোরগে দানা রা' অর্থাৎ "দানার লোভে চতুর মোরগ কোনো দিন ফাঁদে পড়ে না।" লোভের ব্যাপারে ফর্‌রুখ ভাই সত্যি চতুর ছিলেন।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্

অন্তরঙ্গ আলাপন

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে আমাকে আত্মকথন দিয়েই শুরু করতে হবে। কেননা, বাংলা সাহিত্যের এই অনন্য কবি-পুরুষের জীবনের শেষ পঁচিশ বছরের সাথে আমার অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতিই জড়িত। এই সুদীর্ঘ সময় আমি ছিলাম তাঁর অতি-অন্তরঙ্গদের একজন। সাহিত্য ও সংস্কৃতি আন্দোলন, বৈঠক মজলিসে—এমনকি সৃজনী উদ্যোগেও, আমি ছিলাম অনেক ক্ষেত্রেই সহযাত্রী। তাঁর সাহিত্য-প্রয়াস, কাব্যক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও চিন্তা-ভাবনার সাথে বহুক্ষেত্রেই ছিল আমার ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র। এ ব্যাপারে আমি একক সৌভাগ্যের অধিকারী ছিলাম না বটে, কিন্তু যে কারণেই হোক না কেন, তিনি আমাকে অনেকখানি কাছে টেনে নিয়েছিলেন। সেই টান ছিল এমনই গভীর যে, তাঁর ভক্ত, অনুরক্ত ও অন্তরঙ্গদের অনেকেই ক্রমে ক্রমে তাঁর কাছ থেকে দূরে সরে গেলেও আমি ছিলাম শেষ পর্যন্তও তাঁর অনেকটাই কাছাকাছি। ফলে তিনি কখন কি ভাবছেন, রচনাকর্মে কি পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হয়েছেন, কোন্ সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছেন, তার অনেকখানি আমার জানার সুযোগ হয়ে যেত। এমনকি কখনও কখনও আমি ব্যক্তিগতভাবে সে-সব উদ্যোগে শরীকও হতাম। সে কাহিনী লিখতে গেলে একটি বৃহৎ-কলেবর গ্রন্থই হয়ে যাবে। আপাতত তা ভবিষ্যতের জন্যেই তোলা রইল।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নিজে সব সময়েই কিছু-না-কিছু লিখতেন। লেখাটা তাঁর একান্তরূপে নৈসঙ্গের ব্যাপার ছিল না; রেডিও অফিসে, চায়ের দোকানে, রাস্তার পাশে হোটেলে বসেও তাঁকে লিখতে দেখেছি। তাঁর পাঞ্জাবীর পকেটে থাকতো একটি কলম, কিছু সাদা কাগজ এবং কিস্তি টুপি। এক সময়ে তিনি একসারসাইজ খাতায়, রুলটানা কাগজে কবিতা লিখতে পছন্দ করতেন। পরের দিকে তাঁকে সাদা দিস্তার কাগজেও কবিতা লিখতে দেখা গেছে। তাঁর হাতের লেখা ছিল রাবীন্দ্রিক কিংবা নজরুলী-ধরন থেকে ভিন্ন, গোটা গোটা অক্ষর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং অস্পষ্টতা থেকে মুক্ত। তিনি বলতেন, কবিতা লেখাটা তাঁর কাছে ছিল অনেকটা 'অনায়াস কারুকর্মের' ব্যাপার। তাঁর অনেক বিখ্যাত সনেট কবিতার খসড়াই নাকি তিনি কলতাকায় ট্রামে যেতে যেতে টিকিটের উল্টা পিঠে তৈরী করেছিলেন। উনিশ শ' চুয়ান্ন সালের দিকে তাঁর কলেজ জীবনের এক সহপাঠী বন্ধুর কাছে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কিত একটি চমকপ্রদ

www.pathagar.com

কাহিনী শুনেছিলাম। কলকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে (অথবা রিপন কলেজে, ঠিক মনে নেই) ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সহপাঠী ছিলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক ও "মোহাম্মদী"র এককালীন সম্পাদক মরহুম মওলানা নজির আহমদ চৌধুরীর জ্যেষ্ঠ পুত্র। যতদূর মনে পড়ে, তার নাম আহমদ আবুল মসিহ। তাঁর কাছেই কাহিনীটি শোনা।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তখন আদ্দির দামী পাঞ্জাবী ও ফিনফিনে ধুতিও পরতেন। একদিন বৃষ্টিতে ভিজে, ধুতি-পাঞ্জাবীতে রাস্তার কাদা মাখিয়ে তিনি কলেজের ক্লাসে এসে হাজির হন। পরনের কাপড় ভেজা ও কর্দমাক্ত ছিল বলে তিনি গিয়ে বসেন একেবারে পেছনের বেঞ্চিতে। সেখানে বসেই সবার অলক্ষ্যে তিনি একটি খাতায় কবিতা লিখতে শুরু করেন। ক্লাস নিচ্ছিলেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও অধ্যাপক প্রমথনাথ বিশী। আচমকা তাঁর দৃষ্টি যায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদের দিকে। তিনি চেয়ার ছেড়ে বক্তৃতা-মঞ্চ থেকে নেমে ধীর পায়ে এগিয়ে যান ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে। অধ্যাপককে দেখে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ খাতাটি লুকানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রমথনাথ বিশীর সন্ধানী দৃষ্টিতে ধরা পড়ে একজন নবীন কবির কাব্যপ্রয়াস। তিনি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছ থেকে খাতাটি চেয়ে নিয়ে যান। ঐ খাতায় লেখা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কয়েকটি সনেট পড়ে তিনি বিস্ময়-বিমুগ্ধ হন এবং টিচার্স কমনরুমে গিয়ে অন্যান্য অধ্যাপকদের নাকি কবিতাগুলো আবৃত্তি করে শোনান। অভিভূত কণ্ঠে অধ্যাপক বিশী বলেন যে, তিনি একজন 'তরুণ শেক্‌সপীয়র'কে আবিষ্কার করেছেন। বুদ্ধদেব বসু অধ্যাপক বিশীর কাছ থেকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার খাতাটি চেয়ে নিয়ে যান এবং সেখান থেকে কয়েকটি কবিতা তাঁর বিখ্যাত "কবিতা" পত্রিকায় প্রকাশ করেন। কথাগুলো সুধীমহলে বিশেষ প্রশংসা পায়। শোনা যায়, বুদ্ধদেব বসুও ছিলেন তখন সেই কলেজেরই অধ্যাপক। উল্লেখ্য, সেকালে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত "পরিচয়", প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত "অরণি", হুমায়ুন কবির সম্পাদিত "চতুরঙ্গ" পত্রিকায়ও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনেক কবিতা প্রকাশিত হয়।

কাহিনীটি সম্পর্কে ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে কখনো কিছু জিজ্ঞাসা করি নি। কেননা, নিজের কাব্যকৃতির বিষয়ে তিনি বিশেষ কিছু বলতেন না। ঐ ধরনের প্রশ্ন করলে অনেক সময় বিরক্ত হতেন। একবার দুঃখ করে বলেছিলেন, "কলম কামড়িয়ে আমি কোনদিন কবিতা লিখি নি, কিন্তু অধুনা লিখতে গিয়ে বেশ ভাবতে হচ্ছে। তাই আগের মতো তেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে আর ভাবনাকে ভাষা দিতে পারছি না। চারপাশের অবস্থা দেখে মন বেদনায় বিষিয়ে যাচ্ছে।" তাঁর এই মনোবেদনারই কিছু ছাপ রয়েছে বছর পনেরো-ষোলো আগে লেখা একটি অনবদ্য সনেটে ঃ

> আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হয়ে আছে বেদনায় ঃ
> যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিমরাতে,

www.pathagar.com

যেমন নিঃসঙ্গ পাখী একা আর ফেরে না বাসাতে;
তেমনি আমার মন মুক্তি আর খোঁজে না কথায়।
যখন সকল সুর থেমে যায়, তারা-রা হারায়,
নিভে যায় অনুভূতি—আঘাতে কঠিন প্রতিঘাতে,
নিঃস্পন্দ নিঃসাড় হয়ে থাকে পাখী পায় না পাখাতে
সমুদ্রপারের ঝড় ক্ষিপ্রগতি নিশান্ত হাওয়ায়।

মুখ গুঁজে পড়ে আছে সে পাখীর মত এ হৃদয়
রক্তক্ষরা। ভারগ্রস্ত এ জীবন আজ ফিরে চায়
প্রাণের মূর্ছনা আর নবতর সৃষ্টির বিস্ময়,
উদ্দাম অবাধ গতি, বজ্রবেগ প্রমুক্ত হাওয়ায়
অথচ এখানে এই মৃত্যুস্তব্ধ রাত্রির ছায়ায়
রুদ্ধ আবেষ্টনে আজ লুপ্ত হয় সকল সঞ্চয়।

[ক্লান্তি]

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে শুনেছি, ঐ সময়ে তাঁকে কিছুটা গা ঢাকা দিয়ে সন্তর্পণে থাকতে হতো। তাঁর 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে লেখা "ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য", সাপ্তাহিক "আজ" পত্রিকায় প্রকাশের পর তাঁকে নাকি কর্তৃপক্ষীয় কেউ কেউ কম্যুনিস্ট কবি বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন। এমনকি তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশও নাকি লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল। ঐ ব্যঙ্গ-কাব্যটিতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঐতিহাসিক চরিত্র মীরজাফরের জবানীতে তদানীন্তন শাসক-শোষক ও অন্যান্য সমাজবিরোধী 'নীতিবিদদের' তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। সম্ভবত সেটাই ছিল তাঁর বিড়ম্বনার কারণ।

কিন্তু সব বেদনা, দুঃখ-দৈন্য ও সামাজিক প্রতিকূলতার মধ্যেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ হতাশার হাতে আত্মসমর্পিত ছিলেন না; তাই তিনি একই সময়ে 'কবিতার প্রতি' শীর্ষক একটি সনেটে বলতে পেরেছিলেন ঃ

আর একবার তুমি খুলে দাও ঝরোকা তোমার,
আসুক তারার আলো চিন্তার জটিল ঊর্ণাজালে,
যে-মন বিক্ষত, আজ জাগুক আবার ছন্দে-তালে
এখানে সমস্যাকীর্ণ এ জগতে এসো একবার।

কবিতাকে এভাবে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে পরবর্তীকালেও কাব্যক্ষেত্রে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হওয়া সম্ভব হয়েছিল! তিনি ছিলেন অস্থিমজ্জায় কবি। কবিতা ছাড়া অন্য কোন ভাবনা তাঁর মনের ত্রিসীমানায়ও ঘেঁষতে পারতো না। তাঁর সাহিত্য-চিন্তা, সংস্কৃতি-চিন্তা, সামাজিক চিন্তা—এমন কি সব রকমের সংস্কার

www.pathagar.com

সাধনের উদ্যোগও ছিল কবিতা-কেন্দ্রিক এবং কবিতানির্ভর। তাই কবিতাকেই তিনি অবলম্বন করেছিলেন তাঁর জীবনাদর্শ প্রচার, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের উজ্জীবন এবং সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের হাতিয়ার হিসাবে। তিনি নিছক কলা-কৈবল্যবাদী ছিলেন না; সাহিত্যের সামাজিক ভূমিকায়ও ছিলেন গভীরভাবে বিশ্বাসী। তিনি জানতেন, এইসব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হাসিল করতে হলে একটি সামগ্রিক কাব্য-আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, একক প্রচেষ্টায় সন্তুষ্ট থাকলে চলবে না। এ জন্যেই তিনি নিজে লিখতেন, অন্যকে সব সময় লেখার জন্যে অনুপ্রেরণা দিতেন। কেউ কাব্যকলার পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্রতী হলে পরম আনন্দ বোধ করতেন। তিনি বলেছিলেন, তাঁর 'সাত "সাগরের মাঝি"র সবগুলো কবিতাই নাকি মনে মনে একটি ছক তৈরি করে অনেকটা সিকোয়েন্স-এর ধরনে লেখা। এমনকি "সিরাজাম মুনীরা"র কবিতাবলীও নাকি তাই। দুটি গ্রন্থের কবিতাই প্রায় একই কালের রচনা।

দেশবিভাগের আগে পাকিস্তান-আন্দোলনের সময়ে রেনেসাঁ আন্দোলনের পটভূমিতেই এই কবিতাগুলোর জন্ম। তাঁর আগেকার লেখায়—বিশেষ করে সনেট কবিতায় উপজীব্য ও রীতিভঙ্গী এবং ভাষা ব্যবহারের দিক থেকে ছিল অনেকটা ভিন্ন রীতির অনুসরণ। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় ও ঐ সময়ের অন্যান্য রচনায় আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। "সাত সাগরের মাঝি" প্রকাশিত হয় ১৩৫০ সালের বৈশাখ সংখ্যা মাসিক "মোহাম্মদী" পত্রিকায়। কবিতাটি পত্রিকার শুরুতেই মুদ্রিত হয়েছিল। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ঐসব কবিতা সঙ্গে সঙ্গেই তাঁকে একজন শক্তিমান ও স্বতন্ত্র কবি হিসাবে চিনিয়ে দেয়। ঐ বছরই নিখিল বঙ্গ মুসলিম সাহিত্য সম্মেলনের মূল সভাপতির অভিভাষণে সৈয়দ এমদাদ আলী বলেন, "আমাদের নবীন কবিদের মধ্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পথের সন্ধান পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়। তাঁহার 'নিশানবাহী' এবং 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতা ভবিষ্যতের দিক দিয়া শুভসূচক।" (মুসলিম বঙ্গের সাহিত্য সাধনা, মাসিক মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫০।) আন্তর্জাতিক লেখক সংস্থা পি. ই. এন-এর উদ্যোগে আয়োজিত এক সর্বভারতীয় সম্মেলনে কাজী আবদুল ওদুদ তাঁর ভাষণে বলেন,

> বাংলার মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা অগ্রগণ্য সাহিত্যিক তাঁরা অবশ্য প্রধানত বুদ্ধির মুক্তিবাদী। তবে মোটের ওপর নিঃসঙ্গ সাহিত্যিক। আত্মনিয়ন্ত্রণী দলের সাহিত্যিক ও সাহিত্যোৎসাহীদের মধ্যে কিছু উল্লেখযোগ্য হয়েছেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। তিনি ইকবালের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করেছেন, যদিও ইকবালের দার্শনিক মেজাজ তাঁর নয়। তিনি তরুণ, বিচার-বিশ্লেষণ নয়, সুপরিণতিই তাঁর জন্য আজ কাম্য (১৯৪৫)।

মুজীবুর রহমান খাঁ এক প্রবন্ধে বলেন ঃ

> "ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে 'সাত সাগরের মাঝি' নামক কবিতাটি সম্বন্ধে অনেক কথাই বলা যায়। এ কবিতায় আদ্যন্ত আমাদের জাতীয়

www.pathagar.com

তমদ্দুনের ছাপে মর্যাদাবান হয়ে উঠেছে। এটাই তাঁর সম্বন্ধে একমাত্র কথা নয়। তাঁর রচনায় চাতুর্য ও সূক্ষ্মতা অভিনব, 'সাত সাগরের মাঝি' পড়তে পড়তে কীটস ও প্রি-রাফেলাইট কবিদের কথা মনে পড়ে। কীটসে ছিল রঙের ঐশ্বর্য। মরিস সুইনবার্নে যে সুরভি-ঐশ্বর্যের কল্পচিত্র পাই, তারই কতকটা পাই এই 'সাত সাগরের মাঝি'তে।" (মুসলিম বাংলার সাহিত্য, মোহাম্মদী ১৩৫০)।

কবি আবদুল কাদির সম্পাদিত "কাব্য মালঞ্চ" সংকলনে 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। তিনি ঐ সময়ে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা সম্পর্কে একটি কথিকাও প্রচার করেন। তাঁর এই কথিকাটি 'নবীন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' শিরোনামে "সওগাত" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর একটি ইংরেজী ভাষ্যও প্রকাশিত হয়েছিল বেতারের ইংরেজী জার্নালে। এর আগে নাকি কোনো নবীন মুসলমান কবি সম্পর্কে কলকাতা বেতার কেন্দ্র থেকে একক কথিকা প্রচারিত হয় নি। বিভাগপূর্বকালে ফর্‌রুখ আহ্‌মদই পেয়েছিলেন এই বিশেষ মর্যাদা। তাঁর ঐ সময়ের কবিতায় একদিকে রূপ পাচ্ছিল মুসলিম রেনেসাঁ, ইসলামী আদর্শ ও ঐতিহ্যের রূপায়ণের আহবান ও আকুতি, এবং অন্যদিকে নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহমর্মিতা ও শোষক সমাজ এবং সভ্যতার প্রতি ধিক্কার। তেরো শ' পঞ্চাশের দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় লেখা তাঁর বিখ্যাত 'লাশ' কবিতা ছাড়াও অন্যান্য কবিতায় রয়েছে এর বলিষ্ঠ পরিচয়। 'মজলুম' শীর্ষক একটি কবিতায় তিনি লেখেন ঃ

১. সাপের কবলে পড়ে কাঁদে এক
নির্জীব শিকার।
শেষ হয়ে এল তার
জীবন-পিপাসা
মাথা ঠুকে মরিছে মাটিতে
সকল জীবন-স্বপ্ন আলোকের
মুক্ত অধিকার
বাতাসে বাতাসে ভাসে
ব্যর্থতার রোনাজারি
ব্যর্থ হাহাকার
এখানে সভয়ে দেখি
আদমের সন্তানেরা
হল কোটি মৃত্যুর শিকার
*　　*　　*
এই উৎপীড়িত হাড়,
বুভুক্ষ জিন্দিগী আর

www.pathagar.com

পাদপিষ্ট সিনা
আজ শুধু তোমাদের
করে যাবে ঘৃণা;
উত্তপ্ত লেলিহ ধোঁয়া
বুকে তার উৎপীড়িত
রাত্রি হবে ভোর
সে আগুন জ্বালানোর
দুর্বার জেহাদে।

[মজলুম]

২. শীতের হাওয়ায় কেঁপে
এরা একদিন
শেষ হয়ে যাবে।
* * *
এরা শেষ হয়ে যাবে,
রেখে যাবে দীর্ঘশ্বাস আর
ক্ষুধার অন্তিম হাহাকার,
গাছের পাতারা হবে পীত
অকাল মৃতের হাড়
বয়ে নিয়ে যাবে শুধু এবারের শীত।
যারা আজ ধরণীকে ছেয়ে
আসন্ন শীতের রাত্রে
উৎপীড়িত অন্তিম হাওয়ায়
বিছাতেছে হাড়ের বিছানা,
চিরদিন তারা সহিবে না
অত্যাচার এ পাপের।
সমস্ত জীবন দিয়ে বসন্ত তাদের
আসে অগ্নিচূড়,—
আসন্ন শীতের
প্রান্তর পারায়ে হিংস্র
প্রতিহিংসা নিপুণ সঙ্গীন
বিদ্রোহের দিন।

[আসন্ন শীতে]

www.pathagar.com

তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা, বাস্তবতা, বিদ্রোহী-চেতনা ও ঐতিহ্যে উজ্জীবনের প্রেরণা পাশাপাশি কাজ করেছে। কবিতায় উপজীব্য আহরণে, প্রতীকী-উপস্থাপনায়, শব্দগুচ্ছ নির্মাণে, পুঁথি ও পুঁথির ভাষা এবং বাক-প্রতিমার যে শিল্প-সফল ও সার্থক ব্যবহার, সে-ও অনেকটা সে সময়ের সচেতন প্রচেষ্টার ফল। তিনি কলম কামড়িয়ে লিখতেন না বটে, কিন্তু তাঁর প্রায় সব রচনার পেছনেই কিছুটা পরিকল্পনা কাজ করতো। এই পরিকল্পনার উৎস ছিল একটি বিশিষ্ট কাব্য-আন্দোলন। অর্থাৎ কবিতায় ইসলামী আদর্শ, জীবন-বোধ, মুসলিম সংস্কৃতি ও জীবন পরিবেশের রূপায়ণ এবং জনজীবনে—বিশেষ করে মুসলিম পরিবারে ব্যবহৃত শব্দাবলীর নবরূপায়ণ। এই উদ্দেশ্যেই বর্তমানের জীবন-সমস্যাকে ফুটিয়ে তোলা, উজ্জীবনী প্রেরণাকে ভাষা দেয়া এবং মানবতাকে বিপর্যয়মুক্ত করার জন্যে তিনি কাব্যে পুঁথি সাহিত্য, মুসলিম পুরাণ এবং সাধক-দরবেশ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের শরণ নিয়েছিলেন। সমসাময়িক ও উত্তরসূরি কবিদের অনুপ্রাণিত করেছেন এ পথে কবিতার নব নির্মাণে।

নজরুলের প্রভাব এক্ষেত্রে অনিবার্য ছিল এই কারণে যে, ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম ঐতিহ্যবিষয়ক কবিতায় নজরুলও পুঁথিসাহিত্যের উত্তরাধিকারকে আশ্রয় করেছিলেন ঃ উপজীব্য বিষয় সংগ্রহ এবং প্রকাশ ও প্রকরণের অনুসরণ—এই উভয় ক্ষেত্রেই একথা সত্য। রেনেসাঁ-আন্দোলনের সময়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এবং অন্যান্য সহযাত্রী মুসলিম কবিরা কাব্যক্ষেত্রে পুঁথিসাহিত্যের উত্তরাধিকারের দিকেই ফিরে তাকিয়েছিলেন। সে কারণে এক্ষেত্রে নজরুলের প্রভাব হয়ে পড়েছিল অনিবার্য। কবিতায় রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের আগ্রহ এবং সচেতনতা সম্ভবত ইক্‌বালের অনুসরণেই দেখা দিয়েছিল। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় ঃ

> ইকবাল মুসলমানের নিশ্চেষ্টতা ও হতোদ্যমের যথাযথ চিত্র অঙ্কন করেছেন এবং পতন ও সর্বনাশের জন্যে তাঁর ক্ষোভ নিদারুণ। 'জওয়াব-ই-শেকোয়া'য় যে পথ-নির্দেশ আছে, তাতে ইসলামের চিরশক্তিমত্তায় বিশ্বাসী ইকবালের নিবিড় উপলব্ধির পরিচয় মেলে। তিনি প্রত্যেক মুসলমানকে অবলম্বন করতে বলেছেন, ইসলামের প্রবহমান সত্য এবং কোরানের অমোঘ সঞ্জীবনী বাণীকে। .... অবশ্য মনে রাখতে হবে যে, ইসলামের অর্থ ইকবালের কাছে স্তিমিত-প্রাণ ব্যক্তির আত্মসমর্পণ নয়, ইসলামের অর্থ শক্তিমত্তা, ন্যায়ানুসরণ ও সাধনা একই সঙ্গে। ইকবালের এই বলিষ্ঠ আবেগ তরুণ মুসলমানের মনকে নাড়া দিয়েছিল প্রচণ্ডভাবে। সাহিত্যক্ষেত্রে এ আলোড়নের সংবাদ পাই ১৯৪১-৪৩ সাল থেকে। ... কাব্যক্ষেত্রে নেমে এলাম ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ও আমি। ইকবালের আদর্শের অনুবর্তী হতে চেষ্টা করেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। তাঁর কাছে পরম মূল্যবান হলো উন্মেষ যুগের ইসলাম। আজ হয়ত বিপর্যয় এবং পরিবেশের সঙ্গে অসদ্ভাব আছে, কিন্তু বিশ্বাস ও উপলব্ধির পথে প্রথম

www.pathagar.com

যাত্রায় উৎসাহ ছিল অদম্য এবং স্বস্তিও ছিল প্রগাঢ়। তাই হেরার রাজতোরণই তাঁর লক্ষ্য, যে লক্ষ্যে অগ্রসর হতে হলে বিশ্ব-মুসলিম ঐক্যবোধ, ইসলামী রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থা এবং সর্বোপরি খেলাফতের প্রয়োজন। (সৈয়দ আলী আহ্সান, 'ইকবালের কবিতা'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য।)

তাই উপজীব্য আহরণে, ভাষা ব্যবহারে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এবং পুঁথি-সাহিত্যের প্রতীকধর্মী নবরূপায়ণে সে সময়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর পূর্বসূরী ও সমসাময়িক অনেক কবিকেই প্রভাবিত করেছিলেন। পুরানো পত্রিকায় তার বহু নিদর্শন ছড়িয়ে আছে। কিন্তু তাঁদের কারো কবি প্রতিভা এবং সৃজনী-ক্ষমতা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মতো ছিল না বলে তাঁদের কাব্য-সাফল্য তুলনীয় সমুন্নতি লাভ করে নি। ইংরেজী সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক, কীটস ও শেলীর অনুরাগী রোমান্টিক কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর কবি-জীবনের শুরুতেই কাব্যে প্রতীকী ব্যঞ্জনার দিকে ঝুঁকেছিলেন। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় প্রেম এবং প্রকৃতিরই ছিল প্রাধান্য। সেকালের কবিতাবলী নিয়ে "হে বন্য স্বপ্নেরা" নামে একটি সংকলন প্রকাশের ইচ্ছে ছিল তাঁর বহুদিনের। "কাফেলা" নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশ করার ইচ্ছে আছে বলেও জানিয়েছিলেন। গোড়াতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কোন বিশেষ জীবনাদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন না, মুসলিম জীবন এবং পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ও ছিল না তেমন ঘনিষ্ঠ। অন্তত তাঁর আগেকার কবিতায় এর রূপায়ণ ঘটেনি। মানবতাবাদী এই কবি তখন নির্যাতিত-নিপীড়িত মানুষের মুক্তি চাইতেন বটে, কিন্তু কোনো সুনির্দিষ্ট পথ-নির্দেশ তাঁর ছিল না। যদিও তিনি বলতেন যে, আস্তিক্য-প্রবণতাই তাঁর মধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করেছিল। তাঁর সে সময়ের বোহেমীয় জীবন-যাপন ও কবিসুলভ কর্মকাণ্ডের যে বিবরণ তাঁর তখনকার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও অন্তরঙ্গদের মুখে শুনেছি, তা কতকটা এই সাক্ষ্যই দেয়।

প্রথম জীবনে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ খুব বিলাসী এবং বর্ণাঢ্য জীবন-যাত্রার অনুরাগী ছিলেন বলে শোনা যায়। এই স্বাপ্নিক, কল্পনাপ্রবণ ও সৃজনীক্ষমতাসম্পন্ন কবির চালচলন ছিল একদা খুবই রোমান্টিক ধরনের। পরবর্তীকালে ইসলামী জীবনাদর্শে গভীর প্রত্যয়ী হয়ে ওঠার পর ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বিলাসী জীবনযাত্রা ও বর্ণাঢ্যতা সম্পূর্ণ পরিহার করে সরল জীবনযাত্রার ব্যাপারে আমাদের সমাজে এক উল্লেখযোগ্য উদাহরণ স্থাপন করেন। পোশাকে-আশাকে তিনি হয়ে ওঠেন একেবারেই আকর্ষণহীন। পায়জামা-পাঞ্জাবীই তখন তাঁর সরল ভূষণ। মাঝে মাঝে অবশ্য আচকানও পরতেন। কিন্তু পোশাক-আশাকের জৌলুস বর্জন করলেও, তাঁর চেহারা এবং প্রতিভার দীপ্তি ছিল অনেকখানি অটুট। তাঁর দীর্ঘদেহ, উন্নত নাক এবং বাঘের মতো জ্বলন্ত তেজস্বী চোখ এমনিতেই মানুষকে আকর্ষণ করতো। তাঁর কবিতার মতোই তিনিও ছিলেন অনেকের ভীড়েও একেবারেই অনন্য। মাথায় দীর্ঘ চুল, প্রশস্ত বুক ও উন্নত শির, ব্যক্তিত্ববান এই মানুষটির

www.pathagar.com

ছিল এক অদ্ভুত আকর্ষণ ক্ষমতা। তাঁর সাথে বহুবার নানা ব্যাপারে মতভেদ হয়েছে, অভিমান করে তাঁর সান্নিধ্য থেকে অনেকদিন দূরেও থেকেছি, কিন্তু কখনও ক্ষণকালের জন্যেও তাঁকে বিস্মৃত হতে পারি নি। তাঁর কবিতার মতোই তিনি ছিলেন আমার কাছে আশ্চর্য আকর্ষণীয়। একদা যাঁরা তাঁর ঘনিষ্ঠ এবং অন্তরঙ্গ সহচর ছিলেন, অথচ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে এবং মতাদর্শের ভিন্নতার দরুন দূরে সরে গেছেন, তাঁরাও তাঁর কবি ব্যক্তিত্বের আকর্ষণ থেকে মুক্ত হতে পারেন নি। প্রায়শই দীর্ঘশ্বাস ফেলেছেন, আক্ষেপ প্রকাশ করেছেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে আর দেখা হচ্ছে না বলে।

তিনি, কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, সব সময় সুভাষী ছিলেন না। এই স্বপ্নমেদুর রোমান্টিক কবির মনেও ব্যঙ্গ-প্রবণতার একটা বিশেষ জায়গা ছিল। তাঁর জীবন ও কাব্য প্রায় অভিন্ন ছিল বলেই কবিতায় তিনি যেমন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের আশ্রয় নিয়েছিলেন, তেমনি আলাপ-আলোচনায়, বৈঠকে-মজলিসে কখনও কখনও ব্যঙ্গের শাণিত তীর ছুঁড়ে মারতেন। কারো সঙ্গে কোন বিষয়ে মতভেদ হলে তাঁকে সহজে রেহাই দিতেন না। আদর্শের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অনমনীয়। এই অনমনীয়তা, সংস্কারস্পৃহা ও মানবতাবাদী চিন্তাধারাই তাঁকে আদর্শহীনতা, সুবিধাবাদ, অনাচার ও শাসন-শোষণের বিরুদ্ধে ব্যঙ্গ-কবিতা রচনায় উদ্বুদ্ধ করেছিল। বিভাগপূর্বকালে লেখা তাঁর 'অনুস্বার-বিসর্গ' এবং বিভাগ পরবর্তীকালে বিভিন্ন ছদ্মনামে লেখা 'তসবিরনামা', 'নসিহতনামা', 'ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক কাব্য' ও অন্যান্য অজস্র রচনায় হয়েছে এর পরিচয়। তিনি বহু ছদ্মনামে ব্যঙ্গ-কবিতা লিখতেন। তাঁর দু-একটি ব্যঙ্গ কবিতা অন্য কবির নামেও প্রকাশিত হয়েছে। মুসলিম লীগ শাসনামলের অনাচার ও দুর্নীতির চিত্রই তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর 'রাজরাজড়া' নামক প্রহসনে। রচনাটি ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয় "নয়া সড়ক" নামক একটি বার্ষিক সংকলনে। এটি ছিল কবি বেনজীর আহমদ ও আবু জাফর শামসুদ্দীন সম্পাদিত। এক সময়ে এই নাট্য-প্রহসনটি ঢাকায় অভিনীত এবং যথেষ্ট প্রশংসিত হয়েছিল। ব্যঙ্গ-কবিতায় তিনি তাঁর অতি অন্তরঙ্গজনকেও ঘায়েল করতেন। অনেকে যে ক্রমে ক্রমে তাঁর সান্নিধ্য থেকে দূরে চলে গিয়েছিলেন, এও তার একটি প্রধান কারণ।

কিন্তু আমার কাছে ব্যক্তি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আকর্ষণ যথেষ্ট হলেও তাঁর কবিতার আকর্ষণই ছিল অধিক। কেননা, তাঁর কবিতায় প্রতীক ব্যবহার, স্বপ্নের সঙ্গে সৌন্দর্যবোধের চমৎকার সম্মিলন, উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের ব্যবহারে সৃজনী কলা-কৌশলের নিপুণ প্রয়োগ এবং সর্বোপরি মনোরম ও ব্যঞ্জনাধর্মী শব্দ-গুচ্ছ নির্মাণের আশ্চর্য দক্ষতা আমার মন কেড়েছিল। সে জন্যে তাঁর সঙ্গে নানা ব্যাপারে মতভেদ হলেও আমার কাছে তাঁর কবিতার আকর্ষণ অটুট। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে শুনেছি,

www.pathagar.com

তিনি ইসলামের মানবিক মূল্যবোধের প্রতি প্রথম আকৃষ্ট হয়েছিলেন আল-কুরআন-এর মওলানা মুহম্মদ আলী কৃত ইংরাজী তর্জমা পড়ে। তিনি কুরআন-এর মহান চিরন্তনী বাণী ও অনুপম কাব্যসৌন্দর্যে এমন মুগ্ধ হন যে, ঐ ইংরেজী অনুবাদের সাহায্যে বাংলায় কুরআন-এর কিছু কিছু আয়াতের তর্জমা করেন। তাঁর এই কাব্যানুবাদ সে সময় "সওগাত" ও "মাসিক মোহাম্মদী" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শুনেছি, মৃত্যুর পূর্বে তিনি পবিত্র কুরআনের তর্জমায় ব্যাপৃত ছিলেন। একালে মাসিক "মদীনা" পত্রিকায় প্রকাশিত কিছু কিছু তর্জমা পড়ে আমার মনে হয়েছে, মূলানুসারিতার দিকে অধিক দৃষ্টি দিতে গিয়ে তিনি কাব্যগুণকে গৌণ করে দেখেছেন। অথচ কাব্যানুবাদে দক্ষতা যে তাঁর কতখানি তা তাঁর অনূদিত ইকবালের কবিতা এবং বিভাগ পূর্বকালে আল কুরআন-এর কিছু কিছু আয়াতের অনুবাদ যাঁরা পড়েছেন, তাঁরাই উপলব্ধি করবেন ঃ ইংরেজী থেকে কুরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর মনে শংকা জেগেছিল হয়তো বা তিনি মূল থেকে সরে যাচ্ছেন।

এখানে একটি আয়াতের মর্মানুবাদের অংশ বিশেষ উদ্ধৃত করছি ঃ

তিনি আল্লাহ চির-জীবন্ত, শাশ্বত প্রাণবান,
তিনি অতন্দ্র চির-উপাস্য একক অধীশ্বর।
পৃথিবী-নীলের মধ্যবর্তী সম্পদ, সুমহান
সবই শুধু তাঁর, সবই করে তাঁর করুণায় নির্ভর
তাঁর অনুমতি বিনা কে করিতে পারে বলো আবেদন?
তিনি যে প্রাজ্ঞ—যাহা সম্মুখে, যা পিছে সংগোপন
তাঁহার অসীম করুণা ব্যতীত পারে না মানব মন
বুঝিতে তাহার বিপুল জ্ঞানের বিন্দু নিদর্শন।

[আয়াতুল কুরসি]

এই অনুবাদটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৪৮ সালের শ্রাবণ সংখ্যা "মাসিক মোহাম্মদী"তে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনুবাদেও তাঁর নিজের কবিতার মতোই উচ্চারণের বলিষ্ঠতা এবং উদগত কণ্ঠ। বিশেষজ্ঞরা বলেন, বিশ্বাসে জোর না বাঁধলে বাক্য-বন্ধন সুদৃঢ় হয় না। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা পাঠে অনুভব করা যায়, কথাটা কতখানি সত্য। বলেছি, ইংরাজী থেকে আল কুরআনের অনুবাদ করতে গিয়ে তাঁর মনে শংকা ছিল, হয়তো বা তিনি মূল থেকে দূরে সরে যাচ্ছেন। তাই সে যুগে কুরআনের অনুবাদে তিনি আর অগ্রসর হন নি।

তাঁর কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দের ব্যাপক ও নিপুণ ব্যবহার দেখে অনেকের ধারণা—ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বুঝি আরবী ও ফারসী ভাষা খুব ভাল জানতেন। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের নিজের মুখে শুনেছি, তিনি এসব শব্দাবলী আহরণ করেছেন প্রধানত পুঁথি

www.pathagar.com

থেকে, প্যারীচাঁদ মিত্রের "আলালের ঘরের দুলাল," নজরুলের কবিতা, প্রমথ চৌধুরীর গদ্য এবং অন্যান্য রচনা পাঠ করে। তাঁর স্মরণশক্তি ছিল অসাধারণ। কীটস, শেলী, গ্যেটে, হুইটম্যান থেকে শুরু করে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল—এমন কি পরবর্তী কবিদের রচনাও তিনি অবলীলায় মুখস্থ বলতে পারতেন। বাঙালী কবিদের মধ্যে মাইকেলের প্রতিই ছিল তাঁর সর্বাধিক অনুরাগ। কবিতায় মাইকেলের নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষাই ছিল তাঁর এই অনুরাগের প্রধান কারণ। আমার ধারণা, ফর্‌রুখ আহ্‌মদও কাব্যক্ষেত্রে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কবিতার ঔজ্জ্বল্য এবং শিল্পসৌষ্ঠবের অভাব অনেকখানি পুষিয়ে নিয়েছেন। খণ্ড কবিতার পুনরাবৃত্তি এবং রোমন্থনের ক্ষতিকর প্রভাব ও বিপর্যয় থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্যে তিনি অবলম্বন করেছেন মহাকাব্য, নাট্যকাব্য ও পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাটক রচনার প্রকরণ। এরই ফল তাঁর "হাতেম তা'য়ী", "নৌফল ও হাতেম", "ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য'। এইসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার আরেকটি কারণও ছিল। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য করার উপযোগী মুসলমানদের লেখা তেমন কোনো উপযুক্ত মানের বই নেই—এই ধরনের কিছু বক্তব্য রেখেছিলেন এক সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জনৈক অধ্যাপক। এই বক্তব্য ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মনে বিশেষ প্রতিক্রিয়ার জন্ম দেয়। তিনি অ,আ,ক,খ থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপযোগী পাঠ্যকাব্য রচনার জন্যে মনে মনে একটি ছক তৈরি করেন। সেই থেকেই অলক্ষ্যে শুরু হয়ে যায় তাঁর কাব্য রচনার প্রয়াস। "হরফের ছড়া", "ছড়ার আসর", "পাখীর বাসা", "নতুন লেখা" ইত্যাদি শিশু ও কিশোর পাঠ্য গ্রন্থ এবং "হাতেম তা'য়ী", "নৌফল ও হাতেম" ইত্যাদি কাব্য এই সচেতন প্রয়াসেরই ফল। তরুণ বিদ্যার্থীদের মনে স্বাতন্ত্র্যবোধ ও আদর্শপ্রীতি জাগিয়ে তোলার মানসে তিনি রচনা করেন নতুন ধরনের পাঠ্য বই "নয়া জামাত"।

তিনি নিজে যেমন সব সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতেন, তেমনি অন্যকেও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যাপৃত হওয়ার অনুপ্রেরণা দিতেন। বিশেষত পুঁথির কাহিনীর ভাষা নিয়ে, লোক-সাহিত্যের—বিশেষ করে ময়মনসিংহ গীতিকার কাহিনী অবলম্বন করে কেউ কাব্য রচনা করলে তিনি সর্বাধিক প্রীত হতেন। একদা আমারও কিছু কিছু ঐ ধরনের কবিতা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনুপ্রেরণায় এবং তাগিদে রচিত হয়েছিল। পুঁথির শব্দ-সম্ভার ও বাক্যরাজি ব্যবহার করে লেখা আমার 'চাহার দরবেশ পুঁথি থেকে', 'বাদশাহ জোহাকের স্বপ্ন' ইত্যাদি কবিতা জন্ম নিয়েছিল অনেকটা এভাবেই। সৈয়দ আলী আহসান তাঁর "চাহার দরবেশ" কাব্য লিখেছিলেন বিভাগ পূর্বকালে, কিন্তু তাতে পুঁথির কাহিনী উপজীব্য হলেও, পুঁথির ভাষা ও বাকভঙ্গীর তেমন ব্যবহার নেই। আমার "চাহার দরবেশ" কবিতা পাঠ করে অধ্যক্ষ মুহম্মদ আবদুল হাই একদা লিখেছিলেন ঃ

www.pathagar.com

পুঁথি সাহিত্যের ধারার সঙ্গে তার কাহিনী, শব্দ-বিন্যাস রীতি এবং শব্দের বয়নকুশলতা তথা ফ্রিজোলজির সঙ্গে পরিচিত হয়ে সেগুলোর স্বীকরণ সাধন করে শালীন কাব্য-সাহিত্যে তার ব্যবহার করতে পারলে আমাদের একালের সাহিত্য সমৃদ্ধ হবে নিঃসন্দেহে। সম্প্রতি প্রকাশিত মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র "জুলেখার মন" (১৯৫৯) কাব্যটির কয়েকটি কবিতায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রদর্শিত পথে পুঁথি-সাহিত্যের বাকবিন্যাস রীতির ও তার স্বপ্ন-কল্পনার অনুবর্তন আমাদের মুগ্ধ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সাহিত্যের সম্ভাবনাময় উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ইঙ্গিত বহন করে। (ভাষা ও সাহিত্য)

কিন্তু আমি অচিরেই উপলব্ধি করতে পেরেছিলাম 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রদর্শিত পথে' তার অব্যবহিত পরে কাব্য-সাফল্য অর্জন খুব সহজ ব্যাপার নয়। কেননা, নজরুলের পর ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে সাফল্য দিয়েছে তাঁর প্রতীক ব্যবহার, শব্দগুচ্ছ নির্মাণের দক্ষতা এবং নিজস্ব স্বতন্ত্র কণ্ঠস্বর। এর অভাবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনুসরণই সম্ভব, অনুসরণের পথ ধরে নবনির্মাণ সুদূরপরাহত। বিভাগপূর্বকালে এবং পরবর্তী সময়েও তার সমসাময়িক ও উত্তরসুরি অনেকেই এমন প্রয়াস করেছেন, কিন্তু সাফল্যের মুখ দেখেন নি। সৈয়দ আলী আহসানের ভাষায় ঃ

> ফর্‌রুখ আহ্‌মদের পরে আর যাদের আমরা দেখলাম, যারা ইসলামী বিষয় নিয়ে কবিতা লিখেছেন, তাঁরা সকলেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনুসরণ করলেন, কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মধ্যে শব্দ ব্যবহারের যে একটা সচলতা ছিল, যে সচলতা এসেছিল কবিতার ধ্বনি এবং ছন্দ সম্পর্কে তীক্ষ্ণ জ্ঞান থাকার দরুন, সে জিনিসটা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনুসারী যাঁরা তাঁদের মধ্যে ছিল না। ফলে তাঁদের কাব্যে অনুকরণের রূঢ়তা এসেছে, কিন্তু কবিতা কোন প্রকার প্রাণচঞ্চল্যে দীপ্যমান হয়ে ওঠে নি।

(পূর্ব পাকিস্তানের বিশ বছরের কবিতা)

এই শব্দ ছন্দ ও ধ্বনির ব্যবহার-নৈপুণ্যের সাথে এসে যুক্ত হয়েছিল প্রতীক কৌশল, যা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতাকে অনন্য বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। ডক্‌টর সৈয়দ আলী আশরাফ অনেক আগে বলেছিলেন ঃ

> "ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান হচ্ছে এই যে, তিনি 'সিন্দাবাদ' কাহিনীকে রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে ব্যবহার করেছেন। নজরুলের রূপকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় না, এমনকি তিনি প্রতীক ধর্মীও নন। তিনি রূপকল্প সংগ্রহ করেছিলেন তাঁর অভিজ্ঞতা ও জ্ঞান থেকে, কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পুরাকাহিনীর ব্যবহারে সবসময়ই প্রতীকবাদী।"

শুধু 'সিন্দাবাদ' কাহিনীর প্রতীক রূপায়ণে নয়, 'ডাহুক'-এর প্রতীকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যখন মুক্ত মানুষ ও আত্মার কথা বলেন এবং শৃংখলিত সত্তার জন্যে আহাজারী

www.pathagar.com

করেন, তখনও কাব্য-সৌন্দর্যের উদ্বোধন ঘটে এবং সমকালীন জীবন-চেতনার পরিচয় মেলে। স্মরণীয়, কীট্‌সও তাঁর বিখ্যাত 'ওড টু নাইটিঙ্গেল' কবিতায় নাইটিঙ্গেলটিকে একটি প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কীট্‌সের মতো পাখীকে মুক্ত-আত্মার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ 'ডাহুক' কবিতায়। কীট্‌সের 'নাইটিঙ্গেল' যেমন পয়েজি বা শিল্পকলার নামান্তর, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'ডাহুক'ও তেমনি মুক্ত-আত্মার প্রতীক—মুক্তি-পিয়াসী মনের সংগ্রামের সঙ্গে মুক্ত-আত্মার একটা তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে এই কবিতাটিতে। পার্থক্য সম্ভবত এই যে, কীট্‌স নাইটিঙ্গেলকে আবহমানকালের পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন; 'ডাহুক' একটি বিশেষ সময়-পরিস্থিতিতে ইতিহাসের পটভূমিকায় চিত্রিত। কিন্তু এ সত্ত্বেও কবিতাটি এর প্রতীকী উপস্থাপনার জন্যেই কালজয়ী হওয়ার দাবী রাখে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বলতেন, তিনি 'ডাহুক'কে নিঃসঙ্গ সাধকের জিকির এবং তাঁর সাধনার সাফল্যের প্রতীক হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। ডাহুক ডাকতে ডাকতে গলায় রক্ত তুলে ডিমে তা দিলে তবেই নাকি বাচা ফোটে। সাধকের সাধনা এবং সাফল্যও অনেকটা ঐ রকমই। ব্যবহারের তাৎপর্য যা-ই হোক, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্য-সাধনায় 'প্রতীক'-এর ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। তিনি তাঁর অনেক সনেটে 'পাখী'র প্রতীকে এ যুগের যন্ত্রণা ও গ্লানিবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন ও "হাতেম তা'য়ী" কাব্যে "নুররেজ ফুলের" প্রতীকে বর্তমান সভ্যতার অন্ধত্ব ঘুচানোর পথ-নির্দেশ করেছেন। এ কাব্যে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক ক্ষেত্রে।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কাব্য-সাধনায় ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ; বিষয়-আশয় ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির দিকে তাঁর আদৌ কোনো দৃষ্টি ছিল না। দৃষ্টি ছিল কাব্যের নব নব দিগন্ত সন্ধানের দিকে। নতুন আঙ্গিকে, নতুন ভাষা ও ভঙ্গীতে কথা বলার উদগ্র ইচ্ছাই তাঁকে গ্রাস করে রেখেছিল, কিন্তু তিনি কি সব কথা বলে যেতে পেরেছেন? তাঁর নিজেরই ভাষায় ঃ

কিছু লেখা হল আর
অলিখিত রয়ে গেল ঢের,
কিছু বলা হল আর হয় নি
অনেক কিছু বলা;
অনেক দিগন্তে আজও হয় নাই
শুরু পথ চলা
কে জানে সকল কথা।
কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের।
[শেষ কথা]

www.pathagar.com

রফিকুল ইসলাম

অনন্য পুরস্কার

ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয়ের আগে তাঁর কবিতা ও গানের সাথে আমার পরিচয় হয়। ফর্‌রুখ ভাইয়ের 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' কবিতা বা গান এবং ঐ রচনা নিয়ে মওলানা আকরাম খাঁ-র সঙ্গে তাঁর যে লড়াই তার মাধ্যমেই আমি তাঁকে প্রথম চিনি। ঐ ঘটনা ঘটে দেশবিভাগের পূর্বে, তবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হবার পরে ফর্‌রুখ ভাইয়ের গানের সঙ্গে আমার সম্যক পরিচয় ঘটে। আমরা যখন মুকুল ফৌজ করি, আমি ছিলাম রমনা মুকুল ফৌজের অগ্রসেনা। আমরা প্রথমে ফজলুল হক হলের মাঠের পরে কার্জন হলের পেছনে তদানীন্তন ভূগোল বিভাগের মাঠে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে প্রতিদিন বিকেলে প্যারেড, পি টি, গান আবৃত্তি ইত্যাদি করতাম। দেশ বিভাগের পরপর একবার 'বাগবান' ভাই (মোহাম্মদ মোদাব্বের) এবং কামরুল ভাই মুকুল ফৌজ পরিদর্শনে ঢাকা এলেন। সেবারে কামরুল ভাই আমাদের ফর্‌রুখ ভাইয়ের একটা গান শিখিয়ে দিয়ে গেলেন, 'সামনে চল, সামনে চল,/তৌহিদেরি শান্ত্রী দল', ঐ গান আমরা অনেক করেছি।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে পরিচয় নাজিমুদ্দীন রোডে বেতার ভবনে। দেশ বিভাগের পরে কলকাতা থেকে অনেকে ঢাকা বেতার এলেন; ফর্‌রুখ ভাই ছাড়াও কবি শাহাদাত হোসেন, সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম, কবি আবুল হোসেন, কবি সিকান্‌দার আবু জাফর, কবি সায়ীদ সিদ্দিকী, জনাব নাজির আহমদ এবং আরো অনেকে। দেশ বিভাগের সময় আমরা চার ভাই-বোনের তিনজন ছোটদের আসর 'খেলাঘরে' আবৃত্তি বা গান করতাম। স্কুল ব্রডকাস্ট শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানেও আমরা ছিলাম। আগে যাঁদের নাম উল্লেখ করেছি তাদের সঙ্গে পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ হই খেলাঘরে; কিন্তু ফর্‌রুখ ভাই শিক্ষামূলক অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করতেন। সেই আসরেই আমরা ভাই-বোনেরা (আমি, আতিকুল ইসলাম ও মাসুমা খাতুন) ফর্‌রুখ ভাইয়ের স্নেহভাজন হয়ে পড়ি। ফর্‌রুখ ভাই ও শিল্পী জয়নুল আবেদীন বিকেলের দিকে মাঝে মাঝে মুকুল ফৌজের মাঠে আসতেন, সেখানে কামরুল ভাই বা লতিফ ভাই যখন আমাদের গান করাতেন, তাঁরা বসে বসে শুনতেন। ফর্‌রুখ ভাইয়ের একাধিক গান তখন আমরা গাইতাম। আর একটি গানের কথা মনে পড়ে, 'দূর দিগন্তে ডাক এল'। গানটি আহাদ সাহেবের সুরে ছিল, কিন্তু আমাদের শিখিয়েছিলেন লতিফ ভাই।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ ভাইয়ের বাসা ছিল তখন সম্ভবত কমলাপুরের দিকে, বাড়ী যাবার পথে তিনি মাঝে মাঝে আমাদের বাসায় থামতেন। আমাদের বাসা ছিল ফজলুল হক হল গেটের উল্টো দিকে রেল কলোনীতে, ছোট্ট একটি একতলা কোয়ার্টারে। আমাদের বাড়ীতে গান বাজনা হত। সেখানে আসতেন সোহরাব ভাই, বেদার ভাই, লতিফ ভাই, ওস্তাদ ফুলঝুরি খান, ওস্তাদ সাখাওয়াত হোসেন খান প্রমুখ। কেউ শেখাতেন, কেউ গাইতেন। গানের চেয়ে আড্ডা হত বেশী। সেকালের নামকরা গীটার-বাদক ওয়ারেস আলীর আড্ডাও ছিল আমাদের বাড়ীতে। তাঁর পিয়ানোটি আমাদের বাড়ীতেই রাখা ছিল, সবাই সেটায় টুং টাং করতেন। এভাবে কখন যে ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়েছিলাম জানতাম না; ফলে রেডিওতে গেলে, দেখা হলে, সামনের আবুল মিয়ার রেস্টুরেন্টে মিষ্টি-চা না খাইয়ে ফর্‌রুখ ভাই ছাড়তেন না।

ফর্‌রুখ ভাই ঘনিষ্ঠ স্নেহভাজনদের 'তুই' সম্বোধন করতেন। ঐ সম্বোধন থেকে আমিও বাদ পড়িনি। ইতিমধ্যে স্কুল থেকে কলেজ, কলেজ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেছি, মুকুল ফৌজ থেকে ঢাকার সাংস্কৃতিক অঙ্গনে গিয়েছি, রেডিওতেও খেলাঘর বা শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান থেকে সাহিত্য ও নাটক বিভাগে উন্নীত হয়েছি। কিন্তু ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আগের মতোই থেকে গেছে। আমার মনে হয় না যে, ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাছে আমার বয়স কোনদিন বেড়েছিল।

বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীর ঘটনার পরপর যখন রেডিওর সামনে রেস্টুনেন্টে যাই বেতার শিল্পীদের ধর্মঘটে যোগদান করানোর জন্যে; গিয়ে দেখি, ইতিমধ্যেই ফর্‌রুখ ভাই, লতিফ ভাই, আহাদ ভাই, খোন্দকার আবদুল হামিদ প্রমুখ সংগঠন করে ফেলেছেন। ফর্‌রুখ ভাই পাকিস্তান ও ইসলামী আদর্শের অনুরাগী ও অনুসারী বরাবর, কিন্তু তদানীন্তন পাকিস্তানী ও পূর্ব পাকিস্তানী শাসকেরা ইসলামের নামে যা করছিলেন, তাতে তাঁদের ওপরে সবচেয়ে বেশী ক্রুদ্ধ ছিলেন ফর্‌রুখ ভাই। তিনি ঐ শাসকদের ব্যঙ্গ করে 'রাজ-রাজড়া' নামে একটা নাটক লিখেছিলেন এবং তা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত হয়েছিল। বেনজীর আহমদ. ও আবু জাফর শামসুদ্দীন সম্পাদিত "নয়া সড়ক" সংকলনে নাটকটি প্রকাশিত হয়। ভাষা আন্দোলনের পরে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং বাইরে প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ি ঘোরতরভাবে। পঞ্চাশ দশকের বেশীর ভাগ সময় কাটে আমাদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। ঐ সময় ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটত কম, ফর্‌রুখ ভাই আবার ঐ সময়ে বিভিন্ন ইসলামী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে পড়েন। কিন্তু তাতে আমাদের ব্যক্তিগত সম্পর্কের কোন ফারাক ঘটেনি। রেডিওতে দেখা হলেই সেই হাস্য মুখ, মিষ্টি আর তার সঙ্গে যুক্ত পান-জর্দা ও কাব্যালোচনা।

www.pathagar.com

ষাটের দশকে আবার ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটে, এবারে 'রাইটার্স গিল্ড' বা 'লেখক সংঘে'। আমরা প্রথমে লেখক সংঘে যাইনি। তখন ঐ প্রতিষ্ঠান কবি গোলাম মোস্তফার প্রভাবাধীন ছিল। আমরা অর্থাৎ মুনীর ভাই, ফর্‌রুখ খাই, আস্‌কার ইবনে শাইখ, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, হাসান হাফিজুর রহমান প্রমুখ ঠিক করি 'গিল্ড' দখল করতে হবে। আমরা নির্বাচনে অংশ গ্রহণ করে 'গিল্ড' যারা শুরু থেকে পকেটে পুরে রেখেছিলেন, তাঁদের তাড়াই। ঐ নির্বাচনে ফর্‌রুখ ভাই আমাদের খুবই সাহায্য করেছিলেন। গিল্ডের পত্রিকার নাম বদলে 'পরিক্রম' করা হয়, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এবং আমি তা সম্পাদনা করতাম। গিল্ড বা লেখক সংঘ থেকে আমরা শামসুর রাহমানের প্রথম বাক্যগ্রন্থ "রৌদ্র করোটিতে" ছাড়াও ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাব্য নাটক "নৌফল ও হাতেম" প্রকাশ করেছিলাম। ফর্‌রুখ ভাই লেখক সংঘের আদমজী পুরস্কারও পেয়েছিলেন।

ফর্‌রুখ ভাই প্রেসিডেন্ট পুরস্কার—প্রাইড অব পারফরমেন্স পেলে আমরা তাঁকে একটি সংবর্ধনা দিয়েছিলাম। ওপরে যাদের কথা উল্লেখ করেছি, তাঁরা সবাই ছিলেন ঐ সংবর্ধনার উদ্যোক্তা, অনুষ্ঠানটি হয়েছিল ঢাকা হল মিলনায়তনে। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটির দায়িত্ব ছিল আমার ওপর। ফর্‌রুখ ভাইয়ের সংবর্ধনা অনুষ্ঠানটি খুবই সার্থক হয়েছিল এবং ফর্‌রুখ ভাই প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পাওয়ার চেয়ে বেশী খুশী হয়েছিলেন আমাদের সংবর্ধনা পেয়ে। বস্তুত তিনি আইয়ুব খানের কাছ থেকে আদমজী পুরস্কার আনতে করাচী যেতে রাজী ছিলেন না। পাকিস্তানী শাসকদের ইসলামের নামে অনৈসলামিক কার্যকলাপে ফর্‌রুখ ভাই এতই ক্ষুব্ধ ছিলেন যে, তাঁকে কখনো রাইটার্স গিল্ডের কোন কনফারেন্সে পশ্চিম পাকিস্তানে নেওয়া যায় নি। ফর্‌রুখ ভাই রেডিওর কর্মচারী ছিলেন আর ওদিকে পাকিস্তান সরকারের তথ্য বিভাগের কর্মকর্তা কুদরতুল্লাহ্‌ শাহাব ছিলেন রাইটার্স গিল্ডের সাধারণ সম্পাদক। কিন্তু ফর্‌রুখ ভাই কোনদিন কোন আমলাকে তোয়াক্কা করতেন না; বরং ঐসব জাঁদরেল আমলারাই ঢাকা এলে ফর্‌রুখ ভাইয়ের ভাঙা বাড়ীতে গিয়ে তাঁকে তোয়াজ করে আসতেন। কিন্তু ঐ সব মুহূর্তে ফর্‌রুখ ভাই যেমন মাথা উঁচু করে বুক ফুলিয়ে চলতেন, ঠেক তেমনি ব্যবহার ও আচরণ করতেন। বস্তুত পাকিস্তানী আমলারা ফর্‌রুখ ভাইকে রীতিমতো তোয়াজ করতেন আর ঢাকা রেডিওর কর্মকর্তারা তাঁকে দস্তুরমতো ভয় পেতেন। ফর্‌রুখ ভাইয়ের আপোসহীন স্বাধীনতা নির্লোভ আদর্শবাদী চরিত্রের সামনে সব সুবিধাবাদীই মাথা নীচু করে চলতেন। ফর্‌রুখ ভাই ব্যক্তিগত স্বার্থ ও লোভের ঊর্ধ্বে ছিলেন।

উনিশ শ তেষট্টি সালের দিকে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের উদ্যোগে 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' পালন করি, ঐ অনুষ্ঠান এক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের রূপ

www.pathagar.com

পরিগ্রহ করে এবং মানুষের মধ্যে বিপুল সাড়া জাগায়। ঐ সপ্তাহে বাংলা কবিতার বিবর্তন প্রদর্শনী এবং আবৃত্তির মাধ্যমে দৃশ্যমান করে তোলা হয়েছিল। চর্যাপদ বা কাহ্নপাদ থেকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পর্যন্ত আমরা প্রদর্শনী ও আবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত রেখেছিলাম। আবৃত্তি ও পাঠের আসরে ফর্‌রুখ ভাইয়ের 'ডাহুক' কবিতাটি আমি আবৃত্তি করেছিলাম। আমি জানতাম না যে, সেদিন পাবলিক লাইব্রেরী মিলনায়তনের বাইরে হাজার হাজার দর্শকের মধ্যে ফর্‌রুখ ভাইও ছিলেন। আবৃত্তি আমি কেমন করেছিলাম জানি না, কারণ 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সপ্তাহ' আয়োজনের জন্যে এক মাস কাল ধরে আমাদের কয়েকজনকে দিবারাত্রি পরিশ্রম করতে হয়েছিল। প্রতিদিন সকাল থেকে প্রদর্শনী, সেমিনার ইত্যাদির পরে রাতে অনুষ্ঠানের সময় আমাদের আর কোন শক্তি অবশিষ্ট থাকত না, তবুও ফর্‌রুখ ভাইয়ের কবিতা আমি প্রাণ দিয়ে আবৃত্তি করেছিলাম। অনুষ্ঠানের পরে ফর্‌রুখ ভাই আমাকে আবেগের সঙ্গে বুকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ফর্‌রুখ ভাই তখন আবেগে টগ্‌বগ্ করছিলেন। আমি তাঁর বুকের দ্রুত স্পন্দন অনুভব করতে পারছিলাম। অদ্যাবধি আমি ফর্‌রুখ ভাইয়ের সেই উষ্ণ আবেগ ও হৃৎস্পন্দন অনুভব করতে পারি। তার আগে আমি অনেক আবৃত্তি করেছি কিন্তু অমন পুরস্কার কখনো পাই নি।

তারপরে দিন গড়িয়ে গেছে ষাটের দশকে দ্রুত, ছেষট্টি থেকে একাত্তর, নানা রাজনৈতিক আবর্তে বিক্ষুব্ধ দেশকালের সঙ্গে সঙ্গে আমরা চলেছি বিপরীত স্রোতে। ক্রমশ ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে যোগাযোগ কমে এসেছে। মাঝে মাঝে রেডিওতে গেলে দেখা হয়েছে। যখনই দেখা হয়েছে আবার সেই পুরোনো দিনগুলিতে আমরা ফিরে গেছি। নাজিমুদ্দীন রোডের আবুল মিয়ার দোকানের মতোই শাহ্‌বাগের আবুল মিয়ার দোকানে ফর্‌রুখ ভাই তাঁর হাস্যমুখ, মিষ্টান্ন, চা, পান-জর্দা দিয়ে আপ্যায়ন করেছেন। ফর্‌রুখ ভাইয়ের প্রিয় কবি ছিলেন মাইকেল মধুসূদন দত্ত এবং তা উভয়ের বাড়ী যশোহর বলে নয়। ফর্‌রুখ ভাইয়ের চেয়ে বড় মাইকেলপ্রেমিক আমি দেখি নি। দেখা হলেই আমরা মাইকেলের কবিতার মাহাত্ম্য নিয়ে আলোচনায় ডুবে গেছি। ফর্‌রুখ ভাই বা আমি আমাদের রাজনৈতিক মতাদর্শ নিয়ে কখনো প্রশ্ন তুলিনি। জাফর ভাই (সিকানদার আবু জাফর), মুনীর ভাই, কামরুল ভাই সবাই ফর্‌রুখ ভাইয়ের বন্ধু ছিলেন, একসঙ্গে হলে তাদের গভীর বন্ধুত্বে নিমগ্ন দেখেছি। হাস্যকৌতুকে তাঁরা উচ্ছল হয়ে উঠেছেন। কোন রাজনৈতিক মতামত তাঁদের সম্পর্ককে মলিন করতে পারে নি। রেডিওর রেস্টুরেন্টে ফর্‌রুখ ভাইকে দেখেছি আহাদ ভাই বা লতিফ ভাইয়ের সঙ্গে, যাঁরা ওঁর সবচেয়ে বেশী গানে সুর করেছেন। এ ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার লক্ষ্য করেছি। বস্তুত ব্যক্তিগত আদর্শে আপোসহীন ফর্‌রুখ ভাই তাঁর বন্ধু ও স্নেহভাজনদের প্রতি সখ্য ও

www.pathagar.com

প্রীতিতেও আপোসহীন ছিলেন। বাইরে যা-ই ঘটুক, ব্যক্তিগত সম্পর্ককে কোনদিন নষ্ট করতে পারে নি।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে আমার শেষ দেখা শাহবাগ রেডিওর রেস্টুরেন্টেই, ষাটের দশকের একেবারে শেষের দিকে বা সত্তরের দশকের শুরুতে। ফর্‌রুখ ভাই আমাকে যথারীতি আপ্যায়ন করলেন, কিন্তু সেদিন ফর্‌রুখ ভাইকে একটু গম্ভীর, অন্যমনস্ক দেখেছিলাম এবং তা এই প্রথম ও শেষবারের মতো। মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হবার পরে আর ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখা হয়নি।

www.pathagar.com

শামসুল আলম

শতাব্দীর অন্যতম সেরা মানুষ

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কেমন মানুষ ছিলেন, তা তাঁর কাব্যে লেখা নেই। তাঁর সমসাময়িক লোক, যাঁরা বিভিন্ন সময় কাজে-অকাজে সাহিত্যাংগনে বা পেশাগতভাবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সংস্পর্শে এসেছেন, সে কথা তাঁরাই জানেন। তাঁরা যদি এখন মানুষ ফর্‌রুখ সম্বন্ধে না লেখেন, তবে মানুষ হিসাবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কত বড় এবং কত মহৎ ছিলেন, আমাদের ভবিষ্যৎ বংশধরগণ তা জানবে না। তাই আমি মনে করি, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সমকালীন পরিচিত এবং ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিদের ফর্‌রুখের কাব্যপ্রতিভা অপেক্ষা মানুষ ফর্‌রুখের আলোচনাই বেশী করা দরকার। মানুষ ফর্‌রুখ সম্বন্ধে আলোচনা করাও বেশী দরকার এ জন্যে যে, বাংলাদেশের বর্তমান পরিবেশে দশ কোটি মানুষের মধ্যে মানুষ খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।

তোষামোদ বিমুখতা

সাবেক পাকিস্তান সরকারের কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার সচিব ছিলেন প্রাক্তন আই. সি. এস. অফিসার কুদরতুল্লাহ্‌ শাহাব। তাঁর আরও বড় পরিচয় তিনি একজন উঁচুদরের লেখক। কুদরতুল্লাহ্‌ শাহাব একবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে সাক্ষাতের। এ দেশের বহু খ্যাত-অখ্যাত কবি-সাহিত্যিকের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও সাক্ষাৎ হয়েছে কিন্তু কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা হয়নি। ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে অনুরোধ করা হল কেন্দ্রীয় তথ্য ও বেতার সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্যে। শুনে তিনি বললেন, 'আমি পূর্ব পাকিস্তানে রেডিও পাকিস্তান-এর সামান্য স্টাফ লেখক। কেন্দ্রীয় তথ্য সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করার যোগ্যতম ব্যক্তি প্রাদেশিক সচিব। রেডিও-র একজন স্টাফ লেখক কেন কেন্দ্রীয় সচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবে? কেন্দ্রীয় সচিবের কোন কাজ করিয়ে নেওয়ার দরকার থাকলে তিনি রেডিও-র ডিরেক্টরকে বলবেন, ডিরেক্টর আমাকে নির্দেশ দেবেন। আমার তো তাঁর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই।'

কেন্দ্রীয় তথ্য সচিব পুনরায় ঢাকা সফরকালে আবার ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে সাক্ষাতের কথা বললেন। প্রাদেশিক কর্মকর্তারা একথা-সেকথা বলে এড়াতে-ভুলাতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু কুদরতুল্লাহ্‌ শাহাব তা ভুললেন না। তিনি বারবার মনে করিয়ে দিলেন। অগত্যা তাঁকে জানানো হল যে, কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তথ্য বিভাগের কোন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার সঙ্গে কখনও সাক্ষাৎ করেন না। শুনে কুদরতুল্লাহ্‌ শাহাব বললেন,

www.pathagar.com

'মায় সমঝ গিয়া'। অতঃপর তিনি কবি গোলাম মোস্তফাকে নিয়ে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বাসায় যান। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তখন খালি গায়ে, গামছা কাঁধে গোসলখানায় ঢুকতে যাচ্ছিলেন। এমন সময় দরজায় কড়া নড়ল। তিনি দরজা খুলে দিলেন। কবি গোলাম মোস্তফা কুদরতুল্লাহ্ শাহাবের পরিচয় করিয়ে দিলেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁদেরকে বসতে বললেন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন স্যুট-টাই পরা কুদরতুল্লাহ্ শাহাব বসছি বসছি করছেন দেখে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ চেয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখেন চেয়ারে কিছু ধূলাবালি জমেছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কাঁধ থেকে গামছা নামিয়ে চেয়ার পরিষ্কার করা শুরু করলেন। কুদরতুল্লাহ্ শাহাব হাত ধরে তাঁকে থামালেন। কথাবার্তার সময় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এমন কোন ভাব দেখালেন না যে, তাঁর দীন গৃহে কুদরতুল্লাহ্ শাহাবের আগমনে তিনি ধন্য বা পুলকিত বা আনন্দিত হয়েছেন। আর দশ-পাঁচজন লোক তাঁর ঘরে এলে তিনি যেমন ব্যবহার করেন, তাই করলেন। কবি গোলাম মোস্তফা তাঁর এরূপ নির্বিকার ব্যবহারে খুব অস্বস্তি অনুভব করলেন।

আমাদের দেশের বহু কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী সরকারের সচিব পর্যায়ের কোন অফিসারের সঙ্গে সাক্ষাৎ এবং বন্ধুত্বকে বিরাট একটা সম্মান এবং গৌরব মনে করেন। এরূপ সুযোগ হাতের কাছে এলে তা কখনও হারাতে চান না। কিন্তু কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে একজন নিম্নপদস্থ কেরানী এবং ঊর্ধ্বতন কেন্দ্রীয় সচিবের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। দু'জনকে তিনি মানুষ হিসেবেই দেখতেন। শুধু সচিব কেন, রাষ্ট্রপতির সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্বের আহবান এলেও তিনি একইভাবে প্রত্যাখ্যান করতেন। তাঁর কাছে পদমর্যাদা, প্রশাসনিক বা রাজনৈতিক ক্ষমতা বিত্তসম্পদ দ্বারা মানুষের সম্মান বা মূল্য নিরূপিত হতো না। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কখনও কোন মানুষের বন্ধুত্বের আকাঙ্ক্ষী বা অনুগ্রহের প্রত্যাশী ছিলেন না। আমরা শুধু মুখে বলে থাকি 'খোদা ভরসা', কিন্তু নির্ভর করি বহু ব্যক্তি, সংস্থা ও সত্তার উপর। 'খোদা ভরসার' সার্থক এবং বাস্তব প্রতিফলন ছিল ফর্‌রুখ চরিত্রে।

সত্য ও স্পষ্ট ভাষণ

মুখে এক এবং মনে অন্য—এ আমাদের জাতীয় মানসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এ ক্ষেত্রে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন একটি বৈপ্লবিক ব্যতিক্রম। মনের ভাব গোপন করে মনোরঞ্জক কথা বলতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পারতেন না এবং কোনদিন চেষ্টাও করেন নি। বাংলাদেশের দশ কোটি মানুষের মধ্যে যাঁরা ভেতর ও বাইরে সম্পূর্ণ এক, সেই বিরল মানুষদেরই একজন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। রূঢ় সত্য ও নিঃশঙ্ক ভাষণে হযরত আবূ জর গিফারী (রা) ছিলেন তাঁর আদর্শ ও প্রেরণা। সাহিত্য-নীতিমালা-সিদ্ধ ছদ্মনামে ব্যঙ্গ কবিতা লেখা ছাড়া কবি ফর্‌রুখের কোন মানবিক দুর্বলতা ছিল বলে আমার জানা নেই।

www.pathagar.com

আমি এক সময় কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রতিবেশী ছিলাম। তিনি থাকতেন ইস্কাটন গার্ডেন কোয়ার্টারের তিন তলায়। আমি থাকতাম পাশের গোলাপী রঙের দালানের ছ' তলায়। একদিন রোববার তাঁর বাসায় গেলাম। সকাল বেলা যাতে তাঁর লেখাপড়া, কাজ-কর্মের কোন ব্যাঘাত না ঘটে তাই একটু বেলা করেই গেলাম। তিনি নিজেই দরজা খুলে দিলেন। তাঁর দিকে তাকিয়ে বললাম, মনে হয়, আমাকে দেখে আপনি মোটেও খুশী হন নি। আমার ধারণা, এ মুহূর্তে আমি আপনার বাসায় একজন অনাকাঙ্ক্ষিত আগন্তুক।" তিনি একটুও দ্বিধা না করে বলে ফেললেন, "হ্যাঁ, তাই। আমি খুশী হই নি।" তাঁর এ জাতীয় ব্যবহারের সঙ্গে আমি পরিচিত ছিলাম। তাই একটুও আশ্চর্য হলাম না।

আমি তখন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সার্ভিসেস এবং জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশন বিভাগের জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত ডেপুটি সেক্রেটারী। আমার দায়িত্বে ছিল ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থেকে শুরু করে সচিব পর্যন্ত সকল ইপিসিএস, সিএসপি, ইপিএসএস ক্যাডারভুক্ত সকল অফিসারের বদলি, নিয়োগ, প্রমোশন, বিদেশ গমন, ডিসিপ্লিনারী কেস প্রসেসিং। তদুপরি ছিল এডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট জজ, জেলা জজ, কর্পোরেশনের সচিব, ডিরেক্টর, চেয়ারম্যানদের নিয়োগ-বদলী। ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, কৃষি-বিজ্ঞানী এবং প্রদেশের সকল বিভাগের সিনিয়র স্কেলের অফিসারদের সিলেকশন কমিটি নং-১-এর সচিব ছিলাম আমি। তাছাড়া আমার কাজ ছিল প্রাদেশিক সেক্রেটারীদের কমিটির সচিবের দায়িত্ব পালন। ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল-এর আমলে কেবিনেট না থাকায় সেক্রেটারীদের কমিটিই কেবিনেট কাউন্সিলের দায়িত্ব পালন করত। ইত্যাকার দায়িত্বের জন্যে তখনকার দিনে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের সবচেয়ে প্রভাবশালী এবং জাঁদরেল উপ-সচিব ছিলেন জেনারেল এডমিনিস্ট্রেশনের দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-সচিব। এরূপ পজিশন থেকে মানব-চরিত্র অধ্যয়ন করা বড় একটা সুযোগ। অন্যান্য অফিসার তো বটেই, সচিব পর্যায়ের পদমর্যাদাসম্পন্ন অফিসারদের স্নেহ-দৃষ্টিও আমার সার্ভিস কেরিয়ারের মধ্যে বোধ হয় ঐ সময় ছিল। এই পরিবেশ এবং পজিশনে থাকাকালে আমি শুধু একটি জায়গায় দেখলাম, আমি একজন মানুষ ছাড়া আর কিছু নই। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে একজন পিয়ন আর সরকারের সবচেয়ে ক্ষমতাশালী উপ-সচিবের মধ্যে এক কানাকড়ি পার্থক্যও ছিল না।

নির্লোভ ফর্‌রুখ

তদানীন্তন রেডিও পাকিস্তান-এর জনৈক প্রাদেশিক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে একবার ডেকে বলেছিলেন, "দেখ ফর্‌রুখ, তোমার জন্যে আমি একটি ভালো চাকুরীর ব্যবস্থা করেছি। তোমাকে তেমন কোন কাজ করতে হবে না। কাব্য-চর্চা

www.pathagar.com

হবে তোমার কাজ। তোমাকে কোন কাজের নির্দেশ কেউ দেবে না। তুমি যখন যতটুকু কাজ করতে চাও, তা করলেই চলবে। বেতনও বেশী। এ চাকরীটি তুমি গ্রহণ কর। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ জানতে চাইলেন, তাঁর প্রতি এ অযাচিত অনুগ্রহের কারণ কি? তিনি তো কোনদিন তাঁর কাছে কোন করুণার উমেদার ছিলেন না। কর্মকর্তা খোলাখুলি বলেই ফেললেন, "তোমাকে আমরা সকলে শ্রদ্ধা করি, সমীহ করি। কিন্তু তুমি আমাদের আখলাক পছন্দ কর না। তাতে আমরাও অস্বস্তি বোধ করি, তুমিও আমাদের গালাগালি কর। তার থেকে তুমি একটা নির্দোষ পরিবেশে থাকবে, এটাই তো ভাল।'

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এ লোভনীয় চাকুরীর সুন্দর প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "তোমাদের মত শয়তানরা যতদিন এখানে থাকবে, ততদিন আমার এখানে থাকার প্রয়োজন আছে। আমাকে সমীহ করেও তো তোমরা কিছুটা আকাম কম করবে। আমি রেডিও অফিস ছেড়ে কোথাও যাবো না।"

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন জাত কবি, স্বভাব-শিল্পী। সাংসারিক বুদ্ধি বা হিসাব-নিকাশ তাঁর মধ্যে ছিল না। তাঁর সাথে তাঁর বন্ধু-বান্ধব আড্ডা দিতেন ঠিকই, রাজা-উজিরও মারতেন। কিন্তু কাজের কথা বলার সময় তাঁদের সাত-পাঁচ ভেবে কথা পাড়তে হতো। কারণ, কবি-মন কোন্ কথাটা যে কিভাবে নেবেন এবং কিরূপ অর্থ করবেন, তা ছিল হিসাব-নিকাশের বাইরে। তাই ঝুঁকি নিয়ে কাজের কথা পাড়তে হতো।

একবার বিদেশে একটি সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে মনোনীত করা হয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ভাবলেন, এ সুখবরটি তিনি নিজেই কবিকে দেবেন। সময়টা ছিল হজ্জের কিছু আগে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন একজন নিষ্ঠাবান মুসলিম। সম্মেলন হতে ফেরার পথে তিনি হজ্জ করে আসতে পারেন, এটা ভেবেই তাঁকে সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানের জন্যে, বিশেষ করে এ সময়, মনোনয়ন দেওয়া হয়। ধারণা করা হয়েছিল যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এ সুযোগ হাতছাড়া করবেন না। তাঁকে কিছু না বলে মনোনয়নের চিঠিটা দিয়ে দিলে হয়ত বিদেশে সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দেওয়া হতো, আর তাঁর হজ্জও হয়ে যেত। কিন্তু যাতে কবি হজ্জ করে আসতে পারেন, তাই তাঁকে এ সময় নমিনেশন দেওয়া হয়েছে, একথা বলার পরই কবির মধ্যে হলো তাঁর স্বভাবগত এবং কবিসুলভ প্রতিক্রিয়া। তিনি বলে ফেললেন, "সরকারী পয়সায় হজ্জ হয় না। আর এরূপ সরকারী ঘুষও তিনি খান না।" আসলে কোন কিছু মনে না করে, কোন বিশেষ উদ্দেশ্য না রেখে, নিতান্ত নির্দোষভাবেই তাঁকে সাহিত্য সম্মেলনে যোগদানের জন্যে মনোনীত করা হয়েছে, একথা আর কে তাঁকে বোঝাবে। একবার যখন তিনি 'না' করে বসেছেন, তাঁকে আর 'হাঁ' করান কার সাধ্য। তিনি সাহিত্য সম্মেলনেও গেলেন না, হজ্জও তাঁর জীবনে করা হলো না।

www.pathagar.com

সস্তা জনপ্রিয়তাবিমুখতা

আবু জর গিফারী কলেজের প্রতিষ্ঠাতা-প্রতিষ্ঠান আবু জর গিফারী সোসাইটির একটি সেমিনারে প্রধান অতিথি হওয়ার দাওয়াত নিয়ে একদিন আমি গেলাম কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে। তখন ইয়াহিয়া খানের মার্শাল ল। শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর মৃত্যুদিবস উপলক্ষে আয়োজিত সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল 'পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা' (ট্রায়াল্‌স্ অব ডেমোক্রেসি ইন পাকিস্তান)। বক্তা অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমদ, অধ্যাপক গোলাম আযম প্রমুখ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা। ইসলামিক একাডেমী হলে আলোচনা সভা। অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহ্‌মদ এবং অধ্যাপক গোলাম আযমকে পাশাপাশি বসতে দিয়ে বললাম, "আপনারা তো পাশাপাশি বসতে অভ্যস্ত নন। দু'ঘন্টা ধরে অন্যান্য বক্তার বক্তৃতাকালে নিজেরা কিছু কথা বলুন; দেখবেন কারও মুখেই বাঘের মত উৎকট গন্ধ নেই। একজন আর একজনকে দূর থেকে যত জঘন্য মনে করেই ঘাড় মটকাতে চান, আসলে কেউই অতটা খারাপ নন। হাজার হলেও একই মাটির সন্তান তো।"

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রধান অতিথি হওয়ার দাওয়াত গ্রহণ করেন নি। বরং আমাকে বকাবকি করে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সেমিনার ও দাওয়াতের ভূমিকা শুনে নিজে নিজেই আমার বক্তব্য আওড়ালেন। সেমিনারের বিষয়বস্তু ঃ পাকিস্তানে গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা। সময় ঃ মার্শাল ল চলাকালে। স্থান ঃ ইসলামিক একাডেমী। বক্তা ঃ অধ্যাপক মুজাফ্‌ফর আহমদ ও গোলাম আযম প্রমুখ। উদ্যোক্তা ঃ আল্লাহ্‌র নবীর প্রিয় সাহাবীর নামে প্রতিষ্ঠিত আবু জর গিফারী সোসাইটি। প্রধান অতিথি ঃ কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। এর মধ্যে না আছে কোন সংগীত, না আছে ছন্দ। আমি বললাম, "ছন্দ না থাকলেও জমবে ভাল। দেখছেন না, হাবেদা মরুর জাহাজ উটের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলোর মধ্যে ঘোড়ার দেহের মত কোন মিল নেই, ছন্দ নেই, সামঞ্জস্য নেই। তবুও সাত সাগরের মাঝিরা উটকে খুবই ভালবাসেন। কারণ উট একটি উপকারী প্রাণী আর আমাদের সেমিনারের বিষয়টি সময়োপযোগী।"

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আমাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, তাঁকে প্রধান অতিথি করে আমার কি লাভ। আমি বললাম, "আপনি তো সভা-সমিতিতে যান না। আপনার ভক্তরা আপনাকে দেখার সুযোগ পায় না। তাই আপনাকে দেখার জন্যে বেশ কিছু লোক আসবে। সেমিনারের জন্যে লোক যোগাড় করতে আমাদের কষ্ট কম হবে।" কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ "সেমিনারে প্রধান অতিথি হয়ে তাঁর কি লাভ হবে?" আমি বললাম, "সেমিনারের আগে এবং পরে বেশ কয়েকটি পত্রিকায় ছাপার অক্ষরে আপনার নাম দেখবেন। হাজার হাজার লোক পত্রিকায় আপনার নাম দেখে আপনাকে স্মরণ করবে, আপনার বই কিনবে। তাছাড়া আপনার কবিতার বই ক'জনেই বা পড়ে!

www.pathagar.com

পত্রিকায় নাম ছাপা হলে আপনার জনপ্রিয়তা বাড়বে। আমি আপনার শুভাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে একটা সুযোগ দিতে চাই।"

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আমাকে অনেকটা দরজা দেখিয়ে দেওয়ার মত বললেন, "আপনি এখন আসতে পারেন।" এবং তিনি উত্তপ্ত স্বরে বকাবকি শুরু করলেন। বললেন, "আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী নন, আপনি আমার শত্রু। আপনার সম্বন্ধে সাবধান হওয়া দরকার। বেগম সুফিয়া কামালের প্রতিভা ছিল। তিনি আমার মত কবি হতে পারতেন; কিন্তু বামপন্থীরা তাঁকে নষ্ট করেছে। নিজেদের আদর্শিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে সভা-সমিতিতে তাঁকে প্রধান অতিথি এবং সভাপতি করে তাঁর নিজেকে কবিতার মাধ্যমে প্রকাশ করার তাগিদ দুর্বল করে দিয়েছে। এখন আর তাঁর মনে কবিতা লেখার তীব্র বেদনা জাগে না। প্রধান অতিথি আর সভাপতির বক্তৃতার ভাষাই তিনি নিজের অজান্তে মনে মনে আওড়ান। এতে কাব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করার প্রয়োজন তাঁর কমে গেছে। আপনারা আমারও সে সর্বনাশ করতে চান। বামপন্থীরা শেষ করেছে সুফিয়া কামালকে আর আপনারা ডানপন্থীরা শেষ করছেন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফকে। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সর্বপল্লী রাধা-কৃষ্ণণের মত বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক হতে পারতেন। কিন্তু আপনারা তাঁকে সভাপতি, প্রধান অতিথির আসনে নাচাচ্ছেন বলে তাঁর লেখা তিনশ' পৃষ্ঠার একখানা বইও দেখতে পাই না। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফের সর্বনাশ করেই সন্তুষ্ট থাকুন। সভাপতি-প্রধান অতিথি হওয়ার প্রস্তাব নিয়ে আর কোনদিন আমার কাছে আসবেন না।"

ছোটদের কবি

আর একদিন কবির বাসায় কথা প্রসঙ্গে বললাম, আপনি সভাপতি, প্রধান অতিথি হতে চান না আপনি চান বড় কবি হতে। আপনি তো লেখেন বড়দের জন্যে। লিখে যাচ্ছেন কঠিন কঠিন দাঁত-ভাঙা কবিতা। কিন্তু বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো ছিলেন শিশু-বৃদ্ধ ছোট-বড় সকলের কবি। আপনি কি ছোটদের জন্যে লেখেন।"

কবি আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, "ছোটদের জন্যে লিখি না, তা আপনাকে কে বলল! আপনি কি আমার কবিতা পড়েন?"

আমি বললাম, "আমি গল্প উপন্যাস পড়ি, প্রবন্ধ লিখি, কবিতা কষ্ট করে বুঝতে হয়। আপনারা আমাদের না বোঝার জন্যে কঠিন করে কবিতা লেখেন। তাই পড়ি না। আমি অতো সহজ করে প্রবন্ধ লিখি, কারও বুঝতে কষ্ট হয় না। আপনি সহজ করে লিখুন, আপনার কবিতা পড়ব।"

কবি বললেন, "আপনাকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। আপনি রাজ-কন্যাকে ডিঙ্গি চড়াতে চান। রাজকন্যা ডিঙ্গি চড়ে আসে না। তার জন্যে ময়ূরপঙখী দরকার হয়।"

www.pathagar.com

এরপর কবি কয়েকটা পাণ্ডুলিপি আনলেন, ওগুলো শিশুদের জন্যে কবির লেখা। তার মধ্যে একাধিক ছিল শিশুদের ছড়ার বই এবং বর্ণমালা। দুঃখ করে বললেন, "এগুলো ছাপাবার লোক আসছে না, আর আমি ছাপাবার জন্যে প্রকাশকদের পিছু পিছু দৌড়াতেও পারছি না।"

অতিথি বাৎসল্য

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন অত্যন্ত অতিথি বৎসল। তাঁর বাসায় যখন গেছি, সব সময় চা-নাশতা খেয়ে আসতে হয়েছে। আমি কখনও তাঁর অফিসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে যাই নি। ডক্‌টর আবু হেনা মোস্তফা কামাল আমাকে বলেছেন যে, তাঁর কক্ষে গেলে তিনি একটি সিঙাড়া বা একটি রসগোল্লা বা একটি সন্দেশ খাওয়াতেন। এটা ছিল তাঁর নিয়ম।

ফর্‌রুখ ভাই যখন মিষ্টি বা সিঙাড়া আনতে বলতেন, যাঁরা আগে প্রথম দফায় সিঙাড়া বা মিষ্টি খেয়েছেন দ্বিতীয় বার বা তৃতীয় দফার আগন্তুকদের খাওয়াবার সময় প্রথম দফার আগন্তুককে বাদ দিতেন না। ফররুখ ভাইয়ের কাছ থেকে রসগোল্লা, সিঙাড়া বা সন্দেশ আদায়ের জন্যে তাঁর স্নেহাস্পদ কনিষ্ঠ ভক্তরা প্ল্যান করতো। যেহেতু এটা সুনির্দিষ্ট ছিল যে, ফররুখ ভাইয়ের কক্ষে গেলে সিঙাড়া, মিষ্টি পাওয়া যাবে, তাই মিষ্টি সিঙাড়া খাওয়ার ইচ্ছা হলে তাঁর ভক্তরা তাঁর রুমে যেতেন। তিন-চারজন এক সঙ্গে একত্রে যেতেন না। কারণ চারজন একত্রে গেলে, একবারই একটা করে সিঙাড়া পাবেন। তাই তাঁরা একজন একজন করে যেতেন। তাতে যিনি সবার আগে গেলেন তিনি পেতেন একাধিকবার আর যিনি সবার পরে যেতেন তিনি পেতেন একবার। দ্বিতীয় আগন্তুকের খাওয়ার সময় প্রথম জনের দুবার খাওয়া হয়ে যেত। তৃতীয় জনকে একটি সিঙাড়া খাওয়াবার সময় প্রথম জনের হয়ে যেত তিনবার খাওয়া এবং দ্বিতীয় জনের দুবার। তাই তাঁর ভক্তদের কার কয়টি মিষ্টি বা সিঙাড়া খাওয়ার ইচ্ছা আছে, তা সিদ্ধান্ত করে তাঁরা কে আগে এবং কে পরে প্রবেশ করবে ঠিক করে নিতেন। কেউ কেউ তাঁর কক্ষে যাওয়ার আগেই ক্যান্টিন বয়কে বলে যেতেন তাঁর জন্যে ফর্‌রুখ ভাইয়ের কক্ষে কি কি নিতে হবে।

প্রত্যয়ী

বাংলাদেশ হওয়ার পর ফর্‌রুখ ভাই বড় কষ্টে ছিলেন। বহু দিন তাঁর চাকুরী ছিল না। যেহেতু তিনি বাংলাদেশ সমর্থন করেন নি, তাই তিনি বেতন পেতেন না। তাঁর অভাবের কথা জেনে একদিন দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ সাহেব পকেটে ২০০টি টাকা নিয়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বিখ্যাত জমিদার ও সাধক কবি হাসান রাজার দৌহিত্র। জমিদার-নন্দন হওয়া সত্ত্বেও সারা জীবনই আছেন একজন অভাবী মানুষ। তবুও ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে দেওয়ার জন্যে তিনি ২০০টি

টাকা নিয়ে তাঁর বাসায় যান। ফর্‌রুখ ভাই মেজাজী মানুষ, তাই টাকাটা কিভাবে দেবেন তাই তিনি ভাবতে লাগলেন। ইতিমধ্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কোন এক ব্যক্তিকে লক্ষ্য করে বললেন, ওঁরা কেন বাইরে আমার অভাবের কথা বলে বেড়ায়? আমি কি তাদের আমার অভাবের কথা বলেছি। আল্লাহ্ তো আমাকে ভালই রেখেছেন। আমার থেকে কত কষ্টে কত লোক আছেন। আমি রাতে ভাত খেয়েছি। আজ সকালে নাশতা খেয়েছি। আমার কষ্ট কিসের?" ইত্যাদি ইত্যাদি। এ-কথা শুনে দেওয়ান আজরফের সাহায্য করার সাহস উবে যায়।

অনেক রাত অনেক সকাল ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে সপরিবারে না খেয়েও কাটাতে হয়েছে। কিন্তু চাকরীর জন্যে, বেতনের জন্যে তিনি কারও কাছে যান নি, কারও কাছে বোধ হয় ধার করেন নি, বা হাত পাতেন নি। তাঁর আত্মীয়-স্বজন পরিচিত বন্ধু-বান্ধব তাঁর স্ত্রীর কাছে কিছু কিছু টাকা দিয়ে গেছেন। আধপেটা খেয়ে-না-খেয়ে প্রয়োজনীয় ঔষধের অভাবে অনেকটা বিনা চিকিৎসায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ মৃত্যুর পথে এগিয়ে গেছেন।

কোন লোভ, স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কোন মত বা পথ সমর্থন করতেন না। হাজার হাজার টাকা কেন, লক্ষ কোটি টাকায় বিক্রি হওয়ার মত মানুষ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন না। তিনি যা সত্য ও ন্যায় বলে বিশ্বাস করতেন, দুনিয়ার এমন কোন প্রলোভন, পরিবেশ বা শক্তি ছিল না, যা তাঁর অটল বিশ্বাসকে বিন্দুমাত্র টলাতে পারত। তিনি বিশ্বাস করতেন, কোন একটি বিশেষ রাষ্ট্রের সাহায্যপুষ্ট স্বাধীনতায় বাংলাদেশের মানুষের সত্যিকার কল্যাণ আসবে না। এটা ছিল তাঁর বিশ্বাস। কিন্তু তাই বলে হানাদার বাহিনীর প্রশংসায় তিনি গান লেখেন নি, কবিতা রচনা করেন নি বা রাজাকার হন নি।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে যাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে জানতেন, তাঁদের কেউ কেউ তাঁর বিরুদ্ধ মতাবলম্বী হলেও তাঁরা ছিলেন তাঁর নিকট শ্রদ্ধাবনত। তিনি কখনও কোন ব্যক্তিগত বা ক্ষুদ্র স্বার্থের বশবর্তী হয়ে নিজের মত গঠন করতেন না বা পরিবর্তনও করতেন না। তিনি যা বিশ্বাস করতেন তা গোপন করতেন না। যাঁর এক হাতে চাঁদ আর অন্য হাতে সূর্য এনে দিলেও তাঁর বিশ্বাস থেকে টলান যেত না। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন বিশ্বাস প্রত্যয়ে সেই রসূলের অনুসারী। বুকে বেয়নেট, ঘাড়ে তলোয়ার স্থাপন করেও কারও সাধ্য ছিল না, তিনি যা বলতেন তার বিপরীত অন্য কথা কেউ তাঁকে দিয়ে বলাতে। এরূপ মানুষ সারা বাংলাদেশে ক'টি পাওয়া যাবে? কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মেজাজ ছিল রুক্ষ, দৃষ্টি ছিল তীক্ষ্ণ, চরিত্র ছিল পরিচ্ছন্ন। কবিত্ব ও মনুষ্যত্বের অপূর্ব সমন্বয় হয়েছিল তাঁর জীবনে।

অমার্জনীয় অবহেলা

কবি হিসাবে ফর্‌রুখের স্থান হয়ত মাপজোক করে আমরা ঠিক করতে পারবো। কিন্তু মানুষ ফর্‌রুখকে তা পারব না। তিনি ছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যে

www.pathagar.com

অসাধারণ—সকল মাপজোকের বাইরে। এ-ধরনের মানুষ এই পৃথিবীতে দুর্লভ বললে খুব বেশী বলা হয় না।

বাঙালী মুসলিম সমাজ এবং এ ভূখণ্ডের গৌরব যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মতো মানুষের এ দেশে জন্ম হয়েছিল। কিন্তু আমরা এমন এক কৃতঘ্ন জাতি যে, তাঁকে না খাইয়ে তিলতিল করে হত্যা করেছি এবং মৃত্যুর পর সরকারী গোরস্তানে চার হাত মাটির জায়গা দিতে পর্যন্ত অস্বীকার করেছি; যার জন্যে কবি বেনজীর আহমদের ব্যক্তিগত বাসভবনে তাঁকে দাফন করতে হয়েছে।

আমরা বলি, আমাদের দেশ ছোট। আসলে আমাদের মন আরও ছোট। ক্ষুদ্রমনা মানুষ এবং জাতি কোন বড় কাজ করতে পারে না। নিজেদের জন্যেও তেমন কিছু করতে পারে না, যেমন আমরা পারছি না।

বিশুদ্ধ তওহীদবাদী

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এক আল্লাহ্‌র ইবাদত করতেন। একজনকেই তিনি সিজদা করতেন এবং খুশী রাখতে চেষ্টা করতেন। হক কথা বলতে তিনি কখনও দ্বিধা করতেন না। এক আল্লাহ্‌কে ভয় করতেন বলে তিনি সকল ভয়-ভীতি থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন। তাই তিনি ছিলেন সদা নির্ভীক। তাঁর ভাষণে অন্য কোন ব্যক্তি সন্তুষ্ট হোন বা না হোন, তাতে তিনি ছিলেন নির্বিকার। ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে নিছক কবি মনে করা হলে ভুল হবে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন একজন খাঁটি সোনার মানুষ। সেরূপ মানুষ মাটির দুনিয়ায় পাওয়া খুবই কঠিন। তাঁর মুনাজাত, তাঁর চাওয়া-পাওয়ার জায়গা ছিল একটাই। কারও উপর নির্ভর না করা, কোন মানুষের কাছে কিছু না চাওয়া, দ্বিধা-সংকোচ-ভীতিমুক্ত হয়ে সর্বদা সত্য এবং হক কথা বলা, আল্লাহ্ রাজী থাকলে কোন মানুষের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টির তোয়াক্কা না করা এক কঠিন সাধনা। সিরাতুল মুস্তাকীমে দৃঢ় থাকার ওয়াজ বা আদর্শ প্রচার করা বা কিতাব লেখা সহজ, কিন্তু জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে তা পালন করা বড় কঠিন কাজ। এটা এত বেশী কঠিন যে, এরূপ লোক মুসলিম উম্মাহ্‌র মধ্যে খুঁজে পাওয়া কষ্টকর।

আধুনিক কবিতা না লিখে শুধু গযল-না'ত-কাসীদা লিখলে তিনি হয়ত কবি অপেক্ষা সূফী দরবেশ হিসাবে বাঙালী হৃদয়-মনে দীর্ঘস্থায়ী আসন অলংকৃত করতেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের যে চারিত্রিক দৃঢ়তা ছিল, তাতে তিনি কবি না হয়ে শুধু নামায, রোযা, তসবীহ, তাহলীল, দোয়া-দরূদ নিয়ে থাকলে ঢাকায় আর একটি জনাকীর্ণ মাজার হতো।

আমরা বলছিলাম, কবি হিসাবে ফর্‌রুখ যত বড় ছিলেন, মানুষ হিসাবে ছিলেন তার চেয়ে অনেক অনেক বড়। কিন্তু আমরা অমানুষ বলে শতাব্দীর অন্যতম সেরা মানুষটি আমাদের চোখে পড়ে নি। আল্লাহ্ আমাদের দৃষ্টিশক্তি দিন, যাতে আমরা আমাদের সমাজের শ্রেষ্ঠ মানুষটিকে চিনতে ভুল না করি।

www.pathagar.com

মুস্তফা নূরউল ইসলাম

এক বিস্ময়কর নায়ক

প্রতিভার কী দাহ আছে?

অন্তত কতিপয় ক্ষেত্রে কথাটাকে মেনে নিতে হয়। এ দাহ আপনাসঞ্জাত। বিশেষ প্রতিভার নিয়তিই সম্ভবত তাই, এবং এই অবধারিতের হাত থেকে তাঁর অব্যাহতি নেই। যে অগ্নি তাঁকে সম্ভব করে তোলে, তারই লেলিহান শিখা শেষ অবধি তাঁকে পুড়িয়ে নিঃশেষ করে দেয়। ফলে সাংসারিক জীবনে প্রায়শ তাঁরা অসার্থকতায় চিহ্নিত। জাগতিক প্রয়োজন ও স্বার্থের দিক থেকে মন্দভাগ্য সেই সকল পরিবার, যারা একান্তভাবে নির্ভরশীল এঁদের ওপরে।

লোকান্তরিত কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রসঙ্গে কথাগুলি বিশেষ করে মনে আসছে।

মধুসূদনের ক্ষেত্রে কী তাই ঘটে নি? নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এঁরা সবাই ত একই ইতিহাসের চরিত্র। বারবার আমার মনে হয়েছে, বাংলা সাহিত্যের এই চারটি প্রতিভা এক বিশেষ চরিত্রগুণে এবং এক বিশেষ অদৃষ্ট-বন্ধনে সমগোত্রীয়। আর, কী বিস্ময়কর মিল খুঁজে পাওয়া যায় এ ক'জনার চোখের চেহারায়। মধুসূদনকে প্রত্যক্ষ দেখি নি বটে, কিন্তু ছবি ত দেখেছি। অনুরূপ উজ্জ্বল, তেজোদীপ্ত, জ্বালা নিঃসারী, বাঙময় চোখের অধিকারী নজরুল ইসলাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আর ফর্‌রুখ আহ্‌মদ।

ট্র্যাজিডির অনিবার্যতায় এই প্রতিভা-নায়কদের দীর্ঘজীবী হবার উপায় নেই। নিয়তির অগ্নিদাহ এঁদেরকে পুড়িয়ে মারবেই। মধুসূদন, মানিক, ফর্‌রুখ কেউই ছাপ্পান্নর সিঁড়ি পেরোতে পারেন নি; আর নজরুল ত চল্লিশের কোঠায় পা দিয়েই জীবন্মৃত হয়ে গেলেন। কেবল আমাদের দেশের কথাই নয়, বিদেশী শিল্পী-সাহিত্যিকদের বেলাতেও ভুরি ভুরি এমনটি ঘটেছে।

কিন্তু তবু এ সব হচ্ছে সান্ত্বনার কথা। ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে যাঁরা ভালবাসতেন, যাঁরা তাঁর অতি নিকটজন, সান্ত্বনায় কি তাঁদের হৃদয়ের শূন্যতা পূরণ হবার?

দিন ক্ষণ মিলিয়ে সময়টা মনে নেই, তবে তা চল্লিশের দশকের শেষের দিক, আমরা তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। শোনা গেল, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঢাকায়। ঢাকা বেতারে তিনি কাজ করেন। ঢাকার আমরা তাঁকে চাক্ষুস জানি না। কিন্তু লাশ' কবিতার ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, 'সিন্দাবাদ'-এর রূপকার ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তৎকালীন তরুণ পাঠক মহলে এক বিস্ময়কর প্রতিভার নায়ক। তাঁকে আবিষ্কার করলাম ঢাকা বেতারের চা খানায়, পুরনো

www.pathagar.com

শহরের নাজিমুদ্দীন রোডে। অতঃপর দিনের পর দিন, মাস পেরিয়ে বেশ কয়েক বছর ধরে আড্ডা ছিল ঐ একই ঠিকানায়। তিনি বসতেন ভেতরের দিককার একটি আসনে। সে দিনগুলো কী ইতিমধ্যেই বিশ-পঁচিশ বছরের ব্যবধানে পিছিয়ে গেছে?

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে তাঁর একজন বন্ধু বলেছেন, খোলা তলোয়ারের মতো চেহারা। উপমাটা প্রাচীন, ব্যবহারে ব্যবহারে তার ঔজ্জ্বল্য মেটে হয়ে এসেছে। তবু মনে হয়, আর কোনো বর্ণনা দিয়ে সেই চেহারা সম্ভবত বোঝানো যাবে না। এতেই বুঝে নিতে হবে। আর, সেই একজোড়া জ্বালা-উদগারী চোখ। 'লাশ'-এর প্রতিবাদ-ক্ষমাহীন রোষের গর্জনে যেন মুখর ঐ চোখ। সিন্দাবাদ আর ঈগল পাখীর দুঃসাহসী অভিযান পাঠ করেছিলাম ঐ চোখের ভাষায়।

আজ থেকে আড়াই দশক আগেকার কথা বলছি। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সাথে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি এতটুকু ম্লান হয় নি। আরো কত জনারই ত কাছে আসি আমরা, কিন্তু এমনি কেউ কেউ আছেন, যাঁরা হৃদয়ের অন্দর কক্ষে দীপ্ত হয়ে জ্বলেন। সে দীপ অনির্বাণ। যা বলছিলাম। কনিষ্ঠ নিকটস্থ মাত্রই তাঁর কাছে দু'দিনে 'তুই'-এর পর্যায়ে নেমে এসেছে এ অভিজ্ঞতা আমাদের অনেকেরই এবং ইতিমধ্যে তাঁকে ডেকেছি ভাই। কতো অসংখ্য জনের তিনি যে ফর্‌রুখ ভাই। আজ ভাবতে বড়ো ভাল লাগছে, ঢাকা বেতারের চা খানায় যে সময়গুলো কাটাতাম, তার ত' সীমা-সরহদ্দ ছিল না—ফর্‌রুখ ভাই ছিলেন মধ্যমণি। বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা থেকে আসতেন মুনীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, হাসান হাফিজুর রহমান, বেতারের ছিলেন আবদুল আহাদ, ফতেহ লোহানী, শামসুল হুদা চৌধুরী, নাজির আহমদ—আরো কতো জন। দিন ভর আড্ডা হত। চা এবং পান সহযোগে আড্ডা। আলাপ হয়েছে প্রধানত কবিতা নিয়ে। রাজনীতিও এসেছে। সবাই জানেন, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিশেষ এক মতাদর্শ ছিল এবং সে ভূমিতে কট্টরভাবে তিনি আপোসহীন। তখন কতই বা বয়েস আমাদের! ছাত্র রাজনীতিতে উত্তপ্ত সেসব দিন। সাহিত্য আর রাজনীতিতে অবশ্যই কোনো ফারাক ছিল না। আলাপ-আলোচনায় বিতর্কমূলক নানা কথা উঠে যেত। আমরাই কী আর হারতে রাজী হতাম? কিন্তু কলহের কোলাহলে চা-খানা উত্তেজিত হয়েছে, এমন ঘটনা কদাপি ঘটেছে, মনে পড়ে না। ফর্‌রুখ ভাইয়ের সেই উচ্চকণ্ঠ সরল হাসি আর ভালবাসার মাধুর্য সব সময়েই সব কিছুকে ছাপিয়ে গেছে।

ফর্‌রুখ ভাই প্রায়ই বলতেন, "ক্লাসিক্‌স পড়বি। মধুসূদন পড়েছিস?" তাঁর প্রিয় কবি মধুসূদন। ক্লাসিক্‌সের উৎস থেকে, মধুসূদনের চর্চা থেকে একটি বিশেষ ক্ষমতা তিনি অর্জন করেন। তা হচ্ছে কবিতা রচনায় কব্জির জোর। এ জোর ছিল তাঁর সহজ দখলে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা আলোচনা অন্যতর অবকাশে করা যাবে। বর্তমান প্রসঙ্গে তাঁর ঐ বিশেষ ক্ষমতার কথাটাই কেবল বলে নিলাম।

www.pathagar.com

আজ আমরা নিজেদেরকে অভিযুক্ত করছি, বহুদিন তাঁর খোঁজ রাখি নি কেন? তিনি ত' বলতে গেলে প্রায় বিনা চিকিৎসায়, প্রয়োজনীয় পথ্যের অভাবে এবং সপরিবারে অনটন ও কৃচ্ছ্রতার মধ্যে দিনে দিনে ক্ষয়ে গেলেন। সাধারণ ভব্যতা বোধের, সামাজিকতার অভাব কী করে আমাদের সবাইকে পেয়ে বসেছিল? সত্যি, এতই ক্ষুদ্র আর সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিলাম আমরা। কারুকে কারুকে বলতে শুনেছি, কই খবর ত' পাই নি। গরজটা যেন তাঁরই ছিল ঃ 'হে আমার বান্ধব-স্বজন, তোমরা এস এবং আমায় দেখে যাও।' ফর্‌রুখ আহ্‌মদের নিকটজনদের কী জানা ছিল না, এই ব্যক্তি অন্য ধাতুতে গড়া?

কারুরি কোনো কথার জবাব দেয়ার অনেক উর্ধ্বে আজ তিনি। তাই উট পাখীর মতো মাথা গুঁজে মনের অপরাধীটা ভাবছে, বেঁচে গেলাম!

www.pathagar.com

মুহিউদ্দীন খান

স্বপ্নরাজ্যে দুঃসাহসী সিন্দাবাদ

পঞ্চাশের দশকের শুরুর কথা। এ দেশের আপামর জনগণ তখন একটা নতুন আকাঙ্ক্ষা, নতুন আশায় উদ্বেলিত। ইসলামী জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দূর অতীতে হারিয়ে যাওয়া ফারুকী খিলাফতের নবরূপায়ণের স্বপ্নসাধ বাস্তবায়িত করতে আবেগস্পন্দিত। এমনি এক পরিবেশেই আমাদের মতো কিছু স্বাপ্নিক তরুণের কানে ভেসে এলো এক নতুন সিন্দাবাদের নব অভিযানের ডাক। উত্তাল তরুঙ্গবিক্ষুব্ধ লোনা দারিয়াসম বৈরী পরিবেশের সকল বিপত্তির কালো রাত পাড়ি দিয়ে এ নাবিক যাত্রা শুরু করেছিলেন 'হেরার রাজতোরণ'-এর উদ্দেশ্যে। দূরবিস্তারী লোনা দরিয়ার হু হু বাতাসে আমাদের কানে ভেসে আসছিল সে নাবিকের অসহিষ্ণু আর্তনাদ —'রাত পোহাবার কত দেরী, পাঞ্জেরী?' বলা বাহুল্য, আমাদের স্বপ্নরাজ্যের সে নতুন দুঃসাহসী সিন্দাবাদ ছিলেন এ যুগের ব্যতিক্রমী কবিকণ্ঠ ফররুখ আহ্‌মদ।

ফররুখ আহ্‌মদের সাড়া-জাগানো বই যখন আমাদের হাতে আসে, তখন আমরা দূর পাড়াগাঁয়ে একটা পাঠাগার প্রতিষ্ঠায় ব্যস্ত। জনাকয়েক কিশোর ও তরুণ মিলে সাপ্তাহিক 'সৈনিক' পড়ি। যতদূর মনে পড়ে "সৈনিক"-এর পাতায় বিজ্ঞাপন দেখেই আমরা "সাত সাগরের মাঝি" সংগ্রহ করেছিলাম। বইটি যে দিন ডাকপিয়নের ঝোলায় ভর করে আমাদের হাতে এসে পড়লো, সে দিন কাড়াকাড়ি এড়ানোর জন্যই ফয়সালা হয়েছিল, এ বই কেউ নিতে পারবে না। পাঠাগারে বসে সবাই মিলে পাঠ করা হবে। বলতে কি, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পড়া না হওয়া পর্যন্ত আমরা কেউ সেদিন বাড়ী ফিরি নাই। সেদিন এ বইয়ের বক্তব্য কতটুকু কি বুঝেছিলাম জানি না, তবে এমন একটা অনুভূতি নিয়ে আমরা ফিরেছিলাম যে, নতুন এক বিপ্লবের ডাক এসেছে। কাফেলা তৈরী হচ্ছে। যাত্রা অত্যাসন্ন।

এরপরই আমরা শুনতে পেলাম কাফেলা-সালারের আরো সুস্পষ্ট আহবান। এ আহবানের বক্তব্য ছিল যেমন স্পষ্ট, তেমনি লক্ষ্যও ছিল দৃষ্টিসীমার মধ্যে। আমরা স্পষ্ট শুনতে পেলাম, কবি যেন আমাদের লক্ষ্য করেই বলছেন ঃ

> আজকে উমরপন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
> কাঁধে নিয়ে বোঝা পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণপণ।

www.pathagar.com

ঊষর রাতের অনাবিল মাঠে ফসল ফলাবে যারা
দিক-দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা।

১৯৫২ সনে ঢাকায় এলাম লেখাপড়া করতে। এসে প্রথম সুযোগই গিয়ে হাজির হলাম উনিশ নম্বর আজিমপুরে "সৈনিক" অফিসে। কি এক উপলক্ষে যেন সেদিন একটা আলোচনাসভা চলছিল "সৈনিক" অফিসে। কারো সাথে পূর্বপরিচয় ছিল না। সেই পরিবেশে পরিচয়ের কোন প্রয়োজন আছে বলেও মনে করলাম না। সোজা গিয়ে বসে পড়লাম এক কোণে একটা লম্বা বেঞ্চির মাথায়।

সভাশেষে নতুন মুখ দেখে একজন আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলেন। পরিচয় দিলাম, আলিয়া মাদ্রাসার ছাত্র। নতুন ভর্তি হয়েছি। লক্ষ্য করলাম, সবাই পরম সমাদরে আমাকে গ্রহণ করছেন।

এ জলসার সবচাইতে তেজী মানুষটিকে আমি প্রথম থেকেই লক্ষ্য করছিলাম। সবাই তাঁর কথা মনোযোগ দিয়ে শুনছিলেন। সবারই শ্রদ্ধাবনত দৃষ্টি ছিল তাঁর দিকেই নিবদ্ধ। কথায় কথায় পরিচয় পেলাম, ইনি কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। আমার স্বপ্নরাজ্যের সাহসী সিন্দাবাদ।

এরপর কখন কিভাবে আমার মনোজগতের অন্যতম দুর্লভ ব্যক্তিত্ব কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অতি কাছের মানুষ, সহজ সরল ফর্‌রুখ ভাই-এ রূপান্তরিত হলেন, সে কাহিনী অনেক লম্বা। কত স্বপ্ন, কত আনন্দ, কত পরিকল্পনা আর কত যে স্বপ্নভঙ্গের বেদনা সে কাহিনীর সাথে জড়িত, তা বলে শেষ করার মতো নয়।

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের চিন্তার জগতে বিপ্লব এসেছিল প্রাজ্ঞ সাধকপুরুষ অধ্যাপক আবদুল খালেকের সান্নিধ্যে এসে। কবি অনেকবার অনেকভাবে সে কাহিনী আমাদের বলেছেন। 'সিরাজুস সালেকীন' ও 'সাইয়েদুল মুরসালীন' নামক দুটি কালজয়ী গ্রন্থপ্রণেতা অধ্যাপক আবদুল খালেক মরহুম ছিলেন বাংলার মুজাদ্দেদ ফুরফুরার পীর মওলানা আবূ বকর সিদ্দিকীর একজন বিশিষ্ট খলীফা। আধুনিক শিক্ষা এবং আধ্যাত্মিক তত্ত্বজ্ঞানের সমন্বয়ে এক অনুপম ব্যক্তিত্ব ছিলেন তিনি—অনুসন্ধিৎসু মন মাত্রই যাঁদের প্রতি এক অদৃশ্য আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে থাকে।

কবির নিজের মুখে শোনা। তাঁর কবিখ্যাতি তখন বেশ ছড়িয়ে পড়েছে। মানবতাবাদী এম. এন. রায়ের চিন্তাধারার প্রতি তিনি দারুণভাবে আকৃষ্ট। ফিনফিনে ধুতি-পাঞ্জাবী ছিল তাঁর সাধারণ পোশাক। সুপুরুষ তরুণ কবিকে এ পোশাকে দেখে বুঝবার উপায় ছিল না যে, তিনি মুসলিম ঘরের সন্তান। খান্দানী ধার্মিক পরিবারের পরিবেশে তাঁর এ বেশ-ভূষা এবং চালচলন ছিল মুরুব্বীদের জন্য ক্ষোভের বিষয়। এ সময়ই নাকি কবি একদিন কি এক কাজে দেখা করতে গিয়েছিলেন অধ্যাপক আবদুল

www.pathagar.com

খালেক সাহেবের কলকাতার বাসায়। প্রথম সাক্ষাৎ এবং প্রাথমিক কিছু আলাপ-আলোচনার পর থেকেই তাঁর মনোরাজ্যে শুরু হলো এক নতুন বিপ্লব।

অধ্যাপক আবদুল খালেকের কাছে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মুরীদ হয়েছিলেন কিনা জানি না। তবে অধ্যাপক খালেক সাহেব, তাঁর পীর ফুরফুরার মওলানা আবু বকর সিদ্দিকী এবং সিলসিলার ঊর্ধ্বতন পুরুষ হযরত সৈয়দ আহমদ শহীদের প্রসঙ্গ উঠলে কবি যেন অনেকটা আবেগতাড়িত হয়ে পড়তেন। বিশেষত সমঝদার কোন শ্রোতা পেলে তিনি কিছুক্ষণের জন্যে হলেও আধ্যাত্মিকতার আবে-কাউসারে ডুবে যেতেন। কবির এ প্রসঙ্গের অনেক আবেগময় আলোচনার আমি ছিলাম একজন উৎসাহী শ্রোতা। সৈয়দ আহ্‌মদ শহীদ ও তাঁর মুজাহিদ আন্দোলনের প্রতি আমার আবেগময় শ্রদ্ধা এবং কুরআন-হাদীসের একজন ছাত্র বলেই বোধ হয়, তিনি তাঁর অন্তরের মরমী অনুভূতি উজাড় করে দিতেন আমার মতো শ্রোতার সামনে।

দার্শনিক কবি ইকবালের ভাষায়, 'যে কথা আত্মার গভীর থেকে বের হয়ে আসে, তা সহজেই অন্তর স্পর্শ করে।' ঈমান-সমৃদ্ধ আত্মার অধিকারী কবিদের হাদীস শরীফে অভিহিত করা হয়েছে "তালামিযাতুর রহমান" - দয়াময় আল্লাহ্‌র ছাত্র নামে। রূমী, জামী, সাদী, নিযামী, ইকবাল প্রমুখ ঈমানদীপ্ত কবিকণ্ঠগুলো বোধ হয় এ হাদীসেরই বাস্তব প্রমাণ। কবি ফর্‌রুখ ছিলেন এসব কবিকণ্ঠেরই প্রতিধ্বনি। রূমীর মসনবী, জামীর গযল, সাদীর খণ্ড কবিতা এবং ইকবালের বক্তব্য প্রধান লেখা ছিল তাঁর আত্মার খোরাক। সাদীকে তিনি সর্বকালের শ্রেষ্ঠ লোকশিক্ষক বলে অভিহিত করতেন। তাঁর পরিচ্ছন্ন আত্মার মুকুরে উল্লিখিত কবিদের মরমী বাণীগুলো এক আশ্চর্য বিভায় প্রতিবিম্বিত হতো। এঁদের প্রসঙ্গ আলোচনা করার সময় তিনি যেন কোন এক সুদূরে হারিয়ে যেতেন।

বাহ্যিক বেশভূষা থেকে শুরু করে আচার-আচরণ এবং জীবনযাত্রার সর্বক্ষেত্রেই সুন্নত তরিকা সাধ্যমত অনুসরণের মাধ্যমে তাঁর ঈমানের অভিব্যক্তি মূর্ত হয়ে উঠত। যা তিনি বলতেন বা লিখতেন, তা নিজের জীবনে বাস্তবায়িত করার চেষ্টা করতেন। বক্তব্যের সাথে বিশ্বাস এবং আচরণের এ বাস্তব সামঞ্জস্যই তাঁর ব্যক্তিত্বকে আপোসহীন করে তুলেছিল। সমকালীন সতীর্থ বুদ্ধিজীবীদের কারো কারো মুনাফেকী আচরণ তাঁকে দারুণভাবে ব্যথিত করত। অনেক সময় অসহিষ্ণু করে তুলতো। অনেকের মুখের উপরই তিনি তাঁকে সে ব্যথার প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করতে ছাড়তেন না। এ ব্যাপারটা আমাদের মতো নিরীহ অনুসারীদেরকেও বিব্রত করতো। তবে এতটুকু অনুভব করে আমরা সান্ত্বনা গ্রহণ করতাম যে, হাদীসের ভাষায় মুমিনের অনুরাগ এবং বিরাগ উভয়টাই হয়ে থাকে আল্লাহর সন্তুষ্টির লক্ষ্যে। আরবীতে যাকে বলা হয় হুব্বুল্লিল্লাহ ও বুগযুল্লিল্লাহ্‌।

www.pathagar.com

যে স্বপ্ন-সাধ বুকে নিয়ে ফররুখ ভাই চল্লিশের দশকে যাত্রা শুরু করেছিলেন, পঞ্চাশের দশকে তার তীব্রতা ছিল সীমাহীন। কিন্তু একের পর এক আশাভঙ্গের বেদনায় ষাটের দশকে এসে তিনি শুধু ক্লান্তই নয়, রীতিমত ক্ষুব্ধ হয়ে উঠলেন। যাদের নিয়ে তাঁর অভিযাত্রা শুরু হয়েছিল, তাদের নানা দুর্বলতা ও অক্ষমতা তাঁকে এমন আহত করেছিল যে, এ আপনজনদের লক্ষ্য করেই তিনি শ্লেষাত্মক ব্যঙ্গ কবিতা রচনা করতে শুরু করলেন। এ সব ব্যঙ্গ কবিতার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ 'গুলের খসড়া' নামে সাপ্তাহিক "আজ"-এ প্রকাশিত হয়।

'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' গানের রচয়িতা ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এমন এক পাকিস্তানের স্বপ্ন দেখতেন, যে দেশে থাকবে না অবিচার-অনাচার, শোষণ-নির্যাতন। সে দেশটি হবে ফারুকী খিলাফতের আদলে যথার্থ অর্থেই সর্বহারা মানুষের স্বর্গরাজ্য। কিন্তু অসহায় কৃষক-শ্রমিক-সর্বহারার ভাগ্য পরিবর্তনের অঙ্গীকার ভুলে গিয়ে নেতারা যখন নিজেদের ভাগ্য গড়ার ফন্দি-ফিকিরে নিমজ্জিত, তখন তাঁর বিপ্লবী সত্তা যেন নতুন প্রেরণায় জেগে উঠলো। তাঁর প্রিয় কবি ইকবালের কণ্ঠে কণ্ঠ মিলিয়ে তিনি গেয়ে উঠলেন ঃ

ওঠো,— দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও,
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।।

অঙ্গীকার ভঙ্গকারী আদর্শত্যাগী নেতৃবৃন্দের এবং শাসক সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁর ক্ষোভ যে শুধু শ্লেষ-বিদ্রূপের অগ্নিবাণ হয়েই ঝরে পড়েছে, তাই নয়, তাঁর আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা ছিল, অন্তত এমন এক আদর্শবাদী দল গড়ে উঠুক, যারা প্রতারিত ভুখা-নাঙ্গা-সর্বহারার কাফেলাকে সঠিক নেতৃত্ব দিয়ে তাঁর স্বপ্নের হেরার রাজতোরণের পথে এগিয়ে নিয়ে যাবে। এ লক্ষ্য সামনে নিয়ে তাঁর ছোটাছুটিরও অন্ত ছিল না।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বলতেন, মাছের পচন শুরু হয় মাথা থেকে। পাকিস্তানের সুবাদে গড়ে ওঠা নতুন বর্ধিষ্ণু সমাজের স্খলন-পতনটাও শুরু হয়েছে এদেশের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সমাজের মধ্য থেকেই। তাঁর ভাষায় ঃ বিবেক ভাড়ায় খাটানো বুদ্ধিজীবীদের অনেকেই নিছক পদাধিকার বলে ইন্টেলেকচুয়াল মনীষী। এঁরা সমাজের মাথা বলে পরিচিত। কিন্তু এই লোভী, হৃদয়হীন শ্রেণীটি স্বৈরাচারের তল্পী বহন করেও এক আশ্চর্য চাতুর্যের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রগতিবাদী বিপ্লবী নামে খ্যাত হচ্ছেন। আইয়ুবশাহীর আমলে এরাই রাইটার্স গীল্ড, বাংলা একাডেমী এবং ইত্যাকার নানা প্রতিষ্ঠানের কাঁধে সোয়ার হয়ে বিবেক ভাড়া খাটানোর নানা কসরত দেখিয়েছেন। অনেকে আইয়ুবী উন্নয়নের দশ বছরের প্রচার-প্রপাগাণ্ডায় পারঙ্গমতা প্রদর্শন করেছেন। দেশের দু'অংশে সায়র-সফর করেছেন। সরকারী প্রপাগাণ্ডার তল্পী বয়ে নিয়ে বিদেশ ভ্রমণ করছেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এ ধরনের করিৎকর্মা বুদ্ধিজীবীদের প্রতি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উষ্মা ছিল সীমাহীন। খোলাখুলিভাবে সকলের সামনে এঁদের তিনি সমালোচনা

www.pathagar.com

করতেন। ফলে তথাকথিত আঁতেলেকচুয়াল সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন প্রচণ্ডভাবে সমালোচিত ব্যক্তিত্ব। এ সব লোকই সরকারী-বেসরকারী নানা প্রচার মাধ্যমের আশ্রয় নিয়ে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল, সাম্প্রদায়িক বলে প্রতিপন্ন করতে আদা-পানি খেয়ে ময়দানে নামে। চারদিকের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে ফর্‌রুখ ভাই ছিলেন প্রায় নিঃসঙ্গ। তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করার মতো কোন উল্লেখযোগ্য পত্র-পত্রিকাও তখন আর ছিল না। গীল্ড,ট্রাস্ট, একাডেমী প্রভৃতি থেকে প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাগুলো তখন ছিল সুবিধাবাদী বুদ্ধিজীবীদের পারস্পরিক পৃষ্ঠ কুণ্ডয়নের আখড়া। এ সব পত্রিকা এবং প্রচারমাধ্যম থেকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এবং তাঁর সমচিন্তার লোকগণ ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বাসিত; তাই এ দেশের তরুণ সমাজ জানবার সুযোগই পেল না, তেতাল্লিশের মন্বন্তরে লেখা 'সন্ধ্যা জনতা' ও 'লাশ' কবিতার কবি, ভাষা আন্দোলনের মূল উদগাতা, তমদ্দুন মজলিসের অন্যতম প্রেরণার উৎস কবি, আদর্শচ্যুত পাতি নেতা এবং স্বৈরাচারী শাসক শ্রেণীকে লক্ষ্য করে অসংখ্য শ্লেষাত্মক কবিতার রচয়িতা কবি ফর্‌রুখ কি করে সাম্প্রদায়িক এবং প্রতিক্রিয়াশীল শিবিরের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলেন।

১৯৬১ সনের মার্চ মাসে প্রকাশিত হয় ক্ষুদ্রয়াতন মাসিক "মদীনা"। অত্যন্ত সীমিত সামর্থ্য নিয়ে এ পত্রিকাটি আমি প্রকাশ করার দুঃসাহস অর্জন করেছিলাম ফর্‌রুখ আহ্‌মদেরই প্রেরণা ও উৎসাহে। "মদীনা"য় নামে-বেনামে তিনি যে কত কবিতা লিখেছেন, তা শুমার করা মুশকিল। কখনো তিনি লিখেছেন আবদুল্লাহ্ মাহবুব ছদ্ম নামে, কখনো আবদুল জলীল, কখনো বা শুধু আবদুল্লাহ নামে। কলমের ডগায় যে নাম আসতো, সে নামেই তিনি এক-এক সময় এক-একটা কবিতা লিখে আমার হাতে গুঁজে দিতেন। অনেক সময় বেশ কিছু লেখা জমে যেতো। স্থানাভাবে প্রকাশ করা সম্ভব হতো না। কিন্তু এজন্য আমাকে কখনো কৈফিয়তের সম্মুখীন হতে হয়নি।

একদিন তিনি মাসিক "মদীনা" কার্যালয়ে বসে কথাবার্তা বলছেন। রমযানের দিন। সামনে ঈদ। ঈদ সংখ্যার জন্য একটা কবিতা দরকার। আমার এ প্রয়োজনের কথা প্রকাশ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি লিখতে শুরু করলেন। কয়েক মিনিটের মধ্যেই লিখে দিলেন একটা দীর্ঘ কবিতা।

"চাঁদ রাতে কাল সুদূর দিগন্তরে
উঠেছিল বাঁকা, খঞ্জরে আঁকা
রূপালী স্বপ্ন মোর।

হাদীসের বর্ণনা অনুসারে কোন মানুষের প্রকৃত চরিত্র বিচার করতে হলে, তার সাথে একত্রে বাস করতে হবে। এক সাথে চলাফেলা করতে হবে এবং পরস্পর লেনদেন করতে হবে। ঘটনাক্রমে ঐ তিনটি পরিবেশেই আমি ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে দেখেছি। প্রথম পরিচয়ের পর থেকে প্রায় এক যুগ তাঁর নিকট-সান্নিধ্যে দীর্ঘ ওঠাবসা, চলাফেরা

www.pathagar.com

করার সুযোগ পেয়েছি। ষাটের দশকের মাঝামাঝি সময়ে পাশাপাশি ভাড়াটে বাসায় প্রায় এক বছর বাস করেছি। তাই, মুরুব্বীরূপে, প্রতিবেশী রূপে এবং সমচিন্তা ও সমব্যথীরূপে তাঁকে যাচাই করার সুযোগ আমার ঘটেছে।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন সত্যিকার মর্দে মুমিন। ঈমানের মাপকাঠি দিয়ে তিনি সবাইকে যাচাই করতেন। চরম শত্রুর সাথেও তাঁকে হাসিমুখে কথা বলতে দেখেছি। প্রাণ খুলে আপ্যায়ন করতে দেখেছি। কিন্তু নিজের পরম ভক্তজনের কর্মবিমুখতা বা আদর্শচ্যুতি তিনি বরদাশত করতে পারতেন না। মুখের উপরই তাদের তিরস্কার করতেন। এ তিরস্কারের ভাগ আমিও পেয়েছি। অনেক সময় উপভোগ করেছি। অনেক সময় অভিমান করে দূরে সরে গিয়েছি। কিন্তু পরক্ষণেই পরম মমতায় তিনি কাছে ডেকে নিয়েছেন।

অনেকগুলো ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁর সংসার ছিল বেশ বড়। আয় ছিল নিতান্তই সীমিত। সংসারে অভাব-অভিযোগ লেগেই থাকতো। কিন্তু কোন সময় তাঁর মুখে ব্যক্তিগত কোন সমস্যার কথা আমরা শুনি নি। তাঁর অপরিসীম সবর বাচ্চাগুলোর চরিত্রেও এমন গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছিল যে, ওদের চেহারা দেখেও কখনো কিছু আঁচ করার উপায় ছিল না। মুমিনসুলভ সবর-শুকুরের একটা শান্ত সৌম্য পরিবেশ যেন সব সময় বিরাজ করতো। এত কষ্টের সংসারেও কবি ছিলেন দরাজ-দিল। কেউ কোনদিন তাঁর সাথে দেখা করতে এসে খালি মুখে ফিরে গেছে, এমনটা দেখি নি। তাঁর এই মেহমানদারী শুধু বাসাতেই নয়, পথে-ঘাটে, রেডিওর রেস্তোরাঁয় সমভাবে ছিল প্রসারিত। বেতন যা পেতেন, তার একটা উল্লেখযোগ্য অংশ তিনি দিয়ে আসতেন রেডিওর রেস্তোরাঁয়। তাঁর উপরস্থ কর্মকর্তাদের প্রায় সবাই ছিলেন গুণগ্রাহী। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল। কিন্তু কোন সময় তিনি বেতন বৃদ্ধি বা পদোন্নতির জন্য মুখ খুলেছেন, এমনটি শোনা যায় নি। এককালের রেডিও পাকিস্তানের ডাকসাঁইটে মহাপরিচারক ছিলেন বোখারী নামক এক জাঁদরেল আমলা। তিনি ঢাকার আঞ্চলিক অফিস পরিদর্শন করতে এসেছেন। রেডিওর সকল আমলা-কর্মচারীরা দেখা-সাক্ষাৎ এবং তয়-তদবিরে ব্যস্ত। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নির্বিকার। তিনি মহাপরিচালকের সাথে দেখা করতেও গেলেন না। সরকারী আমলা বোখারী ক্ষুব্ধ হলেন। তাঁর এ ক্ষোভ কারো কারো সামনে প্রকাশও করলেন। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পূর্ণ নির্বিকার। চাকুরীটাকে তিনি এক রত্তিও দাম দিতেন না। তিনি মনে করতেন, শ্রম দিচ্ছেন দেশসেবার জন্য। বিনিময়ে সরকার যা দেয়, সেটা অনুগ্রহের দান নয়। তাঁর পাওনার সামান্য একটা অংশ মাত্র।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সময়কার অনেক লেখকই লেখার পারিশ্রমিক কড়ায় গণ্ডায় আদায় করে ঢাকায় বাড়ীঘর করেছেন। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর এ হালাল পাওনার

www.pathagar.com

ব্যাপারেও ছিলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার। তিনি যেন লিখেই সুখ পেতেন। লেখা প্রকাশ পাওয়াতেই যেন ছিল তাঁর পরম তৃপ্তির ব্যাপার।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের একটা দুর্বার কৌতূহল ছিল আরবী, ফারসী ও উর্দু ভাষায় লিখিত ইসলামী বই-পুস্তকের প্রতি।

আরবী কুরআন-হাদীসের ভাষা। হাজার বছরেরও বেশী সময় ধরে এ ভাষার ভাণ্ডারে ইসলামের সকল দিকের জ্ঞান-মনীষা তিলে তিলে সঞ্চিত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে ফারসী এবং তারও পরে উর্দু ভাষায় সাধক পণ্ডিতগণ তা পরম যত্নে আহরণ করেছেন। পরম নিষ্ঠার সাথে নিজেদের ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষা-ভাষীদের জন্য সে জ্ঞান ও মনীষার উত্তরাধিকার একটা অবরুদ্ধ রত্নভাণ্ডারে পরিণত হয়ে রয়েছে। ভাষার এ দুর্ভেদ্য দেয়াল ভেঙে যাঁরাই কিছু কিছু কাজ করতে অগ্রসর হতেন, তাঁদের প্রতি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের পক্ষপাতিত্ব ছিল সীমাতিরিক্ত। তাঁর সমকালীন লেখক আলেমদের মধ্যে মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী, মওলানা মুস্তাফিজুর রহমান, মওলানা আবদুল্লাহিল কাফী আল-কোরাইশী এবং হাকীম আবদুল মান্নানের প্রতি তাঁর অকুণ্ঠ শ্রদ্ধার বহিঃপ্রকাশ অনেকবারই তাঁর বৈঠকী আলাপ-আলোচনার মধ্যে লক্ষ্য করেছি।

নতুন লেখকদের মধ্যে হাকীম হাফেজ আজীজুল ইসলাম, মওলানা মাহমুদুর রহমান হারুন, মওলানা মুজীবুর রহমান, অধ্যাপক আখতার ফারূক এবং মওলানা সৈয়দ জহীরুল হক প্রমুখ তরুণ আলেমের প্রতি তাঁর স্নেহ-প্রীতি ছিল অবারিত। প্রায়ই তিনি এঁদেরকে ডেকে নানা বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। নিজে উপযাচক হয়ে এঁদের কর্মস্থলে পর্যন্ত চলে যেতে কুণ্ঠিত হতেন না।

আমার প্রথম অনূদিত বই আল্লামা শিবলী নোমানীর "আল-ফারূক" প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে। বাঁধাইখানা থেকে প্রথম বইটি নিয়ে যখন তাঁর হাতে তুলে দেই, সেদিনের বিশেষ সে মুহূর্তটির স্মৃতি চিরদিন আমার জন্য প্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সুদৃশ্য মলাট-শোভিত এই বৃহদাকার বইটি হাতে নিয়ে তিনি আনন্দে এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন যে, আবেগে কিছুক্ষণের জন্য তাঁর বাকরুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে তিনি ভরা গলায় বলেছিলেন, "আল্লাহ্‌র শুকুর, আমার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষিত এ বই পড়বার সুযোগ হয়েছে।"

তাঁর আকাঙ্ক্ষা ছিল, এদেশের যমিনে ফারূকী খিলাফতের প্রতিষ্ঠা। তাঁর ভক্ত-অনুরক্তদের সংগঠন তমদ্দুন মজলিসের রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল ফারূকী খিলাফতের স্বপ্নকেন্দ্রিক। সে কারণেই আল্লামা শিবলী নোমানীর লেখা গবেষণা গ্রন্থ "আল-ফারূক" বইটির প্রতি এঁদের কৌতূহল ছিল। আমি এদের মুখেই বইয়ের আলোচনা শুনে বইটি তরজমা করতে শুরু করি। তবে আমার এ প্রচেষ্টার কথা তেমন কেউ জানতো না। তরজমা শেষ করার পর পাণ্ডুলিপিটি তুলে দিয়েছিলাম মওলানা নূর মোহাম্মদ আজমী

www.pathagar.com

সাহেবের হাতে। তিনিই পরম মমতার সাথে পাণ্ডুলিপির ভুল-ক্রটি সংশোধন করে এটি প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেছিলেন। এরপর থেকে মাঝে মাঝে একটি-দু'টি করে ইসলামী বই পুস্তকের অনুবাদ বের হতে শুরু করে। যাঁরা এসব বইয়ের অনুবাদ করতেন, তাঁদের সবাই ছিলেন কবি ফর্‌রুখের স্নেহধন্য। ফলে নতুন কোন বই বের হলেই তা সর্বপ্রথম আসতো আবুল মিয়ার রেস্টুরেন্টে। আর সেদিন উপস্থিত সবার ভাগ্যে জুটতো আবুল মিয়ার পেটেন্ট সিঙাড়ার সাথে দু'টি করে রসগোল্লা। বলতে গেলে সমকালীন আধুনিক ইসলামী বই-পুস্তকের অনুবাদকর্মের সেটাই ছিল সূচনাকাল। আর এ সূচনার সর্বাপেক্ষা উৎসাহী মুরুব্বী ছিলেন ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। কবির সে আন্তরিক যত্ন-সাধনাতেই আজ বহু জটিল ইসলামী গ্রন্থ বাংলা অনুবাদ হয়ে তাঁর একটি স্বপ্নসাধ রূপদান করছে বললে মোটেও বেশী বলা হবে না।

কবি আজ আর আমাদের মধ্যে নেই। অনেক বেদনা বুকে নিয়ে পরপারে চলে গেছেন। জানি না, তাঁর আহবানে যে কাফেলা যাত্রা শুরু করেছিল, এখনো যারা তাঁর বাণী থেকে প্রেরণা নিয়ে মিল্লাতে কাফেলা এগিয়ে নেয়ার সাধনায় নিয়োজিত, তাঁদের কর্মপ্রচেষ্টা পরপার থেকে তিনি দেখতে পাচ্ছেন কি-না। তিনি দেখতে না পেলেও এ পারের তাঁর কর্মীবাহিনীর কানে আজো তাঁর সেই পৌরুষদীপ্ত আহবান প্রতি মুহূর্তেই যে বাজে, তা হলফ করে বলতে পারি। আমাদের সেই কাফেলাসালার—দুর্যোগের রাতে সীমাহীন লোনা দরিয়া পাড়ি দেয়ার আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেলিত দুঃসাহসী সিন্দাবাদের হায়দরী হাঁক এখনো আমরা শুনতে পাই। আমাদের ফর্‌রুখ ভাই এখনো আমাদের কাছে একজন জীবন্ত পথিকৃৎ।

www.pathagar.com

আবু হেনা মোস্তফা কামাল

মর্যাদাবোধের প্রতীক ফর্‌রুখ

তখন আমাদের কতোই-বা বয়স। হঠাৎ একদিন পাঠ্য বইয়ের পাতায় পেয়ে গেলাম এক আশ্চর্য স্বাদের কবিতা ঃ 'কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা/ নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।' কবির নাম ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। তাঁর কবিতা এর আগে আর কখনো পড়ি নি— কিন্তু ঢাকা বোর্ডের কাব্য সংকলনের অন্তর্গত খণ্ডিত 'সাত সাগরের মাঝি' ঘুরিয়ে ফিরিয়ে এতোবার পড়েছিলাম যে, সেই ক্ষতি বোধ হয় পুষিয়ে গিয়েছিলো। 'তবে তুমি জাগো কখন সকালে ঝরেছে হাস্নাহেনা / এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না? তবু তুমি জাগলে না?' এসব চরণের অর্থ কিছুই বুঝতাম না। কে এই তুমি? তবু এক অদ্ভুত ভালো-লাগার বোধে আচ্ছন্ন হয়ে যেতো মন।

মফঃস্বল শহরে এসব নিয়ে আলাপ করার মতো কোনো বন্ধু ছিলো না। অতএব নিজের ভেতরেই এই মুগ্ধতা ও বিস্ময় দিনের পর দিন বেড়ে উঠেছিলো মৌচাকের মতো। '৫১ সালের মাঝামাঝি কোনো এক সময় হবে সেটা। বিনা নোটিশেই নামলো বৃষ্টি। হুড়মুড় করে এক ঘিঞ্জি রেস্তোরাঁয় উঠে পড়েছিলাম। বাইরে যেমন বর্ষণ, তেমনি উদ্দাম, এলোমেলো হাওয়া। ভেতরে সস্তা সিগারেটের ধোঁয়া আর পেয়ালা-পিরিচের ঝনৎকারের সাথে খদ্দেরদের হাঁকাহাঁকি মিশে দম বন্ধ হয়ে যাবার অবস্থা। হঠাৎ সব কিছু ঝাপিয়ে কারো দরাজ গলায় রেডিওতে ভেসে এলো আমার প্রিয় কবিতার চরণ ঃ

তুমি কি ভুলেছো লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমীনের শুভ্র ললাট চুমি,
পরীর দেশের স্বপ্ন সহেলী জাগে-বকাওলী!'

খারাপ আবহাওয়ার জন্যে মাঝে মাঝেই আবৃত্তিকারের গলা হারিয়ে যাচ্ছিলো, আবার পরমুহূর্তে ভেসে উঠেছিলো, যেন মধ্য সমুদ্রে বিপন্ন জাহাজ। কিন্তু যতোক্ষণ ধরে আবৃত্তি হতে থাকলো, আমি অন্তত ততোক্ষণের জন্যে ভুলে গেলাম পরিপার্শ্বের সেই মলিন রুগ্ন ক্লিন্নতা। এবং আমার ভাগ্যে আরো একটি উপরি পাওনা সেদিন সঞ্চিত ছিলো, আবৃত্তি শেষ হলে ঘোষক বললেন, "এতক্ষণ স্বরচিত কবিতা পড়ে শোনালেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ।"

www.pathagar.com

১৯৫২ সালের শেষ দিকে যখন ঢাকায় এলাম কলেজে পড়তে, সেই প্রথম ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে দূর থেকে দেখলাম। নাজিমউদ্দীন রোডের যে দোতলা বাড়ীটায় এখন দেখি বোরহানউদ্দীন কলেজ, তখন সেটা ছিল রেডিও স্টেশন। বেতার ভবনের ঠিক উল্টো দিকে ছিল আজিজিয়া রেস্তোরাঁ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ রেডিওতে চাকুরী করতেন, এ খবর আগেই পেয়েছিলাম। অতএব তাঁকে দেখার লোভেই আজিজিয়া রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে থাকতাম। তখন তাঁর বয়স তেত্রিশ। দীর্ঘ দেহ মেদহীন, কিন্তু স্বাস্থ্যের আভায় উজ্জ্বল ছিলো মুখ। শুক্রবার দিন ছাড়া অন্যান্য দিন আসতেন বিকেলে। এসেই রেস্টুরেন্টের ভেতরে একটা ঘুপচি মতো জায়গায় কাগজ কলম নিয়ে বসতেন। সেখানেই জমে উঠতো দর্শনার্থীদের ভিড়। বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ শিক্ষক ও শিক্ষার্থী, লব্ধপ্রতিষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিক-সাংবাদিক-রাজনীতিক সবাই এসে ঘন্টার পর ঘন্টা কথা বলতেন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে। অনর্গল চলতো গল্প হাসি—চা আর পান। মাঝে মাঝেই শোনা যেতো কবির উদার নির্দেশ, "আবুল মিয়া, আরো দুটো লবঙ্গলতিকা আর দু'পেয়ালি চা।"

ফর্‌রুখ ভাই কখনো পেয়ালা বলতেন না। যতো মেহমান আসতেন, সবাইকে লবঙ্গলতিকা আর চা খেতেই হতো। শুনেছি, ফর্‌রুখ ভাই তাঁর বেতনের একটা মোটা অংশই প্রতি মাসের প্রথমেই আজিজিয়া রেস্টুরেন্টে রেখে যেতেন।

যখন আমার দু'চারটি অকিঞ্চিৎকর লেখা এদিক-সেদিক ছাপা হয়ে গেছে, তখন ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সাথে আনুষ্ঠানিকভাবে আমার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন কবি তালিম হোসেন। সেটা ১৯৫৪ সাল। আই. এ. পাস করে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হবার চেষ্টা করছি। স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে ফর্‌রুখ ভাই প্রথমেই প্রশ্ন করেছিলেন, 'বাচ্চা, কি খাবি বল?" এবং বলাই বাহুল্য, আমাকে লবঙ্গলতিকা ও চা না খাইয়ে তিনি উঠতে দেন নি। অতঃপর ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত একটানা ফর্‌রুখ ভাইকে খুব কাছে থেকে দেখেছি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনা শেষ হলে বেশ কিছুদিন আমাকে ঢাকার বাইরে মফঃস্বলে থাকতে হলো। আবার ১৯৬২ থেকে ১৯৬৫ পর্যন্ত প্রায় আড়াই বছরের মতো ছিলাম ঢাকায়। তখন আমাদের নতুন কর্মজীবন শুরু হয়েছে। আগের মতো অখণ্ড অবসর ছিলো না। তবু সুযোগ পেলেই চলে যেতাম রেডিও স্টেশনে। অবশ্য ততোদিনে বেতার ভবনটি উঠে এসেছিলো শাহবাগ এ্যাভিন্যুতে।

সে যাই হোক, আন্তরিকতায়, অভ্যর্থনায়, আতিথেয়তায় ফররুখ ভাই সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত। আমাদের দেখলেই এমন হৈ হৈ করে উঠতেন, মনে হতো যেন কতো যুগ পরে পরমাত্মীয়ের সাক্ষাৎ পেলেন। তৎকালীন পূর্ব বাংলার অবিসংবাদিত প্রধান কবি ছিলেন তিনি। কিন্তু তাঁর আচরণে কোনোদিন কোনো প্রিটেনশান বা অহমিকা দেখি নি।

www.pathagar.com

অসম্ভব অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন ; আর ভয়ানক খোলামেলা ভাষায় কথা বলতেন। বৈষয়িক উন্নতির জন্যে তাঁর কোনো আকাঙ্ক্ষা ছিলো না। থাকলে, অসময়ে অকালে তাঁর মৃত্যু হতো না। তিনি যে পাকিস্তানের স্বপ্নে উদ্বেল হয়ে "সাত সাগরের মাঝি" লিখেছিলেন, সেই স্বপ্নের দেশ চিরদিন তাঁর অন্বিষ্টই থেকে গেছে। পাকিস্তানের সংহতির নামে অনেকেই মোটামুটি বিত্ত-সম্পদ অর্জন করেছেন। কোনো সুবিধা কেউ প্রত্যাখ্যান করেছেন বলে শোনা যায় নি।

ফররুখ আহমদকে ইউনেস্কোর একটি বৃত্তি অর্পণ করা হয়েছিলো পঞ্চাশ দশকের শেষ দিকে। লেখক হিসেবে দু'মাসের জন্যে মার্কিন মুলুক ভ্রমণের সেই আমন্ত্রণ তিনি নির্বিকারভাবে নাকচ করে দিয়েছিলেন।

মধ্যবিত্তের ক্ষুদ্র বাসনা, ক্ষোভ, ঈর্ষা ইত্যাদির অনেক ওপরে ছিলেন বলেই সম্ভবত মধ্যবিত্তের সম্ভ্রম তিনি আকর্ষণ করেছিলেন সহজে। তাঁর কিছু-কিছু আচরণের ভেতরে এ কালের পর্যবেক্ষক হয়তো অবাস্তব মনোভঙ্গি আবিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু দু'দশক আগের নিগৃহীত পূর্ব বাংলার পটভূমিতে ফররুখ আহমদ ছিলেন আমাদের মর্যাদাবোধের প্রতীক। পাকিস্তান লেখক সংঘের মহাসচিব কুদরতুল্লাহ্ শাহাব ঢাকায় এলে প্রায় সবাই তাঁর সাক্ষাৎপ্রার্থী হয়েছিলেন, কিন্তু ফররুখ ভাইয়ের বেলায় ঘটেছিলো ব্যতিক্রম। শাহাব নিজেই কবির বাসভবনে গিয়েছিলেন। পাকিস্তান সিভিল সার্ভিসের একজন সিনিয়র সদস্য তৎকালীন কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্যসচিব কুদরতুল্লাহ শাহাবকে ফররুখ ভাই তাঁর বৈঠকখানার হাতলভাঙা চেয়ারে বসতে দিয়েছিলেন অনায়াসে। এ গল্প তখন ঢাকায় মুখে মুখে। শুধু ফররুখ ভাই নিজে এ বিষয়ে একটি কথাও বলেন নি।

স্পষ্টভাষণের জন্যে তাঁর খ্যাতি ছিলো। ১৯৫৬ সালে এক নবীন কবি তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থের পশ্চাত প্রবন্ধ মুদ্রণের জন্যে ফররুখ ভাইকে আমার মাধ্যমে একটি শুভেচ্ছাবাণী দেবার অনুরোধ জানান। তখন ঢাকা শহরের অনেক এলাকা বন্যার পানিতে প্লাবিত। ফররুখ ভাই সম্ভবত কমলাপুর বা শাহজাহানপুরে থাকতেন। সেখানেও বন্যার পানি। অতএব দিনের পর দিন তিনি অফিসে আসতে পারছেন না, আমিও তাঁকে অনুরোধটি পৌঁছে দিতে পারছি না। কিন্তু সেই নবীন কবি ততোদিনে এতো অধৈর্য হয়ে পড়েছেন যে, তিনি আর অপেক্ষা না করে নিজেই নিজের কবিতা সম্পর্কে দু'চার কথা লিখে বইয়ের মলাটে ফররুখ আহমদের নামে ছাপিয়ে দিলেন। অচিরেই এই খবর ফররুখ ভাইয়ের কানে গেলো। নবীন কবিও শোনলেন যে, ফররুখ ভাই সব জেনেছেন। অগত্যা বন্যার পানি নেমে গেলে, পাপ ক্ষালনের জন্যে তিনি শুক্রবার সকালে আমাকে সাথে নিয়ে উপস্থিত হলেন আজিজিয়া রেস্টুরেন্টে। ফররুখ ভাই তখন সবে চায়ের পেয়ালা আর কাগজ-কলম নিয়ে বসেছেন। প্রতি শুক্রবার তিনি স্কুলের ছেলেমেয়েদের অনুষ্ঠান কিশোর মেলা পরিচালনা করতেন। তারই স্ক্রিপট লেখার

www.pathagar.com

উদ্যোগ করছিলেন তিনি। আমাদের দেখে বসতে বললেন। এবং বললেন, "বাচ্চা, চা খাবি?" আমি ভাবলাম, মেঘ কেটে গেছে। কিন্তু পরমুহূর্তেই তিনি তাঁর বিশাল দুই চোখের পূর্ণ দৃষ্টি রাখলেন নবীন কবির ওপরে। বললেন, "এতোদিন জানতাম মেদ শুধু তোর গর্দানে, এখন দেখছি তোর মগজেও মেদ জমেছে।" প্রসঙ্গত উল্লেখ করি, আলোচ্য কবি বেশ মোটাসোটা মানুষ ছিলেন।

কর্মস্থলের অনেক কিছুই ফররুখ ভাই বরদাশত করতে পারতেন না এবং তার খোলাখুলি সমালোচনা করতেন। রেডিওর জনৈক আঞ্চলিক পরিচালক একবার তাঁকে ডেকে বললেন, "আপনার জন্যে এই ছোট চাকুরী মানায় না। আপনি রাজী থাকলে অন্যত্র একটি বড়ো পদের ব্যবস্থা করতে পারি। যাবেন?" ফররুখ ভাই হা-হা করে হেসে জবাব দিয়েছিলেন, "প্রফেট কি আর এ্যাঞ্জেলদের ভেতরে আসেন, তিনি স্যাটানদের ভেতরেই আসেন। অন্য চাকুরীতে আমার দরকার নেই।"

অত্যন্ত বাকপটু বলে পরিচিত সেই আঞ্চলিক পরিচালকও নির্বাক হয়ে গিয়েছিলেন এই উত্তর পেয়ে।

যদ্দুর মনে পড়ে, ফররুখ ভাইকে কোনোদিন তাঁর পারিবারিক প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে শুনি নি। ছেলেমেয়ে ক'জন, কে কোথায় পড়াশোনা করছে, এসব বিষয়ে আমরা কিছুই জানতাম না। তাঁর সার্বক্ষণিক আলোচনার বিষয় ছিলো সাহিত্য। একদা আপাদমস্তক রোমান্টিক ফররুখ আহমদ পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি এসে ক্রমশ ক্লাসিকতার ভীষণ অনুরাগী হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর প্রিয় কবি মিল্টন, মধুসূদন, এলিয়ট। এপিক আয়তনের কাব্য লিখবেন বলে হাতেম তা'য়ীকে বেছে নিলেন নায়ক হিসেবে। কাব্য-স্বভাবের এই পরিবর্তন তাঁর জন্যে কল্যাণকর হয়েছিলো কিনা, সে সিদ্ধান্ত নেবার ভার সমালোচকের। তবে এটা লক্ষ্য করেছিলাম, চল্লিশ দশকে তাঁর কবিতায় যে মাদকতা ছিলো, 'ডাহুক' সৃষ্টির যে আশ্চর্য ক্ষমতা—তা যেন ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে অনেক বড়ো—কিন্তু গদ্যময় কাব্য সংগঠনে।

আঁটো-সাটো সনেট অথবা দীর্ঘ গীতি-কবিতায় কবির আসক্তি তখন আর নেই বললেই চলে। এলিয়টের কাব্যনাটকের দিকে সে সময় তিনি গভীরভাবে ঝুঁকে পড়েছেন। "নৌফেল ও হাতেম" তারই উজ্জ্বল উদাহরণ।

যাই হোক, সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধ্যান-ধারণাসমূহ সঠিক ছিলো কিনা, তা নিয়ে মুখোমুখি কথা বলার মতো সাহস আমাদের ছিলো না। বস্তুত আজিজিয়া রেস্তোরাঁর ঐসব আসরে আমরা ছিলাম কেবলই শ্রোতা। ফররুখ ভাই প্রায়শ একাই কথা বলতেন। মাঝে মাঝে আবৃত্তি করতেন মাইকেল মধুসূদনের কবিতা থেকে। অসাধারণ স্মরণশক্তি ছিলো তাঁর। "মেঘনাদ বধ কাব্য"-এর সম্পূর্ণটাই বোধ করি তিনি মুখস্থ বলতে পারতেন। আমরা অবাক হয়ে তাঁর মন্দ্রিত কণ্ঠের আবৃত্তি শুনতাম আর

www.pathagar.com

ভাবতাম, 'তুমি কেমন করে গান করো, হে গুণী'।

এবং মানুষ-যে কেবল স্বাধিকার বলেই বিশিষ্ট হয়ে ওঠে না, ফররুখ ভাই ছিলেন তার নিঃসঙ্গ দৃষ্টান্ত। তেমন কিছু বড়ো চাকুরী তিনি করতেন না। অথচ গোটা বেতার কেন্দ্রের সর্বস্তরে তিনি ছিলেন সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি। সবাই তাঁকে সমীহ করতো, ভালবাসতো আবার ভয়ও করতো। বলা যায়, আবুল মিয়ার চায়ের দোকানের সেই অন্ধকার খুপরিতে বসে তিনি যে নিরঙ্কুশ শ্রদ্ধা ও মর্যাদা উপভোগ করতেন, প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে সুসজ্জিত ও আরামদায়ক কক্ষে উপবিষ্ট কোনো আঞ্চলিক পরিচালক কখনো তা পান নি। অথচ কী সাদাসিধা জীবন ছিলো তাঁর। কখনো ইস্তিরি করা কাপড় তাঁকে পরতে দেখি নি। সারা বছর সাবানে-কাচা পরিষ্কার পাঞ্জাবী-পাজামা পরে কাটাতেন। শুধু শীতকালে গায়ে উঠতো কখনো কালো শেরোয়ানি, কখনো একটি গরম চাদর। তবে শুনেছি, বিশ-বাইশ বছর বয়সে, প্রথম যৌবনে, যখন তিনি ছিলেন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র, তখন বেশভূষায় সৌখিনতার চূড়ান্ত করে ছেড়েছিলেন। শান্তিপুরী ধুতি, ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী, সোনার বোতাম ইত্যাদি ইত্যাদি সবই নাকি ব্যবহার করতেন। কখনো কখনো এসব গল্প উঠলে ফররুখ ভাই আজিজিয়া রেস্তোরাঁর ছাদ কাঁপিয়ে হাসতেন। যেন ইঙ্গিতে বলতে চাইতেন, আহ, তখন যে কী ছেলেমানুষই ছিলাম।

এখনো তাঁর উতরোল হাসি কানে বাজে। ১৯৬৫ সাল থেকেই আমাকে ঢাকার বাইরে থাকতে হয়েছে। তবু কাজে-অকাজে যখনই ঢাকায় এসেছি, রেডিও স্টেশনে গিয়ে খুঁজেছি, ফররুখ ভাই আছেন কিনা। ইতোমধ্যে যে আমাদের বয়স বেড়েছে, ছেলেমেয়ের জনক হয়ে গেছি আমরা এবং অসংখ্য ছাত্র-ছাত্রীর শিক্ষক, ফররুখ ভাই এসব হিসেবের মধ্যে আনতেন না। যখনি দেখা হতো, সেই চিরাচরিত প্রশ্ন, "বাচ্চা, চা খাবি!" তাঁর চোখে আমাদের বয়স কোনদিন বাড়ে নি। এবং এই স্নেহ যে শুধু মৌখিক ছিল না, সে প্রমাণও পেয়েছি একাধিকবার।

এখানে একটি ঘটনার উল্লেখ করি। পঞ্চাশ দশকে পাবনা থেকে বেরুতো একটি সাপ্তাহিক পত্রিকা--"পাক-হিতৈষী'। তাতে পাতার পর পাতা ছাপা হতো নিলাম-ইস্তাহার। তবু আমাদের মতো কয়েকজন ছেলে-ছোকরার আবদারে সম্পাদক এ. কে. এম. আজিজুল হক মাঝে মধ্যে সাড়া দিতেন। একবার জিয়া হায়দার ও আমার পীড়াপীড়িতে "পাক-হিতৈষী"র একটি সাহিত্য সংখ্যা বার করতে সম্পাদক রাজী হলেন। সেটা সম্ভবত ১৯৫৫ সাল। নিতান্ত ভাগ্যের ওপরে ভরসা করে ফররুখ ভাইকে চিঠি লিখেছিলাম 'আমাদের জন্যে একটি কবিতা পাঠাবেন' বলে। তখন ঢাকার নামজাদা পত্রিকার সম্পাদকরাও ফররুখ ভাইয়ের লেখা যোগাড় করতেন অনেক কাঠ-খড় পুড়িয়ে। অতএব আমার চিঠির পরিণাম কী হবে, তা আমি আগেই ভেবে নিয়েছিলাম। কিন্তু সত্যি সত্যি যখন একটি নতুন লেখা সনেট সমেত তাঁর উত্তর

www.pathagar.com

পেলাম, আনন্দে আমি প্রায় কেঁদে ফেলেছিলাম। "পাক-হিতৈষী"র জন্যে ফররুখ ভাই কবিতা পাঠাবেন একথা আমরা স্বপ্নেও ভাবি নি।

১৯৬৫ সালের পর থেকে ঢাকার সাথে আমার দীর্ঘ বিচ্ছেদ ঘটে যায়। মফঃস্বল শহর থেকে কাজে-কর্মে কখনো-কখনো ঢাকায় এসেছি বটে, কিন্তু সে রকম সময় করে যেতে পারতাম না রেডিও স্টেশনে। যদ্দুর মনে পড়ে, ১৯৭০ সালের পরে ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে আর দেখা হয়নি। আর দেখা হবেও না কোনদিন। সেই অসাধারণ প্রাণবন্ত, স্নেহময় মানুষটি চিরতরে বিদায় নিয়েছেন—একথা ভাবতে অবাক লাগে। শাহবাগের বেতার-ভবনে উঠে এসেছিলো আবুল মিয়ার রেস্তোরাঁ। ১৯৭৪-এর পরেও সেখানে বসেছে শিল্পী-কথক-লেখকদের জমজমাট আসর। পুরনো স্মৃতির লোভে মাঝে-মধ্যে চা খেতে গেছি সেখানে। পঞ্চাশ দশকের নবীন যুবা আবুল মিয়াকে দেখেছি অকাল বার্ধক্যে ধূসর, ম্রিয়মাণ, নিষ্প্রভ। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থেকেছি গভীর প্রতীক্ষায়—যেন এই তিনি বলে উঠবেন, "একটু বসুন, কবি সাহেব আসবেন।" তা, আমাদের জীবনে অলৌকিক কিছু কি ঘটতে পারে না? না, তেমন কিছু ঘটে নি। সেই দীর্ঘদেহী, সদাপ্রসন্ন ফররুখ ভাই আর কোনদিন এসে বলেন নি, "বাচ্চা, চা খাবি?"

www.pathagar.com

মীর নূরুল ইসলাম

অন্তরঙ্গ আলোকে

উনিশ শ' চুয়ান্ন কি পঞ্চান্ন সাল। নাজিমউদ্দীন রোডে রেডিও পাকিস্তানের অফিস। নীচের তলায় রেডিওর পাক্ষিক মুখপত্র "এলান"-এর অফিস। সম্পাদক মোহাম্মদ মোকসেদ আলী সাহেবের পাশের কামরায় বসে কবিতা আবৃত্তি করছিলাম ঃ

ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ,
হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া পরেছে শিলাদৃঢ় আবলুস,
পিপুল বনের ঝাঁজালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে ;
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

"সাত সাগরের মাঝি"র কবির সঙ্গে তখনো আমার পরিচয় হয় নি। নিজে একটু-আধটু কবিতা ও গল্প লেখার কসরত করি আর কাজের ফাঁকে অবসর সময়ে দু'জন কবির কবিতা আবৃত্তি করি। একজন ফররুখ আহমদ, অপরজন আহসান হাবীব। কিন্তু কবিতা আবৃত্তি যে কাল হয়ে দাঁড়াবে একথা কখনো ভাবি নি। উপরের কবিতাংশ যেদিন আবৃত্তি করছিলাম, সেদিন ঠিক সেই মুহূর্তে কবি সশরীরে উপস্থিত ছিলেন সম্পাদকের কামরায়। আমি জানতে পারি নি, আবৃত্তি শুনে তিনি ভয়ংকর রেগে গিয়েছিলেন। তিনি নিজে চমৎকার আবৃত্তি করতেন। কবিতার আবৃত্তি ভাল না হলে স্বভাবতই ক্ষুণ্ণ হতেন। আমার আবৃত্তি হয়তো তেমন ভাল হয় নি, তাই তিনি ভেবেছিলেন তাঁর উপস্থিতিতে তাঁরই কবিতা আবৃত্তি করে বুঝি ব্যঙ্গ করা হচ্ছে। পরে জানতে পেরেছিলাম, মোকসেদ আলী সাহেব তাঁকে বুঝিয়েছিলেন যে, এর মধ্যে নিছক কাব্যপ্রেম ছাড়া আর কিছু নেই। তখন তাঁর রাগ পানি হয়ে যায়। তিনি হেসে বলেন, "ও, ছোকরা তাহলে কাব্যচর্চা করে। তা ভালো কথা, কিন্তু মেড়োদের স্বভাব কেন, যখন-তখন কবিতা আবৃত্তি করে কেন?"

এই ঘটনার কিছুদিন পর একই কামরায় কবি বসে মোকসেদ আলী সাহেবের সঙ্গে কথা বলছিলেন। প্রসঙ্গ, আগের রাতে কমলাপুরে একটি নাটিকাভিনয়। সৌভাগ্যক্রমে সেটা আমার প্রথম নাটকের অভিনয়। মোকসেদ আলী সাহেব আমাকে ডেকে পাঠালেন। কবির সঙ্গে সেটাই হল আমার সম্মুখ সাক্ষাৎ। সালাম দিতেই তিনি সহাস্যমুখে বললেন, "গতরাতে তোর নাটকের অভিনয় শুনলাম। বেশ ভাল হয়েছে। সমাজের একটা চিত্র আছে ওতে।"

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদের মত একজন খ্যাতিমান কবির মুখে নিজের নাটকের প্রশংসা শুনে আমার মত নবীন লেখকের বুক সেদিন ক'ইঞ্চি ফুলে উঠেছিল, তার পরিমাপ এখন হয়ত দিতে পারব না; তবে এখন পর্যন্ত তাঁর সেই বাচনভঙ্গি আমার স্মৃতির মণিকোঠায় প্রোজ্জ্বল হয়ে আছে। সলজ্জ কুণ্ঠার সঙ্গে প্রশ্ন করলাম, "আপনি কি নাটক দেখতে গিয়েছিলেন?"

তিনি বললেন, "না, যাই নি। আমার বাসা তো কাছেই। তোদের মাইক বুঝি সেদিকেই ঘোরানো ছিল। শুয়ে শুয়ে পুরোটাই শুনেছি।"

এর দু'দিন পর কমলাপুরের ভাঙা পুলটার সামনে দেখা। হাত তুলে সালাম জানালাম। তিনি আসছিলেন অফিসের দিকে। আমি যাচ্ছিলাম কমলাপুরে আমার বাসায়। কবি দাঁড়ালেন। জিজ্ঞেস করলেন, "নতুন কিছু লিখছিস?"

—"দুই-একটা কবিতা লিখছি।" জবাব দিলাম।

—"আবার কবিতা কেন। নাটকেই তো তোর হাত ভালো। ভাল নাটক লিখতে পারলে বেশ নাম করতে পারবি। সমাজের দোষক্রটি তুলে ধরার জন্যে নাটকই ভাল মাধ্যম।" হঠাৎ প্রসঙ্গ পাল্টিয়ে তিনি বললেন, "তোদের অফিসে সেই বেয়াদব ছেলেটি কে হে, কথা নেই বার্তা নেই কবিতা আওড়ায়?"

বুঝলাম, সেদিনের রাগটা এখনো পুরোপুরি মুছে যায় নি মন থেকে। অবনত মস্তকে হাত কচলাতে কচলাতে বললাম, "ফররুখ ভাই, আমিই সেই ছেলে।"

—"মেড়োদের মত এমন বদ স্বভাব কেন?" হেসে কথাটা বললেন তিনি।

আমি কাচুমাচু হয়ে বললাম, "আমি জানতাম না, আপনি পাশের কামরায় আছেন। আপনার আর কবি আহসান হাবীবের কবিতা আমার খুব ভাল লাগে বলে মাঝে মাঝে আবৃত্তি করি।" হাত জোড় করে বললাম, "বেয়াদবি হয়ে থাকলে মাফ করে দেবেন।"

এরপর ক্রমে ক্রমে ফররুখ ভাইয়ের সুনজরে পড়লাম। প্রায়ই দেখা হত, হয় অফিসে নয় রাস্তায়। কবি কার কি বই পড়ছি জানতে চাইতেন এবং ছন্দ শেখার জন্যে কার কি বই পড়তে হবে তাও বলে দিতেন। আর বলতেন, "সাহিত্য-চর্চা করতে হলে জ্ঞান আর বিদ্যা দু'টোই লাগে। নিজেও লিখবি, দশজনের লেখাও পড়বি।" সেসময়ে রেডিও-তে চাকুরী করতেন তিনজন খ্যাতিমান কবি। কবি শাহাদাৎ হোসেন, কবি ফররুখ আহমদ ও কবি আবুল হোসেন। কিন্তু ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে যত নির্দ্বিধায় কথা বলতে পারতাম, তেমনটি অন্য কারো সঙ্গে হতো না। নাজিমউদ্দীন রোডে রেডিও অফিসের বিপরীতে ছিল আবুল মিয়ার চায়ের দোকান। সেখানে ফররুখ ভাইকে নিয়ে ভীড় জমতো তরুণ কবি-সাহিত্যিকদের। চা, সিঙাড়া, ডালপুরী, পেঁয়াজী সাবাড় হতো কাপে কাপে, পিরিচে পিরিচে। দাম মেটাতেন ফররুখ ভাই। অফিসের ছোট বড় সবাই ফররুখ ভাইকে ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সমীহ করে চলতেন। অভাব-অভিযোগের প্রতিকার না

www.pathagar.com

হলে কথাটা তুলতেন তাঁর কানে। সমস্যাটা যেন একান্ত তাঁর নিজের, সেইভাবে সেটা নিয়ে তিনি এগিয়ে যেতেন।

তখন রেডিও-র ডিরেকটর জেনারেল জেড. এ. বোখারী অফিসের আঙিনায় ঢুকলে সবাই থরথর কম্পমান হ'ত, কেউ সামনে পড়তে চাইতে না। একবার স্টাফ আর্টিস্টদের কি এক ব্যাপার নিয়ে অচলাবস্থা হওয়ার উপক্রম। দাবী-দাওয়া নিয়ে বোখারীর সামনে এগিয়ে গেলেন ফররুখ ভাই। লিখিত প্রতিশ্রুতি নিয়ে তবে ছাড়লেন। একবার বোখারী সাহেব ফররুখ ভাইকে সরকারী খরচে আরব দেশে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন। শুনেছি, তিনি সরাসরি মুখের উপর বলে দিয়েছিলেন এই বলে যে, মক্কা সফর করার তাঁর ইচ্ছা আছে। কিন্তু তা সরকারী খরচে নয়। আল্লাহ্ তওফিক দিলে নিজের পয়সায় যাবেন।

উনিশ শ' ঊনসত্তর সালের কথা। ঈদের আগে কারাকুলের একটু নতুন টুপি কিনেছি। নতুন স্যুট পরে সেই টুপি মাথায় দিয়ে গিয়েছি এক ইসলামী মাহফিলে—ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা। মুচকি হেসে বললেন, "মাশা-আল্লাহ! বেশ মানিয়েছে। কিন্তু শুধু লেবাসে মুসলমান হওয়া যায় না। মনে-প্রাণে ইসলামী জোশ থাকতে হবে।"

ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে যারা মিশেছেন, তাঁরা সবাই জানেন, তাঁর চরিত্র-মাধুর্যের কথা। আমার পক্ষে তাঁর বিন্দু-বিসর্গও ভাষায় ব্যক্ত করা কোনদিন সম্ভব হবে না। তবে তাঁর সান্নিধ্যে থেকে আমি শুধু এইটুকু বুঝেছি, পরের ব্যথায় সমব্যথী, পরের দুঃখে কাতর এমন মহাপ্রাণ অন্য কোন ব্যক্তির সাহচর্য এখনো আমি পাই নি।

www.pathagar.com

শাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রথম ও শেষ আলাপ

কাব্যরোগে পেলে সব কাব্যামোদীর জীবনে যা ঘটে, আমার জীবনে খুব ছোটবেলা থেকে তা ঘটেছিল।

কলকাতা থেকে মাইল চব্বিশেক পুবে বসিরহাট মহকুমার বাদুড়িয়ার পাশে আমাদের বাড়ী। এই ছোট্ট মফস্বল শহরের পাশে আমাদের ছোট্ট গ্রাম আরশুল্লাহ। গ্রামের মধ্যেই একটা প্রাইমারী স্কুল এবং একটা হাইস্কুল। তবু সংস্কৃতির উজ্জ্বল পরিবেশ আমাদের ঐ ছোট শহরে বা গ্রামে ছিল না। তবে শহরতলীর শহরের মত প্রদীপের নীচের অন্ধকার আমাদের গ্রাস করতে পারে নি। কলকাতার কল্লোলিত আধুনিকতার জোয়ার আমাদের উপর প্রকট প্রভাব না ফেললেও তার ক্ষীণতর প্রভাব আমাদের কিছু কিছু স্পর্শ করেছিল। হয়ত তারই খানিকটা আলো আমাদের বাড়ীতে ঢুকেছিল। সম্ভবত আমার নিজের স্বভাবদোষে আমি এই আলোর আলোত্বটুকু একটু বেশী করে পান করতে উৎসাহিত হয়েছিলাম এবং সে জন্যেই খুব ছোটবেলা থেকে কবিতা আমাকে নেশার মত পেয়ে বসেছিল।

প্রথমে কেবল পাঠ্যবইয়ের কবিতা পড়েই এই নেশা মিটত। কিন্তু অচিরেই আমার সঙ্গে পরিচয় হ'ল রবীন্দ্রনাথের এবং প্রায় সাথে সাথে সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুলের।

আমাদের ঐ ছোট্ট মফস্বল শহরে, মফস্বলের ঐ গ্রামে ও স্কুলে তখন রবীন্দ্রনাথ ও নজরুলকে ডিঙিয়ে কোন আধুনিক কবি সামান্যতম নাক গলাবার সুযোগ পান নি।

প্রতি বছর স্কুলের বাৎসরিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথই বেশী করে উচ্চারিত ও আলোচিত হওয়ার সুযোগ পেতেন ও তাঁরই পাশে পাশে কখনও নজরুলের ঠাঁই মিলত।

এ ১৯৪৫-৪৬-৪৭-৪৮-এর কথা বলছি। এই সময় আমাদের কিছু মুসলিম ছাত্রের কাছে নজরুল জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। আর নজরুরের কবিতায় ছিল সেই আবেগ-স্পন্দিত যুগোপযোগী ভাষা ও ভাব। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের সাথে নজরুলকেও আমরা একটা বড় আসনে বসাতে সচেষ্ট হলাম। বলা বাহুল্য, গ্রামোফোনের বদৌলতে কবিতার আগেই নজরুলের গান আমাদের শহরে ও গ্রামে পৌঁছে গিয়েছিল। আব্বাসউদ্দীন আর কে. মল্লিকের কণ্ঠের ইসলামী গান আমাদের মুসলিম অধ্যুষিত গ্রামগুলোকে মাতিয়ে রেখেছিল।

www.pathagar.com

এই দারুণ জোয়ারের মুকাবিলা করে আধুনিক কবিদের সাধারণ মানুষের মনে ঠাঁই করে নেওয়ার সহজ শক্তি ছিল না। বিশেষ করে সাধারণ সাংস্কৃতিক পরিবেশে সেই শিক্ষিত মেধাও ছিল না যা আধুনিক কবিদের আপ্যায়ন করে নিয়ে আসতে পারে। গ্রামের ছাত্র হিসেবে আমি তাই তখনকার দিনের বিখ্যাত হয়ে যাওয়া জীবনানন্দ, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদের বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য এবং ফররুখ আহমদকে পাই নি।

রবীন্দ্রনাথ-নজরুলকে আকণ্ঠ পান করার পর প্রথম যাঁকে পেলাম তিনি জীবনানন্দ দাশ। বুদ্ধদেব, সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে এঁদেরও পড়ার সুযোগ পেলাম; কিন্তু ঐ স্বভাবদোষে জীবনানন্দই আমাকে পেয়ে বসলো।

দুঃখের বিষয়, আমার সঙ্গে তখনও ফররুখ আহমদের পরিচয় হয় নি। কলকাতা শহরের সীমানা ডিঙিয়ে ফররুখ আহমদ কেন আমাদের ছোট্ট মফস্বল শহরে আসতে পারেন নি তা আমার জানা নেই।

১৯৫২ সালে আমি যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় পাস করে কিছু দিনের জন্যে সেন্ট্রাল ক্যালকাটা কলেজে (পূর্বের ইসলামিয়া কলেজ ও পরে আবুল কালাম আজাদ কলেজ) ভর্তি হই, তখনও সেখানে ফররুখ আহমদকে পাই নি। সম্ভবত এই জন্যে যে, ফররুখ আহমদ তখন কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় এসেছেন এবং কলকাতার সাংস্কৃতিক পরিবেশে মুসলিম ফররুখ, অন্তত তখন, তেমন মনোনীত কবি নন। ১৯৪৮ থেকে পশ্চিম বঙ্গের সিলেবাসে দশম শ্রেণী এবং আই. এ.-র সিলেবাসে অনেক মুসলিম কবির মত ফররুখ আহমদ পাঠ্য ছিলেন না।

ফররুখ আহমদের কবিতার সঙ্গে আমার পরিচয় হতে তাই অনেক দেরী হয়। ১৯৫২-এর অকটোবরে আমি পশ্চিম বঙ্গ ছেড়ে পূর্ব পাকিস্তানে আসি, ১৯৫৩-এ খুলনার দৌলতপুর কলেজে ভর্তি হই এবং ১৯৫৪-এ কোন এক মাসের কোন এক সময়ে কোন এক কাব্যবাতিকে পাওয়া ছাত্রবন্ধুর হাতে "সাত সাগরের মাঝি" দেখি। সে উন্মাদও আবার ফররুখে এমন মেতেছিল যে, দু'দণ্ডের জন্যে বই হাতছাড়া হতে দিত না। আমি শুধু কয়েক মুহূর্তের জন্যে তার কাছ থেকে বইটি নিয়ে পাতা ওল্টাবার সুযোগ পেয়েছিলাম। আর তখনই আমাকে দারুণভাবে যে কটি লাইন আলোড়িত করেছিল সেই সবার প্রিয় বিখ্যাত পঙক্তিগুলোর প্রথমটি হল—"কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা।"

আমি আমার এই জীবনে লক্ষ্য করেছি—সত্যিকার কবিতা একটি প্রস্ফুটিত লাল গোলাপের মত নিমেষেই মনকে মুগ্ধ করে। আমাকেও "সাত সাগরের মাঝি"র ঐ প্রথম স্তবকটি মুগ্ধ করেছিল। এমন স্বপ্ন-বেদনাপ্লুত কবিতার পঙক্তি পড়ে সমস্ত বইটা

www.pathagar.com

পড়ার ইচ্ছে হয়েছিল। কিন্তু আমার চেয়ে অনেক বেশী মুগ্ধ ও আবিষ্ট সেই কাব্য-মাতাল আমাকে বইটি পড়ার সুযোগ দেয় নি।

দৌলতপুর কলেজে আমি সায়েন্সে ভর্তি হয়েছিলাম। কাব্যরোগে আমাকে না ছাড়লেও বাস্তবতার খাতিরে আমাকে দূরে থাকতে হত। তা ছাড়া সাহিত্য বাদে আমার আর এক রোগ ছিল খেলাধুলা ও শরীর-চর্চা। গভীরভাবে তখন যেমন কলেজের পাঠে মনোযোগ দিতে পারি নি, কাব্যচর্চারও তেমন অবাধ সুযোগ পাই নি।

দুলা ভাই ডাক্তার রফিকউদ্দীন আহমদ দোনালা বন্দুক কিনলেন। সেটা আবার আমাকে পাখী মারার নেশায় উদ্বুদ্ধ করল। লেখা-পড়া যথারীতি গোল্লায় গেল, কিন্তু সাহিত্য ছাড়ল না। সেই শেষ পর্যন্ত আমাকে ঢাকায় নিয়ে এল। এবং এই ঢাকাতে এসে আমি ফর্‌রুখ আহমদের সাথে প্রথম পরিচিত হলাম ১৯৬১-তে।

১৯৫৮ সালে আমি ঢাকায় আসি। আমার সঙ্গে গোলাম মোস্তফা ও জসীম উদ্দীনের সঙ্গে পরিচয় হয় বেশী করে। কিন্তু নজরুল নিয়ে আমীর হোসেন চৌধুরীর সঙ্গে মিলে আমরা নজরুল-আন্দোলন শুরু করি। নজরুলকে নিয়ে আন্দোলন করি, কিন্তু চর্চা করি জীবনানন্দ দাশের।

১৯৬১ সালে জীবনানন্দের উপর একটি প্রবন্ধ লিখি। "জীবনানন্দ কাব্যের মূল সুর"। বন্ধুবর মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ সেটি তাঁর "পুবালী" পত্রিকায় ছাপেন। এই আমার প্রথম প্রকাশিত প্রবন্ধ।

এই প্রবন্ধটির সূত্র ধরে ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার সত্যিকার পরিচয় হয়। ইতোপূর্বে ফররুখ আহমদের সঙ্গে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হয়েছে। কিন্তু তা দূরত্ব বজায় রেখে দেখা।

আমি ১৯৬১ সালে লেখক সংঘ পত্রিকার সহ-সম্পাদক হিসেবে লেখক সংঘে চাকুরী নিই। বলতে দ্বিধা নেই—প্রথমদিকে আমি ফর্‌রুখ আহমদের তেমন সুনজরে ছিলাম না। এর কারণ লেখক সংঘ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন কবি গোলাম মোস্তফা এবং তিনি আমার এক ধরনের লোকাল অভিভাবকের মত ছিলেন। তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় ফর্‌রুখ আহমদ আমার সঙ্গে ব্যবধান রেখে চলতেন। এর কারণ কবি গোলাম মোস্তফা ফররুখ আহমদের এককালের শিক্ষক থাকলেও তাঁকে তিনি শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখতে পারতেন না। সে সময় আমি এর কারণ জানতাম না। কেননা, ঢাকার রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশে আমি অনেক বিলম্বে এসেছিলাম। সেদিনের অনেক তরুণ সাহিত্যিকের মত হতে পারে গোলাম মোস্তফার নজরুল বিরোধিতা অথবা বাংলা ভাষার রাষ্ট্রভাষা হওয়ার বিরুদ্ধতা ফর্‌রুখ আহমদকে তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ করে থাকবে।

www.pathagar.com

গোলাম মোস্তফাও ফররুখ আহমদের এই উপেক্ষার আচরণের জন্যে ক্ষুব্ধ ছিলেন। তিনি শিক্ষক, আর তাঁর ছাত্র হয়ে ফররুখ আহমদ তাঁকে উপেক্ষা করেন; এজন্যে তিনি দুঃখ করতেন।

ফর্‌রুখ আহমদের প্রতিভার প্রতি গোলাম মোস্তফার শ্রদ্ধা ছিল, কিন্তু "পূবালী"তে যখন "হাতেম তা'য়ী" প্রকাশিত হচ্ছিল, তখন সেই কবিতা পড়ে তিনি তেমন খুশী হতে পারেননি। গোলাম মোস্তফার ধারণা ছিল, ফর্‌রুখ আহমদ "সাত সাগরের মাঝি"তে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কাব্যিক ভাবাবেগে যা লিখতে পেরেছেন, "হাতেম তা'য়ী"তে তা পারেন নি। তাঁর মতে, "হাতেম তা'য়ী"র লেখা অনেকখানি কৃত্রিম, বুদ্ধিজাত বলে আড়ষ্ট এবং ভাষা ব্যবহারে অস্বচ্ছন্দ।

যাহোক, শিক্ষক-ছাত্রের এই মানসিক ব্যবধান থাকার জন্যে দু'-এক সময়ে দু'একটি অস্বস্তিকর ব্যাপারও ঘটে যায়। ফর্‌রুখ আহমদ প্রেসিডেন্ট পুরস্কার পেলেন। পুরস্কার বিতরণের উৎসবে গোলাম মোস্তফাও উপস্থিত ছিলেন। ফর্‌রুখ আহমদ প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পুরস্কার নিয়ে ফিরলে গোলাম মোস্তফা তাঁকে মোবারকবাদ জানান, কিন্তু তার প্রতিদানে গোলাম মোস্তফা নিরুত্তর শীতল উপেক্ষা লাভ করেন।

আর একবার কুদরতুল্লাহ শাহাবকে সঙ্গে নিয়ে গোলাম মোস্তফা ফররুখ আহমদের কমলাপুরের বাসায় যান। সেখানে তিনি ফর্‌রুখ আহমদের কাছ থেকে সৌজন্যমূলক আচরণ পান নি। এই লা-তোয়াক্কা মনোভাব গোলাম মোস্তফাকে ব্যথিত করেছিল।

আর একবার লেখক সংঘের কার্যকরী সংসদের এক সভায়, যেখানে ডকটর কাজী মোতাহার হোসেন, কবি গোলাম মোস্তফা ও জামিলউদ্দীন আলী পাশাপাশি বসেছিলেন। আর সেই টেবিলের অন্যধারে মুখোমুখি বসেছিলেন ফর্‌রুখ আহমদ, মুনীর চৌধুরী ও অন্যান্যরা—ফররুখ আহমদ অকস্মাৎ কোন কারণবশত টেবিলের উপর হাত রেখে ডকটর কাজী মোতাহার হোসেন ও গোলাম মোস্তফার দিকে ইঙ্গিত করে বললেন, "এই দুই বুড়োর জন্যে আমরা কোন কাজে এগুতে পারছি না।" ব্যাপারটা এমনই অপ্রত্যাশিত ছিল যে, মুহূর্তের জন্যে সবার ঘাড় হেঁট হয়ে যায়, কিন্তু ফর্‌রুখ আহমদ তাতে ভ্রূক্ষেপ করেন না। ফর্‌রুখ আহমদের স্বভাবের সঙ্গে আমার পূর্ব-পরিচয় না থাকায় এটা আমার কাছে দৃষ্টিকটু বলে মনে হয়েছিল।

আসল ব্যাপার হল, ফর্‌রুখ আহমদ কারও প্রতি ক্ষুব্ধ বা বিরক্ত হলে রূঢ়ভাবে সামনা-সামনি আঘাত করতে দ্বিধা করতেন না। সে ধরনের আরও দু'টি ঘটনার কথা উল্লেখ করব।

পাকিস্তান লেখক সংঘে প্রতি দু'বছর অন্তর নির্বাচন হত। সেক্রেটারী ও সদস্য নির্বাচনের এমনি একটি সভার কোন বিতর্কিত কথার মধ্যে ফর্‌রুখ আহমদ মুনীর

www.pathagar.com

চৌধুরীর মুখের উপর কোন সঙ্কোচ ছাড়াই চট্ করে বলে দিলেন, "তোমরা তো পদাধিকার বলে সাহিত্যিক।" কথাটা মুনীর চৌধুরী সম্পর্কে সত্য না হলেও অনেক উচ্চপদস্থ্ সরকারী কর্মচারী ও অধ্যাপকের ব্যাপারে যে সত্য ছিল, তাতে সন্দেহ নেই এবং সে জন্যই সে কথাটা সাহিত্যিক মহলে চালু হয়ে গিয়েছিল—'পদাধিকার বলে সাহিত্যিক'।

আর একবার একজন ইংরেজীর অধ্যাপক ফর্‌রুখ আহমদের "হাতেম তা'য়ী"র ভাষা নিয়ে মন্তব্য করেন। লেখক সংঘের অফিসে তিনি বসেছিলেন। কোন ব্যাপারে কবি আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। পাজামা-পাঞ্জাবী পরা, হাতে ছাতি। তিনি এসে দাঁড়াতেই সালাম জানিয়ে অধ্যাপক কবিকে বললেন, "ফর্‌রুখ ভাই, আপনার 'হাতেম তা'য়ী"তে আরবী-ফারসী শব্দগুলোর ব্যবহার কেমন খটখটে—ওগুলো আমরা বুঝি না।"

রাজ-গোখ্‌রো যেমন মুহূর্ত বিলম্ব না করে ফণা উঁচিয়ে উদ্ধত তেজে আঘাত করে, ফর্‌রুখ আহমদ তেমনি বেতের আঘাতের মত সপাং করে বলে দিলেন, "আপনি বোঝেন না, কিন্তু বাংলার মাঠের রাখালগুলো বোঝে।"

তারপর তিনি মুহূর্ত বিলম্ব না করে বাংলা একাডেমীর দিকে হনহন করে চলে গেলেন। বলা বাহুল্য, লেখক সংঘের অফিসটি ছিল বাংলা একাডেমীর গেটের কাছে—যেটা এখন তাদের বইবিক্রির ঘর।

এই ফর্‌রুখ আহমদের সঙ্গে আমার প্রথম নিবিড় পরিচয় হয় "জীবনানন্দ কাব্যের মূল সুর" নামক প্রবন্ধটির সূত্রে—যা পূর্বে বলেছি।

তখন সদরঘাট থেকে একটি বাস গভর্নর হাউজের পাশ দিয়ে মতিঝিল, কমলাপুর, শান্তিনগর, কাকরাইল, সেগুনবাগিচা হয়ে আবার নবাবপুরের রাস্তা দিয়ে সদরঘাটে ফিরত।

এই বাসের মধ্যেই ফর্‌রুখ আহমদ আমাকে বললেন, 'আপনার প্রবন্ধটা পড়লাম।" দু'চার বাক্যের পর সম্বোধন 'আপনি' থেকে 'তুমি' এবং 'তুমি' থেকে 'তুই'-এতে স্বচ্ছন্দভাবে নেমে এল।

বললেন, 'দেখ, জীবনানন্দকে আলোচনা করতে গিয়ে তুই ভাষাটাকেও জীবনানন্দ বানিয়ে ফেলেছিল। সমালোচনার জন্যে এ ভাষা বেশী প্যাঁচানো। তুই এলিয়ট পড়বি। সমালোচনার জন্যে এলিয়টের ভাষাই বেশী স্বচ্ছ ও ধারালো।" একটু বিদ্রূপ মিশিয়ে বললেন, "বেশী জীবনানন্দ করলে জীবনানন্দের মত ট্রামে চাপা পড়ারও সম্ভাবনা আছে।" ঐ বাসের মধ্যেই খানিকক্ষণ কথা বললেন—নিঃসঙ্কোচ, বেপরোয়া,

www.pathagar.com

অকৃত্রিম। নিজের লেখা সম্পর্কেও কিছু কিছু কথা বললেন —বললেন, "মাঝে মাঝে আমি কিছু হাল্‌কা লেখাও লিখি—চাষাদের হুঁকো টানার মত। কাজ করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়লাম—বিশ্রামের ফাঁকে হুঁকো টেনে নিলাম।"

কথার ফাঁকে আমাকে তাঁর কবিতার উপর লিখতে বললেন। এই পরিচয়ের পরে ফর্‌রুখ আহমদের 'আহমদ' অংশটুকু ঝরে পড়ে আমার কাছে, আর সে স্থানটিতে 'ভাই' শব্দটি অনায়াসে জায়গা করে নেয়।

বিষয়গত কারণে ফর্‌রুখ ভাই আমার সঙ্গে নিবিড় পরিচয়ের আওতায় আসেন। লেখক সংঘ থেকে ফর্‌রুখ ভাইয়ের "নৌফেল ও হাতেম" বইটি ছাপা হয়। এরই রয়্যালটির ব্যাপার নিয়ে তাঁকে কিছুদিন ঘন ঘন লেখক সংঘ অফিসে আসতে হত। দেখতাম, তিনি ট্যাক্স পরিশোধের ঝামেলায় পড়েছেন এবং কিভাবে তার মুকাবিলা করবেন তার জন্যে বিব্রত বোধ করছেন। সে-সময়েই সাহিত্য নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা হত। দেখতাম, ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ বেশী। লেখায় দৃঢ়তা, ঘনবদ্ধতা তিনি পছন্দ করতেন। গ্যেটে মধুসূদন তাঁর প্রিয় লেখক ছিলেন। যদিও তিনি ছিলেন মূলত রোমান্টিক কবি।

১৯৬৬-তে ফররুখ ভাইয়ের "হাতেম তা'য়ী" গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। এর একটি তিনি আমাকে উপহার দেন—তাঁর অনিন্দ্যসুন্দর বিশেষ চরিত্রের স্বাক্ষর দিয়ে। এ-সময় ফর্‌রুখ ভাইয়ের "হাতেম তা'য়ী"র উপর আমি একটি আলোচনা লিখি। এই আলোচনাটি তাঁকে শুনিয়েও ছিলাম। দীর্ঘ আলোচনাটি কবি আল মাহমুদ তাঁর প্রকাশিতব্য একটি পত্রিকার প্রথম প্রবন্ধ হিসাবে ছাপার জন্য নেন। দুর্ভাগ্যক্রমে লেখাটি তিনি হারিয়ে ফেলেন। ফররুখ ভাইয়ের জীবিতকালে তাঁর উপর আমি আর কোন নতুন লেখা লিখতে পারি নি।

একটা কথা এই প্রসঙ্গে বলতে হয়—প্রত্যেক লেখকের জীবনে তার কৈশোর ও প্রথম যৌবনের জীবন তার সত্যিকার পাঠ্য ও ছাত্রজীবন—একটি মহাজীবন। কন্টকহীন আবেগ তখন সংসারের ঝঞ্ঝাটে বিস্রস্ত হয় না আর তখন যা পড়া হয় ভাবাবেগে মিশে তা মনের মধ্যে গভীরভাবে স্মৃতি হয়ে জেঁকে বসে।

এই বয়সটায় হাসান হাফিজুর রহমান, শামসুর রাহমান, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, আবু হেনা মোস্তফা কামাল, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, আবদুল মান্নান সৈয়দ এঁরা ফর্‌রুখ আহমদকে পেয়েছিলেন, আমি পাই নি। পেলে আমি ও ফর্‌রুখ ভাই এই উভয়েই যে উপকৃত হতাম, তাতে সন্দেহ নেই।

আমার সমালোচনার প্রতি ফর্‌রুখ ভাইয়ের আস্থা ছিল বলে আমি বিভিন্ন লেখকের মুখে শুনেছি। ১৯৭৩-এ বিশ্বেশ্বর চৌধুরী এসে সে কথা বলেন এবং ফর্‌রুখ ভাই আমাকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন বলে জানান।

www.pathagar.com

১৯৭১-এর পরে এই প্রথম আমি তাঁর ইস্কাটনের বাসায় গেলাম। গভীরভাবে আলিঙ্গন করলেন তিনি আমাকে। তার মধ্যে যে অসামান্য প্রীতি ও স্নেহের আবেগ ছিল তা বলাই বাহুল্য।

অনেক রুগ্ন হয়ে গেছেন ফর্‌রুখ ভাই। শরীর ও মুখ থেকে স্বাস্থ্যের সমস্ত ঔজ্জ্বল্য বিদায় নিয়েছে। কিন্তু সেই বুক উঁচু করে, মাথা উঁচু করে চলার মধ্যে ব্যবধান উঁকি মারে নি। মেরুদণ্ড তখনও তেমনি ঋজু, গ্রীবা তখনও তেমনি উন্নত ও অনমনীয় ; অথচ হাসিতে হৃদ্যতা ও শুভ্র আন্তরিকতা সোনার মত দীপ্তিমান।

গোলাম মোস্তফার সাহচর্যে ছিলাম বলে পরবর্তীতে তিনি আমার প্রতি আর বিরক্ত ছিলেন না; কেননা তিনি বুঝতে পেরেছিলেন—নিছক টিকে থাকার জন্যে মানুষের জীবনে কারণে-অকারণে সম্বন্ধ রচনা করে নিতে হয়। আর তা ছাড়া এটা সম্পূর্ণ একজনের ব্যক্তিগত ব্যাপার।

আর যে কারণে আমার প্রতি তাঁর বিরক্তির অপমৃত্যু ঘটে তা হল তিনি আমার লেখক সত্তাকে চিনে ফেলেছিলেন। তিনি লেখক—অতএব লেখক মাত্রই তাঁর আত্মীয়। আমার আর্থিক অনটন দূরীকরণে সে আত্মীয়তার পরিচয় দিয়েছিলেন তিনি বাংলা একাডেমীকে আমাকে অনুবাদের কাজ দিয়ে সাহায্য করতে বলে।

ঐ দিন তিনি আমার "শব্দ-ধানুকী নজরুল ইসলাম" পড়েছেন বলে বললেন। ঐ বইটিতে তাঁর সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা আছে। সে ব্যাপারে তিনি ইঙ্গিত করলেন এবং বললেন, "আমাকেও দু'একটা কনুয়ের গুতো মারতে তুই ভুলিস নি। ঠিক আছে। লেখাটি ভালো হয়েছে। তবে একটা কথা—সমালোচনা করতে গিয়ে অন্ধ-ভক্তি প্রদর্শন করিস নে।" কথাগুলো বলে তিনি হেসেছিলেন। সে হাসির মধ্যে এমন অনাবিল স্নেহময়তা ও সহিষ্ণুতা ছিল যে, আমাকে তা অস্বস্তির মধ্যে সঞ্চারিত হওয়ার সুযোগ দেয় নি।

আমি তাঁর ইঙ্গিতটা বুঝলাম এবং বললাম, "আমি সজাগ থাকার চেষ্টা করি, ফর্‌রুখ ভাই।"

আমি জানতাম, সে সময়ে তিনি আর্থিক অনটনে আছেন। কিন্তু তাঁর মুখের চেহারায়, কথার ভাষায় এবং তাঁর উদাত্ত হাসির ঢেউ-এ তার বিন্দুমাত্র প্রকাশ দেখি নি। আলাপের মধ্যে এক সময়ে তিনি বললেন, "তুই মুহম্মদ আলীর উপর বই লিখেছিস, এবার গাদ্দাফীর উপর একটা বই লেখ।" সে-সময় গাদ্দাফীর যেটুকু তিনি পরিচয় পেয়েছিলেন তাতে তাঁকে তিনি একজন উত্তম মুসলিম রাষ্ট্রনায়ক বলে ভেবে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

আলোচনার মধ্যে নাশতা এলো, চা এলো—যেটা ছিল তাঁর গৃহের অবধারিত আতিথ্য—এবং তা খেয়ে ও পান করে আমি বিদায় নিয়ে চলে এলাম। এই সাক্ষাতের পর মৃত্যুর পূর্বে আমার সঙ্গে তাঁর আর একবারই দেখা হয়। আমি তাঁকে কোনো একটি পত্রিকার জন্যে একটি কবিতা লিখতে বলি। হেসে বললেন, "কবিতা লেখায় আর উৎসাহ নেই। দেখিস না, এখানকার সিলেবাস থেকে আমার কবিতা বাদ দিয়েছে। (১৯৭১-এর পরে নতুন যে সিলেবাস হয়—নবম-দশম ও একাদশ শ্রেণীর জন্যে, সেই সিলেবাসের বাংলা বই থেকে ফররুখ ভাইয়ের কবিতা বাদ দেওয়া হয়েছিল।) তাছাড়া একজন রোমান্টিক কবি বিশ বছরের বেশী লিখতে পারে না। তারপর যদি সে লেখেও, সে আর তেমন উঁচুমানের লেখা হয় না।"

এটাই ছিল আমার সঙ্গে ফররুখ ভাইয়ের শেষ আলাপ।

www.pathagar.com

গোলাম সাকলায়েন

তিনি অসাধারণ

তিনি ছিলেন অসাধারণ। দেখতে সাধারণ মনে হ'লেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, আমাদের ফর্‌রুখ ভাই, যথার্থ অর্থে যাকে বলে 'অসাধারণ', তাই ছিলেন। এ-কথা কেন বলছি তার হেতু আছে। ফর্‌রুখ ভাইয়ের সাথে আমার পরিচয় ছিল। অন্যের কাছে শুনেছি যে, তিনি আমাকে স্নেহ করতেন। দোভাষী পুঁথি সাহিত্য নিয়ে ক'টি প্রবন্ধ লিখেছিলাম, তা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

১৯৬১ সালের কথা। তখন আমি নাজিমউদ্দীন রোডের এক বাড়িতে থাকতাম। আমার বাসার কাছেই ছিল রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের অফিস ; এবং অফিসের ঠিক সামনেই ছিল একটি 'টি স্টল'। রেডিওর আর্টিস্ট, কর্মচারী ও অফিসার মাঝে-মধ্যে আসতেন এই চায়ের দোকানে। যেহেতু আমার বাসার লাগোয়া ঐ-চায়ের দোকান, তাই অনেক পরিচিত-অপরিচিত ব্যক্তিকে যাতায়াত করতে দেখতাম। কেউ কেউ ছিলেন নিয়মিত 'ভিজিটর'। আমি জানতাম চায়ের আসরে মাঝে-মধ্যে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ উপস্থিত থাকতেন, তাঁর স্বভাব-সিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি কথা বলতেন, চায়ের আসরে অনেক সংলাপের মধ্যমণি হতেন তিনি। একদিন কি একটা কাজে টি স্টলে গেছি, গিয়ে সবেমাত্র হাজির হয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে ফর্‌রুখ ভাই এসে গেলেন। এরকম সাধারণত হয় না। এর আগেও দু'-একবার গিয়েছি দোকানে, কিন্তু সেদিন কবির সাথে আমার এভাবে যোগাযোগ নিতান্ত আকস্মিকভাবেই ঘটলো। কবি আমাকে দেখতে পেয়ে বলে উঠলেন, "এই যে ভায়া, আপনাকে কিছু বলতে চাই, একটা বিষয়ে।" আমি সকৌতুকে তাঁর দিকে তাকাই। ক্ষণকালের জন্য চেয়ে থাকি।

"ফকির গরীবুল্লাহ্" প্রবন্ধটি আপনার লেখা। বাংলা একাডেমী পত্রিকায় বেরিয়েছিল। আমি পড়েছি। প্রথমেই আমার আপত্তি 'ফকির গরীবুল্লাহ' নাম সম্বন্ধে। জানেন, মুসলমান কবি বা শায়েরদের নামের আগে 'ফকির' শব্দ ব্যবহার না ক'রে 'শাহ্' শব্দ ব্যবহার করা উচিত। দেখুন, মুসলমানের গৌরব ফিরিয়ে আনতে গেলে তাদের নামের সঙ্গে আভিজাত্য সৃষ্টি করতে হবে। 'শাহ্' বললে যে গৌরব বা আভিজাত্যের সৃষ্টি হয় 'ফকির' শব্দে তা হয় না, এই আমার অভিমত।" কথা কটা বলে দুটি উজ্জ্বল চোখে তিনি আমার দিকে চেয়ে রইলেন।

www.pathagar.com

আমি বললাম, "আপনার যুক্তির সারবত্তা অস্বীকার করি না। পুঁথি-সাহিত্যের কাহিনী নিয়ে আপনি চমৎকার কাব্য নির্মাণ করেছেন এবং এ সাহিত্য একেবারেই এ-কালের সাহিত্য হয়ে উঠেছে। এ-রকমটা কেউ করতে পারেন নি। 'সাত সাগরের মাঝি'র তুলনা হয় না।"

ফর্‌রুখ ভাই বললেন, "তা জানি না। তবে "নৌফেল ও হাতেম" ও "হাতেম তা'য়ী"তে আমি দেখাতে চেয়েছি যে, যে-সাহিত্য একালের পাঠকের কাছে নিন্দনীয় ব'লে বিবেচ্য, সেই পুঁথি-সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে সময়োপযোগী কাব্য রচনা করা সম্ভব। আমি চাই, আরো অনেকেই এ-পথে আসুন।" সেদিন কবি আমার সাথে আর কি কথা বলেছিলেন, তা মনে নেই।

ফর্‌রুখ ভাই সাধারণত কোন সাহিত্য-সভা, সেমিনার অথবা এ-ধরনের কোন অনুষ্ঠানে যোগ দিতেন না। আমি যতদিন ঢাকায় বাংলা একাডেমীতে ছিলাম, তার মধ্যে খুব কমই তাঁকে দেখেছি সাহিত্যানুষ্ঠানে। একবার কোন একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলে উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, "বুঝেছি আপনার মনের কথা। আমি এসেছি অন্য কারণে। এ-সভায় অমুকের উপস্থিত থাকার কথা; তাঁর কাছে আমার দরকার বিধায় আমাকে আসতে হলো। তাঁর সাথে দেখা হয়ে গেছে। আমি এখুনি চলে যাচ্ছি। বলতে পারেন নিয়মের মধ্যে এটা একটা ব্যতিক্রম।"

এবং সত্যি সত্যি তিনি চলে গেলেন। সভায় থাকলেন না। কেন এবং কি কারণে তিনি সভা-সমিতিতে অনুপস্থিত থাকতেন, এ-বিষয়ে কোনদিন তাঁকে কোন প্রশ্ন করি নি। জানতাম, প্রশ্ন করলে তাঁর একটা শাঁসালো জবাব পাওয়া যাবেই এবং তাঁর দিক থেকে এর সারবত্তাও রয়েছে হয়তো।

একবার দেখি রিক্সাযোগে তিনি সাত্‌-তাড়াতাড়ি যেন কোথায় চলেছেন। বললাম, "কদ্দূর যাচ্ছেন, ফর্‌রুখ ভাই?"

"মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত, ভাই। রেডিওতে যাব, তার আগে অন্য একটা কাজ সমাধা করতে হবে। রেডিওতে আজ একটা বিশেষ অনুষ্ঠান প্রচার করা হবে। আমি গেলে রিহার্সেল হবে। কোনদিন এমন হয়নি। আজ লেট হয়েছি।" 'লেট' শব্দের উপরে অতিরিক্ত জোর দিলেন। কিন্তু ঘড়িতে দেখালেন যে, আরো এক ঘন্টা সময় বাকি।

বললাম, "বলেন কী, কবি! এক ঘন্টা সময় বাকি আর আপনি বলছেন কিনা 'লেট হয়েছেন'। অদ্ভুত কথা তো!"

"না, অদ্ভুত নয় মোটেই। কোন বিশেষ অনুষ্ঠান থাকলে আমি দু'একদিন আগে থেকেই ঠিকঠাক করে রাখি! রেডিও কর্তৃপক্ষ তা জানেন। আজ সে-রকমটা হলো না। তাই বলছিলাম, এটা আমার জন্যে অস্বাভাবিক।"

www.pathagar.com

বলতে ভুলে গেছি, কবি রেডিও পাকিস্তান, ঢাকা কেন্দ্রের স্টাফ আর্টিস্ট ছিলেন। মৃত্যু আগ পর্যন্ত তিনি সেখানেই চাকুরি করতেন।

দারুণ ব্যক্তিত্ব ছিল ফর্‌রুখ ভাইয়ের। তাঁর চোখে-মুখে ব্যক্তিত্বের ছাপ পড়তো, বিশেষ করে তাঁর চোখ দু'টিতে এক সম্মোহনী শক্তি ছিল বলে আমার ধারণা।

কবি কারও কাছে অনুযোগ করেছিলেন যে, প্রগতিবাদীরা, অতি-আধুনিক কাব্যের Stalwart-রা, নাকি তাঁর সম্বন্ধে কটূক্তি করেছিলেন। তাঁরা বলছিলেন যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যদি 'ইসলাম' 'ইসলাম' ক'রে বাড়াবাড়ি না করতেন তাহ'লে আরো বড় হ'তে পারতেন। এটা তাঁর মতো প্রতিভাবান কবির জন্যে অপমৃত্যু।

এঁদের মন্তব্য শুনে কবি কি উত্তর দিয়েছিলেন, জানি না। তবে ক্ষুণ্ন হয়েছিলেন। মনে ব্যথা পেয়েছিলেন। তবে তাঁর হৃদয়টা এতো বড় ছিল যে, ঐ সব কবিদের কথাবার্তা বা কটূক্তির উপর বেশি গুরুত্ব দিতেন না তিনি।

আজ ফর্‌রুখ ভাই নেই।

তাঁর মুখের কথা আর কোন দিনই শোনা যাবে না। কিন্তু তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি'-র কথা কোনদিনই ভুলবো না। ভোলা সম্ভব নয়। তিনি আমার কাছে সত্যি অসাধারণ ছিলেন।

www.pathagar.com

আখতার-উল-আলম

যুগ-প্রবর্তক কবি

ফর্‌রুখ ভাইয়ের কথা মনে হলে ভীষণ খারাপ লাগে। আবার ভালও লাগে এ ভেবে যে, ফর্‌রুখ ভাই তাড়াতাড়ি মরে গিয়ে বেঁচেই গেছেন। আজ যখন বিভিন্ন আলোচনা মঞ্চে, রেডিও, টেলিভিশনে ফর্‌রুখ ভাই সম্পর্কে নানা ধরনের আলোচনা শুনি, বক্তাদের চেহারা দেখি, তাদের ভাবভঙ্গি অবলোকন করি, অনেক ক্ষেত্রে বিস্মিত হই। আজ যদি ফর্‌রুখ ভাই বেঁচে থাকতেন, তাহলে কি হত? মনে পড়ছে, ষাট দশকের শেষ দিকের কথা। আমি তখন রেনেসাঁ সোসাইটির যুগ্ম সম্পাদক, অন্য যুগ্ম সম্পাদক ছিলেন রেডিও'র তৎকালীন প্রোগ্রাম অর্গানাইজার, "আরশী নগর"-এর গল্পকার-কবি মরহুম হেমায়েত হোসেন। সোসাইটির প্রেসিডেন্ট ছিলেন "পারস্য-প্রতিভা" খ্যাত মরহুম মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ। স্থির হল, ফর্‌রুখ ভাইয়ের উপরে একটা আলোচনা সভা হবে। ফর্‌রুখ ভাইয়ের উপরে মূল প্রবন্ধ লিখবেন জনাব মুজীবুর রহমান খাঁ। বই কোথায়? ফর্‌রুখ ভাইয়ের খোদ "সাত সাগরের মাঝি" বইখানা পাওয়াই যাচ্ছে না যে! খোঁজ, খোঁজ ; শেষ পর্যন্ত আজাদ অফিসের কবি আবদুর রশীদ ওয়াসেকপুরী সাহেবের কাছে একখানা "সাত সাগরের মাঝি" পাওয়া গেল। আরো কিছু বই-পুস্তক জোগাড় করেছিলাম। মুজীবুর রহমান খাঁ গুণী মানুষ। তাঁর কলমের অনবদ্য ছোঁয়ায় চমৎকার এক প্রবন্ধ বেরুল। কিন্তু আলোচনা সভা কোথায় দেই? সেগুনবাগিচাস্থ পাকিস্তান কাউন্সিল অফিসে। আলোচনা সভা ডাকা হল। প্রথম দিন, খুব সম্ভব ৫/৭ জন লোক হয়েছিল। পরের সপ্তাহে আবারো সভার তারিখ নির্ধারিত হল। সেবারে লোক হল ৮/১০ জন। তার মধ্যে আলোচকই বেশী। পরে, রাগ করে বরকতুল্লাহ্ সাহেব আমাকে বললেন, "যে ভাবেই পারেন, ধার করে হলেও কিছু টাকা জোগাড় করুন। জনে জনে প্রত্যেকের কাছে যান। ব্যক্তিগতভাবে দাওয়াত দিন। আলোচনা সভা হতেই হবে।"

সে এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা। যাঁর কাছে যাই, তিনিই মুখ ফিরিয়ে নেন। শেষ পর্যন্ত জানা গেল, একটি বিশেষ মুখচেনা মহল আমাদের সভার খবর পেয়েই পাল্টা তৎপরতা শুরু করে দিয়েছেন এবং এই আলোচনাসভা যাতে না হয়, আমাদের আগেই বলতে গেলে, জনে জনে প্রত্যেকের কাছে গিয়ে তাঁরা সে অনুরোধও জানিয়ে এসেছেন। শেষ

www.pathagar.com

পর্যন্ত আমি আর হেমায়েত দীর্ঘ দু'সপ্তাহ ধরে গোটা ঢাকা শহর আর শহরতলী চষে বেড়িয়ে আলোচনাসভা সফল করে তুললাম। এবারে বেশ লোকজন হল। মুজীবুর রহমান খাঁ-এর অনবদ্য প্রবন্ধটি পড়া হল (পরবর্তীকালে প্রবন্ধটি "সাত সাগরের মাঝি"র পরিশিষ্ট হিসাবে প্রকাশ পেয়েছে)। কিন্তু আলোচনাসভায় বেধে গেল হৈ-চৈ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপরে আলোচনা মূলত মুজীবুর রহমান খাঁ-র প্রবন্ধের আলোকেই যে হবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু না, প্রাচীন সেই সমালোচক আলোচনা করতে দাঁড়িয়েই শুরু করলেন, যাকে বলে একদম উল্টা কারবার। তাঁর কথা—দেও আর দানব, জিন, আর পরী, হুর আর ফেরেশতা নিয়ে আর যাই হোক, কাব্য হয় না। খেজুর গাছ আর বালির ঢিবি বাংলাদেশের চিত্র নয় ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই আলোচনার জওয়াবে কবি মুফাখ্‌খারুল ইসলাম কিছু বললেন। আরো দু'একজন অধ্যাপক-কবি বক্তা ফর্‌রুখের কাব্য-প্রতিভা সম্পর্কে বক্তব্য রাখলেন। শেষে উঠলেন অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। তিনি কোন ভূমিকা না করেই একে একে রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়ড, ওডিসি প্রভৃতি মহাকাব্য থেকে লাইনের পর লাইন আউড়ে গেলেন। সবাই জানেন, তাঁর মুখস্থ শক্তি অসাধারণ। তিনি উদাহরণ দিলেন বীর হনুমানের কাহিনীর ; গন্ধমাদন পাহাড় মাথায় করে চলেছে হনুমান, সূর্য উঠতে যাচ্ছে, হনুমান সেই সূর্যকে ধরে নিয়ে বগলদাবা করে ফেলল। ইউলিসিস একচোখা দৈত্যের সাথে লড়াই চালাচ্ছেন ইত্যাদি ইত্যাদি। পরিশেষে দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ বললেন, "এত সব অবিশ্বাস্য আধিভৌতিক অশরীরী কাহিনী, ঘটনা ও উপাখ্যানেও যদি ওই সব কাব্য ও মহাকাব্যের অঙ্গহানি কিংবা রসহানি না ঘটে থাকে, তাহলে ফর্‌রুখের কাব্যের ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠে কেন? আর দেশজ রূপের কথা? বাংলা সাহিত্যেই বলা হয়, 'কানু ছাড়া গীত নাই।' এই কানু বা শ্রীকৃষ্ণ রাধা, ষোলশত গোপিনী, মথুরা, বৃন্দাবন, এ সবের কোন্‌টা বাংলাদেশের সীমানার মধ্যে ? বাংলার কোন জনপদের মানুষ এরা? বাংলার বাইরের হয়েও শুধুমাত্র কাব্যিক গুণ আর ধর্মীয় অনুভূতির কারণে এরা যদি বাংলা সাহিত্যে স্থান পায়, তা'হলে কেন 'সিন্দাবাদ', 'শাহেরজাদী', 'হাতেম তা'য়ী' বাংলা সাহিত্যে অপাঙক্তেয় হবেন? কেন সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ঐতিহ্যচেতনা ও ধর্মীয় মূল্যবোধের কাব্যিক রূপায়ণ বিদেশমুখীনতা বলে নিন্দিত হবে ?

সেদিন বলতে গেলে, ওই বিরোধী বক্তার মুখ চুন হয়ে গিয়েছিল। রেগে-মেগে তিনি সভাস্থল ত্যাগও করেছিলেন। সভার সভাপতি ছিলেন মরহুম আবুল কালাম শামসুদ্দীন। তিনি তখন পাকিস্তান প্রেসট্রাস্ট পরিচালিত পত্রিকা "দৈনিক পাকিস্তান"-এর সম্পাদক। খোদ পত্রিকার সম্পাদক আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করছেন, অথচ সেই পত্রিকার ফটোগ্রাফার ক্যামেরা ঝুলিয়ে এলেন যখন সভা সাঙ্গ হয়ে গেছে। দ্বিতীয় আর কোন রিপোর্টার কিংবা ফটোগ্রাফার অন্য কোন পত্রিকা থেকে এসেছিলেন বলেও মনে

www.pathagar.com

পড়ছে না। এ ধরনের ঘটনা তখন ছিল এন্তার। ফর্‌রুখের কাব্যের ওপরে আয়োজিত আলোচনা সভার নিউজ, ছবি ইত্যাদি কভার করলে যদি পাকিস্তানপন্থী ও ব্যাকডেটেড বলে মনে করেন, তাই! অথচ খোঁজ নিলে হয়ত দেখা যেত, ওই সাংবাদিক, ওই ফটোগ্রাফার পাকিস্তান সরকারের পরিচালিত কাগজেই কাজ করে যাচ্ছেন, রেডিও-টেলিভিশনে সরকারের গুণকীর্তন করে ভাগ্য ফেরাচ্ছেন। যাই হোক, শামসুদ্দীন সাহেব চলে যাচ্ছিলেন, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ্ বুদ্ধি করে তাঁকে ডেকে নিয়ে এসে, একটা ঘরে মাইকের সামনে দাঁড় করিয়ে ফটো তোলালেন। পরদিন ওই ফটোই আলোচনাসভার সভাপতির-ভাষণ দানের ফটো হিসাবে "দৈনিক পাকিস্তান"-এ ছাপা হল।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে স্মৃতিকথা বলতে গিয়ে এত কথা বলছি এ কারণে যে, সেদিন আমরা যারা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের একান্ত ঘনিষ্ঠ-জন ছিলাম, আজ তারা তালে গোলে আউট হওয়ার জোগাড় হয়েছি, মঞ্চ এখন অধিকার করে রাখতে চাইছেন অন্যরা। আমাদের তবু ক্ষোভ নাই। বরং আমরা খুশী যে, ইদানীং ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আলোচিত হচ্ছেন। ফর্‌রুখের প্রতিভা ইদানিং তাঁর আদর্শ-বিরোধী মহলেও সমাদৃত হচ্ছে। শক্তিমান কবি হিসাবে ফর্‌রুখ স্বীকৃতি পাচ্ছেন। কেউ কেউ ইদানীং এমন কথাও বলছেন যে, ফর্‌রুখের কাব্য সম্পর্কে বিরূপতার কারণ অজ্ঞতা ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা বহু আগে থেকেই একথা বলতাম। আমরা আরো বলতাম যে, নজরুল ইসলামের পর ফর্‌রুখ আহ্‌মদ হলেন বাংলা সাহিত্যের আরেক 'যুগ-প্রবর্তক কবি'। আমি এখনো এই ধারণা মনে প্রাণেই বিশ্বাস করি এবং মনে করি, আজ হোক বা কাল হোক, নিরপেক্ষ ও সঠিক বিচারে ফর্‌রুখের এই যুগ-প্রবর্তনার বিষয়টি সাব্যস্ত হবেই, কেউ ঠেকাতে পারবে না।

সে সময়ে আমি "আজাদ" অফিসে কাজ করতাম। পরবর্তী কালে "পয়গামে" চাকুরী নেই, এবং পরে আবার আজাদে ফিরে আসি। প্রায়ই যেতাম রেডিও অফিসে। প্রথমে নাজিমুদ্দীন রোডে, পরে শাহবাগ এলাকায়। রেডিও অফিসে গেলেই ফর্‌রুখ ভাইয়ের চা খেতে হত ; কখনো কখনো প্রীতিভাজন কাউকে মিষ্টি-সিঙাড়া খাওয়ানোর মধ্যেও তাঁর আদর আর স্নেহ যেন ঝরে পড়ত। কোন কোন দিন তাঁর অফিস থেকে তাঁর সাথেই বেরিয়ে পড়তাম। হাঁটতে হাঁটতে কথা হত। কবি নিজে হরদম পান খেতেন।

এরকম পান খেতে দেখেছিলাম তখন আরেকজনকে। তিনি মরহুম কবি ও গীতিকার আজিজুর রহমান। কখনো বা ফর্‌রুখ ভাইকে ঘিরে চা-খানাতেই আড্ডা জমে যেত। যারা সে সময়ে তাঁর সামনে মাথা উঁচু করে, এমনকি মুখ তুলে পর্যন্ত কথা বলতে পারতেন না, তাঁরাই পরবর্তী কালে দেখেছি.... যাক, সে সব কথা আর নাই বা

www.pathagar.com

বললাম। একবার বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপক (পরবর্তীকালে ডকটর) এ ধরনের এক বৈঠকের আলাপে বেফাঁস কি যেন বলে ফেলেছিলেন, ফর্‌রুখ ভাই তাকে কষে এমন এক ধমক লাগিয়েছিলেন যে, ভয়ে সেই অধ্যাপক ছুটে পালাতে দিশা পান নি। অনেক পরে, বায়তুল মুকাররমের এক অফিসে, কিসের যেন একটা বৈঠক বসেছিল। সভাপতিত্ব করছিলেন কবি বেনজীর আহমদ। আমাদের সবার প্রিয় গল্পকার ও কবি মফিজউদ্দীন আহ্‌মদ কি একটা যেন বেফাঁস কথা বলেছেন কি বলেন নি, ফর্‌রুখ ভাই হুংকার দিয়ে উঠলেন, "মফিজ!" বজ্রকণ্ঠ কাকে বলে, সেদিনই প্রথম শুনেছিলাম। পরে ফর্‌রুখ ভাইকে একান্তে পেয়ে বলেছিলাম, "আপনি যদি কবি না হতেন, তা হলে ডাকাত সর্দার হতেন।" কবি তাঁর সেই সুবিশাল চোখ আমার দিকে নিবদ্ধ করে বললেন, "কি বললি?" বললাম, "হ্যাঁ, আপনার চোখ আর গলার আওয়াজ শুনেছি, ডাকাত সর্দারদেরই এমনটি হয়।" হো হো করে হেসে উঠলেন কবি।

ওই সময়ের কাছাকাছি আর একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কবি তখন কেবলমাত্র ছোটদের জন্য কবিতা ও ছড়া রচনায় ব্যস্ত। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্, হেমায়েত হোসেন, সুশোভন আনোয়ার আলী (মরহুম) এবং আরো কেউ কেউ আমরা প্রায়ই কবিকে ভিন্ন ধরনের কবিতাও লিখতে বলতাম। একদিন হেমায়েত হোসেন আমার বাসায় এলেন। আমি তখন ৮০ শান্তিবাগে থাকি। ওই এলাকার কিছু দূরে, মালিবাগে তখন কবি সপরিবারে বাস করতেন। হেমায়েত জানালেন, "কবি সাহের 'বৈশাখ' নিয়ে এক কবিতা লিখেছেন, আপনাকে ডেকেছেন ; আনোয়ারকে সাথে নিয়ে যেতে বলেছেন।"

এর কিছুকাল পরে এক রাতে হেমায়েত সহ কবি এলেন আমার বাসায়। তিনি জানতেন, শেলীর কমপ্লিট ওয়ার্কস আমার কাছে রয়েছে। কি একটা লেখার ব্যাপারে শেলী কনসাল্ট করার প্রয়োজন পড়েছিল, তাই। সেদিন অনেক রাত ধরে তাঁর কাছে ইংরেজী সাহিত্যের মরিস, সুইনবার্ন, জার্মান সাহিত্যের গ্যেটে, ইতালীর দান্তে, রোমের ভার্জিল, ফ্রান্সের হুগো সম্পর্কে নানা আলোচনা শুনেছিলাম। বিস্মিত হয়েছিলাম। এককালের ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র, বিশ্ব সাহিত্য সম্পর্কে এত গভীর জ্ঞান সম্পন্ন এই কবিকে এদেশের অনেকে কিভাবে 'ব্যাকডেটেড,' 'পুঁথি সাহিত্যের পাতায় বন্দী' বলে ভুল বোঝেন। অথচ তাঁরা যদি একটু গভীর মনোনিবেশ নিয়ে পড়াশোনা করার পর কবি ফর্‌রুখের কাব্যরস আহরণের প্রয়াস পেতেন, দেখতেন, বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কবিদের মত তিনিও বাংলা সাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করে গেছেন।

বাংলা সাহিত্যে সনেটের প্রথম রূপকার হলেন মাইকেল, আর সেই বাংলা সাহিত্যেরই সর্বাধিক সনেট রচয়িতা হলেন ফর্‌রুখ। কাব্যনাট্য রচয়িতা হিসাবেও ফর্‌রুখ অনন্য, মাইকেল যেমন তাঁর রচনার বুনিয়াদ হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন

www.pathagar.com

হিন্দুপুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত সহ বিভিন্ন হিন্দু ঐতিহ্যকে, তেমনি ফর্‌রুখ তাঁর কাব্যিক বুনিয়াদের জন্য গ্রহণ করেছিলেন পুঁথি সাহিত্যকে—আলিফ লায়লা, হাতেম তায়ী, কাসাসুল আম্বিয়া এবং এতদ্দেশীয় ইসলামী-ভাবধারাকে। তাছাড়া মাইকেল যেমন ফর্‌রুখও তেমনি এই বুনিয়াদে যে কাব্যিক মহল তৈরী করে গেছেন, তা সৃষ্টিশৈলীর দিক থেকে শুধু আধুনিক নয়, সে সবের উপাদানও সংগৃহীত হয়েছে বিশ্বের বিভিন্ন সাহিত্যের বিভিন্ন ইতিহাস, ঐতিহ্যের ভাণ্ডার থেকে। আর উভয়ই সেই সব কিছুকেই সমান পারদর্শিতার সাথে, রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন, সেই স্বীকরণ, সেভাবেই, তাঁদের কাব্যে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন। মাত্র একটা উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ,
হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া পরেছে শিলাদৃঢ় আবলুস,
পিপুল বনের ঝাঁজালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে ;
নামে নির্ভীক সিন্ধু ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।

বাংলা সাহিত্যে এ রকম কাব্যিক ভাবসমৃদ্ধ ও সৌন্দর্যমণ্ডিত পঙক্তি খুব বেশী আছে ব'লে আমার জানা নাই।

ফর্‌রুখ ভাইকে নিয়ে মাঝে-মধ্যে আমাদের বিপাকে পড়তে হত। আমাদের বলতে এখানে হেমায়েত আর আমি; এবং মাঝে-মধ্যে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌কে। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুউল্লাহ্‌কে কবি দারুণ স্নেহ করতেন। বলতেন, "তোরা—তুই আর হেমায়েত খালি-খালি দাপাদাপি করে বেড়াস। মাহফুজউল্লাহ্‌কে দেখ দু'হাতে লিখে যাচ্ছে। ওর শ্বশুরের স্থানটা ওর দ্বারাই পূর্ণ হবে।"

যা হোক, অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপরে আলোচনা পুস্তক রচনা করছেন, কথায় কথায় কবিকে তা জানান হল। কবি কিছু বললেন না, শুধু একটুখানি হেসে বললেন, শোন, আমার 'ডাহুক' কবিতা নিয়ে দিগ্‌গজেরা তো মহা চিন্তায় পড়ে গেল। 'ওড টু স্কাইলার্ক' 'ওড টু নাইটিঙ্গেল'—কোনটার সাথেই মেলাতে পারে না। কিন্তু ওরা তো কথার বেপারী। তালে-গোলে মিলিয়ে দিয়ে সাব্যস্ত করে ছাড়ল যে, 'ডাহুক' আদৌ মৌলিক কবিতা নয়। ঠিক নকল না হলেও ভাবানুকরণ ইত্যাদি। আরে, ওরা কোথা থেকে জানবে, বল্ ? ওরা তো খালি বইয়ের পাতায় জীবনের মানে খুঁজে বেড়ায়—ভুল মানেকে সঠিক মানে ভেবে নিয়ে বগল বাজায়। তুই তো জানিস, মুজাদ্দিদী তরিকায় জিকির কি জিনিস। 'ডাহুক' রাত ভর ডেকে ডেকে গলায় রক্ত ওঠায়। মুজাদ্দিদী সাধকও তেমনি রাতভর 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' জিকির করে নিজেকে ফানা করে দেন। গভীর রাতে নীরব নির্জন কোন গ্রাম্য মসজিদে মুজাদ্দেদী তরিকার কোন সাধক যখন 'আল্লাহু' 'আল্লাহু' জিকির করতে থাকেন, তখন মনে হয় অবিকল যেন একটা ডাহুক একমনে ডেকে চলেছে। আমার 'ডাহুক' কবিতা এই

www.pathagar.com

ধরনের মুজাদ্দিদী সাধকের জিকির নিয়েই রচিত। স্কাইলার্ক কিংবা নাইটিঙ্গেলের সাথে তার মিল থাকবে কোত্থেকে?"

কিন্তু অধ্যাপক সুনীল মুখোপাধ্যায়ের যে কথা বলছিলাম, ষাট দশকের শুরুতেই আমি যখন মাসিক "মোহাম্মদী" সম্পাদনার দায়িত্ব পাই, তার আগেই "মোহাম্মদী"তে সুনীল বাবু রচিত কিছু কিছু ফর্‌রুখের আলোচনা ছাপা হয়েছে। পরে নানা কারণে তা বন্ধ হয়ে যায়। এর কিছু আগে "বিবর্তন" নামে একটা মাসিক পত্রিকা বেনামীতে সম্পাদনা করেছিলাম। সম্পাদক ও মালিক ছিলেন আবদুল মান্নান ভূঁয়া। পত্রিকাটির অফিস ছিল আহসান মঞ্জিলে। চামচিকা আর বাদুড়ের আস্তানা। টিমটিমে আলোতে আমরা কাজ করতাম। সুনীল বাবুর "সিরাজাম মুনীরা"র কাব্য আলোচনা কয়েক সংখ্যা এই বিবর্তনেই ছাপা হয়েছিল। পরে হঠাৎ করে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। তখন ইতস্তত কানাঘুষা শুনতাম যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের হয়ে আমরাই নাকি টাকা খরচ করে সুনীল বাবুকে দিয়ে তাঁর উপরে বই লেখাচ্ছি। অথচ সুনীল বাবু সাক্ষী আছেন, তখন পর্যন্ত ফর্‌রুখ ভাইয়ের সাথে তাঁর সাক্ষাৎই হয় নাই, পরে সাক্ষাৎ হলেও তেমন কোন অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠে নাই। শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের "কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ" গ্রন্থটি প্রকাশ করলেন মরহুম নাসির আলী সাহেব তাঁর সুবিখ্যাত নওরোজ কিতাবিস্তান থেকে।

যা হোক, এই সময়ে হেমায়েত আর আমি ঠিক করলাম, ফর্‌রুখ ভাইয়ের সাথে সুনীল বাবুর একটা বৈঠকের ব্যবস্থা করতে হবে। সুনীল বাবুকে আনা হবে কবির বাসায়। প্রথমে ফর্‌রুখ ভাই কিছুতেই রাজী হতে চান না। শেষ পর্যন্ত অনেক বলে-কয়ে রাজী করানো হল। ফর্‌রুখ ভাই তখন থাকতেন ইস্কাটন গার্ডেন কলোনীতে মসজিদের নিকটবর্তী ফেলাটে। সিঁড়ি দিয়ে নিচে নামতে নামতে কবি বললেন, "তাই তো রে, আমাকে জব্দ করতে চাচ্ছিস তোরা। সুনীল বাবু গুণী মানুষ। কি করি, বল তো?" বললাম, "না, বেশী কিছু না, শুধু একটু চা-নাশতার ব্যবস্থা করলেই হবে।" বললেন, "ধ্যাৎ, তা কি করে হয়!"

হেমায়েত জানালেন, "আজকেই রেডিও অফিসে সুনীল বাবু আসতে পারেন। সেখানেই কথাবার্তা বলে রাখব।" ফর্‌রুখ ভাই বললেন, "চল, দেখা যাক।" আমাকে বললেন, "তুই কিন্তু কাল বারোটার আগে অবশ্যই সোজা এই বাসায় চলে আসবি।" এরপর কিভাবে রেডিও অফিসে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সাথে অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের প্রথম সাক্ষাৎ ঘটেছিল, কিভাবে হেমায়েত কবি সাহেবের পক্ষ থেকে সুনীল বাবুকে দাওয়াত জানিয়েছিলেন, সে কথা সুনীল বাবুর মুখে যে কেউ শুনে নিতে পারেন।

www.pathagar.com

পরদিন দুপুরে ফর্‌রুখ ভাই, সুনীল বাবু, হেমায়েত আর আমি এই চারজন কবির সেই ইস্কাটনস্থ বাসায় টেবিল ভর্তি খানা খেতে খেতে অনেক বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। লক্ষ্য করেছিলাম, সুনীল বাবুর যেমন অগাধ শ্রদ্ধা কবির প্রতি, কবিরও তেমনি সশ্রদ্ধ একটা সমীহ রয়েছে সুনীল বাবুর পাণ্ডিত্যের প্রতি। অথচ বাইরে এ নিয়ে নানা মহলে কি প্রচারণাই যে হয়েছে। চরিত্র-হননের এই কায়দা-কারসাজি আজো এদেশের শিক্ষা, শিল্প, সাহিত্যের অঙ্গনে ও প্রাঙ্গণে এন্তার। কবিকে 'পাকিস্তানপন্থী' বলে সব সময়ই সমালোচনা করা হত। তিনি অবশ্যই 'পাকিস্তানপন্থী' ছিলেন, কিন্তু প্রচলিত অর্থে নয়। পাকিস্তানের যতটুকু ইসলাম, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের পাকিস্তানপ্রীতিও ঠিক ততটুকুই। পাকিস্তানী শাসকবর্গ কতবার কতভাবে কবিকে যে ব্যবহার করতে চেয়েছেন, ইয়ত্তা নাই। কিন্তু ফর্‌রুখ ছিলেন আলাদা ধাতের। তিনি ভাঙবেন, তবু মচকাবেন না। শুনলে অবাক হতে হয়, বারকয়েক সরকারীভাবে অনুরোধ পাওয়া সত্ত্বেও ফর্‌রুখের মত কবি তদানীন্তন পশ্চিম পাকিস্তানে কোন দিন যান নাই। প্রতিবারই পাকিস্তানের জালেম শাসকদের দাওয়াত তিনি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন।

আমরা অনেকেই পশ্চিম পাকিস্তানে যাই নাই। আর যারা পাকিস্তানী শাসক আমলা-অফিসারদের ডাকে সাড়া দিয়ে হরদম পাকিস্তানে যেতেন, এন্তার নানান ইনাম, সওগাত ডালা ভরে নিয়ে আসতেন, আগু বাড়িয়ে আইয়ুবের 'ফ্রেণ্ডস নট মাস্টার' বই অনুবাদ করতেন, পাকিস্তানের রেডিও-টেলিভিশনে টাকার জন্য আসর জমাতেন, "মাহে-নও" "পাকিস্তানী খবর", "পাক সমাচার" ও "পাক জমহুরিয়াত"-এর মত পত্র-পত্রিকায় টাকার বিনিময়ে লিখতেন হরদম এবং লেখক-সংঘের হালকা রুটির স্বাদ-আস্বাদ মজাসে ভোগ-উপভোগ করতেন, তাঁরাই হলেন পাকিস্তান-বিরোধী প্রোগ্রেসিভ, আর আমরা হয়ে রইলাম পাকিস্তানপন্থী, ব্যাকডেটেড্। এর আর একটা বড় প্রমাণ মেলে তদানীন্তন বি. এন. আর-এর অর্থ-প্রাপ্তির তালিকা থেকেও। কিন্তু এসব কথা এখন আর আমরা তুলতে চাই না। আমরা সব কিছুই ভুলে যেতে চাই। ভুলে যেতে চাই, অতীতে ফর্‌রুখ তথা এদেশের স্বাতন্ত্র্যবাদী সাহিত্য-সংস্কৃতি চেতনার বিরুদ্ধে কার কি ভূমিকা ছিল, এবং কারা বাইরে সেই ভূমিকা বজায় রেখেই, ঘরের মধ্যে কোন ভূমিকা পালন করতেন।

ফর্‌রুখ ভাই আম খেতে খুব পছন্দ করতেন। আমের মওসুমে আমাদের বাসায় এলেই আমার স্ত্রী আম কেটে খাওয়াতেন। এক সময় আমার স্ত্রী ব্লাড প্রেসারে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবি সময় পেলেই ওকে দেখতে আসতেন। ওষুধ পথ্যের খবরাখবর নিতেন। আমাকে সাহস জোগাতেন।

অনেক সময় তাঁর কিছু কিছু লেখা হেমায়েত আমার বাসায় রেখে যেতেন। আনোয়ার (এস আনোয়ার আলী) মাঝে-মধ্যে এসে, আমি বাসায় না থাকলেও ফর্‌রুখ

www.pathagar.com

ভাইয়ের সেসব লেখা এবং আমারও কিছু কিছু লেখা আমার স্ত্রীর কাছ থেকে নিয়ে যেতেন "পাকিস্তানী খবর"-এর জন্য। সে সময়ে আনোয়ার পারতপক্ষে ফররুখ ভাইয়ের মুখোমুখি হতে চাইতেন না। কেননা, তাঁর "পাকিস্তানী-খবর"-তাঁকে ঘিরে যে আড্ডা ও আসর জমত, সেখানে নাকি ফর্‌রুখ ভাইয়ের কুৎসা, সমালোচনা চলত জোরে-শোরে। এ ধরনের একটা খবর কিভাবে যেন ফর্‌রুখ ভাই জেনে ফেলেছিলেন। আর ফর্‌রুখ ভাই যে খবরটা জেনে গেছেন তা আনোয়ার জানতে পেরে ঘাবড়ে গিয়ে ফর্‌রুখ ভাইয়ের সাথে সাক্ষাৎ বন্ধ করে দিয়েছিলেন ভয়ে। আমাকে বলেছিলেন, "কি করব, সরকারের নীতিই হল ওদের ইউটিলাইজ্ করা। আর 'যারা' ইউটিলাইজড্ হওয়ার জন্য এমনভাবে আগু বাড়িয়ে রয়েছে, কে জানতো। তারাই আবার বাইরে গিয়ে আমারও সমালোচনা করবে! ওদের প্রত্যেকটাকে হাড়ে হাড়ে চিনি। বাইরে ভড়ং ঠিকই আছে, ভিতরে ক্যারেকটার বলতে ঢুঁ-ঢুঁ। হুঁ-হুঁ, আমি বাবা মোহাম্মদ ওয়াজেদ আলীর ছেলে, আমার কাছে মোনাফেকী!"

ফর্‌রুখ ভাই এই মোনাফেকীর বিরুদ্ধেই ছিলেন সবচাইতে সোচ্চার। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলি এই সব মোনাফেকের ভড়ং উদঘাটনের জন্যই রচিত হত। মোনাফেকী একদম সহ্য করতে পারতেন না বলেই বাইরে তাঁর দুর্নাম রটেছিল দুর্মুখ আর বদরাগী বলে। অথচ আমরা যারা একান্ত কাছে থেকে তাঁকে দেখেছি, জেনেছি, আর কেউ না জানুক, তারা তো জানি, মানুষ হিসাবে তিনি ছিলেন কত উদার, কত শরীফ!

শেষ দিকে ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাছে লোকজনের যাওয়া-আসা কমে গিয়েছিল। আমি তখন সবে "ইত্তেফাকে" যোগ দিয়েছি (১৯৭২-ফেব্রুয়ারী)। খবরটা পেয়ে ফর্‌রুখ ভাই খুশি হলেন, আবার আশংকাও প্রকাশ করলেন। বললেন, "তুই কি ওখানে কাজ করতে পারবি? কিছু লিখতে পারবি? ওরা কি তোকে কিছু লিখতে দেবে?" বললাম, "আমাকে তো ওখানে দিয়েছেন আবুল মনসুর আহমদ। কথাই আছে, আমি আমার মত করে যতটা সম্ভব লেখা লিখতে চেষ্টা করব।"

পরবর্তীকালে আহমদ ছফা প্রথম "গণকন্ঠ" পত্রিকায় লিখে ফর্‌রুখ ভাইয়ের অবস্থার প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। ৭৪-এর দুর্ভিক্ষের সময়ে ঈদুল ফিতরের একদিন আগে 'স্থান-কাল পাত্র' কলাম লিখতে গিয়ে লিখেছিলাম ঃ কোথায় আজ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, দুর্ভিক্ষের উপর লেখা 'লাশ'-এর মত অনবদ্য কবিতা আর দেখি না কেন? ঈদের পরের দিনই 'লাশ'-এর কবি নিজেই লাশ হয়ে গেলেন। তারপর কবির সেই লাশ নিয়েও এদেশে রাজনীতি হল। শেষ পর্যন্ত কিভাবে বেনজীর আহমদ এগিয়ে এসে নিজের পারিবারিক গোরস্তানে কবিকে শেষ জায়গাটুকু দিলেন, কিভাবে কবির দাফন-কাফন সম্পন্ন হল, দাফন শেষে 'ইত্তেফাকে' ফিরে গিয়ে সেদিনের 'স্থান-কাল-পাত্র'কলামে তাও লিখেছিলাম। ভবিষ্যতে কেউ যদি ওই সব লেখা খুঁজে দেখেন,

www.pathagar.com

জানতে পারবেন, সমকালীন বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠতম কবির প্রতি স্বদেশ আর স্বজাতি কি নিষ্ঠুর নির্মম আচরণ করেছে।

কবি-পুত্র আহমদ আখতার বলেছিল, ইত্তেফাকে যেদিন দুর্ভিক্ষের উপর লেখাটা প্রকাশ পায়, কবি লেখাটা বুকে নিয়ে কেঁদেছেন। কেঁদেছি আমরাও, কবির লাশ সামনে রেখে। আবার অনেকে সেদিন যে হাসেন নাই, সেকথা হলফ করে বলতে পারি না। তবে, আমাদের সান্ত্বনা এই যে, মর্দে মুজাহিদ কবি কারো হাসি-কান্নার ধার বড় একটা ধারতেন না। তিনি তাঁর কলম চালিয়ে গেছেন চিরটাকাল একমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য। অন্য কারো মনোরঞ্জনের জন্য নয়। এ ধরনের জিহাদী-জীবনের মৃত্যু শহীদী মৃত্যু ; আর এ কথা সবার জানা যে শহীদেরা কখনো মরেন না। তাঁরা চিরঞ্জীব। মরহুম কবি ফর্‌রুখ আহমদ তাই আজ জীবিত ফর্‌রুখের চেয়ে অনেক শক্তিমান, অনেক বেশী জীবন্ত। আর আমরা এদেশের সবাই আজ তাঁর সেই জীবন্ত আদর্শেরই উত্তরাধিকারী। আল্লাহ্‌ কবিকে জান্নাতবাসী করুন। আমীন।

www.pathagar.com

সুলতান আহমদ

মেজমামা

মধুমতি নদীর তীরে ছোট্ট একটি গ্রাম। গ্রামের নাম মাঝআইল। এই গ্রামেই কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের জন্ম। মাঝআইল যশোর জেলার মাগুরা মহকুমার শ্রীপুর থানার (উপজেলা) অন্তর্গত একটি গ্রাম। মধুমতি নদীর ওপারেই ফরিদপুর জেলা শুরু। গ্রাম বরাবর ঠিক ওপারেই কামারখালী ঘাট। একটি প্রাচীন বাণিজ্য কেন্দ্র, ধান-পাটের গুদাম, হাই স্কুল, রেল স্টেশন। প্রায় তিপ্পান্ন বছর আগে মামাবাড়ীতে আমার জন্ম। কবি ফর্‌রুখ আহমদ আমার মেজমামা।

খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলীর মেজ ছেলে ফর্‌রুখ আহমদ। আম্মা বেগম রওশন আখতার। বড় ভাই সৈয়দ সিদ্দীক আহমদ। বড় বোন সৈয়দা শরফুল আরা মোকাদ্দেসা খাতুন। ছোটভাই মরহুম সৈয়দ মুশীর আহমদ। মুশীরমামা কলকাতা গভর্নমেন্ট আর্টস স্কুলে শিল্পী কামরুল হাসানের সহপাঠী ছিলেন।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন মধুমতি নদী খরস্রোতা ছিল। বর্ষায় দু'কূল ছাপিয়ে বন্যা আসতে, প্রচুর মাছ পাওয়া যেত। এখন মধুমতি একটি ক্ষীণস্রোতা মৃত নদী মাত্র।

শৈশবে মামাবাড়ীতে মেজমামাকে দু'তিনবার দেখেছি। বড় বড় একজোড়া উজ্জ্বল চোখ, লম্বা বাঁকানো নাক, প্রশস্ত কপাল, গভীর কণ্ঠস্বরের মেজমামাকে আমরা ছোটরা ভীষণ ভয় করতাম। তখন মেজ মামা কলকাতায় স্কুলে পড়েন। আম্মার মুখে শুনেছি, আমার যখন জন্ম হয়, তখন মেজ মামা বাড়ীতেই ছিলেন। তখন তাঁর বয়স এগার-বার বছর। লম্বা পিরহানের জেবে কলসীর ভাঙা চাড়া, কড়ি এসব ভ'রে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ করতেন, হাঁকতেন, 'হিং নেবে হিং, আঙুর, কিসমিস, পেস্তা, খুবানি, বাদাম।" মেজমামা কাবুলীওয়ালা সাজতে চাইতেন। তখন মেজমামা একটা ছড়া বানিয়েছিলেন, "সুলতান যাবে কাবুল দেশে, পেস্তা বাদাম খাবে ঠেসে।" ঐ সময় মেজমামা খুবই উদাসীন, ভাবুক প্রকৃতির ছিলেন। একা একা মাঠে মাঠে আর নদীর ধারে ঘুরে বেড়াতেন। চাঁদনী রাতে, সব কিছু নিঝুম হয়ে এলে উঠোনে পায়চারী করতেন। ডাহুক ডাকতে শুরু করলে বাঁশঝাড়ের পাশে গিয়ে ডাহুকের ডাক শুনতেন। এসব আমার আম্মার মুখে শোনা। আমার বয়স যখন পাঁচ-ছ' বছর, সে সময় মেজমামা একদিন ...র নদীর ধারে বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলেন। আমাদেরকে কিছু ভূগোলের জ্ঞান

www.pathagar.com

দিলেন। বললেন, "পাহাড় থেকে এসেছে এই নদী। তারপর চলে গেছে দক্ষিণে, সেখানে আছে বঙ্গোপসাগর, তারপর আরো সাগর, নৌকা চড়ে ভেসে যেতে কোন বাধা নেই, কোন মানা নেই। কিন্তু সাবধান, হুঁশিয়ার। আসবে ঝড়, উঠবে তুফান, বড় বড় কুমীর আর হাঙর মাতামাতি করবে। আল্লাহ্ আল্লাহ্ করে নৌকা ছাড়লে কোন ভয় নেই।"

তখন জানতাম না কোথায় পাহাড়, আর কোথায় সাগর। মেজমামার মুখের দিকে সেদিন হা করে তাকিয়েছিলাম।

এরপর অনেকদিন গেল। ১৯৩৮ বা ৩৯ সালের কথা। কলকাতার উপকণ্ঠে যাদবপুরে বড়মামা একটা বাড়ী তৈরী করেছিলেন। সেখানেই মেজমামাকে দেখলাম। মেজমামা তখন অনেক বড় হয়েছেন। রাজপুত্রের মত চেহারা। পরনে শান্তিপুরী ধুতি, গায়ে লক্ষ্ণৌই আদ্দির পাঞ্জাবী, চুল ব্যাকব্রাস করা, পায়ে স্যাণ্ডেল। মেজমামা তখন ইংরেজীতে অনার্স পড়েন।

আমরা আগেই শুনেছিলাম মেজমামা কবিতা লেখেন। কিন্তু মেজমামার কবিতা আমরা কখনই পড়ি নি। জিজ্ঞেস করেছিলাম, "মামা আপনি কবিতা লেখেন, আমাদের বইয়ে ছাপা হয় না কেন?" মেজমামা হেসেছিলেন, "ছাপা হয় বৈ কি।" মেজমামা মাসিক "মোহাম্মদী"র একটা সংখ্যা আমার হাতে দিয়ে বলেছিলেন, "এই কবিতাটা পড়্।" তাঁর লেখা কবিতাটা আমি পড়তে চেষ্টা করেছিলাম, কিন্তু কোন্ কবিতা এখন কিছুই মনে নেই।

১৯৪২ সালে আব্বা কলকাতায় বদলী হয়ে গেলেন। আমরা মামাবাড়ীতে গিয়ে উঠলাম। যখন মেজমামানী বাপের বাড়ী যেতেন তখন আমি মেজমামার ঘরেই থাকতাম। এই সুযোগে মেজমামাকে কিছুটা ঘনিষ্ঠভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম। মাঝে মাঝে তিনি গভীর রাতে আমাকে ডেকে তুলতেন, বলতেন, "কত ঘুমাবি, সকাল হয়ে এল।" একদিন মেজমামা আবৃত্তি করলেন,

কৃষ্ণা দ্বাদশীর পাণ্ডুর ক্ষীয়মাণ চাঁদ,
আরক্ত ঊষার প্রান্তে এল শেষ হয়ে,
দিগন্তে স্বর্ণাভা ঃ দূরে আলোর ইংগিত
থামাও মৃত্যুর সুর..।

আমি ঘুমজড়িত চোখে মেজমামার কবিতা শুনতাম। কষ্ট হলেও ভারী উৎসাহ বোধ করতাম। তিনি তখন মাসিক "মোহাম্মদী"র সাথে জড়িত ছিলেন, কলকাতা বেতারে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করতেন, বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় লিখতেন। কয়েক বছর পিছিয়ে যাব। শান্তিপুরী ধুতি আর লক্ষ্ণৌই আদ্দির পাঞ্জাবী পরা, চুল ব্যাকব্রাস করা মেজমামা

www.pathagar.com

প্রগতিবাদী গ্রুপের সাথে জড়িত ছিলেন। কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সহপাঠী ছিলেন। জ্যোতিবসু প্রমুখের সাথে ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠতা।

এরপর কবি ফররুখ আহ্‌মদের জীবনে আমূল পরিবর্তন আসে। শোনা যায়, তৎকালীন টেলর হোস্টেলের সুপারিনটেনডেন্ট মরহুম মওলানা আবদুল খালেকের সংস্পর্শে এসে কবি প্রভাবিত হন।

আবার ১৯৪২-৪৩-এ ফিরে আসি। এখন মেজমামা আর ধুতি পরেন না। সাদা লুঙ্গি পাজামা-পাঞ্জাবী আর পাম্প সু তাঁর পোশাক। দাড়ি রেখেছেন, প্রচুর পান খান, নামায পড়ার জন্যে তাগিদ দেন। একদিন নামায শিক্ষা কিনে এনে দিলেন আমাদের।

মেজভাই ডঃ হাসান জামানকে খুব স্নেহ করতেন মেজমামা। তাঁরা মাঝে মাঝে কাব্য, সাহিত্য, দর্শন, রাজনীতি, আন্দোলন, মুসলমানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করতেন। সেই আলোচনার আসরে আমার প্রবেশাধিকার থাকলেও অংশগ্রহণ করার ক্ষমতা ছিল না। এই সময় কবি ফররুখ আহ্‌মদের "সাত সাগরের মাঝি" প্রকাশিত হয়। বইয়ের মলাট তখনও কাঁচা-কাঁচা। মেজমামা একদম প্রেস থেকে নিয়ে এসেছেন। আম্মার হাতে একখানা বই তুলে দিয়ে বললেন, "মেজবু, আমার একখানা বই ছাপা হল।" আম্মা দু'হাত বাড়িয়ে ছোট ভাইয়ের হাত থেকে বইখানা নিয়েছিলেন। আমি পাশেই দাঁড়িয়েছিলাম। আমার হাতে একখানা বই দিয়ে বললেন, "কবিতা পড়তে চাস, পড়।" আমি পড়লাম ঃ

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?

এক ঈদুল ফিতরের দিনের কথা। মেজমামা আমাকে নিয়ে গেলেন গড়ের মাঠে নামায পড়তে। নামায শেষে আমার সাথে কোলাকুলি করলেন। তারপর আমজাদিয়া হোটেলে এসে দু'জনে দু'প্লেট জর্দা খেলাম। ট্রামে করে পার্ক সার্কাসের মোড়ে এসে নেমে একটা বাড়ীতে উঠলেন। কার বাড়ী আমার মনে নেই। সম্ভবত আবুল মনসুর আহমদের বাড়ী হবে। ওঁরা আমাদেরকে খুব সমাদর করলেন, পোলাও কোর্মা খেতে দিলেন। আমার খিদে ছিল না, তাই মুরগীর একটা রান আর একটা আলু খেলাম। মেজমামা পোলাও কোর্মা সবই খেলেন। তাকিয়ে তাকিয়ে একটু হাসলেন, কিছুই বললেন না। ওখান থেকে বেরিয়ে "মৃত্তিকা" সম্পাদক ঔপন্যাসিক আফসারউদ্দীন আহমদ ও বেগম জেবু আহমদের বাড়ীতে উঠলাম। সেখানেও একই ব্যাপার। পোলাও, কোর্মা, ফিরনি, জর্দা এলো। মেজমামা বললেন, "ও জর্দা আর কোর্মা

www.pathagar.com

খেয়েছে, ওকে শুধু একটু পোলাও দেবেন।" আর কেউ না বুঝলেও কথাটার অর্থ আমি বুঝলাম। ভীষণ রাগ হয়েছিল সেদিন মেজমামার উপর।

যাদবপুরের বাড়ীতে একদিন কোত্থেকে একটা সাদা বিড়ালের বাচ্চা এল। কুঁই কুঁই করে ডাকাডাকি, কান্নাকাটি শুরু করল। মেজমামা বললেন, 'কি রে, তোদের খিদে লাগে, বিড়ালের খিদে লাগে না! ও মেজবু, বিড়ালটাকে কিছু একটু দেন।" আমার নানী মেজমামা ও ছোটমামাকে খুব ছোট রেখে ইন্তেকাল করেছিলেন। তাই আম্মা ছোট দুই ভাইকে খুব স্নেহ করতেন। বলা যায়, কোলে-পিঠে করে মানুষ করেছেন।

বিড়ালটার কথা বলছিলাম। আস্তে আস্তে সেটা বড় হল, আরও সুন্দর হল। আমাদের সাথে খেলা করত। কিন্তু আসল সখ্যতা ছিল তার মেজমামার সাথে। মেজমামা রান্নাঘরে পিঁড়ি পেতেই খেতে বসে যেতেন। বিড়ালটা তার পাশে এসে বসত। মেজমামা এক টুকরো মাছ বা গোশত হাতে নিয়ে অপেক্ষা করতেন। বিড়ালটা হাতের উপর ভর দিয়ে উঠে মাছ বা গোশতের টুকরা নিয়ে যেত। তারপর একটু দূরে বসে খেত আর পিট পিট করে তাকাত। মেজমামা সেই হাতেই খাওয়া শেষ করতেন।

একদিন আমরা ক'ভাই বোন ঠিক করলাম কত কবি-সাহিত্যিক সুধীজনের জন্ম-জয়ন্তী পালিত হয় ; কত লোকের জন্মদিন উপলক্ষে আয়োজন হয়, বিড়ালটার একটা জন্মদিন করলে কেমন হয়! আমার প্রস্তাবে আমার ছোট ভাই-বোন মনা, রোজী, নবাব (মরহুম) ও বাবলা (মামাত বোন) করতালি দিয়ে সম্মতি জানাল। কিন্তু জন্মদিন করতে হলে তো একটা নাম দরকার। কিন্তু বিড়ালটার তো কোন নাম নেই। যেই চিন্তা অমনি কাজ, মেজমামার কাছে গিয়ে বললাম, "মেজমামা, বিড়ালটার জন্মদিন করতে চাই। কিন্তু ওর তো কোন নাম নেই, ওর একটা নাম রেখে দেন।" মেজমামা একটু ভাবলেন। তারপর বললেন, ওর নাম 'ঝকমারী'। এরপর থেকে বিড়ালটা 'ঝকমারী' নামেই পরিচিত হল।

১৯৪৪ সালের মাঝামাঝি সময়ের কথা। তখন দুর্ভিক্ষ। কলকাতায় চালের মণ ৪০/৫০ টাকা। না খেয়ে কত লোক মারা গেল। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় লাশ দেখা যেতে লাগল। মেজমামা লিখলেন ঃ

জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে প'ড়ে আছে জমিনের 'পর,
সন্ধ্যার জনতা জানি কোন দিন রাখে না সে মৃতের খবর।

এরই মাঝে একদিন আমি আর মেজমামা কলকাতা থেকে ট্রেনে করে যাদবপুর স্টেশনে এসে নামলাম। কিছু দূরেই একটি লোক কাঁথা গায়ে শুয়ে আছে। মেজমামা এগিয়ে গেলেন, নাকের কাছে হাত দিয়ে বলছেন, "এখনও বেঁচে আছে, একটু গরম দুধ আনতে পারবি ?" আমার কাছে চার আনা পয়সা ছিল। তাই দিয়ে কাছের রেস্তোঁ

থেকে একটু দুধ আনলাম। মেজমামা খুব যত্নে লোকটাকে দুধটুকু খাওয়ালেন। তারপর দু'জনে ধরে লোকটাকে যাদবপুরের এক লঙ্গরখানায় পৌঁছে দিয়ে এলাম। এরপর থেকে মেজমামার খাওয়া কম হয়ে গেল। মেজমামা আম্মা আর বড় মামানীকে বললেন, "আমার ভাতের অর্ধেক কোন লোককে দেবেন।" এরপর প্রায়ই দেখতাম মেজমামা না খেয়ে বেরিয়ে যেতেন। খাওয়ার সময় বলে যেতেন, "আমার ভাত কাউকে দেবেন।" মেজমামার কাছে বেশী পয়সা থাকত না ; তিনি দিনের পর দিন এইভাবে উপোস করে কাটিয়েছেন।

১৯৪৬ সাল। কলকাতায় হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শুরু হল। সে দাঙ্গা ছড়িয়ে পড়ল বিহারে। আরও অনেক জায়গায়। মেজমামা অস্থির হয়ে উঠতেন। ঘন ঘন পায়চারী করতেন। সেই দাঙ্গার মধ্যে একদিন মেজমামা কলকাতা বেতারে ছুটে গেলেন। রেডিওতে মেজমামার কণ্ঠস্বর ভেসে এল, "এবার দেখেছি নিজের রক্ত—দেখেছি আর রক্ত নেবার পাশবিক মত্ততা।"

দিন যায়, মাস যায়, বছর গেল। কেউ ঢাকা, আর কেউ যশোর চলে এলাম। মেজমামা ঢাকা বেতারে এসে যোগ দিলেন। আমি ঢাকায় এলাম ১৯৫২ সালে। এসেই আমিও ঢাকা বেতারে নাট্য শিল্পীর খাতায় নাম লেখালাম। নাজিমুদ্দীন রোডে ঢাকা বেতার কেন্দ্রের সেই ভাড়াকরা বাড়ীটা অনেক স্মৃতি নিয়ে এখনও দাঁড়িয়ে আছে। সেখানেই রাস্তার ওপারে আবুল মিয়ার রেস্টুরেন্ট ছিল। মেজমামা এই রেস্টুরেন্টে বসে থাকতেন। তাঁর চারপাশে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিকেরা ভীড় জমাতেন। আবুল মিয়ার দোকানের রসগোল্লা সন্দেশের থালা সাবাড় হয়ে যেত। বিল সব পরিশোধ করতে হত মেজমামাকেই।

একদিনের কথা। এক দুঃস্থ শিল্পী এসে কেঁদে পড়লেন। তাঁর স্ত্রী গুরুতর অসুস্থ। হাসপাতালে। রক্ত দিতে হবে। একটি টাকাও কারো কাছ থেকে পেলেন না। মেজমামা মুখ তুলে তাকালেন। সেইদিনই তিনি বেতন পেয়েছিলেন। মুঠো ভরে পকেট থেকে সব টাকা তুলে লোকটার হাতে দিয়ে বললেন, "আপনার স্ত্রীর চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।" শূন্য হাতে বাড়ী ফিরে গেলেন মেজমামা।

১৯৭১ সালে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর মেজমামা নানা অসুবিধার মধ্যে পড়লেন। নিদারুণ অর্থকষ্টে তাঁর দিন যেতে লাগল। ধনী আত্মীয়-স্বজনের সাথে মেজমামা তেমন সম্পর্ক রাখতেন না। আমরা দরিদ্ররাই ছিলাম তাঁর ঘনিষ্ঠ।

১৯৭৩-এর দিকে মেজমামার শারীরিক ও আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি হল। প্রায়ই উনুনে হাড়ি চড়ে না, এমন অবস্থা। মেজভাই ডঃ হাসান জামান সবে জেল থেকে বেরিয়েছেন। তাঁর অবস্থা আরো খারাপ। আমিও তখন একরকম বেকার। মাঝে মাঝে

www.pathagar.com

মেজমামার খবর পেতাম। একদিন কিছু টাকা সংগ্রহ করে মেজমামার বাসায় গেলাম। সেই স্নেহের সুরে সম্বোধন, "কি রে কেমন আছিস, বুবুর চিঠি পেয়েছিস?" দু'একটা কথা বলে বেরিয়ে এলাম। পকেটের টাকা বের করতে সাহস পাই নি।

শোনা একটা কথা বলছি, কে নাকি মেজমামার বাসায় গিয়ে তাঁর সাংসারিক অসুবিধে সম্পর্কে খোঁজ-খবর নিয়েছিল। মেজমামা নাকি বলেছিলেন, "তোর পান থাকলে কিছু পান পাঠিয়ে দিস।" মেজমামা পান খেতে খুব ভালবাসতেন।

বেশ ক'দিন মেজমামার কোন খোঁজ-খবর রাখি নি। একদিন সন্ধ্যেবেলায় বাসায় বসে আছি, রেডিওতে ঘোষণা হল, "কবি ফর্‌রুখ আহমদ ইন্তেকাল করেছেন।" চমকে উঠলাম। শুধু মনে হল, "কি রে কেমন আছিস?" এই ঘনিষ্ঠ সম্বোধনে আর কোনদিন মেজমামা আমাকে কাছে টেনে নেবেন না।

www.pathagar.com

মোবারক হোসেন খান

অমর ডাহুক

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা স্কুলে পড়েছি, কলেজে পড়েছি। কবিতা পড়তে গিয়ে তাঁর জীবনের কথা পড়েছি, তাঁর কাব্য-সাধনা আর কাব্য-চর্চার কথা পড়েছি। জেনেছি, তিনি ছিলেন মুসলিম রেনেসাঁর কবি। তাঁর লেখনীর ধার তীক্ষ্ণ, তীব্র। কবিতার অন্তর্নিহিত ভাবের সঙ্গে খাপ খাইয়ে অবলীলাক্রমে তিনি আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছেন। বাংলা-কবিতা তাঁর হাতের স্পর্শে হয়েছে সমৃদ্ধ। 'ডাহুক' পড়েছি, পড়েছি 'পাঞ্জেরী'। এখনো ডাহুকের ডাক যেন শুনতে পাই। না, ঠিক ডাহুকের ডাক নয়, যেন ফর্‌রুখ ভাইয়ের ডাক শুনতে পাই। তিনি যেন নাম ধরে ডাকছেন। বলছেন, "তোকে লিখতে হবে। সঙ্গীতের ইতিহাস লিখতে হবে। তোকে শিখতে হবে, ফারসী ভাষা শিখতে হবে। তাহলে অনেক জানতে পারবি, অনেক লিখতে পারবি। তোর ভাষা শেখা হবে, দেশের মানুষকে বলতে পারবি। কার কাছে শিখবি? আমি বলে দিচ্ছি, মাজহার আলী সাহেবের কাছে শিখবি। তিনি ভালো ফারসী জানেন, আরবী তো জানেনই, তোকে আন্তরিকভাবে শেখাবেনও। তিনি রেডিওতেই চাকরি করেন। সকালে পবিত্র কুরআনের তরজমা করেন, প্রচার করেন।"

ফর্‌রুখ ভাইয়ের এ যেন আরেক রূপ।

স্কুল বা কলেজে যখন পড়ি, তখন ভাবি নি, কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা হবে। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হবে। তাঁর স্নেহের পরশ পাবো। রেডিওতে তাঁর সঙ্গে কাজ করবো। স্কুল ছেড়ে, কলেজ ছেড়ে, ইউনিভার্সিটি ছেড়ে চাকরি জীবনে প্রবেশ করলাম। ঠিক কি প্রবেশ করলাম? না, তা ঠিক নয়। বাবা জোর করে ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর এক ছেলে, আর আমিই সেই ছেলে, আমাকে নাকি রেডিওতে চাকরি করতে হবে। সুতরাং একদিন সত্যি চাকরিতে ঢুকে পড়লাম এবং রেডিওতেই দেখা হলো 'ডাহুকে'র কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে। স্কুল বা কলেজ জীবনে তাঁর কবিতা পড়তে গিয়ে তাঁর চেহারা মনের পর্দায় ভাবতে চেষ্টা করতাম কিনা মনে নেই। কিন্তু সামনে দেখে মনে হলো, তাঁর কবিতার মতোই তাঁর চেহারা শাণিত, ক্ষুরধার। হালকা-পাত্‌লা-লম্বাটে গড়ন। মুখটাও লম্বাটে। গালে এক গুচ্ছ শ্মশ্রু। টিকোলো নাক। ভাসা চোখ। বেশ বড়ো বড়ো। চোখগুলো থেকে যেন সব সময় আগুন ঝরছে। মাথায় এক ঝাঁক চুল। ঘাড় পর্যন্ত নামানো। গলাটাও বেশ লম্বা। গায়ে আলখাল্লার মতো সাদা পাঞ্জাবী, পরনে

www.pathagar.com

পাজামা। আর হাতে একখানা ছাতা। তাঁর নিত্য সহচর। কথা যখন বলেন, মনে হয় যেন গুলি ছুঁড়ছেন। বেশ তীক্ষ্ণ, আর মাঝে মাঝে কিছুটা যেন হেঁয়ালী। সে এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব। প্রথম দর্শনেই মনে শ্রদ্ধা জাগে। অদ্ভুত একটা জাদু, অসাধারণ একটা আকর্ষণ যেন রয়েছে তাঁর চেহারা আর কণ্ঠস্বরে। চেহারার সঙ্গে কণ্ঠস্বরের এক অপূর্ব মিল। যেন একটা আরেকটার পরিপূরক।

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে দেখে আমি অভিভূত হয়ে পড়েছিলাম। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হয়ে আমি মুগ্ধ-বিস্মিত হয়েছিলাম। সে তো উনিশ শো বাষট্টি সালের কথা। একদিন পরিচয়ের সূত্র ঘনিষ্ঠ হলো। তিনি আমাকে কাছে টেনে নিলেন। ছোটভাইয়ের আসনে বসালেন। একটা আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে উঠলো তাঁর সঙ্গে।

ফর্‌রুখ ভাই রেডিওর 'খেলাঘর' অনুষ্ঠান পরিচালনা করতেন। আমার সহকর্মী হেমায়েত হোসেন 'খেলাঘর' অনুষ্ঠান দেখতেন। তিনি আর আমি এক কক্ষে বসতাম। তাঁর কাছে ফর্‌রুখ ভাই আসতেন। আর সেই সূত্র ধরেই তাঁর সঙ্গে পরিচয়। পরিচয়ের পরে ঘনিষ্ঠতা। আমার সহকর্মী হেমায়েত নেই। হাইপার টেনশনে মারা গেছেন। ফর্‌রুখ ভাইও নেই। ঈদুল-ফিতর-এর পরের দিন ইন্তেকাল করেছেন। কিন্তু আমি আছি। আমার সঙ্গে আছে ফর্‌রুখ ভাইয়ের স্মৃতি। আমৃত্যু সেই স্মৃতি থাকবে আমার সঙ্গে।

আমি বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে সুর-বাহার বাজাতাম। রেডিওতে অনুষ্ঠান করতাম। চাকরিতে যোগ দেয়ার পর ছেড়ে দিতে হলো। ওটাই নাকি নিয়ম। রেডিওর অফিসাররা অনুষ্ঠান করলে মানুষ সমালোচনা করবে। সুতরাং রেডিওতে বাজানো যাবে না। কি অদ্ভুত নিয়ম।

একটা মানুষের প্রতিভাকে গলা টিপে মারবার এ এক অদ্ভুত ফন্দি! প্রতিভা মরুক আপত্তি নেই, মানুষটা বেঁচে থাকলেই হলো। কারণ মানুষটা চাকরি করবে, তার প্রতিভা নয়। অগত্যা আমাকেও সঙ্গীত-চর্চায় জলাঞ্জলি দিয়ে অফিসার হতে হলো। আর তখনই ফর্‌রুখ ভাই উপদেশের ডালি নিয়ে এগিয়ে এলেন। আমাকে অভয় দিলেন। বললেন, "কুছ পরোয়া নেই। বাজাতে দেবে না তো কি হলো? তুই লিখবি। সঙ্গীতের থিওরী লিখবি। সঙ্গীতের ঔপপত্তিক প্রক্রিয়া লিখে পাঠকদের উপহার দিবি। তোর চাচা উস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ, তোর বাবা উস্তাদ আয়েত আলী খাঁ যেমন সঙ্গীত জগতে অমর হয়ে আছেন, তুই তাঁদের মতো না হতে পারলেও শিক্ষিত সমাজে সঙ্গীতের ইতিহাস লিখে নিজের যৎকিঞ্চিৎ হলেও অবদান রেখে যেতে পারবি। তোকে আমীর খসরুর কথা লিখতে হবে। তিনি কেমন করে এ দেশের সঙ্গীতে নতুনা ধারা প্রবর্তন করলেন, সে-কথা লিখবি। তোকে ফারসী বইয়ের সাহায্য নিতে হবে। তাই তোকে ফারসী শিখতে হবে। আর লিখবি তোদের পরিবারের ইতিহাস। একটা পরিবার থেকে কোন

www.pathagar.com

যাদুমন্ত্রে একের পর এক সঙ্গীতজ্ঞ বের হলো, তার কথা জনগণের কাছ বলবি। আল্লাহকে পেতে হলে সঙ্গীতের সাধনার ভেতর দিয়েও যে লাভ করা যায় উস্তাদ আলাউদ্দিনের জীবনী লিখে তুই জনগণকে সে কথা জানাবি।"

ফর্‌রুখ ভাইয়ের তেজোদ্দীপ্ত সে কথাগুলো আজও কানের পর্দায় বাজে। মিজরাব দিয়ে সেতারের তারে আঘাত করলে যে বলিষ্ঠ শব্দ বের হয়, তাঁর কথাগুলোর প্রতিটি শব্দে ছিল সেতারের সেই সুর, সেই আওয়াজ। আমি লিখেছি, তাঁর উপদেশ পালনের চেষ্টা করেছি। সঙ্গীতের ইতিহাস লিখেছি, এখনো লিখছি। আমীর খসরুর কথা লিখেছি। মুসলমানরা সঙ্গীতে যে এক অভিনব ধারা প্রবর্তন করেন, সে কথা লিখেছি। উস্তাদ আলাউদ্দীন খাঁর কথা লিখেছি। আরো লিখছি। জানার যেমন শেষ নেই, লেখারও তেমন শেষ নেই। যত জানবো, ততই লিখবো। এটা যেন একটা প্রক্রিয়া।

একদিন দু'দিন করে দিন যায়। ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে আসে। অনেক ধরনের আলাপ-আলোচনা হয়। সাহিত্য, সঙ্গীত, সমাজ, মূল্যবোধ, চরিত্র-সঙ্কট। বিষয়ের যেন শেষ নেই। আমাকে আরো একটা পরামর্শ দিয়েছিলেন তিনি। আমাকে স্যার ওয়াল্টার স্কট রচিত 'দি ট্যালিস্‌ম্যান' অনুবাদ করতে বলেছিলেন। বাঙালী পাঠক সমাজে উপহার দেয়ার জন্যে তাগিদ দিয়েছিলেন। একবার নয়, কয়েকবার—বহুবার। বইটা সে মুহূর্তে যোগাড় করতে পারি নি। কিন্তু সংগ্রহ যখন করেছি, ফর্‌রুখ ভাই তখন আর এ জগতে নেই। তাঁর মৃত্যুর পর বইটা আমি কিনেছি। না, অনুবাদ করি নি। রেখে দিয়েছি। অনেকটা তাঁর স্মৃতির মতোই। হয়তো কোনোদিন অনুবাদ করবো। তাঁর উপদেশ বাস্তবায়িত করবো।

ফর্‌রুখ ভাই সব সময় স্পষ্টবাদী ছিলেন। সত্য কথাটা সোজা ও সরল ভাষায় বলতে কসুর করতেন না। অপর পক্ষ তাতে দুঃখ পেলে বা বেদনা বোধ করলে, সত্যকে সহজভাবে গ্রহণ করতে না পারলে সে দোষ তো আর তাঁর নয়। সুতরাং তাঁর সঙ্গে কথা বলার সময় সত্য কথা সুস্পষ্ট ভাষায় শোনার জন্যে প্রস্তুত থাকতে হতো। আমি অনেককে অবশ্য তাঁর স্পষ্ট কথা শুনে ক্ষুব্ধ হয়ে চলে যেতে দেখেছি। কিন্তু মানুষের চরিত্র আল্লাহ্ -তায়ালা সৃষ্টির সময় ঠিক করে দেন। তা আর বদলানো যায় না। সুতরাং ফর্‌রুখ ভাইও আল্লাহর দেয়া চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে এক স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সত্যকে সত্য হিসেবে গ্রহণ করতে পারার এই গুণ হয়তো তিনি পেয়েছিলেন রসূলের (সা) জীবন ও আদর্শ থেকে। সত্যি বলতে কি, ফর্‌রুখ ভাই তাঁর জীবনে ইসলামের শিক্ষা ও আদর্শকে গভীরভাবে গ্রহণ করেছিলেন এবং তা তাঁর ব্যবহারিক জীবনে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করেছিলেন।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ ভাইয়ের হৃদয় ছিল সংবেদনশীল। মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্নার সঙ্গে তিনি নিজেকে একাত্ম করে দিতেন। গরীব-মিসকীন দেখলে তিনি মর্মপীড়া বোধ করতেন। অনেক সময় হৃদয়ের সে ব্যথা কথায় ও লেখায় প্রকাশ করতেন। দুঃখীর তিনি ছিলেন সমব্যথী। তাদের দুঃখ-কষ্ট হয়তো তিনি লাঘব করতে পারতেন না, কিন্তু অন্তর দিয়ে তা উপলব্ধি করতেন।

হাজারো গুণের সমন্বয় ছিল ফর্‌রুখ ভাইয়ের মধ্যে। তিনি আমার মেয়ে রিমিকে খুব স্নেহ করতেন। একদিনের কথা মনে আছে। তাঁর "পাখীর বাসা" বইটি প্রকাশিত হয়েছে। একটা বই হাতে করে একদিন অফিসে নিয়ে এলেন। তারপর পাতা উল্টে আমার কন্যা রিমিকে উপহার দিলেন। নাম সই করে বইটা আমাকে দিয়ে বললেন, "তোর মেয়েকে দিলাম। পড়ে শোনাবি। সবগুলো পাখীর ছড়া। ফওজিয়াকে গাইতে বলবি। সুর করে গাইলে খুব ভালো লাগবে। তোর মেয়ে খুব মজা পাবে।"

আমার স্ত্রী ফওজিয়া ইয়াসমীন রেডিওর কণ্ঠশিল্পী। ফররুখ ভাইয়ের সঙ্গে আমার বিয়ের আগে থেকেই পরিচিত। অত্যন্ত স্নেহ করতেন। তখন ছড়ার গান গেয়ে বেশ নাম করেছিলো বলেই হয়তো তাঁর "পাখীর বাসা"র ছড়াগুলো সুর করে গাইতে বলেছিলেন। আমি কিন্তু কয়েকটা গান সুর করেছিলাম। একটা গান দ্বৈত কণ্ঠে গেয়েছিলো তখনকার দিনের শিশু-শিল্পী সাবিহা মাহবুব ও ফরহানা হক। আমার কন্যা "পাখীর বাসা" পেয়ে খুব খুশী হয়েছিলো। ছবি দেখতো। আর আমাকে ছড়া পড়তে বলতো। ফররুখ ভাই আমার মুখে একথা শুনে আনন্দ পেয়েছিলেন। খুশী হয়েছিলেন।

ফররুখ ভাই অত্যন্ত নীতিবাদী ছিলেন। নীতির ব্যাপারে তাঁর কাছে কোনো আপোস ছিল না। ইংরেজদের শাসন থেকে দেশকে মুক্ত করতে তিনি সোচ্চার ছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করেছেন। বাংলার মানুষদের দুঃখে তিনি অশ্রুসিক্ত হয়েছেন। এ দেশের মানুষের প্রতি অত্যাচার আর জুলুম তাঁর কাছে অসহ্য ঠেকেছে। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ বিদ্রোহী হতে চেয়েছে, কিন্তু নিপীড়নের যাঁতাকল পেরিয়ে সে কণ্ঠ সোচ্চার হতে পারে নি। স্বাধীনতা যুদ্ধকালটা ছিল তাঁর অনুচ্চারিত সোচ্চার ক্রন্দনের সময়। নীরবে অশ্রু বিসর্জন করেছেন। অনেক সময় নিজেকে অসহায় ভেবেছেন। কেমন যেন আত্মহারার মতো হয়ে পড়েছিলেন। তাঁকে আমি অনেকদিন অফিস থেকে ফিরিয়ে দিয়েছি। কৃতজ্ঞতার দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ছাতার বাঁট ধরে অফিসের চত্বর থেকে বের হয়ে গেছেন। তাঁর প্রাণের আকুলতা খুব কাছে না গেলে টের পাওয়া যেতো না। তাঁর মনের ব্যথা বুঝবার চোখ দিয়ে না তাকালে দেখা যেতো না। তাই হয়তো তাঁকে অনেকে ভুল বুঝেছেন। কিন্তু তিনি সে জন্য আক্ষেপ করেন নি। ভবিতব্য মেনে নিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ স্বাধীন হলো। কবি আবার লেখনী হাতে তুলে নিতে চাইলেন। কিন্তু বাধা এলো। তিনি সে বাধাকে অতিক্রম করতে চাইলেন। হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হলো। তবু অভিযোগ করলেন না। তারপর একদিন নীরবে লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেলেন। তিনি আর আসবেন না। পবিত্র ঈদ্-উল্-ফিতরের পরের দিনে ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭৪-এ তিনি দু'চোখ বুঁজে চিরনিদ্রায় ঘুমিয়ে পড়লেন।

যে কবির কবিতা স্কুল জীবনে পড়েছি, যে কবির 'ডাহুক' কলেজে পড়েছি, সে কবি আর ফিরে আসবেন না। 'ডাহুক' হয়তো বনে ডাকবে, কিন্তু ডাহুকের কবি আর কথা বলবেন না। তাঁর কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেছে চিরদিনের জন্যে। অনন্তকালের জন্যে। হয়তো 'পাঞ্জেরী' কবিতার মতো মনে প্রশ্ন জাগবে, 'রাত পোহাবার কত দেরী?'

রাত পোহাবে। দিনের আলোতে ভেসে উঠবে ধরিত্রী। কিন্তু স্তব্ধ কবির রাত পোহাবে না। দিনের আলো তাঁর চোখে পড়বে না। তিনি যে চিরনিদ্রায় শায়িত—তিনি নীরব, স্তব্ধ!

www.pathagar.com

ফজল-এ-খোদা

তাঁর তুলনা তিনি নিজেই

'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ'—এই নামটি শোনা মাত্রই আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে শিরদাঁড়া টান টান এক পৌরুষদীপ্ত ব্যক্তিত্বের ছবি। যে ব্যক্তিত্ব কোন মানুষের কাছে নত হবার নন। সেই অবয়ব যেন শত কণ্ঠে ঘোষণা করতে থাকে, 'বল বীর, চির উন্নত মম শির।' ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে যাঁরা দূর থেকে দেখেছেন কিম্বা যাঁরা খুব কাছ থেকে দেখেছেন, তাঁরাই আমার এ কথার সত্যতা অনুধাবন করতে পারবেন।

ফর্‌রুখ আহমদের বিশ্বাস যেমন ছিল পর্বতের মত অটল, তেমনি তাঁর বিশ্বাসের প্রতি সততাও ছিল বিস্ময়কর। তিনি যা বিশ্বাস করতেন, তা তিনি তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব দিয়ে বিশ্বাস করতেন। যে কোন মূল্যে কেউ তাঁকে তাঁর বিশ্বাস থেকে এক চুলও নড়াতে পেরেছে কিনা আমার জানা নেই। স্বাধীনতার ঠিক অব্যবহিত পরের একটি বিষয় এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করছি।

মি মুক্তিযুদ্ধ থেকে ফিরেছি ১৯৭১ সালের ২২শে ডিসেম্বর। ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছে। ঢাকার চারদিকে সদ্য যুদ্ধবিধ্বস্ত চিহ্নগুলি গলিত ক্ষতের মত দগদগ করছে। তবু রাস্তায় রাস্তায় জনতার বিজয়োল্লাস বাঁধ-ভাঙা জোয়ারের মত। ঠিক এই সময়ে ফররুখ ভাইকে দেখতে গেলাম তাঁর ইস্কাটন গার্ডেনের সরকারী বাসায়। বসবার ঘরের দরোজা খোলা। দরোজা খোলা পেয়েও কেমন যেন থমকে গেলাম। আশ্চর্য! আমার সঙ্গে আমার কতিপয় সহযোগী মুক্তিযোদ্ধাও ছিলেন। খোলা দরোজা দেখে তাঁরাও আমার মতই বিস্মিত হয়েছেন বুঝতে পারলাম। মুক্তিযুদ্ধের এই ন'মাসে সবাই ঘরের দরোজা বন্ধ রাখতেই অভ্যস্ত হয়ে গেছে। ঢাকায় ফিরে যত বন্ধু-বান্ধব পরিচিত আত্মীয়-স্বজন যাঁর সঙ্গেই দেখা করতে গিয়েছি, তাঁদের ঘরের দরোজাই বন্ধ পেয়েছি। এমন কি ঘরের দরোজা বন্ধ রাখার নানা রকম কসরৎ দেখতে পেয়েছি সর্বত্র। কিন্তু এ কি? তাঁর প্রাণে কি মৃত্যুরও ভয় নেই। অন্তত তাঁর স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের জন্যে তো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। না হয় ঢাকা এতদিন পাকিস্তানী বাহিনীর দখলে ছিল বলে তাঁর কোন ভয়ের কারণ ছিল না। কারণ পাকিস্তানের কর্তা ব্যক্তিরা ভালো করেই জানতো, ফররুখ আহমদ একজন খাঁটি পাকিস্তানী। এজন্যে হয়তো তারা এতদিন তাঁকে মুক্তিযোদ্ধাদের রোষ থেকে পাহারা দিয়ে বাঁচিয়েছে। কিন্তু এখন? এখন তিনি কার ভরসায় ঘরের দরোজা এমন উন্মুক্ত করে নির্বিকার আছেন?

www.pathagar.com

ঘরের দরোজা খোলা পেয়ে আমার সাথীদের একজন ঘরে ঢুকে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে টেনে ধরে থামিয়ে দিয়ে আওয়াজ করলাম, "ফর্‌রুখ ভাই আছেন?" ভেতর থেকে ফর্‌রুখ ভাইয়েরই নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠ শুনতে পেলাম—"কে?" উত্তরে বললাম, "ফর্‌রুখ ভাই, আমি ফজল-এ-খোদা।" সঙ্গে সঙ্গে তিনি বাইরের ঘরের দরোজায় আমাদের সামনে এসে দাঁড়ালেন। আমাকে দেখেই হাত এগিয়ে দিলেন, আমি তাঁকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে কোলাকুলি করলাম। সহসাই যেন বাকরুদ্ধ হয়ে এল তাঁর। পরক্ষণেই স্বাভাবিক স্বরে বললেন, "আয় আয়, বোস। তোকে অনেকদিন পর দেখলাম। তোর বৌ-ছেলে কেমন আছে? তোর মা কেমন আছেন? তোর ভাই-বোন?" উদ্বিগ্ন স্বর তাঁর কণ্ঠে। "সবাই ভালো আছে," আমি বললাম, "আপনি কেমন আছেন ফর্‌রুখ ভাই? ভাবী, ছেলে-মেয়েরা?" উত্তরে ফর্‌রুখ ভাই বললেন, 'আছে, আছে--সবাই ভালো আছে।" তারপর আরো দু-চারটি সৌজন্যমূলক কথা হল। এর মধ্যে আমার সঙ্গীদের সঙ্গে ফর্‌রুখ ভাইয়ের পরিচয় করিয়ে দিলাম। এক সময় তিনি ভেতরে গিয়ে আমাদের জন্যে শরবত নিয়ে এলেন নিজ হাতে। শরবত খেতে খেতেই আরো নানা রকম কথা হচ্ছিল—পরিচিত কে কেমন আছে ইত্যাদি ইত্যাদি। কথার ফাঁকে আমার এক সঙ্গী ফররুখ ভাইকে জিজ্ঞেস করে বসলেন, "দেশ স্বাধীন হয়েছে, আপনি খুশী হন নি?"

সৌজন্যমূলক কথা-বার্তার মধ্যে প্রশ্নটি আমার কাছে অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছিল। লক্ষ্য করলাম, ফর্‌রুখ ভাইয়ের মুখটা আর আগের মত স্বাভাবিক নেই, কেমন থমথমে আর শক্ত। মুহূর্তেই তিনি যেন বদলে গেলেন। বললেন, "আমার ব্যক্তিগত খুশী-অখুশীতে কি আসে যায়! আমি আগেও যা ভাবতাম, এখনো তাই ভাবি। আমি মুসলমান, এ কথাটাই আমার কাছে বড়।" ভাবলাম, আর কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। তাই তাড়াতাড়ি বিদায় নিয়ে সেদিন চলে এসেছিলাম। এরপর যতবার তাঁর কাছে গেছি, আমি একাই গেছি।

আর একটি ঘটনা। ফর্‌রুখ ভাই অফিসেও আসেন না, বেতনও নেন না। খবর পেলাম, ফররুখ ভাই ভীষণ আর্থিক অসুবিধার মধ্যে আছেন। তখন বেতারের মহাপরিচালক ছিলেন এম. আর. আখতার মুকুল। তিনি ফর্‌রুখ ভাইকে অফিসে আসার জন্যে ব্যক্তিগতভাবে চিঠি লিখলেন। ফর্‌রুখ ভাই মহাপরিচালকের পরিদপ্তরে এলেন মুকুল ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে। সেই আগের মত তাঁর পরনে পাজামা-শেরওয়ানী, মাথায় জিন্নাহ্ ক্যাপ। কথায় কথায় মুকুল ভাই ফর্‌রুখ ভাইকে বাংলাদেশের ওপর অন্তত একটি গান লেখার অনুরোধ করলেন। উত্তরে ফররুখ ভাই বললেন, "মুকুল, তুই আমাকে এ অনুরোধ আর করিস না। আমার এখন লেখার মত

www.pathagar.com

মানসিকতা নেই।" মুকুল ভাই ফর্‌রুখ ভাইয়ের বকেয়া বেতনসহ নিয়মিত বেতন পাবার সমস্ত ব্যবস্থা নিজে উদ্যোগী হয়ে করে দিয়েছিলেন।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের মত এমন সৎ, নীতিবান ও নির্ভীক স্পষ্টভাষী কবি আমি আর আমার জীবনে দ্বিতীয় দেখি নি। তাঁর কথা স্মরণ হলেই শ্রদ্ধায় মন-প্রাণ আপ্লুত হয়। তাঁর সঙ্গে আমার রাজনৈতিক আদর্শের ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি ছিলেন আমার একজন প্রকৃত হিতৈষী। অত্যন্ত আপনজন।

ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় ১৯৬৪ সালে এক সাহিত্য মজলিসে। ঐ মজলিসে দেশের ওপর আমি একটি কবিতা পড়েছিলাম। কবিতাটির নাম ছিল 'জায়নামাজ'। কবিতায় দেশের জমিনকে জায়নামাজের মত পবিত্র করা হয়েছে। মজলিস শেষ হবার পর ফর্‌রুখ ভাই আমাকে ডেকে নিলেন। আমি কোথায় থাকি জিজ্ঞেস করলেন। আমি তখন বাংলা মটর এলাকায় থাকি। বললেন, "চল্ আমার সঙ্গে। রিক্সা নিয়ে কি হবে, চল হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে বলতে যাই।" সেদিন ফর্‌রুখ ভাই আমার কবিতার প্রশংসা করে বললেন, "তোর কবিতায় ঐতিহ্যগত চেতনা দেখে আমার খুব ভালো লেগেছে। লেখ, লিখে যা, এই তো লেখার সময়।" আরো বললেন পুঁথি সাহিত্যের কথা। পুঁথির কাহিনী ও ঐতিহ্য নিয়ে আমাকেও লেখার চেষ্টা করতে বললেন। পরামর্শ দিলেন 'গাজী কালু চম্পাবতী' নিয়ে কাহিনী-কাব্য রচনা করার। সেই সঙ্গে সাবধান করে দিলেন গদ্যছন্দে না লেখার জন্যে। বললেন, "যে ভাবে গদ্যছন্দে কবিতা লেখা হচ্ছে ইদানীং কালে ; ভবিষ্যতে দেখে নিস এসব কবিতার পাঠক পাওয়াই মুশকিল হবে। যারা কবিতা লিখছেন, তারাই কেবল কবিতা পড়বে। অগণিত সাধারণ পাঠকের কাছ থেকে কবিতা হবে নির্বাসিত। কবি ও কবিতার প্রতি আগ্রহ ও কৌতূহল মানুষের মন থেকে উঠে যাবে। কবিতা মানেই মানুষের মনের ছন্দোবদ্ধ কথা, ভাবনার কথা। কবিতা পড়তে গিয়ে যদি বারবার থামতে হয়, কবিতা বুঝতে গিয়ে যদি অভিধান খুলে বসতে হয়, সে কবিতা লোকে পড়বে কেন বল?" আরো অনেক অনেক কথা বলেছিলেন, আজ আর সে সব কথা মনে নেই। কিন্তু তাঁর কথা আমি রাখতে পারি নি। আমি তাঁর পরামর্শ মত পুঁথিসাহিত্য নিয়ে এখন পর্যন্ত কোন কাব্যই রচনা করতে পারি নি। এমন কি কবিতাও দু'একটি যা লিখছি, মিল না দিতে পেরে গদ্য-রীতিতেই রচনা করছি। যদিও ফররুখ ভাইয়ের পরামর্শের কথা ভুলে যাব, একথা কখনো কল্পনাও করতে পারি না।

ফর্‌রুখ ভাই একদিন "মাহে-নও" অফিসে এলেন। আমি তখন "মাহে-নও"তে চাকরী করি। আমি তাঁর একটি কবিতার পারিশ্রমিক নেবার কথা বলতেই তিনি বললেন, "আমার কবিতা তোরা যদি ছাপিস তো বিনা পারিশ্রমিকেই ছাপবি, না হলে ছাপিস না। এই দু'একটি কবিতার টাকার হিসাব আমার পক্ষে রাখা সম্ভব না। তোরাও ঠিকমত

www.pathagar.com

দিতে পারিস না বছরের হিসাব। এদিকে আমার আয়করের হিসাব সঠিক হয় না।" 'আমি তো অবাক—ফররুখ ভাই এ কি বলছেন। এমন মানুষ এখনো দুনিয়াতে আছেন? আয়করের হিসাব সঠিক হচ্ছে না সন্দেহে তিনি তাঁর পাওনা টাকাও গ্রহণ করতে নারাজ। এমনি বিস্ময়কর সৎ ব্যক্তি ছিলেন তিনি।

তখন ১৯৬৫ সাল। ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ চলছে। সেপ্টেম্বর মাস। ফর্‌রুখ ভাই আমাকে খবর পাঠালেন বেতারে দেখা করতে। আমি বেতার ভবনে গিয়ে ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করলাম। ফর্‌রুখ ভাই আমাকে নিয়ে তৎকালীন রেডিও পাকিস্তান ঢাকা-কেন্দ্রের আঞ্চলিক পরিচালক সৈয়দ জিল্লুর রহমান সাহেবের কক্ষে নিয়ে গেলেন। বললেন, "এই ছেলেটির লেখার হাত খুব ভালো। একে দিয়ে কিছু কাজ করানো যেতে পারে।" আমি রেডিওতে অনিয়মিত লেখকের কাজ পেয়ে গেলাম। আমি প্রথমেই 'মৃত্যু এ নয় জীবনের উদ্বোধন' শিরোনামে যে গীতি নক্‌শটি রচনা করেছিলাম, তা ফর্‌রুখ ভাই খুব পছন্দ করেছিলেন। গীতি-নকশাটি সেই সময়ে প্রচুর জনপ্রিয়তাও অর্জন করেছিল। পরবর্তীতে এই রচনাটির কথা বলে ফর্‌রুখ ভাই আমাকে অনেকের সঙ্গে পরিচয়ও করিয়ে দিতেন।

১৯৬৬ সালে বেতারের বেতার প্রকাশনা দপ্তরে আমি নিয়মিত চাকরী নিলাম। ফর্‌রুখ ভাই প্রায়ই তখন আমার কক্ষে আসতেন এবং চা খেতেন ও কিছু সময় কাটিয়ে যেতেন। এমনি একদিন এলেন এবং বসেই বললেন, "চা খাওয়া। এবারের 'পাকিস্তানী খবর'-এ তোর ছড়াটি ভারী সুন্দর হয়েছে। সব সময় এ রকমই লিখবি। এই যে, তোকে আমার একটি বই দিলাম।" হাতে নিয়ে মোড়ক খুলে দেখি ফররুখ ভাইয়ের সদ্য-প্রকাশিত শিশুতোষ বই 'পাখীর বাসা'। বইয়ের প্রচ্ছদ ওল্টাতেই চোখে পড়লো, "কবি ফজল-এ-খোদাকে—ফররুখ আহমদ।" আর সেই তখন থেকেই আমি যেন কবি হয়ে গেলাম। বাংলা সাহিত্যের নির্মাতাদের একজন ফররুখ আহমদ যাকে কবি বলেছেন, সে 'কবি' না হয়েই পারে না। ফররুখ আহমদ ফররুখ আহমদই ; তাঁর তুলনা তিনি নিজেই—কি কবিতায়, কি ব্যক্তিত্বে, কি মানবিকতায়।

আর একদিন ফররুখ ভাই আমার দপ্তর কক্ষে এই কেবল এসে বসেছেন আর অমনি দু'তিন জন তরুণ সালাম দিয়ে তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো। তাদের বক্তব্য—তারা একটি সাহিত্যসভা করছে এবং সেই সভায় ফর্‌রুখ ভাইকে প্রধান অতিথি হিসেবে পেতে চায়। কিন্তু আশ্চর্য ব্যাপার, কিছুতেই তিনি রাজী হলেন না, ছেলেরা ভীষণ অসন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল। পরে ফররুখ ভাই আমাকে বললেন, "ও কাজের জন্যে এক রকম নামী দামী লোকই থাকে। তাদেরই ওসব অতিথি-টতিথিগিরি মানায়। বানিয়ে বানিয়ে যতসব মিথ্যে কথা বলা আমার আসে না। তুই ওদের হয়ে আমাকে অনুরোধ

www.pathagar.com

করছিলি কেন বল তো ? এ রকম আর কখনো করবি না।" আমি মনে মনে ভাবলাম, ওরে বাপরে, আগে এমন জানলে কি কখনো অনুরোধ করতাম ?

তখন অফিস ছিল সকাল সাড়ে সাতটা থেকে দুপুর দু'টো। কিন্তু পত্রিকা (তৎকালীন পাক্ষিক বেতার পত্রিকা "এলান") প্রকাশের দু'একদিন আগে কাজের চাপ এত বেশী থাকত যে, অফিস থেকে বেরুতে বেরুতে অনেকদিন রাতও হয়ে যেত। এমনি একদিন অফিস থেকে বিলম্বে বেরুচ্ছি, সামনেই দেখি ফর্‌রুখ ভাইও বেতার ভবনের প্রধান ফটকের দিকে যাচ্ছেন। ভাবলাম, এমন অসময়ে তো ফর্‌রুখ ভাই কখনো অফিসে আসেন না। কৌতূহল হতেই আমি পেছন থেকে ডাকলাম। তিনি ফিরে দাঁড়ালেন। আমাকে কোন প্রশ্ন করতে না দিয়েই তিনি জানালেন, অনুষ্ঠানের ব্যাপারে অফিসে একটা সভা ছিল। ফটক দিয়ে বাইরে আসতে আসতে জিজ্ঞেস করলেন, "কি রে, এখন প্রেসে না বাসায় যাবি ?" আমি বললাম, "বাসায়।" তিনি বললেন, "এ অবেলায় বাসায় গিয়ে কি করবি এখন ? চল, দু'জনে বরং ওদিক দিয়ে একটু হেঁটে আসি।" আর দ্বিরুক্তি না করে ফর্‌রুখ ভাইয়ের পাশাপাশি হাঁটতে লাগলাম। প্রথমেই তিনি আমার মা-ভাই-বোন বৌ-বাচ্চার খবর নিতে শুরু করলেন। আমরা আর্ট কলেজ ও পাবলিক লাইব্রেরী ডানে রেখে তখনকার রেসকোর্সের পাশ দিয়ে হাঁটছি। ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রের মোড়টি ছাড়িয়ে কেবল বাংলা একাডেমীর দিকে মুখ করেছি, এমন সময় একটি লোক সালাম দিয়ে ফর্‌রুখ ভাইয়ের মুখোমুখি এসে আমাদের গতিরোধ করে দাঁড়ালো। আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। লোকটিকে কেমন যেন উদভ্রান্ত মনে হোল আমার। গায়ে ছেঁড়া ময়লা গেঞ্জী, পরনে আরো অধিক ময়লা লুঙ্গী। মুখে কাঁচা-পাকা দাড়ি, মাথায় তেলহীন খাটো চুল, বাঁ হাতে ধরা কোলের কাছে একটা ছোট্ট পুঁটলি। কিন্তু লোকটির শরীরটা বড় আঁটো-সাঁটো। দৃষ্টিতে কোন চালাকি নেই, একেবারে সাদা। দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, তিনি একজন গ্রামের লোক এবং কোন কারণে শহরে এসেছেন। লোকটির কথায় জানা গেল, আমাদের ধারণা মিথ্যে নয়। তার বাড়ী মানিকগঞ্জের কোন এক গ্রামে। ঢাকায় করোগেট টিন সস্তা জেনে কিনতে এসেছিলেন। বাস থেকে নামার পর একজন লোক গায়ে পড়ে আলাপ করে। লোকটি তাঁকে একটি বিড়ি খেতে দেয়। তারপর তিনি আর কিছুই জানেন না। যখন তাঁর জ্ঞান ফিরলো, তখন তিনি দেখেন তাঁর কোমরে যে টাকা ছিল তা সবি খোয়া গেছে। লোকটির একটা বর্ণনা দিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, লোকটিকে আমরা চিনি কি না। তিনি সেই গতকাল দুপুর থেকে লোকটিকে খুঁজছেন। কিন্তু কেউ তাকে চেনে না। তিনি এখন পর্যন্ত কিছু খাননি। ফর্‌রুখ ভাই খুব মনোযোগ দিয়ে লোকটির কথা শুনলেন। এবং লোকটিকে বোঝাতে চাইলেন, সোজা মানুষ পেয়ে সেই অচেনা লোকটি তাঁকে বেকায়দায় ফেলে সব টাকা আত্মসাৎ করেছে। লোকটি হাউমাউ করে কেঁদে উঠে

www.pathagar.com

যা বললেন, তার মর্মার্থ হল এই যে, তিনি যখন ঢাকায় টিন কিনতে আসবেন ঠিক করেছেন, তখন তাঁর এক দূর সম্পর্কীয় আত্মীয় তাঁকে বলেছিল, শহরের লোক ভালো না। শহরে গেলে তাঁর মত লোক ঠগের পাল্লায় পড়তে পারে। কিন্তু তাঁর ধারণা ছিল, শহরের সব লোক শিক্ষিত। তারা কেন ঠগ হতে যাবে? ইত্যাদি ইত্যাদি। ফর্‌রুখ ভাই তাঁকে বোঝালেন, শহরের সব লোক যেমন শিক্ষিত নয় তেমনি সব শিক্ষিত লোকও ভালো নয়। তিনি তাঁর পকেট থেকে কিছু টাকা বের করে লোকটির হাতে দিয়ে বললেন, "আমি তো আপনাকে আর টিন কেনার টাকা দিতে পারব না, আপনি এই টাকা নিয়ে কোন হোটেলে গিয়ে আগে কিছু খেয়ে নিন। তারপর লঞ্চ বা বাস ধরে বাড়ী চলে যান। পরে আবার টাকা সংগ্রহ করতে পারলে টিন কিনে নেবেন।" লোকটি টাকা হাতে পেয়ে প্রথমে হতভম্ভ হয়ে উদাস চোখে ফর্‌রুখ ভাইকে পা থেকে মাথা পর্যন্ত বারবার কয়েকবার দেখলেন। তারপর হঠাৎ ফর্‌রুখ ভাইয়ের হাত দু'টি চেপে ধরে বললেন, "আপনার মত মানুষও শহরে আছে। আপনি মানুষ না, আপনি ফেরেশতা।"

ফর্‌রুখ ভাই মিথ্যে কথা একদম সহ্য করতে পারতেন না, যদি কখনো তিনি বুঝতে পারতেন কেউ তাঁর সঙ্গে মিথ্যা বলেছে। তাহ'লে তিনি যেমন মর্মাহত হতেন, তেমনি সেই মিথ্যুককে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। বেতারের একজন বিশিষ্ট কর্মী, যাঁর সঙ্গে ফর্‌রুখ ভাইয়ের খুবই হৃদ্যতা ছিল বলে সবাই জানেন, (এখানে সেই বেতার কর্মীর নাম ইচ্ছে করেই উল্লেখ করলাম না—কেননা, সেই কর্মী এখন মৃত) আমাকে জড়িয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে মিথ্যে রিপোর্ট দিলে ফররুখ ভাই এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি সরাসরি তাঁর কাছে সে-কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার তো করলেনই, এমন কি তিনি এর বিন্দু-বিসর্গও জানেন না বলে জানালেন। কিন্তু ফররুখ ভাই পরবর্তীতে যখন জানলেন ঘটনা দিবালোকের মত সত্যি, তখন ঐ ব্যক্তিকে তিনি নর্দমার কীটের সঙ্গে তুলনা করে গালমন্দ করলেন। আর বহুদিন পর্যন্ত তার ছায়াও তিনি মাড়ালেন না। তিনি প্রায়ই বলতেন, "মিথ্যুক ব্যক্তি হচ্ছে পশুর চেয়েও অধম। চোখে-মুখে যারা এমন মিথ্যে কথা বলে, তারা দুনিয়া ও আখেরাত দু-জায়গাতেই অভিশপ্ত। এ সমস্ত লোকের সঙ্গে মেলামেশা মানেই শয়তানের সঙ্গে দোস্তী করা।" তিনি কখনো মিথ্যাচার করেছেন, এমন কথা তাঁর মহাশত্রুও বলতে পারবে না।

ফররুখ ভাই ইন্তেকাল করেছেন। এই খবর ছড়িয়ে পড়া মাত্রই কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, গুণগ্রাহী, গুণীজনেরা ছাড়াও অগণিত সাধারণ মানুষ এমন কি মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই তাঁকে এক নজর দেখার জন্যে তাঁর ইস্কাটন গার্ডেন রোডের বাড়ীতে ভীড় জমিয়েছেন। লোকে লোকারণ্য। প্রশ্ন দেখা দিল কবিকে কোথায় কবর দেয়া হবে। এ ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করলেন প্রখ্যাত সাংবাদিক মরহুম মুহম্মদ আসফউদ্দৌলা রেজা। তিনি চেষ্টা করলেন, সরকারীভাবে কোন বিশেষ স্থানে কবির

www.pathagar.com

সমাধির ব্যবস্থা করা যায় কি না? কিন্তু সরকারী সিদ্ধান্ত পেতে বিলম্ব হচ্ছে দেখে কবির অগ্রজ সাহিত্যিক, কবি ও পৃষ্ঠপোষক বেনজীর আহমদ উপস্থিত সবার কাছে প্রস্তাব দিলেন—যদি কারো আপত্তি না থাকে, বিশেষ করে যদি কবির পত্নী অনুমতি দেন, তাহ'লে তিনি তাঁর ভাই ফররুখ আহমদকে তাঁর শাহজাহানপুরের পারিবারিক গোরস্তানে দাফন করতে নিয়ে যেতে পারেন। এবং যেখানে তিনি তাঁর নিজের কবরের জন্যে স্থান নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, ঠিক তার পাশেই কবি ফররুখ আহমদের কবরের স্থান করে দেবেন। আরো বললেন, 'ফর্‌রুখের বন্ধুত্বের দাবী নিয়েই আমি এ প্রস্তাব দিচ্ছি।' কবির সমাধিস্থানের সমস্যা এত সহজে সমাধান হয়ে যাওয়ায় উপস্থিত সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে প্রকৃতিস্থ হলেন।

এদিকে কবিকে গোসল দিয়ে কাফনের আয়োজন চলছে। হঠাৎ একটা চঞ্চল উত্তেজনা সবার মধ্যে লক্ষ্য করা গেল। খবর নিয়ে জানা গেল, কাফনের সব কিছু আনা হয়েছে কিন্তু আতর আনার কথা কারো মনে ছিল না। আবার ব্যস্ততা, আবার অস্থিরতা। এমন সময় একজন আতরের একটি ছোট্ট শিশি এনে বললো, "এই যে আতর। মক্কা থেকে কবির এক গুণগ্রাহী ভক্ত কবিকে পাঠিয়েছেন।" কিন্তু সুদূর মক্কা থেকে কে এই আতর বয়ে নিয়ে এল? আর কেই বা তাঁর জন্যে আতর পাঠালো? খবর নিয়ে জানা গেল, একজন সফেদ 'শ্মশ্রুমণ্ডিত সাদা আলখেল্লা পরিহিত দরবেশের মত মানুষ এখানে এসে কবি ফররুখ আহমদের খোঁজ করছিলেন। তিনি যা বলেছেন তার মর্মার্থ হল, তিনি যখন মক্কায় গিয়েছিলেন তখন কবির একজন ভক্ত তাঁকে এই আতরের শিশিটি কবিকে নিজ হাতে পৌঁছে দেবার অনুরোধ করেছিলেন। তাঁরও কবির সঙ্গে পরিচিত হবার আগ্রহ ছিল বহুদিন থেকে। তাই এই আতরের কল্যাণে তিনিও কবির সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পাবেন ভেবে আতরের শিশিটি অতি আনন্দের সঙ্গেই বহন করে এনেছেন। কিন্তু নানা রকম ব্যস্ততায় এতদিন তাঁর পক্ষে এই আতর আর কবিকে পৌঁছানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। আজ তিনি কবির কাছে সেই আতর পৌঁছুতে পেরে বড় আনন্দিত বোধ করছেন।

কিন্তু কবির জানাজার পর যখন সেই আতর বহনকারীর খোঁজ করা হল, তখন আর তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। এমন কি যিনি আতরের শিশিটি এনে বলেছিলেন 'এই যে আতর' তাঁকেও আর সেই হাজার লোকের ভীড়ে সনাক্ত করা সম্ভব হয় নি। কবির কোন্ এমন ভক্ত মক্কায় ছিলেন, যিনি শুধু শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ এই ছোট্ট এক শিশি আতর পাঠিয়েছিলেন? তিনি কে? আর তিনিই বা কে, যিনি ঠিক কবির কাফনের সময়েই সেই আতর নিয়ে হাজির হয়েছিলেন? কারা তাঁরা? না, সে পরিচয়ের আজ আর প্রয়োজন নেই।

www.pathagar.com

ফখ্‌রুজ্জামান চৌধুরী

আকাশের শাহীন তিনি

জীবনের অনেক আঁধার পর্দা অসাধারণ চারিত্রিক দার্ঢ্যের সঙ্গে উন্নতশিরে পার করেছেন যে ব্যক্তিটি, তিনি আমাদের কাব্য জগতের প্রবাদ-পুরুষ কবি ফর্‌রুখ আহমদ। যাঁরা তাঁর সংস্পর্শে এসেছেন, তাঁরা জানেন, কী দৃঢ় চরিত্রের অধিকারী ছিলেন এই মানুষটি! আদর্শের কারণে, শুধু আদর্শের কারণে এমনভাবে কষ্ট পেতে খুব কম লোককেই দেখা যায়, আজকের সুবিধাবাদের এই যুগে।

আমরা মানুষকে বিচার করি খণ্ডিত রূপে, তাৎক্ষণিকভাবে। মার্কিন কবি ওয়ালেস স্টিভেনসের সুখপাঠ্য একটি কবিতার নাম 'লাইন ওয়েজ অফ লুকিং এ্যাট এ নাইটিঙ্গেল।'

কবিতাটির বক্তব্য হলো, একটি বুলবুলিকে নয়টি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা সম্ভব। এবং সব ক'টি দৃষ্টিকোণই সুষমামণ্ডিত। বলা বাহুল্য, এই কবি-কল্পনায় একটি জিনিসকে বহুভাবেই দেখা সম্ভব। কিন্তু যারা সৌন্দর্য বিশ্লেষণ না করে নিজের প্রয়োজনে কোনো ব্যক্তির বিচার-বিশ্লেষণ করেন, তারা অনেকটা ময়ূরের সৌন্দর্য না দেখে তার পা দেখার মতো কাণ্ড করেন।

এই জাতীয় বিচার হরহামেশাই হচ্ছে এবং এতে বিচার্যের উপকার কতটুকু হয় জানি না। তবে বিচারক যে বিচারের ফায়দা পুরোপুরি লাভ করে তা বলা যায়।

কবি ফর্‌রুখ আহমদ যে আমাদের কাব্য জগতের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক ছিলেন এই সত্য আজ তর্কের ঊর্ধ্বে।

তাঁকে আমরা জানি ইসলামী রেনেসাঁসের একজন মহান কবি হিসেবে। তাঁর কবিতায় ইসলামের অতীত গৌরব, ঐশ্বর্য আর সৌকর্যের অনুষঙ্গ ফিরে এসেছে বারবার। এ কারণে অবশ্য তিনি ইতিহাসবেত্তা হয়ে যান নি, কবি-ই রয়ে গেছেন। কবি নজরুল ইসলামের পর ইসলামী গৌরবগাঁথার সবচেয়ে কৃতী রূপকার ছিলেন ফর্‌রুখ আহমদ।

এবং আশ্চর্য ক্ষোভের ব্যাপার, ফর্‌রুখ আহমদের ইসলামী ঐতিহ্য সচেতনতা আমাদের কোনো কোনো তথাকথিত প্রগতিবাদীর চোখে প্রতিক্রিয়াশীল বলে ধরা

www.pathagar.com

পড়েছে। এই সব সুবিধাবাদীরা আবার উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করেছেন টি. এস. এলিয়টের খৃস্টধর্ম সচেতনতার।

কবি ফর্‌রুখ আহমদ ছিলেন মানবতাবাদের একজন সুমহান প্রবক্তা। তিনি ছিলেন জালেমের বিরুদ্ধে একজন আপোসহীন সংগ্রামী। মজলুমদের পক্ষে তাঁর লেখনী থেকে বের হয়েছে অগ্নিক্ষরা পঙক্তি।

কাব্য জীবনের প্রথম পর্বে তিনি লিখেছেন 'লাশ' নামক অনবদ্য প্রতিবাদী কবিতা—যার পটভূমি ছিলো মানুষের তৈরী চল্লিশের মন্বন্তর।

প্রকৃতিগতভাবেই তিনি ছিলেন প্রতিবাদী। প্রতিবাদের ভাষা ছিলো তাঁর নিষ্কম্প। তাঁর প্রতিবাদী কণ্ঠ শোনা গেছে ১৯৫২-তে, ১৯৬৮-তে। তাঁর এই প্রতিবাদী চরিত্রের কথা মহাকাল মনে রাখলেও রাখে নি তাঁর সুবিধাবাদী প্রতিপক্ষের দল। সেই কারণে স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশে তাঁর জীবনে নেমে এসেছিলো চরম লাঞ্ছনা, তাঁর মতো একজন কবির জন্যে অত্যন্ত অকিঞ্চিৎকর চাকরিটির ওপর এসেছিলো হামলা। কিন্তু কবি মাথা নত করেন নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষ পরাজিত হতে পারে, কিন্তু মানুষের আত্মার ধ্বংস নেই। যদি তিনি সেদিন নতি স্বীকার করতেন, চাকরি ইত্যাদি জাগতিক সব সুযোগ-সুবিধা ফিরে পেতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেন নি। বরং শামুকের মতো নিজের মধ্যে নিজে গুটিয়ে রইলেন। ইস্কাটনের সরকারী বাড়ীটিতে স্বেচ্ছায় নির্বাসন বেছে নিলেন কবি।

বহুদিন পরে আজ এ কথা স্মরণ করতেও আনন্দ হয় যে, লাঞ্ছিত কবিকে নিয়ে যখন একশ্রেণীর লোক উৎকট উল্লাসে মেতেছিলো, তখন একজন বিবেকী, তেজিয়ান তরুণ কবি ফর্‌রুখের পক্ষে তাঁর শাণিত কলম ব্যবহার করছিলেন। না, তার চেয়ে বরং বলা শোভন, আদর্শের দুর্ভিক্ষের যুগে তরুণ লেখক একজন ভিন্ন মতাবলম্বী অথচ আদর্শে গরীয়ান মানুষের পক্ষে কথা বলেছিলেন।

কবি ফর্‌রুখ আহমদের ব্যক্তিগত সাহচর্যে যাঁরা আসতে পেরেছিলেন, তাঁরা জানেন, দীর্ঘ উন্নতনাসা, উজ্জ্বল চোখের অধিকারী এক অসাধারণ মানুষ ছিলেন তিনি।

তিনি ছিলেন তৎকালীন রেডিও পাকিস্তানের, ঢাকা স্টেশনের ক্যান্টিনের আড্ডার মধ্যমণি। বর্তমান জাতীয় সম্প্রচার ভবনে উঠে আসবার আগে রেডিও বাংলাদেশের দফতর ছিলো শাহবাগ এ্যাভেন্যুর বেতার ভবনে। ষাটের দশকে শাহবাগ এ্যাভেন্যুর বেতার ভবনে রেডিও অফিস স্থানান্তরিত হয়েছিলো নাজিমুদ্দীন রোডের লাল রঙের বিল্ডিং থেকে। এই দোতলা বাড়ীতে শুরু হয়েছিলো অল ইণ্ডিয়া রেডিওর ঢাকা স্টেশনের অনুষ্ঠান প্রচারের কাজ। ১৯৪৭-এ ভারত বিভক্তির পর এই লাল রঙের বাড়ীতেই শুরু হয়েছিলো রেডিও পাকিস্তানের ঢাকা স্টেশনের কাজ।

www.pathagar.com

লাল রঙের বাড়ীটির উল্টো দিকে একতলা লম্বাটে দালানের ছোটো পরিসরের একটি ঘরে ছিলো একটি ক্যান্টিন। লোকমুখে যার নাম ছিলো আবন মিয়ার ক্যান্টিন। তখন ছিলো না অফিসের আড়ম্বর, ছিলো না ক্যান্টিনের আসবাবপত্রের জৌলুস। টেবিল আর লম্বা টুলের আসবাবপত্র ছিলো ক্যান্টিনে। এই আবন মিয়ার ক্যান্টিনে তখন জমজমাট আড্ডা জমতো সাহিত্যিক, সঙ্গীত শিল্পী, সাংবাদিক এবং আরো অনেকের। অবিন্যস্ত সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী পরিহিত উজ্জ্বল শ্যাম বর্ণের মানুষ কবি ফর্‌রুখ আহমদের দরাজ কণ্ঠস্বরে গমগম করতো ক্যান্টিনের ছোটো ঘরটি। তাঁর প্রাণখোলা হাসি এখনো যেন কানে বাজে।

মনে পড়ছে একবারের কথা। সন তারিখ মনে নেই। আফ্রো-এশীয় লেখক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে সোভিয়েট রাশিয়ার তাশখন্দ শহরে। ফর্‌রুখ ভাইয়েরও সেই সম্মেলনে যাওয়ার কথা ছিলো। কিন্তু লাইন দিয়ে, তদবির করে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না তিনি। যারা ঐ ধরনের কাজে পটু, তাঁদেরকে নিয়ে প্রতিনিধি দল তৈরী হলো। ধুম পড়ে গেলো স্যুট-বুট কেনার। সম্মেলন হওয়ার কথা ছিলো শীতকালে। মধ্য এশিয়ার শীতের কথা ভেবে অনেকেই প্রতিনিধিদলের সদস্যদেরকে পরামর্শ দিলেন, ভারী ওভারকোট সঙ্গে নিয়ে যেতে ঃ রেস্তের জোর যাদের ছিলো তাঁরা তাড়াহুড়া করে নতুন ওভারকোট তৈরি করলেন। কেউ কেউ কিনলেন তখনকার ভিকটোরিয়া পার্কের পুরোনো কাপড়ের একমাত্র বাজার থেকে।

সব প্রস্তুতি যখন সম্পন্ন, তখন হঠাৎ খবর এলো, তাশখন্দে প্রতিনিধি দলের যাওয়া হচ্ছে না। আশাভঙ্গের বেদনায় নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ মুষড়ে পড়লেন। যারা নির্বাচিত হন নি, তাদের মনে এক ধরনের আনন্দ।

একজন ফর্‌রুখ ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, "ব্যাপারটা কেমন হলো?"

ফররুখ ভাই হেসে বললেন, "কি আর হবে। অন্য সময় যাওয়ার সুযোগ নিশ্চয়ই হবে।"

আসলে যিনি এই প্রসঙ্গের অবতারণা করেছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো ফর্‌রুখ ভাইকে উসকে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে রসময় কোনো মন্তব্য আদায় করা। বললেন, 'তা না হয় হবে। কিন্তু ওভারকোটের কি হবে! আমাদের দেশের শীতে ঐ জবরদস্ত ওভারকোট কি পরা যায়।"

হো হো করে হাসলেন কবি। বললেন, "সমস্যা কি! শীতের ভোর রাতে ওভারকোট পরে ছাদে বসে মাথায় মোমবাতি জ্বালিয়ে গান গাইলেই হবে ঃ 'আকাশ-প্রদীপ হয়ে জ্বলবো!" (তখন ঐ গানটি মাত্র বাজারে বের হয়েছে এবং প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে।)

ফর্‌রুখ ভাইয়ের এই তাৎক্ষণিক রসিকতায় সবাই হো হো করে হেসে উঠলেন। লক্ষ্য করলাম, যাঁরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের মধ্যে একজন ছিলেন প্রতিনিধি দলের অন্যতম সদস্য। তিনিও ফর্‌রুখ ভাইয়ের এই রসিকতায় না হেসে পারলেন না।

www.pathagar.com

অনেকে ফর্‌রুখ ভাইকে বড় কঠিন মানুষ বলে ভাবতেন। কিন্তু যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁরা জানেন, কী সুন্দর একটি রসিক মনের অধিকারী ছিলেন তিনি।

একবার ওপরওয়ালা হুকুম জারি করেছিলেন রেডিওর অধিকারিক, শিল্পী নির্বিশেষে সবাইকে টাই পরতে হবে। বিপদে পড়েছিলেন ফর্‌রুখ ভাই। গরমের দিনে পাজামা-পাঞ্জাবী এবং শীতকালে পাঞ্জাবীর ওপর শেরোয়ানি এই ছিলো তাঁর লেবাস। পাঞ্জাবীর সঙ্গে টাই পরেন কি করে! টাই সম্পর্কিত ফর্‌রুখ ভাইয়ের রসিকতা তখনকার দিনে অনেকের মুখে মুখে ফিরেছে।

ফর্‌রুখ ভাই একবার বলেছিলেন, "বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি হলেন মাইকেল মধুসূদন। রবীন্দ্রনাথ, নজরুল নন, মধুসূদন।"

"মাইকেল এবং তাঁর জন্মস্থান যশোরে বলে কি?" জিজ্ঞেস করেছিলেন কেউ।

তিনি উচ্চকণ্ঠে হেসে বলেছিলেন, "না। মধুসূদনের মতো কাব্য এবং জীবনে এমন বিদ্রোহী স্বভাবের মানুষ বাংলা কাব্যে দ্বিতীয় জন নেই।"

অমিত তেজের এই মানুষটি প্রতিকূল পরিবেশের সঙ্গে আপোসহীন সংগ্রাম করে যেদিন চিরবিদায় নিলেন—উত্তাল সাগরে সঙ্গীহীন সিন্দাবাদের মতো, সেদিন অনেকে জমায়েত হয়েছিলেন তাঁর প্রাণহীন দেহের পাশে। শোক প্রকাশের প্রতিযোগিতা হয়েছিলো। তাঁর সুহৃদ কবি বেনজীর আহমদ কবির লাশ সমাহিত করার জন্যে নিজের পারিবারিক গোরস্তানে এক টুকরো জায়গা দিয়েছিলেন। এই সব ঘটনা আজ ইতিহাসের বিষয়।

কবি ফর্‌রুখ আহমদ স্বনামে-বেনামে অনেক কবিতা লিখেছেন। 'হায়াত দরাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে লেখা তাঁর স্যাটায়ারধর্মী কবিতাগুলোয় কী তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ আর রসিকতার সংমিশ্রণ ঘটেছে, তা পাঠক মাত্রই জানেন।

কবি ফররুখ আহমদের প্রিয় প্রসঙ্গ ছিলো শাহীন। শাহীন ছিলো তাঁর কাছে স্বাধীনতা ও সাহসিকতায় প্রতীক বিশেষ।

শাহীন শক্তসুঠাম পাখায় ভর করে নীল আকাশে উড়ে বেড়ায়। মাটির পৃথিবীর মলিনতা তাকে স্পর্শ করতে পারে না।

শাহীন ঊর্ধ্বলোক থেকে পৃথিবীকে দেখে। অত ওপর থেকে দেখে বলে পৃথিবীর মলিনতা তার চোখে পড়ে না।

ফররুখ ভাইও ছিলেন শাহীনের মতো ঊর্ধ্বলোকের বাসিন্দা। তিনিও ছিলেন জাগতিক কালিমার অনেক ঊর্ধ্বে।

তাঁর চিত্তের ঔদার্যের একমাত্র সীমা ছিলো আকাশ আর তিনি স্বপ্ন দেখতেন সিতারার ওপারের এক জগতের।

www.pathagar.com

মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান

শেষ মুহূর্ত

সময়টা ছিল চুয়াত্তরের রমযান মাস। সম্ভবত একুশ রমযান বিকেল বেলার কথা। আমি ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম তাঁর ইস্কাটন গার্ডেনের সরকারী বাসায়। ফর্‌রুখ ভাইয়ের সঙ্গে সপ্তাহে অন্তত একবার দেখা করার ব্যাপারে তাঁর ও আমার মধ্যে একটা অলিখিত চুক্তি ছিল। রমযানের শেষ দিকের নানা ব্যস্ততা সত্ত্বেও অনেকটা সেই চুক্তির তাগিদেই ছুটে গেলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে।

আমি সামনের কামরায় বসে ছেলেদের সাথে কিছু রুটিন-মাফিক আলাপ করছিলাম। খবর পেয়ে অল্পক্ষণের মধ্যেই ফর্‌রুখ ভাই ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন প্রসন্ন বদনে। হঠাৎ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আমি একটু শিউরে উঠলাম। কারণ স্বভাব-সুলভ ভঙ্গিতে তাঁর মুখে হাসি লেগে থাকলেও সে হাসির আড়ালে ছিল এক বিরাট ক্লান্তির ছাপ। মুহূর্তের জন্যে মনে হলো, ফর্‌রুখ ভাই যেন বুড়িয়ে গেছেন, বয়সটা অস্বাভাবিক রকম বেড়ে গেছে এবং গোটা শরীর জুড়ে ধ্বস নেমেছে। কিন্তু এ মনোভাবটা আমি প্রকাশ করতে পারলাম না, কোনো রকম আভাসে-ইঙ্গিতেও কিছু বলা সম্ভব হলো না। কারণ ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রশ্নে চির-উদাসীন ফর্‌রুখ ভাইয়ের কাছে এ প্রসঙ্গ উত্থাপন ছিল এক দুঃসাধ্য ব্যাপার।

তাই নিজের মনের অনুভূতি মনেই চেপে গেলাম। মুহূর্তের মধ্যে নিজকে সামলে নিয়ে যথারীতি সালাম-কালাম ও কুশল বিনিময় করলাম। ফর্‌রুখ ভাই কোনোরূপ ভনিতা না করেই তাঁর স্বভাবসুলভ ভাষায় শুরু করলেন, "আজ আপনাকে আমি খুব প্রত্যাশা করছিলাম। এসে খুব ভাল করেছেন। অনেক জরুরী কথা আছে।"

একটি কথা এখানে বলে রাখা ভাল। ফর্‌রুখ ভাই বয়সে ছিলেন আমার চাইতে ১৮-১৯ বছরের বড়। বয়সের এই বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি আমাকে কখনো তুমি বলতেন না, বরং আপনি সম্বোধনই করতেন বরাবর। বন্ধু-বান্ধব ও পরিচিত জনদের মধ্যে বয়সে জুনিয়রদের তো বটেই, অনেক সিনিয়রকে পর্যন্ত তিনি তুমি সম্বোধন করতেন অকপটে। অথচ এ ব্যাপারে তিনি আমার বেলায়ই ছিলেন ব্যতিক্রম। তাঁর আপনি সম্বোধনে আমি লজ্জায় সঙ্কুচিত হয়ে যেতাম, মাঝে মাঝে তাঁকে সম্বোধনটা

www.pathagar.com

পাল্টাতে অনুরোধ করতাম। কিন্তু কেন জানি না, তিনি ছিলেন এক্ষেত্রে একেবারে অনড়। হয়ত এ ছিল আমার প্রতি তাঁর অপরিসীম স্নেহের নিদর্শন।

যাক, ফর্‌রুখ ভাই এক নিশ্বাসে দেশের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি ও শিল্প সাহিত্য নিয়ে আলাপ শুরু করলেন। বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে অনেক বিষয়ে তিনি খোঁজ-খবর জানতে চাইলেন। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর অনেকদিন ধরে ফর্‌রুখ ভাই ছিলেন একরূপ গৃহবন্দী। তাঁর রেডিও'র চাকরীটা তো ছিনিয়ে নেয়া হয়েছিল, তদুপরি বিভিন্ন মহল থেকে আসছিল তাঁর জীবনের ওপর নানারূপ হুমকি। তাই অধিকাংশ সময় বাসাতেই আটক থাকতেন তিনি। কুরআনের বিভিন্ন নির্বাচিত অংশের কাব্যানুবাদ করে সময় কাটত তাঁর। রেডিওর চাকরীটা পাওয়ার পরও তাঁর দিন অনেকটা এভাবেই কাটছিল। কারণ চাকুরী ফেরত পেলেও অফিসে তাঁর বিশেষ কোন কাজ ছিল না। এর ফলে স্বভাবতই বাইরের দুনিয়া সম্পর্কে একটা ইনফরমেশন গ্যাপে ভুগছিলেন তিনি। নানা জনে নানা কথা নিয়ে যেত তাঁর কাছে। অনেক মুখরোচক ও চমকপ্রদ খবর শুনতেন তিনি। সব খবর তিনি জমা করে রাখতেন আমার জন্যে। সপ্তাহান্তে দেখা হলে জাম্বিল উজাড় করে সব ঢেলে দিতেন আমার সামনে। একে একে সব খবর বাছাই করে নিতেন আমার দ্বারা।

সেদিনও তিনি এ ধরনের অনেক খবর শোনালেন আমাকে। তারপর নানা বিষয়ে অনেক প্রশ্ন করলেন। এক পর্যায়ে আমপারার একটি সূরার কাব্যানুবাদও আবৃত্তি করে শোনালেন। কিছুক্ষণ পর একত্রে ইফতার করলাম। ইফতারীর সময় আয়োজিত উপাচারের দীনতার ব্যাপারে সংকোচে একটু কৈফিয়ত দিতে চাইলেন। কিন্তু মেহমান আপ্যায়নে দরাজ দিল ফর্‌রুখ ভাইয়ের তখনকার আর্থিক দৈন্যদশা আমার ভালমত জানা ছিল। তাই এ ব্যাপারে আর তাঁকে এগুতে দিলাম না। আমার মনোভাব বুঝে তিনিও আর কথা বাড়ালেন না। মাগরেবের পর চায়ের পালা সেরে আমি বিদায় চাইলাম। তিনি সপ্তাহের মধ্যেই আবার দেখা করার তাগিদ দিলেন। আমি ঈদের পরদিন দেখা করার ওয়াদা করে বিদায় নিয়ে এলাম। কিন্তু সেদিন কি ঘুণাক্ষরেও জানতাম, সে-ই হবে ফর্‌রুখ ভাইয়ের সাথে আমার শেষ দেখা। জীবনে আর কোনদিন মহীরুহের ন্যায় সুউচ্চ এই বিশাল-হৃদয় লোকটির উষ্ণ সাহচর্য আর কোন দিন আমি পাব না।

ঈদের পরদিন (১৯ অকটোবর) বিকাল বেলা আমি সস্ত্রীক ফর্‌রুখ ভাইয়ের বাসায় গেলাম। সামনের কামরার দোরগোড়ায় পা দিতেই একটি ছেলে ব্যস্তভাবে এসে খবর দিল ঃ চাচা আপনি এসে ভাল করেছেন। আব্বার শরীর খুব খারাপ। আমি কাল বিলম্ব না করে ফর্‌রুখ ভাইয়ের শোবার ঘরে ছুটে গেলাম। বিছানায় শায়িত ফর্‌রুখ ভাইয়ের দিকে নজর পড়তেই আমার অন্তরাত্মা শুকিয়ে গেল। তাঁর বাকশক্তি তখন সম্পূর্ণ রুদ্ধ,

www.pathagar.com

স্মৃতিশক্তিও লুপ্ত। গোটা শরীর যেন একটা জীবন্ত কঙ্কাল। বিছানায় শুয়ে তিনি অস্থিরভাবে এপাশ্-ওপাশ করছেন। কখনো কখনো উঠে বসার চেষ্টা করছেন। একবার তাঁকে ধরে বসিয়েও দিলাম কিছুক্ষণের জন্যে। কিন্তু কিছুতেই তিনি স্বস্তি পাচ্ছিলেন না। এক পর্যায়ে তিনি বড় বড় চোখে আমার দিকে তাকিয়ে কি যেন বলতে চাইলেন। চোখ-মুখের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হলো, হঠাৎ যেন তিনি আমার চেহারা শনাক্ত করে ফেলেছেন। তাই সাগ্রহে কিছু বলতে চাইলেন। কিন্তু না, কিছুই তিনি বলতে পারলেন না। কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই তাঁর মুখের ভাবভঙ্গি আবার পাল্টে গেল।

পরিবারের লোকদের সাথে আলাপ করে জানা গেল, রমযানের শেষ দিকে ফর্‌রুখ ভাই একরূপ না খেয়েই রোযা রাখতেন। এতে করে তাঁর দুর্বল শরীর মারাত্মক রকম ভেঙে পড়ে। ২৭ রমযানের দিকে তিনি একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। এ সময় তাঁকে বারংবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তিনি রোযা ভাঙতে অসম্মতি জানান। রোযার শেষ দিন ইফতারীর পর তিনি একদম জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সে জ্ঞান তিনি আর ফিরে পান নি। ঘরের লোকেরা সাধ্যানুযায়ী চিকিৎসার ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু অবস্থার তুলনায় তা তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।

বেলা দ্রুত গড়িয়ে যাচ্ছিল। ফর্‌রুখ ভাইয়ের জীবনপ্রদীপ ধীরে ধীরে নিভে আসছিল। তাঁর অবস্থা তখন স্পষ্টত চিকিৎসার বাইরে চলে গেছিল। তবু মানবিক কর্তব্যের তাগিদে তাঁর চিকিৎসার জন্যে ভাল ব্যবস্থা করা একটা জরুরী বিষয় হয়ে দেখা দিল। এ সময় ফররুখ ভাইয়ের ভাগ্নে ডঃ হাসান জামান বসার ঘরে প্রবেশ করলেন। ফর্‌রুখ ভাইকে হাসপাতালে স্থানান্তর সম্পর্কে তাঁর সঙ্গেও বিস্তারিত আলাপ হলো। মাগরিবের অল্প কিছুক্ষণ আগে ডঃ গোলাম মোয়াযযম ভাইয়ের শোবার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি জানালেন, " রোগীকে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে। ফলাফল ভাল মনে হলে তাঁকে হাসপাতালে স্থানান্তর করা যাবে।"

ইতিমধ্যে মাগরিবের আজান হলো। আমি এবং ডঃ জামান একত্রে নামায পড়লাম। সালাম ফিরানোর সাথে সাথে হঠাৎ ভেতর থেকে কান্নার আওয়াজ শোনা গেল। একটি ছেলে ছুটে এসে আমাদের খবর দিল, "আব্বা আর নেই।"

আমি এবং ডঃ জামান উভয়ে ছুটে গেলাম ফররুখ ভাইয়ের শোবার ঘরে। গিয়ে দেখলাম, সব শেষ। ফররুখ ভাইয়ের নিশ্চল নিথর দেহটি পড়ে আছে বিছানার উপর। তাঁর শীর্ণ পাণ্ডুর-মুখে বাঘের ন্যায় তীক্ষ্ণ চোখ দু'টি শুধু জ্বলছে জ্বলজ্বল করে।

www.pathagar.com

তিতাশ চৌধুরী

কিছু কথা কিছু স্মৃতি

"তিনি এক বিশেষ কাব্যধারার অনুসারী এবং নিজস্ব একটা আদর্শ আর ভাবকল্পে ছিলেন বিশ্বাসী, তাঁর কাব্যে এসবের প্রতিফলন অসন্দিগ্ধ। --- তাঁর বিশ্বাস আর উপলব্ধি অকৃত্রিম আর একান্ত আন্তরিক বলে, এ ধরনের ভাবাদর্শে রচিত বহু কবিতা হয়ে উঠেছে উচ্ছল ও হৃদয়স্পর্শী। অনড় বিশ্বাস আর আবেগের তোড়ে তিনি খাঁটি কবিতার সীমালংঘন করেননি।------ তাঁর সমসাময়িক কবিকুলের মধ্যে তিনি এতখানি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র ও একক ছিলেন যে, তাঁকে সহজে কাতারবন্দী করা যায় না।" এমন একজন বিশিষ্ট কবিকেই দেখার জন্যে আমার আজীবন তৃষ্ণা ছিল। স্বপ্ন ছিল।

কলেজে পড়াকালেই ফররুখ আহমদের (১৯১৮-১৯৭৪) কবিতা আমাকে দুর্বার আকর্ষণ করে। তাঁর কবিতার চিত্রকল্প, উপমা, শব্দচয়ন এবং বক্তব্যের প্রতীকী উপস্থাপনা মন কেড়ে নেয়। এ সময়েই ফর্‌রুখ আহমদ খুব বড় কবি হয়ে উঠেছেন। আসলে 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা', 'নৌফেল ও হাতেম', 'হাতেম তা'য়ী' ও 'মুহূর্তের কবিতা' প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ তাঁকে আদর্শনিষ্ঠ ও খাঁটি বড় কবির শিরোপা এনে দিয়েছিল। তিনি বাংলা কাব্যধারায় নতুন গতি ও শক্তি সঞ্চার করেছিলেন।

কবি হিসেবে ফররুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্যবোধই আমাকে স্পর্শ করেছিল স্মরণীয়ভাবে। আর সে কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিঁড়ি ডিঙিয়েও কবি ফররুখ আহমদকে ভুলতে পারি নি। তাঁকে দেখার মানসে আবার নতুন কোনো সফরের জন্যে তীব্র বাসনা জেগে ওঠে ঃ

> কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
> শুন্‌ছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
> ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
> পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক ;
> নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ।

একদিন সত্যি সত্যি বুঝি মাঝি সিন্দাবাদ আমার সঙ্গে দেখা করতে এল। ফর্‌রুখ আহমদ সম্পর্কে কিছু জানতে চাইল। মাঝি সিন্দাবাদের কণ্ঠে ছিল স্বপ্ন। ছিল থরো

www.pathagar.com

থরো আবেগ। এমন সন্ধিক্ষণে আমি হতবাক হয়ে যাই। ভেবে কুল পাই না—কি করে তা সম্ভব হল। ঘটনাটি খুলেই বলি। মাঝি সিন্দাবাদ অর্থাৎ আমার বন্ধু অধ্যাপক মুজীবুল হক ধন মিয়া (কবি নজরুল ইসলাম কলেজে তখন অধ্যাপনায় রত ছিলেন) ফর্‌রুখ আহমদ সম্পর্কে তেমন কিছু জানত না। ও কখনো ফর্‌রুখ আহমদের কবিতা-টবিতা পড়ত বলেও মনে হয় না। অথচ আশ্চর্য তুখোড় ছাত্র ছিল সে, কি কলেজ জীবনে—কি বিশ্ববিদ্যালয়ে—সর্বত্রই। চুপি চুপি বলে রাখি—আমাদের ধন মিয়া আসলে ধনবিজ্ঞানের ছাত্র। আর ছিল আশৈশব-কৈশোর ও যৌবন ইসলামী ঐতিহ্য-চেতনায় আচ্ছন্ন। যে-কোনো গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারেও সে আমার পরামর্শ চাইত সর্বদাই। তাই ফর্‌রুখ আহমদের মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ের প্রস্তাব এলেও সে দৌড়ে আমার কাছেই আসে প্রথম। আমি সানন্দে এবং কোনো বিচার-বিবেচনা ছাড়াই ওকে এ বিয়েতে মত দিতে বলি। ও প্রথমে আমার কথায় কিছুটা গাঁইগুই করছিল। অবশ্য পরে রাজি হয়ে চলে যায়।

বিয়ের দিন-তারিখ ঠিক হলে আমি ঢাকা যাই। বিয়ের আয়োজন করি। আমাদের আরেক বন্ধু ছিল ঢাকা কলেজে অধ্যাপনায় নিরত। তাঁর ইন্টারন্যাশনাল হোস্টেলের এক কামরাতেই আমরা ধন মিয়াকে বিয়ের বর সাজাই। সাজ-সজ্জাতে তেমন কোনো চাকচিক্য ছিল না ; চমকও। তার কোন উপায়ও ছিল না। আসলে ধন মিয়াকে ভালো করে সাজানোর মতো আমাদের হাতে তেমন ধন-সম্পদও ছিল না। বিয়েতে জনাপাঁচেকের মতো আমরা বরযাত্রী যাই। যদ্দূর মনে পড়ে, মুজীবুল হকের বাড়ী থেকেও কিছু লোক এসেছিল। ফর্‌রুখ আহমদ তখন ইস্কাটনের একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন।

আমরা বর নিয়ে জোহর নামায বাদ সেখানে হাযির হই। বিয়ে বাড়ী হিসেবে ফর্‌রুখ আহমদের বাসাটা তেমন সাজান হয়েছিল বলে মনে পড়ে না। মনে হয়েছিল, আমরা যেন কোনো একটা সাধারণ মজলিসে গোটা কতক মানুষ বসেছি। বিয়ের আসর বলে ঠাহর করা কঠিন। সে আসরে ফর্‌রুখ আহমদের আত্মীয়-স্বজনের তেমন ভীড় ছিল না বলেই মনে হ'ল। অন্তত কবি নিজের পরিবার-পরিজন নিয়েই পরিকীর্ণ ছিলেন। স্বজনদের মধ্যে কবি তালিম হোসেন সম্ভবত এসেছিলেন। তাও পরিচয় পর্বের পূর্বেই তিনি প্রস্থান করেন। এর হেতুটা কি ? হেতুটা এই যে, কবির কাব্য-সংসার চিত্ররূপময় ও বর্ণাঢ্য হলেও বাস্তব সংসার তেমন ছিল না। আর সেই কারণেই তিনি আদরের কন্যাকে পাত্রস্থ করতে এই পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাহলেও হবে কি? ফর্‌রুখ আহমদের চাল-চলনে এই সততা ও সংযম আমাকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিল। তাঁর কবিতার মতোই ছিল তাঁর এই সততা ও সংযম। মন ও মননে তাঁর ভণ্ডামী ছিল না, এটি আমি তখনই পরিষ্কার আঁচ করতে পেরেছিলাম।

www.pathagar.com

বিয়ের আসরে বসেই আমি আমার প্রিয় কবি ফর্‌রুখ আহমকে এদিক-সেদিক খোঁজাখুঁজি শুরু করি। তিনি তখন ভেতরে ছিলেন। এলেই আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন কনেপক্ষের একজন। পরিচয়ে তিনি দারুণ খুশী হলেন। খুশী হলেন এ কারণে যে, আমিও ব্রাহ্মণবাড়িয়ার লোক। আর কিছু নয়। 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া' নামের প্রতি ফররুখ আহমদের অনেকখানি দুর্বলতা ছিল। এর কারণ সম্ভবত ব্রাহ্মণবাড়িয়ার অন্তর্গত 'চতুরা' গ্রামের পীর আবদুল খালেক সাহেব। আবদুল খালেক সাহেবই ছিলেন কবি ফর্‌রুখ আহমদের ধ্যান ও চিন্তার সুবিস্তীর্ণ রাজপথ তথা 'হেরার রাজতোরণ'। আর সেই কারণেই তিনি ফর্‌রুখ আহমদের আকর্ষণ ও আকাঙক্ষার বস্তুতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য আবদুল খালেক সাহেবকেই উৎসর্গ করা হয়েছিল। অধ্যাপক হলেও খালেক সাহেব অধ্যাত্ম-চেতনায় অনেক দূর এগিয়েছিলেন। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মানুষ সে কারণেও তাঁর খুব প্রিয়পাত্র ছিল। আমাদের ধনমিয়ার কাছে তাঁর বুকের আদরের ধন তুলে দিতেও তাই তাঁর বিন্দুমাত্র দ্বিধা ছিল না; সংশয় ছিল না। তাঁর আচরণে আমি বিস্ময়বোধ করেছিলাম ঃ এতোবড় একজন কবি—শুধুমাত্র তাঁর পীর খালেক সাহেবের বাড়ী ব্রাহ্মণবাড়িয়া, প্রধানত সেই কারণেই তিনি সেখানে বিয়েতে মত দিয়েছিলেন। আমি শুনে তাজ্জব বনে যাই! এ আদর্শ তাঁর কাব্যেও প্রতিফলিত হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। যৌবনকালে কবিকে দেখি নি। তাই ছবির সঙ্গে কবিকে মেলাতে পারছিলাম না। কবির স্বাস্থ্যও তখন ভেঙে পড়েছিল। মাথায় বাবরি চুল, চেহারায় দরবেশী ভাব, দুটি বড় বড় উজ্জ্বল চোখ আমাকে কেবল 'হেরার রাজ-তোরণে'র দিকে টেনে নিয়ে চলেছিল অবিরাম। কথাবার্তার এক ফাঁকে কবিকে কুমিল্লা থেকে প্রকাশিত "অলক্ত" কাগজটির কথা বললাম। একটি কাগজ বের করছি জেনে খুশী হলেন। তিনি কাগজটিতে একটি কবিতা দেয়ার কথা বলতেই তাঁর অভিমান দেখা দিল। বললেন, "আমি এখন কোন কাগজেই লিখি না।" কবির অভিমান আঁচ করতে পেরে আমি অন্য প্রসঙ্গে যাই।

কবি ফর্‌রুখ আহমদ প্রবহমান আধুনিক কবিতার গতি-প্রকৃতির বিরোধী ছিলেন না। এ ধারাকে স্বীকার করে নিয়েই তিনি কবিতা লিখেছেন অসংখ্য, অজস্র। তাঁর কবি-কীর্তি শুধু ধর্মীয় ঐতিহ্যচেতনায় সীমাবদ্ধ নয়, এর বাইরেও একই রকম তৃষ্ণা নিয়ে তিনি হাত বাড়িয়েছেন এবং কাব্যক্ষেত্রে সোনা ফলিয়েছেন। ধর্মীয় ঐতিহ্য-চেতনা যেমন তাঁর কবিতায় প্রাণ পেয়েছে, তেমনি নির্যাতিত মানবাত্মা দেশ ও প্রকৃতিও তাঁর কবিতায় সমভাবে উঠে এসেছে। এ কথা স্বীকার করতে হয় যে, ফর্‌রুখ আহমদ ছিলেন মূলত মানবতাবাদী। এবং স্বাতন্ত্র্যের সৈনিক কবি। এ প্রসঙ্গে কবি জসীম উদদীনের কাছ থেকে শোনা দু'একটি গল্প বলি।

www.pathagar.com

জসীম উদদীন একবার জার্মানী সফরের নিমন্ত্রণ পেলেন। তখন কি ভেবে যেন তিনি কবি ফররুখ আহমদের কাছে যান। বলেন, "ফররুখ, আমি জার্মানীতে যাচ্ছি--তোমার কিছু কবিতা দাও। আমি সেখানে এগুলি প্রচারের ব্যবস্থা করব।"

ফর্‌রুখ আহমদ জসীম উদদীনের কথা শুনে বললেন, "আপনার কবিতাই নিয়ে যান।"

কথা শুনে জসীম উদদীন ত ভ্যাবাচেকা খেয়ে গেলেন। কতটা আত্মবিশ্বাস থাকলে একজন এমন কথা বলতে পারেন? ফর্‌রুখ আহমদের আত্মবিশ্বাস, আদর্শ ও স্বাতন্ত্র্যই তাঁকে অন্যান্য কবি থেকে পৃথক করে রেখেছিলো।

একবার কবি ইকবালের উপর একটি আলোচনাসভার আয়োজন করা হয়। এতে স্বরচিত কবিতা পাঠ করার জন্যেও কবিকে নির্বাচন করা হয়। এবং এর জন্যে প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে একশত টাকা সম্মানী দেবারও প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। কবি জসীম উদদীন সহ সকল নির্বাচিত কবিই এতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফর্‌রুখ আহমদ টাকার কথা শুনে অনুষ্ঠান বর্জন করেছিলেন। গল্প শেষে কবি জসীম উদ্দীন আমাকে বললেন, "ফর্‌রুখের মনের জোরই ছিল আলাদা—কোনো কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে সচরাচর এরূপ দেখা যায় না।"

আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, ফর্‌রুখ আহমদ এতোটাই স্বতন্ত্র যে—তাঁকে সমসাময়িক কবিদের সঙ্গে কোনক্রমেই এক করে দেখা যায় না।

www.pathagar.com

হাসি সিদ্দিকী

অশেষ স্মৃতি

আমার এই উত্তর-চল্লিশ বয়সে দূর অতীতের ভাবনায় যখন তলিয়ে যাই, যেতে ভালো লাগে, তখন পুরনো ঢাকার ক্বচিৎ-কিরণে দীপ্ত বিকেলগুলো ফিরে আসে ঃ ঘড়িতে শুক্রবার বিকেল পাঁচটা—একটি অপূর্ব সুন্দর দরাজ কণ্ঠ ভেসে আসে—"স্নেহের ভাই-বোনেরা!"

শোন হুঁশিয়ার পান্থ সুজন
তোমার চলার পথে গো যদি
গুলশান থাকে, হও শবনম ;
সাহারা থাকিলে তুফান হও।

কিংবা—

ঝড়ের মধ্যে প্রদীপ জ্বালানো কঠিন কাজ, ঝড়ের ভেতর দিয়ে
প্রদীপ ব'য়ে নিয়ে যাওয়া কঠিনতর কাজ।

অথবা—

সেরা নেতা যিনি সেরা খিদমতগার—

কখনো—

জ্ঞান যখন চামড়ার কাজ করে, তখন সে হ'য়ে ওঠে সাপের মতো হিংস্র।

এইসব কথার সঙ্গে ছোটদের বোঝাবার জন্যে একই কণ্ঠ থেকে ভেসে আসে প্রতিটি লাইনের ব্যাখ্যা।

মাত্র সপ্তম শ্রেণীতে পড়ি, তবু ফররুখ-ভাইয়ের কথাগুলো মনে কী অদ্ভুত প্রভাব বিস্তার করতো! আমার সমগ্র কৈশোর ফর্‌রুখ-ভাইয়ের প্রভাবে প্রবলভাবে প্রভাবিত। যে-বয়সে মানুষ তার সামনে এমন কাউকে চায়, যাঁর পিছু পিছু পরম নির্ভরতায় চলা যায়, যাঁর আদর্শে নিজেকে বিলিয়ে দেয়া যায়—ফর্‌রুখ-ভাই আমার কৈশোরে সেই ভূমিকা নিয়েই এলেন—পরম স্নেহময় পথ-নির্দেশক। ছোট ব'লে কখনো তুচ্ছ করেন নি, আমার মতামতকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন—তাঁর স্বভাবের এই দিকটি আমার কাছে কেবল গভীর শ্রদ্ধারই নয়, পরম বিস্ময়েরও। আড়াই যুগ আগের ফররুখ

www.pathagar.com

ভাইয়ের ব্যবহারকে আজ যখন পর্যালোচনা করি, তখন সশ্রদ্ধ বিস্ময়ে আমার অন্তর ভরে ওঠে।

চিঠির মাধ্যমেই প্রথম পরিচয়—ফর্‌রুখ ভাই তখন রেডিও পাকিস্তান ঢাকায় স্কুলের ছেলে-মেয়েদের অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। আমরা সদস্য। ধাঁধায়, বিভিন্ন আলোচনায় চিঠির মাধ্যমেই অংশগ্রহণ ক'রে থাকি।

আমি অত্যন্ত রক্ষণশীল পরিবারের মেয়ে, আমার পক্ষে সেই বয়সে রেডিও অফিসে গিয়ে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা সহজ ব্যাপার ছিল না। নিয়মিত লম্বা চিঠি লিখে আসরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতাম। চিঠি লেখার ব্যাপারে আমার সমসাময়িক অন্যান্য বন্ধুদের থেকে আমি সম্ভবত একটু পরিণতই ছিলাম। কারণ প্রথম আলাপে ফররুখ-ভাই যখন বলেছিলেন—"তুমি এতো ছোট!" কথাটা তখন আমার কাছে নিতান্তই অবমাননাকর মনে হয়েছিল, ভারী মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

এরপর পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়েছে—ফর্‌রুখ ভাই কখন কেমন ক'রে আমার 'ভাইয়া' হ'য়ে গেছেন।

আমি তখন নবম শ্রেণীতে পড়ছি—রবীন্দ্রনাথের "চয়নিকা" (আমাদের বাড়ীর পুরনো বইয়ের শেলফে পাওয়া), "সোনার তরী", "বলাকা", "পুনশ্চ", "মহুয়া" শেষ ক'রেছি, শেষ করেছি নজরুলের "সঞ্চিতা", "অগ্নিবীণা", "বিষের বাঁশী", সত্যেন্দ্রনাথের "কুহুকেকা", জসীম উদদীনের "নক্‌শী কাঁথার মাঠ" এবং নরেন্দ্র দেবের "রুবাইয়াত-ই-ওমর খৈয়াম"। প্রতিটি দৈনিকের সাহিত্য পাতা পড়ি মন দিয়ে--সম্ভবত বয়সের তুলনায় একটু বেশী প'ড়ে ফেললাম। এতে লাভ হ'লো এই যে, মোটামুটি কবিতা বুঝতে পারি, ভাইয়াকে সাহিত্য নিয়ে চিঠি লিখতে পারি, আলোচনা করতেও ভয় পাই না। ভাইয়া আমার প্রতিটি চিঠির জবাব দেন, আলোচনা করবার সময় ছোট বলে কোনো তাচ্ছিল্য নেই—এতে সেই কৈশোরে কী গভীর আনন্দে আর গৌরবে বুকটা যে ভরে উঠতো, সে কথা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

কবি ফর্‌রুখ আহমদ সম্পর্কে পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ রচনা করবেন অনেক সুধীজন, মনোজ্ঞ আলোচনা করবেন হয়তো একাধিক বিদগ্ধ সুরকার। আমি শুধু লিখবো স্নেহময়, আদর্শবাদী পথ-নির্দেশক ভাইয়ার কথা—যাঁর স্নেহময় সাহচর্য আজো আমার কাছে এক দুর্লভ সম্পদ।

ম্যাট্রিকের পাঠ্যতালিকায় 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটির অংশবিশেষ অন্তর্ভুক্ত ছিল। নবম শ্রেণীতে পড়বার সময় কবিতাটির অংশবিশেষ পড়ে আমার তো আশ মেটে না—পুরো কবিতা কোথায় পাই। বইটি তখন বাজারে পাওয়া যায় না। ভাইয়াকে ধরলাম—"সাত সাগরের মাঝি" বইটি চাই। ভাইয়া বললেন—"দেখি।" আমি কিন্তু 'দেখি' শুনে ক্ষান্ত হলাম না। তাগিদের পর তাগিদ দিলাম। আমার মতো গুটিকয় ক্ষুদে

আগ্রহী পাঠকের জোর তাগাদায় (বলাই বাহুল্য, সবচেয়ে বেশী আগ্রহ এবং তাগিদের জোর সম্ভবত আমারই ছিল। অবশ্য জানি না, বড়ো কেউ তাঁর বই প্রকাশের ব্যাপারে এতোটা আগ্রহী ছিলেন কিনা।) ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বরে প্রকাশ পেল "সাত সাগরের মাঝি"র তমদ্দুন সংস্করণ এবং সেই সঙ্গে আরেকটি নতুন কাব্যগ্রন্থ "সিরাজাম মুনীরা"। বই দু'টি হাতে পেয়ে এতো ভালো লেগেছিল যে, মাস খানেকের মধ্যে প্রায় সব ক'টি কবিতা মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। ম্যাট্রিক পরীক্ষার বাংলা দ্বিতীয় পত্রে রচনার মধ্যে ছিল 'তোমার প্রিয় কবি'। ফররুখ-ভাইয়ের কবিতাগুলো মুখস্থ থাকার জোরে আমি অনেক উদ্ধৃতি দিয়ে ফর্‌রুখ ভাইকে নিয়ে আঠার-উনিশ পৃষ্ঠা রচনা লিখে এলাম দারুণ খুশী হয়ে।

আদর্শবাদী, নিষ্ঠাবান, নীতিতে অবিচল মানুষ বলে কবি ফর্‌রুখ ভাইয়ের খ্যাতি প্রায় কল্পজগতের। আমার কাছে তাঁর চরিত্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিকটি মনে হয়েছে ছোট-বড় নির্বিশেষে (বয়সে এবং সামাজিক ব্যবস্থায়) প্রতিটি মানুষকে মূল্য দেবার সহজ মানসিকতা। ভাইয়ার সঙ্গে আমার বয়সের তফাৎ প্রায় কুড়ি বছর—এতো ছোট (সব দিক দিয়ে, সব অর্থে) একটি মেয়ের আগ্রহকে তিনি কখনো তুচ্ছ করেননি, মতামতকে যথেষ্ট মূল্য দিয়ে আলোচনা করেছেন, সংশোধন করেছেন। কোনো কবিতা বা সাহিত্য সম্পর্কিত বিষয়ে নির্দ্বিধায় তাঁর সঙ্গে আলোচনা করা যেত। মনেই হত না আমি মাত্র দশম শ্রেণীতে পড়ি, ভাইয়া একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবি, অনেক উঁচু পর্যায়ের মানুষ—উঁচু আসন থেকে নেমে এসে একটি ছোট মেয়ের আগ্রহকে, উৎসাহকে, মতামতকে গুরুত্ব দেওয়া, মর্যাদা দেওয়া সম্ভবত কবি ফর্‌রুখ আহমদের পক্ষেই সম্ভব। এই প্রসঙ্গে শওকত আলীর কথাও বলা যেতে পারে। শওকত আলী আমাদের বাড়ীতে কাজ করত (এখনো করে)। বয়সে তখন সে তরুণ। রেডিও অফিসে কিংবা ফর্‌রুখ ভাইয়ের কমলাপুরের বাসায় দরকার হলে শওকতকে দিয়ে চিঠি পাঠাতাম। প্রথম যেদিন শওকতকে দিয়ে চিঠি পাঠালাম রেডিও অফিসে, ও ফিরে এসে খুব খুশী হয়ে আমাকে বললো,—"জানেন বড় মিস্‌বাবা, (আমার বাপের বাড়ীতে কাজের-লোকেরা আমাকে এ নামে সম্বোধন করে।) তানি খুব ভালা মানুষ। আমারে কইলেন, চিঠি দিয়া চইলা যাইবেন এইটা একটা কথা হইল? তারপরে আমারে দোকানে বসাইয়া চা আর সন্দেশ খাওয়াইলেন।" (নাজিমুদ্দীন রোডের রেডিও অফিসের উল্টোদিকে তখন আজিজিয়া রেস্তোরাঁ ছিল।) আমি একটু অবাক হয়ে বললাম, "ফর্‌রুখ-ভাই তোমাকে আপনি বললেন?" শওকত আলী হাসিমুখে বললো, "হ্যাঁ, হুজুর। তানি খুব ভদ্দলোক।" একজন সাধারণ, সমাজের নীচের তলার একজন মানুষের এই অকপট উক্তি অনেক জাঁকজমকপূর্ণ সভার গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির ব্যবহৃত সুন্দর শব্দাবলীর চেয়ে আমার কাছে মূল্যবান মনে হয়।

www.pathagar.com

ম্যাট্রিক পাস ক'রে ফেললাম।

এখন তো 'স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিশেষ অনুষ্ঠানে' আমার ভূমিকা নেই। ভারী খারাপ হয়ে গেল মন। প্রতি শুক্রবার বিকেল পাঁচটায় মনটা পড়ে থাকে। কী করি!

ভাইয়াকে বললাম—"ভাইয়া, নিয়ম করে দিন না, যাতে আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত সদস্য থাকা যায়, তাহলে আরো দু'-তিন বছর সদস্য থাকতে পারবো। স্কুল পার হয়ে গেছি, এখন কী করি বলুন তো? একটুও ভালো লাগছে না।"

ভাইয়া বললেন, "দেখি কি করা যায়।" ভাইয়া কথা রাখলেন।

এর কয়েক মাস পরেই 'স্কুলের ছেলেমেয়েদের বিশেষ অনুষ্ঠানে'র নাম বদলে করা হল 'কিশোর মজলিস'—সম্ভবত ১৯৫৪ সালে। সদস্যদের বয়সসীমা করা হল আঠারো বছর।

তখন "চিত্রালী" বেরিয়েছে। সম্ভবত ১৯৫৩ কিংবা ১৯৫৪ সাল। "চিত্রালী"র একটি কলাম ছিল 'তরঙ্গে রঙ্গ'। এই কলামে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের অনুষ্ঠানমালার ময়নাতদন্ত করা হত। এখানে একবার ফর্‌রুখ-ভাই সম্পর্কে অত্যন্ত অশালীন, অশোভন ভাষায় এক ব্যঙ্গোক্তি বেরুলো। বিষয়টি ছিল ফর্‌রুখ আহমদের লেখা দুটি গান। একটি গান হল—"ভোরের স্বপন যেন আমার হয় না বিফল।" অন্যটি হল—"এতোটুকু বুকে এতো কামনা রাখ কি দিয়ে।" সমালোচনা করতে গিয়ে সমালোচক লিখলেন (আমার যদ্দুর মনে পড়ে), "এই বুড়ো বয়সেও ...." ইত্যাদি। লেখাটি পড়ে আমার এতো মেজাজ বিগড়ে গেল যে, আমি জবাব দিয়ে বসলাম। সম্পাদককে লিখলাম, "যদি আপনার সৎসাহস থাকে, তবে লেখাটি সামনের সপ্তাহে ছাপবেন।" এরপর দীর্ঘ জবাব লিখলাম। শিরোনাম দিলাম, 'তরঙ্গ রঙ্গ সৃষ্টিকারীকে'। জবাব অবশ্য নরম হল না। সবটুকু মনে নেই। তবে আমার 'তরঙ্গে রঙ্গ সৃষ্টিকারী'কে ছাপা হয় নি এবং এর পর যদ্দুর মনে পড়ে, এই কলামটি (তরঙ্গে রঙ্গ) আর লেখাই হয় নি।

ভাইয়ার সঙ্গে সাহিত্যের নানা বিষয় নিয়ে আলাপ হ'ত। আমাদের সাহিত্যে পুঁথির গুরুত্ব সম্পর্কে তাঁর কাছেই প্রথম শুনি। তাঁর কাছে শুনেই পুঁথি পড়ার আগ্রহ জাগলো।

"লাখে লাখে সৈন্য মরে কাতারে কাতার
শুমার করিয়া দেখি পঞ্চাশ হাজার।"

কথাটা পরস্পরবিরোধী মনে হ'লেও এর ব্যাখ্যা কত সহজ। চোখের দৃষ্টিতে যা লক্ষ লক্ষ মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে তার সংখ্যা অনেক অল্প। গুণতে গিয়ে দেখা যায়, চোখের হিসাব নির্ভুল নয়।

কিংবা—

ঘোড়ায় চড়িয়া মর্দ হাঁটিয়া চলিল।

www.pathagar.com

ঘোড়ায় চড়ে জোর কদমে না গিয়ে যদি ধীর গতিতে চলা হয়, সে কি হেঁটে চলার শামিল নয়?

পুঁথি-সাহিত্য সম্পর্কে ভাইয়ার আগ্রহ ছিল খুব। পুঁথি-সাহিত্যের উপজীব্যকে আধুনিক ভাষায় পরিবেশনের আকাঙ্খার কথা তিনি অনেকবার বলেছেন। তারই সার্থক রূপায়ণ সম্ভবত "হাতেম তা'য়ী"। তাঁর বিশ্বাস ছিল, লোকজ সাহিত্যেই আমাদের মূল প্রোথিত, একে বর্জন করা সহজ নয়, উচিতও নয়।

অনেক পুরনো, ১৯৪০ সালের "মোহাম্মদী"তে 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' নামে ফররুখ আহমদের একটি গল্প বেরিয়েছিল। আমাদের বাড়ীর পুরনো পত্রিকার মধ্যে গল্পটি পেয়ে পড়ে ফেললাম এক নিঃশ্বাসে।

"হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী" এই ছদ্মনামে ভাইয়া দৈনিক "আজাদ"-এর সাহিত্য পৃষ্ঠায় ধারাবাহিকভাবে সমাজের বিভিন্ন গলদ এবং বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী মানুষকে ব্যঙ্গ করে 'তসবির নামা' নামে দেড় শতাধিক কবিতা লিখেছিলেন। তার তিনটি তুলে দিচ্ছি ঃ

সাপুড়ে ও সাপের পীর

পীর

মুরীদ হয়েছে গোখরোটা অঘ্রাণে
সুফীর প্রভাব ফুটে ওঠে তার প্রাণে।

সাপুড়ে

আসল চেহারা শীতশেষে যাবে জানা
পীরকে সে দেবে যথোচিত নজরানা।

পীর

তোমার কথায় নিরাশার ছাপ দেখি!

সাপুড়ে

স্বভাব ঢাকে না কাফনেও—মানবে কি!

ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর আলাপ

ব্যঙ্গমী

কেন কী কারণে হাল আমলের কবি
একমনে শুধু এঁকে যায় কালো ছবি ?

ব্যঙ্গমা

কালো বাজারের চাপে প'ড়ে বেমালুম
যেহেতু আলোর দুনিয়া হয়েছে গুম।

www.pathagar.com

ব্যঙ্গমী
ব্যঙ্গোক্তির আছে কোনো প্রয়োজন ?
ব্যঙ্গমা
কালো পর্দায় চালাতে অপারেশন।

মসজিদ ও জুতাচোর

মসজিদ
হীন পেশা যতো ধরেছে হারামখোর
সকলের মাঝে হীনতম জুতাচোর।
জুতাচোর
স্বার্থ সুবাদে করি বটে জুতা চুরি
কুকাজে আরো কি দেখ নাই বাহাদুরি?
মসজিদ
খুলে দাও জ্ঞান-পাপীদের জারি-জুরি।
জুতাচোর
খোদার কালাম মুখে আর মনে ছুরি।

কবিতাগুলো বেশ চাঞ্চল্য সৃষ্টি করেছিল। জনৈক সাহিত্যিক দৈনিক "আজাদ"-এ জবাব দিলেন, "মওতে নজ্‌দিগ গোরস্থানী' এই ছদ্মনামের আড়ালে—অবশ্য তিনি একবারই লিখেছিলেন। আমি এখনো জানি না সাহিত্যিকটিকে। 'তসবির নামা' আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি ভাইয়াকে বললাম "আরো কড়া করে, কাউকে বাদ না দিয়ে লিখুন, ভাইয়া।" ভাইয়া মুখে জবাব দিলেন—"দেখা যাক।" লিখলেন ঃ

তোমরা কেউ ব'লো না ভাই হায়াত দারাজ খাঁ-কে
অকারণে মারতে টোকা সব মানুষের টাকে।
হায়াত দারাজ মারে তাকে স্বভাবটা যার মন্দ
মিলে মিশে না থেকে যে বাড়ায় কেবল দ্বন্দ্ব।
একটা কথা বলতে গিয়ে তিনটে বলে মিথ্যে
পরের খাতা টুকলি করে জাহির করে বিদ্যে।
কাজের বেলায় কুঁড়েমি আর কাজ করে যে অল্প
বাহাদুরির খোঁজে তবু বাড়িয়ে বলে গল্প।

* * *

এমন মানুষ পাও যদি ভাই খবর দিও তাকে
কিম্বা নিজেই তালিম দিও সেই মানুষের টাকে।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহমদ কতটা অসাম্প্রদায়িক, মানবতাবোধ সম্পন্ন, উদার দৃষ্টিভঙ্গির মানুষ ছিলেন, সে সম্পর্কে অনেকেই অবহিত নন। তাঁর নীতিগত দৃঢ়তা অনেক সময় একগুঁয়েমি বলে অনেকের কাছে মনে হতে পারে। ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসের দাঙ্গার পর "স্বাধীনতা" পত্রিকার ২৩ নভেম্বর সংখ্যায় (১৯৪৬) 'বন্ধু' নামে একটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি তাঁর কোনো বইয়ে এখনো প্রকাশিত হয়নি। সম্ভবত কবিতাটির কপি আজ কেবলমাত্র আমার কাছেই রয়েছে—

বন্ধু

হাজার বছর কাটায়েছি পাশাপাশি,
পড়শী আমার সুদিনের চেনা আত্মীয় দুর্দিনে,
এক সাথে মোরা পথ চলিয়াছি ঝড়ের আখর চিনে,
লক্ষ আঘাত হেলায় উড়ায়ে দাঁড়ায়েছি পাশে আসি।

তোমার সাথে যে মোর পরিচয় বন্ধন সুনিবিড় ;
তোমার ঘরের ছায়ায় বেঁধেছি আমার স্বপ্ন-নীড়,
তোমার দুঃখে ঝরেছে আমার কলিজার তাজা খুন,
উজাড় ক'রেছে শত্রু মোদের বক্ষে পূর্ণ তূণ।

একসাথে মোরা নিয়েছি সে তীর বুকে,
অত্যাচারীর শিকল কাটতে ছুটে গেছি সম্মুখে,
বন্ধু আমার ওগো পরমাত্মীয়!
কালের কোঠায় দু'জনার কথা হ'য়ে আছে স্মরণীয়।

আজকে পারি না তাকাতে তোমার পানে,
দশ শতকের পরিচয় আজ লজ্জায় নতমুখ।
বন্ধুকে আমি হেনেছি আঘাত অপমৃত্যুর বাণে
কলংক-ম্লান গভীর ব্যথায় আজ ভ'রে ওঠে বুক।

বন্ধু আমার ক্ষমা করো অপরাধ,
এসো একসাথে মুছে ফেলি এই ভুল।
তোমার স্বপ্নে জাগুক আবার আমার স্বপ্নসাধ,
চলো একসাথে দুইজনে মিলে তুলি এ পাপের মূল।

১৯৪৬ সালের ২৭ অকটোবর সংখ্যার 'স্বাধীনতা'য় 'নিজের রক্ত' নামে আরো একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। কবিতাটির প্রথম ও শেষ স্তবক দু'টির উল্লেখ করা হল ঃ

www.pathagar.com

এবার দেখেছি নিজের রক্ত, দেখেছি আর
রক্ত নেবার পাশবিক মত্ততা,
এবার শুনেছি কোটি ফরিয়াদ, শুনেছি আর
শত মুমূর্ষু কণ্ঠের আকুলতা।--------

পেয়েছি নিজের রক্তের স্বাদ, পেয়েছি আর
রক্ত নেবার দুঃসহ সংবাদ,
কাকে দিয়ে যাব এই দুঃসহ পাপের ভার
এই ক্ষমাহীন আঘাতের অনুনাদ।

[কবিতাটি তৎকালীন অল ইণ্ডিয়া রেডিও-র কলকাতা কেন্দ্র থেকে ফর্‌রুখ আহমদের কণ্ঠে প্রচারিত।]

ভাইয়া লেখার অনুলিপি সংরক্ষণের ব্যাপারে বড়ো উদাসীন ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ ব্যঙ্গ কবিতার অনুলিপি আমি করেছিলাম। কিছু সংখ্যক কবিতার অনুলিপি ভাইয়া আমার কাছ থেকে নিয়েছিলেন, বাকীগুলো আজো সযত্নে আমার কাছে রক্ষিত আছে। ভাইয়া একদিন বলেছিলেন, "কপি-টপি কোথায় যে হারিয়ে যায়!"

শুনে আমিই প্রস্তাব করেছিলাম, "ঠিক আছে, ভাইয়া, আমি সব কপি করে রাখবো।"

ভাইয়া সাগ্রহে রাজী হয়েছিলেন। আমাদের বাড়ীর পুরনো বইয়ের শেলফে অনেক পুরনো পত্র-পত্রিকা বিশেষ করে মাসিক "মোহাম্মদী" থেকে ভাইয়ার দুষ্প্রাপ্য অনেক কবিতা সংগ্রহ করেছিলাম। 'তসবির-নামা'র কবিতাই একটা খাতায় তুলে ভাইয়াকে দিয়েছিলাম। তিনি ভারী খুশী হয়েছিলেন। প্রায় ঊনত্রিশ বছর পর সেদিন আখতার* আমাকে সেই খাতাটি দেখাল—দেখলাম, খাতাটিতেই ভাইয়া কিছু কবিতা সংস্কার করেছেন।

খাতাটি হাতে নিয়ে সেদিনকার কথা বড়ো বেশী মনে হচ্ছিল—সেই নিষ্ঠা আর প্রত্যয়ে উজ্জ্বল দিনের কথা। আজ যখন চারপাশে তাকাই, তখন ছেলেমেয়েদের নিষ্ঠা আর প্রত্যয় দুই-ই বড়ো মলিন হ'য়ে চোখে বাজে, বুকেও। আখতারের হাত থেকে কালো প্লাস্টিকের ঢাকনায় মোড়া খাতাটি হাতে নিয়ে ভাবছিলাম—মানুষের স্মৃতি যেমন আপনা থেকেই কিছু গ্রহণ করে, কিছু বর্জন করে, কালের বহমান গতিধারায়ও বুঝি তেমনি কোনো কোনো জিনিস রক্ষিত হয়, কোনো কোনো জিনিস হারিয়ে যায়!

একবার ভাইয়াকে দারুণ জব্দ করেছিলাম। ভাইয়ার 'আজাদীর পটভূমি' (দৈনিক আজাদ, ১৪ই আগস্ট সংখ্যা, ১৯৫৩) কবিতাটিতে দু'টি লাইন ছিল ঃ

* আখতার--পুরো নাম আহমদ আখতার। ইনি ফররুখ আহমদের চতুর্থ পুত্র।

www.pathagar.com

নতুন সফরে শুরু হোক আজ জীবন সেই,
মুক্তপ্রাণের রোশ্‌নিতে ভয় শঙ্কা নেই।

১৯৫৪ সালের ১লা জানুয়ারী হাতে এঁকে কার্ড পাঠালাম 'কিশোর মজলিস'-এ নতুন বছরের সম্ভাষণ জানিয়ে ঃ

নতুন বছরে শুরু হোক আজ জীবন সেই
মুক্ত প্রাণের রোশ্‌নিতে যার শঙ্কা নেই।

ভাইয়া আর কী করবেন, 'কিশোর মজলিস'-এর ভাই-বোনদের নতুন বছরের শুভেচ্ছা প'ড়ে শোনানো হ'ল!

সব শিল্পীরই সৃষ্টির মূল উৎস যন্ত্রণাক্ত হৃদয়; তবু বাহ্যত উদ্দীপনা-উৎসাহ জোগানদারের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। ভাইয়ার গাম্ভীর্যপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অন্তরালে এমন একটি সংবেদনশীল, কোমলপ্রাণ, স্নেহসিক্ত ব্যক্তিত্ব ছিল যে, তাঁকে কাছে থেকে না জানলে তাঁর সম্পর্কে তেমন স্পষ্ট ধারণা করা সম্ভবপর ছিল না। আমরা কয়েকজন, বিশেষ ক'রে আমি ভাইয়াকে নতুন লেখার জন্য এতো জোর তাগিদ দিতাম যে, না লিখে তাঁর উপায় ছিল না। লেখা বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে মন্তব্য করা হ'য়ে যেত—মনে হয়, এতে ভাইয়া প্রচুর উৎসাহ পেতেন। আমার এই উৎসাহ জোগানদারীতে ভাঁটা প'ড়লো, সংসার সাজাতে আমি যখন মফঃস্বল শহরে চ'লে গেলাম। স্বাভাবিকভাবেই যোগসূত্র ক্ষীণ হ'য়ে এলো—আমি রান্না ঘরের কাজ করতে, ঘর গোছাতে, ফুল সাজাতে ব্যস্ত হ'য়ে পড়লাম। এখন যতই অন্তহীন আক্ষেপে হৃদয় ভরে উঠুক না কেন, আজ সবই তো অর্থহীন! যোগসূত্র জোরদার রাখা এমন কোনো কঠিন ব্যাপার ছিল না। কারণ আমি যাঁর সংসার সাজাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, তিনি অনুদার ছিলেন না। হয়তো তেমন আগ্রহী পাঠকের তাগিদের অভাবেই ভাইয়ার লেখা ষাট দশক থেকে ক্রমশ স্তিমিত হয়ে এসেছিল।

লিখতে লিখতে বারবার হারিয়ে যাচ্ছি ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, সালে। কত সহজে, স্বাভাবিক নিয়মে মানুষ বদলে যায়, পরিপার্শ্বের পরিবর্তন হয়--যারা একদিন প্রাণময় ছিল, যে-সময় একদিন প্রাণোচ্ছল স্রোতের মতো মনে হ'ত, সবই হ'য়ে যায় কেবলমাত্র স্মৃতির অবগাহনে কখনো আনন্দ, কখনো বেদনা—এই দুই মিলিয়েই তো জীবন। সেই অপরূপ কন্ঠের ব্যঞ্জনা আজ বারবার তিরাশি থেকে তিপ্পান্নতে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে–

দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?

কিম্বা—

রাত শেষ হয় কাহিনী তোমার অশেষ শাহেরজাদী

কোনো কিছুরই কী শেষ আছে? কালের অবিরাম গতিতে কিছুরই বুঝি শেষ নেই, কিছুই বোধ হয় হারিয়ে যায় না।

www.pathagar.com

শেখ তোফাজ্জল হোসেন

সমুদ্র-নাবিক ফর্‌রুখ

স্মৃতি সাধারণত প্রতারণা করে। কিছু কিছু স্মৃতি থাকে উজ্জ্বল। সারা জীবনেও তা নিষ্প্রভ হয় না। প্রতিকূল পরিবেশে, আবহাওয়ায় সেই সব স্মৃতি বরং আরো প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। সুবেহ সাদিকের শুকতারার মতো সমস্ত মনোজগত জুড়ে দিক-নির্দেশনার একটি মিনার হয়ে সে আলোক ছড়ায়। তার তুলনা খুঁজে পেতে কষ্ট হয়। সহজে পাওয়া যায় না। অনেক সময় কোন কোন ব্যক্তিত্বের স্মৃতি অগুণতি বর্ষ-কালব্যাপী কারো মনে এমন রেখাপাত করে থাকে যে, চেষ্টা করেও তা মোছা যায় না। স্মৃতির সমস্ত কাঠামোয় সেই ব্যক্তিত্ব একটি সবল উপস্থিতি সব সময় ঘোষণা করে। মরহুম কবি ফর্‌রুখ আহমদ ছিলেন তেমনি একটি ব্যক্তিত্ব। স্মৃতিবাহী সত্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাঁর ব্যক্তিত্বের সংশ্রবে যাঁরা এসেছেন, সাহচর্যে যাঁরা এসেছেন—তাঁরা জানেন, কথাটা কতো সত্য এবং হৃদয়গ্রাহী।

কবির সঙ্গে আমার স্মৃতি নিতান্তই স্বল্প। বয়সের বিস্তর তফাৎ নিয়ে তাঁর সঙ্গে একটা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ হওয়া অনেক কষ্টসাধ্য ব্যাপার ছিল। সেই কষ্টকে যারা উপেক্ষা ক'রে কবির সৃষ্ট প্রবল বিরুদ্ধ আবহাওয়ায় ঢুঁ মেরে তাঁর একেবারে কাছে ঘেঁষতে সক্ষম হয়েছিলেন আমি তাঁদের একজন। এবং এটা আমার একপ্রকার অহংকারেরও ব্যাপার।

তাঁর সঙ্গে আমি একটি পাহাড়ী পরিবেশকে তুলনা করতে চাই। দূর থেকে যার অবয়ব দর্শনার্থীকে ভীত করে তোলে। পাহাড়ের রুক্ষ চূড়া উঠে গেছে ওপরে। সমস্ত প্রতিবন্ধকতার উর্ধ্বে। কঠিন ও ধূসর পাথরের চাঁইগুলো ভয়াবহতা সৃষ্টি করে আছে। সবুজ বৃক্ষগুলোও তাতে ম্রিয়মাণ। নযরে আসছে, কিন্তু সেগুলোর সবুজাভ কোমলতা উবে গেছে। পেছনে উত্তুঙ্গ মেঘলোক পাহাড়কে আরো কর্কশ করে তুলেছে। খাড়া তলোয়ারের ধারালো উপস্থিতিকে সে মনে করিয়ে দেয়। অন্যদিকে সেই পাহাড়ে পৌঁছুনোর রাস্তা অত্যন্ত বন্ধুর। বন্ধুরতা ও বিপত্তি উপেক্ষা ক'রে সাহস মেখে যাঁরা এগুবেন, তাঁরা দেখবেন ঃ পাহাড়টি একটি নিরিবিলি আশ্রয়। দূর থেকে দেখা অভিজ্ঞতার বিপরীতে একটি সচ্ছল অন্তর। উর্ধ্বমুখী পাহাড়গুলো ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। আত্মবিশ্বাসে অটল, সৃষ্টিকর্তার প্রতিনিধিত্বশীল এক-একটি স্বাক্ষর। নির্মাণের সৌকর্যে দীপ্যমান এবং ভীতিহীন। পাথরের পাশেই প্রবাহিত তরল ঝর্ণা। শুভ্র ঢেউয়ের বুনোট

www.pathagar.com

কারুকাজ করা পানির স্রোত। একটি ঐতিহ্যের ধারক, ধারাবাহী; কিন্তু প্রতিনিয়ত পরিবর্তনশীল ও আধুনিক। অতীতের ভিত্তিভূমির ওপর নির্মিত বর্তমানের সেতু। যাঁর অস্তিত্ব গিয়ে ভবিষ্যতের চৌকাঠ ছোঁবে। ঐতিহ্যকে যা ক্রমশ বুনন করে চলেছে সমস্ত অস্বচ্ছ বাধা ডিঙিয়ে। সেই পাহাড়ের ঝর্ণায় পড়েছে তীরবর্তী বৃক্ষরাজির সবুজ আলাপন। আলোছায়ার খেলায় তা প্রতিনিয়ত বদলে যাচ্ছে। পাথরের রুক্ষতাকে, ধূসরতাকে, বাতাসের তরঙ্গকে এবং পাখির কল-গুঞ্জনকে একটি হৃদয়বান কবিতায় রূপান্তরিত করতে ঝর্ণা এবং সবুজ বৃক্ষের কী আকুতি! শব্দের অনুষঙ্গ বেয়ে একটি নির্মম পাহাড় যেনো নিমেষেই উধাও হয়ে যায়। একটি সবুজাভ মুক্ত কিন্তু দৃঢ়চেতা আশ্রয় হয়ে ওঠে। ফররুখ ছিলেন তাই।

কৈশোরেই তাঁর কবিতার সঙ্গে পরিচয়। সেই সূত্রে তাঁর প্রতি আমার আগ্রহ বেড়ে ওঠে। ঢাকায় এলে একদিন তাঁর খোঁজ নিতে শান্তিনগরের বাসায় যাই। তাঁতানো রোদ্দুর পড়েছে তাঁর টিনের চালে। দুপুর। দিনটি সম্ভবত রোববার ছিল। ছুটির দিন। আর আমি তখন সবে ষোলোয় পা রেখেছি। দরজায় টোকা মারতেই ঝাঁকড়া-চুল, ধারালো এবং তীক্ষ্ণ চক্ষু ফর্‌রুখ আহমদ দরজা খুলে দিলেন। পূর্বে তাঁকে কখনো ছবিতেও দেখি নি। চমকে গেলাম। দুরু দুরু বুকে সালাম দিলাম। তিনি প্রতিসালাম দিয়ে জিগ্যেস করলেন, আমি কে, কি চাই। আমি ঢোক গিলে গ্রাম থেকে আসা তাঁর কবিতার একজন ভক্ত এবং তাঁর দর্শনার্থী পরিচয় দিতেই তিনি রেগে গেলেন। লেখার মধ্যেই তিনি আছেন, কাজেই বাস্তবে কবির সঙ্গে দেখা করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। দ্বিতীয়বার যেনো না আসি—এমনটি ব'লে তিনি রোদ থেকে গা বাঁচিয়ে ঘরের ভেতর বসতে বললেন। আমি ঘেমে উঠলাম। ভয় ভয় স্বরে 'এখন যাই' বলে কেটে পড়তে চাইলাম। তিনি তাঁর বাক্যের ওজনকে সমানে রেখেই বললেন, ভিতরে এসো। আমি ভিতরে ঢুকলাম। তিনি আমাকে বসতে ব'লে অন্দর-ঘরে গেলেন। খানিক বাদে ফিরে এলেন। হাতে একটা প্লেট। তাতে মুড়ি, গুড় ও এক পাশে একটা সন্দেশ। বললেন, খাও। মাথার ওপর ফ্যান ছিল না। হাতপাখায় তিনি বাতাস দিতে লাগলেন। আমি খাচ্ছি, অস্বস্তি বোধ করছি ; কিন্তু মুখ দিয়ে কোন শব্দ বেরুচ্ছে না। খাওয়া শেষ। প্রশ্নের উত্তরে জানালাম, আমিও লিখি, তাঁর মতো লেখার চেষ্টা করি, ক্লাসের পড়াশোনায় ফাঁকি দিই না, পরীক্ষা শেষের ছুটিতে ঢাকায় এসেছি। তিনি নরম হলেন এতক্ষণে। আমি যাবার অনুমতি চাইতেই তিনি রীতিমত আমার পিঠে চাপড় দিয়ে বললেন, "কবিতা লেখার জন্যে সাহস চাই। প্রবল সাহস। অকারণে এমন ভীত হওয়া মুসলিম যুবকের সাজে না।" রবীন্দ্র-নজরুল-ফর্‌রুখ নয়, তাঁদের উত্তরসুরি হিসেবে আরো বড়ো কবি হবার জন্যে ব্যাপক পড়শোনা ও অনুশীলন করতে হবে। কোনো অহংকার যেনো না ছোঁয়। আর অচিরেই আমি যেন নিজের লেখা নিয়ে তাঁর কাছে

www.pathagar.com

হাজির হই। আমার ওপর থেকে একটি পাহাড় সরে গেলো। সেদিনের মতো বিদায় নিয়ে রাস্তায় নেমে হাঁফ ছাড়লাম। আকাশে প্রচুর নীল ছড়ানো। দুপুরের রৌদ্র মনে হলো নরম।

পরে নানা কারণে আমি তাঁর ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। আমি বলতাম 'ফররুখ ভাই'। তিনি আমাকে 'তুই' বলে সম্বোধন করতেন। অজান্তে তাঁর এত কাছে চলে যাই যে, তিনি ইসলামিক একাডেমীতে এলে আমার কাছেই বেশী সময় কাটাতেন। পান খেতেন। গল্প করতেন। 'সবুজ পাতা'র জন্যে যেসব লেখা আসতো, তিনি তা মাঝে মধ্যে দেখে দিতেন। তিনি সাধারণত আড্ডা পছন্দ করতেন না। কিন্তু নতুন লেখকদের জন্যে আড্ডা জমানোর কথা বলতেন। সৃষ্টিশীল লেখকদের আড্ডা! প্রচুর পড়াশোনা আর লেখার জন্যে অনলস চর্চার ওপর তিনি সব সময় জোর দিতেন। পরিবেশ প্রিয় হয়ে উঠলে তিনি চেয়ারে দুই পা উঠিয়ে বসতেন। কোনো সময় কোনো কিছুতে যদি সামান্য ভুল করে বসতাম—তিনি যা-তা ব'লে গালাগাল করতেন। আমার একটি লেখায় দুটো বানান ভুল দেখে তিনি প্রায় মারতে উঠেছিলেন। আরেকদিন একটি কবিতার দুটো চরণ তাঁর ভালো লেগেছিল ব'লে তিনি সন্দেশ খাইয়েছিলেন। অনেককেই দেখেছি তাঁর ঐরূপ আদর-শাসন-সোহাগের আশ্রয়ে মানুষ হতে। তাঁর চোখের দিকে তাকিয়ে মিথ্যে বলা যেত না।

কারো মধ্যে কোনো প্রতিভার ছোঁয়া দেখলে তিনি খুব খুশী হয়ে যেতেন। তিনি আমাকে কার্টুনে মানুষের আহাজারিকে ফুটিয়ে তোলবার জন্যে বলতেন। বলতেন, লেখার চাইতে আঁকার গুরুত্ব অনেক বেশী। লেখা সবাই পড়তে জানে না। আঁকা ছবি সবাই বোঝে। কবির অভাব নেই। আঁকিয়ের বিস্তর অভাব।

আর্নেস্ট হেমিংওয়ের বই "ওল্ড ম্যান এণ্ড দ্য সী"। ফতেহ লোহানী বইটির বাংলা তরজমা করেছিলেন। নাম "সমুদ্র সম্ভোগ"। ফর্‌রুখ নতুন লিখিয়েদের বারবার বইটি পড়তে বলতেন। বলতেন, "এতে জীবনের ভাষা আছে, জীবন সংগ্রামের একটি মোহনীয় দর্শন আছে। বইটিতে সেসব যেভাবে প্রাণ পেয়েছে, তা অন্য কোনো বইতে পাওয়া যায় না।"

আত্মবিশ্বাসী ফর্‌রুখ যা ভাবতেন, যা বিশ্বাস করতেন—অকপটে তা ব্যক্ত করতেন। আল্লাহ্ ছাড়া সত্যিই কাউকে তিনি তোয়াক্কা করতেন না। উনিশ শ' একাত্তুরের আগে তিনি কথায় কথায় পাকিস্তান সরকারকে মোনাফেক সরকার ব'লে গালি দিতেন। ঠিক নিজ সন্তানকে বিপথে যেতে দেখলে যেমন পিতা সোচ্চার হন। একাত্তুরে সেই ফর্‌রুখ হয়ে গেলেন নীরব। তাঁর সমস্ত বিশ্বাস আর ভালোবাসার শরীরে কে যেন থাবা বসিয়ে দিয়েছিল। তিনি পাঞ্জাবী-পাঠানদের কাজ-কারবারকে ঘৃণা করতেন, কিন্তু পাকিস্তান থাকুক এটা চাইতেন। একাত্তুরের স্বাধীনতা যুদ্ধকে তিনি

www.pathagar.com

সহজভাবে মেনে নিতে পারেন নি। একাত্তুরের ষোলই ডিসেম্বরের পর তাঁর কবিতার অনুরাগী সশস্ত্র দুই মুক্তিযোদ্ধাকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর বাসায় গেলাম। উদ্দেশ্য, তাঁকে অভয় দেয়া। কিন্তু অবাক হতে হলো। তিনি আসলে ভীত নন। সেই তেজস্বী ভঙ্গিমায় তিনি নিজেই দরজা খুলে আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। কুশল জিগ্যেস করলেন। ওরা দু'জন কোন্ কোন্ এলাকায় যুদ্ধ করেছে জানতে চাইলেন। প্রসঙ্গত বললেন, তিনিও এক সময় পাকিস্তানের জন্যে প্রাণপণ যুদ্ধ করেছেন। সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যুদ্ধ। কলমী যুদ্ধ। প্রবল প্রতিপক্ষকে হটিয়ে তাঁরা জয়ী হয়েছিলেন। তাঁর দুঃখ, পাকিস্তানী শাসকদের কুকর্মে সেই পাকিস্তান তাঁর চোখের সামনেই ধ্বংস হয়ে গেলো। যে আদর্শের সৌধ নির্মাণে তারা সচেষ্ট ছিলেন, তা হলো না। চা বিস্কুট খেয়ে আমরা সেদিনের মতো চলে এলাম।

মরহুম কবি প্রায়শই বলতেন, "মানুষকে জন্মাতে হয় বলেই ভিন্ন ভিন্ন মায়ের পেটে জন্মে। কেউ কাউকে পর ভাবা ঠিক নয়। যাদের সঙ্গে রক্ত সম্পর্ক তাঁরা রক্তীয়। আর যাদের সঙ্গে হৃদয়ের সম্পর্ক, আত্মার সম্পর্ক, তারাই আত্মীয়। পরম আত্মীয়। আত্মীয়ই আপন। আত্মীয় পাওয়া কঠিন। আত্মীয় বানানোও কঠিন।"

বাঁকা তলোয়ারের মতো ফররুখ। কোনোদিন তাঁকে কেউ কোষাবদ্ধ হতে দেখেনি। যখন যে অবস্থায় থেকেছেন, যে অবস্থায় পড়েছেন—তাকেই আল্লাহ-প্রদত্ত ব'লে মেনে নিয়েছেন। বিপর্যয়ের সময় তাঁকে দেখেছি, আর্থিক অনটনের চৌহদ্দিতে তাঁকে দেখেছি। সন্তানহারা পিতার ভূমিকায় তাঁকে দেখেছি। কিন্তু তাঁকে কোনোদিন সামান্য ভীত-বিহ্বল কিংবা শোকার্ত হতে দেখি নি। কারো কৃপাপ্রার্থী হতে দেখি নি।

একটি দৃশ্য আজও স্পষ্ট মনে পড়ে। তাঁর আদরের বড় মেয়েটি মারা গেছে কঠিন ব্যাধিতে আকস্মিকভাবে। খবর পেয়ে কবির ঘনিষ্ঠরা তাঁকে সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছেন। আমিও গেলাম। গিয়ে দেখলাম, বৈঠক-ঘরের দরজা খোলা। ভেতরে অনেকেই এসেছেন। মধ্যমণি ফররুখ সবার সঙ্গে কথা বলছেন। তাঁর উজ্জ্বল শোকার্ত চেহারায় বলিষ্ঠ ছাপ। তিনি বলছিলেন, "ও আমাকে খুব আদর করতো। ভালোবাসতো। আমি অচিরেই চলে যাব দুনিয়া থেকে। ও তাই আগে-ভাগে চলে গেলো। সবই আল্লাহর ইচ্ছা। আমাকে হয়ত আর বেশীদিন ওর অভাব অনুভব করতে হবে না। তদ্দিন ধৈর্য না ধরে উপায় কি!" সান্ত্বনা খুঁজে নেবার ভাষা তাঁর নিজেরই জানা ছিল। আমরা সেদিন ছলছল চোখে তাকিয়েছিলাম। দেখছিলাম আল্লাহয় বিশ্বাসী একজন মানুষের চমৎকার অবয়ব।

ফুলকে ফর্‌রুখ ভালোবাসতেন। ভালোবাসতেন ফুলের মতো স্বভাবের মানুষকে। গন্ধ বিলানো, আনন্দ বিলানো, আপন করে নেয়া যার কাজ। ফর্‌রুখ ঝরে গেছেন।

www.pathagar.com

আমাদের চোখের সামনে থেকে চলে গেছেন। কিন্তু আমরা তাঁকে দেখছি। ভেতরে আনন্দের উৎস হয়ে তিনি বিরাজ করছেন। গন্ধ বিলাচ্ছেন। আপন করে চলেছেন।

তাঁর মৃত্যুর সময় আমি গ্রামের বাড়ীতে ছিলাম। তাঁর শেষ নির্দেশটি আমি পালন করতে পারি নি। "রোযার মধ্যে একদিন বাসায় আসিস, একসাথে ইফতার করব।" আমি একবার মাত্র তাঁর কবর যিয়ারত করেছি। পুনর্বার আর সাহস হয়নি। আমার মনে হয়, তাঁর মতো পবিত্র আত্মার কবর যিয়ারত করতে হলে যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। সে যোগ্যতা একজন মর্দে মুমিনের যোগ্যতা; ভীতু মুর্দা কমিনের যোগ্যতা নয়। তা আর ক'জনের আছে!

জীবনব্যাপী সমুদ্রের নুড়ি কুড়িয়েছেন কবি ফর্‌রুখ আহমদ। হেরার রাজতোরণের স্বপ্ন দেখেছেন। পাঞ্জেরীকে জাগানোর জন্যে আহ্বান করেছেন। আর ঐতিহ্যের পাটাতনে আদর্শের পাল উড়িয়ে তিনি সিন্দাবাদ নাবিক সেজেছেন। বর্তমানে ফিরে এসে আবার সমুদ্র সম্ভোগের সেই সান্তিয়াগো হয়েছেন। যিনি জয়ের স্বপ্ন-সম্ভাবনাকে সামনে নিয়ে প্রবল ঢেউয়ের সঙ্গে লড়াই করে চলেছেন। যুগ যুগ ধরে তা আমাদের পথ দেখিয়ে নেবে। দিগ্বিজয়ের পথ। সামনের পথ। অবশ্য আমরা যদি সেই পথ-প্রত্যাশী হই।

এখনও ডাহুক ডাকে। সুবেহ সাদিকের আসমানে শুকতারা হাসে। শুধু সেই ফর্‌রুখ নেই।

www.pathagar.com

সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু

আব্বাকে যেমন দেখেছি

আব্বা চিরদিনের জন্যে হারিয়ে গেলেন। পিছনে রেখে গেলেন হাজারো স্মৃতির মালা। অসংখ্য টুকরো টুকরো ঘটনাই আজ আমার মনের পর্দায় ভেসে উঠছে। একজন কবি হিসেবে আব্বা যতখানি সম্মানিত, তার চেয়েও আমাদের কাছে তিনি বেশী সম্মানিত আমাদের আব্বা হিসেবে। আব্বাকে দেখেছি কখনো বন্ধু পরিবেষ্টিত অবস্থায়, কখনো ভক্তদের মধ্যে, আবার কখনো সম্পূর্ণ একাকী নিঃশব্দে কাব্য এবং সাহিত্যের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতে।

দাদাজান ছিলেন প্রতাপশালী পুলিশ ইনসপেকটর খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী। আব্বা পিতা-মাতার দ্বিতীয় পুত্র ছিলেন। বংশানুক্রমে শিক্ষিত এই পরিবারটিকে পরাধীনতার সেই যুগেও কেবল মুসলমানরাই নয়, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতাপশালী রাজকীয় কর্মচারী এবং ব্রাহ্মণরাও (হিন্দুদের মধ্য সবচেয়ে অভিজাত ঘর) সম্মান করতেন।

দাদাজান একজন পুলিশ ইনসপেকটর হওয়া সত্ত্বেও তৎকালীন বৃটিশ সরকারের পুলিশ বাহিনীর দুর্নীতি এবং অন্যায় আচরণের প্রতিবাদ করে পঞ্চম জর্জের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। এই বিদ্রোহের ফলে তিনি বৃটিশ রাজশক্তির রোষানলে পড়েছিলেন। কিন্তু শাসক বৃটিশ জাতির বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও তারা তাঁর ব্যক্তিত্বকে সম্মান না দেখিয়ে পারে নি।

আব্বার দাদী ছিলেন জমিদার-কন্যা। তখনকার অবরোধের যুগে এই সম্মানিতা মহিলা পর্দার ভিতরে থেকেও যতখানি শিক্ষিতা ছিলেন, সেটা আজকের যুগেও বিস্ময়কর বলে মনে হতে পারে। আব্বা যখন খুব ছোট তখন এই দাদীর কাছ থেকে শুনতেন পুঁথির কাহিনী 'তাজকিরাতুল আওলিয়া' এবং 'কাসাসুল আম্বিয়া'। আব্বার জীবনে শিক্ষার হাতেখড়ি এইভাবে দাদীর কোল থেকেই হয়েছিল। আব্বার আম্মা রওশন আখতার ছিলেন অত্যন্ত কোমলপ্রাণা মমতাময়ী নারী। তাঁর পরপর তিনটি মেয়ের জন্মের পর আমার আব্বার জন্ম হয়েছিল। পবিত্র রমযানের চাঁদ ওঠার দিন আব্বা জন্মগ্রহণ করেন। নবজাত শিশু হওয়ার খুশীতে বাড়ীর অনেকেই সেদিন সেহরী

www.pathagar.com

না খেয়েই রোযা রাখলেন। রমযানের চাঁদে জন্ম বলে আব্বার দাদী অনেক সময় আদর করে আব্বাকে 'রমযান' বলে ডাকতেন।

দাদাজান ছিলেন অত্যন্ত রুচিশীল এবং শিক্ষিত পুরুষ। তিনটি কন্যা-সন্তানের পর জন্মানো এই আদরের দুলালের জন্যে তিনি সেদিন অনেক ভেবে-চিন্তে নামকরণ করলেন 'ফররুখ' অর্থাৎ সৌভাগ্যবান। ছোট্ট বয়সে আব্বা খুব দুরন্ত ছিলেন। যখন তাঁর বয়স মাত্র ছ'বছর তখনই দাদীজান ইন্তিকাল করেন। এবং আব্বার লালন-পালনের ভার তাঁর দাদীর ওপর বর্তায়। আব্বার দাদী দীর্ঘজীবী মহিলা ছিলেন। বাড়ী থেকেই আব্বাকে ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হয়। একজন ফারসী জানা মহিলা ছোটকালে আব্বা এবং মরহুম ছোট চাচা মুশীর আহমদকে ধর্মীয় শিক্ষা দিতেন।

এরপর আব্বা ভর্তি হন বালিগঞ্জ মডেল স্কুলে। শিক্ষা জীবনে আব্বা প্রথমে কলকাতার তালতলা মডেল স্কুলে পড়াশোনা করেন এবং এর পরে ভর্তি হন বালিগঞ্জ সরকারী হাই স্কুলে। খুলনা জেলা স্কুল থেকে আব্বা প্রবেশিকা পরীক্ষা দেন। রিপন কলেজ থেকে তিনি আই. এ. পাস করেন। তিনি স্কটিশ চার্চ ও সেন্ট পল কলেজেও পড়াশোনা করেছিলেন। কলেজ জীবনে আব্বার শিক্ষক ছিলেন বুদ্ধদেব বসু ও প্রমথ নাথ বিশীর মত প্রথিতযশা কবি ও সাহিত্যিক। মেধাবী ছাত্র হিসেবে আব্বা বুদ্ধদেব বসুর নিকট অত্যন্ত আদরের ছিলেন। এ ছাড়াও বহু উচ্চশিক্ষিত হিন্দু শিক্ষক এবং খ্রীশ্চান শিক্ষকদের কাছেও আব্বা প্রিয় ছিলেন।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী বলে অনেকেই আব্বাকে 'দ্বিতীয় আশুতোষ' বলে আখ্যায়িত করতেন। আব্বার সহপাঠীদের মধ্যে ছিলেন সত্যজিত রায়, ফতেহ লোহানী, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ। আব্বার অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে রাজ মুরাদাবাদীর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি ছিলেন আফ্রিদী পাঠান। আব্বা এবং রাজ মুরাদাবাদীর মধ্যে অত্যন্ত মধুর সম্পর্ক ছিলো। শ্রদ্ধেয়দের মধ্যে প্রখ্যাত মহিলা কবি সুফিয়া কামাল, মরহুম শাহাদাৎ হোসেন, মরহুম গোলাম মোস্তফা, কবি জসীম উদদীনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। আব্বা জসীম উদ্‌দীনের 'কবর' কবিতা খুব পছন্দ করতেন। 'কবর' কবিতার এ পংক্তিগুলো ছিল আব্বার অত্যন্ত প্রিয় ঃ

ঐ দূর বনে সন্ধ্যা নামিছে ঘন আবীরের রাগে!
অমন করিয়া লুটায়ে পড়িতে বড় সাধ আজ জাগে!
ম'জিদ হইতে আজান হাঁকিছে বড় সকরুণ সুর!
মোর জীবনের রোজ কিয়ামত ভাবিতেছি কত দূর!

যৌবনকালে আব্বা অত্যন্ত সৌখিন ছিলেন। সেতার বাজানো, বাগান করা, দামী পেন কেনা আব্বার শখের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

www.pathagar.com

প্রথম জীবনে আব্বা ছিলেন উপ-মহাদেশের প্রখ্যাত মানবতাবাদী কমরেড এম. এন. রায়ের শিষ্য। যিনি আটটি ভাষায় পণ্ডিত ছিলেন। আব্বার জীবনে এক অচিন্তনীয় পরিবর্তনের মূলে যে মহান আওলিয়ার দোয়া ছিল, তিনি হচ্ছেন আব্বার পীর মরহুম অধ্যাপক আবদুল খালেক—তৎকালীন যুগে ইংরেজী এবং আরবীতে এম. এ. ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট (গোল্ড মেডালিস্ট)। বহু বিতর্কের মাধ্যমে আব্বাকে পরাস্ত ক'রে সেদিন তিনি আব্বাকে বুঝিয়েছিলেন যে, ইসলামই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা, যেখানে মানুষের জাগতিক এবং আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান রয়েছে।

বাঙালী শিশু-সাহিত্যিকদের মধ্যে শ্রী দক্ষিণারঞ্জন রায়ের 'ঠাকুর মা'র ঝুলি', বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী', মরহুম মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরীর 'নূরনবী', সুকুমার রায়ের 'হ-য-ব-র-ল', 'পাগলা দাশু', ড্যানিয়েল ডিফোর 'রবিনসন ক্রুশো', এঞ্জেলসের 'শীত নেমেছে মাঠে' এবং এ ছাড়া 'ডন কুইকসোট' ইত্যাদি বই আব্বার প্রিয় ছিল। এই বইগুলি আমি পড়েছি। কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গীতাঞ্জলী' এবং 'সঞ্চয়িতা'র কয়েকটি কবিতা আব্বার প্রিয় ছিল। এগুলোর মধ্যে আছে 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' এবং 'বৈশাখ'। কবি মোহিতলাল মজুমদারের 'নাদির শাহের জাগরণ' এবং 'কালাপাহাড়' কবিতা দু'টি আব্বার প্রিয় ছিল। ছন্দের যাদুকর সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাও আব্বা পছন্দ করতেন। তাঁর অনূদিত সূরা 'আদ-দোহা'র বাংলা তর্জমা এবং হাদীসের অনুসরণে লেখা 'ফুল' কবিতাটি আব্বা ভালোবাসতেন। বাংলা সাহিত্যে পৌরুষোচিত ভাব আনয়নের জন্যে মাইকেল মধুসূদন 'মেঘনাধ-বধ কাব্য' এবং ডি. এল. রায়ের নাটিকা আব্বা খুব পছন্দ করতেন। 'মেঘনাদ-বধ কাব্যে'র অনেকটা অংশ আব্বার মুখস্থ ছিল।

ডি. এল. রায়ের 'বংগ আমার জননী ধাত্রী আমার—আমার দেশ' এই লাইনটি আব্বা প্রায়ই আবৃত্তি করতেন। বাঙালী মুসলিম কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে কবি শাহাদাৎ হোসেন, নজরুল ইসলাম, মোহাম্মদ এয়াকুব আলী চৌধুরী, হাবীবুল্লাহ বাহার, কবি ইসমাইল হোসেন শিরাজী এবং জীবিতদের মধ্যে কবি আবদুল কাদির আব্বার প্রিয় ছিলেন। আব্বা হিন্দুস্থানের মশহুর গায়ক শচীন দেব-বর্মণের গান পছন্দ করতেন। কণ্ঠশিল্পী বেদারউদ্দীন আহমদ এবং সোহরাব হোসেনের গান আব্বা ভালোবাসতেন। সোহরাব হোসেনের কণ্ঠে 'আকাশে হেলান দিয়ে পাহাড় ঘুমায় ওই' নজরুল-গীতিটি তাঁর প্রিয় ছিল।

নজরুল-গীতির মধ্যে 'ও পদ্মার ঢেউ রে' এবং 'তুমি জানিতে চেও না আমার মনের কথা' গান দু'টি আব্বার নিকট প্রশংসিত ছিল। মরহুম আবদুল আলীমের

www.pathagar.com

পল্লীগীতি আব্বা খুব পছন্দ করতেন। শেখ সাদী (র)-এর 'গুলিস্তাঁ' সম্বন্ধে আব্বা প্রায়ই কোন এক সাহেবের উদ্ধৃতি দিয়ে এই কথাটি বলতেন ঃ Wisdom and beauty hand in hand that is Sadi. জ্ঞান এবং সৌন্দর্য যেখানে হাতে হাত মিলিয়েছে সেখানেই আছে সাদী।

জালালুদ্দীন রূমীর 'মসনভী শরীফ', 'রুবাইয়াতে ওমর খৈয়াম' (ফিটজে-রাল্ডের), হযরত আমীর খসরু এবং হাফিজের গীতি-কবিতা আব্বার খুবই প্রিয় ছিল।

আওলিয়া-দরবেশদের আলোচনা আব্বার অত্যন্ত প্রিয় প্রসঙ্গ ছিল। হযরত ফজিল আয়াজ (র), হযরত বশর খাফী (র), হযরত হাবীব আজমী (র), রাজর্ষি ইবরাহীম আদহামের প্রসঙ্গ ছিল আব্বার কাছে প্রিয়।

হযরত ফজিল আয়াজ ছিলেন প্রথম জীবনে একজন দস্যু। পবিত্র কুরআনের একটি আয়াত তাঁর জীবনের অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটায়। দুর্ধর্ষ দস্যু-সর্দার হলেন আল্লাহ্‌র প্রিয় দরবেশ। সুদখোর হাবীব আজমীর জীবনে এলো সুচিন্তা, রাজর্ষি ইবরাহীম আদহাম আল্লাহকে পাওয়ার জন্য বলখের শাহী তখত পরিত্যাগ করে পরিণত হলেন জীর্ণ লেবাস পরিহিত এক অতি দীন-হীন মানুষে। হযরত বশর খাফীর কথা আব্বা প্রায়ই বলতেন। যিনি প্রথম জীবনে শরাব এবং কাবাবের মধ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখতেন, কিভাবে পরবর্তী জীবনে আবার তিনিই হলেন সাধক। এই বিস্ময়কর এবং অনিন্দ্যসুন্দর কাহিনী বলবার সময় আব্বার গভীর চোখ দিয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় আনন্দের অশ্রু গড়িয়ে পড়তো।

আব্বা বলতেন, "দাম্ভিক পরহেজগারের চাইতে অনুতপ্ত পাপী ভালো।" ব্যক্তিজীবনে আব্বা ছিলেন পরহেজগার। জীবনে জ্ঞান থাকা অবস্থায় স্বেচ্ছাকৃতভাবে সাধারণত নামায কাযা করেন নি তিনি। শরীর ভীষণ অসুস্থ থাকা অবস্থায় ত্রিশ রোযাই রেখেছেন। আব্বা ধার্মিক ছিলেন, কিন্তু গোঁড়া ছিলেন না ; সাম্প্রদায়িক তো ছিলেনই না।

শিক-কাবাব, টিকিয়া, চায়নিজ মজ, চালকুমার মোরব্বা, ভালো নাশতা, রোজ সিরাপ, পনির, গোশতের কিমা ও পরোটা এবং আরবী খেজুর আব্বার পছন্দনীয় খাবার ছিল।

কোন খাবারকেই আব্বা খারাপ বলতেন না। শাক এবং ভাত অত্যন্ত তৃপ্তির সাথে খেয়ে 'আলহামদুল্লিাহ' পড়তেন।

আব্বার পোশাক-পরিচ্ছদের মধ্যে দুটো পায়জামা, দুটো পাঞ্জাবী, একটি গেঞ্জী, একটি শেরওয়ানী, একজোড়া স্পঞ্জের স্যাণ্ডেল, একজোড়া জুতো, শীতের সময় একটি

www.pathagar.com

পুলওভার এবং একটি আলোয়ানই যথেষ্ট ছিল। নবীজীর সুন্নতকে ভালবাসতেন বলে আব্বা কাপড়ে তালি দিয়ে পরতেন।

প্যান ইসলামিজমের প্রতিষ্ঠাতা এশিয়ার সিংহপুরুষ জামালুদ্দীন আফগানীর প্রসঙ্গ আব্বার নিকট খুব প্রিয় ছিল। আফগানীর শাগরেদ আলী ভ্রাতৃদ্বয় যাঁরা খিলাফত আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন তাঁদের প্রসঙ্গ আব্বা প্রায়ই আলোচনা করতেন।

মারাঠাদের বিরুদ্ধে বিজয়ী তৃতীয় পানিপথ যুদ্ধের মহতী সেনানায়ক আহমদ শাহ আবদালীর কথা খুশী হয়ে বলতেন। উপমহাদেশে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা জহিরুদ্দীন মুহম্মদ বাবরের চরিত্রের বীরত্বের দিক অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে আলোচনা করতেন। কোন এক যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বাবর লুকিয়ে পর্বতের ভিতর ছিলেন। সেখানে এক বিরাট অজগর ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁকে জড়িয়ে ধরে। কিভাবে জাগ্রত হয়ে বাবর নিজেকে এই অজগরের হাত থেকে সুকৌশলে ছাড়িয়ে নিয়েছিলেন, তারই চমকপ্রদ কাহিনী আব্বার কাছ থেকে শুনেছি। মুঘল সম্রাট জিন্দাপীর আওরঙজেব যুদ্ধের ময়দানে তীর-বৃষ্টির ভিতর দাঁড়িয়ে নামায পড়ার ঘটনা আব্বা বলতেন।

দরিদ্রদের আব্বা অত্যন্ত ভালোবাসতেন। তিনি ছিলেন রাসূল (সা)-এর সুন্নাতের একান্ত অনুসারী, তাই রাসূলেরই মত দরিদ্ররা ছিল আব্বার প্রিয়পাত্র। মহানবী (সা) শ্রমের মর্যাদার যে শিক্ষা দিয়েছেন, আব্বা তাঁর জীবনে সেটা পুরোপুরি বাস্তবায়িত করেছেন

সোনার চামচ মুখে নিয়েই আব্বার জন্ম হয়েছিলো, কিন্তু দুঃসহ দারিদ্রের মধ্যে তাঁকে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। দারিদ্র তাঁর মাথা নত করতে পারে নি। দারিদ্র তাঁকে সম্মান দান করেছে। এই মর্দে মুমিন জীবনে আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করেননি ; শির উঁচু রেখে সম্মানের সঙ্গে এই জরাগ্রস্ত পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিয়েছেন।

আব্বার ইন্তেকালের পরের ঘটনা বড়ই মর্মন্তুদ। কপর্দকহীন হয়ে আব্বা ইন্তেকাল করেছেন। বাড়ী-গাড়ী, ব্যাংক ব্যালেন্স এবং বিষয়-সম্পত্তি বলতে কিছুই রেখে যান নি। মুসাফির খালি হাতে আসে আর খালি হাতে ফিরে যায়। আব্বাও ছিলেন এমনি এক মুসাফির,—দুনিয়ার সেতু থেকে যখন আব্বা বিদায় নিলেন, তখন ছুটে এলেন তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধের দল, সহপাঠী, বন্ধু-বান্ধব এবং আত্মীয়-স্বজন। কিন্তু আব্বা তখন অনেক দূরে। আব্বা তখন তাঁর মাহবুব এলাহীর সান্নিধ্যে পৌছে গেছেন। আর কোনদিন আব্বা দুনিয়ায় ফিরে আসবেন না। বাজার করে সেই স্নেহভরা কণ্ঠে আর ডাক দেবেন না, "ইয়াসমিন কোথায়?"

www.pathagar.com

শেষবারের মত লোবান, আগরবাতি এবং আতর দিয়ে আব্বাকে সাজানো হচ্ছিল নওশার সাজে। সাদা কাপড় পরে আব্বা নীরব হয়ে শুয়েছিলেন খাটিয়ার উপর। স্তূপীকৃত নীচে রাখা বরফগুলি গলে গলে মেঝেয় ভাসছিল। যে কণ্ঠ এক মুহূর্তের জন্যে নীরব হয় নি, সে কণ্ঠ আজ চিরদিনের মত স্তব্ধ হয়ে গেছে। "এমন কি জগৎ থেকে আমি যখন অন্তর্ধান করবো তখন সবাই বলবে, আমি চিনতাম তাকে, কিন্তু সত্য বলতে কি, কেউ চেনে নি এই সুদূরের মুসাফিরকে।"—ইকবাল)

বেঁচে থাকতে কেউ চিনতে পারে নি। ইন্তেকালের পরে সবাই যখন তাঁকে চিনলো, তখন তাদের কণ্ঠ থেকে, বেদনাঘন হৃদয় থেকে একটি শব্দই উচ্চারিত হয়েছিল, 'ইন্নালিল্লাহে-------- রাজেউন।'

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবির এই পোর্ট্রেটটি কবি গোলাম মোস্তফার দ্বিতীয় পুত্র প্রখ্যাত শিল্পী মোস্তফা আজীজ ১৯৬৯ সালের ২৯শে জুলাই এঁকেছিলেন।

www.pathagar.com

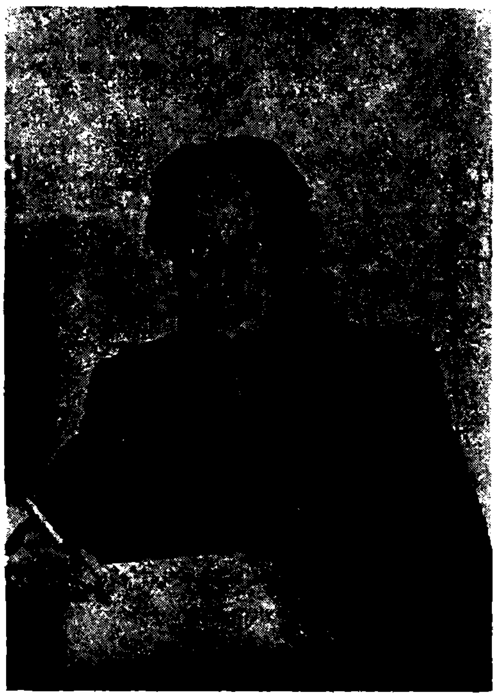

উপরে

এই গ্রুপ ফটোটি ১৯৫৭ সালে রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রের সাহিত্য-আসরে তোলা হয়। ছবিতে বাম দিক থেকে আছেন: কবি আহসান হাবীব, কবি ফরুরুখ আহ্‌মদ, কবি আবুল হোসেন, কবি সুফিয়া কামাল, কবি শামসুর রাহমান ও কবি আবদুল কাদির।

পাশে

রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে তোলা এই আলোক-চিত্রটি ১৯৬৬-তে স্কুল ব্রডকাস্টিং-এর বিশেষ মুখপত্রে ছাপা হয়।

www.pathagar.com

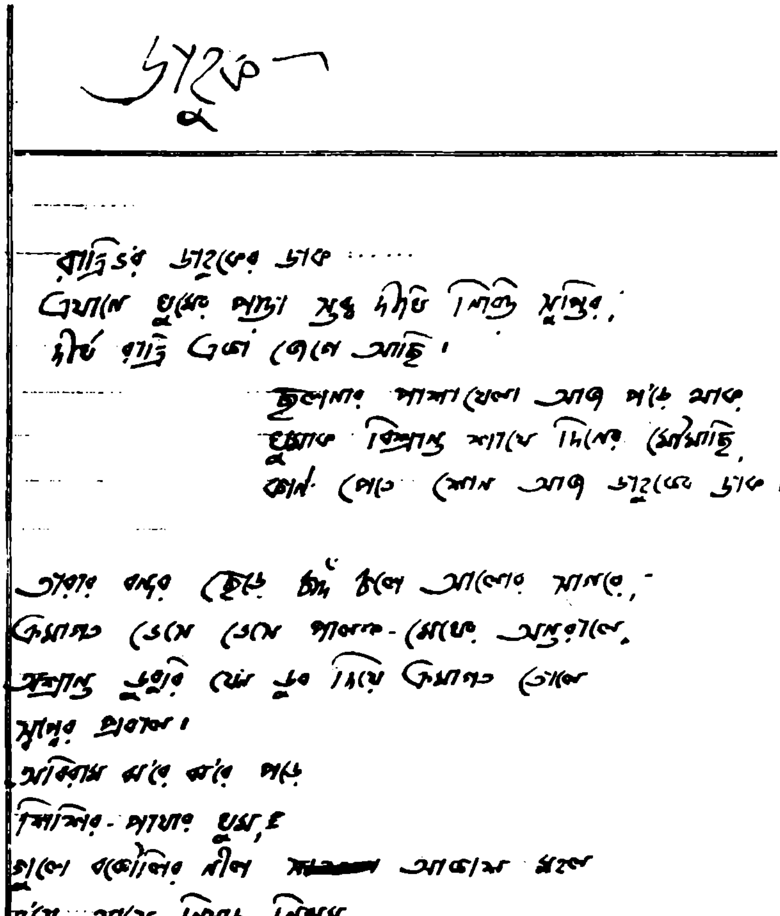

ডাহুক

রাত্রির ডাহুকের ডাক ......
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অপার সুন্দর;
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশাখেলা আজ পড়ে থাক,
ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি,
কান পেতে শোন আজ ডাহুকের ডাক।

তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাতের সাগরে,
ক্রমাগত ভেসে ভেসে পালক-মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ডুব দিয়ে ক্রমাগত তোলে
সুখের প্রবাল।
অবিরাম ঝরে ঝরে পড়ে
শিশির-পাখার ঘুম,
গুলে বকৌলির নীল আকাশ মহল
হয়ে আসে নিঝুম নিঝুম,
নিভে যায় কামনা-চেরাগ;
অবিশ্রান্ত ওঠে শুধু ডাহুকের ডাক।

বিখ্যাত 'ডাহুক' কবিতার অংশ বিশেষ। পাণ্ডুলিপিটি কবির কবিতার খাতা থেকে নেওয়া হয়েছে।

www.pathagar.com

রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে পুঁথি পাঠরত কবি। কবির বয়স তখন ৫০ বছর।

www.pathagar.com

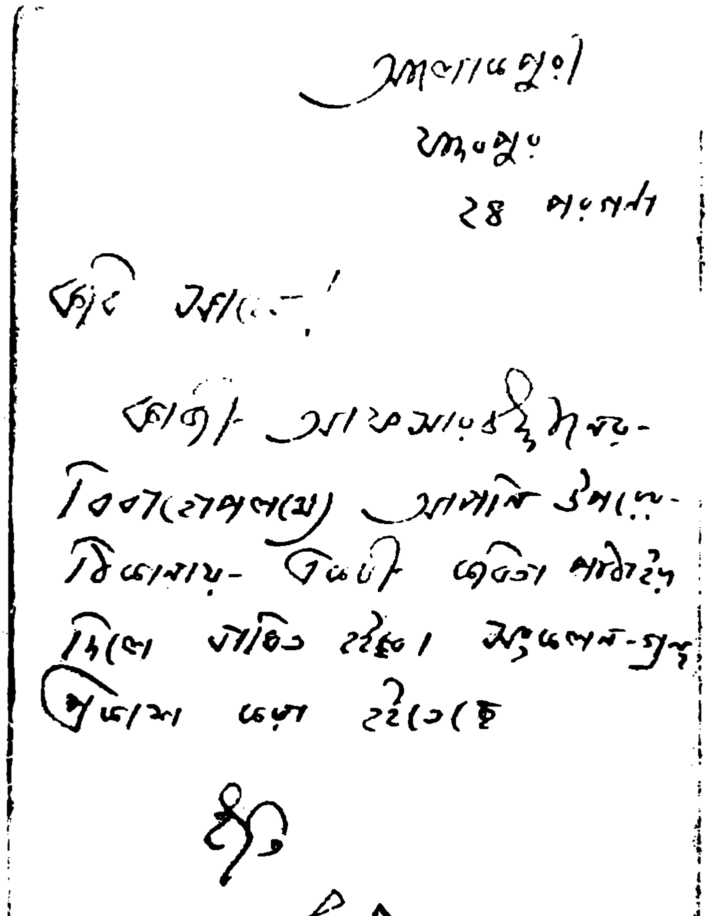

বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক "মৃত্তিকা"র সম্পাদক কাজী আফসারউদ্দীন-এর বিবাহ উপলক্ষে সূফী জুলফিকার হায়দারকে লেখা ফররুখের চিঠি।

www.pathagar.com

নাজিমুদ্দীন রোডে অবস্থিত রেডিও পাকিস্তান ঢাকা কেন্দ্রে স্ক্রিপ্ট রচনায় রত কবি। কবির বয়স তখন ৪০ বছর।

www.pathagar.com

ছবিটিতে দাঁড়িয়ে আছেন সর্ববামে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, মধ্যে পাকিস্তানের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, সর্বদক্ষিণে কবি জসীম উদ্‌দীন এবং তাঁর পাশে কবি গোলাম মোস্তফা।

www.pathagar.com

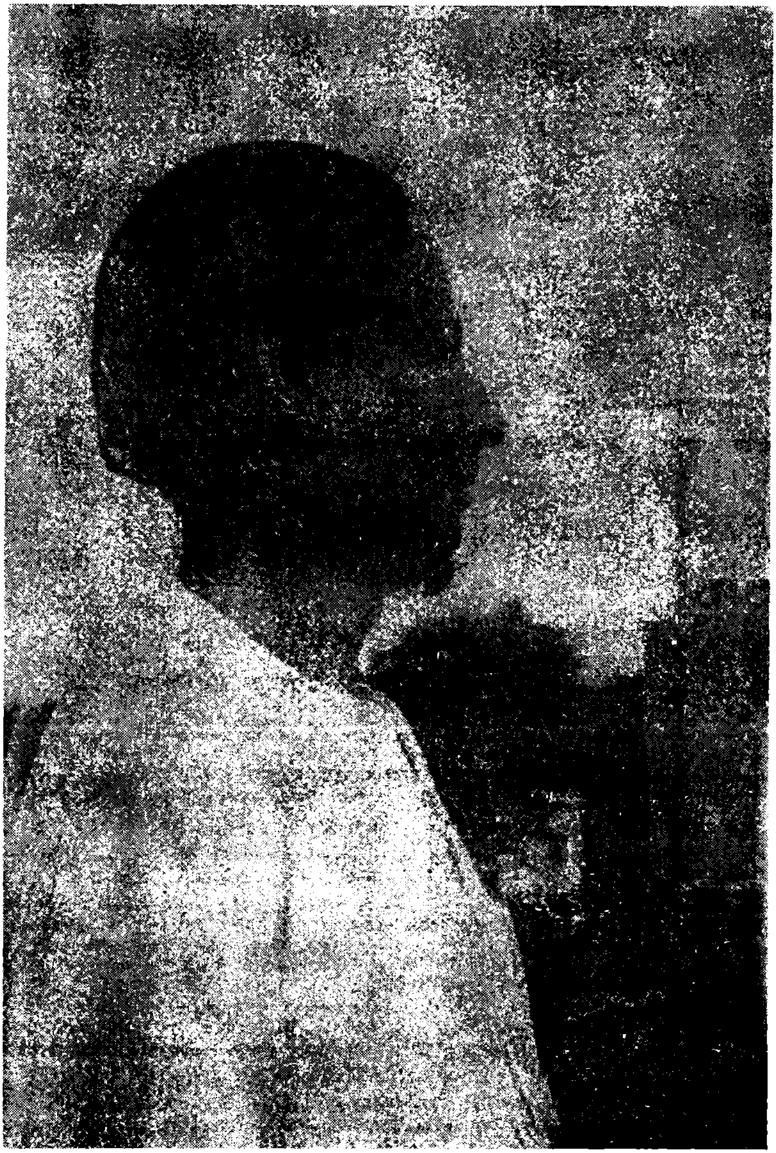

কবির এই আলোক-চিত্রটি শাহবাগস্থ রেডিও ভবনের সামনে তোলা।

www.pathagar.com

আর এক সন্ধ্যায়

গোধূলি তরল সেই হরিণের তনুর আভায়;–
–আসন্ন রাত্রির—তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ।
সাত সাগরের বুকে সেই শুভ্র আলোক-উচ্ছল;
অন্ধকার বন্য রাতে তার [illegible] পাড়ি [illegible]।
আরও সমুদ্র স্রোতে উচ্ছ্বসিত দূরের আহ্বান,
তারও মুখ থেকে মুছে গেছে দিনের গরিমা;
ঘাটে হরিণ আনে বাঁকা শিঙে চাঁদ: অম্লান,
রাত্রির প্রতীক্ষায় [illegible] [illegible] পূর্ণিমা।

প্রবাল পাখায় যেন চাঁদনী সে পূর্ণ দোলে,
তেমনি আভায় তার দূর দিগন্তে মুসাফির!
তেমন ক'রেছি তারা সাহসী সিন্ধু স্বপ্নের!
~~[illegible]~~
নিঃস্ব ইশারা তার ভেসে সে ~~[illegible]~~ [illegible]
আজকে সমুদ্র থেকে পেয়েছি ও রাত্রির নিশান,
তারই সোনালি ফুল ছিঁড়ে পাড়ি দিতে অজ্ঞান।

~~নিঃস্ব ইশারায় তার~~
নিঃস্ব ইশারায় তার ~~[illegible]~~
ভেসে দিল মুক্তি সফেন!

"আর এক সন্ধ্যায়" নামের এই সনেটটি "বন্দরে সন্ধ্যা" নামে প্রথমে মাসিক 'মোহাম্মদী' তে ছাপা হয়। পরে এটি "সাত সাগরের মাঝি"তে অন্তর্ভুক্ত হয়।

www.pathagar.com

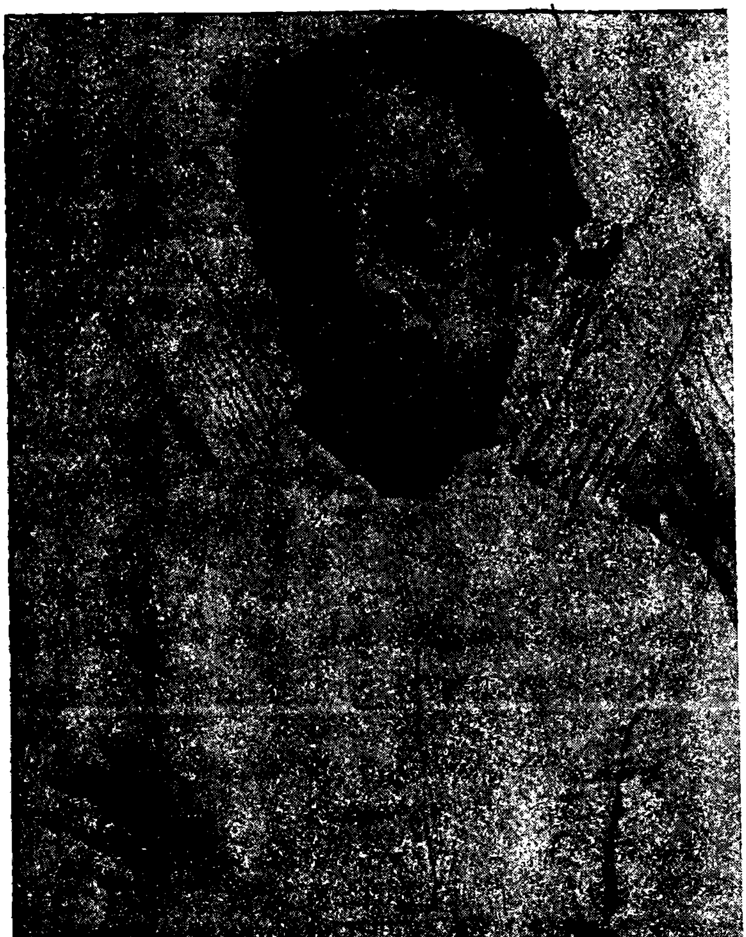

কবি এক সময় মালিবাগের একটি বেড়ার ঘরে থাকতেন। এই ঘরটির পিছনে ছিল একটি খেলার মাঠ। কবির এই ছবিটি সেই বাড়ীর পিছনের মাঠে দাঁড়িয়ে তোলা। ছবিটি তদানীন্তন "দৈনিক পাকিস্তান"-এর একজন ফটোগ্রাফার তুলেছিলেন আনুমানিক ১৯৬৫-৬৬ সালে।

www.pathagar.com

নকীব

রাত্রির প্রহর জাগি নকীব তোমারি প্রতীক্ষায়, —
দূর মনজিলের পথে যাত্রীদল শ্রান্ত যখন
তীব্র হতাশায় ক্লিষ্ট (থেমে গেছে গতির স্পন্দন),
ঝিমায় প্রান্তরে ক্লান্ত, অবসন্ন, আচ্ছন্ন তন্দ্রায়।
অথবা হারায়ে পথ নিশীথের ঘন তমিস্রায়
যখন সতর্কহীন, দিশাহারা, স্বার্থদর্শী মন
সামগ্রিক স্বার্থ ভুলি' ক্ষুদ্র স্বার্থ করে অন্বেষণ;
ঘন হয় অন্ধকার নৈরাশ্যের নিবিড় ছায়ায়।

তোমারে তখন খুঁজি, খোঁজ নিই তোমার সন্ধান
যখন পিচ্ছিল পথে চলে পাপ-পঙ্ক নিয়ে খেলা,
বজ্রকণ্ঠে হে নকীব! যে মুহূর্তে জানাও আহ্বান,
নিমেষে জাগে যে, ভাঙে মোহ-বাসনার মেলা;
জাগ্রত যাত্রী শোনে তাকবীরে, বেলালী আজান
মনজিলের পথে ফের যাত্রা শুরু সকাল বেলা।

কবির স্বহস্ত লিখিত একটি 'সনেট'। "নকীব" শীর্ষনামের এই সনেটটি "নকীব" নামক একটি পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এটি এখনও পর্যন্ত কবির কোন প্রকাশিত গ্রন্থে সংকলিত হয়নি।

www.pathagar.com

কবি ঃ উত্তর যৌবন

www.pathagar.com

নজরুল ইসলাম : তিন

পলাশীর শূন্য মাঠে ডুবেছিল যে সূর্য অম্লান
ছায়াচ্ছন্ন অন্ধকারে, আজাদীর সেই আফতাব
ছিল বন্দী দীর্ঘ কাল মৃত্যু ঘুমে ছিল সে বেতাব,
শোনেনি সুদীর্ঘ রাত্রি জীবনের পূর্ণ ফরমান।
জাগালে সে মৃত্যু-ঘুম তুমি দিলে মুক্ত তুফান
জীবন্ত নিশান যেন — বাক্ মুক্ত আত্মা আজাদীর।
দুর্বার বন্যার মত দিলে ডাক, উদ্দাম অধীর
দৃপ্ত পদক্ষেপে যার চূর্ণ হয় আদ্য নিশান।

দুরন্ত ঝড়ের বেগে সেদিন আমরা শুনিলাম
এ জীবন অন্তহীন, অন্তহীন আসমানের বীণ
নিখিল সৃষ্টির পারে সমুজ্জ্বল মানুষের নাম
বেজে গেল ক্রন্দনে যেন দীপ্ত সুরে ইস্রাফিল যা
সে আহ্বান শুনে দিল প্রান্তর জাগ্রত মিছিল
দীপ্তি মরুভূমির মনে পেল দীপ তোমার, সালাম।

নজরুল ইসলাম-এর উপর কবি ফর্‌রুখ আহমদ মোট ৩টি সনেট ও ১টি কবিতা লিখেছিলেন। বর্তমান সনেটটি সেই তিনটি সনেটের ১মটি। এটি কবির কোন প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে সংকলিত হয় নি।

www.pathagar.com

১৯৭৩-এর ১৮ই আগষ্ট-এ বাংলাদেশ বেতারের পরিচয়-পত্রের জন্যে তোলা কবির শেষ ছবি।

www.pathagar.com

কবি : পূর্ণ যৌবনে

www.pathagar.com

কবি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ্

এক অমূল্য সম্পদ

'হাতেম তা'য়ী' কাব্যটি আগাগোড়াই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। ক্বচিৎ কোথাও পয়ার ছন্দও দৃষ্ট হয়। অমিত্রাক্ষরের বেলায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পুরোপুরি মাইকেলের অনুসরণ করেন নি। মাইকেলের ছন্দ চতুর্দশ অক্ষরা, কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ছন্দ অষ্টাদশ অক্ষরা। কিন্তু তাতে ছন্দগতির ব্যাঘাত ঘটেনি ঃ

পরীর মুলুকে আমি ছাড়া নাই দ্বিতীয় 'আদমজাত',
জানি না কিভাবে কেটে যায় দিন, ফুরায় স্বপ্নরাত,
পেয়েছি পরীকে; এ জীবনে আর কোন আফসোস নাই!
কার কাছে তুমি পরীর দেশের সন্ধান পেলে ভাই?

অষ্টাদশ অক্ষরা অমিত্রাক্ষরেও শেষ যতি সর্বক্ষেত্রেই পঙক্তির শেষে পড়েনি, কখনও কখনও পরের পঙক্তিতে এসে তিন বা চার অক্ষরের পরে বসেছে ঃ

যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ, নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরু প্রশ্বাসের সাথে জেগে ওঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো-অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা
রাত্রির অস্পষ্ট পাখী 'দেখি আমি অজ্ঞাত বিস্ময়ে!

শেষ যতির এই প্রকার সুসঙ্গত স্থানচ্যুতি মাইকেলেও দৃষ্ট হয়, যথা ঃ

কৌটা খুলি রক্ষঃবধূ যত্নে দিলা ফোঁটা
সীমন্তে। সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে
গোধূলী ললাটে, আহা, তারারত্ন যথা।

এখানে প্রথম বাক্য শেষ হয়েছে 'সীমন্তে' শব্দের পর। কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপরে উদ্ধৃত আটটি পঙক্তি শুধু ছন্দ-সাফল্যেরই স্বাক্ষর বহন করছে না, কবির অপূর্ব

www.pathagar.com

বর্ণনাভঙ্গি, ওজস্বিতা ও দক্ষতাও বিস্ময়করভাবে ব্যক্ত করছে। এর পরবর্তী কয়েকটি পঙক্তিতে কবিত্বের সে ব্যঞ্জনা আরো প্রসার লাভ করেছে ঃ

আশ্চর্য সে অনুভূতি! দুনিয়ার দুঃখ-সুখ থেকে
বিদায় নিয়েছে যারা, তাদেরি সে হারানো কাহিনী
জ্যোতিষ্কের ক্ষীণালোকে লক্ষ বুদ্বুদের মত।
সিতারা চেরাগ যত নেভে জ্বলে রাত্রির ডেরায়।

শেষের একটিমাত্র পঙক্তিতে অতীতের মুসলিমদের শিবির-আশ্রয়ী সামরিক পরিবেশ কি অপূর্ব মহিমায় দীপ্যমান হয়েছে!

'মেঘনাদ বধ কাব্যে' মাইকেল পদে পদে পৌরাণিক উপমার আশ্রয় নিয়েছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদও মুসলিম ঐতিহ্যের নিজস্ব ভাণ্ডার থেকে তাঁর উপমা-সম্ভার সংগ্রহ করেছেন। তাতে ভাবী কাব্যকারদের জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে ঃ

তামাম আলমে দেখি বেশুমার রহমত খোদার,—
যে রহমত পেয়ে বাঁচে জ্বিন ও ইনসান আশরাফুল
মখলুকাত দু'জাহানে,——অথবা পরেন্দা প্রাণীকুল
শূন্যস্তরে ভাসমান যে রহমে দিশা পায় খুঁজে,
মাটির মানুষ চলে সে রহমে পূর্ণতার পথে

পুনশ্চ ঃ

কোহকাফ কঠিন সেই সংশয়ের সুনিবিড় রাত
আবদ্ধ জিন্দান যেন, খুঁজে না পায় যখন
অন্তহীন অন্ধকারে, ঘোরে একা শ্রান্ত রাহাগীর
ক্লান্ত পেরেশান, অথবা হারায়ে লক্ষ্য আশাহীন
অথৈ শূন্যতা মাঝে জেগে থাকে সংশয়িত ম্লান
দিগন্তে ভোরের রোশনি আঁধারে না ফোটে যতক্ষণ

* *

কিম্বা মুক্ত প্রাণের সরণি
দূর মঞ্জিলের প্রান্তে নিয়ে চলে যে সহজে, আর
খুশীর পয়গাম তার রেখে যায় সংশয়ের শেষে।

এরূপ দৃষ্টান্ত কাব্যের সর্বত্র ছড়ানো। তাছাড়া উপরে উদ্ধৃত পঙক্তিগুলির আভ্যন্তরীণ ভাবধারা পাঠকের চিত্তকে সহজেই এক পরিচিত পরিবেশের ভিতর নিয়ে যায় এবং সেই সঙ্গে পুঁথি-সাহিত্যের খোশবু-ঢালা আমেজ সে চিত্তকে তন্ময় করে তোলে।

www.pathagar.com

'হাতেম তা'য়ী' কাব্য যেমন বিশাল, কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের রচনাও তেমনি বলিষ্ঠ এবং প্রাণস্পর্শী।

মুসলিম ঐতিহ্যের ছায়াঘেরা এই অপূর্ব অবদান কবিকে চিরদিনের জন্য স্মরণীয় করে রাখবে সন্দেহ নেই। বাংলা সাহিত্যের জন্য এ কাব্য এক অমূল্য সম্পদ। ভাষার আঙ্গিক ও শব্দের কাঠিন্য স্থানে স্থানে গ্রাম-বাংলার সাধারণ পাঠকের কাছে কিঞ্চিত দুর্বোধ্য মনে হলেও বর্ণনার মাধুর্য, বিষয়বস্তুর মনোহারিত্ব এবং ঘটনার বৈচিত্র্য গ্রামের রাত-জাগা পাঠক ও শ্রোতাদের চিত্তকে বিমোহিত করতে সমর্থ হবে বলে বিশ্বাস করি। 'শাহনামা', 'জঙ্গনামা' ইত্যাদি মহাকাব্যেরও এইরূপ নবরূপায়ণ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

আবুল কালাম শামসুদ্দীন

ফর্‌রুখের হাতেম তা'য়ী

'হাতেম তা'য়ী' কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের লেখা প্রায় সোয়া তিন শত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত এক বিরাট মহাকাব্য। এ-আখ্যায়িকা কাব্যটি যখন সাময়িক পত্রিকা মাসিক 'পূবালী'তে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছিল, তখনই কবি আবদুল কাদির, ডক্টর মুহাম্মদ এনামুল হক প্রমুখ সাহিত্য-সমালোচক একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমিও মনে করি, সবদিক দিয়ে বিবেচনা করে একে মহাকাব্য বলে আখ্যায়িত করলে ভুল তো কিছু করা হবেই না, বরং তাতে এর যথার্থ মূল্যায়ন হবে।

প্রাচীন মহাকাব্যগুলির আঙ্গিক, গাম্ভীর্য, Sublimity স্বর্গ-নরক বর্ণনা, যুদ্ধ-বিগ্রহের জমকালো বিবরণ এতে নেই বলে কেউ কেউ একে 'মহাকাব্য' বলতে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন, কিন্তু মহাকাব্যের প্রাচীন রূপ-কেই যদি তার একমাত্র সনাতন অনড় রূপ ভেবে এ-ধরনের আপত্তি উত্থাপিত হয়, তাহলে তা কতটা যুক্তিসহ হবে, তা-ই বিবেচ্য। দুনিয়ার কোনো কিছুই অচল-অনড় নয়—পরিবর্তনশীল দুনিয়ায় মহাকাব্যের বিষয়বস্তু এবং ফর্মও অচল-অনড় অচলায়তনে সীমায়িত হয়ে থাকবে, এটাও প্রগতিশীল চিন্তার লক্ষণ নয়।

তা'ছাড়া প্রাচীনকালে মহাকাব্য লেখা হত পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়ে। কিন্তু একমাত্র পৌরাণিক বিষয়বস্তু ছাড়া অন্য কোন বিষয় নিয়ে মহাকাব্য লেখা চলবে না, মহাকাব্য রচনার ক্ষেত্রে এমন একটি বিধি-নিষেধের কোনোরূপ যৌক্তিকতা আছে বা থাকতে পারে বলে আমি মনে করি না। অবশ্য হোমার, ভার্জিল, দান্তে, মিল্টন, গ্যেটে--এমন কি আমাদের মাইকেল মধুসূদন পৌরাণিক বিষয়বস্তু নিয়েই তাঁদের মহাকাব্যগুলি লিখেছেন, একথা ঠিক। কিন্তু ঠিক পৌরাণিক কাহিনী নয়, ইতিহাসের পর্যায়েই পড়ে এমন বিষয়বস্তু নিয়েও মহাকাব্য রচিত হয়েছে, তেমন দৃষ্টান্তেরও তো অভাব নাই। ইরানের মহাকবি ফেরদৌসীর 'শাহনামা'কে মহাকাব্যই বলা হয়ে থাকে। কিন্তু এর বিষয়বস্তু ঠিক পৌরাণিক বিষয়ের পর্যায়ে পড়ে না--পড়ে ইতিহাসের পর্যায়ে, এ-কথা সম্ভবত কেউই অস্বীকার করবেন না। 'শাহনামা'কে নিশ্চয়ই প্রাচীন ইরানের ধারাবাহিক ইতিহাস বলে অভিহিত করা যায়। 'শাহনামা'য় যুদ্ধ-বিগ্রহের বর্ণনা আছে বটে, কিন্তু স্বর্গ-নরকের বিবরণ তাতে নেই। তবু এই বিশাল ঐতিহাসিক কাব্য বিশ্বসাহিত্যে মহাকাব্যের মর্যাদা পেয়েছে বলেই জানি। তেমনি আমাদের বাঙলা সাহিত্যে

www.pathagar.com

যোগীন্দ্রনাথ বসুর 'শিবাজী' ও 'পৃথ্বিরাজ', কায়কোবাদের 'মহাশ্মশান' ও 'মহরম শরীফ' প্রভৃতি রচনাকেও অনেক সাহিত্যরসিক মহাকাব্যের মর্যাদা দিয়েছেন। তাতে তাঁরা অন্যায় করেছেন বলে আমি মনে করি না। মহাকাব্য সম্পর্কে প্রাচীন Convention তাঁরা ভেঙেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে এ-অভিযোগও খুব যুক্তিনির্ভর নয় এই কারণে যে, প্রাচীন Convention আঁকড়ে থাকা প্রতিক্রিয়াশীলতারই নজীর মাত্র -- এই চলমান বিশ্বে প্রতিক্রিয়াশীলতার কোন স্থান নেই।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'হাতেম তা'য়ী'কে প্রাচীনকালের পৌরাণিক মহাকাব্যগুলির নিরিখে মহাকাব্য হয়ত বলা চলে না। এতে স্বর্গ-নরকের বর্ণনা নেই, আর প্রাচীন মহাকাব্যগুলির আঙ্গিকের বিশ্বস্ত অনুসরণও তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। কাজেই পৌরাণিক মহাকাব্যগুলির নিরিখে যাঁরা এর বিচার করবেন, তাঁদের পক্ষে 'হাতেম তা'য়ী'কে মহাকাব্যের মর্যাদা দেওয়া হয়ত সম্ভব নয়। কিন্তু আমি আগেই বলেছি, কালে কালে যুগে যুগে অন্য সব-কিছুর মতো সাহিত্যে কাব্য-মহাকাব্যের ধারণাও বদলেছে—বদলে যেতে বাধ্য।

গ্যেটের এপিক-ড্রামা 'ফাউস্ট'-এর আঙ্গিকে আমরা হোমারের 'ইলিয়াড' বা মিল্টনের 'প্যারাডাইস লস্ট'-এর আঙ্গিকের অনুসরণ দেখতে পাই না। একই ছন্দে এটা লিখিত হয় নাই, রসের দিক দিয়েও আগেকার মহাকাব্যগুলির সাথে 'ফাউস্ট'-এর পার্থক্য অত্যন্ত বেশী। তা'ছাড়া লিরিকধর্মী রচনাও এতে আছে। প্রতীকধর্মী চরিত্র—সৃষ্টির দিক দিয়েও 'ফাউস্ট'-এ একটা স্বতন্ত্র বিশিষ্টতা রয়েছে। তবু 'ফাউস্ট'-কে মহাকাব্যের মর্যাদাই দিয়েছেন সাহিত্য-সমালোচকগণ।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'হাতেম তা'য়ী'-র সাথে 'ফাউস্ট'-এর কতগুলি বিষয়ে মিল আছে। একই ছন্দে এটা রচিত নয়--'ফাউস্ট'-এর মতো এতেও নানা ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষার নিদর্শন আছে। তা'ছাড়া প্রতীকধর্মী চরিত্রসৃষ্টি 'হাতেম তা'য়ী'তে সুপ্রচুর। মানবতা হচ্ছে 'হাতেম তা'য়ী'র মূল সুর। এ-গ্রন্থের নায়ক বা হিরো হাতেম তা'য়ী একটি গগনস্পর্শী মহান চরিত্র। তিনি ঢাল-তলোয়ার নিয়ে যুদ্ধ তেমন করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁর জীবন-রহস্যের সন্ধান দুর্বার অভিযানের চাইতে কম সাহসিকতাপূর্ণ নয়। এই কারণে প্রাচীন মহাকাব্যগুলির হুবহু অনুসরণ নাই বলে 'হাতেম তা'য়ী' মহাকাব্য নয়, এ ধরনের রায় আমাদের মতে প্রতিক্রিয়াশীলতারই পরিচায়ক হবে।

বাঙলা সাহিত্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এ এক দুঃসাহসিক প্রচেষ্টা। প্রাচীন পুঁথির অনুসরণে কাব্য রচনার চেষ্টা অবশ্য নতুন নয়। এ প্রচেষ্টা ইতিপূর্বে কিছু কিছু দেখা গেছে বটে, কিন্তু পুঁথিকে অবলম্বন করে একটা আস্ত মহাকাব্য রচনার প্রয়াস বাঙলা সাহিত্যে আর দেখা যায় নাই। তাছাড়া, পুঁথি-সাহিত্যের বিষয়বস্তুই শুধু তিনি গ্রহণ করেন নাই, তাঁর ভাষায় বিবর্তিত রূপ আধুনিক যুগে কিরূপ হতে পারে, তারও

www.pathagar.com

পরীক্ষা-নিরীক্ষা তিনি এ কাব্যে করেছেন। নজরুল ইসলামের হাতেই এ ভাষা সর্বপ্রথম সুষ্ঠু রূপ পায় বটে, কিন্তু পরবর্তীকালে একমাত্র ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছাড়া আর কারুর হাতেই এর সুষ্ঠু রূপ পরিপূর্ণভাবে ফুটে উঠতে দেখা যায় নাই। এ ভাষায় একটা মহাকাব্য লেখার প্রয়াস ফর্‌রুখ আহ্‌মদই প্রথম করেছেন এবং তাঁর চেষ্টা সফলও হয়েছে, এ-কথা বলতে দ্বিধাগ্রস্ত হওয়ার কারণ দেখি না।

পুঁথিকাব্য 'হাতেম তা'য়ী'র আধুনিক কাব্যরূপ দানের জন্যে যে এ ভাষাই সুন্দর ও সুসঙ্গত তাতে আমার সন্দেহ নাই, সংস্কৃত ঘেঁসা ভাষায় এ-কাব্য এত সুন্দর হতে পারত না। আমাদের যেসব উন্নাসিক সাহিত্যকর্মী ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এ-কাব্য রচনায় নাক সিট্‌কাবার দুঃসাহস করবেন, তাদের আমি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্প্রতি-প্রকাশিত উপন্যাস 'গন্না বেগম' পড়তে অনুরোধ জানাব। পূর্ব-পাকিস্তানের কোনো সাহিত্যিক এ-ভাষায় কোনো শিল্পসৃষ্টির কাজে হাত দিলে পূর্ব-পাকিস্তানেরই একশ্রেণীর সাহিত্য-মহলে যেখানে নাক–সিট্‌কাতে দেখা গেছে, পশ্চিম বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সেখানে এই ভাষায় উপন্যাস লিখতে দুঃসাহসী হবেন, এটা কে ভাবতে পেরেছিল? কিন্তু তারাশঙ্কর যেহেতু অত্যন্ত শক্তিশালী বাস্তববাদী কথা-সাহিত্যিক, তাই তিনি সহজেই বুঝতে পেরেছিলেন যে, বিষয়বস্তু বিচার করে উপযুক্ত ভাষা নির্মাণ করতে না পারলে শ্রেষ্ঠ সাহিত্য রচনা করা সম্ভব নয়। সম্রাট আওরঙ্গজেবের পরবর্তী বাদশাহী আমলের ঐতিহাসিক বিষয়বস্তু নিয়ে লিখেছেন তিনি তাঁর এই উপন্যাস 'গন্না বেগম'। সত্যিকার কথা–সাহিত্যিকের অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সে যুগের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিয়ে লিখিত উপন্যাসে সে যুগের সার্থক চিত্র ফোটাতে হলে উপযুক্ত ভাষা প্রয়োগ ব্যতিরেকে তা সম্ভব নয়। এই কারণে আদ্যোপান্ত এই উপন্যাসটি লিখেছেন, যা আমাদের পুঁথি-সাহিত্যের ভাষার অত্যন্ত নিকটবর্তী— এমন কি, পুঁথি-সাহিত্যের এতটা সন্নিহিত ভাষায় কোনো মুসলমান লেখকও এত বড় একটা বই লিখেছেন বলে আমার মনে পড়ে না। এজন্যে তাঁর উপন্যাসখানা বিন্দুমাত্র অসুন্দর তো হয়ই নাই, বরং মনে হয়, এর চাইতে সার্থক সুন্দর রচনা বাঙলা সাহিত্যে খুবই কম লিখিত হয়েছে। তবে সত্যের অনুরোধে আমাকে এখানে বলতেই হচ্ছে যে, লেখকের আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োগ কোনো কোনো ক্ষেত্রে সুষ্ঠু হয় নাই— এমন কি ভুলও হয়েছে।

তারাশঙ্করের এই দুঃসাহসী প্রচেষ্টা আমাদের পূর্ব-পাকিস্তানী উন্নাসিক সাহিত্যিকদের, এমন কি পশ্চিম বাঙলার সাহিত্যিকদেরও, বিষয়বস্তু অনুসারে যোগ্য ভাষা নির্মাণে সচেতন করতে পারলে সত্যিই সুখের বিষয় হবে।

মহাকাব্য হিসাবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ রচিত 'হাতেম তা'য়ী'র নতুনত্ব সম্পর্কে আরো একটি কথা বলা যায় যে, এতে অমিত্রাক্ষর ছন্দের যে রূপ দেখা গেছে, তা

www.pathagar.com

মাইকেলের অমিত্রাক্ষর থেকে বেশ কিছুটা পৃথক। মাইকেল থেকে শুরু করে এ-যাবত বাঙলা কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের রচনায় চৌদ্দ অক্ষরের পদ দেখা গেছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার এই কনভেন্‌শন ভেঙেছেন। অবশ্য এর সূচনা তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্য থেকেই। তিনি এর প্রতি পদে আঠারো অক্ষর ব্যবহার করেছেন। তাতে এ-ছন্দের ধ্বনি-গাম্ভীর্য ক্ষুণ্ন হয়েছে বলে আমার মনে হয় নাই। বরং মনে হয়েছে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অমিত্রাক্ষর ছন্দ নিয়ে এই নতুন এক্সপেরিমেন্ট তাঁর রচনার বিষয়বস্তুর সাথে এমন খাপ খেয়েছে যে, চৌদ্দ অক্ষরের পদে যেনো তা এমন সুন্দর হতে পারতো না। এখানে একটুখানি নমুনা দিচ্ছি ঃ

যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যান-মৌন; অজানা ইঙ্গিতে
তখনি ঘুমন্ত প্রাণ জেগে ওঠে। তখনি এ মনে
মরু প্রশ্বাসের সাথে জেগে উঠে বিগত দিনের
দীর্ঘশ্বাস। আধো-আলো-অন্ধকারে দেখি আমি চেয়ে
বিস্মৃতির দ্বার খুলে উঠে আসে ঘুমন্ত স্মৃতিরা।

অমিত্রাক্ষর ছন্দের গাম্ভীর্য এতে অটুট আছে এবং যতি প্রয়োগের নিপুণতার জন্যে রচনার কাব্যময়তা পাঠক-চিত্তে আনন্দের শিহরণ তোলে।

উপমা প্রয়োগের দিক দিয়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ হোমার বা মাইকেলের মতো দক্ষতা বা শক্তির পরিচয় দিতে পেরেছেন, একথা বলি না; বিশেষ করে হোমারের উপমায় তাঁর সমসাময়িককালের সমাজ ব্যবস্থার যে পূর্ণায়ত চিত্র পাওয়া যায়, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ উপমা রচনায় সে-দিক দিয়ে যান নাই। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপমা চিত্রধর্মী তেমন নয়, যতটা বর্ণনাধর্মী। যেমন ঃ

রয়েছে অজানা তবু জীবনের রহস্য বিপুল
—শীতের প্রথম সূর্য কুহেলীতে আচ্ছন্ন যেমন

কিংবা ঃ

—শস্যদানা ওষ্ঠপুটে যেমন জালালী কবুতর
দূর দারাজের রাহা পাড়ি দিয়ে ফিরে আসে তার
পরিচিত নীড়ে, ফিরিল হাতেম তা'য়ী শাহাবাদে
প্রশ্নের উত্তর নিয়ে বক্ষপুটে।-------------

পূর্ণায়ত চিত্র না হলেও এ-উপমাগুলি কম উপভোগ্য নয়, এবং এর কাব্যমূল্যও যথেষ্ট বলেই আমার ধারণা।

www.pathagar.com

আগেই বলেছি, শুধু অমিত্রাক্ষর ছন্দেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এ-মহাকাব্য লেখেন নাই। তিনি নানা সমিল ছন্দও এ-কাব্যে ব্যবহার করেছেন। মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাঁর 'মেঘনাদবধ কাব্য'–এ অমিত্রাক্ষর ছাড়া অন্য কোনো ছন্দ ব্যবহার করেন নাই বটে, তবে আমাদের অন্যান্য মহাকাব্য-লেখক কবিদের এই ধরনের রচনায় বিভিন্ন সমিল ছন্দের ব্যবহার দেখা গেছে। একই ছন্দের একঘেঁয়েমী কাটাবার উদ্দেশ্যেই সম্ভবত তিনি এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদও তাঁর পূর্ববর্তী মহাজনদের এ-পন্থা অনুসরণে দ্বিধাগ্রস্ত হন নাই। তবে এ-সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই যে, মহাকাব্যে এ-পন্থা অনুসরণের ফলে এর ভাষার একঘেঁয়েমী যত দূরই হয়ে যাক না কেন, মহাকাব্যের গাম্ভীর্য ও Sublimity যেনো এর ফলে কিছুটা ক্ষুণ্ন না হয়ে পারে নাই। সমিল চটুল ছন্দ যত উপভোগ্যই হোক, মহাকাব্যের জন্য অপরিহার্য গাম্ভীর্য ও Sublimity রক্ষার তেমন অনুকূল হতে পারে নাই।

তবে 'হাতেম তা'য়ী'র বিষয়বস্তু এমন বিচিত্র, চমকপ্রদ ও রহস্যময় যে, শুধু এক অমিত্রাক্ষর ছন্দে এর রসঘন রূপায়ণ সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। এবং সম্ভবত এই কারণেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অমিত্রাক্ষর ছন্দের সাথে বিভিন্ন ছন্দও এ কাব্যে আমদানী করেছেন। তাতে মহাকাব্য হিসাবে এর গাম্ভীর্য ও Sublimity হয়ত কিছুটা ক্ষুণ্ন হয়েও থাকতে পারে, কিন্তু বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে এর সার্থক রূপায়ণ সম্ভব হয়েছে।

www.pathagar.com

আবদুল কাদির

কবি ফর্‌রুখ : দুই সমীক্ষা

১. প্রথম সমীক্ষা

বাঙলা সাহিত্যে নজরুল ইসলামের আবির্ভাব এক বিস্ময়কর ব্যাপার। নজরুলের আবির্ভাব না হলে একালের বাঙালী মুসলমানের সাহিত্য সাধনার দিকে সমগ্র দেশের কৌতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হত কিনা সন্দেহ। অতীতে আলাওল আর একালে নজরুল,—বাঙলা সাহিত্যের মুসলিম ধারায় এ দুই দিকপাল—কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করেও তাঁদের কাব্যকীর্তি বহুকাল অম্লান থাকবে।

নজরুলের পরে জসীম উদ্‌দীন অপেক্ষাকৃত স্বল্প শক্তিমান হলেও নজরুলের মতোই সৃষ্টিশীল প্রতিভা। জসীম উদ্‌দীনের সমসময়ে আর যে ক'জন তরুণ মুসলমান কাব্যচর্চায় খ্যাতিলাভ করেছেন, তাঁদের মধ্যে বন্দে আলী মিয়া, হুমায়ুন কবির, বেগম সুফিয়া কামাল, কাজী কাদের নওয়াজ, মহীউদ্দীন, ফজলুর রহমান ও বেনজীর আহমদের নাম উল্লেখযোগ্য। এঁদের রচনায় ভাবাবেগ আছে, বর্ণবৈচিত্র্য আছে, সমাজ-মঙ্গলের আকুতি আছে--কিঞ্চিৎ স্বকীয়তাও আছে; কিন্তু সেই শক্তির অজস্রতা নেই যা সমগ্র দেশের চিত্তকে দোলা দিতে পারে। অবশ্য এঁদের কোনো কোনো রচনা বেশ প্রতিশ্রুতিশীল, সুতরাং এঁদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে চূড়ান্ত কথা বলবার সময় এখনও আসে নি।

প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অতি-আধুনিক নামে সুখ্যাত; রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলালের পরে বাঙলা কাব্যে এঁরা অতি-আধুনিক ভঙ্গির আমদানী করেছেন। এই 'ভঙ্গি' সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ঃ

সেটা সত্য হোক
শুধু ভঙ্গী দিয়ে যেন না ভুলায় চোখ।
সত্যমূল্য না দিয়েই সাহিত্যের খ্যাতি করা চুরি
ভালো নয়, ভালো নয় নকল সে সৌখিন মজদুরী।
এসো কবি, অখ্যাত জনের
নির্বাক মনের
মর্মের বেদনা যত করিও উদ্ধার,
প্রাণহীন এদেশেতে গানহীন যেথা চারিধার

www.pathagar.com

অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক নিরানন্দ সেই মরুভূমি
রসে পূর্ণ করে দাও তুমি।
অন্তরে যে উৎস তার আছে আপনারি
তাই তুমি দাও তো উদ্ধারি।

বাঙলার নবীন মুসলমান কবিদের মধ্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, আহ্‌সান হাবীব, আবুল হোসেন, গোলাম কুদ্দুস ও সৈয়দ আলী আহ্‌সান কালের হিসেবে অতি আধুনিক। কিন্তু কালের হিসেবেই শুধু নয়, যে-ভঙ্গী অতি-আধুনিক কবিতার প্রধান বৈশিষ্ট্য তার প্রতি এঁদেরও অনুরাগ অত্যন্ত প্রবল। এই পঞ্চরথীর মধ্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নিঃসন্দেহে সর্বশ্রেষ্ঠ। অবশ্য আহ্‌সান হাবীবের ভাষা-সৌকর্য উৎকৃষ্ট মানস-বৈদগ্ধের পরিচায়ক। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ভাষা তত বেশী উৎকর্ষমণ্ডিত না হলেও সৌন্দর্যবোধ ও ভাব-স্বাতন্ত্রে তিনি অগ্রগণ্য।

অতি আধুনিক কবিদল দেশের উপেক্ষিত জনগণের 'নির্বাক মনের' নিগূঢ় মর্মরস কাব্যমধুতে রূপান্তরিত করবেন, এই আশা রবীন্দ্রনাথ করেছিলেন। কিন্তু আমাদের মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী সাহিত্যিকদের দ্বারা সেই দুরূহ ব্রত সাধিত হবে বলে অনেকেরই বিশ্বাস নেই। তবে অতি আধুনিকরা রবীন্দ্রনাথের একটা নির্দেশ অনুসরণ করছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ঃ

নাগিনীরা চারিদিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিঃশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস,—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।

রবীন্দ্রনাথের এই 'ডাক' অনেক অতি আধুনিক কবিই কানে তুলেছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদও এই 'ডাক' উপেক্ষা করেন নি। তিনি তাঁর 'লাশ' কবিতায় পৃথিবীর যান্ত্রিক সভ্যতাকে, এই প্রাণহীন সভ্যতার সৃষ্ট শোষক শ্রেণীকে অভিশাপ দিয়ে বলেছেন ঃ

হে জড় সভ্যতা!
মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক-সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ!
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়,

www.pathagar.com

তোমার শৃংখল-গত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারাপ্রান্তে টানি'
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও,
ধ্বংস হও,
তুমি ধ্বংস হও।।

উৎপীড়িত মানব-সমাজের মুক্তির জন্যে তিনিও 'দানবের' সঙ্গে 'সংগ্রামের পথই কাম্য মনে করেছেন। মানুষের হস্তধৃত ন্যায়ের পতাকা ধূল্যাবলুন্ঠিত মানুষের মর্যাদা আজ লাঞ্ছিত, কবি কি করে এ 'দুর্দৈব' সইতে পারেন ? তিনি জনগণকে আহবান করেছেন ঐক্যের পথে, মৈত্রীর মিলন-ক্ষেত্রে, সাম্যের শুভ্র পতাকাতলে। তাঁর মন পাল তুলেছে অবাধ মুক্তির পথে উত্তাল হাওয়ার টানে ঃ

যে-পথের তীরে
বেদুইন পায় খুঁজে পরিচিত ডেরা,—
যে-পথের ধূলিমাঝে পতাকা সাম্যের
উঠায়েছে ঊর্ধ্বশির, সে-পথে আমার
আরব্ধ জীবন।

*

মাঝি সিন্দাবাদ
সে-পথের রেখা ধরি' করে অভিযান।

আরব্য উপন্যাসের নাবিক সিন্দাবাদ এই তরুণ কবির মানস-রাজ্যে নানা কল্পনা-রাখের সৃষ্টি করেছে। তাঁর 'সিন্দাবাদ' অকূল দরিয়ার যাত্রী--অকূলের আহবানে অজানার টানে সে বারবার নোঙর তোলে। বিপদ আছে, ব্যর্থতা আছে, কিন্তু সে-কথায় সিন্দাবাদ কান পাতে না,--নীল দরিয়ার তরঙ্গ-আহবান তার ঘরছাড়া মনকে উতলা করে তোলে। কবি তাঁর মন–মাঝিকে ডাক দিয়ে বলেছেন--

কোথায় জাহাজ হবে ফিরে বানচাল.
তক্তায় ভেসে কাটবে আবার দরিয়ায় কতকাল;
সে কথা জানি না, মানি না সে কথা, দরিয়া ডেকেছে নীল।
খুলি জাহাজের হালে উদ্দাম দিগন্ত ঝিলমিল,.......

*

ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙ্গছে বালুর বাঁধ,

ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল অবসাদ
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ।

[সিন্দাবাদ ঃ সাত সাগরের মাঝি]

কিন্তু এই মানস-অভিযান অন্তহীন সৌন্দর্যলোকে নিরুদ্দেশ নয়,--কবি তাঁর মানস-নাবিককে যাত্রা করতে বলছেন এক অনাবিল আদর্শের দেশে। 'হেরার রাজ-তোরণ' নিত্য-নব সৌন্দর্যের হাতছানি দিয়ে ডাকছে, পথে রাত্রি নেমে এলেও সে-ছবি নয়ন থেকে বিলুপ্ত হবে না, তারি সন্ধানে দিতে হবে সাত সাগর পাড়ি। তাই শতাব্দীর পথশ্রান্ত নাবিকের আলস্য-জড়িমা ঘুচাবার জন্যে তিনি গাইছেন ঘুম-ভাঙ্গানিয়া গান ঃ

তবে তুমি জাগো কখন সকালে ঝরেছে হাস্‌নাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না ? তবু তুমি জাগলে না?

*

তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী
যেখানে ধূলিতে, কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট চুমি'
পরীর দেশের স্বপ্ন-সেহেলি জাগে গুলে-বকাওলী!

*

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে

*

ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন—
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ

[সাত সাগরের মাঝি]

ইসলাম ধর্মের প্রবর্তক হযরত মুহম্মদ (সঃ) আরবের হেরা-পর্বতে সাধনা-সিদ্ধ হয়েছিলেন, সেই দুঃসহ সাধনার পথেই কবি তাঁর স্বসমাজকে বারবার আহবান করেছেন। যদিও কবি মনে মনে বুঝেছেন, তাঁর বাণী ব্যর্থ হচ্ছে, তবু তিনি নিরাশ না হয়ে বলেছেন ঃ

ডাক দিল আজ হেরার শিখর-চূড়া,
ডেরার কপাট খোলো আজ বন্ধুরা।

ইসলামের অর্ধচন্দ্র-চিহ্নিত 'আল-হেলাল' পতাকা আবার বিশ্বের আকাশে সগৌরবে উড্ডীন হবে, এই আশার স্বপ্ন কবির মনে আনন্দ-রসের সঞ্চার করেছে। ইকবালের শক্তিমন্ত্র সম্যক অনুসরণ না করলেও তিনি আশাবাদী; নৈরাশ্য ও পরাজয়ের সুর তাঁর কাব্যবীণায় মাঝে মাঝে অলক্ষ্যে বেজে উঠলেও তিনি শেষ পর্যন্ত আশাবাদী ঃ

www.pathagar.com

নিশান কি ঝড়ে পড়ে' গেছে আজ মাটির পরে?
আধো-চাঁদ-আঁকা সেই শাশ্বত জয়-নিশান?

এই কঠোর প্রশ্ন তাঁর বাস্তবপন্থী মনে বাস্তবিকই সংশয় জাগায়। কিন্তু বাস্তবের হতাশাব্যঞ্জক দৃশ্য কবির পক্ষে সইতে পারা সহজ নয়; তাই তাঁর কবিমন অগত্যা পলায়ন করে আত্মিক কুয়াশার রহস্যলোকে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপচেতন মনের জটিল গ্রন্থিতে জটলা পাকিয়েছে মধ্যযুগীয় মর্মরস,—সেই রসের আস্বাদনেও তিনি কম তৃপ্তি উপভোগ করেন না। প্রধানত সেই রসের প্রেরণাতেই তিনি কামনা করেছেন আত্মার জাগরণ ঃ

আমাকে জাগাও যেখানে, সেনানী। মানে না বাঁধন রবি,
আমাকে জাগাও যেখানে দীপ্ত সে-মদীনাতুন্নবী,
বিশ্বকরুণা, মুক্তিপদ্ম--বেদনা-লাল
বহিছে চিত্ত-সুরভিত শ্বেত আল্‌হেলাল।।

কিন্তু 'কোরানের ধ্বনি', 'নবীজীর উন্মুক্ত সরণি', 'ওমরের পায়ের ছাপ', 'আলীর হাতের জুলফিকার', এসব তাঁর মনে যত আবেগই সৃষ্টি করুক না কেন, বলিষ্ঠ মুক্ত মনুষ্যত্বের অব্যাহত দীপ্তি এখনো তাঁর মনে সম্যক প্রতিফলিত হয় নি। তাঁর মন এখনো নভোবিহারী; পায়ের নীচে যে মাটি রয়েছে তার আকর্ষণ তিনি খুব অনুভব করেন না। ভাবের নিশীথ রাত্রে তাঁর মানসনেত্রে ভীড় করে আসে 'কায়খসরু', শাহরিয়ার', 'শাহেরজাদী', 'লাইলী' ও 'শিরী'র স্বপ্ন—তাঁর মনে জাগে 'কোহিতুর' ও 'সাফা-মারোয়ার পাহাড়তলীতে' নিঃসঙ্গ বিচরণের বাসনা। এইখানেই নজরুলের সঙ্গে তাঁর জীবনদর্শনের পার্থক্য। ইসলাম বলতে নজরুল বুঝেছেন পূর্ণাঙ্গ মনুষ্যত্ব, আর ফর্‌রুখ বোঝেন হযরত ও তাঁর খলীফাদের অনুসৃত জীবনধারা। বাঙলার আকাশ, বাতাস, পাহাড় ও নদী নজরুলের মনে করেছে অপূর্ব মমতারসের সঞ্চার; প্রাত্যহিক খণ্ড জীর্ণ জীবনধারা নজরুলের মনে করেছে অপরিসীম বেদনার সৃষ্টি, আর ফর্‌রুখের দৃষ্টি ইরান-তুরান-তায়েফ-বাগদাদের আকর্ষণে অধিকতর উতলা বলেই দেশের মনের বেদনা থেকে যথেষ্ট রস সংগ্রহ করতে পারে নি।

সুসাহিত্যিক আবু রুশ্‌দ বলেছেন, "আধুনিক কোন কবির প্রভাব ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপর যদি থেকে থাকে ত তিনি প্রেমেন্দ্র মিত্র।" কিন্তু এ উক্তির সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি নে। আমার বরং মনে হয়, ফর্‌রুখের উপর যদি কোন আধুনিক কবির প্রভাব থাকে ত তিনি নজরুল ইসলাম। তবে উভয়ের মধ্যকার স্বাতন্ত্র্যও সুস্পষ্ট। আধুনিক তুরস্ক, পারস্য, আফগানিস্তান, ইরাক, মরক্কো, মিশর জুড়ে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে, তাকে অভিনন্দিত করে নজরুল বলেছেন ঃ

www.pathagar.com

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন-ইসলামী লাল মশাল,
ওরে বেখবর, তুই-ও ওঠ জেগে
তুই-ও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল।

*

জাগি যদি মোরা দুনিয়া আবার
কাঁপিবে চরণে টাল্‌মাটাল।

আর ফর্‌রুখ বলেছেন ঃ

খঞ্জরে ভাঙো জিঞ্জির ভীতি
কাঁপুক দুনিয়া টালমাটাল।

বলা বাহুল্য যে, এই উভয় কবিই মুসলমানের পুনরুজ্জীবন কামনা করেন, আর উভয়েই রোমান্টিক। তবে নজরুল জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি, আর ফর্‌রুখ ধর্মবাদী (পাকিস্তানবাদী?) সমাজতান্ত্রিক।

উপসংহারে ফর্‌রুখের সুবিখ্যাত 'আলী হায়দর' কবিতা থেকে কিয়দংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

আট কেল্লার রুদ্ধ প্রাকার আজিকে হয়েছে গুঁড়া,
কূল মখ্‌লুক হতে দেখা যায় আলহেলালের চূড়া।
তার তকবীর শোনা যায়, পিছে ওঠে জনতার স্বর ঃ
আলী হায়দর! আলী হায়দর! আসে আলী হায়দর!

এর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন মোহিতলাল মজুমদারের ঃ

পথে পথে ওই গিরি নুয়ে যায় কটাক্ষে রবি অস্তমান,
খড়গ তাহার থির বিদ্যুৎ--ধূলিধ্বজা তার মেঘ সমান,
সেই আসে ওই বাজে দুন্দুভি, তামার দামামা কাড়ানাকাড়,
এতদিন পরে উদিল কি আজ সুরাসুর জয়ী যুগাবতার,
কালাপাহাড়।

২. দ্বিতীয় সমীক্ষা

আজ কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রথম মৃত্যুবার্ষিকী। তিনি আমার অপেক্ষা ১৩ বছর ৯ দিনের বয়োকনিষ্ঠ ছিলেন, সুতরাং এটিই ছিল স্বাভাবিক যে, তিনি আমার মৃত্যুর পর আমার স্মৃতিসভায় আমার বিষয়ে বলবেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্যবশত তার বিপরীতই ঘটলো, তিনি অকালে ১৯৭৪ সালের ১৯শে অক্টোবর তারিখে আমাদের ত্যাগ করে গেলেন।

www.pathagar.com

তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' নামক নাট্যকাব্যের মুর্শিদ বলছেন ঃ

মুমিনের মৃত্যুই চেয়েছি
দীর্ঘদিন এ-জীবনে—আল্লার দরগাহে। অসত্যের,
অন্যায়ের পদপ্রান্তে চাই নাই আত্মসর্মপণ
পৃথিবীতে।

এ ছিল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অন্তরেরও নিগূঢ় কামনা। তিনি মুমিনের মৃত্যুই লাভ করেছেন, চিন্তা ও ভাবের ক্ষেত্রে অসত্যের অন্যায়ের সাথে কোনো আপোস—কোনো সমঝোতা করেন নি। নৌফেলের মুখে তিনি বলেছেন ঃ

দিয়ে যাও মহৎ প্রেরণা
প্রেমপন্থী সুমহান আদর্শের পথে,

হাতেম তা'য়ীর মুখে তিনি ফুটিয়েছেন তাঁর অন্তরের কামনা এইভাবে ঃ

প্রত্যেক মানুষ যেন হয় প্রজ্ঞাবান—
ইনসানে কামিল, মজলুম পায় যেন বাঁচার
অকুণ্ঠ অধিকার।

এই ভাব ও ভাবনার পথেই তিনি ছিলেন সংগ্রামী। ইসলামসম্মত মানবিকতার পথে পদচারণাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান ব্রত। তাঁর 'কবিতার প্রতি' সনেটে তিনি বলেছেন—

পৃথিবীর প্রয়োজন করি নি কখনো অস্বীকার,
তবু মনে রেখ তুমি পলায়নী মনোবৃত্তি নয়,
যে পারে সহজে নিতে আনন্দের রক্তিম সঞ্চয়
সংগ্রামের পথ রুদ্ধ কোনদিন হয়নি ত তার।

তিনি পলায়নবাদী ছিলেন না, বাস্তব জীবনের কঠোরতা তাঁকে কোনদিন তাঁর আদর্শের পথ থেকে বিচ্যুত করে নি। এরূপ কঠিন পথে অকুতোভয়ে চলার আনন্দই তাঁর কাব্যকে করেছে সৌন্দর্যের সামগ্রী। হুইটম্যানের যেমন ঃ The Song of the Self, বোদলেয়ারের যেমন Le Voyage, নজরুলের যেমন 'বিদ্রোহী', ফর্‌রুখ আহ্‌মদের তেমনি 'সাত সাগরের মাঝি' কবিচিত্তের সুগভীর স্বরূপ অপূর্ব রস ও রূপের মহিমায় উদঘাটিত করেছে। 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতার নেই প্রাক-নযীর, এটিও দৈব-প্রতিভার এক আশ্চর্য সৃষ্টি। তার ছন্দ অসমপঙক্তিক ষন্মাত্রপর্বিক মাত্রাবৃত্ত, কিন্তু সুপ্রচলিত ছন্দরীতিতেই তিনি তাতে যে গতিবেগ ও রূপচ্ছটার সৃষ্টি করতে পেরেছেন তা বিস্ময়কর। তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্য আঠারো অক্ষরের দীর্ঘ পয়ারবন্ধে বিরচিত। ইতিপূর্বে এই ছন্দোবন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত রচনা করেন তাঁর 'আয়ুষ্মতী'। এই ছন্দোবন্ধ যে আদর্শমূলক দৃশ্যকাব্য প্রণয়নের খুবই উপযোগী, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তা সপ্রমাণ করেছেন। বাংলা ছন্দের ইতিবৃত্তে এজন্যে তাঁর নাম পরিকীর্তিত হবে।

www.pathagar.com

বাংলা সাহিত্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান তাঁর 'হাতেম তা'য়ী'। এই কাব্যের বিষয়বস্তু ও পরিকল্পনা তিনি আহরণ করেন সৈয়দ হামজার 'হাতেম তাই' নামক দোভাষী পুঁথি থেকে। তিনি 'প্রাচীন পুঁথি রচয়িতাদের উদ্দেশে' শীর্ষক তাঁর একটি সনেটে বলেছেন—

নির্বাক বিস্ময়ে দেখি বিস্মৃত প্রাণের ব্যাকুলতা
সঞ্চারিত এ মাটিতে, এই পাক বাংলার প্রান্তরে,
অথবা রাত্রির পটে জীবনের নব রূপকথা
পদ্মা মেঘনার দেশে বহমান ক্লান্তির প্রহরে।
পুঁথির পৃষ্ঠায় ম্লান মানুষের আর্তি, মানবতা
উজ্জ্বল হীরার মতো দেখি জ্বলে রাত্রির প্রহরে।।

প্রাচীন পুঁথির পৃষ্ঠায় রয়েছে দুঃখার্ত মানুষের যে বেদনা, যে মানবতার প্রকাশ, তারই আকর্ষণে তিনি মধ্যযুগের এক মুসলমানী পুঁথি অবলম্বনে সংরচন করেন তাঁর আখ্যানকাব্য 'হাতেম তা'য়ী'। পৃথিবীর প্রাচীন মহাকাব্যগুলিতে ঘটনার নিয়ন্তা হচ্ছে দেবদেবী; মধুসূদনের 'মেঘনাদ বধ' কাব্যেও মানবভাগ্য নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে দৈব শক্তির অদৃশ্য সংকেতে। কিন্তু মুসলমান কবিরা দেবদেবীতে বিশ্বাস করেন না, তাই তাদের স্থলে জিন-পরী-দেও-ডাইনী প্রভৃতি অতিপ্রাকৃত শক্তি পেয়েছে আসেন। মহাকাব্যেও আছে আখ্যায়িকা, কিন্তু তা পুঁথিভিত্তিক "হাতেম তা'য়ী"তে আছে বলেই তা আখ্যাত হচ্ছে আখ্যান কাব্য বলে। এর কারণ বিশ্লেষণ করেন বিশেষজ্ঞেরা। মহাকাব্যে সাধারণত থাকে একটিমাত্র ছন্দরীতির ব্যবহার, কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'হাতেম তা'য়ী'তে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত এই তিন রীতির ছন্দোবন্ধের বৈচিত্র্যই দেখা যায়। শুনুন ঃ ৬+৬+৬ মাত্রাভাগের মাত্রাবৃত্ত ঃ

ভোরের সিতারা ওঠে নি এখনো, দেখ রাত্রির
বেদনা জমেছে তৃণের শিয়রে—অশ্রু-শিশির।

এবং ৪+৪+৪ সিলেবলের স্বরবৃত্ত ঃ

বিষম ক্ষোভে কাঁপল যে তার মাথার জটা
চোখের কোণে উঠল জেগে অগ্নিছটা।

কিন্তু সৈয়দ হামজার মূল 'হাতেম তাই' পুঁথিতে আছে শুধু অক্ষরবৃত্ত রীতির বিভিন্ন ছন্দোবন্ধ। সেই পুঁথির মূল ভাববস্তুর বড় রকম পরিবর্তন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ করেন নি, তাঁর হাতে তার রূপ হয়েছে আধুনিক রূপক প্রতীক ও চিত্রকল্প সমৃদ্ধ। সৈয়দ হামজার পুঁথিতে আছে ঃ

পানিতে থাকিয়া এক উঠিল আওরাত।
আজব বাহার তার জামাল সুরাত।

www.pathagar.com

শির পাও তামাম ওজুদ নাঙা তার।
হাতেম মুদিল আঁখি হইয়া বেজার।।

এই কথাগুলি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যে হয়েছে এরূপ ঃ

তারপর দেখিল সে অপরূপ হাসিন সুরাত
উঠে এল এক নারী, নগ্নতনু সেই আওরাত।
নির্লজ্জ সে সাহসিকা হাত ধরে হাতেম তায়ীর
দীঘির পানিতে ডুবে ডুব দিল চঞ্চল অধীর।

নজরুল ইসলাম ললিত মধুর শিরিন আরবী-ফারসী শব্দাবলী বাংলা কবিতায় ব্যবহার করে ভাষার ভাণ্ডার ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবিতায়ও 'জিন্দেগানি', 'তেলেসমাত', 'জুলমাত', 'কুল মখলুক' প্রভৃতি শব্দের অবাধ প্রয়োগের দ্বারা বাংলা ভাষায় শক্তিবৃদ্ধির পরীক্ষা করেছেন। তাঁর এই প্রয়াসের মূল্য অনুধাবনীয়।

ফর্‌রুখ আহমদ তাঁর 'মুহূর্তের কবিতা' নামক সনেট সংকলনের 'শেষ কথায়' বলেন ঃ

কিছু লেখা হ'ল আর অলিখিত রয়ে গেল ঢের,
কিছু বলা হ'ল আর হয় নি অনেক কিছু বলা।

কিন্তু তিনি যা লিখে গেছেন, তা সম্পূর্ণ আজও দিনের আলোক দেখে নি। তাঁর অপ্রকাশিত রচনাগুলি প্রকাশের এবং গ্রন্থাকারে মুদ্রণের ব্যবস্থা হওয়া উচিত।

সম্প্রতি আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত হয়েছে। তাতে সংকলিত হয়েছে কবির বহু গ্রন্থিত কবিতা। ১৩৫৪ আশ্বিনের 'সওগাতে' তাঁর 'পাকিস্তান ঃ রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য' শিরোনামে এক মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর এ ধরনের রচনাগুলি গ্রন্থবদ্ধ হ'লে চিন্তার খোরাক পাওয়া যাবে। তাঁর সাহিত্য বিষয়ক চিঠিপত্রও সংগৃহীত হওয়া আবশ্যক। তাঁর শিশুপাঠ্য পদ্যাবলী ও ছদ্মনামের কবিতাগুলি অবিলম্বে গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হওয়া উচিত। তিনি 'মৃত বসুধা', 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' ও অন্যান্য নামে কয়েকটি ছোটগল্প এবং 'রাজ-রাজড়া' নামে একটি ব্যঙ্গ নাটক লিখে গেছেন। সেগুলি উপভোগ্য। আরও গ্রন্থনা দরকার। তাঁর গানগুলির সংগ্রহ বের হলে গায়কদের উপকার হবে।

অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ 'দ্যুতি' পত্রিকায় বাংলা কাব্যে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ" শিরোলেখায় একটি দীর্ঘ আলোচনা ছেপেছিলেন। তার কয়েক বছর আগে (১৩৫৪ বাং) 'নবীন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' শিরোনামে 'সওগাত'-এ কলকাতা বেতারে

www.pathagar.com

পঠিত আমার একটি প্রবন্ধ বের হয়েছিল। পরবর্তীকালে অধুনালুপ্ত 'দৈনিক মিল্লাতে' কবি শামসুর রাহমান 'একজন আধুনিক কবি প্রসঙ্গে' শিরোনামে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উপর একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। কয়েক বছর আগে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সনেট ও কাব্যনাট্য বিষয়ে 'পূবালী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় আমার একটি আলোচনা। 'পূবালীতে' ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'নৌফেল ও হাতেম'-এর ওপর লেখা সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর একটি প্রবন্ধও প্রকাশিত হয়। মুজিবুর রহমান খাঁ অধুনালুপ্ত 'পাকিস্তানী খবর' পত্রিকার এক বিশেষ সংখ্যায় একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তাতে প্রচারণামূলক অতিশয়োক্তি অনেক থাকলেও লেখাটি ছিল সুখপাঠ্য। কিছুকাল আগে বই পত্রিকায় মরহুম অধ্যাপক আনোয়ার পাশার একটি অসমাপ্ত লেখা বের হয়। তাতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার কিছু বিরূপ সমালোচনা থাকলেও চিন্তার পরিচয় ও তত্ত্বজিজ্ঞাসা আছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সাহিত্য ও চিন্তাধারা বিষয়ে মোহাম্মদ নাসির উদ্‌দীন, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আবুল ফজল, কবি শামসুর রাহমান, আবদুল হক, অধ্যাপক সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়, আবু জাফর শামসুদ্দীন, ডক্‌টর মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান, ডক্টর সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌, আবদুল মান্নান সৈয়দ, শাহাবুদ্দীন আহমদ প্রমুখ বহু সুধী ব্যক্তি সম্প্রতি নানা সাময়িকপত্রে তাঁদের সারবান লেখা প্রকাশ করেছেন। এগুলি একত্রে গ্রন্থিত করে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশিত হলে তাঁর সাহিত্য-কীর্তি বিচারের ক্ষেত্রে একটা নতুন দিগন্তের উন্মোচন হবে। ইতোপূর্বে আমার সম্পাদিত 'নজরুল পরিচিতি' বাংলা একাডেমী কর্তৃক প্রকাশিত 'কবি গোলাম মোস্তফা' এবং জিয়াদ আলী সম্পাদিত 'সুকান্ত পরিচয়' সাহিত্য সমীক্ষার ক্ষেত্রে যে কাজ করেছে, প্রস্তাবিত 'ফর্‌রুখ স্মারকগ্রন্থ' অনুরূপ ভূমিকা পালন করবে। ফর্‌রুখ স্মৃতিরক্ষা কমিটির উদ্যোগেও এই প্রয়োজনীয় কাজটি সম্পন্ন হতে পারে। উল্লেখ্য, সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' এ বিষয়ে এ পর্যন্ত একক সমালোচনাগ্রন্থ। হাসান হাফিজুর রহমানের 'আধুনিক কবি ও কবিতা' গ্রন্থেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা ও কবিমানস সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা আছে।

উপসংহারে আমার বক্তব্য এই যে, প্রতি বছর ১০ই জুন ও ১৯শে অক্‌টোবর তারিখে আমাদের সংস্কৃতিমনা কর্মীগণ ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানগুলি যদি যথাক্রমে ফর্‌রুখ আহমদের জন্মদিবস ও মৃত্যুবার্ষিকী পালনের উদ্যোগ নেন, তাহ'লে অকালে লোকান্তরিত কবির আত্মারই শুধু তৃপ্তি সাধন হবে না, আমাদের সাহিত্য বিষয়ে আলোচনার ক্ষেত্রও প্রসারিত হবে।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ আজরফ

বাংলা কাব্যে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

১.

শতাব্দীর অভিশাপে দুনিয়া আজ জর্জরিত। একদা মানুষের যে সমাজ ও সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার জীবন বিকাশের জন্যে, বর্তমানে সেই সভ্যতাই করছে মানবতার চরম অপমান। মানব-জীবনের বিকাশ আর সভ্যতার উদ্দেশ্য এক নয়, মানুষ হয়ে পড়ছে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে উদ্দেশ্য সাধনের উপায় মাত্র। পথে-ঘাটে সদর রাস্তায়, জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে মানবতার এ লাঞ্ছনা মানব-দরদীর চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করেছে তুমুলভাবে।

কেন এমন হ'ল ? মানুষের সত্যিকার রূপ কি? মানব-সৃষ্ট নিয়ম-কানুন, আইন-শৃংখলা আজ মানুষকে কেন করছে এমন নিষ্ঠুরভাবে নির্যাতন? এসব প্রশ্ন স্বভাবতই মানুষের মনে জাগে। মানুষ আবার ওজন করে দেখতে চায় জীবনের মানগুলো। সে গবেষণার বাইরের কার্যকারণের ফলাফলই ধরা পড়ছে মানুষের চোখে। মানব-জীবনের অন্তঃস্থলে বিরাজমান দ্বন্দ্ব রয়ে যাচ্ছে অজ্ঞাত। মানব-জীবনের সম্পূর্ণ রূপের আলোকে জীবন-সমস্যার সমাধান না হ'লে তার এক বৃত্তি অন্য বৃত্তির সঙ্গে লিপ্ত হয় দ্বন্দ্বে। তার ফলেই জীবনে শুরু হয় তুমুল যুদ্ধ, এ তথ্যটি বর্তমান সভ্যতা স্বীকার করেনি বলেই সভ্যতার এ অভিশাপ দেখা দিয়েছে মারাত্মকরূপে। মানব-জীবনকে পূর্ণভাবে দেখেছিলেন মানুষের নবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ)। সে দর্শনের আলোকেই তিনি করেছিলেন তার পথনির্দেশ। প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর সে জীবনদর্শন সম্পূর্ণ রূপায়িত হয়নি সত্যি, তবুও নানা ঘাত-প্রতিঘাত, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের মধ্যে মানব-সভ্যতা তাঁরই অনুসৃত নীতির দিকে অন্ধের মত হাতড়ে চলেছে। সে আদর্শ জীবন-সংস্থা যদি মানুষ গোড়াতেই গ্রহণ করত, তা'হলে এসব মারামারি, হানাহানি, হত্যা-বেসাতিতে দুনিয়ার ইতিহাসের পাতা রঞ্জিত হ'ত না, মানুষ গোড়া থেকেই সকল দিকে পূর্ণ বিকশিত হয়ে উঠত।

শতাব্দীর এ অভিশাপে সত্যিকার মানব-দরদীর মন তাই অবিরাম যুঝে মরছে। পলে পলে তিলে তিলে জীবনের এ লয় এ ক্ষয় তাঁদের পীড়া দিচ্ছে ভীষণভাবে। কবিরা সমাজ-মানসের প্রতিনিধি। যে ব্যথা সাধারণ মানুষের ভাষায় প্রকাশ পায় না, যে আলোর ইশারা সাধারণের চোখে অর্থহীন, কবির বাণীতে বা কবির চোখে তা'ই মূর্ত হয়ে পড়ে।

www.pathagar.com

সে বাণীর বিষয়বস্তু সার্বজনীন হলেও তার আবেদন বিশেষ ভাষার মাধ্যমে ফুটে ওঠে বলে—তা' বিশেষ ভাষা–ভাষী মানুষের চিত্তকেই দোলা দেয় প্রচণ্ডভাবে।

কেবল এ যুগেই নয়, গোড়া থেকেই জীবন-জিজ্ঞাসার জোরালো তাগিদে এ অঞ্চলের চার কোটি লোক ঘুরপাক খেয়েছে। শ্যামল পল্লীর বুকে উন্মুক্ত মাঠে হাওরের উত্তাল তরঙ্গে সে তাগিদের চাহিদা মেটাতে তারা চেয়েছে কাল্পনিক ইতিহাস সৃষ্টি, লোকগাঁথায়, ঐতিহ্যময় কিস্‌সা কাহিনীতে, পীর মুর্শিদী গানে, মারফতী তত্ত্ব-বিচারে। তাতে তাদের প্রাণের আদি তাগিদ সন্তোষ লাভ করতে পারে নি। যে বিরাট প্রতিশ্রুতি নিয়ে এ মানব-সমাজ দুনিয়ার বুকে দেখা দিয়েছিল, সেসব একচোখা হালকা সমাধানে তার পক্ষে সন্তুষ্ট হওয়া ছিল অসম্ভব। অস্ট্রিক, দ্রাবিড়, সীদিয়, তুর্কি, সেমেটিক, আরব প্রভৃতি নানা রক্তের উপাদানে গঠিত হলেও এ দেশের মুসলিম জীবন তার গতি খুঁজে পেয়েছিল ইসলামের তওহীদবাদে। তওহীদের প্রবল প্রবাহে বিভিন্ন রক্তের উপাদান জারক রসে সঞ্জীবিত হয়ে ছুটে চলেছিল এক মহাপ্রতিশ্রুতি নিয়ে। পলাশীর আম্রকাননে সে আশা তার হয়েছিল ধূলিসাৎ। তবু সে জাতি মরে নি। তার জীবনীশক্তি তওহীদ মরে নি বলেই আজও সে টিকে আছে। আজও সে চলছে প্রতিকূল পরিবেশে আত্ম-প্রতিষ্ঠার অদম্য আকাঙক্ষা নিয়ে। জীবন বিকাশের আধুনিক স্তরে তাই দেখা দিয়েছে আবার তওহীদবাদের প্রতি তার আকুল আগ্রহ। আবার সে ফিরে পেতে চায় পরিপূর্ণ জীবনের রূপ। আবার সে বিকশিত হতে চায় পূর্ণভাবে। জীবনের সকল ক্ষেত্রে সে একই আদর্শের আলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় তার সকল মর্মকে, সকল কর্মকে।

এ দেশীয় মানব-সমাজের নব-জীবনের এ নবীন প্রভাতে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ দেখা দিয়েছেন অগ্রদূতরূপে। জীবনের যে ব্যর্থতায় এতদিন এতগুলো মানুষ গুমরে মরছিল—সে ব্যর্থ জীবনের ব্যর্থতার বেদনা তাঁর লেখনীতে খুঁজে পেয়েছে ভাষা। যে আলোর দিশা পেয়েও তার সঠিক সন্ধান এতদিন তারা করতে পারেনি—তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ তারা পাচ্ছে তাঁর কাব্যের রোশনিতে।

কবি-জীবনের প্রথম স্তরে তিনি সভ্যতার এ বিকৃত রূপের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছেন। দ্বিতীয় স্তরে এ পচনশীল গ্লানি,এ মোহান্ধ আত্মহত্যা থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নির্দেশ করেছেন। তাঁর মানসের এ ক্রমবিকাশের ধারায় স্পষ্টই প্রতীয়মান হচ্ছে, তিনি ইসলামের ব্যাপক আদর্শের প্রতি ক্রমশই আসক্ত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁর মনের আগাছা-পরগাছাগুলো ক্রমেই উজাড় হয়ে পথ পরিষ্কার করে দিচ্ছে ইসলামের সত্যিকার জ্যোতি ধারণের জন্যে।

ইসলামের বিশাল, উদার জীবনদর্শনের প্রভাবে তাঁর মাঝে ভৌগোলিক জাতীয়তাবাদ প্রশ্রয় পায় নি। তাঁর কাব্যের সর্বত্র ফুটে উঠেছে মানব-জীবনের প্রতি

www.pathagar.com

অসীম দরদ, অকৃত্রিম সমবেদনা। এ অঞ্চলের সরস পরিবেশ থেকে উপমা-উদাহরণ নিলেও সংকীর্ণ জাতীয়তার অন্ধ মোহকে কোথাও তিনি প্রশ্রয় দেন নি।

২.

'সাত সাগরের মাঝি' কবির কাব্য-জীবনের প্রথম পর্যায়। এ যুগে শতাব্দীর এ অভিশাপ কবির প্রাণে আঘাত হেনেছে প্রচণ্ডভাবে। তিনি মর্মাহত হয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ঃ

এ কোন সভ্যতা আজ মানুষের চরম সত্তাকে
করে পরিহাস?
কোন ইবলিস আজ মানুষেরে ফেলি মৃত্যুপাকে
করে পরিহাস?
কোন আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে?
ভিজায়ে কুৎসিত দেহ শোণিত আসবে
কোন প্রেত অট্টহাসি হাসে?
মানুষের আর্তনাদ জেগে ওঠে আকাশে আকাশে!

এ সভ্যতা সত্যিকার মানুষের সভ্যতা নয়—এ তত্ত্বটি সম্বন্ধে কবি সম্পূর্ণ ওয়াকিফহাল—তাই তার ধ্বংস তিনি কামনা করেছেন বিপ্লবীর ভাষায় ঃ

আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও ঃ
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও।।

এ যুগের প্রত্যেকটি কবিতাতেই কবিপ্রাণে প্রচলিত জীবন-সংস্থার বিরুদ্ধে জেগেছে অগ্নিবর্ষী বিদ্রোহ। মানব-জীবন যে পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে আলোর সন্ধানে ঘুরে মরছে, তার শোধ দিতে হয়েছে হাজার হাজার জান কুরবান করে। সে জন্যে কুখ্যাত জালিম বাদশা শাহরিয়ারের মনেও জেগেছে আফসোস। সে আজ মরছে অনুশোচনার তীব্র দাহে ঃ

হাজার নাজুক কুমারীর মুখ ভাসায়ে লোহুর স্রোতে
ছুটেছিলো সিয়া জিন্দেগী নিয়ে যে পশু মৃত্যুপারে,
হাজার ইশারা ডেকে ডেকে গেছে তারে
থামে নি তবু সে অন্ধ ছুটেছে পথ হ'তে ভুল পথে।.....

তাই বাদশাহী আয়েশের মাঝেও সে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে ঃ

সাত আলিশান চাঁদোয়ার নীচে যেন এ গোর আজাব
জড়োয়া জড়ানো কিংখাবে জাগে এ মন সর্বহারা,
খুঁজে ফেরে শুধু দিলের দোসর তার;

www.pathagar.com

চিড় খেয়ে বুকে জেগে ওঠে শুধু সীমাহারা হাহাকার। কবি তাই বেরিয়েছেন সত্যিকার জীবন-সন্ধানে। যে জীবনে নেই কোন গ্লানি, নেই কোন আবিলতা, তারই সন্ধানে শুরু হয়েছে তাঁর মহা অভিযান। 'সিন্দাবাদ' কবি-মানসের সেই সন্ধানী দৃষ্টিরই প্রতীক। এ যুগের 'সিন্দাবাদ' চলেছে মহাসাগরের মহাতরঙ্গের মাঝে জীবনের আলোর সন্ধানে। এ 'সিন্দাবাদ' আব্বাসী যুগের বণিক 'সিন্দাবাদ' নয়; তার জীবনের লক্ষ্য পণ্যসম্ভার ক্রয়-বিক্রয়ের মধ্যে ধন-দওলতে ঐশ্বর্যশালী হওয়া নয়। এ যুগের সিন্দাবাদ চায় বার দরিয়ায় সফর করে জীবনের আস্বাদ পেতে। তার কাছে আহবান এসেছে ঃ

ডেকেছে আমাকে জিন্দেগী আর মওতের মাঝখানে
এবার সফর টানবে আমাকে কোন স্রোতে কেবা জানে!

স্রোতের মুখে কিশতী ভাসায়ে দিয়েই এ নাবিক পেয়েছে জীবনের আঘ্রাণ ঃ

এ আশ্চর্য আমাদের কাছে! কিশতী ভাসায়ে স্রোতে
আমরা পেয়েছি নিত্য-নতুন জীবনের তাজাঘ্রাণ'।

যে বিষদগ্ধ শহরতলীতে হাঁফিয়ে উঠেছিল জিন্দেগী, তা থেকে মুক্তি পেয়ে তাই এ যুগের নাবিক উল্লাসে নেচে উঠেছে ঃ

ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা, আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ,
ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ!

এ মহাযাত্রায় সংকট রয়েছে অনেক। ভীতির কারণ রয়েছে অগণিত। যে কোন মুহূর্তে এ কিশতী চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেতে পারে। তবু এ মাঝি নিরাশাবাদী নয়। সে জীবনের শক্তির উপর প্রত্যয়শীল। তাই শত বাধা-বিপত্তিতেও সে ভীত নয়। সে শক্তি পাচ্ছে নিজের জীবন থেকেই ঃ

ঝলসাতে থাক তোমার হালের চাকা,
চমকাতে থাক তোমার চোখের তারা,
দরিয়া সোঁতায় যেখানে এ তাজী ভেসে চলে দিশাহারা
দাঁড়াও সেখানে ভেঙে চলো এই মউজের কালো পাখা।

এ বিরাট অকূল সাগরে এ নাবিকের মনে কোন ভয় নেই, কোন শংকা নেই। কারণ তার দৃঢ় প্রত্যয়—সে এ সংকট-সংকুল যাত্রার পরিসমাপ্তিতে আলোর সন্ধান নিশ্চিতই পাবে। তার এ বিশ্বাস ব্যর্থ হয় নি। তাই মরণজয়ী খিজিরের এলাকায় পৌঁছে উল্লাসে উল্লসিত হয়ে সে ঘোষণা করছে ঃ

www.pathagar.com

এসেছি এখন তুফান বিজয়ী খিজিরের এলাকায়
এবারের ঝড় পাড়ি দিয়ে মোরা ফিরেছি বিজয়ী মাঝি!

তবু এ বিজয়ী মাঝির মন সম্পূর্ণ আশ্বস্ত হতে পারে নি। তার কাছে রাত্রিতে আহ্‌বান আসে। সে কান পেতে শোনে 'সাফা ও মারওয়া'র আহ্‌বান। সে আহ্‌বান শুনে সে চঞ্চল হয়ে ছুটে যেতে চায় নিশানবাহীর পতাকাতলে। সে জানে—কেবলমাত্র এ নিশানের নীচের মানুষ পেতে পারে পরিপূর্ণ জীবনের স্বাদ, সে জানে কেবলমাত্র এ নিশানই দিতে পারে মানবতার মুক্তি। তাই নিশানবাহীকে উদ্দেশ্য করে সে জানায় তার ব্যাকুল আবেদন ঃ

হে নিশানবাহী ! ওড়াও তবু ওড়াও
ও হেলাল রশ্মি আকাশে আকাশে ছড়াও

এ নিশান সামান্য নয় ! এ নিশান একবার উঠেছিল যেসব মহামানবের হাতে, তাঁরা কেবল বিশ্বজয়ের প্রতিশ্রুতি নিয়েই বেরিয়ে যান নি; তাঁরা মানব মনের আদি দুশমন নফসে আম্মারার বিরুদ্ধেও জেহাদ ঘোষণা করেছেন। সে নিশান আবার বাংলার শ্যামল বুকে, আউস ধানের দেশে মদীনার সৌরভ ছড়াবে বলে তার প্রতি নাবিকদের এত আগ্রহ! সাত সাগর পাড়ি দিয়েও এখন সে মাঝির যাত্রা হয়নি শেষ। যে পর্যন্ত না হেরার গুহার নূরের আলোয় সে পথের দিশা খুঁজে পাচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত তার বিরাম হ'তে পারে না। সামনে রয়েছে তার অমানিশার ঘোর অন্ধকার, কিন্তু ঃ

তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ-তোরণ,
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠেছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ....

'সিরাজাম মুনীরা' কবির কাব্যজীবনের দ্বিতীয় পর্যায়। এ পর্যায়ের কবি, জীবনপথের স্পষ্ট দিশা পেয়ে ছুটে চলেছেন সুদূর অতীতের এক অধ্যায়ে। মহানবীর জীবনে যে আদর্শ হয়েছিল পূর্ণ বিকশিত, যে আদর্শের রূপায়ণ হয়েছিল ইসলাম জগতের মহামানবদের জীবনে তাকে আবার দুনিয়ার বুকে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করার আকুল বাসনায় কবি আলোর জন্যে ছুটে চলেছেন 'হেরার রাজ-তোরণে'। মানব জীবনের যে চরম দুর্দিনে এ দুনিয়ায় মহানবীর আবির্ভাব হয়েছিল তার এক সুস্পষ্ট ছবি এঁকে তারই পাশে দাঁড় করিয়েছেন নবীজীর কল্যাণধর্মী জীবনের নানাবিধ দিক। তৎকালীন জীবনে যে 'জোড়াতালি দেওয়া' সমাজ-সভ্যতা গড়ে উঠেছিল, সে হালকা ঠুনকো সভ্যতা যে তাসের ঘরের মত ভেঙে যাবে তাতে বিস্মিত হওয়ার কিছুই নেই। সে সমাজের বুনিয়াদ সত্যিকার জীবনের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সে ছিল মানব-জীবনের এক বিকার। মানুষ

www.pathagar.com

তার আসল স্বরূপ চিনতে পেরেই ছুটে চলেছিল নবীজীর পতাকাতলে পূর্ণ বিকশিত জীবনের স্বাদ পেতে।

নবীজীর প্রদর্শিত পথে জীবন-বিকাশের জন্যে যারা জীবন উৎসর্গ করেছিলেন তাঁদের অমিয় জীবনকথা কবি আবার তুলে ধরেছেন বাংলা ভাষাভাষী পাঠকের সামনে। নবীজীর আদর্শের প্রেরণায় তাঁর অনুসঙ্গীগণ কোন সংকটেই বিচলিত হন নি কোনদিন। তাঁরা বিশ্ব-জুড়ে এক আদর্শ সংস্থা গড়ে তুলতে স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়েছিলেন। তাঁদের প্রত্যেকের মাঝেই ফুটে উঠেছিল নবী-জীবনের এক একটি বিশিষ্ট দিক। খুব স্বাভাবিকভাবেই ঃ

তাই সিদ্দিক পেয়েছে বক্ষে অমন সত্য সিন্ধু-দোল
তাই উমরের পাতার ডেরায় নিখিল জনের ও কল-রোল,
তাই উসমান খুলে গেলো দ্বার অতুলন দিল মণিকোঠার
তাই তো আলীর হাতে চমকায় বাঁকা-বিদ্যুৎ জুলফিকার,
খালেদ, তারেক ঝাণ্ডা ওড়ায় মাশুকের বুকে প্রেমের টান,
মহাচীন মুখে ফেরায়ে কাফেলা জ্ঞানযাত্রীরা করে প্রয়াণ।

*　　　　*

চলেছে ধ্যানের জ্ঞান-শিখা ব'য়ে জিলানের বীর, চিশ্‌তী বীর
রংগীন করি মাটির সুরাহি নক্‌শবন্দের নয়নে নীর
জ্ঞানের প্রেমের নিশান তুলেছে হাজার সালের মুজাদ্দিদ
রায়বেরেলির জঙ্গী দিলীর ভেঙেছে লক্ষ রাতের নিঁদ

নবীজী ছিলেন 'ওসওয়াতুন হাসানা'। মানব জীবনের পূর্ণ বিকাশ তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল বলে তিনি সর্বাবস্থায় মানুষের আদর্শ হতে পারেন। তাঁর জীবনের সারল্য—তাঁর জীবনের আদর্শনিষ্ঠা ফুটে উঠেছে প্রথম খলীফা হযরত আবু বকর (রাঃ)-এর জীবনে। তাই ঃ

অনুপ্রাণিত সে মহা আদর্শে চিত্ত যে তার সুরভি 'লালা'
সব প্রেমিকের সাথে সে সমান খলিফা মহান--ফিরিওয়ালা !

মানবজীবনের সে পূর্ণ আদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলেই দুনিয়ায় দেখা দিয়েছে কত অবিচার-অনাচার। দুনিয়া আজ বিত্তবান ও বিত্তহারার দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছে। কবির চিত্ত তাতে বেদনাবোধ করেছে তীব্রভাবে। সে হযরত উমরের জীবনে ফিরে যেতে চায়। সে আজ আফসোস করে মরে অতীতের সে মধুর মানবীয় সম্বন্ধের জন্য ঃ

সেদিনে এ-দিনে উমর ! আজ
পড়েছে বাঁধ
কবে যে সেখানে ঘনালো সাঁঝ

www.pathagar.com

নামলো এখানে সেই ছায়ায়
রাত অগাধ।
এখানে কেবল আর্ত স্বর
এখানে তোমার নাই খবর,
পড়ে আছি যেন শ্রান্ত শব:
আজকে এখানে নাই উমর।

এই অনাচার-অবিচারকে দুনিয়ার বুক থেকে চিরতরে উৎখাত করার জন্যে চাই উমরপন্থী মহামানবদের আবির্ভাব। কবি তাই বলেছেন ঃ

আজকে উমর-পন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ-পণ.
উষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা,
দিক-দিগন্তে তাদের খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা!

নবী-জীবনের ত্যাগের আদর্শে ছিলেন তৃতীয় খলীফা হযরত উসমান (রাঃ) উদ্বুদ্ধ। ব্যক্তিগত মালিকানা তিনি বিলিয়ে দিয়েছেন মানব সাধারণের কল্যাণে। এহেন মহামানবের কুৎসা কোন ঐতিহাসিক গ্রন্থে দেখতে পেয়ে তিনি অধীর হয়ে পড়েছেন--

যার অফুরন্ত দানে জনপদে বেড়েছে সুষমা
জীবনের শেষ কড়ি প্রয়োজনে রাখে নি যে জমা
বায়তুল মাল থেকে করে নি যে ব্যয় কপর্দক
কুৎসা গাহে তার নামে আজ কোন হীন প্রবঞ্চক ?

আপনাকে সম্পূর্ণ নির্দোষ জেনেও শুধু ভ্রাতৃহত্যার আশঙ্কায় হযরত উসমান (রাঃ) হত্যা বেসাতিতে লিপ্ত হন নি। তাঁর চরিত্রের এ মহত্ত্বে অভিভূত হয়ে কবি গাইছেন ঃ

মুক্তিকামী খলিফা সে, মৃত্যুকামী নহে সে ভ্রাতার
নিতে সে পারে না খুন, দিতে পারে প্রাণ-রক্ত তার!
বন্ধুর ঈমানে তার কোনদিন নাই অবিশ্বাস—

চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রাঃ) ছিলেন নবীজীর তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারী। তাঁর জ্ঞান সম্বন্ধে নবীজীর প্রশংসনীয় বাণী মুসলিম জাহানে সুপরিচিত—'আমি ইলমের শহর আলী তার দরওয়াজা'। তাসাওয়াফ বা আধ্যাত্মিক শাস্ত্রে তাঁকে বলা হয় চশমায়ে বেলায়েৎ (The fountain head of sainthood) অথচ হযরত আলীই (রাঃ) ছিলেন শেরে খোদা। তাঁর দু'ধারী জুলফিকারের আঘাতে কত অত্যাচারী পাষণ্ডের মস্তক হয়েছে ধূলিতে লুণ্ঠিত। কোমল ও কঠোরের এমন অপূর্ব সমাবেশ নবীজী ব্যতীত অন্য কোন

www.pathagar.com

মানুষের জীবনে আর দেখা যায় নি। তাঁর চরিত্রের এ বৈশিষ্ট্য অপূর্ব ভাষায় ফুটে উঠেছে কবির ছন্দে—

যার বল্লম চাষ করে গেছে লাখো জালিমের খুলি,
বদর আকাশে মেঘ হ'য়ে যার জমেছে পায়ের ধূলি,
ইহুদীর পিছে দেখ সে চলেছে সম্ভ্রম নত-শীর
মহাসেনানীর বিনয়ে মুগ্ধ মানবতা ধরণীর।

দুনিয়ার বুকে সত্যিকার মনুষ্যত্বের বিকাশের জন্যে যে ইসলামের হয়েছিল অভ্যুদয় তা আর টিকে থাকি নি প্রথম চার খলীফার খেলাফতের পরে। দুনিয়ার বুক থেকে শাহানশাহীর শেষ চিহ্নটুকু মুছে দেবার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ইসলাম দেখা দিয়েছিল এ ধরায়। কালের কুটিল চক্রে সে ইসলামের নামেই চলল আবার শাসন ও শোষণের নাগপাশ। তার নিষ্ঠুর পেষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল মানুষের বুকের পাঁজর। সে মানববিধ্বংসী শাহানশাহীর বিরুদ্ধে শেষ চেষ্টা করে ব্যর্থ হন ইমাম হোসেন (রাঃ)। তাই আজও কারবালার সে অমানুষিক হত্যাকাণ্ডের স্মৃতিতে মুহররম মাসে দুনিয়ায় ওঠে মাতমের রোল। কারবালাতে শুরু হলেও সে জুলুমশাহীর আজও হয় নি অবসান। দুনিয়ার সর্বত্র আজও চলছে কারবালা প্রান্তরের সে অবিচার-অত্যাচার পুরোদমে। কবির বিদ্রোহী আত্মা তাই আজ নিখিল জনের প্রতিভূ স্বরূপ নির্দেশ দিচ্ছে ঃ

উতারো সামান, দাঁড়াও সেনানী নির্ভীক-সিনা বাঘের মত।
আজ এজিদের কঠিন জুলুমে হয়েছে এ প্রাণ ওষ্ঠাগত
কওমী ঝাণ্ডা ঢাকা পড়ে গেছে স্বৈরাচারের কালো ছায়ায়
পাপের নিশানী রাজার নিশান জেগে ওঠে আজ নভঃ নীলায়,

*

তীব্র ব্যথায় ঢেকে ফেলে মুখ দিনের সূর্য অস্তাচলে,
ডোবে ইসলাম-রবি এজিদের আঘাতে অতল তিমির তলে,
কলিজা কাঁপায়ে কারবালা মাঠে ওঠে ক্রন্দন লোহু সফেন
ওঠে আসমান জমিনে মাতম, কাঁদে মানবতা ঃ হায় হোসেন।।

ইসলাম তবু মরে নি। ইসলাম মরতে পারে না। ইসলামের ভিত্তি মানব জীবনের গভীর অন্তঃস্থলে। নানাবিধ দ্বন্দ্ব, ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়েই সে আবার মানব জীবনে তার প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। মানুষ নানাবিধ পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়েই অগ্রসর হচ্ছে তার দিকে। যারা সে সব পরীক্ষার অপেক্ষা না করে সত্যিকার ইসলামের নূরের আভায় ছিলেন জ্যোতিষ্মান তাঁদের মধ্যে গাওসুল আজম হযরত আবদুল কাদের জিলানী, সুলতানুল হিন্দ হযরত মঈউদ্দীন চিশ্তি, খাজা নক্শবন্দ ও মুজাদ্দেদ-ই-আলেফেসানী, সেখ আহমদ সরহিন্দী (রঃ) অগ্রগণ্য। ইসলামী

www.pathagar.com

জীবনদর্শনের এক একটা দিক প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে এ সব মহামানবের জীবনে। নবী জীবনের আদর্শ থেকে বিচ্যুত মানবজীবনকে আবার তার পাথের দিশা দেবার জন্যে কবি হযরত আবদুল কাদের জিলানী (রঃ)-কে আহবান করেছেন ঃ

কাফেলার পথ ছেড়ে যে ফেরে তিমির—দুর্বিপাকে
জীলান সূর্যের রশ্মি তার চোখে দাও আজ আনি।
এ নীরন্ধ্র শর্বরীর অন্ধকারে তীব্র দ্যুতি হানি
তমিস্রা-বিমুক্ত নভে জাগাও নূতন সূর্যোদয়!

পুরাতন সভ্যতার ঐতিহ্যবাদী ভারতের বুকে যখন চলছিল নানাবিধ অন্যায় ও অবিচারের বন্যা, তখন হযরত খাজা মঈনউদ্দীন চিশ্‌তি (রঃ) এ দেশে উপস্থিত হয়েছিলেন আল্লাহর রহমত নিয়ে—তার উপস্থিতিতে তাই ঃ

---------------বহু শতাব্দীর মারীবিষ
(জড়ায়ে ছিল যে মিথ্যা হিন্দের কলুষ মৃত্তিকায়)
আবে হায়াতের ধারা তার বুকে ছড়াল আশীষ,
সত্যের প্রোজ্জ্বল শিখা দীপ্ত হল রাত্রির হাওয়ায়।

ইসলামে সদ্য দীক্ষিত মোগলেরা এ দেশের সংস্পর্শে এসে তৌহিদকে আবার ডুবিয়ে দেবার চেষ্টা করলে তার বিরুদ্ধে জেহাদে অবতীর্ণ হন হযরত আহমদ সরহিন্দী। প্রবল প্রতাপ মোগলদের ভ্রূকুটি অগ্রাহ্য করে তৌহিদের মশাল জ্বেলে তিনি আবার মানব মনের অন্ধকার বিদূরিত করেন। সে জন্যে তাঁকে নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে, তবু বিচলিত হননি একটুও। তাঁরই সে জিহাদের ফলে ভারতের বুকে ইসলামের হয়েছে পুনঃপ্রতিষ্ঠা, সে মুজাহিদ তাই ঃ

তৌহিদের সত্যে দীপ্ত পরিপূর্ণ সেই মুক্তরবি
হাজার বছর পরে এনেছিল মদীনার ছবি।।

ঐতিহাসিক কবিতাগুলি ব্যতীত অন্যান্য কবিতাতেও কবির প্রাণের সে আদি তৃষ্ণা ফুটে উঠেছে। কবি সর্বত্রই চেয়েছেন তৌহিদের সুরায় বিভোর হয়ে হেরার রাজ-তোরণের দিকে ছুটে যেতে।

৪.

বাঙলা ভাষায় কাব্যের ধারা যে স্রোতে প্রবাহিত যে ক্রম বিকাশের ধারা বেয়ে বাঙলা কাব্য হচ্ছে অগ্রসর—এঁর প্রত্যেক কবিতায়ই দেখা দিয়েছে তার ব্যতিক্রম। বৌদ্ধ দোঁহা, বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল কাব্য, মহাকাব্যের স্তর পার হয়ে বাঙলা কাব্য, গীতি কবিতার মধুর রসে অভিষিক্ত হয়ে এখন তা থেকে মুক্তি লাভের জন্যে করেছে সাধনা। নজরুল ইসলাম তার মাঝে সঞ্চার করেছেন মানব জনমের প্রতি শ্রদ্ধার ভাবধারা, জসীম

www.pathagar.com

উদ্‌দীন তাতে ঢেলেছেন গ্রাম জীবনের মাধুরী। সম্প্রতি শ্রেণী বিরোধের রক্তাক্ত সংগ্রামের জন্যে আহবান আসছে অতি আধুনিক কবিদের তরফ থেকে।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বাঙলার সে ঐতিহাসিক ধারা বেয়ে চলেন নি। তাঁর কাব্য প্রাণ খুঁজে পেয়েছে ইসলামের তৌহিদবাদে। তাঁর কাব্যে ভাষা থেকে ভাবের প্রাধান্য বেশী। তাঁর আসল বক্তব্য মানব জীবনের জন্যে তৌহিদের প্রয়োজন। সে তৌহিদকে তিনি যে ইতিহাসের পাতায় দেখেছেন রূপায়িত ইতিহাসের সে অধ্যায়কে তিনি আবার জীবন সংস্থায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করতে প্রয়াসী।

তাঁর কাব্য মহাকাব্য বা গীতিকাব্য কোনটিই নয়। মহাকাব্যের শক্ত গাঁথুনি ও উদার পরিসরের মাঝে গীতি কবিতার সুর সংযোগ করে তিনি তাকে করে তুলেছেন অনবদ্য। ভাবের গাম্ভীর্যে তাঁর কবিতায় মহাকাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্য থাকলেও গীতি কবিতার হালকা পরিবেশ তাতে নেই। ভাবের দিক থেকে তিনি জালাল উদ্দীন রুমী ও ইকবালের উত্তর সাধক।

দ্বিতীয়ত তার কাব্য কেবল আনন্দদায়ক Recreational নয়, Recreative সৃষ্টিধর্মীও বটে। তার প্রতিটি কবিতায় মানব জীবনকে আরও সুন্দর আরও শোভন করে তুলবার জন্যে আন্তরিক তাগিদ রয়েছে। তবু পীর-মুর্শিদের বাণীর মত তারা উপদেশ ধর্মী বা Deductive হয়ে ওঠে নি। এখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য।

পূর্বেই বলা হয়েছে, কাব্য-জীবনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি এসেছেন 'সিরাজাম মুনীরা'তে। এ পর্যায়েই ইসলামের সারতত্ত্ব তাঁর মনে পূর্ণভাবে দানা বেঁধেছে। তবু অতীত জীবনের বিজাতীয় শিক্ষা, সংস্কৃতি ও পরিবেশের ছাপ রয়ে গেছে। যে রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের ধ্বংসের জন্যে ইসলামের হয়েছিল অভ্যুদয়—সে সামন্ততন্ত্রের ধারণাগুলো এখনও কবির মন থেকে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন হয় নি।

প্রথম পর্যায়ের 'সাত সাগরের মাঝি'কে কবি উৎসর্গ করেছেন, 'বিশ শতকের শ্রেষ্ঠ তামদ্দুনিক রূপকার, দার্শনিক' মহাকবি আল্লামা ইকবালের অমর স্মৃতির উদ্দেশে। তাতে নিবেদন করেছেন—'তোমার নয়নে দীপ্তি সিকান্দার শাহার মতন'। ইকবালের নয়নের দীপ্তি যদি সিকান্দার শাহার মতই হয় তা'হলে বলতে হবে সে ইসলামের 'তামদ্দুনিক রূপকার' ইকবাল নয়—সে অন্য এক ইকবাল। নতুন পথের মোহে তৃপ্তিহীন অন্বেষণ থাকতে পারে মহাকবি ইকবালের বুকে, কিন্তু তাকে কি সিকান্দার শাহার দেশ জয়ের অতৃপ্ত আকাঙক্ষার সঙ্গে তুলনা করা চলে? কোথায় ইকবালের মরণজয়ী আত্মার অভিব্যক্তির উদ্বেল আবেগ আর কোথায় রাজ্যলিপ্সু সিকান্দারের সাম্রাজ্য বিস্তৃতির রক্ত-নেশা! রূপক হিসাবেও এমন তুলনা চলে না।

www.pathagar.com

'সিরাজাম মুনীরা'তে এসেও কবির মনের সে বাদশাহী অনুষঙ্গের (Association) নেশা ছুটে যায় নি। এমন কি হযরত রসুল আকরমের (দঃ) প্রশস্তি বর্ণনার সূচনাতে তিনি তাঁকে শাহানশাহের সঙ্গে তুলনা করেছেন। স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়, সামন্ততন্ত্রীয় পরিবেশের ছাপ তাঁর মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে বলে তা' থেকে এ পর্যায়েও তিনি সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারেন নি।

আমাদের সর্বদাই স্মরণ রাখতে হ'বে, রাজার আসন মানব জাতির পক্ষে আশীর্বাদ নয়—তার পক্ষে চরম অপমান। ইসলাম গোড়া থেকেই শাহানশাহীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তাকে যেখানে পেরেছে সেখানেই উৎখাত করেছে।

তবু আশার কথা এই যে, এ কবির প্রতিভা এখনও বিকাশশীল। তাঁর সাম্প্রতিক রচনায় তাঁর বর্তমান মননধারার স্পষ্ট রূপ পাওয়া যায়। মাত্র কিছুদিন আগে প্রকাশিত সৈয়দ আবদুল মান্নান কৃত 'আসরারে খুদী'র বাঙলা অনুবাদের ভূমিকায় কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যে অসমান্য শক্তির পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর কবি-জীবনের প্রতিশ্রুতি আমাদের কাছে জাজ্বল্যমান হ'য়ে পড়েছে। সে কবিতা নিঃসন্দেহে বাঙলা সাহিত্যের স্থায়ী সম্পদ হওয়ার যোগ্য। কবি-মানসের বর্তমান পরিণতির পরিচয় হিসাবে নিম্নে ক'টি পঙক্তি তুলে দেওয়া গেল ঃ

দূর মদীনার শমীম সবুজ শীষে
এসেছে নতুন গান—
স্বপ্ন দেখিছে হেজাজী হাওয়ায় মিশে
সোনালী পাকিস্তান ।
স্বপ্ন দেখিছে বোত-শিকনির দিন
জিঞ্জিরহীন লাখো অমলিন দিন।
সী-মোরগ এক শোনে আকাশের ডাক
মুর্দার মত বন্দী ও'তান পরে
নওবাহারের দিনে এল বৈশাখ
আজাদীর পথে ডেকে গেলো হা হা স্বরে।

দেরী শুধু তার জিঞ্জির খোলবার—
দেরী শুধু তার নীল নেশা ভোলাবার—
তবু তোলপাড় শোনে সে তারার
উধাও বহ্নিস্রোতে—

www.pathagar.com

দুর্মর বেগে পয়ামের সুর ওঠে কোথা রণরণি—
ফারানের বুকে বহু দূর পর্বতে
নতুন দিনের বিশাল পক্ষধ্বনি।

এ পক্ষধ্বনি কেবল অনাগত বিশ্ব-সংস্থা গঠনের জন্যে নয়, এ পক্ষধ্বনি কবি-জীবনের তৃতীয় পর্যায়েরও। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বর্তমানে যে পূর্ণ বিকশিত মানসের অধিকারী, তার ফল দেখা দিচ্ছে তাঁর সদ্য-প্রকাশিত অনেকগুলো কবিতায়। সাময়িক পত্রাদির পাঠক-পাঠিকার কাছে এ সংবাদ নতুন নয়। আমরা আশা করি, তৃতীয় পর্যায়ে কবির দানে সমৃদ্ধ হ'য়ে উঠবে আমাদের কাব্য—সে সকল রসের আস্বাদই যোগাবে ন—মানব-জীবনের পূর্ণ বিকাশের দিকদিশারী হ'য়েই সে দেখা দেবে অদূর ভবিষ্যতে।

www.pathagar.com

আবুল ফজল

তাঁর বিশ্বাস অকৃত্রিম

১.

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অকালমৃত্যুতে বাংলা কাব্য-সাহিত্যের যে ক্ষতি হলো তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তিনি এক বিশেষ কাব্য-ধারার অনুসারী এবং নিজস্ব একটা আদর্শ আর ভাব-কল্পে ছিলেন বিশ্বাসী, তাঁর কাব্য-দেহে এসবের প্রতিফলন অসন্দিগ্ধ। আমরা যারা কিছুটা বিপরীতপন্থী, তারাও তাঁর কবিতায় ধর্মীয় চেতনা ও ঐতিহ্যের একটা অনাবিল স্বাদ পেয়ে থাকি। তাঁর বিশ্বাস আর উপলব্ধি অকৃত্রিম আর একান্ত আন্তরিক বলে, এ ধরনের ভাবাদর্শে রচিত বহু কবিতা হয়ে উঠেছে উজ্জ্বল, উচ্ছল ও হৃদয়স্পর্শী। অনড় বিশ্বাস আর আবেগের তোড়ে তিনি খাঁটি কবিতার সীমা লংঘন করেন নি; বক্তব্যের উচ্চরোল অনেক সময় কবিতাকে বিঘ্নিত করে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বেলায় তা ঘটে নি; কবিতার মূল্যে কণ্ঠস্বরের দাম বাড়াবার কোশিস করেন নি তিনি। খাঁটি কবির এসব লক্ষণ তাঁর কবি-সত্তার মর্মমূলে সব সময় সক্রিয় ছিল বলে তাঁর কবিতা কখনো হয়ে পড়েনি স্রেফ প্রচার-সর্বস্ব, তাঁর পাঠকদের পক্ষে এটি পরম সৌভাগ্যের কথা।

তাঁর সমসাময়িক কবি-কূলের মধ্যে তিনি এতখানি বিশিষ্ট, স্বতন্ত্র ও একক ছিলেন যে তাঁকে সহজে কাতারবন্দী করা যায় না। তাই তাঁর তিরোধানে এমন এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছে যার জন্যে আমরা বিপরীতমনারাও বেদনাবোধ না করে পারি না। কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ শুধু যে এক বিশেষ ঐতিহ্যানুসারী ছিলেন তা নয়, সে সঙ্গে ঐতিহ্য সন্ধানীও ছিলেন। চেয়েছিলেন বাংলা কাব্যে নতুন ঐতিহ্য নির্মাণ করতে। তাই ইসলামের হারানো ইতিহাস আর নানা কাব্য ও কল্পকাহিনীতে তিনি তাঁর ধ্যান আর কবিতার উপজীব্য খুঁজেছেন এবং তাঁর সৃজনশীলতাকে তাতেই রেখেছিলেন অনেকখানি সীমিত। সিন্দাবাদ, হাতেম ও নৌফেল ইত্যাদি নাম-চরিত্র এ কারণেই তাঁর কাব্যের অনুষঙ্গ হয়েছে বারবার। মনে হয় কবি আরব্যোপন্যাসের মুগ্ধ পাঠক ছিলেন। ফলে 'হাজার এক রজনী'র বহু ঘটনা ও চরিত্র কবির হাতে পেয়েছে নতুন প্রাণ। 'শাহেরজাদী' আর শাহেরজাদীর মুখে মুখে রচিত বহু কল্প-চিত্র ও চরিত্র রচনাগুণে হয়ে উঠেছে 'কাব্যের সত্য'। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এ কবি-কীর্তি বাংলাকাব্য–রসিকদের কাছে দীর্ঘকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

www.pathagar.com

ইংরেজ যুগ, পাকিস্তান আমল, পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ—এ তিন সংঘাতমুখর যুগের অনেক ঝড়-ঝাপটায় আরো অনেকের মতো, এ কবির জীবনও কেটেছে। এ ঝড়-ঝাপটায় অনেকে বিচলিত হয়েছেন, হয়েছেন লক্ষ্যভ্রষ্ট। অনেক কবি সাহিত্যিক শিল্পীও এ পরিণতি এড়াতে পারেন নি। অনেকের মন-মানস নোঙরহীন নৌকার মতো বারবার দোলা খেয়েছে একাৎ ওকাৎ। কিন্তু কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অবিচল থেকেছেন সর্ব অবস্থায় নিজের লক্ষ্য ও আদর্শে। চরম দুঃখ-দুর্দিনেও 'হেরার রাজ-তোরণ' থেকে চোখ ফেরান নি তিনি ডানে কি বাঁয়ে। এ অস্থির যুগে একনিষ্ঠার এমন নজীর বিরল বললেই চলে।

এর বাইরে স্বদেশের প্রকৃতিও তাঁকে আকর্ষণ করেছে এবং চারিদিকের মানুষের দুঃখ-দুর্দশায় তাঁর মন হয়েছে আলোড়িত। তাঁর বহু কবিতা আর সনেটে এ সবের আশ্চর্য প্রতিফলন পাঠকের নজরে না পড়ার কথা নয়। তবে আমৃত্যু তাঁর কবি-দৃষ্টির সামনে ধ্রুবতারা হয়েছিল ইসলাম আর ইসলামী ঐতিহ্য এবং যা কিছু তার সঙ্গে সম্পৃক্ত।

সংখ্যাতীত অক্ষর–জানা লোক এখন কবিতা লিখে থাকেন, কিন্তু তাঁদের অনেকে মোটেই কবি নন। কবিতাকে সহজতম সাহিত্যকর্ম মনে করে এঁরা অহরহ অজস্র অপাঠ্য পদ্য লিখে থাকেন। দীর্ঘ প্রস্তুতি, কবি-মানস আর কবি-দৃষ্টির অধিকারী না হলে যেন-তেন প্রকারে পদ্য একটা দাঁড় করানো যায় না যে তা নয়, কিন্তু তা কবিতা হয় না। একটা সুনির্দিষ্ট মতাদর্শে প্রবলভাবে বিশ্বাসী থেকেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বিশুদ্ধ কবি ছিলেন। এ কারণে আপন লক্ষ্যে এতখানি সনিষ্ঠ থেকেও কবিতার নানা স্রোতে বিচরণ তাঁর পক্ষে সহজ হয়েছে। আদর্শনিষ্ঠ কবি সাধারণত একচোখা, তথা একস্রোতা হয়ে থাকেন। সুখের বিষয়, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তা হন নি। রচনার অজস্রতায়, আঙ্গিক আর ভাবের বৈচিত্র্যে, নতুন আমদানী করা শব্দসম্ভারে এ কবি নিশ্চিতভাবে আমাদের সাহিত্যের সম্পদ বাড়িয়েছেন। তাঁর এসব অবদান মূল্যবান ও স্বীকৃতির দাবী রাখে।

২.

ফর্‌রুখকে কৈশোর বয়সে ছাত্র হিসেবে দেখেছি। তিনি একবার আমাকে, আমি কলকাতা যাচ্ছি শুনে হুইটম্যানের 'লীভস অব গ্রাস' এক কপি আনার জন্যে অনুরোধ করেছিলেন। এ থেকে বুঝতে পারা যাবে তিনি শৈশব থেকে, কৈশোর বয়স থেকে কিভাবে কাব্য সাধনাকে গ্রহণ করেছিলেন। অত্যন্ত নিষ্ঠা আর সততার সঙ্গে তিনি নিজেকে ভবিষ্যৎ কবি জীবনের জন্যে তৈরী করেছিলেন। এবং তাঁর এ প্রস্তুতি যে অত্যন্ত সাফল্য অর্জন করেছে এ বিষয়ে আমি নিঃসন্দেহ। আদর্শনিষ্ঠা ও জীবন-আদর্শকে তিনি জাতির সামনে তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। শুধু যে তিনি নৈতিক চেতনা বা ধর্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ ছিলেন তা নয়। নিজের স্বদেশকেও তিনি অত্যন্ত

www.pathagar.com

ভালবাসতেন। স্বদেশের বহু বিষয় নিয়ে তিনি অত্যন্ত অনবদ্য কবিতা লিখেছেন। বাংলাদেশের বহু দৃশ্যকে, বহু বিষয়কে তিনি তাঁর কাব্যের উপকরণ করেছেন। তাঁর 'মুহূর্তের কবিতা'য় তিনি বহু অনবদ্য সনেট লিখেছেন। সে রকম একটি সনেটের নাম 'ধানের কবিতা'—

কুমারী, কনকতারা, সূর্যমুখী, হাসি, কলমী আর
আটলাই পাশপাই ধান—এ পুণ্য বাংলার মাঠে মাঠে!
আউস ধানের স্বপ্নে—কিষাণের দিন-রাত্রি কাটে;
আমনের বন্যা আনে ফসলের সম্পূর্ণ জোয়ার।
শোকর-গোজারী করে তারপর দরবারে খোদার
গোলায় তোলে সে ধান—-রূপসা'ল তিলক কাচারী
বালাম, ক্ষীরাইজালি, দু'ধসর—মাঠের ঝিয়ারী
কৃষাণ পল্লীতে আনে পরিপূর্ণ সুরের সম্ভার।

ধান, ধান, ধান, শুধু এ ধানের স্বপ্নে দিন গণে
মাঠের মানুষ যত! ফাল্‌গুনে জমিন ক'রে চাষ,
বৈশাখে ছড়ায়ে বীজ প্রতীক্ষায় থাকে দীর্ঘ মাস,
কখনোও শংকিত চিত্ত উত্তরের ঝড়ে ও প্লাবনে
কখন শিশির ঝরা ভোরে পেয়ে সুরভি আশ্বাস
অজস্র ধানের শীষে: এই পাক বাংলার অঙ্গনে।।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি' আমাদের সাহিত্যে বলা যায় সারা বাংলা সাহিত্যে একটি বিশিষ্ট গ্রন্থ। তিনি সেখানে তাঁর আদর্শের কথা যে অপূর্ব আনন্দ-উচ্ছল ছন্দে প্রকাশ করেছেন সেটা চিরকালই কাব্যরসিকদের কাছে প্রিয় হয়ে থাকবে। তাঁর সবচেয়ে বড় গুণ হ'ল তিনি কখনও নিজের আদর্শকে বিসর্জন দেন নি। কোন অবস্থাতেই, কোন প্রলোভনে পড়ে তিনি তাঁর নীতি নিয়ে কোন আপোস করেন নি। দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করেছেন,—অভাবের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন, কিন্তু নীতি নিয়ে কোন আপোস করেন নি। তাঁর ধর্মচেতনা, নৈতিকতা বোধ অত্যন্ত দৃঢ় ছিল। সেগুলি তাঁর রচনায় প্রতিফলিত হয়েছে। 'সাত সাগরের মাঝি'র পর তাঁর বিশিষ্ট রচনা 'সিরাজাম মুনীরা'। সেখানে তিনি মুসলিম ইতিহাস থেকে বহু মহাপুরুষের জীবন নিয়ে জীবনের মহত্ত্বের দিকগুলি তাঁর পাঠকদের কাছে তুলে ধরেছেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ শুধু গীতি-কবিতা বা খণ্ড কবিতা লেখেন নি। তিনি নাট্যকাব্য লিখেছেন 'হাতেম তায়ী'কে' নিয়ে। এই কাব্যের সর্বত্র দেখতে পাওয়া যাবে তাঁর

www.pathagar.com

আদর্শ। এভাবে স্বদেশের একটি প্রধান সম্পদ এদেশের মানুষের প্রধান খাদ্যকে নিয়ে তিনি অনবদ্য কবিতা লিখেছেন। এরকম আরও বহু কবিতায় তিনি বাংলাদেশকে প্রকাশ করেছেন। একদিকে ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে তিনি কাব্যে রূপ দিয়েছেন আর একদিকে স্বদেশকে তিনি কাব্যের বিষয়বস্তু করেছেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ও তাঁর কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। আমাদের সাহিত্যে তাঁর যে অবদান, আমরা স্মরণ করছি সেই অবদানকে এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করছি তাঁর বিদেহী আত্মার প্রতি। তাঁর কাব্য-পাঠকেরা তাঁর কাব্য পাঠ করে আনন্দ পাবেন; এবং আমার বিশ্বাস দীর্ঘকাল ধরে তাঁর কাব্য এদেশে অর্থাৎ বাংলাদেশে পঠিত হবে। সেটাই হবে তাঁর স্মৃতির প্রতি সবচেয়ে বড় শ্রদ্ধা-নিবেদন।

www.pathagar.com

মুজিবুর রহমান খাঁ

নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যেমন জরিন-কলম, তেমনি শিরিণ-কলম কবি। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় আমরা রং-এর তীক্ষ্ণ পরিচয় পাই আর পাই শহদের নিবিড় স্বাদ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'সাত সাগরের মাঝি'ই তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। 'সাত সাগরের মাঝি'র উনিশটি কবিতার সর্বশেষ কবিতা হলো 'সাত সাগরের মাঝি'। এই কবিতাটির নামেই বইটির নামকরণ হয়েছে। কাব্য-মূল্যায়নের প্রয়োজনীয় পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কবিতাগুলোর পরিচিতি দিলে ভাল হয় এবং একটি একটি করে তাই আগে দিচ্ছি। প্রথমে 'সাত সাগরের মাঝি' ও পরে তার পরিপূরকধর্মী অন্যান্য কবিতার পরিচয় দেব। 'সাত সাগরের মাঝি'-র মোদ্দা কথা হলো ঃ

অনেক আঁধার পারায়ে ভোর হয়ে এলো। নারঙ্গী বনে সবুজ পাতা কাঁপছে। দুয়ারে সাত-সাগরের সফেন জোয়ার। হে নাবিক, এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না। অচল ছবির মত জাহাজ দাঁড়িয়ে আছে—হালে তার পানি নাই, পাল তার অবনমিত। হে নাবিক, তুমি জাগো, মাঝি-মাল্লার দলে এসো। সাগরজলে আবার তোমার কিশ্‌তি ভাসবে, আবার তরঙ্গ কেটে কেটে কিশ্‌তি চলবে। অনেক দেরী হয়ে গেলো, তোমার কি ঘুম ভাঙবে না?

জেগে দেখো, ক্ষুধিতেরা ভীড় করছে। আজ তোমার বেসাতি ছড়াতেই হবে। তুমি কি দেখছ না, আলেয়ার পিছে পিছে ওরা শুধু নেমে যাচ্ছে। তোমার সেতারা তো উজ্জ্বল। দেখ, দিগন্তরে তোমার কত লালা রায়হান জমা হলো। তুমি ভয় পাও কেন, তুমি কেন ভয়ে কাঁপ!

তোমার জাহাজ কি বানচাল হয়েছে? তোমার ভাগ্যের সেতারা কি মেঘে ঢাকলো? তোমার জাহাজের হাল কি ভাঙা? এসব আমি জানি না, তবু তোমাকে ডাকছি। তুমি সাত দরিয়ার মাঝি। প্রবাল দ্বীপের নারিকেল শাখা বাতাসে বেজে উঠেছে। তোমার মাঝি-মাল্লারা আজ অধৈর্য। সাত-সমুদ্র আক্রোশে ফুলছে। অচেনা যাত্রীরা আজ পথে চলেছে। তোমার বেসাতি মারজানে মর্মরে কে পূর্ণ করে? তুমি কি এখনো দুঃস্বপ্নে ডুবে আছো? উচ্ছৃংখল রাত্রির দেনা কি তোমার মেটে নি? কখন সে যে সকাল হয়ে গেল, তবু তুমি জাগলে না। তাই তোমাকে বলি ঃ

www.pathagar.com

তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে, কাঁকরে দিনের জাফরান খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট চুমি'
পরীর দেশের স্বপ্ন-সেহেলি জাগে গুলে-বকাওলী"!

মনে নাই সেই প্রথম সফরের কথা, অজানা ফুলের দেশে তোমার যাত্রা, আর সবার চোখে জামরুদ তোলার স্বপ্ন চন্দ্রালোকে জ্বলছিল। তোমার অশ্রান্ত সন্ধানী জাহাজ নোনা পানিতে কোথায় যেন ভেসে চলেছে। মনে পড়ে কোন বন্দরে এসে জাহাজ তোমার ভীড়ল। শুধু এইটুকু মনে পড়ে, সেখানে তোমার জাহাজ মারজানে মর্মরে ভরে উঠেছিল।

কবে ঝরে তোমার পাল ছিঁড়ে গেলো। মন তোমার আজ দুঃস্বপ্নে ভরা। মনে হয়, মৃত্যুর কাল অজগর ফণা তুলেছে, তোমার আকাশকে তারা বিষাক্ত করে তুলেছে। হে নাবিক, বাতাসে তোমার রুদ্ধ কপাট বেজে উঠেছে, তবু কি তুমি শুনবে না ? আজ তুমি ভুল করো না ঃ

এ নয় জোছনা—নারিকেল শাখে স্বপ্নের মর্মর,
এ নয় পরীর দেশের ঝরোকা নারঙ্গী বন্দর
এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার,
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার।

সুতরাং তোমাকে জাহাজের পাল আজ তুলতেই হবে। পাল তোমার ছেঁড়া হতে পারে, মাস্তুল হতে পারে তোমার ভাঙা, তবু তোমাকে জাহাজ ভাসাতেই হবে।

বহুদিন আগে তোমার স্বপ্নমুগ্ধ রাত বাসি হয়ে গেছে। সম্মুখে কঠিন ঝড়। তার সর্প চিক্কন জিহ্বায় মৃত্যুর ইঙ্গিত, তার পুচ্ছ ঘাতে তোমার রঙিন মিনার ভেঙে পড়ছে। তবু ভয় পেলে চলবে না। শতাব্দীর কিশ্‌তি তোমার ভাসাতেই হবে।

এখানে যদিও রাত্রি নেমে এসেছে, তবু বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ দেখা যায়। এখানে মানুষ ক্ষুধায় কাতর—দুচোখে তার আঁসু। সম্মুখে পথ তোমার কঙ্করময়, দুস্তর বাধা-বিপত্তি, চারিদিকে পিশাচের হামাগুড়ি, শকুনিরা মাথার উপর ছায়া ফেলেছে, তবুওঃ

ফেলেছি হারায়ে তৃণঘন বন, যত পুষ্পিত বন,
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ-তোরণ...
শাহী দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা।

হে মাঝি, তোমার জাহাজ ভাসাবার আর দেরী কত ? বাতাসে তোমার পাল কাঁপছে—নোনা পানি এসে তোমার হাল ছুঁয়েছে। এবার তোমার জয়যাত্রা শুরু হোক—

www.pathagar.com

আর দেরী নয়। তুমি জান, অনেক দেরী হয়ে গেছে। জাহাজ ভাসানোর মৌসুম অনেক এসে চলে গেছে। কত এলাচের দানা উড়ে গেছে, দারুচিনির শাখা পড়েছে ভেঙে, কত সুবাস বাতাসে ঝরে গেলো। অনেক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। মৃত্যু তোমার এখন আক্রমণোদ্যত। যদিও নারঙ্গী বনে সবুজ পাতা কাঁপছে, তবু মাটির টানে একদিন তা ধূসর হয়ে যাবে। তবে জানি, তার দান ব্যর্থ হবে না। তার সঞ্চয়ে নারঙ্গী আবার রক্তিম হবে। যদিও মৃত্যুর নিঃশ্বাস শুনছি তবু মনে আশা আছে, স্বপ্ন আছে অপরিসীম। হে মাঝি, তুমি ভয় পেও না। তুমিও হেরার পথিক তারার বিস্ময় কুড়াতে পার। ঝড়ে নারঙ্গী পাতা ঝরে যায়, যাক। হেরার রাজ-তোরণ তোমার আকাশে মাথা তুলে আছে। হে মাঝি, তুমি ভয় পেও না। জানি, তোমার পথে মরু আছে, নোনা দরিয়ার পানিও আছে। তবু মনে রেখো, পথে আবার মঞ্জিল আছে, ছায়াতরু আছে, আছে মিঠাপানি ঃ

তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গর তোলো,
এবার অনেক পথশেষে সন্ধানী!
হেরার তোরণ মিলবে সমুখে জানি!
তবে নোঙ্গর তোলো,
তবে তুমি পাল খোলো,
তবে তুমি পাল খোলো।

রূপ-প্রকৃতির দিক থেকে 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতাটি 'সাত সাগরের মাঝি' গ্রন্থের ভিতর নিঃসঙ্গ নয়। গোষ্ঠীগত দৃষ্টিকোণ থেকে যদি বিচার করি, তবে এ ধরনের কবিতা এ বইয়ে আরো কয়েকটি পাই। 'সিন্দাবাদ', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি', 'পাঞ্জেরী' 'সাত সাগরের মাঝি'র গোষ্ঠীতেই পড়ে। প্রথম কবিতা 'সিন্দাবাদ'-এর মর্ম হলো ঃ নোনা দরিয়ার ডাক এসেছে। তার রঙিন মখমল দিনের অবসান হয়েছে। নূতন পানিতে নূতন সফরের দাওয়াত এসেছে। কবি লিখেছেন ঃ

আহা, সে নিকষ আকীক বিছানো কতদিন পরে ফিরে
ডেকেছে আমাকে নীল আকাশের তীরে,
ডেকেছে আমাকে জিন্দিগী আর মওতের মাঝখানে
এবার সফর টানবে আমাকে কোন স্রোতে কেবা জানে!

খোদার আলমের বিচিত্র ডাকে ভোগ-বিলাসের বাঁধন ছিঁড়ে দুঃখ-অভিমান ত্যাগ করে নব নব সম্পদের সন্ধানে আবার জাহাজ ভাসাতে হবে। নূতন সমুদ্র-যাত্রার দুর্বার আহ্বান সিন্দাবাদকে কবুল করতেই হবে।

'বার দরিয়ায়' নাবিক বিচিত্র প্রলোভন ও বিপদ সঙ্কটের অভিযাত্রী, তাকে স্রোতঘূর্ণি তুচ্ছ করে চলার মত্ততায় সমুদ্রের ঢেউ ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাসতে হবে। আলবুর্‌জের চূড়ার যত ঢেউ ছুটে আসতে পারে, আসুক। কিন্তু মাঝিকে এগুতেই হবে। মরদের মত

www.pathagar.com

মউজের বুকে জাহাজের হাল সামলিয়ে তাকে চলতে হবে। এ দায়িত্ব থেকে তার নিস্তার নাই ঃ

নিপুণ হাতের বলিষ্ঠ পেশী যদি পড়ে যায় ছিঁড়ে
তবে তুরন্ত বদলায়ে নাও হাত,
এক লহমার গাফলতে জেনো এই মৃত্যুর তীরে
ডোবাবে অতলে প্রবল ঝন্‌ঝাঘাত।

এমনিতর সংগ্রামের শেষে মাঝির জীবনে বিজয় আসে। বা'র দরিয়ারও মাঝি বহু ত্যাগ-ক্ষতির পর বিজয়ী হলো। তারই ছবি আঁকতে যেয়ে কবি লিখছেন ঃ

দেখ আসমানে ফোটে সিতারার কলি,
আরশির মত নিটোল পানিতে মুখ দেখে বকাওলি।
এসেছি এখন তুফান বিজয়ী খিজিরের এলাকায়
এবারের ঝড় পাড়ি দিয়ে মোরা ফিরেছি বিজয়ী মাঝি।
দেখ আমাদের নিশান উড়ছে নীল আকাশের গায়ে
কেশর ফোলানো পাল নিয়ে ফের ছুটছে সফেদ তাজী।।

'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতায় কয়েকজন বিমর্ষ গৃহবিরহ-কাতর মাঝি-মাল্লা সিন্দাবাদকে ঘিরে সুখ-দুঃখের কথা বলছিল। স্বঘরের সন্ধ্যাদ্বীপের মায়া মাঝিদের প্রাণ করে তুলেছিল উতলা। চতুর্থ মাল্লার উক্তি এখানে তুলে দেয়া হলো ঃ

দজলার পাশে খিমার দুয়ারে হাসিন জওয়ানি নিয়ে
যেখানে আমার জীবনের খা'ব মন ছুটেছিল সেথা,
কাফেলার বাঁশী বয়ে এনেছিল জহরের মত ব্যথা!
কলিজার সেই রুদ্ধ বেদনা শুনেছি ঝড়ের স্বরে।

মাল্লাদের মুখে গৃহী-জীবনের সুখ ও স্বাদের কথা। কিন্তু সিন্দাবাদ বলছে কেবল সমুদ্র-সফরের বিচিত্র অভিজ্ঞতার অনুভূতি, নবনব সাফল্যের কাহিনী। তাই, গৃহ-সুখকামী এসব মাল্লাদেরই জবাবে সিন্দাবাদ বলছে, তোমারা ঘরে ফিরবে ফের, কিন্তু তোমরা—

ভুলে যেও না এ মাল্লার জিন্দিগী,
শুরু করো ফের নতুন সফর আজি,
দেখ মাস্তুল জ্বেলেছি নতুন বাতি;
মৌসুমী হাওয়া পাল ভ'রে ওঠে বাজি।

আমার মতে 'পাঞ্জেরী' এ বই-এর সুন্দরতম কবিতা। পাঞ্জেরী কবিতায় কবি পাঞ্জেরীকে জিজ্ঞাসা করছেন, রাত পোহাবার আর দেরী কত? পাঞ্জেরীকে অতন্দ্র দিশারী

www.pathagar.com

হয়ে থাকতে হবে, তাকে জাগতে হবে এবং রাত পোহাবার সঠিক খবর তাকে দিতেই হবে। কারণ ঃ

সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারী,
ঘরে ঘরে ওছে ক্রন্দন ধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।
ওকে বাতাসের হাহাকার—ওকি রোনাজারি ক্ষুধিতের!
ওকি দরিয়ার গর্জন—ওকি বেদনা মজলুমের!
ওকি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী!
পাঞ্জেরী!
জাগো! বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রুকুটি হেরি,
জাগো! অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি;
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী!!

'সাত-সাগরের মাঝি' একটি সার্থক প্রতীকী। এমন সুন্দর ঐতিহ্যভিত্তিক কাব্য-প্রতীকী আমাদের সাহিত্যে বেশী আছে বলে আমার জানা নাই। তবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর কবিতায় প্রতীকী অবলম্বন করার ব্যাপারে পথিকৃতের দাবীদার, একথা আমি বলবো না। অনেক প্রতীক-ধর্মী কবিতা নানা সাহিত্যে রচিত হয়েছে। সমুদ্রের অভিযাত্রী নাবিক জীবনের বিচিত্র কথা নিয়ে সুপ্রাচীন কাল থেকে কবিতা লেখা হয়েছে। হোমারের ওডিসির গল্প সকলেই জানেন। ইউলিসিস ট্রয় যুদ্ধের পর অশ্রান্ত সমুদ্র জীবনের ও জাহাজডুবির দীর্ঘ দিনের অভিজ্ঞতা নিয়ে বাধা-বিপত্তির উত্তুঙ্গ তরঙ্গে ভেসে ভেসে স্বঘরে ফিরে আসে।

আলেফ লায়লার বীর নাবিক সিন্দাবাদের কাহিনী, সমুদ্র পথে সফরের পর সফরের বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত। বাধার পর বাধা এসেছে, বিপদের পর বিপদ—তবু সিন্দাবাদ হার মানে নাই, পরাজয় বরণ করে নাই। ভীরু ও কমজোরের আয়েশী গৃহের স্থবির জীবন সে বেছে নেয় নাই। সিন্দাবাদের সমুদ্রাভিযান নিয়ে নানা ধরনের বই-গল্প, কবিতা নানা সাহিত্যে রচিত হয়েছে। আলোছায়া-ঘেরা কিংবদন্তীর ধূসর অধ্যায় থেকে যদি আমরা আলোকদীপ্ত ইতিহাসের পাতায় চলে আসি, তখনো আমারা পাই দুঃসাহসী অভিযাত্রী কলম্বাসের অভিযানের বিবরণ। কলম্বাসের অভিযানের উপর কল্পনার রং বুলিয়ে সাহিত্যে অনেক নতুন ধরনের কিস্‌সা-কাহিনী রচিত হয়েছে। নব নব আবিষ্কারের স্বপ্ন নিয়ে আরো বহু অভিযাত্রী নাবিক দুর্গম দুস্তর পাথারে জাহাজ ভাসিয়েছেন এবং তাঁদের কথাও আমরা পড়েছি। এসব অভিযাত্রী পাঞ্জেরী আর শুধু ইতিহাসের পাতার চরিত্র নন, তাঁরা মানুষের বহু সাহিত্যকর্মের মধ্যে নানারূপে নানা রঙের প্রতীক হয়ে বারবার দেখা দিচ্ছেন। এমনি একটি সত্য কল্পনাকেন্দ্রিক বহু-বিচিত্র প্রতীককে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

www.pathagar.com

কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে অবলম্বন করেছেন এবং সুন্দর ও সফল পরিণতি দিতে সক্ষম হয়েছেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আলেফ-লায়লার সিন্দাবাদের তাৎপর্যময় ভাব ও ছায়াকে আশ্রয় করে তাঁর কবিতা লিখেছেন এবং ঠিকই করেছেন। একথা এখানে মনে রাখা উচিত, সাহিত্যের অমর সৃষ্টি 'আলেফ-লায়লা' এবং বিশেষ করে তার 'সিন্দাবাদের কাহিনী' সে কালের নবজাগ্রত, বিস্ফোরণমুখী এবং সম্ভাবনাময় আরব জীবনেরই প্রতীক। সেদিন আরব জীবনে যে যৌবন-জল-তরঙ্গ দিকে দিকে ফেটে পড়েছিল তার প্রকৃতি বোঝাবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কবিতার একটু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে ঃ

হিল্লোলিয়া, মর্মরিয়া
কম্পিয়া, স্খলিয়া, বিকিরিয়া, বিচ্ছুরিয়া,
শিহরিয়া, সচকিয়া আলোকে-পুলকে,
প্রবাহিয়া, চলে যাই সমস্ত ভূলোকে
প্রান্ত হতে প্রান্তভাগে উত্তরে দক্ষিণে
পূরবে পশ্চিমে............

'সাত সাগরের মাঝি'র কবিতাগুলোর রচনাকাল ১৯৪৩-৪৪ সাল। একদিন যেমন আরব জীবনে এসেছিল জাগরণের যৌবন-জোয়ার, তেমনি ১৯৪৩-৪৪ সালে উপমহাদেশের নবজাগ্রত মুসলিম জাতির মন ও মানস আশা-আকাঙক্ষার বিচিত্র প্লাবনে হয়ে উঠেছিল উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত। সে-সময়ে পাকিস্তান আন্দোলন চলছিল। পাকিস্তানের লক্ষ্য-ভূমিতে মুসলিম জনতাকে পৌছাতে হবে, এবং তার আগে বাধা-বিপত্তির দুস্তর-দুর্গম অথৈ পাথার জাতিকে পাড়ি দিতে হবে—তাই জাতির অন্তরে আশা-আকাঙক্ষার অন্ত ছিল না। সেই স্বপ্ন ও সাধের, আশা ও আন্দোলনের ইঙ্গিতময় প্রতীক হিসাবে আমরা তখন মুগ্ধ বিস্ময়ে বেছে নিতে পেরেছিলাম ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার সুন্দর কটি লাইন। যদিও 'সাত-সাগরের মাঝি'তে প্রত্যক্ষভাবে সেই আন্দোলনের কোন ছাপ নেই ঃ

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।

নারঙ্গী বনের কম্পমান সবুজ পাতারা যেন আমাদের আশা-ভরসার রূপ-প্রতীক হয়ে বাতাসে দুলছে, এ কথাই বারবার এ কবিতাটি পড়তে পড়তে মনে জাগে।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সমুদ্রপথে দুঃসাহসী নাবিকের অভিযানকে প্রতীক হিসাবে বেছে নিয়ে নানা দিক থেকে কুশলী শিল্প-বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছেন। কাব্য ও ইতিকথায় দেশে দেশে কালে কালে সমুদ্র-অভিযাত্রীকে বীরের জয়মাল্য দেওয়া হয়েছে। সত্যের সাথে কল্পনা মিশিয়ে তাকে বাস্তবের চাইতেও করা হয়েছে অনেক বড়, অনেক রহস্যময়।

www.pathagar.com

কাব্য ও সাহিত্যের এই বাস্তব এবং কল্পলোকের নাবিক বীর নায়ক সর্বদেশের পাঠক-চিত্তে সুপরিচয়ের অন্তরঙ্গতায় এক মর্যাদাবান আসনে প্রতিষ্ঠিত। সমুদ্রযাত্রী নাবিককে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রতীকী হিসাবে গ্রহণ করায় তাই সুবিধা হয়েছে। তাঁর কবিতা পাঠকের কাছে সহজে বোধগম্য হয়েছে।

কবিতা অল্পবিস্তর মনের অবচেতন লোকের সম্পদ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদও বিশেষভাবে অবচেতন মনের গহনচারী কবি। কবিতা মাত্রই বাধ্যতামূলকভাবে অবচেতন মনের গভীরতম তলদেশ থেকে আসবে, তা নাও হতে পারে। কিন্তু এটাও সত্য, সত্যিকারের কবিতা হতে হলে, মাঝে মাঝে এবং ইতস্তত অবচেতন মনের এলাকা থেকে রং তাকে আহরণ করতেই হবে। খাঁটি কবিতাকে আমরা অনুভব করি বেশী, বুঝি কম। কবি ও পাঠকের মধ্যে গভীর মন দেয়া-নেয়ার কারবার চলে। কবি-মন পাঠকের মনের কাছেই আবেদন করেন—বুদ্ধির কাছে নয়। বুদ্ধির ভূমিকা কাব্য-উপভোগের প্রাথমিক স্তরে অনেকটা গৌণ। এজন্য এক শ্রেণীর পাঠকের কাছে গভীর অবচেতন মনের কবির কবিতা অর্থহীন ও অসংলগ্ন বলে বিবেচিত হয়। কেউ কেউ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার বিরুদ্ধেও কুয়াশা ও দুর্বোধ্যতার অভিযোগ করেছেন। কিন্তু এ অভিযোগ সত্য নয়। অন্ততঃ রসিক-চিত্ত পাঠকের কাছে এ অভিযোগের কোন দাম নাই। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সর্বজন-পরিচিত প্রতীক নিয়ে কবিতা লিখেছেন। সুতরাং কবিতায় দুর্বোধ্যতার অবকাশ নাই। মনে রাখতে হবে, প্রতীক-নির্বাচনে ভুল ও অক্ষমতার দরুন অনেক কবির কবিতাই দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তা থেকে মুক্ত।

অতি আধুনিক কবিদের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তাঁরাও প্রতীক নিয়ে কারবার করেন বেশী। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে দেখা যায় যে, তাঁদের প্রতীক নির্বাচন স্বেচ্ছাচারিতাপূর্ণ ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক। এ জানা কথা, চিত্র ও কবিতার বিরুদ্ধে দুর্বোধ্যতার শেকায়েত বর্তমান যুগে খুবই সোচ্চার। স্যুর-রিয়ালিস্টিক (Sur-realistic) কবিতা ও ছবির কথা এখানে একটু আলোচনা করলে আমার কথাটা আরো পরিষ্কার হবে। স্যুর-রিয়ালিস্টরা অবচেতন মনেরই শিল্পী। অবচেতন মন শিল্প-কর্মে কিভাবে কাজ করে, তার একটা বর্ণনা দেওয়া যাক। ধরুন ঃ একটা ঘরে একটি টেবিলে ধূমায়িত চার কাপ। ছাইদানিতে একটা আধ-পোড়া জ্বলন্ত সিগারেট। দু'একবার আলোর রেখা তীর্যকভাবে জানালা দিয়ে ঘরে আসে-পাশের রাস্তায় হৌস থেকে একজন পানি ছড়াচ্ছে—এগুলি দিয়ে একটি কবিতা লেখা হল বা ছবি আঁকা গেল। একেই বলতে পারি একটি স্যুর-রিয়ালিস্টিক কবিতা বা ছবি। কিন্তু বোঝা গেল কি, এ সওয়াল কেউ কেউ এখানে করতে পারেন। এর ব্যাখ্যা হল যে, এগুলোর সাহায্যে আঁকা হচ্ছে প্রভাতের একটি দৃশ্য। কিন্তু এক শ্রেণীর পাঠককে একথা খোলাখুলি বলে না দিলে বোধ হয় এগুলি তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য, অর্থহীন এবং অসংলগ্ন বলেই ঠেকত। এক শ্রেণীর পাঠক

www.pathagar.com

আছেন তাঁরা এ যুগেও 'পাখী সব করে রব রাতি পোহাইল/কাননে কুসুম-কলি সকলি ফুটিল'–ইত্যাদি ধরনের কবিতার বেশী পক্ষপাতী। ভাল-মন্দ জানি না, এ যুগের কবিতা বুঝতে গেলেই এ যুগের ছবি-রসিকদের মত পাঠকদেরও কিছুটা বৈদগ্ধ ও প্রস্তুতির প্রয়োজন আছে। তাই বলছিলাম কদরদান সাহিত্যের পাঠকদের মন ও দৃষ্টিতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'সাত সাগরের মাঝি'তে হেঁয়ালি ও কুয়াশার কিছুই নেই। কারণ তিনি পাঠক মনের গোপন চৈতন্যের ধ্যান-ধারণার যুগ যুগ লালিত সঞ্চয়ের অতি পরিচিত ও পুরাতন সাত মহলায়ই নতুন করে আলোক জ্বেলে দিয়েছেন। সে আলোকে পথ চিনে চিনে নির্ভুল পদক্ষেপে আমরা তাঁর কাব্য-পরিক্রমা করে ফিরতে পারি। তাঁর প্রতীকীটি নতুন আবিষ্কার নয়—পুরাতনের নতুন শিল্পরূপ-সমৃদ্ধ উপস্থাপন মাত্র। প্রতীকটির তাৎপর্য আগে থেকেই আমাদের জানা ছিল।

আমি পূর্বেই বলেছি যে, 'সাত সাগরের মাঝি'কে সম্পূর্ণভাবে উপভোগ করতে হলে তার পরিপূরক কবিতাগুলির সাথে তাকে একত্রে পড়াই উচিত। কারণ এটা এককভাবে 'সাত সাগরের মাঝি'তে খণ্ডিত, কিন্তু 'সিন্দাবাদ', 'বা'র দরিয়ায়', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি', 'পাঞ্জেরী' প্রভৃতি কবিতায় মিলে এটা সম্পূর্ণ। এক অভিযাত্রী নাবিকের স্বপ্ন ও অভিজ্ঞতা তাঁর বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন রূপে দল মেলেছে একটি লক্ষ্যে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রতীকচিত্রটি সকল বড় বড় সাহিত্যের একটি সাধারণ উত্তরাধিকার। এজন্য তাকে চিনতে কেউ ভুল করে না। পুনরাবৃত্তির ঝুঁকি নিয়েও প্রতীক চিত্রটির সামগ্রিক রূপ এখানে সংক্ষেপে আবার আমি তুলে ধরতে চাই। পূর্বেই আভাস দিয়েছি যে, এটা বিশেষভাবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের হলেও সাধারণভাবে সকল পাঠক-চিত্তের সুপরিচিত ছবি। 'সাত সাগরের মাঝি'র সমধর্মী কবিতা যেগুলি পেয়েছি সেগুলি হতে সংগৃহীত সামগ্রিক চিত্ররূপ সংক্ষেপে হচ্ছে এইরূপ, এবং তাতে দৃশ্যের পর দৃশ্য দেখি ঃ নোনা দরিয়ার ডাক এসেছে। সমুদ্র উত্তাল তরঙ্গ। কখনো নৌ-অভিযাত্রীর জাহাজের পাল ছিঁড়ে যায়, কখনো জাহাজের পাটাতনের তক্তা খুলে যায় খড়-কুটার মত, নাবিকরা তরঙ্গে তরঙ্গে ভাসে। দৃঢ় হাতে মাঝি হাল ধরে, জীবন ও মৃত্যুর মাঝে লড়াই করে—মরে ও বাঁচে। মাথার উপর সমুদ্রে সূর্য আগুন ছড়ায়, চাঁদ ওঠে ও ডোবে। দ্বীপে দ্বীপে নারকেল গাছের হাতছানি—শত মাথায় দ্বীপ-কাননিকারা নাবিকদের ডাকে। স্বদেশের ছেড়ে আসা সান্ধ্য-প্রদীপের মায়া নাবিক-মনকে পাগল করে। ঘরের সুখ তাদের ঘরে টানে। তবু সমুদ্রের সংগ্রামী জীবনের হাতছানি দুরন্ত ও দুর্নিবার। সওদাগরীর সওদা তাকে কুড়াতে হবে। লাল, মারজান, মর্মর, জামরুদ, আলমাস, গওহর, এলাচ, দারুচিনি, কাফুর আর সন্দলে জাহাজ তার বোঝাই করতে হবে। এসব বেসাতি ছড়াতেই হবে এবং হেরার রাজ-তোরণে দ্বাদশীর-চাঁদের আলো যেখানে দোলা দিয়েছে, সেই মঞ্জিলে মকসুদে তাকে পৌঁছুতেই হবে। ক্ষুধিতের রোনাজারি শোনা যায়, মজলুমের কান্নায়।

www.pathagar.com

আকাশ ভরে উঠেছে—তাই আর দেরী করা চলবে না। সঠিক পথ চিনে, রাত পোহাবার খবর জেনে স্বপ্নের বন্দরে জাহাজ ভেড়াতেই হবে। সমুদ্রযাত্রী মাঝির জীবনের এ ছবি, পাঠকের কল্পলোকে এ ছবির আনাগোনা চিরদিনের। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অবচেতন মনের রহস্যচারী হতে পারেন এবং হতে পারেন প্রতীকী কবিতার নিগূঢ় কারবারী, তবু তিনি এ কারণেই পড়াশোনা করা পাঠকের নিকট সুস্পষ্ট এবং সহজ-বোধ্য। তবে একথা হয়তো কেউ কেউ বলতে পারেন, তিনি বিদগ্ধ পাঠক মনের কবি, অতি-সাধারণের কবি নন। প্রতীক অবলম্বনে রচিত কবিতা বাংলা সাহিত্যে আরো আছে। তা সত্ত্বেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে ও পরিবেশে একক ও অনন্যসাধারণ। এক কথায় নজরুলোত্তর বাংলা সাহিত্যে ফর্‌রুখ আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি। যা হোক, 'সাত সাগরের মাঝি' পড়তে পড়তে আমাদের নজরুলের 'দুর্গমগিরি' কান্তার মরু, দুস্তর পারাবার হে' এবং রবীন্দ্রনাথের 'যদিও সন্ধ্যা নামিছে মন্দ মন্থর/সব সঙ্গীত ইঙ্গিতে গেছে থামিয়া' প্রভৃতি কবিতার কথা মনে আসে। 'সাত সাগরের মাঝি'র সাথে এগুলির মিল যত না আছে, ব্যবধান আছে আরো বেশী। তবু এগুলি মনে পড়ে এজন্য যে, সমান সমানকে এবং অনুরূপ কেবল অনুরূপকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না, অসমান ও প্রতিরূপকেও যথাক্রমে স্মরণ করিয়ে দেয়।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তীক্ষ্ণ টানের সরল রেখার সুন্দর সুন্দর রূপকল্প সৃষ্টির অসাধারণ নৈপুণ্যের অধিকারী। বাংলা কাব্যের প্রতিভাবান কবিরা দীর্ঘকাল ধরে রূপকল্প রচনার এক ঐশ্বর্যদীপ্ত ঐতিহ্য গড়ে তুলেছেন, এ কথা সকলেই জানেন। মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ও নজরুল ইসলামের রূপকল্প সৃষ্টির অবদান বিচিত্র। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের পূর্বসূরীদের অবদান স্বীকার করেও বলতে পারা যায়, রূপকল্প সৃষ্টিতে তাঁর স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা অনস্বীকার্য। কিছু দৃষ্টান্ত দেয়া যেতে পারে ঃ

> ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ
> হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া পরেছে শিলাদৃঢ় আবলুস,
> পিপুল বনের ঝাঁঝালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে,
> নামে নির্ভীক সিন্ধু-ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।"

অন্যত্র ঃ

> বুরাইর সাথে পেয়েছি ভালাই অফুরান জিন্দিগী
> আবলুস-ঘন আঁধারে পেখম খুলেছে রাতের শিখী।

অথবা ঃ

> তুফানের ছাঁচে ঘূর্ণাবর্তে সুগঠিত তার তনু,
> পুষ্ট পালকে পিছলিয়া পড়ে প্রবাল বর্ণধনু।

আরো যেমন ঃ

www.pathagar.com

দূরে বহু দূরে বন্দর গেছে মিশে
দিগ-কাওসের কোলে,
সূর্যের ঝাঁজ জ'মে ওঠে পাল ভরে
নতুন পথের বাঁকা ধনু আসে সরে
সমুদ্র-কল্লোলে!

আবার যেমন ঃ

দেখ আসমানে ফোটে সিতারার কলি,
আরশির মত নিটোল পানিতে মুখ দেখে বকাওলি।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার স্থানে স্থানে যে অপূর্ব বর্ণালী এবং শাণিত রূপচ্ছটা আছে, উপরের উদ্ধৃতি থেকে তার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গেল। তাঁর কবিতার দীপ্ত রূপ এবং রং-এর ঐশ্বর্যের আরো নমুনা দেওয়া যেতে পারে ঃ

ডাকে বাগদাদী খেজুর শাখায় শুক্লা রাতের চাঁদ
মাহগির বুঝি দজলার বুকে ফেলে জোছনার জাল,
কোমল কুয়াশা স্নেহে যেথা মাটি পেতেছে নতুন ফাঁদ
ঘরে ফেরবার সময় হয়েছে আজ।

অথবা যেমন ঃ

দেরী হয়ে গেছে অনেক জানো ত তুমি,
ফিরে গেছে কত জাহাজ ভাসান দরিয়ার মৌসুমী,
কত এলাচের দানা উড়ে গেছে ঝড়ে
দারুচিনি শাখা ভেঙেছে বনান্তরে,
মেশকের বাস বাতাস নিয়েছে লুটি,

আর এক জায়গায় আছে ঃ

দূর বন্দরে দীপ্ত সূর্য, আমাদের গতিমান
জাহাজের পাল স্রোতের নেশায় ভরা,
যেথা দিগন্তে সবজা হেরেমে ভাসে পরীদের গান
নেকাব দোলায়ে আদিম বনানী জাগছে নৃত্যপরা
দরিয়া-মরুর মরীচিকা পানে মাতাল দুঃসাহসী
ছুটছে অন্ধ তাজী।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আসল পরিচয় হল, তিনি একজন শিল্পী-কবি। রং ও রূপের, বর্ণ এবং তার সাথে গন্ধের আলো, ছায়া এবং মোহের আবিষ্টতা নিয়ে যে-সব খেলার চতুরী দেখান, তাঁরাই শিল্পী-কবি। তাঁদের কবিতা চিত্রধর্মী এবং তাঁরা আরো কিছু। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা পড়তে পড়তে পাঠক-মন অলক্ষ্যে ইংরেজী সাহিত্যের

www.pathagar.com

রোমান্টিক ও তার পরবর্তী প্রি-রাফেলাইট (Pre-Raphalite) কবিদের রাজ্যে চলে যায়। রোমান্টিক কবিদের মধ্যে কীটসের কবিতার রঙ-প্রাচুর্যের তুলনা নাই। প্রি-র‍্যাফেলাইটদের মধ্যে মরিস, সুইনবার্ন প্রমুখ কবি রং, আলো, সুগন্ধীর জাল বুনে কবিতায় যে ছবি আঁকতেন এবং দেহাভিসারী স্পর্শাতুরতা আনতেন, তার সাথে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের গভীর সাদৃশ্য আছে।

উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও শব্দরীতি নির্মাণেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নতুনত্বের সংযোজন করেছেন। এতে তাঁর কাব্যের বর্ণাঢ্যতা প্রখরতর হয়েছে। 'আকীক-বিছান পথ', 'শিলাদৃঢ় আবলুস', 'দরিয়ার হাম্মাম' প্রভৃতির কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। পুঁথি-সাহিত্যের অনুসরণে নয়, পুঁথি-পাঠের দরুন তাঁর মনের সঞ্চয় থেকে যে আলো উপচে পড়ছে, তার রঙে নেয়েই এগুলি ঝলমল করে উঠেছে। এগুলি তাঁর চিত্রধর্মী কবিতার রূপ সৃষ্টির ব্যাপারে পরিপূরক হিসাবে অনেকখানি কাজ করেছে।

এখানে স্বাভাবিকভাবেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার ভাষার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ভাষার দু'টি গুণ বিশেষভাবে পাঠকদের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ভাষার বদৌলতে যে অপরূপ চিত্র-বর্ণালীর সৃষ্টি হয়েছে তার কথা আমি পূর্বেই আলোচনা করেছি। এরই সাথে সংশ্লিষ্ট যে গুণটি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের রচনায় আমরা পাই, তা হলো তাঁর রচনার তীক্ষ্ণতা। কথার সাহায্যে ছবি আঁকতে যেয়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তীক্ষ্ণ এবং বর্ণোজ্জ্বল রেখা টেনেছেন। শাণিত রেখায় তিনি তাঁর কবিতাকে ব্যঞ্জনাময় করে তুলেছেন। তীক্ষ্ণ কলমের আঁচড়েই তাঁর কবিতা অর্থবহ ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ভাষার দ্বিতীয় গুণটি হলো তাঁর রচনার সুমার্জিত ও পরিচ্ছন্ন রূপ। তাঁর রচনায় পুঁথি-সাহিত্যের পরোক্ষ প্রভাবের কথা আগেই আমি উল্লেখ করেছি। নজরুল ইসলামের মত ফর্‌রুখ আহ্‌মদও সোজাসুজি পুঁথির ভাষাকে তাঁর ভাষা করেন নাই। উভয়ের রচনায় পুঁথির ভাষা এসে সোজাসুজি রং ফেলে নাই। পুঁথি-সাহিত্যের দূরাগত বিচ্ছুরিত আলোককেই তাঁদের রচনায় লক্ষ্য করা যায়।

নব পর্যায়ে নজরুল ইসলাম আমাদের ঐতিহ্যবাহী ভাবধারায় যে বিপ্লব সাধন করেছেন—ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সে-ধারারই উত্তরসাধক। এখানে এটাও মনে রাখা উচিত, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা নজরুলেরই অনুসারী নয়, তবে তিনি সেই একই ভাবধারারই পথিক, যে ভাবধারার নজরুল পথিকৃত। ভাষার ক্ষেত্রে নজরুল ও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মধ্যে মূলগত একটি ঐক্য আছে, তবে তাঁদের মূলগত ব্যবধানও সুস্পষ্ট। নজরুলের ভাষায় যে আকরিক ক্লেদ রয়েছে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ভাষায় তা নাই। ঘষামাজা করেছেন তিনি প্রচুর, এজন্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ভাষা নজরুলের ভাষা থেকে অনেকখানি সুসংহত ও পরিশোধিত। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ব্যবহৃত ভাষায় আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার খুবই সুন্দর। নজরুলও আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহারে সুদক্ষ, তবে

www.pathagar.com

নজরুলের রচনায় পরিশীলিত পেলবতায়ও মাঝে মাঝে সৌকর্যের অভাব দেখা যায়। নজরুলের ভাষার মধ্যে বহু স্থানে আছে ধৈর্যহীন ও সংস্কারবিহীন স্খলন ও পতন। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা পাঠককে বলে দেয় যে, ধৈর্যহীনতা ও অসংযমের দিন কেটে গিয়েছে এবং আমাদের জবানে এসেছে সংহতি ও সংযমের নিয়ম-কানুন।

নজরুল ইসলামের রচনায় বেশ লক্ষ্য করা যায়, তাঁর প্রত্যেক কবিতাতেই একটি পরিণতি আছে। তার আগা থেকে গোড়া পর্যন্ত ভাবধারার সূত্রটি অবিচ্ছিন্ন। ফররুখ আহমদের এক 'পাঞ্জেরী' কবিতাটি ছাড়া 'সাত সাগরের মাঝি'র অন্যান্য কবিতায় এই সূত্রের এ অবিচ্ছিন্নতাটি তেমন পাওয়া যায় না। 'সাত সাগরের মাঝি'তে সমুদ্র-জীবনের বিচিত্র পরিবেশের বিশাল পশ্চাদভূমির উপর নাবিক জীবন যাপন করে কবির অবচেতন মন বারবার কথা বলে উঠেছে। তাঁর কবিতা পাঠে মনে হয়, নিঃসীম অন্ধকারের কাল বুকে এখানে-সেখানে যেমন আকাশের তারাগুলি ফাঁকে ফাঁকে ঝকমক করতে দেখা যায়, তেমনই অপার দরিয়ার পশ্চাৎভূমিতে নাবিক-জীবনের অভিজ্ঞতার খণ্ড খণ্ড চিত্র মাঝে মাঝে দীপ্ত হয়ে আছে। এসব কবিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই ভাবপরিণতির দিকে পাঠকমনকে অবিচ্ছিন্ন অনিবার্যতায় টেনে নিয়ে যায় না। কবি কখন কি কথা বলবেন, না পড়ার আগে তা আঁচ করা মুশকিল হয়। কিন্তু 'পাঞ্জেরী' তার ব্যতিক্রম। একটি লক্ষ্যে একটি নাটকীয় গতিতীব্রতায় এ কবিতা পাঠককে প্রথম থেকে শেষ পরিণতি পর্যন্ত টেনে নিয়ে যায়।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ শোনা যায়। বলা হয়, তিনি ঐতিহ্যাশ্রয়ী এবং প্রচার-ধর্মী। এ অভিযোগ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অন্যান্য বই সম্পর্কে প্রযোজ্য কিনা, সে আলোচনা এখানে মুলতবী থাক। আমি 'সাত সাগরের মাঝি' সম্পর্কে বলতে পারি, এ অভিযোগ অসার ও অর্থহীন। আমি পুনরুক্তি করে এজন্যেই বলতে চাই যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বিশেষ অর্থেই অবচেতন মনের কবি এবং আরো বলতে চাই যে, প্রচারণার কবিতা কোনোদিনই কবির অবচেতন মনের ফসল হয় না, হতেও পারে না; প্রচারণা জাগ্রত মনের কর্ম। জাগ্রত মনেই এটা জমে ভাল। 'সিরাজাম মুনীরা' প্রচারধর্মী কিনা ও 'হাতেম তা'য়ী'-এর ইতস্তত রচনার ধর্ম গদ্যাত্মক কিনা, সে আলোচনা এখানে আমি করব না। যে কবিতা প্রচারণাপ্রবণ হয়, সে কবিতা তার সব মৌলিক গুণ হারায়, হয় হতশ্রী। তা হয় গদ্যাত্মক এবং সাংবাদিকতার অনুসারী। অন্যদিকে ঐতিহ্যবিচ্যুত, ছিন্নমূল ও আকাশচারী হয়ে একজন কবির পক্ষে কোনো বড় কবিতা ও সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়। ঐতিহ্যাশ্রয়ী হওয়ার দরুনই মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল ইসলাম বড় কবি। একথা সকল দেশের কাব্য ও সাহিত্যেই সত্য। ঐতিহ্য থেকেই একটি ভাষা ও সাহিত্যের কাব্যকর্মের রূপ, বৈচিত্র্যে ও লীলাচাতুর্যে রস, পুষ্টি, জীবন ও প্রাণপ্রাচুর্য সঞ্চারিত হয়।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ 'সাত সাগরের মাঝি'তে দু'একবার 'হেরার রাজ-তোরণ' 'শাহী দরওয়াজা' ও 'দ্বাদশী জোছনার' কথা বলেছেন এবং সুন্দর করেই বলেছেন, এবং কোথাও তাঁর ভাষা তাঁর রসোত্তীর্ণতার বিচ্যুতি বা অমর্যাদা ঘটায় নাই। কবির চাইতে প্রচারক এখানে কোথাও উচ্চকণ্ঠ হয় নাই। কিন্তু এরই উল্লেখ করে কোনো কোনো সমালোচক তাঁর কবিতার প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ করেছেন। আমাদের সমালোচনা-সাহিত্য যে সুস্থ হয় নাই এবং হীনমন্যতা থেকে মুক্ত নয়, এটা তারই নজীর। আর অতীত দিনের বিজাতীয় ধারা এখনো নিঃশেষিত হয় নাই, এটা তারও বেদনাদায়ক স্বাক্ষর। কাব্যবিচার ও মূল্যায়নের নিরাসক্ত দৃষ্টিতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যে তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি'তে স্বস্থানে উত্তীর্ণ, এটা আমি জোর করেই বলতে পারি।

ঝড়-পরিত্যক্ত, বর্ষণ-পরিতৃপ্ত বনানীতে নৃত্যপরা নব পত্রপুলক ও কিশলয়ের খেলা। নবারুণের স্বর্ণকিরণে তারা ঝলমল করছে এবং প্রভাতের মৃদু বাতাসে তারা আন্দোলিত। দুর্ভোগের শেষে জাতির জীবনেও এসেছে আবার প্রভাত। পুরাতন চলে যাচ্ছে এবং নতুন আসছে। আশা-আনন্দের প্রবল ভাব-পীড়িত এইরূপ একটি ঐতিহাসিক ক্রান্তিকালকে নিয়ে আগের দিনের কবিরা হয়ত মহাকাব্য লিখতেন। এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে নাট্যপ্রতিভারও হয়ত মহৎ স্ফুরণ ছিল সম্ভব। ফর্‌রুখ আহমদ এই বিষয়বস্তু অবলম্বনে 'সাত সাগরের মাঝি' রচনা করেছেন, এ আমাদের সাহিত্যের পরম সৌভাগ্য। 'নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজপাতা'র ভিতর দিয়ে জাতির আশা ও কামনার সেদিন তাদের যে সুরের রূপ পেয়েছিল এবং যে প্রাণচাঞ্চল্যে সঞ্চরমান হয়ে উঠেছিল, 'সাত সাগরের মাঝি'তে সে ছবিই বিধৃত হয়েছে। তাই 'সাত সাগরের মাঝি'র কবি এক কথায় আমাদের জাতীয় রেনেসাঁর সার্থক রূপকার।

www.pathagar.com

সৈয়দ আলী আহ্‌সান

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ

আমি এক সময় কবিতায় প্রচুর আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছি একটি বিশেষ পরিমণ্ডল নির্মাণের উদ্দেশ্যে। এ-শব্দগুলোর যে ধ্বনি-বৈচিত্র্য কবিতার ছন্দে এবং প্রবহমানতায় প্রভাব বিস্তার করেছে, তার সঙ্গে বাংলা শব্দের ধ্বনির সাযুজ্য ছিলো অর্থাৎ বাংলা শব্দের যে ধ্বনি সম্পর্কে আমি অবহিত ছিলাম তার সঙ্গে যে সব আরবী-ফারসী শব্দের ধ্বনিগত সমান্তরলতা ছিলো আমি সে সমস্ত আরবী-ফারসী শব্দই ব্যবহার করেছি। সে-সব শব্দ তাদের নিজস্ব লৌকিক এবং ঐতিহাসিক রূপকল্পে এবং ব্যঞ্জনায় আমার কাছে উপস্থিত হয় নি। সে-সব শব্দের নিজস্ব ভাষাগত অর্থের বিস্তার এবং গভীরতা সম্পর্কে আমার কোনও জ্ঞান ছিল না।

১৯৪০ থেকে ১৯৪৫ পর্যন্ত আমি আমার অনেক কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছি। 'মক্কা মোয়াজ্জামার পথে', 'মহররম', 'কোরবানী' এ-সময়কার কয়েকটি কবিতার নাম দেখেই বোঝা যাবে বিষয়ের সঙ্গে ব্যবহৃত শব্দের একটি সম্পর্ক ছিলো। ইসলামের প্রাথমিক যুগের কয়েকটি ঘটনা এবং আবেগকে শব্দের সাহায্যে উপস্থিত করবার চেষ্টায় আমি কিছু সংখ্যক আরবী-ফারসী বিশেষণ এবং নামবাচক শব্দের প্রয়োগ করেছিলাম। দু'একটি ফারসী ক্রিয়াপদও ব্যবহৃত হয়েছে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, প্রথম বিষয়ের কারণে অর্থাৎ যে পরিবেশ সৃষ্টি করা আমার কাম্য ছিলো সে পরিবেশ সৃষ্টির জন্যে কিছু সংখ্যক আরবী-ফারসী শব্দের প্রয়োজন হয়েছিলো। সঙ্গে সঙ্গে অন্য একটা প্রয়োজন আমি অনুভব করেছিলাম। ধ্বনি-বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্যে এবং চরণান্তের চমক সৃষ্টির জন্যে অনেক বিদেশী শব্দ আমি গ্রহণ করেছিলাম। কিন্তু এ–ব্যবহারে আমি সান্ত্বনা পাই নি, আমি এ-শব্দগুলোর সীমাবদ্ধতা অনুভব করেছি এবং দেখেছি যে আমার শব্দের অধিকারের মধ্যে এরা কোনও ক্রমেই আমার আয়ত্তাগত নয়। এক সময় সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার, নজরুল ইসলাম বাংলা কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। তাঁরা কিন্তু ব্যবহারের দ্বারা বাংলা কাব্যের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনও বিস্তার সৃষ্টি করতে পারেন নি, একমাত্র নজরুল ইসলাম ছাড়া। নজরুল ইসলাম শব্দের ধ্বনিগত তাৎপর্যের উপর নির্ভর করে বাংলা কবিতার জন্য ছন্দের হিল্লোল সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর 'ফাতেহা-ই-দোয়াজদহম' এর সাক্ষ্য বহন করে। তিনিও আরবী-ফারসী শব্দের নিজস্ব লৌকিক এবং ঐতিহাসিক সত্তা সম্পর্কে

www.pathagar.com

অবহিত ছিলেন না, কিন্তু শব্দগুলোর ধ্বনি-মাধুর্য তাঁকে উন্মনা করেছিল এবং তাঁর পরিচিত বাংলা ধ্বনির সঙ্গে তাদের সাযুজ্য নির্মাণ করে তিনি তাঁর কবিতায় একটি অনবদ্য ধ্বনি-হিল্লোল সৃষ্টি করেছিলেন। আরবী-ফারসী ভাষার উপর নজরুল ইসলামের প্রচণ্ড কোনও অধিকার ছিলো না, সুতরাং একমাত্র ধ্বনিগত আবহের দ্বারাই তিনি রোমান্টিক রসাশ্রিত ভাবাবেগপূর্ণ কবিতা রচনায় সফলকাম হয়েছিলেন। আলোকোজ্জ্বল একটি প্রাসাদকে বাইরে থেকে দেখে অভিভূত হওয়া যায়, আনন্দিত হওয়া যায়, কিন্তু সে আলো যে কত বিচিত্র বর্ণের সংমিশ্রণে একটি বিশেষ উজ্জ্বলতায় বিকশিত, আলোর সেই উপকরণ সম্পর্কে জ্ঞান না থাকার দরুন আমারা শুধু আলোর উচ্ছলতায় দৃষ্টিকে আপ্লুত করেছি।

বয়সের ক্ষেত্রে আমার কিছুটা অগ্রবর্তী কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ 'সাত সাগরের মাঝি' লিখেছিলো। 'সাত সাগরের মাঝি'র মধ্যে অত্যন্ত সুন্দর একটা রোমান্টিক ভাবাবহ নির্মিত হয়েছে। ফর্‌রুখ প্রাথমিক যুগের ইসলামের উদ্দীপনা, সচলতা, আগ্রহ এবং অনেক দূরে চিত্তকে প্রসারিত করার আকাঙ্ক্ষা তার কবিতায় প্রকাশ করেছে। কিন্তু তার পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা' বা আরও পরের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থ যখন পাঠ করি তখন দেখতে পাই, প্রথম কাব্যগ্রন্থের উচ্ছলতা সে আর অতিক্রম করতে পারে নি। সেটা তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার কারণ, এসব শব্দ তাকে আনন্দের সঙ্গে রোমান্টিক ভাবাবহকে গ্রহণ করতে সাহায্য করেছিল, বিপুল পৃথিবীর বিচিত্র বিস্ময় এবং যন্ত্রণাকে প্রকাশ করবার সুযোগ দেয় নি।

বাংলা শব্দের ধ্বনির সঙ্গে আরবী-ফারসী শব্দের ধ্বনির সাযুজ্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা আবৃত্তির জন্যে সুষম; বলা যায় যে আবৃত্তির একটি বলিষ্ঠ তৎপরতায় বিলসিত। মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ছয় মাত্রার সমগতির কয়েকটি পর্বে, চরণান্তের খণ্ড পর্ব সহ আবৃত্তিযোগ্য একটি সহজ প্রবাহ নির্মিত হয়েছে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অধিকাংশ কবিতায়। কবিতাগুলোতে আবৃত্তিযোগ্যতার একটি যথার্থতা আছে। যেমন ঃ

১, আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি'
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা, শশী;

২. সওদাগরের দল মাঝে মোরা ওঠায়েছি আহাজারী,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন ধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।

৩. সারা দিন চলে একভাবে সেই কিশতী দরিয়া ফুঁড়ে,
সাঁঝের আকাশে সিন্ধু-শকুন সহসা পালায় উড়ে,
কলিজার খুনে লাল হয়ে ওঠে সন্ধ্যার আসমান,
রক্ত পাথার ক্ষেপে ওঠে যেন, লাগে মৃত্যুর টান

www.pathagar.com

লোহু তরঙ্গে ফণা তোলে লাখো আজদাহা একসাথে,
রক্ত-রঙিন জহরের শ্বাস মিশে যায় ঝঞ্ঝাতে।

দুর্গম পথযাত্রায় তৃপ্তি, সমুদ্র-পথে নতুন দ্বীপভূমি আবিষ্কারের আকাঙ্ক্ষা, রাত্রির অন্ধকার এবং বিভীষিকা অতিক্রম করে একটি স্বপ্নরাজ্যে উপস্থিত হবার কল্পনা—এ সমস্ত কিছুই রোমান্টিক আবহ নির্মাণের সহায়ক। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এভাবেই রোমান্টিক আবহ নির্মাণ করেছে 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে। দেখা যাবে যে, আরবী-ফারসী শব্দ এক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করেছে তাদের নিজস্ব অর্থের অধিকারে নয়, কিন্তু বাংলা শব্দের ধ্বনিতরঙ্গের সাযুজ্যে। এভাবেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার চরণে যে তরঙ্গায়িত ধ্বনিপ্রবাহ তা পাঠকের চিত্তে একটি সুকুমার মোহমুগ্ধতার সৃষ্টি করে, একটি স্বপ্নাচ্ছন্ন নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আনে। কিন্তু যেহেতু এ শব্দগুলো তাদের নিজস্ব লৌকিক এবং ঐতিহাসিক অধিকারে বাংলা কাব্যে প্রবেশ করছে না, তাই তাদের মনোমুগ্ধকর ধ্বনিপ্রবাহ একটি রীতির বন্ধনে সর্বসময়ের জন্য কবিকে আবদ্ধ রেখেছিল। এভাবেই 'সাত সাগরের মাঝি'র বাণীভঙ্গি 'সিরাজাম মুনীরা' এবং 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যদৃষ্টিতে একটি রীতিমত গতানুগতিকতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

কবিতার জন্য বিশেষ বাণীভঙ্গি নির্মিত হতে পারে, কিন্তু সে বাণীভঙ্গি যদি অবশেষে একান্ত এবং একমাত্র কৌশলে পরিণত হয় তাহলে কবিতার শব্দার্থের প্রসারতা ঘটে না। তখন কবি একটি বিশেষ শৈলীর শাসনে থেকে কবিতা রচনা করেন বলেই অনবরত পূর্বতন ধ্বনিবিন্যাস, উপমা-রূপক-বিশেষণ এবং নামবাচক শব্দের পুনরাবৃত্তি ঘটে। ক্রিয়াবাচক পদও একই নিয়মে চরণগুলোকে অর্থবহ করে। একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের 'সিন্দাবাদ' কবিতা থেকে :

কালো আকীকের মত এ নিকষ দরিয়ার বুক ছিঁড়ে
চলো সন্দল বন-সন্ধানে অজানা দ্বীপের তীরে,
হালের আঘাতে নোনা পানি ছুঁড়ে রাহা খোঁজো গুমরাহা,
পার হয়ে যাও আয়েশী রাতের ফাঁদ;
পাথর জমানো দরিয়ার তীরে মওতের বুকে আহা,
কাফুরের মত নতুন জীবন ডাকছে সিন্দাবাদ!

অন্য একটি উদাহরণ একই কাব্যগ্রন্থ থেকে :

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না? তবু তুমি জাগলে না?

www.pathagar.com

সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে নাকো,
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো ঃ
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝিমাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতী আবার ভেসেছে সাগর জলে,
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ-তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।
[সাত সাগরের মাঝি]

সর্বশেষে উদ্ধৃতি 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যগ্রন্থ থেকে ঃ

সারা দিন চলে একভাবে সেই কিশতী দরিয়া ফুঁড়ে।
সাঁঝের আকাশে সিন্ধু-শকুন সহসা পালায় উড়ে।
কলিজার খুনে লাল হয়ে ওঠে সন্ধ্যার আসমান,
রক্ত-পাথার ক্ষেপে ওঠে যেন, লাগে মৃত্যুর টান,
লোহু-তরঙ্গে ফণা তোলে লাখো আজদাহা এক সাথে,
রক্ত-রঙিন জহরের শ্বাস মিশে যায় ঝঞ্ঝাতে।

সব ক'টি উদাহরণে শব্দ প্রয়োগের একই পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে, যেমন 'সাত সাগরের মাঝি'তে তেমনি 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যে। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'র বাণীভঙ্গি নতুন এবং মধুর ছিলো, কিন্তু 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যগ্রন্থে একই বাণীভঙ্গি তাৎপর্যহীন পোয়েটিক ডিকশনে পরিণত হয়েছে। শব্দের উপর কবি তার অধিকার প্রমাণ করে নি, শব্দই কবির উপর আপন অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যের বাণীভঙ্গি শব্দের বন্ধন-দশায় কবির আর্তনাদের মতো।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় বস্তুবাচক শব্দগুলো অনেক রকমের বস্তুর নামবাচক সাধারণ বাংলা শব্দ, বিদেশী শব্দ, উৎপ্রেক্ষারূপে উপস্থিত কিছু সংখ্যক শব্দ, অলঙ্কৃত শব্দ এবং বিশেষভাবে নির্মিত শব্দ। ফর্‌রুখ আহমদের বিদেশী শব্দ হচ্ছে আরবী-ফার্সী শব্দ, কিন্তু সে শব্দগুলোও অর্থের বিশিষ্টতার কারণে গ্রাহ্য হয় নি, ধ্বনিগত কারণেই সেগুলো গৃহীত হয়েছে। কবিতায় শব্দের সিদ্ধি শুধু ধ্বনিগত কারণেই নয়, অর্থের কারণেও। মূলত শব্দের অর্থবহতার চূড়ান্ত পরীক্ষা কবি করবেন, আমরা এটাই আশা করি। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় আরবী-ফার্সী শব্দের অর্থবহতার কোনও পরীক্ষা ঘটে নি। 'চোখে দেখি সেই তলব নেদার মওতের হকিকত', 'খুঁজে ফিরি আমি পেরেশান হালে দিল থাকে বেকারার', 'মুনাজাত করি পাক বারিতালা আল্লার দরবারে', 'একদা যে রাহাগির বাদগর্দ হাম্মামের মাঝে', 'এ কী ঘন সিয়া জিন্দেগানীর বাব' কবিতার চরণ

www.pathagar.com

হিসেবে এগুলো শুধু যে দুর্বল তাই নয়, শব্দগুলো বিশেষত্বহীন এবং অর্থের সঞ্চয়ে নিতান্ত দরিদ্র। উৎপ্রেক্ষারূপে আহ্‌মদ 'জাম', 'বিয়াবান', 'সফর' 'পাঞ্জেরী' ইত্যাদি শব্দ অনবরত ব্যবহার করেছে। 'সাত সাগরের মাঝি'তে এ ব্যবহারগুলো নতুন ছিলো এবং সুর ও সঙ্গতি নিয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলো। 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যগ্রন্থে একই ব্যবহারের পুনরাবির্ভাব ক্লান্তিকর এবং অর্থহীন মনে হয়। অলংকৃত শব্দ এবং বিশেষভাবে নির্মিত শব্দের পর্যায়ে পড়ে আরবী-বাংলা মিশ্রিত সমাসবদ্ধ পদ এবং কিছু সংখ্যক অনুকারবাচক শব্দ। এ ক্ষেত্রেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বিশেষ কোন নিপুণতার পরিচয় দেয় নি। দেওয়া সম্ভব ছিলো না।

এক সময় ফর্‌রুখ ও আমি আলোচনা করেছিলাম, রসূলের জন্ম-মুহূর্তে পৃথিবীব্যাপী যে সমস্ত তাৎপর্যবহ সংঘটনের বিবরণ মৌলুদগ্রন্থে আছে, সেগুলোকে বাংলা শব্দের ভাবার্থে রূপান্তরিত করা যায় কিনা। ইরানের অগ্নিপূজকদের চিরকালীন অগ্নিশিখা নির্বাপিত হয়েছিলো, কাবাঘরের মূর্তিগুলো ভেঙে পড়েছিলো, পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের নিষ্ঠুর শাসকবৃন্দ অজানা আতঙ্কে কম্পিত হয়েছিলো, একটি অলৌকিক জন্মের তাৎপর্য জানবার জন্য সমস্ত প্রকৃতি যেন উন্মুখ হয়েছিলো। এ বোধগুলোকে বাংলা শব্দে কুশলতার সঙ্গে সমর্পণ করে একটি সুন্দর কাব্যনাট্য রচনা করা যায় এবং একটি সচল প্রশস্তির প্রদীপ্তি নির্মাণ করা যায়। ফর্‌রুখ বলেছিলো সে লিখবে, কিন্তু যখন লিখলো তখন সে সূফীতত্ত্বের অন্তর্লীন ভাবাবেগে নিমগ্ন। তাই নাট্যকাব্যের রীতি-প্রকরণকে অবলম্বন না করে সরল প্রশস্তিতে লিখলো 'সিরাজাম মুনীরা' ঃ

এমন সময় আমিনা মায়ের কোল আলো করি সুবেসাদেক
নিখিল-বিশ্ব-ঊষা নেমে এলো বুকে নিয়ে এলো আলোর রেখ!
সে দিন কি দুলে উঠেছিল ধরা নওশেরোয়াঁর ভেঙেছে দ্বার ?
নিভেছে পৌত্তলিকের হাজার বছর জ্বালানো কুহক নার ?
দুম্বা শাবক ঘাস ফেলে দিয়ে শোনে কি অজানা সুরের গান
অস্ত চাঁদের রশ্মি কি চায় দিনের সূর্যে জোয়ার টান?

কাব্যকর্মের প্রয়োজনে নয়, কিন্তু একটি নিশ্চিন্ত বিশ্বাসের আবেগে ফর্‌রুখ 'সিরাজাম মুনীরা' লিখেছিলো, তাই বিশ্বাসের প্রতিবর্ণীকরণই ছিলো তার লক্ষ্য। সে নাট্যকাব্যের জন্য বেছে নিলো হাতেম তাইয়ের ঘটনাবহুল জীবনকে যেখানে বস্তুগতভাবেই হাতেমের জীবনে অনেক আকস্মিকতা এবং নাটকীয় কুহক বিদ্যমান। পুঁথির কাহিনীতে যে উপকরণগুলো সে পেয়েছিলো, তাকেই প্রচলিত পরম্পরায় সাজিয়ে সে লিখলো কাহিনী-কাব্য 'হাতেম তা'য়ী' এবং সেগুলো থেকে একটিমাত্র ঘটনা বেছে নিয়ে নাট্যভঙ্গির উন্মোচন করলো একই নামের একটি নাট্যকাব্যে।

www.pathagar.com

'সিরাজাম মুনীরা' শীর্ষক কবিতাটিতে ফর্‌রুখ সূফী সাধনার পদ্ধতির মাধ্যমে সত্য আবিষ্কারের কথা বলেছে, বলেছে যে রসূলে খোদা নবুঅত প্রাপ্তির পূর্বে হেরার গুহায় মোরাকেবালীন ছিলেন এবং সে অবস্থায় ঃ

একাগ্রতার সকল সেতারা চেরাগে জ্বালায়ে মনের সাধ–
খোঁজো হে সাধক মৌন: পরম সত্যদ্রষ্টা আল-আহাদ,
খুঁজে ফেরো তুমি লা-শরীকের মহান সত্য অভিজ্ঞান!
মরুর পিপাসা অশ্রু ভিজায়ে জাগাও দু'চোখে কী সন্ধান ?

ফর্‌রুখের বিবেচনায় রসূলের সমগ্র অস্তিত্বের কেন্দ্রবিন্দু ছিলো তাসাওফ এবং তাঁর ইশক-তত্ত্ব। এর প্রমাণস্বরূপ রসূলের যথার্থ অনুসারী হিসাবে সে নাম উল্লেখ করেছে হযরত আবদুল কাদির জিলানীর এবং হযরত মঈনুদ্দীন চিশ্‌তীর। ধ্যান-তন্ময়তার একটি একান্ত জীবনপদ্ধতিকে রসূলের সর্বস্ব-রূপ হিসাবে সূফী সাধকগণ চিহ্নিত করে থাকেন। ফর্‌রুখও তার বিবেচনায় সেটাকেই সত্যি বলে মেনেছিলো। 'বু'আলী কলন্দর' কবিতায় ইকবাল সূফীদের ইশক-তত্ত্বের ব্যাখ্যাসূত্রে লিখেছেন, প্রেমের শক্তিতে সত্তা পূর্ণতা পায় এবং সে শক্তি সাধকের মুষ্টিতে সসাগরা ধরাতল এনে দেয়। ফর্‌রুখের অনুবাদে কথাটির বিন্যাস ঘটেছে নিম্নরূপ ঃ

মুহব্বতের কুঅতে যখন সত্তার পূর্ণতা
শক্তি তাহার মুষ্টিতে আনে সসাগরা ধরাতল,
তার কব্জায় ঝলসিয়া ওঠে আল্লার দেওয়া বল!
ধরা পড়ে তার মুঠিতে ধরার সঞ্চয় ; সম্বল।

কিন্তু যে অর্থে মৌলানা রুমী অথবা ইকবাল সূফী প্রজ্ঞাকে কাব্যের বিষয়বস্তু করেছিলেন এবং তত্ত্বজ্ঞানকে কবিতার নির্ণেয় লক্ষ্য করেছিলেন সে অর্থে ফর্‌রুখ তাসাওফকে কবিতার বিষয়বস্তু করতে পারে নি। সে ছিলো মূলত রোমান্টিক এবং দুর্গম পথযাত্রার আবেগ ছিলো তার প্রচণ্ড। এ-কারণে 'সাত সাগরের মাঝি' কবিতায় প্রাণদ আবেগের যে প্রচণ্ড আনন্দিত বিস্ফোরণ আমরা লক্ষ্য করি, 'সিরাজাম মুনীরা' কবিতায় তার কোনও চিহ্ন নেই। রূমী এবং ইকবালের দার্শনিকতা ফর্‌রুখের ছিলো না, দর্শনের যুক্তি অনুধ্যান, বিবেচনা এবং সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠার জন্য যে মানসের প্রয়োজন ফর্‌রুখের কবি-মানস ছিলো তার বিপরীত। সে ছিলো অসাধারণ চঞ্চল এবং একটি প্রতাপের প্রতিষ্ঠা রেখেছিলো তার কবিতায়। এ প্রতাপ সে পেয়েছিলো তার পিতার কাছ থেকে। পিতা ছিলেন বিত্তবান পুরুষ এবং ইংরেজ আমলের দুর্ধর্ষ পুলিশ অফিসার। এক সময় কলকাতায় কাজী আফসার উদ্দীনের 'মৃত্তিকা' পত্রিকায় সে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস লেখা আরম্ভ করেছিলো, যার নাম দিয়েছিলো 'সিকান্দার শা'র ঘোড়া'। ফর্‌রুখের মুখেই তার পিতার ঐশ্বর্য অহমিকা এবং প্রতাপের কথা শুনেছি। ফর্‌রুখ ঐশ্বর্য চায় নি,

www.pathagar.com

কিন্তু প্রতাপ পেয়েছিলো। প্রতাপ ছিলো তার কণ্ঠস্বরে, বলিষ্ঠ গতি-ভঙ্গিতে, দৃষ্টির তীক্ষ্ণ শাসনে। 'সাত সাগরের মাঝি'র প্রতিটি কবিতায় প্রতাপের উচ্চারণ শুনতে পাই সমুদ্রের অনমনীয় তরঙ্গের মতো; বিচিত্র নামে তার বিশেষণ এবং উপমার পরাক্রম। আশ্চর্য নিঃশঙ্ক তার ছন্দের স্পন্দন ঃ

জড়ো করি লাল, পোখরাজ আর ইয়াকুত ভরা দিন
দরিয়ার বুকে নামায়েছি ফের বে-দেরেগ সংগিন;
সমুদ্র-সিনা ফেড়ে ছুটে চলে কিশ্‌তি, স্বপ্ন সাধ:
নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দাবাদ!
রাতে জেগে শুনি খোদার আলমে বিচিত্র কলরোল,
তারা ছিটে পড়ে মধ্য সাগরে জাহাজে জাগায় দোল,
আমরা নাবিক জংগী জোয়ান ইশারা পেয়েছি কত
মউজের মুখে তাই ভেসে যাই টুকরা খড়ের মত।

ফর্‌রুখের কবিতায় ছন্দ-স্পন্দন এবং অন্ত্যর্যমক অপরিহার্য, সে সর্বদাই কবিতা লিখেছে শ্রবণযোগ্যতার কথা স্মরণে রেখে। ইংরেজীতে যাকে বলে To write for the ear ফর্‌রুখের ছন্দ ও ধ্বনিস্পন্দনে সে অভিপ্রায়ই প্রমাণিত। নিরূপিত ছন্দের বন্ধন মেনেই ফর্‌রুখ কবিতা লিখেছে, সে সর্বদাই চেয়েছে তার কবিতার শব্দাবলী যেন দৃষ্টিতে পড়ে এবং শ্রুত হয়। এদিকে লক্ষ্য রেখেই সে তার শব্দগুলো সাজিয়েছে। বিভিন্ন ধ্বনির পুনরাগমনকে সে বাঞ্ছিত করেছে, যার ফলে তার কবিতা সহজেই পাঠকের অবধানতা পেয়েছে। যেমন ঃ

হে নিশান ফের ইঙ্গিত দাও মানবতার,
হে নিশান ফের ইঙ্গিত দাও
মৃত যাত্রীকে পথ চলার।
ইঙ্গিত দাও মানবতার সে
পূর্ণ চাঁদের ভরা-বিকাশ।

অথবা—

বঞ্চিত তনুমনের আকাশ,
খাক হয়ে যেথা জ্বলে আকাশ,
চৈত্র-দগ্ধ পোড়া মাটি ম্লান
নিষ্প্রভ নীল শূন্যাকাশ।

অথবা—

এই সব রাত্রি শুধু একমনে কথা কহিবার—
খরস্রোতা জীবনের কেনল ঘেঁষে যেখানে অসাড়

www.pathagar.com

অন্ধকার বালিয়াড়ি, তলদেশে যাত্রীরা নিশ্চল
মৃত্যুর কুয়াশা মাঝে বিবর্ণ তুহিন তনুতল
আমাতে সকল গান, সব কথা রিক্ত নিরুত্তাপ,
সয়ে যায় কবরের, সয়ে যায় ধূলির প্রতাপ,
এই সব রাত্রি শুধু একমনে সেই কথা শোনে
সেতারা উড়িছে তার অন্ধকার দুরন্ত পবনে।

উপরের তিনটি উদাহরণেই বাক্যাংশ এবং শব্দের পুনরাবৃত্তির ফলে একটি ধ্বনি-আবর্ত নির্মিত হয়েছে, যার ফলে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত এ-ধ্বনির প্রসারটি পাঠকের স্মরণে থাকে। পাঠককে অথবা শ্রোতাকে আকর্ষণ করবার এ-সহজ কৌশলটি ফর্‌রুখ সর্বদা ব্যবহার করেছে।

আবার একই স্বভাবের ধ্বনিকে কবিতার চরণে চরণে বিভিন্ন স্থানে স্থাপিত করে অনুপ্রাসগত একটি গুঞ্জনের প্রবাহ নির্মাণে ফর্‌রুখের সফলতা লক্ষ্যযোগ্য ঃ

সুরাত জামাল জওয়ানির ঠোঁটে বেকার নওজোয়ান
ভাবে জীবনের সব মধু লোটে কমজোর ভীরু প্রাণ
এ আশ্চর্য আমাদের কাছে! কিশ্‌তী ভাসায়ে স্রোতে
আমরা পেয়েছি নিত্য নতুন জীবনের তাজা ঘ্রাণ।

যাঁরা ছবি আঁকেন তাঁরা ছবি আঁকার আগে ছবির জন্য একটি সাপোর্ট বা অবলম্বন বেছে নেন, তারপর সে অবলম্বনের উপর একটি রং দিয়ে ছবির জন্য গ্রাউন্ড বা ভিত্তি তৈরী করেন। যে ধরনেরই ছবি আঁকুন না কেন, বাস্তববাদী, পরাবাস্তব অথবা বিমূর্ত সকল ক্ষেত্রেই সাপোর্ট এবং গ্রাউন্ডের প্রয়োজন থাকবে। তেমনি কবিতা যে ধরনেরই হোক না কেন, ছন্দ এবং ধ্বনিস্পন্দন তার থাকতেই হবে, ফর্‌রুখ এটা মারাত্মকভাবে বিশ্বাস করতো। সে মোহিতলাল মজুমদারের কবিতা পছন্দ করতো, 'কালাপাহাড়' কবিতা তার প্রিয় ছিলো। ধ্বনির ব্যাখ্যাসূত্রে ইংরেজীতে দুটো শব্দ আছে স্টেটেড (Stated) এবং ইমার্জেন্ট (Emergent)। স্টেটেড হচ্ছে নিরূপিত এবং ইমার্জেন্ট হচ্ছে আকস্মিকভাবে উন্মোচিত। আধুনিক কবিতায় নিরূপিত ধ্বনিবিন্যাসের চাইতে ইমার্জেন্ট ধ্বনির পরীক্ষাই ব্যাপকভাবে হচ্ছে। ফর্‌রুখ নিরূপিত রীতিকেই মান্য করেছে প্রধানত এবং এক্ষেত্রেই তার সিদ্ধি। ফর্‌রুখের বিশিষ্টতা এখানে যে, যেখানে নিরূপিত ছন্দ অতি-পরিচিতির কারণে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয়তা হারাতে পারে, সেখানে ছন্দ-স্পন্দনের কৌশলগত বিন্যাসের কারণে ফর্‌রুখের কবিতা অসচল হয় নি।

দোভাষী পুঁথির রাজ্যে ফর্‌রুখের পরিভ্রমণ ছিলো নিশ্চিত এবং সর্ব সময়ের। প্রধানত দুটো পুঁথি তার প্রিয় ছিলো, একটি 'হাতেম তা'য়ী' এবং অন্যটি 'আলিফ লায়লা'। ফর্‌রুখের সমগ্র কাব্যজীবনে এ-দুটো পুঁথির প্রভাব ছিলো প্রচণ্ড। 'আলিফ

www.pathagar.com

লায়লা' থেকে 'সিন্দাবাদ' এবং 'হাতেম তাই' থেকে 'হাতেম তা'য়ী' এ দুজন প্রবল পুরুষের বিভিন্ন অসাধারণ অভিযান ফর্‌রুখকে অভিভূত করেছিলো। কখনও তারা কোনও কাহিনীর শক্তিমান নায়ক হিসেবে এসেছে, আবার কখনও এসেছে প্রতীক রূপে অবিচল নিষ্ঠার দুর্দমনীয় প্রাণবন্যার এবং সংঘর্ষের সামীপ্যের। পুঁথিকে এক সময় আমিও অবলম্বন করেছিলাম, কিন্তু যখন আমি পুঁথি পাঠ করছি তখন য়েটস এবং টি. এস. ইলিয়টও পাঠ করছি। উপকরণ সংগ্রহের জন্য পুঁথি আমার অবলম্বন হয়েছিলো সত্য, কিন্তু আমার লক্ষ্য ছিলো আধুনিক ইংরেজী কাব্যকৌশলের প্রতি।

'চাহার দরবেশ' যখন লিখি, তখন ইলিয়টের The Waste Land আমার দৃষ্টিতে একটি আদর্শ কাব্যপ্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি: আবার যখন 'কোরবানী বা 'জোহ্‌রা' ও 'মুশতারী' লিখি, তখন য়েটসের At the Hawk's Well এবং The Tower পাঠ করে অভিভূত হচ্ছি। ফর্‌রুখের সঙ্গে য়েটস এবং ইলিয়টের কবিতা নিয়ে আমি আলোচনা করেছি, কিন্তু ফর্‌রুখ এঁদের কাব্যপ্রক্রিয়াকে অশান্ত মনে করতো। অবশ্য এদের বিশিষ্ট ঐতিহ্যবাদিতা ফর্‌রুখকে আশ্বস্ত করেছিলো এবং সে আপন কাব্যকর্মের উৎসমূলে প্রারম্ভিক যুগের ইসলামকে স্থাপন করতে অসুবিধা বোধ করে নি।

ফর্‌রুখের 'সাত সাগরের মাঝি'র সব ক'টি কবিতাই বাংলা ১৩৫০-১৩৫১ সালে মাসিক 'মোহাম্মাদী'র এবং 'সওগাত'-এর বিভিন্ন সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। আমার 'কোরবানী', 'জোহ্‌রা' ও 'মুশতারী ', 'মক্কা মোয়াজ্জমার পথে',—এ সমস্ত ইসলামী ঐতিহ্যনির্ভর কবিতা একই সময় মাসিক 'মোহাম্মাদী'তে প্রকাশিত হয়। 'মক্কা মোয়াজ্জমার পথে' প্রকাশিত হয় পৌষ, ১৩৫০ সালে। ফর্‌রুখের 'সিন্দাবাদ' প্রকাশিত হয় 'সওগাত'-এ পৌষ ১৩৫০ সালে। কালানুক্রম অনুসরণ করলে দেখা যাবে, আমারা উভয়েই নিজস্ব ধারায় একটি স্বকীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হবার চেষ্টা করছিলাম। ফর্‌রুখ সফলকাম হয়েছিলো। আমি পাশ্চাত্য কাব্যধারার সঙ্গে সাযুজ্য খুঁজেছিলাম বলেই হয়তো এগুলোকে সমর্থন করতে পারি নি।

কবিকে অবশ্যই তার বক্তব্যের জন্যে একটি প্রত্যয়যোগ্য ভাষা এবং ছন্দ আবিষ্কার করতে হবে। ফর্‌রুখের 'সাত সাগরের মাঝি'র ভাষা বিষয়বস্তু উপস্থাপনার দিক থেকে বৈলক্ষ্যহীন এবং সুনিশ্চিত। সুনিশ্চয়তার কারণে একটি প্রত্যয় সেখানে প্রতিষ্ঠিত এবং আমারা তখন সকলেই একই স্বভাবের ধ্বনি-স্পন্দনে বিশ্বাসী ছিলাম। যেমন ঃ

১. কেটেছে রঙিন মখমল দিন নতুন সফর আজ। (ফর্‌রুখ)
২. ঝরা পালকের ভস্মস্তূপে তবু বাঁধলাম নীড়। (আহসান হাবীব)
৩. জিন্দেগী নয় হেনার সুবাসে লেবাস খোসবু করা ।(আমি)

আহসান হাবীব এবং আমি এ ছন্দের তরঙ্গে হিল্লোলিত থাকতে পারি নি বেশীদিন। ফর্‌রুখের জন্য এ ছন্দই ছিলো সুষম এবং ভাবগ্রাহ্যতার একটি বিশ্বাসী অবলম্বন।

www.pathagar.com

আবুল হোসেনও কখনও কখনও গদ্যস্বভাবের চরণ-বিন্যাসের মধ্যে মাত্রাবৃত্তের সমপর্বের বিভাগগত চরণ-উপস্থিত করেছে, যেমন ঃ

১. আজ সকালে এই গ্রাম দেখে
পলক পড়ে না চোখে।
২. সালাম সালাম দূর অতীতের আত্মীয়মণ্ডল।
৩. তাইতো আজকে কলম নিয়েছি
আমরা নিজের হাতে।

কিন্তু শব্দকে একটি ধ্বনি-তরঙ্গে প্রভাহিত করে, শব্দপ্রান্তিক কোন ধ্বনিকে একটি স্তবকে আবর্তিত হবার সুযোগ দিয়ে ফর্‌রুখ যে দক্ষতা দেখিয়েছিলো, পর্বমূলক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আমাদের অন্যদের সফলতা সে তুলনায় ছিলো অনেক লঘু। ফর্‌রুখ বলতো, সে কবিতার জন্যে গদ্য-ভঙ্গিকে স্বীকার করে না; কেননা, তার বিবেচনায়, যারা গদ্যের বাচনরীতি কবিতায় প্রয়োগ করে, তারাও সাধারণ মানুষের কণ্ঠস্বরকে তুলে ধরে না। সুতরাং কবিতার জন্য উভয় ক্ষেত্রেই যেহেতু বিশিষ্টার্থক প্রথাই নির্মিত হচ্ছে, অতএব প্রচলিত ছন্দরীতিকে আরও প্রভাবশালী ও সম্ভ্রান্ত করাই কবির কর্তব্য। এ বিশিষ্টার্থক প্রথার অপর্ব সুন্দর নিদর্শন নিম্নের কবিতাটিতে লক্ষ্য করি ঃ

শুনি নি প্রেমের সংজ্ঞা, চোখ তুলে তবু চাও যবে
প্রেমের সত্তাকে চিনি, যে মুহূর্তে হাতে রাখো হাত
উন্মুখর ঘূর্ণাবর্তে কাটে দ্বিধা দ্বন্দ্বের সংঘাত
রেঙে ওঠে মন মেঘ আকাশের আরক্ত বৈভবে।
ভুলে যাই এ জীবনে তিক্ত ভুল হয়েছিলো কবে,
ঘনঘোর কেশদামে নেমে আসে স্বপ্নভরা রাত
জ্বলন্ত অঙগার বক্ষে ক্ষণে ক্ষণে করে ছায়াপাত
চেতনার সাড়া আনে বিভ্রান্ত দিনের মৃত শবে।
শুক্লা দ্বাদশীর স্পর্শে জেগে ওঠে তমিস্রা সাগর
প্রতি তরঙ্গের বুকে চাঁদ জ্বলে চাঁদ ভেঙে পড়ে,
নীল জোয়ারের স্পর্শে আধো ঘুমে জাগে ঝাউবন।
আজ রাত্রে হাত দাও চোখ রাখো এ চোখের পর
বিগত ফাল্‌গুন যার বৈশাখের মৃত্যু কৃষ্ণ ঝড়ে
তোমার উত্তপ্ত স্পর্শ শুনুক সে প্রাণের স্পন্দন।

আমাদের সকলের কবিতাই আত্মগত এবং আত্মগত সংস্থিতিতেই আমরা একে অন্যের পাঠক। এর মধ্যেই আমরা সত্যকে সন্ধান করি এবং সে সত্য ব্যক্তিবিশেষের।

www.pathagar.com

একটি সর্বচেতনার সত্যের কথা আমরা বলি, কিন্তু আমরা প্রত্যেকেই আপন আপন প্রক্রিয়ায় নিজস্ব বক্তব্যকেই উপস্থিত করছি। এভাবেই হয়তো আমরা পাঠক নির্মাণ করছি। এর মধ্যে অনেক পাঠক যথার্থ, আবার বহু পাঠক কাল্পনিক। ফর্‌রুখের কাব্যপ্রক্রিয়ায় যেহেতু একটি বিশ্বাসের উন্মুখরতা ছিলো, তাই তার পাঠকের সংখ্যা আমাদের মধ্যে সর্বাধিক। বিশ্বাসের সে একটি কল্লোলিত সমর্থন পেয়েছে, আবার ব্যবহৃত শব্দের পরিধির সার্থক বিবেচনা এবং ধ্বনিসাম্যের কারণে অবিশ্বাসীও তাকে আগ্রাহ্য করতে পারে নি। আমি ফর্‌রুখের কাব্যে যেমন আমার বিশ্বাসের প্রতিচিত্রণ পেয়েছি, তেমন পেয়েছি আমার বুদ্ধিবৃত্তির প্রেক্ষাপট এবং আমার অনুচ্চারিত সকল ইচ্ছার উন্মোচন।

www.pathagar.com

মনিরউদ্দীন ইউসুফ

ঐতিহ্যের রূপকার ফর্‌রুখ

১.

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জানাশোনা খুব বেশীদিনের নয়। সম্ভবত ১৯৬২ সালের কোন এক সময়ে তাঁকে প্রথম দেখি। আকস্মিক এই পরিচয় অবশ্য হৃদ্যতার দিক দিয়ে নিবিড় হয়ে উঠতে সময় নেয় নি। তাঁর কবিতার শক্তিমত্তা, সেই সঙ্গে তাঁর ব্যক্তি-জীবনের সততা ও চারিত্রিক দৃঢ়তা– শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্যে এ-তিনটিই যথেষ্ট ছিল।

কবির মানসিক বৈশিষ্ট্য ধরেই কবিতার জাত নির্ণয় সহজ হয়। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মানসিক বৈশিষ্ট্য স্বাধীনতা ও সাহসিকতাসূচক ছিল বলে, প্রথম থেকেই তাঁর কবিতার রোমান্টিক ভাব প্রবল হয়ে উঠতে দেখা যায় এবং তার প্রকাশ ভাষা ছন্দ ও রূপকল্প-মহিমায় বলিষ্ঠ হয়ে আত্মপ্রকাশ করে। যিনি যত বড় রোমান্টিক কবি, তিনি তত বেশী অন্য-নিরপেক্ষ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে তাঁর বাইশ-তেইশ বছর বয়সে, অর্থাৎ চল্লিশের দশকের শুরু থেকেই রবীন্দ্র-প্রভাব কাটিয়ে উঠতে দেখা যায়। এমন কি, যে নজরুল ইসলাম তখন কবিতায় বাঙালী মুসলমানের অবিসংবাদিত নেতা, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর অনুসরণ থেকেও নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন।

নজরুল ইসলামের জনপ্রিয়তা ও সমকালীনতার ভিত্তি যে-নিপীড়িত জনতার সঙ্গে একাত্মতা, তা তখন ভারতবর্ষে ইংরেজ-বিরোধী জাতীয়তার পরিভাষায় ব্যক্ত হচ্ছিল। নজরুল ইসলাম ইংরাজ-বিরোধিতার বিদ্রোহী তরঙ্গ সওয়ার হ'য়ে জাতীয়তার মূলমন্ত্রকে জনগণের উদ্দেশ্যে এমনভাবে উৎসর্গ করে চলেছিলেন যে,ভারতীয় জাতীয়তাবাদের প্রতিভূ বলে ঘোষিত সংস্কৃতিই তাঁর কবিতার অন্তঃস্রোত হয়ে তার গতি নিয়ন্ত্রণ করছিল। ফলে, মানবতার পরিচয় তুলে ধরতে যেয়ে যে-সব মুসলিম মহাপুরুষ ও মনীষীকে তিনি তাঁর কবিতায় এনেছিলেন, তাঁরা নজরুলকে নির্বিশেষ মানবতায় স্থির রাখতে পারেন নি। জাতীয়তাবাদের প্রতি এহেন নিষ্ঠা নজরুলের সাংস্কৃতিক পরিচয়কে দ্বিধা-বিভক্ত করে দিয়েছিল। ফর্‌রুখ-প্রতিভা কিন্তু তেমনভাবে স্বীয় ঐতিহ্য-তরুর শিকড় থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে নি। জনপ্রিয়তা ও সমকালীনতার অভিধায় পরিচিত হতে তিনি প্রলুব্ধ ছিলেন না। এটি ফর্‌রুখের কবিতার বলিষ্ঠতা ও নিজস্বতার পরিচায়ক।

www.pathagar.com

বলা আবশ্যক যে, রবীন্দ্রনাথ কিন্তু আজীবন স্বীয় ঐতিহ্য-তরুর সঙ্গে সংলগ্ন ও ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বিশ্বস্ত ছিলেন, সেই সংস্কৃতির ফলশ্রুতি হিসাবে বেদান্ত উপনিষদের আনন্দবাদকে তিনি ছন্দের সুষমায়, রূপকের রহস্যময়তায় ও ইঙ্গিতের মহার্ঘতায় সারা জীবন পরিবেশন করে গেছেন, এমন কি জীবনের প্রথম পর্বের কবিতায়ও সে-পরিচয় নির্ভুলভাবে অঙ্কিত রয়েছে। নিরুদ্দেশ যাত্রায় কবি যে সোনার তরীর যাত্রী তার কর্ণধারকে জিজ্ঞাসা করতে ভোলেন না যে, নিরুদ্দেশের যে-লক্ষ্যপথে তরী চালানো হয়েছে, তা কি কালাপানির পারে 'শান্তি ও সুপ্তি'র দেশে গিয়ে পৌঁছবে? কর্ণধার জীবন-দেবতা বা দেবী তখন রহস্যময় স্মিত হাসির দ্বারা কবিকে আশ্বস্ত করেন যে, সেই শান্তি ও সুপ্তির দেশে সব আছে। এই শান্তি ও সুপ্তির দেশই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রকর্ষের ভূমি। মানবত্মার উপজীবিকা সেখানেই আছে।

তবে কি ঐতিহ্যের সঙ্গে সংলগ্ন থেকে সংস্কৃতির ফলশ্রুতিকে তুলে ধরাই কবির মাহাত্ম্যের পরিচায়ক? কবির সামাজিক দায়িত্ব বলতে কিছু নেই?

কবি ও রাজনীতিকের সমাজ-চর্চা এক নয়। সমাজ থেকে অবশ্য কবিকে বিচ্ছিন্ন হলেও চলে না। সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন কবির কবিতা কাগজের ফুল: প্রাণের সজীবতা তাতে অনুপস্থিত থাকে। রাজনীতিকের যে সমাজ-চর্চা পরিবেশের তাৎক্ষণিকতাকে অবলম্বন করে, কবি সেই সমাজের সঙ্গে লগ্ন থাকার জন্যেই ঐতিহ্যকে ধরে থাকেন, তাই কবির ঐতিহ্যপ্রীতি জীবন-নিরপেক্ষ। অতীতের কাহিনী-বিলাস নয়। জীবনের প্রয়োজনেই কবিকে ঐতিহ্য-লগ্ন হতে হবে। রাজনীতিকের সমাজ-চর্চা আশু কার্যসিদ্ধির সত্ত্বরতা, কিংবা ধর্মগুরুর বৃত্তাবদ্ধ নীতি নিয়মের চাপের কাছে আত্মসমর্পণ হয়ে আত্মপ্রকাশ করলেও, কবির কাছে তেমন কার্যসিদ্ধি তুচ্ছ ব্যাপার।

সামাজিক হিসাবে কবির নিয়তি-নির্দেশিত দায়িত্ব হলো, জীবনের বহু দূর পর্যন্ত নিয়ে যাবার জন্যে আত্মিক বা মানসিক শক্তির উদ্বোধন। এই শক্তিই একদিন মানব-পরিবেশকে তার সমুচ্চ বাসনার অনুকূল করে তুলবে। প্রাণ-শক্তির সেই উদ্বোধনের সপক্ষে কবিকে ঐতিহ্য-নির্দেশিত সংস্কৃতির পথ ধরে ইতিহাস, কিংবদন্তী কিংবা কোন সমুচ্চ তত্ত্বজ্ঞানকে সমাজ-মনের সামনে ধ্রুবতারার মতো প্রতিষ্ঠা করার কাজ করে যেতে হয়। ফলে, কবির মতো সহৃদয় সামাজিকের বাণী দেশ ও ভাষার সীমারেখা অতিক্রম করে সকল মানুষের হৃদয়-তারেই সমভাবে অনুরণিত হতে থাকে।

এই সামাজিক দায়িত্ব আমাদের আলোচ্য কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কতটুকু পালন করেছিলেন? নিঃসঙ্গ নির্জনতার মধ্যেই কি তাঁকে দুনিয়া থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল?

না। ফর্‌রুখ সত্যার্থে নিঃসঙ্গ-নির্জন ছিলেন না। কারণ, স্বীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তিনি ছিলেন পুরোপুরি সম্পর্কিত। এই ঐতিহ্য সংলগ্নতাই তাঁর কবিতাকে এমন বলিষ্ঠ করেছে ও কবির সামাজিক দায়িত্ব পালনে তাঁকে করেছে ঐকান্তিক।

www.pathagar.com

কবিতা এক ধরনের নয়। কোন কোন কবিতা পরিবেশকে ছবির মতো ধরে রাখে; কোন কবিতা তাৎপর্যপূর্ণ অতীতকে ব্যঞ্জনাময় ভাষায় মনের সীমাহীন আগ্রহের সামনে তুলে ধরে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাৎক্ষণিক পরিবেশের ছবি আঁকার পক্ষপাতি ছিলেন না বলেই, তাঁকে নিঃসঙ্গ নির্জন বলা ঠিক হবে না। বরং ঐতিহ্যের রূপকার হওয়ার কারণে তিনি কবির সামাজিক দায়িত্বকে যথেষ্ট সহৃদয়তা ও স্বকীয়তার সঙ্গে পালন করেছেন।

এই ঐতিহ্যকে নির্ভুলভাবে লাভ করেছিলেন বলেই তিনি স্বীয় সংস্কৃতিকে তিনটি মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত দেখেছিলেন, এবং কাব্যিকভাবে সর্বত্র তা উপস্থাপিত করে গেছেন। ঐতিহ্যের পথ ধরে কালের উজানেও প্রাক-ইসলামী যুগের হাতেম তায়ী পর্যন্ত তিনি পৌঁছেছিলেন। দীর্ঘ সেই মানবিক এতিহ্যকে তিনি স্থান ও কালের বুকে কিভাবে বিস্তৃত দেখেছিলেন, তার এক সুন্দর কাব্যিক নিদর্শন রয়েছে 'কিস্‌সাখানির বাজার' নামক কবিতায় ঃ

এই কিস্‌সাখানির বাজার
এ-ও এক পণ্যশালা।......শেষহীন আলিফ লায়লার
অশেষ কাহিনী নিয়ে পড়ে আছে যুগ-যুগান্তর !
মরু গিরি পাড়ি দিয়ে আসে যায় যত সওদাগর
তারাই সাজায়ে রাখে এ বাজার.........দু'দিনের ঘর,
বলে যায় একে একে সেই সব সওদাগর
অন্তহীন জীবনের কথা;
কথক হারায়ে গেলে নতুন কথক টানে
কাহিনীর ধারাবাহিকতা।।

এই কবিতায় স্বীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতার সঙ্গে অন্তহীন জীবনের কাহিনীর ইঙ্গিতটুকুও ফুটিয়ে তুলেছেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। ঐতিহ্যের অনবদ্য রূপকার এই কবি, বাংলাভাষার এক রূপদক্ষ কবি হিসাবে বেঁচে থাকবেন বলে আমরা মনে করি।

কিন্তু সামাজিক হিসাবে কবির দায়িত্ব শুধু পরিবেশের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন কিংবা ঐতিহ্যের রূপায়নের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। মানুষের অমর অংশের জন্যে উপাদেয় উপজীবিকা সরবরাহ করাই বরং তার শ্রেষ্ঠ করণীয়। বাংলা ভাষায় রবীন্দ্র-কবি ভারতীয় সংস্কৃতির আনন্দ ও শান্তিকে পরিবেশন করে সেই সামাজিক দায়িত্ব পালন করে গেছেন। ভারতীয় সংস্কৃতির এই প্রকট সম্ভাবনাকেই তিনি নৈবেদ্যরূপে বিশ্ব-চেতনার দ্বারে উপঢৌকন হিসাবে পেশ করেছিলেন।

এ যুগের অন্য এক উপ-মহাদেশীয় কবি ইকবালও ইসলামী সংস্কৃতির সারাংশকে 'খুদী' বা 'মানবাত্মার' জাগরণের পরিভাষায় অত্যন্ত সংবেদনশীল উপায়ে কাব্যিক উপাদানে সমৃদ্ধ করে মানবাত্মার সিংহদ্বার পর্যন্ত নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন, যাকে

www.pathagar.com

লাভ করে বিশ্ব-মানুষ সফলতার সম্ভাবনাময় এক ভবিষ্যৎকে তাদের সামনে উন্মুক্ত দেখতে পেয়েছিল।

ফর্‌রুখ আহমদ ঐতিহ্যের ইঙ্গিতকে ততদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি।

মহত্তমদের তুলনায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এই ন্যূনতাকে, অবশ্য কোনক্রমেই অসাফল্য বলা ঠিক হবে না। কারণ শক্তির সীমাকেই নিয়তি বলা হয় এবং বিশ্ব-বিন্যাসে শক্তির তারতম্য অনিবার্যভাবেই স্বীকৃত।

২.

প্রবন্ধের প্রথমাংশে বলেছি যে সৈয়দ আলী আহসান ও কবি আবুল হোসেনের সঙ্গে শুরু করলেও ইকবালের কবিতার প্রতি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সারা জীবনই অনুরক্ত ছিলেন এবং প্রবীণ বয়সেও তিনি ইকবালের কবিতার অনুবাদ সমান আগ্রহেই করে ছিলেন।

সৈয়দ আলী আহসান দেশের এক প্রখ্যাত কবি। কবি-জীবনের শুরুতে তিনি হয়তো ঐতিহ্যের পাঠ গ্রহণের জন্যে দার্শনিক কবি ইকবালের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন। আবুল হোসেন ও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উদ্দেশ্যই তখন অন্য রকম ছিল না। তাঁরা ইসলাম ধর্মের মূল্যবোধ ও বিভিন্ন যুগে তার রূপায়ণকেই নিজেদের ঐতিহ্য বলে গ্রহণ করেছিলেন।

কিন্তু এ শতকের চল্লিশের দশকে ইসলাম বাহ্যত কোথাও শ্রদ্ধার আসনে ছিলো না। তুরস্কের যে-মুস্তফা কামালকে নিয়ে মুসলমান তখন গর্ববোধ করতো, তিনিও ইসলাম নয় বরং ইয়োরোপীয় জাতীয়তাবাদের পুরোপুরি অনুসারী ঠিলেন, আর সে জন্যেই ইকবাল তাঁর উপর থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়েছিলেন।

ইয়োরোপীয় শিক্ষা-দীক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবশত এবং জাতীয়তাবাদের অনুসরণে দুনিয়ার গোটা আধুনিক পরিবেশকেই ঐতিহ্যরূপে বরণ করার আগ্রহে সৈয়দ আলী আহসান ও কবি আবুল হোসেন ইকবালের প্রতি সেই পূর্ব-আকর্ষণ অব্যাহত রাখতে পারেন নি। অন্যদিকে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ইকবালের মধ্যে খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁরই আচরিত মানবিক আদর্শের এক অনন্যসাধারণ রূপকারকে। ইকবালের ইসলাম-তত্ত্ব জীবনের যে-সত্যকে ক্রমোন্মোচিত করে চলেছিল তার প্রতি ফর্‌রুখ ছিলেন নির্নিমেষ। যে ঐতিহ্যকে বাংলা ভাষার কবি নিজের মানসদিগন্তে প্রলম্বিত প্রেক্ষাপটরূপে পেয়েছিলেন, উর্দু-ফরসীর ইকবাল-কবির পেছনেও সেই ঐতিহ্যেরই প্রেক্ষাপট প্রলম্বিত ছিল। ইকবাল তাঁর সূক্ষ্ম চিন্তা-অনুভূতিকে যেভাবে ভাষার কারুকর্মে মূর্ত করে তুলেছিলেন, সম-মনা ফর্‌রুখও সেগুলিকে অনুবাদের মাধ্যমে বাংলায় অনবদ্যভাবে ফুটিয়ে তুলতে পেরেছিলেন। ঐতিহ্য-সূত্রে গ্রথিত পূর্ববর্তীর প্রতি এই শ্রদ্ধা বাংলা-ভাষায় এই অনুবাদগুলোর মধ্যে এক অমর স্থায়িত্ব লাভ করলো।

www.pathagar.com

আশ্‌রাফ সিদ্দিকী

আর এক অগ্নিবীণা

মোটামুটিভাবে চতুর্থ দশক বা তার কিছু পূর্ব থেকে পাঠক হিসাবে আমরা যাঁদের কবিতা উৎসাহের সঙ্গে পড়তাম, সে-যুগের তরুণ বা তরুণতর কবিদের মধ্যে অবশ্যই প্রথম সারিতে ছিলেন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন , সৈয়দ আলী আহসান প্রমুখ। লেখক হ'তে হলেই পাঠক হ'তে হবে, এটাই ত পূর্বশর্ত। আমরা যারা তখন ছোটদের মহফিলে লিখি, বড়দের সদর মহফিলে উঁকিঝুঁকি দিতাম বৈ কি! পাঠক হিসাবে সে যুগের 'হানাফী', 'নবযুগ', 'আজাদ', 'ইত্তেহাদ', 'মোহাম্মাদী', 'বুলবুল', 'গুলিস্তাঁ', 'সওগাত' প্রভৃতিতে কবি নজরুল ইসলাম, শাহাদাৎ হোসেন, গোলাম মোস্তফা, জসীম উদ্‌দীন, আবদুল কাদির, কাদের নওয়াজ, বেনজীর আহ্‌মদ, বন্দে আলী মিয়া, আ. ন. ম. বজলুর রশীদ, শামসুদ্দীন, বেগম সুফিয়া কামাল, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা এবং আরও অনেকের লেখাই প্রকাশিত হ'ত। এঁদেরই উত্তরসুরি বা সমসাময়িক সে-যুগের তরুণ বা তরুণতর লেখকদের কবিতার সঙ্গে আমাদের পরিচিতি ঘটবে, এটাই ত স্বাভাবিক ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, এ যুগের তরুণ কবিদের যেমন লেখার জন্য বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার প্রশস্ত ময়দান রয়েছে, সে যুগে তেমন সুযোগ ছিল না। পত্রিকাও ত' হাতে গোনা ছিল। এ-সব পত্রিকার সম্পাদক বা ভারপ্রাপ্ত সম্পাদকগণও প্রবীণ বা অভিজ্ঞ ছিলেন। প্রবীণদের প্রতি তাঁদের শ্রদ্ধা ছিল, নবীনদের প্রতি ছিল স্নেহ। এই অবস্থায় একজন নতুন লেখকের জায়গা করে নেয়া খুব সহজ ছিল না। এই সময় প্রায় প্রতি মাসে এবং প্রায় প্রতিটি পত্রিকার বিশেষ বিশেষ সংখ্যায় কখনো প্রথম পৃষ্ঠায় যখন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, আহসান হাবীব বা আবুল হোসেন প্রমুখের কবিতা বের হত, তখন তাঁদের আমরা পত্রিকা জগতের স্নেহধন্য সুপরিচিত লেখক হিসাবেই ধরে নিতাম। তাঁদের সম্বন্ধে এর-ওর কাছে কি করেন, কেমন দেখতে, কোথায় থাকেন, এ সবই আমাদের জিজ্ঞাস্য ছিল। দেখতে ইচ্ছে হ'ত তাঁদের। মনে মনে শ্রদ্ধা জানাতাম। যে তিনজন লেখকের কথা বললাম, তাঁরা প্রত্যেকে রবীন্দ্র-নজরুল সাহিত্য-সূর্যালোকিত পৃথিবীতে বাস করেও আপন বৈশিষ্ট্যে প্রোজ্জ্বল ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ বলতে পারি, আহসান হাবীবের 'রাত্রি শেষে'র কবিতা অথবা আবুল হোসেনের 'নববসন্ত'-এর সমুদয় কবিতার প্রায় অধিকাংশই এই সময়ে পূর্ববর্ণিত পত্র-পত্রিকা এবং বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত প্রগতিশীল 'কবিতা' এবং হুমায়ুন কবির সম্পাদিত

www.pathagar.com

'চতুরঙ্গ'তেও বের হয়েছে। একই মন্তব্য তদানীন্তন স্কটিশ চার্চ কলেজের ছাত্র ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কিন্তু তবু একজন কিশোর বা সদ্য কলেজে পড়া আমার মত পাঠকের হৃদয়ে আবেদনটা কিভাবে এসে পৌঁছাতো ? আহসান হাবীবকে মনে হ'ত রোমান্টিক (বিশেষ করে তাঁর 'নীল খাম' প্রভৃতি কবিতা), কিন্তু কথা বলেন বড় তীর্যকভাবে—ধনুকের তীরটা সোজা এসে বক্ষভেদ করে। বিশেষ করে তাঁর 'হক নাম ভরসা' প্রভৃতির মত শাণিত তীর। আবুল হোসেন 'মেহেদীর জন্য কবিতা' লিখতেন। গদ্য কবিতায় এমন একটি আবেশ সৃষ্টি করতেন যে, এ মেহেদী এক সুর করে পড়তে ভালো লাগতো, পড়া শেষ হলেও তার অনুরণন থাকতো। সম্ভবত এখনও ভালো লাগবে।

ফর্‌রুখ এলেন তিরিশের আধুনিক কবিদের পথ ধরে, তাঁর 'সওগাত'-এর 'আঁধারের স্বপ্ন' (পৌষ ১৩৪৫), চৈত্র প্রভাতের সুর' (ফাল্গুন ১৩৪৫), 'নাটকীয়' (চৈত্র ১৯৪৫) চৈত্র সন্ধ্যার সুর' (বৈশাখ ১৩৪৬), 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি' (পৌষ ১৩৪৭), 'পথিক' (১৩৪৯) প্রভৃতি পার হ'য়ে ১৩৫০-এর শ্রাবণে প্রথমেই 'তায়েফের পথে' যাত্রা সূচিত হল। তারপর কতকটা নজরুলের সেই ইসলামী গজল, পুঁথি এবং দূর আরবের আলিফ লায়লার স্বপ্ন-রংগীন পথ ধরে বলিষ্ঠ থেকে বলিষ্ঠতর পথে যাত্রা ; তাঁর আলিফ লায়লার সমুদ্র-নাবিকদের সাথে ভেসে যেতে একটা রোমাঞ্চ ছিল, যাত্রা মন্দ লাগতো না, কথা এবং ছন্দ ও সুর নতুন। আর এটাও অস্বীকার করার উপায় ছিল না যে, নজরুল বাংলা সাহিত্যে পূর্বে যে ইসলামী শব্দভাণ্ডারের সার্থক রূপায়ণ করেছিলেন, জসীম উদ্‌দীনের মধ্যে যা পেল ঘরোয়া-আবেষ্টনী, ফর্‌রুখে তা স্বভাবতই একেবারে আনকোরা নতুন মনে হ'ল না। কিন্তু নতুন লাগলো ওয়ার্ডসওয়ার্থ, কোলরিজ, শেলী, কীটস, ইলিয়টী মাধুর্যমণ্ডিত তাঁর প্রকাশভঙ্গি, শব্দযোজনা, যা তরুণ পাঠকদের আকর্ষণ করার জন্য যথেষ্ট ছিল ঃ—

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দাবাদ।

[সিন্দাবাদ ঃ সাত সাগরের মাঝি]

অথবা ঃ

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার শাদা তাজী!
খুরের হলকা,--ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী........

[বা'র দরিয়ায় ঃ সাত সাগরের মাঝি]

www.pathagar.com

অথবা ঃ

আখরোট বনে,
বাদাম খুবানি বনে
কেটেছে তোমার দিন।
হে পাখী শুভ্রতনু,
সফেদ পালকে চমকে বিজুরী, চমকে বর্ণধনু
সোনালী, রূপালী, রক্তিম রঙিন।

[আকাশ–নাবিক ঃ সাত সাগরের মাঝি]

বলা নিষ্প্রয়োজন, নজরুলের 'কামাল পাশা', 'খালিদ', 'মহররম' প্রভৃতি কবিতার স্টাইল যেমন তাঁর নিজেরই স্টাইল, ফর্‌রুখের এইসব কবিতার প্রকাশ-নৈপুণ্য তেমনি তাঁর নিজস্ব। এ নৈপুণ্য রপ্ত করা অথবা যৌগিক, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্তের স্বচ্ছন্দগামী কাব্যের ঘোড়াকে বল্গা খিঁচে ঠিকমত চালানো সহজ ছিল না। অনেকেই কিন্তু চেষ্টা করেছিলেন, পারেন নি। আর যাঁরা পারেন নি সেইসব কাব্য-সমালোচকের দল এ যুগে যেমন নজরুলকে গালমন্দ দিতেন, ফর্‌রুখকেও তেমনি বাঁকাচোরা কথা বলতেন। সাধারণ একজন পাঠক হিসাবে আমাদের প্রতিক্রিয়া ছিল এই যে, বৈচিত্র্য নিয়েই ত' কাব্যসাহিত্য, নানা সুর নিয়েই ত' সুর-সংগীত নদী-সমুদ্র, ভালোই ত' লাগছে, নতুন সুরে নতুন আবেগ।

কিন্তু তাজ্জব হ'য়ে গেলাম আমরা 'সওগাত' কার্তিক ১৩৫১-এ তাঁর 'ডাহুক' কবিতা পড়ে ঃ

রাত্রিভর ডাহুকের ডাক........
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির।
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।

*

বেতস লতার তারে থেকে থেকে বাজে আজ বাতাসের বীণা,
ক্রমে তাও থেমে যায়;
প্রাচীন অরণ্যতীরে চাঁদ নেমে যায়;
গাঢ়তর হ'ল অন্ধকার।
মুখোমুখি বসে আছি সব বেদনার
ছায়াচ্ছন্ন গভীর প্রহরে।
রাত্রি ঝরে পড়ে
পাতায় শিশিরে......
জীবনের তীরে তীরে.....
মরণের তীরে তীরে......
বেদনা নির্বাক।

www.pathagar.com

সে নিবিড় আচ্ছন্ন তিমিরে
বুক চিরে, কোন ক্লান্ত কণ্ঠ ঘিরে দূর বনে ওঠে শুধু
তৃষাদীর্ণ ডাহুকের ডাক।।

[ডাহুক ঃ সাত সাগরের মাঝি]

এটি এমন একটি কবিতা, যার একটি পঙক্তিও বাদ দিয়ে পড়া চলতে পারে না। এটি এমনই এক সুর যা বাজানো যেন-তেন বাদকের পক্ষে সম্ভব নয়; এটি এমনই একটি সৃষ্টি, যা যতবারই পড়া যায় ততবারই নতুন মনে হয়। একেই কি বলে কাব্যের এটারনিটি? এটারনাল ট্রুথ বা এটারনাল মিউজিক?

এ-কবিতা স্মরণ করিয়ে দেয় ইংরেজী সাহিত্যের ওয়ার্ডসওয়ার্থ ও শেলীর টু এ স্কাইলার্ককে। কিন্তু ফর্‌রুখের 'ডাহুক' আকাশচুম্বী নয়, মর্ত্য মাটির ধূলায় বন্দী কণ্ঠ হ'তে রক্ত উদ্‌গীরণকারী এক মিথিক ডাহুক, আত্মার আত্মলোকে যার অবিরাম জিকির, জিগর উন্মোচন করে যে মানবতার ডিম্বকুসুম ফোটাতে চায়।

ইংরেজী ১৯৪৩। বাংলা ১৩৫০। কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় নর-কংকালের মিছিল। দেখেছি নারীদেহ নিয়ে কায়েমী সুখ-বাদীদের একই খেলার পুনরাবৃত্তি। দেখেছি কত স্বল্পমূল্য আদমসন্তানের। সেই বেদনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্যে নতুন যুগের অগ্নিবীণার প্রয়োজন ছিল। নজরুল তখন অসুস্থ। বীণা বাজলো সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোলাম কুদ্দুস প্রভৃতি আরও অনেকের হাতে। আরও ২/১ বছর পরে সুকান্তের হাতে। কখনো ময়লা পাজামা, কখনো লুংগি পরা, হাতে কালো কালো লম্বা তুলির কলমে উদভ্রান্তের মত ছবি আঁকছেন ময়মনসিংহের এক শিল্পী—নাম জয়নুল আবেদীন। ঈদ-সংখ্যা 'আজাদ'-এর প্রথম পৃষ্ঠায় এই শিল্পী আঁকলো দু'টি শীর্ণ হাত—যে কোন আদম সন্তানের, দূরের আকাশে ঈদের চাঁদ, বিরাট ভ্রূকুটির মত। 'সওগাত'-এ 'মোহাম্মদী'তে বিশেষ ঈদ-সংখ্যায় এ শিল্পীর ছবি, ডাস্টবিনে মানুষে-কুকুরে উচ্ছিষ্টের জন্যে কাড়াকাড়ি। মৃত আদমের লাশ পরে আছে রাজধানীর গর্বিত ফুটপাতে, মৃত মায়ের স্তন চুষছে জীবন্মৃত শিশু। আর ঠিক সেই সময়ে সম্ভবত 'সওগাত'-এ বের হ'ল একটি কবিতা, নাম—'লাশ' ঃ

যেখানে প্রশস্ত পথ ঘুরে গেল মোড়,
কালো পিচ-ঢালা রঙে লাগে নাই ধুলির আঁচড়,
সেখানে পথের পাশে মুখ গুঁজে পড়ে আছে জমিনের পর;
সন্ধ্যার জনতা জানি কোন-দিন রাখে না সে মৃতের খবর।

*

স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা
এ পাশবিকতা,
শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ
বিষাইছে দিনের পৃথিবী ;
রাত্রির আকাশ।

www.pathagar.com

*

কার হাতে হাত দিয়ে নারী চলে কাম-সহচরী ?
কোন সভ্যতার?
কার হাত অনায়াসে শিশু–কণ্ঠে হেনে যায় ছুরি?
কোন সভ্যতার ?
পাঁজরার হাড় কেটে নৃত্য-সুর জেগে ওঠে কার?
শ্রমিকের রক্তপাতে পান-পাত্র রেঙে ওঠে কার?
কোন সভ্যতার?

*

হে জড় সভ্যতা!
মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বার-প্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও
ধ্বংস হও,
তুমি ধ্বংস হও।।
[লাশ ঃ সাত সাগরের মাঝি]

এমনিই সব কবিতা ছিল 'শকুনী' (সওগাত, কার্তিক ১৩৫০), 'বিরাণ সড়কের গান' (ঐ, মাঘ, ১৩৫২) ইত্যাদি যা জ্বালা ধরিয়ে দিত আমাদের তরুণ রক্তে, বলা নিষ্প্রয়োজন, এ-কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। এর পরেই পড়লাম বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত 'কবিতা', প্রেমেন মিত্র সম্পাদিত 'অরণি'। এ ছাড়া 'পরিচয়', 'রূপায়ণ', হুমায়ুন কবীর সম্পাদিত 'চতুরঙ্গ' এবং কাজী আফসারউদ্দীনের 'মৃত্তিকা'য় আরও কিছু মৌলিক সুরের কবিতা। তরুণ সমাজে সকলের মুখে মুখে তখন ফর্‌রুখের নাম। অমুসলিম খ্যাতিমান কবি এবং পত্রিকা সম্পাদকগণও তখন পরিচিত হয়ে গেছেন তাঁর প্রতিশ্রুতিশীল কাব্য-প্রতিভার সঙ্গে। তখন বিভিন্ন সাহিত্য সভা-সমিতিতে আবৃত্তিকৃত হচ্ছে তাঁর কবিতা। প্রশংসা করে প্রবন্ধ লিখছেন শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্র মজুমদার, 'পরিচয়' 'নতুন সাহিত্য' গোষ্ঠীর নরহরি কবিরাজ, কবি আবদুল কাদির এবং কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এ সময়ের প্রায় প্রতিটি কাব্য-সমালোচনামূলক গ্রন্থেই তাঁর উল্লেখ থাকতো।

www.pathagar.com

অধ্যাপক আবদুল গফুর

ফররুখ-মানস : তাঁর কবিতা

১. ফররুখ-মানস

"চাঁদের এক পৃষ্ঠায় আলো পড়ে না, সে আমাদের অগোচর, তেমনি দুর্দৈবক্রমে বাংলাদেশের আধখানায় সাহিত্যের আলো যদি না পড়ে তাহলে আমরা বাংলাদেশকে চিনতে পারব না ; না পারলে তার সঙ্গে আমাদের ব্যবহারে ভুল ঘটতে থাকবে।"

কথাটা বলেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বাংলা সাহিত্যে মুসলিম অবদানকে উৎসাহিত করাই ছিল তাঁর এ প্রসঙ্গ অবতারণার উদ্দেশ্য। বলা বাহুল্য, এটা ছিল সেইসব দিনের কথা, বাংলা সাহিত্যের অঙ্গনে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের প্রবেশ ছিল যখন ভীরু-সংকুচিত পদক্ষেপে।

বাংলা সাহিত্য-অঙ্গনে মুসলমান কবি-সাহিত্যিকদের এই ভীরু সংশয়াচ্ছন্ন মনোভাব অবশ্য নজরুলের আবির্ভাবের পরই এক লহমায় ঘুচে গিয়েছিল। নজরুলের পূর্বে মুসলমানদের মধ্যে কেউ সার্থক সাহিত্য সৃষ্টি করেন নাই—একথা নিশ্চয়ই বলা উচিত হবে না, তবে সে ছিল অনেকটা "নিজ গৃহে পরবাসী" আচরণের মত। অর্থাৎ মুসলমান পরিচয় পরিহার করেই সেদিন মুসলমানদের বাংলা সাহিত্য অঙ্গনে প্রবেশ করতে হত, অন্তত ভাষার দিক দিয়ে। নজরুল ইসলামই এক্ষেত্রে প্রথম সার্থক ব্যতিক্রম। বাংলা সাহিত্য গগনে নজরুলের আবির্ভাব ধূমকেতুর মত। ধূমকেতুর মতই অকস্মাৎ আবির্ভাবের মাধ্যমে নজরুল বাংলা সাহিত্যে এক বিপ্লব সৃষ্টি করে বসলেন। বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুল মনসুর আহমদের ভাষায়, "নজরুলের আবির্ভাবের আগে পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মুসলিম লেখকেরা ছিল কোণঠাসা, অপাঙক্তেয়, দুর্বল, অসন্তুষ্ট, defensive minority ; নজরুলের আবির্ভাব একদিনে করে তুললো তাদের আত্মবিশ্বাসী, অভিজাত, aggressive majority। নজরুল ইসলাম একদিন বিনা নোটিশে 'আল্লাহু আকবর' তকবীরের হায়দারী হাঁক মেরে ঝড়ের বেগে বাংলা সাহিত্যের দুর্গ জয় করে বসলেন। মুসলিম বাংলার ভাঙা কিল্লায় নিশান উড়িয়ে দিলেন। একদিনে দূর করে দিলেন মুসলিম বাংলার ভাষা ও ভাবের হীনমন্যতা।"

এ বক্তব্যে কিছুটা অতিকথন থাকতে পারে, তবে নজরুলের সময় থেকে বাংলা-সাহিত্যে মুসলমানদের যে নবযুগ এসেছে এটা পরম সত্য। এটাও ঐতিহাসিক সত্য

www.pathagar.com

যে, নজরুলের সময় থেকেই মুসলিম-সাহিত্য-সাধনার একটা আত্মবিশ্বাসী সুর ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠেছে।

সাহিত্যে এই আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বাতন্ত্র্যকামিতার ধারা সম্পর্কে কিছু লোকের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি থাকলেও এ ছিল একটা ঐতিহাসিক বাস্তবতার দাবী। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবী স্বীকার করেও অনেকে সাহিত্য-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আত্মনিয়ন্ত্রণের কোন তাৎপর্য আছে কিনা সে প্রশ্ন তুলে থাকেন। ফররুখ আহমদ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এসব কথা বলতে হয় এজন্যে যে, ফররুখ মূলত স্বাতন্ত্র্যকামী সাহিত্য-সাধক এবং ফররুখের সাহিত্যে এ সত্য লুকোবার কোন প্রয়াস ছিল না। কথা উঠতে পারে, নজরুলের কবিতায় যদি বাংলার মুসলিম মানস প্রথম বাঙয়রূপ লাভ করে থাকে, তবে সেক্ষেত্রে এ অভিযোগ ওঠেনি কেন? অভিযোগ ওঠেনি একথা সত্য নয়। "শনিবারের চিঠি" থেকে শুরু করে সেকালের বহু পত্র-পত্রিকাই আমাদের বক্তব্যের প্রমাণ দেবে। তবে তার চাইতেও বড় কথা, নজরুল জীবনের এবং নজরুল কাব্য-সাধনার এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল—যা তাঁকে সবকিছুর ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে সাহায্য করেছিল। হিন্দু ও মুসলিম উভয় ঐতিহ্য মন্থন করে কাব্য সৃষ্টি ও সমান স্বাচ্ছন্দ্যের সাথে একাধারে ইসলামী গজল ও শ্যামা সঙ্গীত রচনার দুরূহ কৃতিত্ব বাংলা সাহিত্যে বিরল। এক্ষেত্রে নজরুলের সাফল্য এতটাই একক যে, স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এ প্রশ্নে তাঁর বহু পশ্চাতে পড়ে রয়েছেন। বঙ্কিম, মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের ন্যায় ফররুখও নজরুলের দুরূহ পথে পা বাড়ান নি। এতে অন্যেরা যদি সংকীর্ণতা দোষে দুষ্ট না হন, তবে ফররুখের নিশ্চয়ই সেটা বিশেষ অপরাধ নয়।

ফররুখকে বিচার করতে হলে ফররুখের কাল এবং তার বৈশিষ্ট্য অবশ্যই স্মরণ রাখতে হবে। নজরুল ছিলেন মোটামুটি বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের মধ্যবর্তী যুগের কবি। অসহযোগ, খিলাফত ও সন্ত্রাসবাদ এ তিন ধারায়ই তাঁর মন উচ্চকিত হয়েছে। "ওরে আয় ঐ ইসলাম ডুবে যায়"—বলে যিনি একবার মুসলিম সমাজকে ডাক দেন, আবার তিনিই অসহযোগের চরকার চাকার মধ্যে স্বাধীনতার আওয়াজ শুনতে পান ; আবার তিনিই 'মৃত্যুক্ষুধা'য় এসে রায় দেন, চরকায় সূতা কেটে স্বাধীনতা লাভ করা যায় না। ফররুখের প্রতিভার উন্মেষ ঘটেছিল বৃটিশবিরোধী সংগ্রামের মাঝেই, কিন্তু সে সংগ্রামের মধ্যে তখন বিক্ষিপ্ততা নেই, এ সংগ্রাম একটা চরম পর্যায়ে সুস্পষ্ট গতিপথ বেছে নিয়েছে। গোটা সমাজ সেদিন আত্মনিয়ন্ত্রণ আর আত্মপ্রতিষ্ঠার জীবন-মরণ সংগ্রামে লিপ্ত। বহু শতাব্দীর বিচিত্র অভিজ্ঞতার সংগ্রাম ও অভিযানমুখর মুসলিম মানস একটা আবাসভূমি পাবার স্বপ্নে সেদিন বিভোর। এই পটভূমিতেই সফরক্লান্ত সিন্দাবাদকে খাকের স্বপ্নে বিহ্বল দেখিয়েছেন ফররুখ।

www.pathagar.com

ফররুখের কৃতিত্ব এখানেই যে, আদর্শের স্বপ্নে আপোসহীন থাকলেও ফররুখ যে-কোন কালোত্তীর্ণ কবির ন্যায় তাঁর কবিতার শিল্প-সুষমাকে অক্ষুণ্ন রাখতে সক্ষম হয়েছেন। ভাব প্রকাশের উপযোগী পরিমণ্ডল সৃষ্টির প্রয়োজনে উপযুক্ত শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে তিনি অস্বাভাবিক সাফল্য অর্জন করেছেন। শব্দ চয়নের ক্ষেত্রে তিনি আরবী-ফারসী শব্দের যেমন যথার্থ ব্যবহার করেছেন, তেমনি প্রয়োজনে আরবী-ফারসী শব্দের পাশাপাশি উপযুক্ত তৎসম-তদ্ভব শব্দের ব্যবহারেও কখনও কার্পণ্য করেন নি। ফলে তাঁর কবিতা শৈল্পিক বিচারে হয়ে উঠেছে সুষমামণ্ডিত। ফররুখের আদর্শ-চেতনার একটা বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, সাধারণভাবে মুসলমানদের নবজাগরণের জন্যে তিনি অতীত থেকে প্রেরণা লাভ করলেও বাস্তবে কিন্তু তিনি অতীতমুখী নন। অতীতের পুনরুজ্জীবন নয়, উজ্জ্বলতর ভবিষ্যতের পানে অভিযাত্রার স্বার্থে অতীতের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলো থেকে শিক্ষা ও প্রেরণা গ্রহণই তাঁর কাম্য। আধুনিক বিশ্বের বিভিন্ন মতবাদের অপূর্ণতা ও ব্যর্থতাই যে তাঁকে মানবতার মুক্তির তাগিদে এ পথে ঠেলে দিচ্ছে তাও তাঁর কাব্যে সুস্পষ্ট।

২. চরিত্র-স্বরূপ

ফররুখ আহমদ কে ছিলেন? কী অভিধায় তাঁকে অভিহিত করা যাবে? তিনি অবশ্যই অসাধারণ প্রতিভাধর ছিলেন। প্রতিভাবান মাত্রেরই সমাজে মূল্যবান অবদান থাকে। অধিকাংশ প্রতিভাধরই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হন। কিন্তু প্রতিভার সঙ্গে আদর্শবাদিতার সংযোগ না ঘটলে সে ব্যক্তিত্ব মহিমান্বিত হয় না। ইতিহাসের বহু বিখ্যাত ব্যক্তিই কেউ বিত্তশালী হিসাবে, কেউ রাজনীতিক হিসাবে, কেউ বিজ্ঞানী বা মনীষী হিসাবে, কেউ সাহিত্যিক হিসাবে, কেউ শিল্পী হিসাবে নিজ নিজ ক্ষেত্রে বিপুল অবদান রেখেও মহিমান্বিত ব্যক্তিত্বের দাবীদার হতে পারেন নি। এদেশেও এ ধরনের কম প্রতিভার আবির্ভাব ঘটে নি। কিন্তু ফররুখ ছিলেন ব্যতিক্রম। ফররুখ ছিলেন আদর্শবাদী এবং নির্ভেজাল আদর্শবাদী। আদর্শবাদী বলেই তিনি ছিলেন সাধক, ছিলেন আপোসহীন সংগ্রামী, ছিলেন অবিচার ও অপপ্রচারের শিকার হবার বেলায় অকুতোভয়।

ফররুখ আহমদের সবচাইতে বড় পরিচয় তাঁর আপোসহীন আদর্শবাদিতা, তাঁর নিরাপোস সংগ্রামশীলতা। ইসলামের দৃষ্টিতে সার্থক সংগ্রামী জীবন, মর্দে-মুমিনের জীবন গড়ে তুলতে বড় প্রয়োজন সংগ্রামের পাশাপাশি সাধনা--আল্লাহর সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলবার সাধনা। এখানেই ইসলামে আধ্যাত্মিক সাধনার গুরুত্ব। ফররুখ আহমদ এ ব্যাপারে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। তিনি যৌবনে একদা মার্কসবাদের প্রভাবে পতিত হয়েছিলেন, কিন্তু ফুরফুরার বিখ্যাত সাধক-সংস্কারক হযরত আবু বকর সিদ্দিকীর (রহ) বিশিষ্ট খলীফা প্রফেসর আবদুল খালেক সাহেবের সান্নিধ্যে এসে তাঁর চিন্তা-

www.pathagar.com

জগতে এক অভূতপূর্ব বিপ্লব সৃষ্টি হয়। এরপর আমৃত্যু তিনি আধ্যাত্মিক জীবনের প্রতি বরাবর গভীরভাবে অনুরক্ত ছিলেন। তাঁর 'সিরাজাম মুনীরা' গ্রন্থে রসূলে করীম (সা) এবং চার খলীফা ছাড়াও আর যাঁদের উপর তাঁর কবিতা লক্ষ্য করা যায় তাদের মধ্যে রয়েছেন গাওসুল আজম, সুলতানুল হিন্দ, খাজা নকশবন্দ ও মুজাদ্দিদ আলফেসানী। 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থটি কবি উৎসর্গ করেছেন পূর্বকথিত আধ্যাত্মিক সাধককে— (কবির ভাষায়) "পরম শ্রদ্ধাভাজন আলহাজ্জ মৌলানা আবদুল খালেক সাহেবের দস্ত মুবারকে—"।

একজন প্রকৃত মর্দে মুমিনের মতই তিনি বাইরের বিশ্বের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হবার প্রাক্কালে এখানে নিজের সাথে বোঝাপড়া সেরে নিচ্ছেন ঃ

আজ সংগ্রাম নিজেকে চেনার,
মানবতা নিয়ে বেচা ও কেনার
হাটের ভীড়ে,
সময় এসেছে সকল দেনার
সকল হিসাব মেটাতে ফিরে।
ঋণ শুধবার দিন—
আজ সংগ্রাম নিজের সংগে
নিজেকে চেনার দিন।

[আজ সংগ্রাম ঃ সিরাজাম মুনীরা]

'অহম'-এর সঙ্গে এই অভিনব সংগ্রামের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করতে গিয়েই যেন কবি ঘোষণা করছেন--

আজ সংগ্রাম নিজের সংগে।....
নিজেকে আজ
জয় করে নিতে চালাও সাহসী কুচকাওয়াজ। [ঐ]

কারণ কবির মতে ঃ

ওঁত পেতে আছে ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে হিংসার ছুরি ক্ষুদ্রতার,
পর্বত বাধা সম্মুখে আনে দাম্ভিকতার দৃঢ় পাহাড়
লুব্ধ বাসনা জঘন্যতম ক্ষুদ্র কাম,
নির্লজ্জের লেলিহ রসনা, হীন আরাম,
আস্তাকুঁড়ের নোংরা কীটের পংকিলতা,
হিংস্র পশুর হিংসা নিপুণ-পাশবিকতা। [ঐ]

এখানে উল্লেখযোগ্য যে, আধ্যাত্মিকতার নামে ঘুম-পাড়ানিয়া গান কবির কাম্য ছিল না। প্রকৃত মর্দে মুমিনের জেহাদী জিন্দেগীর জন্য যে আধ্যাত্মিক সাধনা অপরিহার্য, কবি

www.pathagar.com

তারই প্রয়োজন অনুভব করেছেন মর্মে মর্মে। তাঁর সাথে ব্যক্তিগত আলোচনার সূত্রে বলতে পারি, আজকের দিনের বহুতর ইসলামী আন্দোলনে এর অভাবে তিনি গভীর মর্মপীড়া অনুভব করতেন। কবির আধ্যাত্মিক সাধনার এই বিষয়টা কবি সযত্নে গোপন রাখতেন, আর এটা পুশিদা রাখবার ব্যাপারও বটে। কবি তাঁর সালাতের ব্যাপারেও মানুষকে সহজে জানতে দিতেন না। মসজিদে সবার অগোচরে কোন ফাঁকে এক কোণে তিনি ঢুকে পড়তেন এবং ফরয-সুন্নত শেষ হবার পরও বহুক্ষণ ধরে নফল আদায় করতেন।

সালাতের মধ্যে সর্বশক্তিমানের সামনে দাঁড়ানো যে ফররুখকে দেখা যেত আত্মসমর্পিত, প্রায় অস্তিত্বহীন একটি সত্তারূপে, সামাজিক অংগনে তাঁকেই সকলে দেখত শির-উঁচু এক নিরাপোস সংগ্রামীর ভূমিকায়। বস্তুত এটাই ছিল স্বাভাবিক। তাঁর সমগ্র সত্তা তিনি বিশ্বপালকের উদ্দেশ্যে নিবেদিত করতে পেরেছিলেন বলেই সমাজ জীবনে তিনি হতে পেরেছিলেন অকুতোভয়। আপোসহীন সংগ্রামীর মতই তিনি সমাজজীবনের ক্লেদ, গ্লানি, ক্ষুদ্রতা, মূঢ়তা সবকিছুর বিরুদ্ধে করতে পেরেছিলেন জেহাদ ঘোষণা।

ফররুখের কবিতার এক বিরাট অংশেই সমাজের অনাচার, অত্যাচার-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের বাণী ধ্বনিতে হয়েছিল। এ প্রসঙ্গে তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'লাশ'-এর কথা অবশ্যই আমাদের স্মরণে জাগে। কিন্তু এতে তো ছিল একটি সভ্যতার বিরুদ্ধে এবং প্রচলিত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কথা। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর এদেশের সরকার ও বিভিন্ন নেতার বিচ্যুতির যে চেহারা তাঁর চোখের সামনে ধরা পড়েছিল, তার জন্য দরকার পড়েছিল তাৎক্ষণিক উপলব্ধিযোগ্য একটু ভিন্ন স্বাদের সহজবোধ্য কবিতা, যা বোধগম্য কারণেই তাঁর নিজের নামে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না। এই সুবাদেই শুরু হয়েছিল বিভাগ-পরবর্তী আমলের তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার নতুনতর পালা।

আগেই বলেছি, সমাজের ক্লেদ, গ্লানি, কপটতা ও বিচ্যুতির বিরুদ্ধে কষাঘাত হানাই ছিল ফররুখের ব্যঙ্গ কবিতার উদ্দেশ্য। এসবের বিরুদ্ধে উচ্চতর পর্যায়ে সংগ্রাম ছিল তাঁর সাহিত্যসাধনার অন্যতম প্রধান দিক। এ কাজ হয়ত কমবেশী আরও অনেকে করেছেন, তবে ফররুখের সাথে তাঁদের পার্থক্য ছিল—ফররুখ কবিতায় ও জীবনে ছিলেন সমভাবে বিদ্রোহী। কী বৃটিশ আমলে, কী পাকিস্তান আমলে, কী বাংলাদেশ আমলে তিনি তাঁর মাথা উঁচু রেখেই চিরকাল পথ চলেছেন। যে পাকিস্তান আন্দোলনে তাঁর যৌবনের সবটুকু স্বপ্ন উজাড় করে তিনি অংশগ্রহণ করেছিলেন, যার স্বপ্ন বুকে নিয়ে ১৯৪৫ সালে তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থের নামই দিয়েছিলেন "আজাদ করো পাকিস্তান", সেই পাকিস্তানের তেইশটি বছর তাঁকে অংশ নিতে হল. তদানীন্তন কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের বিরুদ্ধে নতুনতর সংগ্রামে, আর বাংলাদেশ আমলে তো সুপরিকল্পিত

www.pathagar.com

চক্রান্তের শিকার হয়ে তিনি তিলে তিলে নির্মম মৃত্যুর পথেই এগিয়ে গেলেন। লক্ষ্য করবার ব্যাপার, এত সবের পরও তাঁর আপোসহীনতা-সৃষ্ট দারিদ্র্যের কারণে তিনি কখনও এতটুকু দুঃখিত হন নি, মুষড়ে পড়েন নি, আত্মসমর্পণের পথ বেছে নেন নি—যা নিয়েছেন পাকিস্তান ও বাংলাদেশ আমলে অনেকে।

এরপরও ফররুখ আহমদ সম্পর্কে কিন্তু বিভ্রান্তির অন্ত ছিল না, অন্ত ছিল না বিতর্কের। বরঞ্চ সত্য বলতে কি ফররুখ যেন মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একজন বিতর্কিত ব্যক্তিই রয়ে যান। ফররুখের বিরুদ্ধবাদীরা তাঁর সম্পর্কে যে শব্দগুলো ব্যবহার করেছেন, সেগুলো হল—উগ্রপন্থী, গোঁড়া, একগুঁয়ে, ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক, প্রতিক্রিয়াশীল ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, তথাকথিত ইসলাম-দরদী ও ইসলাম-বিরোধী নির্বিশেষে কায়েমী স্বার্থবাদী পুঁজিবাদী গোষ্ঠীর অনেকেই ফররুখকে প্রথম তিনটি বিশেষণে আখ্যায়িত করতে ছিলেন আগ্রহী। তাঁদের দৃষ্টিতে ফররুখের অপরাধ—ফররুখ কায়েমী স্বার্থ শাসিত প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থার উৎখাত কামনা করতেন। ইসলাম-বিরোধী মহলের অভিমত, ইসলামপন্থী বিধায় ফররুখ ছিলেন ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল। কারণ তাদের মতে—ইসলামে বিশ্বাসী হলে আর কোন ব্যক্তি প্রগতিশীল হতে পারে না।

প্রথমোক্তদের বক্তব্যের আমরা বিশেষ মূল্য দিতে চাই না। কারণ ফররুখ আহমদ ছিলেন ইসলামের বিপ্লবী আদর্শে বিশ্বাসী। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেও তিনি যে বিপ্লবে বিশ্বাসী হিসাবে ডাক দিয়েছিলেন ঃ

"এ ঝড়ের মুখে মরণ-নিদালী কুয়াশা চাদর টানি কি লাভ?
আয় ইনকিলাব!
আয় ইনকিলাব!

[ইনকিলাব ঃ কাফেলা]

তাতে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন জীবনের শেষদিন পর্যন্ত। এবং তাঁর জীবন দিয়ে তা প্রমাণও করে গেছেন। সুতরাং তাতে কায়েমী স্বার্থান্বেষীরা ভয় পাবে, তাঁকে মন্দ বলবে, তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই। কিন্তু ফররুখ বিশ্বাস করতেন ইসলামের আদর্শ নিতে হবে কায়েমী স্বার্থবাদীদের কাছ থেকে নয়, সিরাজাম মুনীরা হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (স) থেকে, যিনি ছিলেন আদপেই দুনিয়ার সেরা বিপ্লবী, দুনিয়ার সেরা ইনকিলাবের মহানায়ক।

তবে যারা ইসলামপন্থী ছিলেন বলেই ফররুখকে ধর্মান্ধ, সাম্প্রদায়িক ও প্রতিক্রিয়াশীল বলতে চান, তারা অবশ্যই করুণার পাত্র। নেশাগ্রস্তের মত প্রগতি, সমাজতন্ত্র প্রভৃতি বুলি উচ্চারণে অভ্যস্ত অনেকে, যাঁরা পাকিস্তান ও বাংলাদেশ উভয় যুগে চরম বিলাসিতা, আত্মকেন্দ্রিকতা ও সুবিধাবাদের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন, তাঁদের

www.pathagar.com

মুখে ফররুখ আহমদের নিন্দা শোভা পায় না। পশ্চিমা পুঁজিবাদ আর ধর্মহীন সমাজবাদের বাইরে দুনিয়ার আর কোন আদর্শ নেই, এই ধরনের কূপমণ্ডুকতায় যাঁরা ভোগেন, তাঁদের চোখের ঠুলি ভেঙে গেলে তাঁরাও দেখতে পাবেন, অনাগত যুগ তৃতীয় একটি আদর্শের যুগ, যার অগ্রযাত্রা ইতিমধ্যেই দুই পরাশক্তির কলিজায় কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছে। ফররুখ সেই তৃতীয় আদর্শের অভ্যুত্থানে বিশ্বাসী ছিলেন।

৩. ফররুখ-কাব্যে বাংলার নিসর্গ

ফররুখ আহমদকে মূলত ইসলামী রেনেসাঁর কবি মনে করা হয়। এ কথা সত্য যে, তাঁর কবিতায় মুসলিম নবজাগরণের সুর অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তিনি ইসলামের জীবনাদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং তাঁর অসংখ্য কবিতা ইসলামের জাগরণবাদের বাণীতে মুখর। উনিশ শতকের শেষ ও বিশ শতকের প্রথম দিকে সারা পৃথিবীর মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে জাগরণের এক নতুন প্রাণবন্যা দেখা দেয়, যার জোয়ারে অবগাহন করে এই উপমহাদেশে ইকবাল ও নজরুল তাঁদের অসংখ্য কবিতায়—'দিকে দিকে পুনঃ দীন ইসলামী লাল মশাল' জ্বলে উঠবার স্বপ্ন দেখেছেন। ফররুখের কবি-মানস সেই একই প্রাণবন্যা থেকে তাঁর সঞ্জীবনী সুধার সন্ধান পেয়েছে। আর নজরুল যেমন বিশেষ জীবনাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং বিশ্বের তাবৎ অন্যায়-অবিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে 'বিদ্রোহী কবি' আখ্যা লাভ করেও কাব্যের অন্যান্য বহুতর ক্ষেত্রেই বিচরণ করেছেন, ফররুখও তেমনি ইসলামী রেনেসাঁর কবি বলে সুপরিচিত হলেও অন্যান্য বহুতর ক্ষেত্রেই সমান সাফল্যের সঙ্গে পদচারণা করেছেন। বিদ্রোহী কবি নজরুল প্রেম, সৌন্দর্য, নিসর্গ—সব বিষয়েই এত অধিক কবিতা লিখেছেন যে, অনেকে নজরুলকে 'বিদ্রোহী কবি' বলার চাইতেও 'প্রেমের কবি' বলাই অধিক যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

ফররুখের কবিতার একটি বিপুলতর অংশে ইসলামী নবজাগরণের বাণী প্রতিফলিত হলেও মানবতা, প্রেম ও নিসর্গও তাঁর কবিতায় মোটেই অনুপস্থিত নয়। ফররুখের রচনায় মরু-দুলাল হযরত মুহম্মদ (স) ও তাঁর উত্তরসাধকদের কীর্তিগাথা বিশিষ্ট স্থান লাভ করায় পরিমণ্ডল সৃষ্টির তাগিদে মুসলিম সমাজে প্রচলিত আরবী-ফারসী শব্দের শিল্পসম্মত ব্যবহারের প্রয়োজন যেমন দেখা দিয়েছে, তেমনি আরব-আজমের প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন হয়ে উঠেছে অপরিহার্য। এসব সত্ত্বেও কবি যে এই বাংলারই সন্তান তা তিনি মুহূর্তের তরেও বিস্মৃত হন নি।

আসলে কোন কবির জীবন-দর্শন যাই হোক, কবি তার রূপায়ণ অবশ্যই প্রথমত দেখতে চান স্বদেশের মাটিতে ; তার জন্মভূমির প্রভাব থেকে তাঁর স্বপ্ন কখনোই বিমুক্ত বা বিযুক্ত হতে পারে না। বাংলাদেশের মাটিতে দাঁড়িয়েই নজরুল একদা গেয়েছিলেন ঃ

www.pathagar.com

দূর আরবের স্বপন দেখি বাংলাদেশের কুটির হতে।

আর ফররুখও সেই একই ভূমিতে দাঁড়িয়ে কামনা করেছেন ঃ

আউষ ধানের দেশে মদিনার রক্তগোলাব
সকল আশার পূর্ণতা নিয়ে মেল বে কলাপ।

[নিশান ঃ সাতসাগরের মাঝি]

বস্তুত এটাই স্বাভাবিক। আর এজন্যেই মূলত ইসলামী রেনেসাঁর কবি ফররুখের কবিতায়ও আমরা দেখি বাংলার প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য মাঝে-মাঝেই অপরূপ মনোহারিত্ব নিয়ে ধরা দিয়েছে। ফররুখের একাধিক কবিতায় ও কাব্যগ্রন্থে এ সত্যের স্বাক্ষর পরিস্ফুট। কবির সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি" থেকেই আলোচনা শুরু করা যাক। এ কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতাই মুসলিম ইতিহাসের বিশাল পটভূমিতে রচিত এবং প্রায় প্রতিটি কবিতাই এখানে নবজাগরণের জোয়ারে উত্তাল। কোন বিশেষ দেশ নয়, গোটা মুসলিম বিশ্ব, বিশেষত তার গৌরবময় সভ্যতার প্রতিটি কেন্দ্রভূমিই কবি-চিত্তকে আন্দোলিত করেছে। অভিযাত্রী মুসলিম জাতির প্রতীক সিন্দাবাদ তার সভ্যতা-সাগরের সব বন্দরেই প্রচুর বেসাতি করেছে। মুসলমানের হারানো গৌরব ফিরে পাওয়ার আশায় কবি একান্ত হৃদয়ে কামনা করেন ইসলামের অবনমিত নিশান আবার আকাশে মাথা তুলে দাঁড়াক কিন্তু এ কামনায় অনেকটা যেন অলক্ষিতেই স্বদেশের নিসর্গ কবির চিত্তলোক দখল করে বসেছে ঃ

আউষ ধানের দেশে মদিনার সৌরভ ভার
ঝড় বৈশাখে জাগো নির্ভীক, জাগো নিশংক হেলাল আবার।
হও প্রতিষ্ঠ আকাশে আকাশে নিশান আমার, নিশান আমার।

[নিশান]

একই গ্রন্থের অমর কবিতা 'ডাহুক' যে পরিবেশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, তা একান্তভাবেই বাংলাদেশের, একান্তভাবেই পল্লীবাংলার ঃ

বেতস লতার তীরে থেকে থেকে বাজে আজ বাতাসের বীণা ;
ক্রমে তাও থেমে যায়,
প্রাচীন অরণ্যতীরে চাঁদ নেমে যায় ;
গাঢ়তর হল অন্ধকার।

এ দৃশ্য বাংলার গণমানুষের এত পরিচিত যে, একে ফররুখের পাঠকদের নতুন করে চেনাতে হয় না, যেমন চেনাতে হয় না বাংলার বেতস-কুঞ্জের এই অপূর্ব সৃষ্টি ডাহুককে ঃ

www.pathagar.com

হয়তো তোমাকে চিনি, চিনি ঐ চিত্রিত তনুকা,
বিচিত্র তুলিতে আঁকা
বর্ণ সুকুমার।

[ডাহুক ঃ সাত সাগরের মাঝি]

কবির অন্যতম কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা' মূলতই মহানবী হযরত মুহম্মদ মুস্তফা (স) ও তাঁর উত্তরসাধকদের জয়গানে মুখর। বিপর্যস্ত মুসলিম জাতি এবং মানবতাহীন সভ্যতার যাঁতাকলে পিষ্ট বিশ্বসমাজের জন্যে এক নবযুগ উন্মেষের স্বপ্নে বিভোর। কবি এখানে স্মরণ করেছেন মানবতার শ্রেষ্ঠ মুক্তিদাতা নবী মুহম্মদের (স) আদর্শকে। কিন্তু এখানেও তাঁর কবি-মানসে বাংলার নিসর্গ ছায়াপাত করেছে স্বচ্ছন্দ গতিতে। মানবতার বিপর্যস্ত চিত্র দেখতে দেখতে কবি-মন ক্লান্ত। কবির মনে যে স্বপ্ন জাগে তা যেন চৈত্রশেষে ঝড়েরই সংকেত ঃ

তবু পরিশ্রান্ত ম্লান স্নায়ুর বিবশ সঞ্চরণে
আতপ্ত গতির স্বপ্ন জমা হয় মনে,
বুঝি চৈত্র অবসন্ন আকাশে আকাশে ফেরে ঝড়ের সংকেত
বুঝি দুঃস্বপ্নের মতো ভিড় করে আসে কোটি প্রেত,
অমনি
মনের দিগন্তে মোর চমকায় সহস্র অশনি।"

[মন ঃ সিরাজাম মুনীরা]

কবির প্রকাশিত একমাত্র সনেট-গ্রন্থ 'মুহূর্তের কবিতা'য় আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে প্রমাণ মিলবে অজস্র ঃ

বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ এ রাতেও উঠেছে তেমনি,
যেমন সে উঠেছিল হাজার বছর আগেকার
বৃষ্টি-ধোওয়া আসমানে। সে রাত্রির অস্ফুট ব্যথার
মৃদু স্বর আছে এ আকাশে। সেই ক্ষীণ কণ্ঠধ্বনি
আমার মনের তারে বেজে ওঠে আপনা আপনি,
শ্রাবণ মেঘের মাঝে ডুবে যায় চাঁদ যতবার ;
যতবার ভেসে ওঠে। দূরে এক অস্পষ্ট মাজার
শতাব্দীর স্মৃতি নিয়ে জাগায় ব্যথার আবেষ্টনী।

[বর্ষার বিষণ্ন চাঁদ ঃ মুহূর্তের কবিতা]

অথবা—

মাঠের সীমান্ত ঘেঁষে যেখানে প্রাচীন ঝাউ গাছ
(নির্জন পথের ফৌজ) বাতাসের শোনে দীর্ঘশ্বাস,

www.pathagar.com

যেখানে সমস্ত দিন নদীতীরে খঞ্জনের নাচ,
যেখানে মাটির কান্না সারাক্ষণ কাঁদায় আকাশ।

[ময়নামতির মাঠে।। ১ ঃ মুহূর্তের কবিতা]

ফররুখের বিপ্লবী কবি-চিত্তে বাংলার ঝড়, বাংলার কালবৈশাখী যে সাড়া জাগায় তা সত্যিই অপূর্ব। ঝড়ের উপর লিখিত কবির সার্থক কবিতা ও সঙ্গীতের সংখ্যা প্রচুর। বাংলার ঝড়কে কবি দেখেন বন্দী মানবতার মুক্তির বার্তাবাহী রূপে ঃ

হাজার হাজার 'দেও' স্বাদ পেয়ে প্রমত্ত মুক্তির
বঙ্গোপসাগর ছেড়ে চলেছে সুদূর পরীস্তানে
আশা-নৈরাশ্যের দ্বন্দ্ব বিচ্ছুরিত বজ্রে ও তুফানে
মুহূর্তে ঘোষণা করে মুক্তি-বার্তা সহস্র বন্দীর।
উড়ে যায় ঝরাপাতা ; বালুবক্ষ মেঘনার তীর
বুক পেতে নেয় সেই মৃত্যু-সুকঠিন নির্মমতা,
নিমেষে নিঃশেষ হয় শীত-বসন্তের নির্জনতা।

[ঝড় ঃ মুহূর্তের কবিতা]

অবশ্য বাংলার ঝড়কে ফররুখ দেখেছেন তাঁর নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকেই এবং তা অন্যান্য কোন কোন কবি, বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথ থেকে যে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র তা ব্যাখ্যার অপেক্ষা রাখে না। রবীন্দ্রনাথ কালবৈশাখীর মধ্যে আবিষ্কার করেছেন তপঃক্লিষ্ট, জটাধারী সন্ন্যাসীর মূর্তি।

হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ,
ধূলায় ধূসর রুক্ষ উড্ডীন পিঙ্গল জটাজাল,
তপঃক্লিষ্ট তপ্ত তনু, মুখে তুলি বিষাণ ভয়াল
কারে দাও ডাক—
হে ভৈরব, হে রুদ্র বৈশাখ?

[বৈশাখ ঃ কল্পনা]

ফররুখের চোখে বৈশাখ তপঃক্লিষ্ট সন্ন্যাসী নয়, উদ্দাম জীবনবাদী, জীবন-সংগ্রামের নির্ভীক সেনানী, 'কারুনের সঞ্চিত মৌচাক',—'ধ্বংসের নকীব', 'মর্দে মুজাহিদ'। কণ্ঠে তার 'অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রলয়ের আহবান ঃ

ধ্বংসের নকীব তুমি হে দুর্বার, দুর্ধর্ষ বৈশাখ
সময়ের বালুচরে তোমার কঠোর কণ্ঠে
শুনি আজ অকুণ্ঠিত প্রলয়ের ডাক।
চৈত্রের বিশীর্ণ পাতা রেখে গেছে শেষ চিহ্ন সালতামামীর,
ফাল্গুনের ফুলদল (কো'কাফের পরী যেন) আজ শুধু কাহিনী স্মৃতির

www.pathagar.com

খররৌদ্রে অবসন্ন রাহী মুসাফির যত পথপ্রান্ত নিঃসাড় নিশ্চল,
আতশের শিখা হানে সূর্যরশ্মি লেলিহান ঝিমায় মুমূর্ষু পৃথ্বিতল,
রোজ হাশরের দগ্ধ তপ্ত তাম্র মাঠ, বন, মৃত্যুমুখী নিস্তব্ধ নির্বাক,
সুরে ইস্রাফিল-কণ্ঠে পদ্মা-মেঘনার তীরে এস তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ।

[বৈশাখ ঃ "কাফেলা"]

ঝড়-তুফানের দেশ বাংলার বিপ্লবী কবি ফররুখ যেমন বৈশাখের বিপ্লবী সত্তাকে হৃদয় নিংড়িয়ে স্বাগত জানান, তেমনি তিনি মুগ্ধ হন পদ্মার প্রমত্তা বিপ্লবী রূপ দেখে ঃ

হে পদ্মা, প্রমত্তা নদী, এইভাবে কত যুগান্তর
চলেছ বর্ষায় তুমি বন্যাবেগে প্রান্তর ভাসায়ে
সে কথা জানে না কেউ তার রাখে না খবর।

[পদ্মা ঃ কাফেলা]

বাংলার বিপ্লবী সত্তার বহিঃপ্রকাশ যেমন তিনি অবলোকন করেন কালবৈশাখীর ধ্বংসতাণ্ডবের মধ্যে, তেমনি পদ্মার উদ্দাম স্রোতধারায় খুঁজে পান জীবন-সংগ্রামের গতিচ্ছন্দ ঃ

অচল স্থাণুর বুকে গতিমান জীবনের গান
রিক্ত প্রাণ পৃথিবীতে দেয় যেন পুষ্পের সম্ভার ;
আবদ্ধ জিন্দানে দিয়ে প্রাণোচ্ছল গতির আহ্বান।

[পদ্মা ঃ কাফেলা]

কিন্তু বিপ্লবী সত্তার প্রতীক পদ্মাই একমাত্র নদী নয়, যা ফররুখচিত্তকে আকৃষ্ট করে। নদী-মাতৃক বাংলার অন্যান্য বহু নদীও ফররুখের কবিচিত্তে দোলা জাগায়। এমনি একটি নদী মধুমতী। এখানে নদীমাতৃক বাংলা কবির নিকট আরেক রূপে ধরা দেয় ঃ

আকাশের মাঠ ঘিরে ঘিরে ঘন সূর্যাস্তের নলবন
তারি মাঝে ডুব দিয়ে পাখী চাঁদ দেখে আলোর স্বপন
দিনের কুশ্রীতা ঝেড়ে ফেলে ওড়ে কোন শুভ্র রাজহাঁস
জ্যোছনা ভেজানো তনু তার নীচে ফেলে মাঠ, মরা ঘাস
উড়ে চলে আকাশের ধারে অন্তহীন নীলের কিনারে।

[মধুমতীর তীরে ঃ হে বন্য স্বপ্নেরা]

মধুমতীর পরিপার্শ্ব-চিত্রে নিসর্গের যে রূপ বিধৃত হয়েছে, তা বাংলার গণমানুষের অতি-পরিচিত ঃ

জনতার কোলাহল নাই, প্রশান্তির স্বপ্ন মধুমতী
দুই পাশে ধানক্ষেত রেখে অবিশ্রান্ত চলে সেই নদী
সূর্যাস্তের তোরণে যেখানে জ্বলে সন্ধ্যাতারকার টীপ

www.pathagar.com

রাত্রির দুর্গম পথে পথে মহাকাশ জ্বালালো প্রদীপ
কর্কশ দিনের দাঁড়কাক যেথা এসে হল স্তব্ধ বাঁক।

[মধুমতীর তীরে ঃ হে বন্য স্বপ্নেরা]

বাংলার নদী-নদীর আরেক রূপ কবি প্রত্যক্ষ করেন তাঁর 'আরিচাপারঘাট' কবিতায় ঃ

বাধাবন্ধহীন নদী,--গতিবেগ উন্মুক্ত, অবাধ
মুক্ত জীবনের কিংবা আজাদীর যেন সে প্রতীক—

নদীর স্রোতধারায় কবি-জীবনের পরম রহস্যের সন্ধান খুঁজে পেয়েছেন। তাই তো নদীস্রোতের তীর-তীব্র গতিতে তিনি শুনতে পান জীবনের গান ঃ

তীর-তীব্র বেগে চলে নিয়ে তার বাঁধমুক্ত সুর,
পেয়ে যায় মুক্ত কণ্ঠে পরিপূর্ণ জীবনের গান
(সম্মুখে চলার পথে নাই তার ব্যর্থতা অশ্রুর),
খিজিরের কাছে পেয়ে মঞ্জিলের, পথের সন্ধান
জীবন্ত প্রবাহ চলে অসংশয়--ভারমুক্ত প্রাণ।

[আরিচা-পারঘাট ঃ কাফেলা]

বাংলার নদী ফররুখের কবি-চেতনায় যে কতটা স্থান দখল করে রেখেছিল, তার প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর অজস্র কবিতায় ঃ

যে সুর সমস্ত রাত্রি বেজে যাবে বাতাসের ছড়ে
দীঘল নদীর মত সারারাত্রি বাজিবে সে সুর,
দৃঢ় তটরেখা পারে জীবনের আগ্নেয় অংকুর
ছড়ায়ে পাবে যে মুক্তি অগ্নিশিখা রাত্রির প্রহরে
তমিস্রা-পাথর পটে কক্ষচ্যুত অজানা-বন্দরে
সেই নদী, সেই তারা লুপ্ত মোর মননের মত নিঃশব্দে
বহিয়া চলে আয়োজন করি অবিরত
দিন ও নদীর শেষে অবচেতনায়, ঘুমঘোরে।

[সুর ঃ হে বন্য স্বপ্নেরা]

অথবা—

ডায়ালের বাঁকা পথে ছুটে চলে এ ঘড়ির কাঁটা
দিনরাত্রি অবিশ্রান্ত সময়ের মসৃণ উপলে
আঁধারে হরফে তার আকাঙ্ক্ষার রেডিয়াম জ্বলে,
জানে না সে পাবে খুঁজে জীবনের কোন পারঘাটা!

www.pathagar.com

কত নদী মিশে গেছে, মুছে গেছে কত পায়ে হাঁটা
পথ ও প্রান্তরে ;—জানে না সে। জানে না, তবুও চলে।

[হাত-ঘড়ি ঃ মুহূর্তের কবিতা]

শুধু বাংলার আবহওয়া, ঋতুবৈচিত্র্য ও নদ-নদীই নয়, বাংলার পাখ-পাখালিও ফররুখের কবি-চিত্তে অসামান্য প্রভাব বিস্তার করেছে। কবির সর্বপ্রথম প্রকাশিত শিশু-কিশোর-কাব্যগ্রন্থ "পাখীর বাসা" এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। শিশু-কিশোর কাব্যের কথায় আমরা পরে আসছি। 'ডাহুক' ফররুখের একটি জনপ্রিয় কবিতা। কিন্তু শুধু কি বিচিত্রতনু ডাহুকই ? ডাহুকের সঙ্গে সঙ্গে বাংলার খঞ্জন, দোয়েল প্রভৃতি বহু সুপরিচিত পাখীও তাঁর কবিতায় বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে ঃ

খঞ্জন নেচে ফেরে। নির্মম রুদ্র
সূর্য প্লাবন নামে, আলোর সমুদ্র
চঞ্চল হয়ে ওঠে। যে আঘাত অন্ধ
নির্মল নীরে তবু পায় পথ-ছন্দ।

[খঞ্জন ঃ ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

অথবা—

সাদা কালো রঙে আবদ্ধ তনুকা সুকোমল
সেই পাখি! কণ্ঠে তার বয়ে নিয়ে আসে কোন গীতি শতদল
গোধূলি-ভরানো সুর মুমূর্ষু সূর্যের রক্তরাগে,
কণ্ঠের নির্ঝর খুলি 'শেষবার রাঙায়ে সে গের চলি' বিদায়ী পরাণে
সুকোমল সুরে।

[দোয়েলের শিস ঃ হে বন্য স্বপ্নেরা]

বাংলার নিসর্গ-জীবনের দু'টি বিশিষ্ট উপাদান বৈশাখ ও পদ্মা ফররুখের কবি-মানসকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছে, একথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। কারণ এর সাথে ছিল ফররুখের বিপ্লবী সত্তার নিবিড় সংযোগ। তবে ফররুখের চোখে বাংলার অন্যান্য ঋতুও একবারে অনাদৃত নয়। এর প্রমাণ মেলে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। একথা সত্য যে, বৈশাখ-সংযুক্ত গ্রীষ্ম ঋতু তাঁর মনকে বিশেষভাবে উচ্চকিত করেছে ঃ

দোলা দাও, দোলা দাও, হে পৃথিবী, সমুদ্র, আকাশ
বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ রাত্রে পথ চিনে প্রেম এল বুকে,
জীবন-মৃত্যুর ঝড় জাগে আজ আমার সম্মুখে
বৈশাখ পাংশুল শাখে চমকায় বিদুৎ-বিভাষ।—

[প্রেম ও সত্তা ঃ ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

www.pathagar.com

বৈশাখের প্রতি কবির এ দুর্বলতা কবিকে তাই বলে আষাঢ়-শ্রাবণের বর্ষা ঋতুর প্রতি বিমুখ করে তোলে নি। প্রকৃত প্রস্তাবে বৈশাখী মেঘের গর্জন থেকেই তো আষাঢ়-শ্রাবণের জন্ম হবে, যেখানে থাকবে বর্ষণের আশ্বাস ঃ

মেঘবক্ষে সঞ্চারিত গুরুগুরু শাওনের ত্রাস
দিগন্ত ছাড়ায়ে অন্য দিকচক্রে খুঁজিছে বন্ধুকে
কখনো বেদনা-রিক্ত কখনো বা পরিপূর্ণ সুখে
ঝড়ের প্রণয় তালে শুনিতেছে বর্ষণ আশ্বাস।

[প্রেম ও সত্তা ঃ ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

কবির 'পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাট' প্রভৃতি বিখ্যাত কবিতা তো প্রকৃতপক্ষে দু'কুল প্লাবী বর্ষার প্রমত্তা নদীরই জয়গানে মুখর। কিন্তু শুধু ভরা বর্ষার ভরা নদীই নয়, বর্ষণমুখর রাতের বর্ণনায়ও কবি কম আবেগ-মুখর নন ঃ

অঝোর ধারায় বৃষ্টি—কাল রাত্রে বৃষ্টি নেমেছিল,
মৃত্যুর পাহাড় থেকে কাল রাত্রে এসেছিল মেঘ,
যেখানে জামের মূর্তি বিদায়ের পথ খুঁজে নিল
সে কোহে-নেদায় কাল জেগেছিল দুর্জয় আবেগ।

[অঝোর ধারায় বৃষ্টি ঃ ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

বর্ষার শেষে শরৎ। কবির প্রেমিক সত্তা তার প্রেমিকার পরিচয় দিতে যেয়ে শরৎ রাত্রির শরণ না নিয়ে পারে না ঃ

'সে নামে ডেকেছি আমি যে নামে ডাকে নি কেউ তাকে,
সে মন দেখেছি আমি যে মন দেখে নি কেউ আর ঃ
শরৎ রাত্রির মত যে মন মেলেছে লঘুভার
স্বপ্ন-সুরভিত পাখা ম্লান করি ধূসর সন্ধ্যাকে।

[সে নামে ডেকেছি আমি ঃ ফররুখ আহমদের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

শরতের পর হেমন্তের কুহেলী আর হিমেল কুয়াশা স্বভাবতই কবি-চিত্তকে স্বপ্নাবিষ্ট করে তোলে। হেমন্ত বাংলাদেশে ফসল তোলার ঋতু। আমাদের প্রধানতম ফসল আমন ধানের মাঠে যে স্বপ্নের প্রত্যাশা জাগায় তারই সাথে দেখা দেয় শিশিরের অশ্রুকণা— এ অশ্রু যেন মৃত্যু-তুহীন শীতের আগমনী বার্তা। ফররুখের কবিতায় হেমন্তের অঘ্রাণ তাই কথা ক'য়ে উঠেছে তাঁর নিজস্ব ভাষায় ঃ

অঘ্রাণে হিমের রাতে অনেকেই দেখেছে আবার
কাক-জোছনার সাদা কাফনে শরীর ঢেকে রেখে

শ্রান্ত সেই মুসাফির এসেছে সুদূর দেশ থেকে
আমন ধানের মাঠে এনেছে লুকিয়ে গুলনার।

[ময়নামতীর মাঠে।। ৩ ঃ মুহূর্তের কবিতা]

শীত ফররুখের খুব প্রিয় ঋতু নয়। শীত কবির নিকট সাদা কাফনের, তুহীন মৃত্যুর স্মারক ঃ

অন্ধকার আজদাহার বেষ্টনীতে প্রাণী ও প্রাণের
সাড়া নাই। এখানে জালালাবাদে দেখি এসে
হিমসিক্ত কম্বলের মত রাত্রি ঢেকেছে নিঃশেষে
সমস্ত আলোক-রশ্মি পৃথিবীর সকল পথের।
ইরানী ছুরির মত তীক্ষ্ণধার হাওয়া উত্তরের
বিদ্ধ হয় অনাবৃত তরু শীর্ষে, নিমেষে নিমেষে
তারি স্পর্শ পাই শূন্য প্লাটফর্মে,'—মাঘ রাত্রি শেষে
সুপ্তি-মগ্ন জনপ্রাণী এখন সিলেট শহরের।

[সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত ঃ মুহূর্তের কবিতা]

তবুও আঁধারের পর আলো, রাতের পর দিন এবং মৃত্যুর পর নবজীবনের মতই নতুন আশার সঞ্চার করে শীত। শীতের কুয়াশা এই স্বপ্নেরই প্রতীক ঃ

যখন হিমেল হাওয়া আনে বয়ে স্বপ্ন কুয়াশার
পুঁথির জগতে ঘোরে রসান্বেষী কৃষাণের প্রাণ,
দূর সফরের পথে যেন সে নাবিক ভ্রাম্যমাণ।

[পুঁথির আসর ঃ মুহূর্তের কবিতা]

বাংলা বর্ষের শেষ ঋতু বসন্ত অন্যান্য কবির মনে যত উন্মাদনাই সৃষ্টি করুক না কেন, ফররুখের জীবনচেতনা এখানেও স্বাতন্ত্র্যের অভিসারী। কবির জীবন গণ-জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। বাংলার গণজীবনে ফাল্গুন-চৈত্র কিন্তু আষাঢ়-শ্রাবণ বা কার্তিক-অঘ্রাণের মত নতুন ফসলের আশ্বাস বয়ে আনে না, আনে না কোন আনন্দের প্রাণবন্যা। শীর্ণ-জীর্ণ, ক্লান্ত এই বসন্তকে কবি যৌবনের উচ্চাসনে বসাতে রাজী নন।

যৌবন যে প্রেমের প্রতীক বলি না তা'
বাসন্তী নীল দিনগুলি যার রূপ-বিভায়
কাটলো সুরের দাহ নিয়ে ঝড় হাওয়ায়
পিছন পানে তাকিয়ে শুনি সেই গাঁথা।

[প্রতীক ঃ হে বন্য স্বপ্নেরা]

www.pathagar.com

সকল প্রকার ব্যর্থতা, দীনতা, দীর্ণতা ও শূন্যতার প্রতীক বসন্তের তথা বছরের শেষ মাস চৈত্র। বঞ্চনার ও হীনতার অতল গহবরে তলিয়ে যাবার পরেই জীবনবিপ্লবের অগ্নিবাণী নিয়ে আসবে কবির চিরপ্রিয় বৈশাখ। কবির চোখে তাই চৈত্রঝরা পাতার প্রতীক। প্রতীক রিক্ততার ও নিষ্প্রাণতার ঃ

শস্য শ্যামলিমাহীন উষর প্রান্তর যেন শূন্যতার প্রতীক পৃথ্বীর
চৈত্রের বিভ্রান্ত শ্বাস মূর্ত হয়ে ওঠে শুধু তাপদগ্ধ উদভ্রান্ত জীবনে
নিষ্প্রাণ শূন্যতা নিয়ে বিমর্ষ প্রান্তর, মন গুমরিয়া ওঠে ক্ষণে ক্ষণে
খররৌদ্রে উদঘাটিত ব্যর্থতার এ অধ্যায়, প্রাণহীন এ নদীর বাঁক
সুরে ইস্রাফিল কণ্ঠে নিষ্প্রাণ দিনের তীরে
এসো ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ।

বৈশাখ ঃ কাফেলা]

বাংলার নিসর্গ চিত্রণে ফররুখ সবচাইতে মনোযোগী হয়েছেন শিশু-কিশোর কবিতার ক্ষেত্রে। এটা খুবই স্বাভাবিক। শিশু-কিশোরদের বাইরের দুনিয়ার জ্ঞান খুবই সীমিত। উচ্চাঙ্গের ধ্যান-ধারণা উপলব্ধির উপযোগী পরিপক্কতাও তাদের নেই। তাদের সুপরিচিত পরিপার্শ্ব স্বাভাবিকভাবেই তাদের জন্যে লেখা কবিতায় বিশেষ গুরুত্ব লাভ করেছে। তবে এক্ষেত্রেও আমাদের দুর্ভাগ্য, কবির প্রায় দেড় ডজন শিশু-কিশোর কাব্য-গ্রন্থের মধ্যে প্রকাশিত ২/৩ খানির মধ্যেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে হচ্ছে।

কবির সর্বপ্রথম শিশু-কিশোর কাব্যগ্রন্থ 'পাখীর বাসা' সাতটি পর্যায়ে বিভক্ত। এর মধ্যে অন্তত তিনটিতে—'পাখীর বাসা', 'পাখ-পাখালি' ও 'পাঁচ-মিশালীতে—বাংলার নিসর্গ চিত্রণ প্রচেষ্টা সুস্পষ্ট। প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলিতে কবি ঘুঘু, বক, প্যাঁচা, গাঙ-শালিক, বাবুই, চড়ুই ইত্যাদি সুপরিচিত পাখীর জীবনধারা শিশুদের উপযোগী করে বর্ণনা করেছেন। এ পর্যায়ের প্রথম কবিতা 'পাখীর বাসা'তে কবি এই কবিতাগুচ্ছের একটা ভূমিকা দিতে প্রয়াস পেয়েছেন এভাবে ঃ

আয় গো তোরা ঝিমিয়ে পড়া
দিনটাতে,
পাখীর বাসা খুঁজতে যাবো
এক সাথে।।
কোন বাসাটা ঝিঙে মাচায়
ফিঙে থাকে কোন বাসাটায়
কোন বাসাতে দোয়েল ফেরে
সাঁঝ রাতে।।

ঝিলের ধারে ঝোঁপের মাঝে
কোন বাসাটা লুকিয়ে আছে
কোন বাসাটায় বাবুই পাখীর
মন মাতে।।
নদীর ধারে নিরালাতে
গাঙশালিকের বাস যেটাতে
রাত্তিরে সে থাকে, এখন
নেই যাতে।

[পাখীর বাসা ঃ পাখীর বাসা]

'পাখ-পাখালি' পর্যায়ের কবিতাগুচ্ছে টুনটুনি, কাঠঠোকরা, কুটুম পাখী, টিয়ে পাখী, ফিঙে, মাছরাঙা এবং শীতের অন্যান্য বিভিন্ন ধরনের পাখীর রূপবৈশিষ্ট্য ও জীবনবৈচিত্র্য বর্ণনা করেছেন। 'পাঁচ-মিশালী' পর্যায়ের কবিতাগুলিতে বাংলার ঋতু-বৈভবের কাব্যিক পরিচয় বিধৃত। এই পর্যায়ের একটি কবিতায় কবি কালবৈশাখীর চিত্র এঁকেছেন ঃ

ঝড় এল ভাই ঝাঁকড়া চুলে
মাথা নাড়িয়ে,
ঝরা পাতা সবগুলোকে
দিল তাড়িয়ে।।
সাঁ-সাঁ করে শোঁ শোঁ করে
ডাক দিল যে বিষম জোরে
যেখানটাতে গাছেরা সব
ছিল দাঁড়িয়ে।।
থরথরিয়ে উঠলো কেঁপে
তাল গাছটার ছাতা,
মড়মড়িয়ে পড়লো ভেঙে
বুড়ো বটের মাথা।

[ঝড়ের গান ঃ পাখীর বাসা]

কবির অন্যতম শিশু-কিশোর কাব্যগ্রন্থ 'নতুন লেখা'র প্রচুর কবিতা রচিত হয়েছে বাংলার নৈসর্গিক পটভূমিতে। এর একটিতে কবি শীত ঋতুর বর্ণনায় বলেন ঃ

উত্তরী বায় এলোমেলো
পউষ এল ! পউষ এল!
হিমেল হাওয়ায় শিরশিরিয়ে

www.pathagar.com

এল অচিন সড়ক দিয়ে—
মাঠ, ঘাট, বন ঝিরিয়ে গেল,
পউষ এল! পউষ এল!

[পউষ এল ঃ নতুন লেখা]

একই গ্রন্থে শ্রাবণের মৃদু ও ভারী বর্ষণ কবির হাতে রূপ পেয়েছে যথাক্রমে নিম্নরূপে ঃ

ইলশেগুড়ি! ইলশেগুড়ি!
আসলো উড়ে মেঘের ঘুড়ি,
হাওয়ায় বাজে রেশমী চুড়ি ;
ইলশেগুড়ি! ইলশেগুড়ি!!

[ইলশেগুড়ি ঃ নতুন লেখা]

এবং ঃ

বিষ্টি নামে রিমঝিমিয়ে
রিমঝিমিয়ে, রিমঝিমিয়ে,
টিনের চালে, গাছের ডালে
বিষ্টি ঝরে হাওয়ার তালে—
যুঁই চামেলী ফুলের বোঁটায়
বিষ্টি নামে ফোঁটায় ফোঁটায়,
বাদলা দিনের একটানা সুর
বিষ্টি নামে ঝুমুর ঝুমুর!!

[শ্রাবণের বৃষ্টি ঃ নতুন লেখা]

শিশুদের জন্য কবির ছড়ার বই 'হরফের ছড়া'। এ বইয়ে ছড়ার মাধ্যমে বাংলার বিভিন্ন বর্ণমালার অনবদ্য চিত্ররূপ অঙ্কন করেছেন কবি। এবং বলা বাহুল্য, বাংলার নিসর্গ এখানেও সার্থকভাবে উপস্থিত। নীচে কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যাক ঃ

ক-য়ের কাছে কলমিলতা
কলমিলতা কয় না কথা
কোকিল ফিঙে দূর থেকে
কলমি ফুলের রঙ দেখে।

অথবা ঃ

ঝ-য়ের পাশে ঝিঙে
ঝিঙে লতায় ফিঙে

www.pathagar.com

ঝিঙে লতা জড়িয়ে গেলো
কালো গরুর শিঙে।

অথবা ঃ

ব-য়ের কাছে বনবিড়াল
আনলো ডেকে সাত শিয়াল
বোল-বোল-বোল আমের বোল
বাদুড় এসে বাজায় ঢোল।

এসব ছাড়াও শিশু-কিশোরদের আরও কয়েকখানা কাব্যগ্রন্থে বাংলার প্রকৃতির বিভিন্ন দিক নিয়ে কবি রচনা করেছেন অসংখ্য কবিতা ও ছড়া। গ্রন্থগুলোর নামের মধ্যেই পাওয়া যায় এসব বিষয়ের প্রাথমিক পরিচয়। যেমন—'চিড়িয়াখানা' গ্রন্থে বাংলার বিভিন্ন পশু, 'ফুলের ছড়া'য় বিভিন্ন ফুল, 'পোকা-মাকড়' গ্রন্থে বিভিন্ন কীটপতঙ্গ এবং 'পাখীর ছড়া' গ্রন্থে রঙ-বেরঙের পাখীর মন—মাতানো পরিচয় দেয়া হয়েছে। তবে দুঃখের বিষয়, এখন পর্যন্ত 'চিড়িয়াখানা' ছাড়া আর অন্যান্য বই গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় নি বলে এগুলো এখনো পাঠক সমাজের অগোচরেই রয়ে গেছে।

শুধু শিশু-কিশোরদের জন্য রচিত গ্রন্থের বেলাতেই নয়—তাঁর বড়দের জন্য লেখা গ্রন্থের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং নিসর্গসহ যে কোন বিষয়েই ফররুখের আজকের মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ থাকতে বাধ্য। তবে একথাও সত্য, কবির যেসব রচনা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এ যাবত প্রকাশিত হয়েছে এবং যেসব রচনা গ্রন্থাকারে ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে, সেসব যদি একটু অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করা যায়, তবে বাংলা কাব্যে ফররুখের বিপুল, অভিনব ও বৈচিত্র্যময় অবদান উপলব্ধি করা এতটুকু অসুবিধা হবার কথা নয়।

www.pathagar.com

আবদুল হাফিজ

ফররুখের কাব্য-নাটক

'নৌফেল ও হাতেম' ফররুখ আহমদের একটি দুঃসাহসিক কবিকর্ম। তার কারণ দ্বিবিধ। প্রথমত পূর্ব বাংলার সাহিত্যে নাটক রচনার ব্যাপারটি এমনিতেও খানিকটা দুঃসাহসের কাজ। সার্থক নাটক এ পর্যন্ত আমরা পাইনি, যার মধ্যে একাধারে মঞ্চধর্মিতা ও অন্যদিকে সাহিত্যিক উৎকর্ষতার সমাবেশ ঘটেছে। সাম্প্রতিককালে, এ শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে বিলেতে এবং কন্টিনেন্টের নানা দেশে কাব্যনাটকের পুনরুজ্জীবন (revival) চেষ্টা চলছে। ফলে দেখি, এলিয়টের মতো কবি-প্রতিভাও এদিকে প্রযত্ন ও অধ্যবসায় প্রয়োগ করে Murder in the Cathedreal-এর মতো সার্থক কাব্যনাটক সৃষ্টি করেছেন, যার মঞ্চসাফল্য সংশয়াতীতরূপে প্রতিষ্ঠিত। Yeats-ও অসংখ্য কাব্যনাটক লিখেছিলেন ; আইরিশ থিয়েটার আন্দোলনের প্রবর্তনা ঘটে তাঁরই হাতে, তাঁরই কাব্যনাটকের অভিনয়ের মাধ্যমে। এদিকে পদচারণা করে আরও অনেকে খুব সাম্প্রতিককালেও বিলেতে প্রতিষ্ঠা পাচ্ছেন। অর্থাৎ ইউরোপে ও বিলেতে কাব্যনাট্য পুনরুজ্জীবনের প্রচেষ্টা যেমন সাম্প্রতিক, তেমনি অন্যদিকে এ ধরনের কাব্য-নাটকের প্রতি দর্শক ও পাঠকের অনুরাগ, প্রমাণ করে কবিতা ধর্মানুরাগের অপর নাম।

কিন্তু পূর্ব বাংলার ক্ষেত্রে প্রশ্নটি অন্যভাবে বিবেচ্য। কবিতা যেমন আমাদের হাতে, অন্তত বিভাগোত্তরকালে একটা শ্রেষ্ঠ শিল্পে উন্নীত হয় নি, তেমনি হয় নি নাটক। গদ্যে রচিত নাটকের সংখ্যা কম, আর যা আছে তাও শিল্পকর্মের নজীর হিসেবে (নাটকের জটিল স্বভাবের কথা স্মরণ রেখে) উল্লেখযোগ্য নয়। সুতরাং এ মুহূর্তে 'নৌফেল ও হাতেম' হাতে নিয়ে বিপন্ন বিস্ময়ের সম্মুখীন হওয়া ছাড়া পথ থাকে না।

'নৌফেল ও হাতেম'-এর কাহিনী মূলত হাতেমের বীরত্ব, দানশীলতা ও সুনামের প্রতি নৌফেলের ঈর্ষাবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত। হাতেম বাদশাহজাদা, কিন্তু রোমান্টিক মানবিকতার অধিকারী—মধ্যযুগীয় রোমান্স কাব্যের তিনি মহৎ নায়ক। নৌফেল স্বয়ং বাদশাহ। হাতেমের বিপুল সুনাম তার রাজ্যের অধিবাসীদেরকেও করে মুগ্ধ। ফলতঃ সংকীর্ণচিত্ত নৌফেল হাতেমের দানশীলতাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার জন্য তার খাজাঞ্চীকে হুকুম দেয় ঃ

www.pathagar.com

লক্ষ দিরহাম তুমি দেবে লক্ষ সায়েলের হাতে
পরিচিত, অথবা অপরিচিত। দৃষ্টি রেখো, যেন
কৌশলী ভিখারী কোন এ মেলায় করে না বঞ্চনা
বারবার ভিক্ষা নিয়ে। দেবে তুমি সহস্র দিনার
দূরান্তের মুসাফির দেখে।

হাতেমের দেশের এক মুসাফির এ সময়ে বেড়াতে এসেছিল নৌফেলের রাজ্যে। সে সচকিত হয়ে অনুভব করে আশ্চর্য তামাসা। দুস্থ মিসকিন বা প্রতিবেশী রেখে আমাকে আশরাফি দিল! মুসাফিরের করুণ উপলব্ধিই তাকে দিরহাম ত্যাগ করতে প্ররোচিত করে ঃ

আশরফি চাই না আমি, নই আমি ভিক্ষুক সায়েল
এসেছি মেলায় শুধু এ রাজ্যের রীতি দেখে যেতে ;
দেখেছি তা। চলে যাব এই রাত্রি শেষে। নিয়ে যাও
ফেরায়ে আশরফি তুমি ; দিও দর্পী নৌফেল বাদশাকে।

হাতেমের ঔদার্য আর মহৎ মানবিকতার শিক্ষা তার রাজ্যের এই নাগরিকের চরিত্রে প্রতিফলিত। জাতীয়তাবাদী ফররুখ আহমদের পক্ষে এ ধরনের চরিত্র সৃষ্টি সম্ভব। নৌফেলের গোয়েন্দা সংবাদ সংগ্রহ করে—রাজ্যের মুসাফির কর্তৃক অবহেলিত মোহর ধূলায় যায় গড়াগড়ি ; কোতোয়ালের চোখে সে একটা অঘন্য অপরাধ। মুসাফিরকে গ্রেফতার করা হল। নৌফেলের অনিবার্য নির্দেশ ঃ

জল্লাদ, গর্দান নাও শয়তানের। হত্যা করো ওকে
তিলে তিলে, ওজুদের চামড়া খুলে নিয়ে, ভারী বোঝা
জগদ্দল পাথর চাপিয়ে ; যাও যাও নিয়ে যাও।

কিন্তু নৌফেলের ভাঁড় বোধ করি রসিকতা ছাড়া আরও কিছু জানে ঃ

আজব তামাসা।....... বুদ্ধি মগজেই থাকে। ঘিলুহীন
মুণ্ডের বিরান মাছ সারবস্তু জন্মে না কখনো।

'ওয়েসিস' নামক একটি দৃশ্যে ক্রীড়ারত বাচ্চাদের মুখে হাতেমের প্রশংসাকীর্তন ও নৌফেলের নিন্দা প্রচার করা হয়েছে। নৌফেলের রাজ্যের বাচ্চা, জোয়ান, জঈফ হাতেম-অনুরাগী। তাই শেষ পর্যন্ত এ নাটকের দ্বিতীয় অংকে ঈর্ষাকাতর নৌফেল হাতেমকে রাজ্যহীন করার জন্য করেন চক্রান্ত, চালান যুদ্ধপ্রস্তুতি। উজীর বাধা দান করলে নৌফেল বলেন ঃ

আমাকে দিও না বাধা। প্রতি রন্ধ্রে, প্রতি বায়ু-কোষে
জ্বলে কোন্ জাহান্নাম রাত্রিদিন, তুমি তা জানো না।

www.pathagar.com

রক্তের অন্তর্গত এই জাহান্নামই তাকে হাতেমবিরোধী যুদ্ধাভিযানে প্ররোচিত করে। অন্যদিকে যুদ্ধ-সংবাদ শ্রবণ করে হাতেম বৃদ্ধ পিতাকে বলেন ঃ

আমার সর্বস্ব যদি চায় আজ নৌফেল তা'হলে
সব কিছু ছেড়ে দিয়ে যাব আমি দূর-দেশান্তরে।

বাদশা বলেন ঃ

ভীরু, কাপুরুষ।

হাতেম উত্তর দানকালে তাঁর জীবনাদর্শের উচ্চকিত ঘোষণা অব্যক্ত রাখেন না ঃ

খ্যাতির সংঘর্ষে আমি দেখি নাই
মর্দমী কখনো।

অথবা—

চাই না সংঘর্ষ তাই যশের পূজায়।

হাতেম চরিত্রে মুসলিম খলিফাগণের ইসলামী রাজনীতিবোধের স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যেতে পারে। এবং শেষ পর্যন্ত তিনি পালিয়ে যান—

প্রজাবর্গের প্রতি তাঁর অফুরান ভালবাসা, স্নেহের জন্যই। নৌফেল তাঁর রাজ্য জয় করেও শত্রু হাতেমের সন্ধান পান না। অনুরাগী প্রজাপুঞ্জ লুকিয়ে রাখে তাঁকে। এ অবস্থাতেও হাতেম দুঃখীর ভার বহন করেন। হাতেমের মস্তকের মূল্য নির্ণীত হয় বিশ সহস্র দিনার। একটি দরিদ্র পরিবার বৃদ্ধ বৃদ্ধা ও তাদের তিন পুত্র হাতেমের সন্ধান করতে থাকে। বিশ সহস্র দিনার তাদের আজীবনের দারিদ্র্য ঘুচিয়ে দিতে পারে। পরিবারটির দারিদ্র্যের কথা জানতে পেরে নৌফেল বাদশার কাছে হাতেম আত্মসমর্পণ করতে যান--যাতে পরিবারটি ঐ বিশ সহস্র মুদ্রা লাভ করে দারিদ্র্যের অসহ্য যন্ত্রণা থেকে মুক্তি পায়। বৃদ্ধ অবশ্য আপত্তি তোলে, পুত্রদের ষড়যন্ত্রের প্রতিবাদ করে, কিন্তু পুত্রেরা তার কথা শোনে নি। বৃদ্ধের কথার প্রত্যুত্তরে হাতেম বলেন ঃ

ব্যাকুল হোয়ো না বৃদ্ধ। জিন্দেগানি রেখেছি আমার
আল্লার বান্দার কাজে। সামান্য প্রাণের বিনিময়ে
দুঃখের দুর্দিন যদি কেটে যায় তোমাদের, তবে
দিও না অহেতু বাধা।

সাচ্চা-মুসলিমের সোচ্চার আদর্শ প্রচার সন্দেহ নেই। নৌফেল সমীপে বৃদ্ধ স্বীকার করে, হাতেম স্বয়ং ধরা দিয়েছেন, জীবন দিতে এসেছেন শুধু বৃদ্ধের পরিবারটির দারিদ্র্য ঘুচবে বলে। হাতেমের এই ঔদার্যে অবাক হন নৌফেল। নৌফেলের মুর্শিদ এক বৃদ্ধ ঘোষণা করে ঃ

... কে দেখেছে
এমন দারাজ-দিল কে দেখেছে দুনিয়া জাহানে?

www.pathagar.com

আর কবি বলেন ঃ

কে শুনেছে এই ত্যাগ, মর্দমীর কথা ? প্রবৃত্তির
ঊর্ধ্বে জানি ফেরেশতারা—নূরানী লেবাস ; কিন্তু ধূলি—
মলিন লেবাস যার সেই লুব্ধ মাটির মানুষ
হিংসা ও বিদ্বেষে অন্ধ করে যায় ব্যর্থ হানাহানি
ভ্রাতৃরক্তে প্রতিদিন বাড়ায়ে মুনাফা।

কবি আরও বলেন ঃ

হাতেম তা'য়ীর শির পর্বতের মত মহীয়ান,
সুব্‌হে উম্মীদের মত মুখ তার উজ্জ্বল রওশন।

সব দেখে শুনে নৌফেল এই ত্যাগবীর দেশপ্রেমিক ইসলামী আদর্শে প্রবুদ্ধ হন এবং নির্মোহ মানবিকতার প্রতীক হাতেমের কাছে করেন আত্মসমর্পণ। হাতেমের উদ্দেশ্যে নৌফেল বলেন ঃ

... দিয়ে যাও মহৎ প্রেরণা
প্রেমপন্থী সুমহান আদর্শের পথে, নিয়ে যাও
বিক্ষত, বিভ্রান্ত জনে মানুষের মুক্তির মঞ্জিল ;

শায়েরের উক্তিতে এ কাব্যের সমাপ্তি ঃ

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়,—শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী, পারে যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ,—ঘুমঘোরে যখন বেহুশ ;
জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে ;
যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ী'র।

ক্ষীণ এই কাহিনী, এর প্লটে তাই নেই জটিলতা, নেই নাট্যধর্মিতা আরোপের কোন সুযোগ। এককথায় কাহিনীর ক্ষীণতা এ কাব্যনাটকের নাটকীয়তাকে করেছে ক্ষুণ্ন। বিশুদ্ধ নীতি প্রচার রাজনৈতিক মতাদর্শের আড়ালে কাহিনীকে খর্ব করেছে। মুসলিম খলিফাগণের আদর্শের রূপকথা জাতীয় গল্প ফররুখ আহমদকে প্রভাবিত করেছে। এ কাব্যনাটকে তাই কাব্যকে এবং নাটকীয়তাকে ছাড়িয়ে গেছে ইসলামী জীবনধারার প্রচার। অথচ নাটকে এটি না হওয়াই বাঞ্ছিত ছিল। শেকসপীয়ারের নাটকে সমকালীনতা ভাস্বর, তবু তা তার নাটকের নাট্য বা কাব্যস্বভাবকে অতিক্রম করে না।

কিন্তু ফররুখ আহমদ কবি, তাঁর কাছে আদর্শ কাব্যনাটক আশা করি না ; বিশেষ করে তাঁর সামনে কোনও বাংলা কাব্যনাটকও উপস্থিত নেই। পূর্ববাংলার কাব্যনাটকের

www.pathagar.com

ইতিহাসে চিরকাল এক্ষেত্রে তিনি পথিকৃৎ বলে গণ্য হবেন। দ্বিতীয়ত, এ কাব্যনাটক সিম্বলিজমকে আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে। এক্ষেত্রে প্রেরণা এসেছে ইউরোপ থেকে। কিন্তু প্রতীক ব্যবহারে সচেতনতার পরিচয় দিতে পারেন নি তিনি। অথচ হাতেমকে নিয়ে প্রতীকী মহাকাব্য লেখার সুযোগ রয়েছে। স্বীকার করি, হাতেমকে সর্বপ্রকার অতিপ্রাকৃত ঘটনার হাত থেকে তিনি বাঁচিয়ে দিয়ে কাহিনীকে মানবিক করেছেন, অথচ রোমান্স রাজ্যের এই রূপকুমারকে নিয়ে অপরূপ সুন্দর কাব্যনাটক হতে পারতো।

ফররুখ আহমদ ইসলামী জীবনধারায় বিশ্বাসী হলেও তিনি আসলে পূর্ব বাংলার প্রগতি সাহিত্যেরই ধারক ও বাহক। তাঁর সিন্দাবাদ সমুদ্রবিহারী—নোনা পানির হাম্মামে সে করতে চায় গোসল। তাঁর হাতেম তায়ী গগনবিহারী হলেও ধূলি-মলিনতাকে অস্বীকার করে নি।

ফররুখ আহমদের রাজনৈতিক সচেতনতা যদি আজ তাঁর কাব্যকে ছাড়িয়েও গিয়ে থাকে, তবু বলবো, তাঁর জাতীয়তাবাদ সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত। নৌফেল চরিত্রে রূপায়িত হয়েছে এক হীন মানসিকতার অধিকারী অন্ধ দেশপ্রেমের পূজারী, অপরিচ্ছন্ন রাজনীতির পাটোয়ারী ও মুনাফাখোর ব্যবসায়ী রাজনৈতিক কর্মীর মনোভাব।

মুসাফির হলেন সাচ্ছা সচেতন নাগরিক, বৃদ্ধ সৎনাগরিক আর মুর্শিদ প্রজ্ঞার প্রতীক। ভাঁড় চরিত্রের পরিকল্পনায় ফররুখ আহমদ সচেতন ছিলেন মনে হয়। অন্যান্য চরিত্রের মধ্যে গুপ্তচরটির মধ্যে সমকালীনতার আভাস আছে, খাজাঞ্চীটির সাথে আমাদের অপরিচয় নেই। বরং হাতেম চরিত্র তার যথেষ্ট মর্যাদা পায় নি। হিংসায় উদ্বুদ্ধ নৌফেল তবু প্রাণবন্ত। হাতেম এ দেশের নিরুদ্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মীর মতো জনতার সহানুভূতির উপরে নির্ভরশীল।

আজকের মুসলিম দুনিয়াকে ফররুখ আহমদ চিত্রিত করেছেন 'হাতেম ও নৌফেল' কাহিনীর মাধ্যমে। কিন্তু সে চিত্রন অস্ফুট।

ফররুখ আহমদের কবিপ্রতিভা নিয়ে আলোচনার অবকাশ নেই। কেননা তিনি প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু একটি কথা বলা প্রয়োজন—নতুন রূপকল্পের সন্ধানে তিনি বোধ হয় সবচেয়ে সচেতন। 'নৌফেল ও হাতেম'-এ তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দের একটা নতুন ভঙ্গী প্রবর্তন করার প্রয়াস পেয়েছেন। মাইকেলী সার্থকতা ফররুখ আহমদের প্রাপ্য নয়, তবু কোথাও কোথাও তিনি সাফল্য অর্জন করেছেন। ঈর্ষায় উন্মত্ত নৌফেল মুহূর্তের উত্তেজনায় যা বলেছে, মহৎ আবেগে হাতেম যা উচ্চারণ করেছে, তা প্রায় অনিবার্য ও কাব্যে উত্তীর্ণ।

www.pathagar.com

সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়

কাব্যনাট্যের নতুন দিগন্ত

'সিরাজাম মুনীরা'র পর ফররুখ আহমদ আপন আদর্শভিত্তিক কাব্য সাধনাকে কাব্যনাট্যের নতুন দিগন্তে প্রসারিত করার প্রয়াস পেয়েছেন। এ প্রয়াসেরই ফল হল ১৯৬১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' নামক কাব্যনাট্যাকারে রচিত গ্রন্থটি। কাব্যনাট্যের এই নতুন ক্ষেত্রে ফররুখ আহমদ কতটা শৈল্পিক সার্থকতার অধিকারী হয়েছেন, আমি এখানে সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করব।

আধুনিক বাংলা সাহিত্যে কবিতা ও নাটকের সৌখ্য প্রথম আবিষ্কার করেছিলেন নবযুগের বার্তাবাহী কবি মধুসূদন দত্ত। মহাকাব্য লিখতে গিয়ে সে বাস্তবতাকে তিনি উজ্জ্বল করে তুলেছিলেন 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে। সেখানে বিক্ষুব্ধ জীবনাবর্তে আহত নায়ক বা নায়িকার ক্লিয়াশীল আর্তনাদ জীবনের নাট্যমুহূর্তকে কবিতায় প্রকাশ করেছে। সে মুহূর্তের প্রকাশ গদ্যে কোন রকমেই সার্থকতর হতে পারত না বলেই আমরা মনে করি। গদ্যে সে হৃদয়াবেগের প্রকাশ অনেকটাই তরল হয়ে নাটকীয় ভাবনার গাঢ়বদ্ধতাকে ক্ষুণ্ন করত। এখানেই কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা প্রমূর্ত হয়ে উঠেছিল যথাযথভাবে। শ্রেণীবিচারে 'মেঘনাদ বধ' কাব্য হলেও, পরিবেশ, আবেগ ও ভাব-সংকটের দিক থেকে তা নাটকেরই সহধর্মী হয়ে উঠেছিল। 'বীরাংগনা' কাব্যে মধুসূদনের এ শক্তি আরও প্রকট। তবু মধুসূদন নাটকের কাব্যিক প্রকাশের যথার্থতা সম্পর্কে বোধ হয় খুব নিশ্চিত হতে পারেন নি বা মহাকাব্য রচনার অতি উৎসাহে এ দিকে প্রস্তুতি নেবার অবকাশ পান নি। কিন্তু নাটকে পদ্যচ্ছন্দের প্রয়োগ নাটকের মুক্তিসাধনে যে সাহায্য করতে পারে, এ বিষয়ে মধুসূদনের স্পষ্ট ধারণা ছিল। 'পদ্মাবতী' নাটকে আমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ-নিরীক্ষা চালানোর প্রচেষ্টার মধ্যেই তা স্পষ্ট হয়ে ধরা দেয়। তবে এ বিষয়ে মধুসূদন বেশী অগ্রসর হন নি। তাই তাঁর হাতে কাব্যনাট্য সৃষ্টির যে সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল, তা শেষ পর্যন্ত সম্ভাবনাই থেকে গিয়েছে। তথাপি মধুসূদনই যে বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্যের আগমনী গেয়েছেন, তাতে সন্দেহ নেই। 'মেঘনাদ বধ' ও 'বীরাংগনা' কাব্যে তিনি যে অপূর্ব ছন্দধ্বনির প্রয়োগ করেছিলেন তা কাব্যের রসস্ফুর্তির সম্ভাবনাকে অবারিত রেখেও ভাষাকে লোকজীবনের সাধারণ ভাবনা ও চিন্তার গণ্ডী থেকে বেশী দূর সরিয়ে নেয় নি। পয়ারের বিধিবদ্ধ কাঠামোতে বন্দী বাংলা কবিতা নিস্তেজ ও ম্রিয়মাণ হয়ে পড়েছিল। তাকে অমিত্রাক্ষরের গতির রথে চড়িয়ে দিয়েছিলেন

www.pathagar.com

মুক্তি, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে পয়ারের বাঁধনে লোকভাষার যে স্পন্দনটি ছিল তাকেও মধুসূদন অনেকটা রক্ষা করতে পেরেছিলেন। ফলে মধুসূদনের এ ছন্দকাব্যনাট্যের সার্থকতার জন্য প্রয়োজন যে objective correlativity তা বজায় রাখতে অনেকটাই সমর্থ ছিল। মধুসূদনের রচনায় জীবনভাবনা ও কাব্যভাবনা সমসূত্রে এসে মিলে গিয়েছিল এ ছন্দের সরণি অবলম্বন করে। লক্ষ্য করার বিষয়, 'মেঘনাদ বধ' ও 'বীরংগনা' কাব্যে মধুসূদন নাট্যকারের জীবনসৃষ্টির প্রতি আনুগত্য রেখেও যেন জীবন থেকে অনুভবের দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন, অনুভব থেকে আর জীবনের দিকে নয়। আর এখানেই সূচিত হয়েছিল কাব্যনাট্যের মহৎ সম্ভাবনা। মধুসূদন সে সম্ভাবনার পথ খুলে দিয়েই থেমে গিয়েছিলেন, জীবনসংগ্রামে ক্লান্ত নিঃশেষিত পথিকের ন্যায়।

মধুসূদনের প্রদর্শিত পথেই কাব্যনাট্য রচনার কাজে পরবর্তীকালে এগিয়ে এসেছিলেন গিরিশচন্দ্র ঘোষ ও রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের পর কাব্যনাট্যের সাধনা তেমন একটা অগ্রসর হয় নি। রবীন্দ্র-পরবর্তীদের মধ্যে মোহিতলাল মজুমদারের কোন কোন কবিতায় কাব্যনাট্যের সম্ভাবনা প্রমূর্ত হতে দেখি। তবু এ বিষয়ে মোহিতলালের তেমন প্রস্তুতি ছিল না। বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্যের সাধনায় স্বল্পশক্তিমান আর দু'চার জন কবি আত্মনিয়োগ করলেও, বস্তুত সে সাধনা তেমন কোন সার্থকতা নিয়ে উপস্থিত হয় নি। বাংলা সাহিত্যে কাব্যনাট্যের সুষ্ঠুবিকাশ আজও তাই অপেক্ষিত। সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত গুটি-কয়েক কাব্যনাট্যের মধ্যে ফররুখ আহমদের 'নৌফেল ও হাতেম' নতুন করেই যেন আমাদের দৃষ্টি কাব্যনাট্যের দিকে আকর্ষণ করেছে। তবে 'নৌফেল ও হাতেম' লিখে ফররুখ আহমদ নতুন একটা কাব্যনাট্যান্দোলন শুরু করেছেন মনে করলে ভুলই করা হবে। বরং একথা বলাই সমীচীন হবে যে, কাব্যনাট্যের নতুন আংগিক আশ্রয় করে ফররুখ আহমদ আপন আদর্শভিত্তিক সাহিত্য-সাধনাকে একটা নতুন শিল্পমহিমা দানের প্রয়াস পেয়েছেন মাত্র। বস্তুত ফররুখ আহমদ আপন কাব্যভাবনার সীমাবদ্ধতাকে আঙ্গিকের বৈচিত্র্যের মধ্যে কিছুটা প্রসারিত করে দিয়ে আপন শিল্পীসত্তার সজীবতাকেই বারবার প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তিনি ভিন্নতর কোন উদ্দেশ্য দ্বারা চালিত হন নি। ভাবের ক্ষেত্রে ফররুখ পূর্বাপর একই পথের পথিক থেকে গিয়েছেন।

একথা স্মরণ রেখেই 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যটির মূল্যায়নে অগ্রসর হব। 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিস্বপ্নই যে 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে সার্থকতার পথ খুঁজে ফিরেছে, তা বুঝতে মনোযোগী পাঠকের মুহূর্তকালও বিলম্ব হয় না। একটু মনোযোগ সহকারে লক্ষ্য করলে এ তিন কাব্যগ্রন্থেই যে কবিভাবনা একটি অখণ্ড ঐক্যসূত্রে বিধৃত তা বুঝতে কষ্ট হয় না। 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে ইসলামী ঐতিহ্যের মহত্ত্বে বিশ্বাসী ও পুনরুজ্জীবনবাদী কবি অশ্রান্ত সন্ধানীর ন্যায়

www.pathagar.com

অতীত পরিক্রমা শেষে 'হেরার রাজ-তোরণে'র পথেই মুসলিম নবজাগরণের সম্ভাব্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসে উপনীত হয়েছেন। 'সরাজাম মুনীরা'য় কবি নবী হযরত মুহম্মদ (স), খোলাফায়ে রাশেদীন ও বিভিন্ন ধর্মসাধকের জীবনের আলোকে সে নবজাগরণের পন্থা নির্দেশ করতে গিয়ে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যকতা সম্পর্কে একটি সুনিশ্চিত প্রত্যয়ের অধিকারী হয়েছেন। 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে কবি সে আদর্শ রাষ্ট্রের কল্পনাকে বাস্তবায়িত করার এক লোকায়ত পন্থা হিসেবেই যেন আমাদের সামনে উপস্থিত করেছেন হাতেম তা'য়ীর নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও সেবার দৃষ্টান্তকে। কবি যেন আমাদের প্রকারান্তরে এ কথাই বলতে চেয়েছেন যে, তাঁর ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের স্বপ্ন তথা মুসলিম পুনরুজ্জীবনের স্বপ্ন একমাত্র সার্থকতামণ্ডিত হতে পারে মানবতার নিঃস্বার্থ ও অক্লান্ত সেবার পথে। এ পথের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কে কবিপ্রত্যয়টি ভাষা পেয়েছে কাব্যনাট্যের সমাপ্তিতে শায়েরের কণ্ঠে উচ্চারিত বাণীতে ঃ

> কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়,—শুধু সে মানুষ
> নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী,—পারে যে জাগাতে
> সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ,--ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ ;
> জ্বালাতে পারে যে আলো ঝড়ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে ;

বস্তুত "সাত সাগরের মাঝি"র অপরূপ স্বপ্নাভিজ্ঞতার জগত থেকে "সিরাজাম মুনীরা"র মহৎ জীবনভাবনা অথবা আদর্শ ভাবনার পথ ধরেই কবি উপস্থিত হয়েছেন "নৌফেল ও হাতেম"-এর অপরূপ সুন্দর মানবিক ভাবনা-কামনার জগতে। ঐতিহ্যের স্বপ্নালোক ও আদর্শের ধ্যানলোক থেকে বাস্তব সমস্যাক্ষুব্ধ জীবনের তটে কবির এ জাগরণ বড়ই তাৎপর্যপূর্ণ। অতীতচারী, স্বাপ্নিক কবির জীবনদৃষ্টির প্রখরতা তাঁর প্রতিভাকে অনেকটাই অপমৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছে।

"নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্যে ফররুখ আহমদ স্বপ্নের, আদর্শের ও তত্ত্ব-ভাবনার জগত থেকে অনেকটাই যেন সমাজকর্মীর বাস্তব ভাবনার জগতে নেমে এসেছেন। তবু মানবিক শ্রেয়ঃ ও কল্যাণের আদর্শে সুদৃঢ় আস্থাই এ কাব্যনাট্যের প্রাণবায়ু যুগিয়েছে, তাতে সন্দেহ নেই। কিংবদন্তীনির্ভর হাতেম তায়ী চরিত্রকে কবি ইসলামী প্রেম, সেবা ও কর্মের মহান আদর্শের মূর্ত প্রতীকরূপে দাঁড় করিয়ে আপন সযত্নপোষিত কবিস্বপ্নটিকে বাস্তবায়নের পথ খুঁজেছেন। হাতেমের মত সেবাব্রতী, মানব প্রেমিক, কামিল ইনসানের চরিত্রমাহাত্ম্য কবির মনোগত আদর্শটির পরিপোষকতা করেছে বলেই তাঁকে নিয়েই কবির এ কাব্যনাট্য রচনার প্রয়াস। "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্যে তাই লক্ষ্য করি, জীবনভাবনা কবির কাব্যভাবনারই অনুগামীরূপে উপস্থিত হয়েছে। অথচ জীবন থেকে অনুভবের দিকেই হওয়া উচিৎ—কাব্যনাট্যের এ মৌলিক শর্ত কবি পালন করতে অপারগ হওয়ায়, "নৌফেল ও হাতেম"-এর শিল্পমূল্য

www.pathagar.com

অনেকটাই ক্ষুণ্ন হয়েছে সন্দেহ নেই। তথাপি "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্য নিছক ভাবধর্মী রচনায় পর্যবসিত হয়নি। এতে নাটকীয় objective correlativity অনেক ক্ষেত্রে বজায় রয়েছে বলে মনে হয়। কবি আপন মনোগত আদর্শ-ভাবনাটির অনেকটা রাশ টেনে 'নৌফেল ও হাতেম'-এর আপাত্যসদৃশ জীবনাদর্শের ভেতরকার গূঢ়তর পার্থক্যটাকে তাঁদের কর্মধারায় সংঘাতের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন। হাতেমের সুখ্যাতি ও গৌরব শ্রবণে ঈর্ষানীল নৌফেলের কার্যকলাপ, হাতেম কর্তৃক মানবিক পন্থায় তার মোকাবেলা করার চেষ্টা, পরিণামে নৌফেলের মনে শুভবুদ্ধির উদ্বোধন ইত্যাদি ঘটনা ও দৃশ্য অনেকটাই নাটকীয় সম্ভাবনাসমৃদ্ধ। ফররুখ এসবের কিছুটা সদ্ব্যবহার আলোচ্য কাব্যনাট্যে করতে পেরেছেন বলে মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে।

'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাটকের কাহিনী পরিকল্পনায় কবি পুঁথি-সাহিত্যের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রাক্-ইসলাম যুগের আরবের কিংবদন্তী সৃষ্টিকারী এক অসাধারণ মানুষ হাতেম তায়ী ; প্রেম, সেবা ও সত্যের শাশ্বত বার্তাবাহী মহান চরিত্র হাতেম পুঁথিসাহিত্যের আবহাওয়ায় লালিত ফররুখের মনের আকাশে বরাবরই এক অপরূপ মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে দেখতে পাই। প্রাক্-ইসলাম যুগের মানুষ হলেও ফররুখের কবি-কল্পনায় হাতেম ইসলামী জীবনাদর্শের মূর্ত প্রতীক হয়ে দেখা দিয়েছে। এ হাতেম-চরিত্র ফররুখের সাহিত্যচিন্তার উপর যে ছায়া বিস্তার করেছে তা বড় সামান্য নয়। এ চরিত্রের ব্যাখ্যানের জন্যেই কবি রচনা করেছেন তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্য এবং 'হাতেম তা'য়ী' নামে একটি সুবৃহৎ কাহিনীকাব্য। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে রচিত অনেক সনেট ও খণ্ড কবিতায় কবি নানা প্রসঙ্গে হাতেম তায়ীর প্রতি আপন অন্তরের শ্রদ্ধা ভালবাসা ও ভক্তি প্রকাশ করেছেন। বস্তুত হাতেম চরিত্রের সরণি অবলম্বনে ফররুখের কবিস্বপ্নটি বারবার মানুষের বাস্তব জীবনে আপন চরিতার্থতা খুঁজে ফিরেছে। ফররুখের হাতে এ চরিত্র প্রতীকী তাৎপর্যমণ্ডিত হয়ে বরাবরই মানবাত্মার এক বিবেকী রূপ নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। তাই কোন মানবিক দুর্বলতাই এ চরিত্রকে কোথাও স্পর্শ করেছে বলে দেখতে পাই নে—'ঝঞ্ঝা, ঝড়ে ঘূর্ণাবর্তে' বিপর্যস্ত মানবতার সামনে অমলিন আশা রূপে জেগে ওঠে এ চরিত্র। আলোচ্য কাব্যনাট্যেও কবি হাতেম চরিত্রের অবতারণা করেছেন একটি মহৎ উদ্দেশ্য সামনে রেখে। 'ত্যাগী, সত্যব্রতী ও মানববন্ধু' হাতেম তায়ীর জীবনাদর্শের আলোকে কবি নৌফেলরূপী ভ্রান্ত মানবাত্মার মুক্তির পথনির্দেশের চেষ্টা পেয়েছেন। বস্তুত 'নৌফেল ও হাতেম' কবির মনোগত ইসলামী (তথা মানবিক) জীবনাদর্শেরই একটি বাস্তব ভাষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এবার 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করব। গ্রন্থের সূচনায়ই Prolouge বা পূর্বভাষণ হিসেবে 'কাহিনীর ইশারা' নামক কবিতায় অতি সংক্ষেপে ও

www.pathagar.com

সুন্দরভাবে কবি তাঁর নাট্যপরিকল্পনার উৎসটি নির্দেশ করেছেন এবং প্রকারান্তরে নাটকের মূল বক্তব্যটি কি তাও বলে দিয়েছেন। য়েমনের শাহজাদা ছিলেন মানবসেবায় উৎসর্গীকৃত এক মহাপ্রাণ ব্যক্তি। জীবনে সকল আরাম-আয়েশকে তুচ্ছ করে তাজ-তখ্‌ত ছেড়ে মানুষের দুঃখ-ব্যথা অপনোদনের জন্যে অক্লান্ত সাধনা করে তিনি অপার খ্যাতির অধিকারী হয়েছিলেন। আরবের প্রতাপশালী বাদশাহ নৌফেল যশোলিপ্সা-হেতু হয়ে দাঁড়ালেন তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী ; তাঁর ভাণ্ডার থেকে অকাতরে ধনরত্ন বিলিয়েও কিন্তু তিনি পেলেন না সে অভীপ্সিত খ্যাতি ও সম্মান। মনের মধ্যে তাঁর প্রবেশ করল হিংসার কালকূট। হাতেমের মত খ্যাতি ও সুনাম অর্জনে ব্যর্থ হয়ে, নৌফেলের মন বিষিয়ে উঠল হাতেমের বিরুদ্ধে। তিনি প্রতিহিংসাপরবশ হয়ে হাতেমের প্রতি ক্রুর হিংস্র আচরণে প্রবৃত্ত হয়ে নেমে গিয়েছিলেন একেবারে পশুর স্তরে। তারপর হাতেমেরই মহিমান্বিত চরিত্রের প্রভাবে সে হিংস্রতার অন্ধত্ব কাটিয়ে বাদশা জেগে উঠলেন মনুষ্যত্বের আলোকে। য়েমনী বলদর্পী নৌফেল বাদশার অপরূপ কাহিনীই বহু শতাব্দীর ঢেউ পার হয়ে কবির মনের দ্বারে এসে ধাক্কা দিয়েছে। এ কাহিনী একটা অসাধারণ তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছে কবির কাছে। কবির মতে এ কাহিনী 'ঝঞ্ঝা ঝড়ে ঘূর্ণাবর্তে' বিপর্যস্ত মানুষের নিকট এক অমলিন আশার বাণীর ন্যায় জেগে উঠেছে, মানুষেরই গানরূপে। অতএব আমাদের কবির কাছে এটি একটি অত্যন্ত আদরণীয় কাহিনী। ফররুখ আহমদ একজন যথার্থ সৎকবিরই ন্যায় নৌফেল ও হাতেমের এ অপরূপ কাহিনী অবলম্বনে আলোচ্য কাব্যনাট্যে মহৎ জীবনের গাথা রচনা করেছেন। উপযুক্ত ভাষা ও ছন্দেই তিনি সে কাহিনী গেঁথেছেন। এ কাহিনী যথার্থই মানবতার গান বটে। আর এ গান উৎসারিত হয়েছে কবি-আত্মায় গভীর থেকে, জীবনেরই স্বাভাবিক দাবীতে। মানবপ্রেমিক হাতেম ও প্রবল প্রতাপশালী যশোলিপ্সু নৌফেলের দ্বন্দ্বের মধ্যে আমরা আমাদের জটিল দ্বন্দ্বায়িত জীবনেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করি। আলোচ্য-কাব্যনাট্য 'নৌফেল ও হাতেম'-এর দ্বন্দ্বমুখর কাহিনী একটা সুদূরপ্রসারী প্রতীকী তাৎপর্য লাভ করেছে। প্রেম ও প্রতাপ, ত্যাগ ও ঐশ্বর্যবিলাস, নিঃস্বার্থ সেবা ও দাক্ষিণ্যের দম্ভ, ক্ষমা ও হিংস্র ক্রুরতা, সার্বিক সাম্যচেতনা ও আভিজাত্যের গর্ব, উদার মানবিকতা ও চরম পশুত্বের বিপরীত প্রকৃতির সমাবেশে সদা আবর্তময় শক্তির-প্রকৃতি। অন্ধকার তমিস্রার দিকে ভ্রান্তিবশে ধাবিত হলেও শেষ পর্যন্ত মানবাত্মা আলোকেরই অভিসারী। তাই তো ঝন্‌ঝাবিধ্বস্ত, বাত্যাপীড়িত শ্রান্ত মানুষের কণ্ঠে যুগে যুগে ধ্বনিত হয়ে এসেছে আশার 'অমলিন গান'। এ জীবন সত্যই নৌফেল ও হাতেমের সংঘাতসংক্ষুব্ধ জীবনকাহিনীর প্রতীকী আধার আলোচ্য কাব্যনাট্যে রূপ লাভ করেছে। নৌফেল ও হাতেমের পরস্পর প্রতিবাদী জীবনধারার সংঘাতের মধ্য দিয়ে উদ্দিষ্ট জীবনসত্য আভাসিত হয়ে উঠেছে বলেই এতে স্বাভাবিকভাবেই নাট্যরস জমে ওঠারও অবকাশ ঘটেছে। 'নৌফেল ও

www.pathagar.com

হাতেম' গ্রন্থটিকে কাব্যনাট্য বলতে তাই কোন দ্বিধা থাকার কথা নয়, কারণ এতে কবির অনুভব-জীবন বাস্তবের অভিজ্ঞতা থেকেই উৎসারিত বলে কাব্যধর্মে ও নাট্যধর্মে একটা সাযুজ্য দেখা দিয়েছে। তবে কাব্যনাট্য হিসেবে 'নৌফেল ও হাতেম' কতটা সার্থক হয়েছে তা স্বতন্ত্র কথা।

'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যের পরিকল্পনামূলে যে কবির মজ্জাগত ঐতিহ্যবোধ ও আদর্শ-প্রীতি কাজ করেছে তা প্রথমদিকে ততটা স্পষ্ট না হলেও, শেষদিকে প্রায় স্পষ্টরূপই ব্যক্ত হয়েছে। কাব্যনাট্যের সমাপ্তিতে কবি যখন হাতেম চরিত্রের মহিমা-স্মরণ করে বলেন, 'কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়,' শুধু হাতেমের মত 'নিঃস্বার্থ ত্যাগী, কর্মী ও সেবাব্রতী' মানুষই জাগাতে পারে তমিস্রানির্জিত জাতিকে, তখন কবির মনোগত অভিপ্রায়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কবি মুসলিম নবজাগরণের যে স্বপ্নকে সার্থক করে তোলার জন্যে 'সিরাজাম মুনীরা'র ইসলামী রাষ্ট্র গঠনের আবশ্যকতা সম্পর্কে নিজ মনোভাব অসংকোচে প্রকাশ করেছিলেন, সে মনোভাবেরই পরিপূরকরূপে 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে ইসলামী রাষ্ট্র গঠনেরই একটি বাস্তব পথনির্দেশ করেছেন। কবির বিশ্বাস, হাতেমের মত নিঃস্বার্থ, সেবাব্রতী, মুমিন, মুজাহিদ ও প্রেমপন্থী মুসলমানই কেবল পারে ঐরূপ একটি মহৎ আদর্শকে বাস্তব রূপ দিতে। বস্তুত নাট্যকারের জীবনভাবনার চেয়ে কবির আদর্শ ভাবনাই এ গ্রন্থে শেষ পর্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে। সেখানেও কাব্যপন্থার চেয়ে সামাজিকের আদর্শ কর্মপন্থার দিকেই তিনি ঝুঁকে পড়েছেন। নাট্যকারের মত জীবনকে তিনি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত মুঠোর মধ্যে ধরে রাখতে পারেন নি। জীবনভাবনা অনেক অনেক ক্ষেত্রেই আদর্শভাবনার তোড়ে তলিয়ে গেছে। এ আদর্শ ভাবনা যদি জীবনের সমসূত্রেই এসে যেত, তাতে আপত্তি থাকত না ; কিন্তু কার্যত: 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে যা ঘটেছে, তা হচ্ছে ঃ কবি জীবনের থেকে অনুভবের দিকে অগ্রসর না হয়ে, অনুভব থেকেই জীবনের দিকে অগ্রসর হতে চেয়েছেন। এটা কাব্যনাট্যের নাট্যধর্মকে যথেষ্টই ক্ষুণ্ন করেছে। প্রথম থেকেই একটা জিনিস স্পষ্ট হয়ে দেখা দিয়েছে যে, কবি একটি সুন্দর মানবিক জীবনাদর্শকেই 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। এ আদর্শভাবনার পরিস্ফুটনের প্রয়োজনেই তিনি 'নৌফেল ও হাতেম'-এর অপরূপ দ্বন্দ্বমুখর কাহিনীটি আশ্রয় করেছেন। তবু এ কথা সত্য যে, স্বাভাবিকভাবেই এ কাব্যনাট্যের অনেক অংশ জীবনধর্মের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে কিছুটা নাটকীয়তাও দেখা দিয়েছে। হাতেমের সুখ্যাতি শ্রবণে নৌফেলের ঈর্ষা, সেই সুখ্যাতি অর্জনের উদগ্র বাসনার তাড়নায় হাতেমের সাথে নৌফেলের অহেতুক দ্বন্দ্ব সৃষ্টি, সে দ্বন্দ্বে নৌফেলের আত্মার চূড়ান্ত পরাভব ও তজ্জনিত অন্তর্জ্বালা রূপায়ণে মাঝে মাঝে উচ্চস্তরের নাটকীয় আবেগের সৃষ্টি হয়েছে, স্বীকার করতে আপত্তি থাকা উচিত নয়। তবু সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে শেষ পর্যন্ত কবির আদর্শভাবনার সুরটাই যেন প্রবল হয়ে উঠেছে

www.pathagar.com

এ কাব্যনাট্যে। তার মানে এই নয় যে, কাব্যধর্মই এখানে জয়যুক্ত হয়েছে। একটা মনোগত আদর্শ ভাবনার পোষকতা করতে গিয়ে কবিত্বের প্রকাশও সর্বত্র অবারিত হতে পারে নি। তবে একথা বলা অসমীচীন হবে না যে, এ 'কাব্যনাট্যে' নাট্যধর্ম পুরোপুরি রক্ষিত না হলেও, কাব্যধর্ম কখনই একেবারে নাট্যধর্মকে আচ্ছন্ন করে মাথা তুলে দাঁড়ায় নি।

এবার আমরা 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যের চরিত্র-পরিকল্পনা, ভাষা ও সংলাপ সম্পর্কে আলোচনা করবো। স্বল্প সংখ্যক চরিত্রের সমবায়ে গঠিত এ কাব্যনাট্যে মাত্র দুটি চরিত্রই সর্বত্র প্রাধান্য বিস্তার করেছে। সে দুটি চরিত্র হচ্ছে কাহিনীর নায়ক 'নৌফেল' ও প্রতিনায়ক 'হাতেম'। গ্রন্থের নামকরণে প্রকৃতপক্ষে এ দুটি চরিত্রের প্রাধান্যেরই স্বীকৃতি ঘটেছে। দুটি চরিত্রের মধ্যে 'নৌফেল' চরিত্রাংকনেই ফররুখের কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে সবচেয়ে বেশী। এ চরিত্র কোন বিশেষ ভাবনার নির্জীব প্রতীক মাত্র হয়ে দাঁড়ায় নি, সজীব মনুষ্যচরিত্রেরই মহিমা লাভ করেছে। প্রথম থেকেই শেষ পর্যন্ত নৌফেল একটি রক্তমাংসের তাজা মানুষ হয়েই দেখা দিয়েছে। বিপুল ঐশ্বর্য, অতুল প্রতাপের অধিকারী নৌফেলের অদ্ভুত যশোলিপ্সা কিভাবে তাঁকে 'দারাজদিল' হাতেম তা'য়ীর প্রতি ঈর্ষান্বিত করে তুলে ধাপে ধাপে পশুত্বের স্তরে নামিয়ে এনেছে, তা কবি সূক্ষ্ম মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের নৈপুণ্য সহকারে প্রদর্শন করেছেন। সর্বনাশা খ্যাতি-লাভের নেশায় নৌফেল আত্ম-অবক্ষয়ী মানবতা-বিরোধী কর্মের কুটিল পথ আশ্রয় করে বিষিয়ে তুলেছিলেন নিজের সমগ্র জীবনকে, নিজের অস্তিত্বকে করে তুলেছিলেন দুর্বহ, হারিয়ে ফেলেছিলেন জীবনের প্রশান্তি, তা কবি অতি সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টি সহকারে বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন। তারপর কেমন করে নৌফেল হাতেমের মহৎ চরিত্রের 'ইশারা' গ্রহণ করে জেগে উঠলেন জীবনের সূর্যালোকে, তাও কবি অতি সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন। নৌফেলের অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনায় জীবনশিল্পী ফররুখ যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন, তা স্বীকার না করে উপায় থাকে না। মোট কথা, এ চরিত্রাংকনে ফররুখ ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারসুলভ বাস্তব দৃষ্টির সাথে কবিসুলভ সূক্ষ্ম অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়েছেন বলতেই হয়। কিন্তু তুলনামূলকভাবে হাতেম চরিত্রাংকনে ফররুখ তেমন কোন সার্থকতা লাভ করতে পারেন নি। হাতেম চরিত্র একটা আদর্শের নির্জীব প্রতিমূর্তি হয়ে দেখা দিয়েছে। তাকে কখনই রক্তমাংসের মানুষের মত বাস্তব বলে বোধ হয় না। লক্ষ্য করার বিষয়, নাটকে হাতেম চরিত্র প্রায়শঃই নেপথ্যাশ্রয়ী। লোকমুখে ভেসে আসে তাঁর সুখ্যাতির কথা, আর তাই আমাদের মনের কোণে উজ্জ্বল বিভায় মূর্ত করে তোলে এক সেবাব্রতী মানববন্ধুর রূপকে। নৌফেল তাঁর সৌভাগ্য ও সুনামের এই কাল্পনিক প্রতিবাদীকে চোখে বড় একটা দেখেন নি, যখন দেখতে পেলেন তখন তিনি হয়ে দাঁড়ালেন রাহুমুক্ত চাঁদের মত মনুষ্যত্বের বিভায় উজ্জ্বল। এ নাটকে আমরা তাঁর

সাক্ষাৎকার পাই মাত্র চারটি দৃশ্যে—একবার নৌফেলের ইয়েমেন মুল্লুক আক্রমণের পূর্বমুহূর্তে বৃদ্ধ বাদশাহ তায়ীর সাথে কথোপকথনরত অবস্থায়, একবার প্রাচীন কোন শহরের রাজপথে রুগ্ন গরীব এক মুটের বোঝা বহনরত অবস্থায়, আর একবার পাই নৌফেলের রাজ্যে বনপথে কাঠুরিয়া-দম্পতির সাথে সাক্ষাৎ ও তাদের কাছে স্বেচ্ছায় বন্দীত্ব বরণের দৃশ্যে এবং সর্বশেষে পাই নৌফেলের দরবারে বৃদ্ধ কাঠুরিয়ার বন্দী হিসেবে হাজির হয়ে আপন শিরের জন্যে ঘোষিত পুরস্কারের টাকা বৃদ্ধকে দান করার জন্যে নৌফেলকে অনুরোধ করতে উপস্থিত অবস্থায়। সর্বত্রই লক্ষ্য করা যায়, তিনি ত্যাগ, ক্ষমা, স্নেহ, প্রেম, সেবা, ভালবাসা দিয়ে মানুষের হৃদয় জয়ের সাধনায় রত। দীন-দুনিয়ার কল্যাণ-ভাবনা ছাড়া জীবনে তাঁর কোন ভাবনাই নেই। তিনি স্নেহ, প্রেম, ভালবাসা ও করুণায় বিগলিত-চিত্ত একটি অতি সুন্দর মানুষ। সেবাধর্মের মহিমায় তাঁর অটল বিশ্বাস। শত্রুমিত্র নির্বিশেষে তিনি সকলের জন্যে বোধ করেন মমত্ব। সামান্যতম বিরূপতা জাগে না তাঁর প্রাণে কারও সম্পর্কে। নৌফেল তাঁকে রাজ্যছাড়া, গৃহহারা করেছেন, তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করেছেন, তার পরিবর্তে হাতেম শুনিয়েছেন তাঁকে প্রেম ও কল্যাণের বাণী। যে খ্যাতির জন্যে তাঁর বিরুদ্ধে নৌফেলের সংগ্রাম, সে সংগ্রামেও হাতেম নির্বিকার। হাতেম এক অটল, অনড় আদর্শ-বিশ্বাসী মানুষ। আলোচ্য নাটকে তিনি সব মানবিক সদগুণেরই যেন একটি প্রতিমূর্তিরূপে উপস্থিত। কোন মানবিক দুর্বলতা ও বিকার এ চরিত্রে লক্ষ্য করা যায় না। হাতেম চরিত্র তাই একটা 'আইডিয়া'-রূপেই যেন এ কাব্যে দেখা দিয়েছে ; ঠিক রক্তমাংসের মানুষ হয়ে দেখা দেয় নি। চরিত্রটি নিঃসন্দেহে একমাত্রিক—অতএব অতিমানবীয়। এ কাব্যনাট্যে কবি বোধ হয় সর্বাধিক কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন অতি সাধারণ স্তরের নরনারীর চরিত্র-চিত্রণে। স্বল্পাক্ষরে অংকিত এ চরিত্রগুলোর মুখে তিনি যে প্রাণবন্ত সংলাপ জুড়ে দিয়েছেন তাতেই এরা জীবনলাভ করেছে। প্রসঙ্গত গুপ্তচর চরিত্র, মুটে, বৃদ্ধ কাঠুরিয়া, তার স্ত্রী-পুত্রাদির চরিত্রগুলোর কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নওফেলের উজীর, সিপাহসালার, আমীর, শায়ের, ভাঁড়, মোসাহেব, ইয়েমেনের বৃদ্ধ বাদশাহ ইত্যাদি চরিত্র বিশেষত্ববর্জিত। মুর্শিদের সত্যনিষ্ঠ চরিত্রের দৃঢ়তাব্যঞ্জক মূর্তিটি অবশ্য মন্দ হয় নি। নারী চরিত্রের প্রায় অনুপস্থিতি এ কাব্যনাট্যের আর একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। একমাত্র নৌফেল বাদশাহর 'বেগম' চরিত্রটি ছাড়া উল্লেযোগ্য নারীচরিত্র এ নাটকে নাই বললেই চলে। তাও আবার 'বেগম' চরিত্রটির ভূমিকা নিতান্তই গৌণ এবং অনুল্লেখযোগ্য। নাটকের নায়ক চরিত্রের বিবর্তনে তাঁর একটি ক্ষুদ্র ভূমিকা আছে, শুধু এটুকু আমরা তাঁর সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলতে পারি। তবে মূলত নেপথ্যাশ্রয়ী চরিত্রের ভূমিকাই সে পালন করেছে।

www.pathagar.com

কাব্যনাট্যের সার্থকতার জন্যে একটি অবশ্যপূরণীয় শর্ত হচ্ছে ঃ উপযুক্ত কাব্যসংলাপে সৃষ্টির ক্ষমতা শিল্পীর থাকতে হবে। এ সংলাপ কাব্যধর্মী হয়েও লোকবাহন ভাষা থেকে খুব দূরে সরে যাবে না। কাব্যের কল্পজগতের দাবী যেমন সে পূরণ করবে, তেমনি জীবনের বাস্তবতার দাবীকেও তার পূর্ণ মূল্য দিতে হবে। তাই কাব্যনাট্যের শিল্পীকে গদ্য-পদ্যের ভেদ অনেকটা ঘুচিয়ে লোকবাহন ভাষার স্পন্দন বজায় রেখে এমন এক বাকপ্রতিমা নির্মাণে সমর্থ হতে হবে যা কল্পজগতের দাবী মিটিয়েও জীবন-বাস্তবতার দাবীকে পূর্ণ মূল্য দিতে অপারগ হবে না। আমাদের মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যেও লক্ষ্য করি কবিরা পয়ারে লোকবাহন ভাষার স্পন্দন বজায় রেখেও তাতে অনেকটা কাব্যমাধুর্য সঞ্চারে সমর্থ হয়েছিলেন। মাইকেল সেই পয়ারকেই অমিত্রাক্ষরের গতিরথে স্থাপন করে তাতে এনে দিয়েছিলেন এক আশ্চর্য প্রাণবন্যা। মহান শিল্পী মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দে লোকবাহন ভাষার স্পন্দনটি যেমন রক্ষা করতে পেরেছিলেন, তেমনি তাতে মানবীয় সুকুমার অনুভূতি ও আবেগগুলোর কাব্যকলাসম্মত প্রকাশকেও অবারিত করে দিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তিনি তাঁর 'মেঘনাদ বধ' কাব্যে এবং পরবর্তীকালে 'বীরাংগনা' কাব্যে জীবনের আশ্চর্য নাটকীয় মুহূর্তগুলোকে অমিত্রাক্ষরের তীব্র গতির রথে চড়িয়ে ছেড়ে দিয়েছেন বলেই তা আমাদের মনকে অতটা স্পর্শ করেছিল। কবিত্বের দাবী মেনে নিয়েও তাঁর কাব্যের ভাষায় লোকবাহন ভাষার প্রাণস্পন্দন বজায় রাখার শিল্পকৌশল মধুসূদনের করায়ত্ত ছিল। ফররুখ আহমদ কাব্যনাট্যে সংলাপ রচনার উপযুক্ত পূর্বসূত্র খুঁজে পেয়েছিলেন মধুসূদনের কাব্যে। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দ কাব্যের মধ্যে আবেগের বেগ যেমন সঞ্চার করেছিল, তেমনি জীবন-বাস্তবতার সাথে কবিতার মিতালী স্থাপনেও সমর্থ হয়েছিল। কারণ এ ছিল এমন এক ছন্দ যা স্বচ্ছন্দ গতিপ্রবাহে কল্পজগত ও বাস্তব জগতকে অনায়াসে মিলিয়ে মিশিয়ে একাকার করে দিতে পারত। ফররুখ আহমদ কাব্যসংলাপ রচনার চাবিকাঠিটি পেয়েছিলেন মধুসূদনেরই 'মেঘনাদ বধ' কাব্য ও 'বীরাংগনা' কাব্যের অপরূপ কাব্যছন্দে। তবে ফররুখ পূর্বসূরীর ঋণকেই পুঁজি বলে সার করেন নি। তিনি তাকে নতুনতর প্রয়োগ নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে কতকটা স্বতন্ত্র মহিমা দান করতে পেরেছেন। মাইকেল অমিত্রাক্ষরের প্রাণপুরুষকে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষরের কাঠামোর মধ্যেই মুক্তি দিয়ে আপনার কাব্যভাবনার প্রকাশকে অবারিত করতে পেরে স্বস্তিবোধ করেছিলেন। ফররুখ আহমদ চৌদ্দ অক্ষরের পরিবর্তে অঠোর অক্ষরের মহাপয়ারের দীর্ঘায়িত কাঠামোকে আশ্রয় করে তাতেই অমিত্রাক্ষরের স্বাধীন গতি সঞ্চারিত করেছেন। অবশ্য আঠার অক্ষরের মহাপয়ারের কাঠামো প্রয়োগেও তিনি পূর্বসূরী অনেক কবির সমর্থন পেয়েছেন। তথাপি ফররুখের কৃতিত্ব এখানে খুব অল্প নয়। বিশেষত কাব্যনাট্যের বিরলক্ষেত্রে এ মহাপয়ারের কাঠামো নির্ভর অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রয়োগ ফররুখ আহমদ

www.pathagar.com

ছাড়া অন্য কেউ বড় একটা করেন নি। ছন্দের আধুনিক পরিভাষায় এ ছন্দকে প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত বললেই যথার্থ বলা হয়। জীবনের ক্রীড়াশীল চঞ্চল রূপের প্রকাশে যেমন এর অপরূপ সামর্থ্য রয়েছে, তেমনি রয়েছে এর গভীর তলদেশের ভাবনার মুক্তারাজিকে বহন করে পথচলার ক্ষমতা। তথাপি মাইকেলের সিদ্ধি ফররুখের ছন্দে নির্মাণ সাধনায় পরিপূর্ণ রূপে দেখা দেয়নি বলেই মনে হয়। এর প্রথম কারণ, বাংলা অমিত্রাক্ষর ছন্দ স্বাভাবিকভাবেই চৌদ্দ অক্ষরের অনতিপ্রসারিত গণ্ডীর মধ্যেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে বেশী, অষ্টাদশ অক্ষরের দীর্ঘায়িত পঙক্তিতে এর প্রাণবায়ু যেন নিঃশেষিত হয়ে আসে। দ্বিতীয় কারণ, ধ্বনি মাধুর্যপূর্ণ শব্দ চয়নে মাইকেলের অসাধারণ নৈপুণ্য ফররুখের অনেকটাই অনায়ত্ত থেকে গিয়েছে। যদিও নতুন শব্দ চয়নে ফররুখ যথেষ্ট উৎসাহী এবং বাংলা কাব্যের ভাষায় বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটানোর স্বতন্ত্র সাধনায় সদা নিয়োজিত। তথাপি, এ ক্ষেত্রে বৃহত্তর কোন সার্থকতার সম্ভাবনা আজও প্রকট হয়ে ওঠে নি। আমাদের বিশ্বাস, ফররুখ নিজেই সে সম্ভাবনার দ্বার অনেকটা অবরুদ্ধ করে দিয়েছেন। তিনি কাব্যে 'ইসলামী' আবহ সৃষ্টির অজুহাতে পুঁথি সাহিত্যের ভাণ্ডার থেকে অজস্র প্রচলিত-অপ্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। নীতিগত দিক থেকে এ প্রয়োগে আপত্তি থাকা উচিত নয়, যদি সে প্রয়োগ কবির কাব্যভাবনাটিকে সুন্দরতর রূপে ফুটে উঠতে সাহায্য করে। ফররুখের কাব্যে ক্ষেত্রবিশেষে এ প্রয়োগ সুষ্ঠু হলেও, অনেক ক্ষেত্রেই কাব্যের ধ্বনি-সৌন্দর্যকে ব্যাহত করেছে বলে মনে হয়। বাংলা-কাব্যের ভাষা আজ যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে তাতে ভাষাতাত্ত্বিক কারণেই আরবী-ফার্সী শব্দের যথেচ্ছ বুকনি দেওয়া সম্ভব নয়। ফররুখ এ নির্মম সত্য বিস্মৃত হয়ে আপন কবিত্ব শক্তির উপর কিছুটা অবিচার করেছেন বলে মনে করার সংগত কারণ রয়েছে। শক্তিমান কবি ও ভাষাশিল্পী তিনি, তাতে সন্দেহ নেই। তাই পুঁথি-সাহিত্যে ব্যবহৃত আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগ তাঁর কাব্যনাট্যে নতুন ছন্দ-কাঠামো আশ্রয় করে কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে, এটা ঠিক ; কিন্তু ভাবের ন্যায় ভাষার ক্ষেত্রেও বিপ্লব ঘটানোর সজ্ঞান প্রয়াসে তিনি মাঝে মাঝে আপনার শিল্পী-সত্তাকে চোখ ঠাউরেছেন। বহুক্ষেত্রে শৈল্পিক ঔচিত্যবোধ বিসর্জন দিয়ে অপ্রচলিত, দুরূহ আরবী-ফার্সী শব্দের প্রয়োগে অকারণ উৎসাহ দেখিয়েছেন। সে সব ক্ষেত্রে কবির শব্দ প্রয়োগ বিশেষ উদ্দেশ্যমূলকতা দোষে দুষ্ট। কবি ভুলেই গিয়েছেন যে, এক ভাষার দেহে অন্য ভাষার শব্দ প্রয়োগের একটা সীমা আছে, সে সীমা অতিক্রম করতে গেলে শিল্পীর শিল্প-প্রচেষ্টা অনিবার্যভাবে ব্যাহত হয়। অবশ্য নতুনের প্রয়োগ-নিরীক্ষায় এ ধরনের ভ্রান্তি দেখা দেওয়া অস্বাভাবিক নয়। তবে আমাদের বক্তব্য হচ্ছে, আধুনিক বাংলা কাব্যে নতুনের পথিকৃৎ এ কবি তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যে আপন আদর্শভিত্তিক কাব্যসাধনার উন্মেষলগ্নে ভাষাশিল্পী হিসেবে যে দুর্লভ ক্ষমতার পরিচয় নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁর এ ভ্রান্তি আমাদের বিস্মিত না

www.pathagar.com

করে পারে না। তিনি কোন্ মহত্তর উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্যে আপনার শিল্পবোধকে এভাবে বিড়ম্বিত করেছেন, তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

তবু আলোচ্য কাব্যনাট্যে উপযুক্ত ভাষা ও ছন্দের সমবায়ে উৎকৃষ্ট কাব্যসংলাপ গড়ে তোলার ক্ষমতার নজীরও অপ্রতুল নয়। অনেক ক্ষেত্রে ছন্দ-প্রবাহে সমন্বিত হয়ে অনেক দুরূহ, অপ্রচলিত আরবী-ফার্সী শব্দও একটা সহজগ্রাহ্যতা লাভ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে তিনি শব্দ প্রয়োগে শিল্পীসুলভ অপক্ষপাত মনোভাবের পরিচয় দিয়ে তৎসম, তদ্ভব, আরবী-ফার্সী শব্দের সমবায়ে চমৎকার প্রাণবন্ত সংলাপ রচনায় সমর্থ হয়েছেন, যেমন তৃতীয় অংকের তৃতীয় দৃশ্যে নৌফেলের সুতীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের বর্ণনায়। আমরা উদাহরণস্বরূপ কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করছি ঃ

সংশয় সন্দেহ মনে দোলা দেয় জুলমাতের তীরে
অনিশ্চিত। অনিশ্চিত অন্ধকারে কাফেলা যেমন
মঞ্জিলের রাহা ভুলে দীর্ণ হয় তীব্র বচসায়
বিচ্ছিন্ন, বিভিন্ন পথে; তিক্ত চিন্তা তেমনি প্রাণের
নিয়েছে প্রশান্তি কেড়ে সংশয়-বিদীর্ণ এ জীবনে।
শান্তি নাই, স্বস্তি নাই সুপ্তিহীন রাত্রির প্রহরে।

*

কেটেছে অনেক রাত তন্দ্রাহীন, এ রাত্রিও যাবে
নির্ঘুম, পাব না আমি এ রাত্রেও সান্ত্বনা ঘুমের
—স্বপ্নময়। ঘুমাবে পৃথিবী, পাখী, সুপ্তির অতলে
ডুবে যাবে সব প্রাণী; শিশু কিম্বা দরিদ্র মিস্‌কীন
ঘুমাবে শান্তির কোলে ;—ঘুমাবে রোগীও। জেগে রবে
ব্যর্থ আকাঙ্ক্ষায় শুধু স্বস্তিহীন মস্তিষ্ক আমার।

বস্তুত 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে এ ধরনের প্রাণবন্ত সংলাপ একেবারে দুর্লভ নয়। তবে একথাও ঠিক, প্রধান চরিত্রগুলো অপেক্ষা অপ্রধান চরিত্রগুলোর মুখে যোজিত সংলাপেই সাধারণত ফররুখের সার্থকতা বেশী দেখা দিয়েছে। প্রধান চরিত্রগুলোর মুখ দিয়ে কবি প্রায়শই আপন মনোগত আদর্শ, ধর্মবোধ ও নৈতিক ভাবনা প্রচারণার প্রয়াস পেয়েছেন। তাতে করে চরিত্রগুলো সজীব রক্তমাংসের মানুষ না হয়ে প্রায়শই ভাবের বাহন হয়ে উঠেছে। কোন বিশেষ আদর্শের প্রতীক হয়ে উঠেছে। স্বভাবতই এসব চরিত্রের মুখে যোজিত সংলাপে কবিত্বের আবেগ সঞ্চারিত করে দিয়ে কবি তত্ত্ব ও আদর্শ ভাবনার নীরসতাকে অনেকটা কাটিয়ে ওঠার প্রয়াস পেয়েছেন। এসব ক্ষেত্রে লক্ষ্য করি জীবন-ভাবনার চেয়ে আদর্শ ভাবনায়ই কবির উৎসাহ বেশী; অতএব নাটকের দিক থেকে এসব চরিত্রের মহিমা অনেকটাই ক্ষুণ্ন হয়েছে। অবশ্য নায়ক চরিত্র

www.pathagar.com

'নৌফেল' এর একটি সুখকর ব্যতিক্রম। অপ্রধান চরিত্রের ক্ষেত্রে ফররুখ কবিত্বের, আদর্শ ভাবনার দায়িত্ব স্বীকার করে নেন নি বলেই সে চরিত্রগুলো যথার্থই রক্তমাংসের মানুষ হতে পেরেছে এবং নাটকে তাঁদের ভূমিকা জীবন্ত মানুষের মতই বাস্তবতায় আমাদের চমকিত করে। তৃতীয় অংকের চতুর্থ দৃশ্যে দারিদ্র্যক্লিষ্ট বৃদ্ধ কাঠুরিয়া দম্পতির কথোপকথনে, অথবা ঐ একই অংকের প্রথম দৃশ্যের প্রাচীন কোন শহরের রাজপথে' একজন রইস ও রুগ্ন মুটিয়া'র কথোপকথনে ফররুখের নাট্যকারসুলভ বাস্তবদৃষ্টি ও শিল্পবোধের পরিচয় ফুটে উঠেছে দেখতে পাই। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁর 'বাংলা নাট্য সাহিত্যের ইতিহাস'-এ কাব্যনাট্যের সংলাপ-রচনায় ফররুখ আহমদের কৃতিত্বের কথা আলোচনা করতে গিয়ে এ দিকটির প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সংগতভাবেই। মোটকথা এ কাব্যনাট্যের প্রধান চরিত্রগুলোর মুখে সংলাপ জুড়তে গিয়ে কবি আপন মনোগত অভিপ্রায়টিকে স্পষ্ট ক'রে তোলার জন্যেই কবিত্বের, আদর্শভাবনার পথ ধরেছেন, অন্যত্র তিনি, কোন বাধা না থাকায় নাট্যকারের বাস্তব পন্থাকেই বরণ করে নিয়েছেন।

আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে আর একটি বিষয় উল্লেখ করতে চাই। ডঃ ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকে বীরবাহুর মৃত্যুতে শোকার্ত রাবণের বিলাপ থেকে কিছু পঙক্তি উদ্ধৃত করে, তারই পরে পরে 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্য থেকে নৌফেলের অন্তর্দ্বন্দ্ব বিক্ষুব্ধ আত্মার পরিচয়-জ্ঞাপক কিছু কাব্যপঙক্তি সমাবেশ করে বলতে প্রয়াস পেয়েছেন যে, ফররুখের ঐ অপূর্ব কাব্যবোধ দীপ্ত নাটকীয় ভাষার উৎস হচ্ছে মাইকেলের অনুপম ছন্দোময় কাব্যভাষা। এ মন্তব্যের সারবত্তা সম্পর্কে প্রশ্ন না তুলেও আমরা বলতে পারি মাইকেল থেকে ফররুখ পর্যন্ত কাব্যনাট্যের ভাষা বিবর্তনের পথে বেশ কিছুটা স্বতন্ত্র মহিমা লাভ করেছে। কেমন করে সে কথা আগেই বলেছি।

এ আলোচনা শেষে 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যটির শিল্পমূল্য সম্পর্কে আমাদের সিদ্ধান্ত হচ্ছে এই ঃ আরব্য কাহিনী নির্ভর এ গ্রন্থটিতে যথেষ্ট নাট্যগুণ থাকা সত্ত্বেও কবি তাঁর উপযুক্ত সদ্ব্যবহার করেন নি বা করতে পারেন নি। কবির আদর্শভাবনা নাট্যকারের জীবনভাবনাকে অনেকটাই শিথিল করে দিয়েছে। ঐতিহ্যবাদী ও আদর্শের পূজারী কবি কাব্যনাট্য রচনাকালে আদর্শ ভাবনার তোড়ে পড়ে এ সত্যই বিস্মৃত হয়েছেন যে, কাব্যের চৌহদ্দিতে স্থির থেকেও নাট্যরচনা একমাত্র তখনই সম্ভব যখন শিল্পী সমগ্র চেতনা দিয়ে জীবনকে দৃঢ় মুঠোয় ধরে রাখতে পারেন, যখন কবি এ সত্য স্মরণ রাখেন যে, জীবন থেকে অনুভবের দিকেই হয় কাব্যনাট্যের গতি। বিপরীত পন্থা, নাট্যধর্মের অবনতি ঘটায়। ফলে কাব্যনাট্য নামধেয় শিল্পকর্ম মূলত নাট্যকারে রচিত কাব্য হয়ে দেখা দেয়। আলোচ্য 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যেও সেই বিপদ দেখা দিয়েছে।

www.pathagar.com

এক মহৎ জীবনাদর্শের ধ্যানলোক থেকে জীবনের সমভূমিতে নেমে আসার চেষ্টা পেয়েছেন কবি এখানে। অথবা বলা যেতে পারে 'নৌফেল ও হাতেম'-এর দ্বান্দ্বিক জীবন-কাহিনীর রূপক আধারে কবি মূলত আপনার একটি মনোগত আদর্শকেই উজ্জ্বল রূপে তুলে ধরতে প্রয়াস পেয়েছেন। কবির লক্ষ্য ঐ আদর্শটি (তার ভিত্তিভূমি), আবর্তসংকুল মানবজীবন নয়। ঐ আদর্শেই দৃষ্টি নিবদ্ধ বলে, কবি জীবনের দ্বান্দ্বিক রূপ ফুটিয়ে তোলার সুযোগটি হাতের কাছে পেয়েও কাজে লাগাতে পারেন নি। অথচ কাব্যনাট্য রচনার উপযুক্ত কাহিনী, ভাষা ও ছন্দ তাঁর অনায়ত্ত ছিল না। তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে কাব্যনাট্যের ভাষার আশ্চর্য হৃদয়স্পন্দনটি অনুধাবন করতে পেরেছেন, তাকে সার্থকভাবে কাজে লাগিয়েছেনও। কোন কোন দৃশ্যে যথেষ্ট নাটকীয়তা সঞ্চার করতেও পেরেছেন—তবু নাট্যকারের নিরাসক্তি বজায় রাখার অক্ষমতা ও আদর্শ প্রচারের প্রবল উৎসাহে তাঁকে প্রার্থিত সার্থকতা থেকে বঞ্চিত করেছে। তবে একথা বলা নিশ্চয়ই অসমীচীন হবে না যে, 'নৌফেল ও হাতেম' গ্রন্থে ফররুখ কাব্যনাট্যের এক নতুনতর সম্ভাবনার পরিচয় নিয়েই আমাদের সামনে হাজির হয়েছেন। এর কাহিনী, ভাষা ও ছন্দে নাট্যগুণও অনেকটাই দেখা দিয়েছে। যদি তিনি আর একটু মনোযোগী হয়ে নাট্যকারসুলভ নিরাসক্তি বজায় রেখেও আপনার আদর্শ প্রচার প্রবণতাকে আরও কিছুটা সংযত করে কাব্যনাট্য রচনায় অগ্রসর হতে পারতেন, তবে এ ক্ষেত্রে তিনি যে উচ্চস্তরের সার্থকতার অধিকারী হতে পারতেন তাতে সন্দেহ নেই। তাঁর সম্পর্কে একথাই বলা চলে যে, তিনি কাব্যনাট্যের হৃদয়স্পন্দনটি অনুভব করতে পেয়েছেন, কিন্তু তার স্বরূপ যেন পুরোপুরি অনুধাবন করতে পারেননি। এ ক্ষেত্রে তাঁর সাধনা এখনও পর্যন্ত একটা বিচ্ছিন্ন প্রয়াস রূপেই আমাদের সামনে বিরাজ করছে। কারণ কবি এ পথে বেশী দূর অগ্রসর হওয়ার মত কোন আগ্রহ আজ পর্যন্ত দেখান নি।

www.pathagar.com

জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী

ফররুখ আহমদের কবিতা

বাংলা-সাহিত্যের ইতিহাসে বেদনাদায়ক মৃত্যুগুলির মধ্যে নবতম সংযোজন ফররুখ আহমদের মৃত্যু। বয়সের বিচারে নয়। ছাপ্পান্ন বছর পরমায়ু লাভ করেন নি যাঁরা, তাঁদের মধ্যে আছেন মাইকেল, আছেন জীবনানন্দ দাশ। হাসপাতালে বা দুর্ঘটনায় যদিও তাঁর মৃত্যু হয়নি, তবু তাঁর চলে যাওয়া যেমন বেদনাদায়ক, তেমনই চরিত্রসম্মত। কিছুটা সান্ত্বনা হয়তো এখানেই, এই চরিত্রসম্মত মৃত্যুর মধ্যেই। মৃত্যু তাঁকে ছিনিয়ে নেয় নি, মৃত্যুকে তিনি বরণ করেছেন, চরম দারিদ্র্যের মধ্যে, পরম পৌরুষের সাথে, বীরের মতো, সম্রাটের মহিমায়। জাগতিক রিক্ততার মধ্যে চিত্তের যে ঐশ্বর্য নিয়ে তিনি বেঁচে ছিলেন, মৃত্যু সেই জীবনের শেষ গৌরব হয়ে দেখা দিয়েছিল। কৃপা, করুণা, সহানুভূতি মৃত্যুর সেই রাজসিক গাম্ভীর্যের কাছে ঘেঁষতে পারেনি। হাতেমের স্রষ্টার মধ্যেই ছিল হাতেমের মহত্ত্ব।

একটা মতবাদ একালে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে ঃ কবিতাকে কবির জীবন থেকে, সমসাময়িক ইতিহাস থেকে, শিল্পের অপরাপর সম্পর্ক থেকে আলাদা করে দেখা যায়, দেখা কর্তব্য। বিবেচনার বিষয় শুধুই সৃষ্টি—আর কিছু নয়। এ মতবাদের বক্তব্য আমরা জানি। কবিতাকে তার শুদ্ধ সত্তায় দেখতে পারলে লাভ আছে; অন্তত বিবেচনার মধ্যে বিবেচ্য বস্তুটিকে কেন্দ্রচ্যুত হতে হয় না। তবু প্রশ্ন থেকে যায়, যে বস্তু স্বয়ম্ভূ নয়, তার স্বনির্ভরতার দাবী আমরা কতোদূর মানতে পারি। রচনার পিছনে যে জীবন ও জগৎ তার পটভূমি হয়ে আছে, তার অবর্তমানে রচনা মাত্রই কিছুটা দরিদ্র। এ দেশে আমরা কবি-জীবনের কিংবদন্তীতে যেমন কৌতূহলী কবি-জীবনের সত্য এবং সম্পূর্ণ সত্য—বিষয়ে ততোটা নই। কারণ আগ্রহের অভাব নয়, কারণ আমাদের প্রাচ্য দেশীয় ভীরুতা, যা সম্মান ও সম্ভ্রমবোধের ছদ্মবেশে আমাদের সমর্থন খোঁজে।

ফররুখ আহমদের মৃত্যু তাঁকে ফিরিয়ে দিয়ে গেল। তিনি উদ্ধৃত হলেন এক অসহনীয় অবহেলা, এক হীনমন্য অনুল্লেখতার আড়াল থেকে। দুর্ভাগ্য এই যে তাঁর কীর্তনে যেমন, তেমনি তাঁর নির্বাসনেও কাজ করেছে এমন বিবেচনা ও প্রবণতা, যা অসাহিত্যিক, যার জন্ম দলীয় কোন্দলে, বিদ্বেষে, অসহিষ্ণুতায়। এজন্য প্রয়োজন দেখা দিয়েছে শুদ্ধ সাহিত্যের নিরিখে তাঁকে ও তাঁর কীর্তিকে দেখবার। এবং তাঁকে, তাঁর জীবনকে বাদ দিয়ে তাঁর কবিকর্মকে দেখা যাবে না। তাঁর কবিতা ও তাঁর জীবন

www.pathagar.com

পরস্পরের ভাষ্য হিসেবে কাজ করে। বিশেষত এ জন্যই যে তাঁর কবিতা নিয়ে যতো বিতর্ক, সব তাঁর জীবনের মধ্যেই নিহিত। মঞ্চলোকের জীবন যদিও তাঁর নয়, বরং নেপথ্যচারীই তিনি ছিলেন, তবু এই জীবনের মধ্যেই ছিল এক অসামান্যতা, যার সাথে তাঁর সৃষ্টির অসামান্যতা এক ও অভিন্ন।

অন্য এক নিবন্ধে আমি ফররুখ আহমদকে এবং সঙ্গে সঙ্গে নজরুল ইসলামকেও—বাংলা কবিতার ইতিহাসে ব্যতিক্রমী পুরুষ বলে চিহ্নিত করেছি। এ দিয়ে আমি শুধু বলতে চেয়েছি যে এই দু'জন এঁদের কালের মুখ্য-প্রবণতার অন্তর্গত নন। এবং প্রত্যেক যুগেই সাহিত্যের একটা মুখ্য-প্রবণতা থাকে। সেই প্রবণতাই সেই যুগের 'আধুনিকতা', যা একটা পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত ধারণা। বাংলা কবিতায়, তিরিশের দশকের 'আধুনিকতা' তার পূর্বের কয়েক দশকের 'তুলনায়' বা 'পরিপ্রেক্ষিতে' আধুনিকতা, যার চরিত্র দু'এক কথায় বলে দেওয়া যায় না। কারণ এই আধুনিকতার মধ্যে জায়গা পেয়েছিল বিভিন্ন উপাদান, যার একটার সাথে অন্যগুলির কোন আবশ্যিক মিল ছিল না। মিল ছিল শুধু একটি জায়গায় শব্দের, প্রকাশের ও অনুভবের সীমানাকে এর সবগুলি উপাদানই কিছুটা সম্প্রসারিত করে দিয়েছিল।

এই মূল প্রবণতার বাইরে যাঁরা দাঁড়ান—ইংরেজী সাহিত্যে মিলটন, ল্যানডর, ফ্রস্ট; বাংলা কবিতায় নজরুল, ফররুখ—তাঁদের ব্যতিক্রমিতা আমাদের কাছে একটা প্রশ্নচিহ্ন রেখে যায়। আমরা জানতে চাই এই ব্যতিক্রমিতার কারণ, এবং স্বভাবতই এই কারণের তল্লাশে আমাদের ডুব দিতে হয় তাঁদের ব্যক্তিজীবনে। আমাদের সহজাত বুদ্ধিই শেখায় যে ব্যতিক্রমী মানুষ না হলে ব্যতিক্রমী সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব নয়।

ফররুখ আহমদের প্রথম যৌবনে একটা অলিখিত ও অনুচ্চারিত ঘটনা অবশ্যই ঘটেছিল। না হলে তাঁর কবিতার ধারা অর্থাৎ প্রধান স্রোত অকস্মাৎ এমন ভিন্ন খাতে ছুটে যেত না। এই 'ঘটনা' শুধু তাঁর ক্ষেত্রে নয়, অনেকের ক্ষেত্রেই, আত্মিক। এ যেন মনোজগতের এক আকস্মিক ঋতুবদল, যার কার্য-কারণ জানা যায় না। এ জাতীয় ঘটনা যৌবনেই সচরাচর ঘটে থাকে, অনুর্ধ্ব তিরিশ বছর বয়সে; এবং এটা প্রায়শই—বিশেষত পশ্চিমী দুনিয়ায়—শেষ হয় ধর্মান্তর গ্রহণে। ফররুখ আহমদ তাঁর "হাতেম তায়ী" কাব্যে হুসনা বাবুর জীবনে এই আকস্মিক পরিবর্তন দেখিয়েছেন এবং এর পিছনে এক আঘাতের কথা জানিয়েছেন। যদিও এখানে তিনি নতুন কিছুই উদ্ভাবন করেন নি, তাঁর উৎসকেই অনুসরণ করেছেন মাত্র, তবু আত্মিক ঘটনা হিসেবে এটা হয়তো সমান্তরাল। এবং সেজন্যই অর্থবহ।

কি ঘটেছিল তরুণ ফররুখ আহমদের মনোজীবনে, সে খবর একদিন জানা যাবে। আপাতত এই প্রয়োজনীয় খবরটি আমাদের অজ্ঞাত। ফিনফিনে ধুতি পাঞ্জাবী পরা এক যুবক, যে স্কটিশে, রিপনে পড়ে, ঘুসঘুসে জ্বরে ভোগে, বিপজ্জনক বামপন্থী রাজনীতির

www.pathagar.com

অন্ধকার গলিতে ঘুরে বেড়ায়, কবিতা লেখে, কিন্তু লাবণ্যময়, ইঙ্গিতবহ সূক্ষ্ম শরীর, আধুনিক কবিতা; চেহারায়, চিন্তায়, রচনায় আধুনিক, এবং নাগরিক; বাস করে নাস্তিকতার গভীরে না হলেও সীমান্ত অঞ্চলে—' সে হঠাৎ একদিন রূপান্তরিত হ'ল। রূপান্তরিত হ'ল ভিতরে এবং বাইরে। সে ডুব দিল ধর্মের গভীরে, তুলে নিয়ে এল প্রাচীন পুঁথির পাতা থেকে সিন্দাবাদ সওদাগরকে, ভেসে গেল এবং ভাসিয়ে নিয়ে গেল এক প্রবল আবেগের ছন্দে, এক উজ্জ্বল, উত্তাল মাত্রাবৃত্তের জগতে, যা তাকে সঙ্গে সঙ্গে এনে দিল খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা। তাঁর কবিতার সুর স্থায়ীভাবে চড়া সুরে বাঁধা হয়ে গেল, তাঁর উজ্জ্বল চোখে এল এক উজ্জ্বলতর দৃষ্টি।

এই পরিবর্তিত ফররুখ আহমদকেই আমরা জানি, ঋজু তীক্ষ্ণ সদালাপী কিন্তু আবৃত সংবৃত ও জনতাবিমুখ। অনেকের মধ্যেই থেকেছেন, কিন্তু নির্লিপ্ত, নির্লোভ, নিরাসক্ত। প্রচুর হাসির আড়ালে ঢেকে রেখেছেন নিজস্ব নির্জনতাকে। গণ-জীবনের আন্দোলনে একবারই আন্দোলিত হয়েছিলেন, চল্লিশের দশকের প্রথমার্ধে। তাঁর স্বপ্নের পাকিস্তান যখন বাস্তবে রূপ নিল তখন স্বপ্নের সেই বিকৃতি তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে এল তাঁর নিজস্ব স্বপ্নের জগতে, কিন্তু সেই জগতের রূপরেখা ততোদিন বদলে গেছে। এক দেশাতীত, কালাতীত মানচিত্র ফুটে উঠ্‌ছে তাঁর নৈরাশ্যের অন্ধকার ভেদ করে। স্বপ্নচারী সিন্দাবাদে সেই জাহাজডুবির খবর আমরা জানতে পারিনি, কিন্তু তাঁর প্রমাণ পাওয়া যাবে কবির উত্তর যৌবনের বৎসরগুলির রচনায়। তিনি যে প্রচুরভাবে ব্যঙ্গ কবিতার দিকে ঝুঁকেছিলেন, তার সঙ্গে এ ঘটনার কোন সম্পর্ক ছিল না, কে বলবে?

ফররুখ আহমদের কবি-ব্যক্তিত্ব পরিবর্তনধর্মী নয় কিন্তু পরীক্ষাপ্রবণ। 'সাত সাগরের মাঝি' তাঁর শ্রেষ্ঠ কাব্য এবং ভবিষ্যতের কোন বাংলা কবিতার সংকলনে যদি তাঁর দশটি কি বারোটি কবিতা জায়গা পায়, তবে তার অর্ধেকই আসবে এই একটি গ্রন্থ থেকে—এ সম্বন্ধে আমি প্রায় নিশ্চিত। স্থান-কাল-পাত্রের যে বিরল যোগাযোগ ঘটলে যে কোন ভাষায় শ্রেষ্ঠ কবিতাগুলি রচিত হয়ে থাকে, তাই ঘটেছিল তাঁর যৌবনের অল্প কয় বৎসর সময়ের মধ্যে। এই সময়েই লেখা হয়েছিল শুধু 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাগুলি নয়, অগ্রন্থিত 'হে বন্য-স্বপ্নেরা'র একটি বড়ো অংশ। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় যে সকল কবিতা সংগৃহীত হয়েছে, তার মধ্যে সম্ভবত তিন-চতুর্থাংশই (বেশীও হতে পারে) ১৯৪২ থেকে ১৯৫২ এই দশ বৎসরের মধ্যে রচিত। সংখ্যার দিক দিয়ে বা পরিমাণগতভাবে তাঁর পরবর্তী জীবনের—বাইশ বৎসরের—কবিতার সমান হতে পারে, কিংবা কিছু বেশী, কিংবা কিছু কম—কিন্তু সংকলনযোগ্যতার বিচারে পাল্লার কাঠি প্রথম দশ বৎসরের দিকেই পরিষ্কারভাবে ঝুঁকেছে।

ফররুখ আহমদ মূলত 'সাত সাগরের মাঝি'র কবি। 'সিন্দাবাদ', 'বার দরিয়ায় শেষ রাত্রি', 'ডাহুক', 'পাঞ্জেরী', 'সাত সাগরের মাঝি'—জনপ্রিয়তার বিচারে সম্ভবত

www.pathagar.com

এগুলি এখনও পর্যন্ত অপ্রতিদ্বন্দ্বী। 'লাশ'ও একটি জনপ্রিয় কবিতা, যদিও এর জনপ্রিয়তার কারণ একটু স্বতন্ত্র। এর বক্তব্য খুবই স্পষ্ট এবং বলা হয়েছে তারস্বরে। তেরশ' পঞ্চাশের পঞ্চাশ লক্ষ লাশের মধ্যে একটি লাশ কবিকে দিয়েছে ধিক্কারের ভাষা। লাশটি শুধু উপলক্ষ—শহরের যে নির্বিকার জনস্রোত এই লাশের দিকে একবার না তাকিয়ে চলে যায়, তাদের দিকেই তিনি ছুঁড়ে দেন তাঁর ঘৃণা, তাঁর অভিশাপ। বাঙালী জীবনের এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত এই কবিতায় একটা শাণিত, তীব্র উচ্চারণে ধরা পড়েছে। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্গে তুলনীয় না হলেও অন্যদিক দিয়ে বিশিষ্ট এই কবিতা। 'ডাহুক'-এর বৈশিষ্ট্য বোধ হয় এখানেই যে দু'টি বিখ্যাত ইংরাজী কবিতার প্রতিধ্বনি পুরোপুরি আত্মগত করেও তিনি নিজস্ব ভঙ্গিতে ব্যক্ত করেছেন মানুষের (হয়তো কবিদেরও) অক্ষমতার বেদনা ঃ

তাই তুমি মুক্তপক্ষ নিভৃত ডাহুক
পূর্ণ করি বুক
রিক্ত করি বুক
অমন ডাকিতে পারো। আমরা পারি না।

বিনিদ্র রাতের এক বেদনা-ঘন মুহূর্তে 'সামুদ্রিক অতলতা হতে' উঠে আসে এই 'মৃত্যু-সুগভীর' ডাহুকের ডাক। এবং এই ডাকে যখন 'ঝিমায় তারারা দীপ স্বপ্নাচ্ছন্ন আকাশে আকাশে', তখন, স্বগতোক্তির মতো, একবারই এক ব্যক্তিগত সুরে বেজে উঠে আবার পরক্ষণেই মিলিয়ে যায় ঃ

তুমি কি এখনো জেগে আছ ?
তুমি কি শুনছো পেতে কান ?
তুমি কি শুনছো সেই নভোগামী শব্দের উজান ?

এর আগে, কবিতার চতুর্থ পঙক্তিতেই ছিল এই প্রশ্নের পূর্বাভাস ঃ

ছলনার পাশা খেলা আজ পড়ে থাক

কিন্তু প্রশ্নটিকে জাগিয়ে দিয়েই আবার তাকে ঘুম পাড়িয়ে দেন তাড়াতাড়ি ঃ

ঘুমাক বিশ্রান্ত শাখে দিনের মৌমাছি

রাত্রি, জ্যোৎস্না, ঘন বন, ডাহুকের সুর, একটা অনির্দেশ ব্যথা, টুকরো টুকরো ছবি-
তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ চলে রাত্রির সাগরে

এক বেদনা-বিহ্বলতার আবহ, যা সচরাচর ফররুখের কবিতায় মেলে না, ডাহুকের জনপ্রিয়তার কারণ বলে অনুমান করি। কিন্তু যে মৌলিকতায় তাঁর সিন্দাবাদ বিষয়ক কবিতাগুলি চিহ্নিত, 'ডাহুক'-এ তা নেই। 'স্কাইলার্ক'-এর তীক্ষ্ণ উজ্জ্বল গতি, 'নাইটিংগেইল'-এর চিন্তাঘন বিষন্নতার পাশে 'ডাহুক'-এর গতিপথ কিছুটা অনিশ্চিত, এর বক্তব্যও অস্পষ্ট। যে পরিমাণ সুরের সম্মোহ, শব্দের ধ্বনি কবির দখলে, সেই একই

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব কবিতার অন্তর্গত ভাবনার উপর দেখা যায় না। শুধু এক অস্পষ্ট বেদনার ছায়াচ্ছন্নতা এক ধরনের আবেশ সৃষ্টি করে।

কিন্তু এখানেই একটা প্রশ্ন। অন্তর্গত ভাবনা যখন ফররুখের কবিতার প্রধান গুণগুলির মধ্যে আমরা গণ্য করি না, তখন 'ডাহুক' প্রসঙ্গে এ আপত্তি কেন ? 'ডাহুক'-এ বোধ হয় কবি সেই প্রত্যাশা জাগিয়েছেন—সে জন্যেই। স্কাইলার্কে প্রসন্ন প্রভাত, অবারিত আকাশ, এবং দূর নীলিমায় মিলিয়ে যাওয়া অসংখ্য চাতকের অফুরন্ত, অবিশ্রান্ত, অপূর্ব চিন্তিত সুরের উচ্ছ্বাস, 'ডাহুক'-এ মধ্যরাত্রির নীরবতায়, ঘন বনের অভ্যন্তর থেকে ভেসে আসা দুঃসহ বেদনার সুর। কীট্‌সের চেতনা জুড়ে ছিল মৃত্যু-চিন্তা, মর-জীবনের নশ্বরতার ভাবনা, 'ডাহুক'-এ ফররুখ ভাবছেন জীবনের বন্দীত্বের কথা, তার বিষতিক্ততার কথা। দুটি বিখ্যাত কবিতার কাছে থেকেও একটু আলাদা পথে গেছে 'ডাহুক'। শব্দ-বিন্যাস রবীন্দ্রানুসারী, তবু এরই মধ্যে উঁকি দিতে শুরু করেছে আসন্ন স্বাধীনতার আভাস ঃ

গুলে বকাওলির নীল আকাশ-মহল
হয়ে আসে নিঃসাড় নিঝুম
নিভে যায় কামনা চেরাগ।

তিনটি সিন্দাবাদ কবিতা—'সিন্দাবাদ.' 'বা'র দরিয়ায়,' 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' এবং এর সাথে 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'পাঞ্জেরী' যুক্ত হলে যে পাঁচটি সামুদ্রিক কবিতার গুচ্ছ, বাংলা কবিতার ধারায় এগুলি ফররুখের সবচেয়ে বিশিষ্ট অবদান। পুরনো ছন্দের খাতে এখানে তিনি বইয়ে দিয়েছেন যে শব্দের ও সঙ্গীতের স্রোত, সে তাঁর একেবারেই নিজস্ব ঃ

কেটেছে রঙীন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক ;

সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুল ইসলাম—বিশেষত নজরুল—আরবী ও ফারসী শব্দের সমন্বয়ে নতুন ধ্বনি সৃষ্টি করেছিলেন। ফররুখও করলেন, তবে তাঁর নিজস্ব নিয়মে, এবং এর ফলে যে ধ্বনি-পরম্পরার সৃষ্টি হল, তা অশ্রুতপূর্ব। সিন্দাবাদ কবিতা তিনটি এক নাটকীয় বৃত্তে পরস্পর-সংলগ্ন। যাত্রার আকুলতা, সমুদ্রের বুকে ঝড়ের সাথে মৃত্যুপণ লড়াই, সফরের ক্লান্তি ও বন্দরের ডাক—যাত্রার এই তিনটি পর্যায়ের কাঠামোয় ধরা পড়েছে এক নতুন ধ্বনি-সমৃদ্ধ ভাবোচ্ছ্বাস। দূর ও দুঃসাহসী যাত্রা, নোনা দরিয়ার ডাকে নতুন পানিতে বারবার কিশতী নিয়ে বেরিয়ে পড়া—সিন্দাবাদের এই সফরই ফররুখের কাব্যে বিভিন্ন রূপে বারবার আবর্তিত হয়েছে।

www.pathagar.com

সমুদ্র, বন্দর, পাখী, যাত্রা এবং দূর সমুদ্রের অজানা দ্বীপ বাংলা কবিতায় দেখা দিয়েছিল আগেই। বিশেষত জীবনানন্দ দাশ ও প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় এ জাতীয় চিত্রকল্পের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায়। কিন্তু ফররুখের কবিতায় এসব সামুদ্রিক চিত্রকল্প বাংলা কবিতার পথে আসেনি, এসেছে আলিফ লায়লার পথে, সিন্দাবাদের সঙ্গী হয়ে; এবং সিন্দাবাদকে আবিষ্কার ও তার প্রতীকী ব্যবহার—টেনিসনের 'ইউলিসিস'-এর মতো—ফররুখেরই কৃতিত্ব। টেনিসনের ইউলিসিস প্রৌঢ় ও প্রাজ্ঞ, তবু বন্দরে বাঁধা জাহাজ তাকে লুব্ধ করে। তার সব যাত্রার পিছনে আছে নতুন জ্ঞান, নতুন অভিজ্ঞতার আকর্ষণ—এবং অনভ্যস্ত গৃহী-জীবনের অপরিসীম ক্লান্তি। সিন্দাবাদের প্রেরণায় তারুণ্য ও উত্তেজনা উচ্ছ্বসিত কল্পনায় উপচে পড়ে। যেখানে টেনিসনে, ইউলিসিসের অভিজ্ঞতা ও গূঢ়তার সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করে ফুটে ওঠে এক আত্মগত প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা, সেখানে ফররুখের কবিতায় আসে এক তীর-তীব্র গতি। ইউলিসিসের যাত্রা জীবনের অভিজ্ঞতার পথে, সিন্দাবাদের যাত্রা জীবনের উত্তেজনা ও আবিষ্কারের পথে।

'পাঞ্জেরী' ও 'সাত সাগরের মাঝি' সিন্দাবাদ কবিতাগুচ্ছের সম্পূরক। এই দুটি কবিতায় আছে ক্লান্তি, প্রতীক্ষা, সন্দেহ, জিজ্ঞাসা, আর আছে মানুষের উল্লেখ ঃ

এবার তোমার রুদ্ধ কপাটে মানুষের হাহাকার,
ক্ষুধিত শিশুর কান্নায় শেষ সেতারের ঝংকার

—[সাত সাগরের মাঝি]

দু'টি কবিতার ছন্দে একই অবসন্নতার আভাস। 'পাঞ্জেরী'তে ক্লান্তি ও জিজ্ঞাসার সুর ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয় ধুয়ার মতো বারবার ঘুরে আসা একটি চরণে ঃ

রাত পোহাবার কত দেরী পাঞ্জেরী

এক আকুল প্রশ্ন, অতল ক্লান্তির অনবদ্য লিরিক প্রতিমূর্তি এই কবিতা সম্ভবত গীতিকবিতাবলীর মধ্যে ফররুখের শ্রেষ্ঠ রচনা। 'সাত সাগরের মাঝি' একই তারে বাঁধা, তবে দীর্ঘতর এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী—সামগ্রিক বিচারে সম্ভবত কবির শ্রেষ্ঠ সিদ্ধি। কল্পনার প্রসার এবং অর্থ গভীরতায় এ-কবিতা সিন্দাবাদ গুচ্ছকে ছাড়িয়ে যায় এবং অনবদ্য পঙক্তির সমাবেশ এই একটি কবিতায় যতো বেশী এমন আর কোথাও নয়। প্রশ্ন ও প্রত্যয়, ব্যথা ও ব্যাকুলতা, স্মৃতি ও আশ্বাস এর স্তবকে স্তবকে তুলেছে এক ধ্বনির হিল্লোল, একে উত্তীর্ণ করেছে এক সমুজ্জ্বল কল্পনার জগতে।

'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্য দুটির মধ্যে সীমানা নির্দেশ করা সহজ নয়। শুধু সময়ের দিক থেকে নয়, আবেগ-কল্পনার প্রকৃতির বিচারেও দুটি কাব্য একই বৃত্তের অন্তর্গত। পয়গম্বর, খোলাফায়ে রাশেদীন ও অন্যান্য পীর-মুজাদ্দিদ যে ভাষায়, যে ছন্দে, যে আবেগে বন্দিত হয়েছেন, প্রথম কাব্যের সাথে তা মূলত এক।

www.pathagar.com

কল্পনা এখানে বিষয়গত কারণেই কিছুটা সংহত, কিন্তু আবেগ অতিমাত্রায় উচ্ছল--এতটা, যে বীরপূজায় অনভ্যস্ত এ কালের পাঠক কিছুটা বিব্রত বোধ করবেন। স্বীকার করতে বাধা নেই যে মানুষের চোখে মানুষের বীরত্ব ও মহত্ত্বের চেয়ে বড়ো কিছু হয় না। মহত্ত্বের অনুধ্যানেই চিত্তের প্রসার। কুলপ্লাবী কল্পনায় ব্যক্তিত্বের সাথে ব্যক্তিত্বের সীমারেখা ভাসিয়ে নিয়ে গেছেন।

'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাসমূহে কবির ব্যক্তিসত্তা অনুপস্থিত বা অবগুণ্ঠিত। নতুন সফর ও নবজাগৃতির এক প্রবল আবেগে তিনি পরিপূর্ণ। তীব্র শিরাজীর মতো এই নতুন জীবনবোধে তিনি মাতাল হয়েছেন বা হতে চেয়েছেন এই মত্ততার সঙ্গে তুলনীয় ঝড়ের উদ্দামতা—'বা'র দরিয়া'র ঝড় নয়, যে 'দরিয়া তুফান' জয় করে বিজয়ী মাঝিকে আসতে হয়েছিল খিজিরের এলাকায়। এ ঝড় আসে 'দিগন্ত কোণে পশ্চিম থেকে আরবী তাজীর পিঠে চড়ে প্রবল, গতিমান, যাযাবর। এই জয়ধ্বনির তলায় কবির ব্যক্তিগত কণ্ঠ হারিয়ে যায়।

এই মত্ততার মধ্যে যাকে পাওয়া যায় না, সেই ব্যক্তিটির কিছুটা খোঁজ মেলে 'হে বন্য স্বপ্নেরা' শীর্ষক কবিতা সংগ্রহে। ফররুখের মধ্যে যে অন্যতর সম্ভাবনা ছিল, 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা', 'নৌফেল ও হাতেম' এবং 'হাতেম তায়ী'র কবি না হলে তিনি যা হতে পারতেন, স্বাভাবিক নিয়মে যে ধরে তাঁকে অগ্রসর হতে হতো, তার ঈশারা মেলে এখানে, 'দিলরুবা' সনেট গুচ্ছে এবং অগ্রন্থিত আরও কিছু কবিতায়। এ প্রসঙ্গে এসে পড়ে তাঁর গৌণ কবিতার কথা—শিশু-কিশোরদের জন্য ছড়া জাতীয় কবিতা, এবং স্বনামে-বেনামীতে লেখা কৌতুক-বিদ্রূপের কবিতা। ছড়ায় এবং ব্যঙ্গ কবিতায় সহজেই তাঁর ব্যক্তিগত মেজাজ যেমন ফোটে, 'হে বন্য স্বপ্নেরা'য় তুলনীয় সিদ্ধি ঘটেছে, বলা যায় না। এখানে বেশ কিছু অপরিণত কবিতার দেখা মেলে, যা শৈলীর দিক দিয়ে অনিশ্চিত। তাঁর পরিণত অক্ষরবৃত্তে যে সার্বক্ষণিক—এবং সময়ে সময়ে ক্লান্তিকর—পেশলতা, তা থেকে এই কবিতাগুলিও মুক্ত নয়। তবু নীচের পঙক্তিগুলির মধ্যে এক ধরনের নমনীয়তা এবং লাবণ্য, মনে হয় আছে, যা অনেক প্রীতিপ্রদ সম্ভাবনার ইঙ্গিতবহ ঃ

হে বন্য স্বপ্নেরা মোর! কোনদিন যদি ফুটেছিল
তোমার শাখায় লাল, নীল,
জীবনের পুষ্প পর্ণ কোনদিন যদি দিয়েছিল
রসায়িত অজস্র সলিল,
তবে সেই ফুটে যাওয়া ফুল, জানি, নয় সেদিন সুদূর—
তবু সেই অনাঘ্রাত দিন —আজ শুধু বাহিনী অশ্রুর।

www.pathagar.com

স্তূপীকৃত দিনের সুরভি বহে না এ রাত্রির আকাশ,
তবু সেই দিনের সন্ধানে আমার তারারা ফেলে শ্বাস,
ফসরের শূন্য শুষ্ক মাঠ পেতে চায় সোনালি আশ্বাস।।

[হে বন্য স্বপ্নেরা]

'হে বন্য স্বপ্নেরা'-য় অনেক ছবি আছে, এমন অনেক চিন্তা, যা পরবর্তী কালে তাঁর কবিতা থেকে একেবারেই অন্তর্হিত। পরিণত বয়সের কবিতায় অন্য সৌন্দর্য যাই থাক, সেখানে যে আর কাঁচড়াপাড়ার রাত্রি আসে না, তন্দ্রাতুর প্রেসম্যানকে দেখা যায় না, সাড়ে আটটায় ট্রেন এসে দাঁড়ায় না প্লাটফর্মে—তা তাঁর শেষের কবিতাকে দরিদ্র করেছে নিঃসন্দেহে। যে কবি লিখেছিলেন ঃ

হায় পূর্ণিমা পাণ্ডুর রাতে প্রথম বিরহী চাঁদ
অমাবস্যার নিরাশ আঁধারে খোঁজে তারে উন্মাদ।

তাঁর কবিতায় হৃদয়ের স্বর ফুটতে শুরু করেছে। কিন্তু তার পরিণতি আমরা দেখতে পেলাম না। 'হাতেম তায়ী'র শেষ দিকে যে কোমলতা, তা আত্মার, যে আত্মার প্রচুর চর্চা হাতেম করেছে। যে কোমলতার কথা, হৃদয়ের স্বরের কথা, এই মাত্র বলছিলাম, তা হৃদয়েরই। এবং চর্চার অভাবেই যেন সেটা শুকিয়ে গেল ফররুখের জীবন ও কবিতা থেকে।

এই এক পথে ফররুখের কবিতার পরিণতি হয়তো হতে পারত, কিন্তু হয় নি। 'দিলরুবা' সনেট গুচ্ছও এই মন্তব্যের বাইরে যায় না। 'দিলরুবা'য় ফররুখ প্রেমের কবিতাই লিখেছিলেন বা লিখতে চেয়েছিলেন। বাংলা সনেটের ইতিহাসে 'দিলরুবা'ই একমাত্র সিকোয়েন্স—পশ্চিমী অর্থে সিকোয়েন্স কি না, আমি জানি না; যদি হয়, তাহলে, সেটাই তার বিশিষ্টতা। না হলে 'দিলরুবা' ফররুখের দীর্ঘকালব্যাপী সনেট-চর্চার মধ্যে একটি বিশেষ আবেগে চিহ্নিত পর্যায়। যেমন 'মুহূর্তের কবিতা'য় তেমনি 'দিলরুবা'য় আছে সনেটের আঙ্গিক সৌকর্য্য, কিন্তু কেমন যেন বড়ো বেশী ভারী ও ভরাট। প্রেম নিজের জন্য যে ভাষা সৃষ্টি করে নেয়, তার ঝোঁক সম্ভবত সহজতার দিকে, স্বল্পকথনের দিকে। এখানে আছে স্তুতি, হতাশ্বাস, দূরত্বের বেদনা, কিন্তু অত্যন্ত বিরল এই ধরনের পঙক্তি যেখানে অল্প কথার বৃত্তে ধরা পড়ে অনেক রোমাঞ্চিত মুহূর্তের অনুভূতি ঃ

অশেষ ইঙ্গিতে ঘেরা অপরূপ তোমার চিবুক

'মুহূর্তের কবিতা' সম্বন্ধেও আমি এই কথাই বলব—আঙ্গিকে, গঠনে, পঙক্তির দৃঢ়তায় নিখুঁত, অনবদ্য। এ কবিতা সর্বদাই ভরা পালের কবিতা, মৃদুতা, মন্থরতা, অব্যবস্থিতচিত্ততা এর মেজাজে নেই। যেমন অন্যত্র, তেমনি সনেটেও, জড়োয়া ঢং-এর শব্দ বিন্যাস, যুক্তাক্ষরের আধিপত্য। বাক্যের ও বাক্যাংশের দীর্ঘতার ফলে প্রত্যেকটি

www.pathagar.com

সনেটই একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতার মতো; কথোপকথনের স্তরে, সংলাপের অন্তরঙ্গতায় নামতে চায় না। অবশ্য দীর্ঘ পয়ার পঙক্তিকে এজন্য কিছুটা দায়ী করতে হবে—এবং অগ্রজ মোহিতলালকে—কারণ বাংলা চতুর্দশপদীর সাবেক হালকা চলন, যা চলে আসছিল মধুসূদন থেকে প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত, তিনিই বন্ধ করেছেন। চোদ্দ মাত্রার পয়ারে মধুসূদন এনেছিলেন ব্যাপ্তি ও বিভিন্নতা, প্রয়োজন মতো কখনো গাম্ভীর্য, কখনো গাঢ়তা, কখনো তারল্য। ফররুখের বেলায় আঠারো মাত্রার চরণ যেন পবিত্র ভূমি, এখানে পা দিলেই তাঁর কণ্ঠে বেজে ওঠে এক উচ্চারণ যা শুদ্ধ, সমৃদ্ধ, উদাত্ত। কালেভদ্রে এর ব্যতিক্রম ঘটে যখন তিনি ইঁদুর' বা বিল্লী'র মতো ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন সনেটের আঙ্গিকে।

ফররুখের কাব্য-বিবেচনায় তবু, শেষ পর্যন্ত, সনেটের গুরুত্ব স্বীকার করতে হবে। এজন্যে নয় যে তিনি, হয়তো, বাংলা কাব্যের জগতে সর্বাধিক সংখ্যক সনেট লিখেছেন। বরং এজন্যে যে তিনি সনেটের আঙ্গিকে সারা জীবন স্বচ্ছন্দ ছিলেন। যে কোন প্রয়োজন তিনি কাজে লাগিয়েছেন চতুর্দশপদী কবিতাকে। তাঁর সবচেয়ে রোমান্টিক, সবচেয়ে সুদূরাভিসারী কল্পনা থেকে সবচেয়ে কৌতুকময় মেজাজ—সবই ধারণ করতে পারে চৌদ্দটি দীর্ঘ-পয়ার পঙক্তি—মিলে, ছন্দে, যতি স্থাপনায়, সার্বিক চলনে কোন প্রকার বৈলক্ষণ্য না ঘটিয়ে। এর এক প্রান্তে 'বন্দরে সন্ধ্যা' ঃ

> ষোল পাপড়িতে ঘেরা ষোড়শীর সে পূর্ণ যৌবনে
> আসিল অতিথি এক বন্দরের শ্রান্ত মুসাফির!
> সূর্যাস্তের অগ্নিবর্ণ সেহেলির বিমুগ্ধ স্বপনে,
> নিভৃত ইঙ্গিত তার ডেকে নেয় পুষ্পিত গহনে ;
> অনেক সমুদ্রতীরে স্বপ্নময় হ'ল এ শিশির,
> তারার সোনালি ফুল ছিটে পড়ে রাত্রির অঙ্গনে।।

অন্য প্রান্তে 'ইঁদুর' ঃ

> দিনের প্রান্তরে (!) দেখি এখানেও সেই উৎপাত
> অসংখ্য ইঁদুর-কর্মী ক্ষিপ্রহাতে গড়িতেছে ভিত
> সাম্প্রতিক জীবনের। জমেছে পেট্রল গ্র্যানাইট
> মধ্যে মধ্যে কাতুকুতু আর তীক্ষ্ণ কাস্তের সংঘাত।
> ঘুমায়েও শান্তি নাই জেগে দেখি পথে ঘাটে ইট
> নতুন সড়ক আজ গড়িতেছে ইঁদুর স্যাঙ্গাত।

অতিশয়োক্তি হবে না, যদি বলা যায় যে, ফররুখের কাব্যের ও কল্পনার সমস্ত ব্যাপ্তিকে ধারণ করে আছে সনেট। সনেট সহজেই জায়গা করে নিয়েছে তাঁর দীর্ঘ কাহিনীকাব্য 'হাতেম তায়ী'তেও। ফররুখ কোন বিশেষ স্তবকের প্রতি পক্ষপাতিত্ব

www.pathagar.com

দেখান নি—যদিও বিভিন্ন স্তবকের ব্যবহার তিনি করেছেন, এমন কি দান্তের ব্যবহৃত 'টেরজা রীমা' পর্যন্ত। তবু রবীন্দ্রযুগের স্তবকপ্রীতি তাঁর মধ্যে তেমন দেখা যায় না। স্তবকের বিকল্প হিসেবেই, অথবা ফারসী কবিদের রুবাই-এর মতো, আঁকড়ে ধরে থেকেছেন তিনি সনেটকে।

সনেটের প্রতি এই আনুগত্য তাঁর পুরস্কার এনেছে হাতে হাতে। কল্পনাকে সংহত করেছে, কবিতাকে দৃঢ়তা দিয়েছে, মাত্রাবৃত্তের উদ্দাম ধাবমানতাকে শান্ত সংযত করেছে অক্ষরবৃত্তের ছন্দে সনেটের নিয়ম-শৃংখলা। 'সাত সাগরের মাঝি'র কবির জন্যে প্রয়োজন ছিল এই নিয়ন-নির্দিষ্ট পথে বারবার ফিরে আসার।

পুরাণের প্রতীকী নির্যাস নিয়ে ফররুখ তাঁর সিন্দাবাদ পর্বের কবিতা লিখেছিলেন। 'হাতেম তায়ী' কাব্যে তিনি মনোযোগ দিয়েছেন পুরাণের বহিরঙ্গে--তার আখ্যানমূলক অবয়বের দিকে। এই অঙ্গের পুনর্গঠন, প্রসাধন এবং বর্তমানের চিন্তা-ভাবনায় তার পুনরুজ্জীবন—এই দীর্ঘ কাব্যে এ-ই তাঁর অভীষ্ট বলে মনে হয়। হাতেমের গল্পাংশকে সাহিত্যের কোন উন্নত ও পরিচিত ছাঁচে ঢেলে তিনি সাজালেন না, যা মাইকেল করেছিলেন ; কোন সমান্তরাল কাহিনী সৃষ্টি করলেন না বর্তমান জীবনের মালমসলা দিয়ে, জেমস জয়েস, এলিয়ট বা আনুই যা করেছেন উপন্যাসে, কাব্যে, নাটকে ; করলেন না—কারণ করা সম্ভব ছিল না। হাতেমের কাহিনী এমন যে, তাঁর মধ্যে মানবিক সম্বন্ধের কোন নাম-নিশানা নেই। কোন মানুষের সঙ্গেই কোন সম্বন্ধসূত্রে সে আবদ্ধ নয়। তার ব্রত শুধু মানুষের কল্যাণ করে যাওয়া ; কিন্তু নিজে সে না পিতা, না পুত্র, না প্রেমিক, না দুশমন। এই অতিমানবিক মানুষটিকে নিয়ে পৌরাণিক কাহিনীকে নতুনভাবে পরিবেশন করা যায়—নাটক বা উপন্যাস বা এপিক সৃষ্টি চলে না। এবং সে অসম্ভব পথে ফররুখ যান নি।

সত্যি কথা বোধ হয় এই যে, কাহিনীও ফররুখের একমাত্র বা প্রধান লক্ষ্য নয়—এই কাহিনীর শাখা-প্রশাখা তিনি চেয়েছিলেন সেখানে তাঁর প্রিয়তর খণ্ড কবিতাগুলি ঝুলিয়ে দেওয়ার জন্যে। এবং অরণ্য থেকে একটা বাণী বয়ে এনেছিলেন জনপদবাসীদের জন্যে। সেই বাণী হল মর্দমীর বাণী, পূর্ণ মনুষ্যত্বের বাণী, যার প্রতীক হাতেম তা'য়ী।

কিন্তু শুধু বাণীর বা বক্তব্যের বা আদর্শের ভারবাহী হিসেবে কাহিনীর ব্যবহার সচরাচর শিল্প-সম্মত হয় না। সৈয়দ হামজার কাব্যে এ সমস্যা নেই—কারণ তিনি গল্পের রসে নিমজ্জিত। তাঁর ভাষা ও উপস্থাপনা যদি একবার মেনে নেওয়া যায়, তাহলে রস গ্রহণের পথে আর কোন বাধা থাকে না। সৈয়দ হামজার হাতেমও মানব-প্রেমিক, পরার্থবাদী--কিন্তু সে অজ্ঞান আদর্শবাদী, তার কোন বক্তব্য নেই, সুতরাং বক্তৃতাও নেই। ফররুখের বক্তব্য আছে, বক্তৃতাও আছে এবং কাহিনীর সাথে এক ধরনের

www.pathagar.com

আপোস আছে। কাহিনীর কাঠামো ত' আছেই, সাত সওয়ালের পথে হাতেমের যে বিপদসঙ্কুল যাত্রা, পরিমার্জিত ও সংক্ষেপিত সংস্করণে তার বর্ণনাও আছে। পুঁথির পয়ার ও ত্রিপদীর জায়গায় এসেছে প্রবহমান দীর্ঘ পয়ার। এই মূল ছন্দের সাথে সহযোগিতা করেছে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন ছন্দ। মাঝে মাঝে সন্নিবেশিত হয়েছে পূর্ণাঙ্গ চতুর্দশপদী, যা ভিন্ন ছন্দে রচিত কবিতা বা কাহিনী সংলগ্ন হয়েও স্বতন্ত্রভাবে উপস্থাপিত। প্রথাসিদ্ধ মহাকাব্য বা প্রচলিত অতিপ্রাকৃত ঘটনাবহুল আখ্যান কাব্যের তৌলে 'হাতেম তায়ী'কে বিচার করলে কবির উদ্দেশ্যকে পুরোপুরি অগ্রাহ্য করা হয়।

'হাতেম তায়ী' কাব্যে নিজের প্রয়োজন ও প্রবণতার উপর নজর রেখে ফররুখ মিশ্র-রীতির অনুসরণে লিখেছেন এক দীর্ঘ কবিতা। এই একমাত্র নিরঙ্কুশ পথ এই কাব্যের বিবেচনার জন্যে। এ ছাড়া যে-কোন পূর্ব ধারণা নিয়ে অগ্রসর হলেই আমরা বাধাপ্রাপ্ত হবো পদে পদে।

সৈয়দ হামজার কাহিনীকেই ফররুখ গ্রহণ করেছেন, শুধু অলৌকিক ও অতিপ্রাকৃতের ভার কিছুটা হালকা করে। কাহিনীর মূল্য তাঁর কাছে শুধু এখানেই যে তার নায়ক হাতেম এবং হাতেমের প্রতিটি লৌকিক অভিজ্ঞতার মধ্যে নিহিত আছে এক মানসিক যাত্রার অনুষঙ্গ। সেজন্যে প্রায় একান্তর নিয়মে তাঁর কাহিনী ও বাণী এগিয়ে চলে। অথবা বলা যায়, প্রায় একান্তর নিয়মে তাঁর বাণী কাহিনীকে থামিয়ে দেয়, তাকে অর্থমণ্ডিত করে আবার তাকে চলবার অনুমতি দেয়।

এভাবেই ঘটনার সাথে ভাবনার একটা সমন্বয়, কাহিনীর সাথে কাহিনী সংলগ্ন কবিতার একটা সংগতি, অলৌকিকের সাথে আধ্যাত্মিকের একটা মিলন, সৃষ্টি ও সৃষ্টিকর্তার সাথে মানুষের একটা সম্বন্ধ রচনার চেষ্টা দেখা যায় 'হাতেম তায়ী' কাব্যে। একালের কবিতা-পাঠকের জন্যে কবিতা প্রয়োজনীয়, কাহিনী নয়, আধ্যাত্মিক গ্রহণীয় হলেও অলৌকিক নয়, সৃষ্টি খুব কাছের জিনিস হলেও সৃষ্টিকর্তা, প্রায়ই দূরাগত ও অস্পষ্ট। সুতরাং বাধা পদে পদে। তবু বলা যায়, প্রাথমিক বাধা ও অনীহা কাটিয়ে ওঠার ধৈর্য দেখাতে পারলে, এবং ফররুখের পূর্ব রচনার সাথে বোঝাপড়া হয়ে থাকলে 'হাতেম তায়ী' শেষ পর্যন্ত পাঠকের মনে আধিপত্য বিস্তার করবে।

এজন্যে ফররুখের কৌশলগত পদ্ধতিকেই ধন্যবাদে দিতে হয়। কাহিনীর হাতে আত্মসমর্পণ না করে তিনি যে সম্পূর্ণ কাব্যের শরীরে লিরিকের লাবণ্য ও ভাবনার প্রতিভা ছড়িয়ে দিয়েছেন, তার ফলেই তাঁর কাব্যের বিশিষ্ট আবহে আমরা শেষ পর্যন্ত উৎসাহিত হয়ে উঠি। উৎসাহিত হই বলেই শেষ পর্যন্ত কাহিনী অংশও বর্জনীয় মনে হয় না, কারণ কাহিনী ও কাহিনী সংলগ্ন কাব্যাংশ পরস্পরের পোষকতা করে। নূররেজ ফুল অসামান্য হয়ে ওঠে, কারণ ঃ

www.pathagar.com

ফুলের নির্যাস দিল আবার যখন দুই চোখে
কেটে গেল দ্বিধাদ্বন্দ্ব, লুপ্ত হল তিমির প্রাকার,
পরিপূর্ণ দীপ্ত দিন সমুজ্জ্বল সূর্যের আলোকে
উদ্ভাসিত হল যেন আদিগন্ত— ঝলকে ঝলকে
প্রমুক্ত আলোক আসে ; নদী, মাঠ, অরণ্য কিনার
আল্লার আলম জাগে দৃষ্টি ফিরে পাওয়া মুগ্ধ চোখে।

এ শুধু একজন অন্ধের দৃষ্টি ফিরে পাওয়ার অলৌকিক কিসসা নয়, হারানো সত্যকে ফিরে পাওয়ার অপূর্ব অভিজ্ঞতা। ঠিক তেমনি, কাহিনী অংশে যখন বিরান শহরে হাতেমকে নিয়ে যান কবি, তখন সেই জনশূন্য পুরী দোভাষী পুঁথির জড়ত্ব থেকে মুক্তি পায়, অর্থ দ্যোতনায় ভরে ওঠে নিমেষেই ঃ

স্পর্শ আছে, চিহ্ন নেই মানুষের। রয়েছে জেওর
কিন্তু নাই আওরত হাসিন। সিঙারের বেশবাস
পড়ে আছে অনাদৃত; আছে আর্শি আছে সুর্মাদানি ;
নেই সে সুরূপা তন্বী আর্শিতে যে মুখ দেখেছিল,
সুর্মা নিয়েছিল চোখে। পড়ে আছে রঙীন খেলনা ;
নাই শুধু শিশুর কাকলি! অসমাপ্ত খেলা ফেলে
চলে গেছে যেন দূরান্তরে।

হাতেমের জবানীতে এই বিরান শহরের অভিজ্ঞতার সঙ্গে আমরা মিলিয়ে নিতে পারি এ-কালের সমাজসম্পর্কচ্যুত নিঃসঙ্গ মানুষের অসহায়ত্বকে ঃ

বলিল হাতেম তায়ী, বাদশা নামদার
নিঃসঙ্গ প্রাণের ব্যথা কত তীব্র, বুঝেছি নিষ্প্রাণ
শূন্য জনপদে। বুঝেছি এখানে আমি সামগ্রিক
জীবনের গূঢ় অর্থ, কত ব্যর্থ বিচ্ছিন্ন জীবন
সে কথাও বুঝেছি এখানে। মানুষের এ সংসার
অশেষ বৈচিত্র্যে ভরা, কিন্তু আছে সঙ্গতি নিভৃতে,
সমাজের মর্মমূলে শুনি আমি তার ঐকতান ;
প্রাণবহ্নি দেখি তার সংগোপন সমাজ সত্তায়,
যে আত্মা পায় না স্পর্শ সে বহ্নির, পায় না পূর্ণতা ;
নিভৃতে বাড়ে যে তরু অরণ্যের নয় অংশীদার
সে নিঃসঙ্গ, ঝড়ের শিকার সেই অরক্ষিত প্রাণ
বিচ্ছিন্ন জীবনে দেখে ছায়া ব্যর্থতার।

www.pathagar.com

দেও আর জ্বিন আর পরীদের বসতি কো'কাফ শেষ পর্যন্ত আর অসম্ভবের মুলুক মনে হয় না, কারণ কবিতার যাদু তাকে স্পর্শ করেছে :

আগুনের ফুল যতো পরীদের বসতি সেখানে ;
প্রেমের দুর্গম পথে যারা কভু মানে না ব্যর্থতা ;
হাওয়ায় মিশায়ে তনু ঘোরে গুলনারের সন্ধানে।

নার্গিসের মত চোখে অপরূপ ভোরের শুভ্রতা,
পাখীর কাকলি নিয়ে সারাক্ষণ তারা কথা কয় ;
কলকণ্ঠে পরীদের ঝর্ণা, বন কয়ে ওঠে কথা।

সেখানে রয়েছে জেগে পাশাপাশি ভয় ও বিস্ময়,
বিষাক্ত ফণার নীচে সেখানে স্ফটিক-শুভ্র হাসি ;
সেখানে মৃত্যুর কাছে জীবনের জাগে না সংশয়।

পঙ্কিল প্রবাহ আর স্বচ্ছ ধারা বয় পাশাপাশি ;
দিনরাত্রি অনির্বাণ জাগে সুর জীবন-মৃত্যুর ;
মওতের সে জিন্দানে গুলে লালা ফোটে রাশি রাশি।

মৃত্যুর যে জিন্দানে রাশি রাশি লালা ফুল ফোটে, সেই কো'কাফকে শেষ পর্যন্ত আমরা যেন চিনতে পারি, যেন সে আমাদেরই চেনা এই মানুষের পৃথিবী।

ফররুখ এই মানুষের অপমান দেখেছেন তাঁর যৌবনের বন্য স্বপ্নের দিনে ঃ

অন্ধকার! গূঢ় অন্ধকার—
ভয়ংকরী এ রজনী বাঁহুতে জড়ায় কাল সাপ
মানুষী বিবেকে শুধু পড়িতেছে শয়তানী চাপ
পাশব প্রতাপ।

[হে বন্য স্বপ্নেরা ঃ হে বন্যা স্বপ্নেরা]

এই মৃত্যুর তীব্র-তিক্ত অনুভূতিই সিন্দাবাদের আয়েশী রাতকে বিষাক্ত করেছিল, টেনে বার করেছিল নতুন সফরে। গভীর রাত্রির নিঃসঙ্গতায় কবি দেখেছিলেন, "খরস্রোতা জীবনের কোল ঘেঁষে যেখানে অসাড়, অন্ধকার বালিয়াড়ি।" প্রশস্ত পথের মোড়ে ক্ষুধিতের লাশ দেখে অভিশাপ ছুঁড়ে দিয়েছিলেন "স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা"র দিকে। সমুদ্রের লোনা হাওয়া সাত সাগরের মাঝিকে প্রশ্ন করেছিল,—'দুয়ারে সাপের গর্জন শোন নাকি/কত অসংখ্য ক্ষুধিতের সেথা ভীড়।' 'নৌফেল ও হাতেম' এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে 'হাতেম তায়ী' কাব্যে যে মানবতার সুর, যে মনুষ্যত্বের বন্দনা, তার সাথে এক অবিচ্ছিন্ন সূতোয় গাঁথা ফররুখের পূর্ব কবিতার মূল সুর--যদিও সে কবিতার ভাষা, ভঙ্গি ও আবহ একটু অন্য রকম।

www.pathagar.com

ফররুখের কবিতায় মানবতার এই মূল সুর ধরে অগ্রসর হলে আমরা সহজেই তাঁর সর্বশেষ কাব্য 'হাতেম তা'য়ী'তে পৌঁছুতে পারি। প্রকরণের বিচিত্রতার মধ্যে ঐক্যসূত্র সম্ভবত এখানেই, তাঁর সমস্ত কবি-কল্পনার অন্তরালবর্তী এই জীবন-ভাবনায়। পৌরাণিক আজদাহা, শ্বাপদ পশুদল, পিশাচ, মরুভূমি, বিয়াবান, দশতে হাবেদার চিত্রকল্পের পৌনঃপুনিক ব্যবহারে এই জড়, নিষ্প্রাণ, নিষ্ঠুর মনুষ্যত্বহীন পৃথিবীর ছবি ফোটে। আবার এই পৃথিবীরই পথে মনুষ্যত্বের তীর্থযাত্রার চিরপথিক হাতেম তা'য়ী ; যার মর্দমীর স্পর্শে মরুভূমিতে ফুল ফোটে, অন্ধ দৃষ্টি ফিরে পায়, মায়ার ফাঁদ থেকে মুক্তি পায় রূপসী জরিনপোষ, নির্বাসনের পাহাড় গলে যায় পানির মতো। হাতেম তা'য়ী স্পষ্টত কোন ভৌগোলিক, কোন পৌরাণিক জগতের বাসিন্দা নন, বাসিন্দা তিনি নৈতিক জগতের, যেখানে আলোর পাশে অন্ধকার, মিথ্যার পাশে সত্য, অমঙ্গলের পাশে মঙ্গল। এই নৈতিক জগতের অস্পষ্ট আভাস মাত্র মেলে পুঁথির পাতায় ; তাকে চিরকালের উজ্জ্বলতায় উত্তীর্ণ করেছেন ফররুখ আহমদ।

আধুনিক বাংলা কবিতার আলোচনায় অনেক সময় ফররুখ আহমদকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার যে প্রবণতা, সেজন্যে দায়ী তিনি কিছুটা নিজেই। এক নিঃসঙ্গ যাত্রায় তিনি বেরিয়ে পড়েছিলেন। সমকালীন সভ্যতার বীভৎসতা থেকে সরে গিয়ে জীবনের শাশ্বত সুন্দর সমগ্রতাকে আবিষ্কারের জন্যে হাতেমের মতোই সরে গিয়েছিলেন লোকালয় থেকে। যে প্রাত্যহিকতার টানাপোড়েনে বর্তমানের কবিতা আন্দোলিত, তার ভাষা ছন্দ প্রতীক বিপর্যস্ত, তার সদর্থক দিকটি তিনি বুঝতে পারেন নি। এ কবিতার অনেকাংশই তাঁর কাছে আত্মরতি ছাড়া কিছু নয়। এর বিপরীতে তাঁর নিজস্ব পন্থাকে নিছক রক্ষণশীলতা বলে প্রচার করলে তাঁর উদ্দেশ্য ও সিদ্ধির প্রতি তা হবে চরম অবিচার। অখণ্ড জীবনের পরম মূল্যে তাঁর অবিচল আস্থাকেই তিনি বারবার ঘোষণা করেছেন। এজন্যে তিনি প্রতীকের আশ্রয় নিয়েছেন প্রয়োজন মতো। এবং এই উদ্দেশ্যে তাঁর পুরাণ যাত্রা কিছু একক দৃষ্টান্ত নয়। আধুনিক কবিতায়, দেশে ও বিদেশে, অনুরূপ যাত্রা এতবার ঘটেছে যে, এখন আর এতে বিস্ময়ের বা আপত্তির কোন অবকাশ নেই। এরই প্রয়োজনে এসেছে ইবলিস, ফেরাউন, ইউনুস, ইউসুফ, হাতেম ; এসেছে দশতে হাবেদা, বাদগদ হাম্মাদ, তখতে সুলায়মান। এসব প্রতীক এবং সেই সঙ্গে কিছু শব্দ ফররুখ ব্যবহার করেছেন, এ কালের একজন উদ্দেশ্য-সচেতন কবি হিসেবে; তাঁর কবিকর্মের অংশ এটা। এতে কবিতা সমৃদ্ধ হয়েছে—এটা কোন দিক দিয়েই পশ্চাদপসরণের রীতি নয়। এই প্রবন্ধে তাঁর কবিতার যে সব অংশ উদ্ধৃত হয়েছে, তাতেই প্রমাণ হয়, তাঁর ভাষা মূলত একালের বাংলা এবং সেখানে তৎসম তদ্ভব শব্দেরই আধিপত্য, পুঁথির সূত্রে পাওয়া শব্দের নয়। তাঁর প্রতীকের মতোই, তাঁর এসব শব্দও নতুন নয়—সবই পুনরুদ্ধার ; এদেশেরই এবং এই সমাজেরই ঐতিহ্য-ভাণ্ডার

www.pathagar.com

থেকে এগুলি তিনি পেরেছেন। নিরপেক্ষ পাঠক জানেন যে, ফররুখের সমগ্র কবি-কর্মের মাত্র একটি অংশে—এবং অপ্রধান অংশে—তিনি পুঁথি-শব্দের ব্যবহার করেছেন এবং এতেই প্রমাণ হয়, বিতর্কিত শব্দ ও প্রতীকের ব্যবহার কোন উদ্ভট খেয়ালের বশে হয় নি। বরং প্রায় ব্যতিক্রমহীনভাবেই তা প্রয়োজনের কঠিন শাসনে নিয়ন্ত্রিত।

ফররুখের জায়গা বাংলা কবিতার ধারায় আধুনিক কবিদের মধ্যে, যদিও তা আধুনিকতার কেন্দ্রীয় ধারায় কিনা, আমরা নিশ্চিত নই। তিনি কোন কাব্য আন্দোলনের অংশ নন, কিন্তু নিজেই একটি আন্দোলন। তাঁর মৌলিকতার চেয়ে অনেক বেশী উল্লেখযোগ্য—তাঁর সৃষ্টির মধ্যে স্থাপত্যের দৃঢ়তা, আলো-আঁধারীর জগতে তাঁর বিদ্যুতের মতো কল্পনা, স্থবিরতার পল্লীতে তাঁর সাইমুমের মতো উদ্দামতা। এই চারিত্র্যই তাঁর কবিতাকে বঁচিয়ে রাখবে। বিতর্কের উঁচু স্বর এখনই নিচু পর্দায় নেমে এসেছে, ভবিষ্যতে আরও আসবে। কারণ যতো দিন যাবে ততোই এটা পরিষ্কার হয়ে উঠবে যে, তাঁর কবিতার প্রাণরস বাংলা কবিতার সরস মাটিতেই ছিল, অন্য কোথাও নয়।

www.pathagar.com

হাসান হাফিজুর রহমান

আধুনিক কবিতা ও ফররুখ আহমদ

আমাদের আধুনিক কাব্যধারার পথনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বসমূহের মধ্যে ফররুখ আহমদ অন্যতম। ঐতিহ্যবোধ ফররুখ আহমদের মজ্জাগত। ঐতিহ্যবোধে উজ্জীবিত হতে না পারলে ফররুখ আহমদ লিখতেও পারেন না। ঐতিহ্যের জগতই তাঁর স্বাভাবিক স্বস্তির জগৎ। আরব্য উপন্যাস, ইরান ও আরবের সংস্কৃতি ও পুরাকথা এবং কুরআনে উল্লিখিত কাহিনীর ঐতিহ্য একদিকে এবং অন্যদিকে মুসলিম অভ্যুত্থানযুগের ব্যক্তিত্ব ও ভাবধারার ঐতিহ্য তার কাব্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। প্রথমোক্ত দিকটা 'সাত সাগরের মাঝি' এবং দ্বিতীয়োক্ত দিকটা 'সিরাজাম মুনীরা'তে প্রধানত প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর প্রেম, সৌন্দর্য ও উদ্বোধনমূলক কবিতার কোনো ক্ষেত্রেই এ সত্যের খুব বেশী ব্যতিক্রম নেই। বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্যে নীচে কয়েকটি উদ্ধৃতি দেওয়া গেল ঃ

১. ঘন সন্দল কাফুরের বনে ঘোরে এ দিল বেহুঁশ,
হাতীর দাঁতের সাঁজোয়া পরেছে শিলাদৃঢ় আবলুস,
পিপুল বনের ঝাঁজালো হাওয়ায় চোখে যেন ঘুম নামে;
নামে নির্ভীক সিন্ধু-ঈগল দরিয়ার হাম্মামে।
[সিন্দাবাদ]

২. আলবুরজের চূড়া যেন এক উড়ে আসে কালো দেউ
[বা'র দরিয়ায়]

৩. যেন সুলেমান নবীর শিকলে বন্দী বিশাল জিন
কাল মাস্তুলে ঝড়ের কান্না শুনেছি একলা জেগে,
শুনেছি কান্না রাত জেগে দূর মরুভূ'র কূলে কূলে,
বাদামের খোসা এসেছিল এক ভেসে তুফানের বেগে,
আমার বুকের সকল পর্দা উঠেছিল দুলে দুলে,

*

ডাকে বাগদাদী খেজুর শাখায় শুক্লা রাতের চাঁদ,
মাহগীর বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোছনার জাল,

www.pathagar.com

কোমল কুয়াশা স্নেহে যেথা মাটি পেতেছে নতুন ফাঁদ,
ঘরে ফেরবার সময় হয়েছে আজ।

*

খিজিরের সাথে পেয়েছি আমরা দরিয়ার বাদশাই,

[দরিয়ায় শেষ রাত্রি]

৪. শাহেরজাদীর ঝরোকায় এসে সাইমুম স্নায়ু শ্রান্ত শিথিল,
খুঁজে ওয়েসিস মরু-সাহারার চিড়-খাওয়া দিল শূন্য নিখিল।

[শাহরিয়ার]

ইত্যাদি। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মনে বাংলা প্রকৃতি এবং বাঙালী অভিব্যক্তি-ঐতিহ্যের যে কিছুই ছায়াপাত করে নি, তা নয়, তারও কিছু নিদর্শন রয়েছে যেমন ঃ

১. তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম
অন্তরের ঘ্রাণ,
দিন-রাত্রি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
দর্ঘি পদ্মনাল বেয়ে পাপড়ির পরে...
ভরে ওঠে মনের আকাশ দীর্ঘশ্বাস অপরাহ্ন বেলা
পাপড়ির দ্বার রুধি পদ্মের সুরভি কোথা চলেছে একেলা,
পিছে ফেলে পরিত্যক্ত পাপড়ির বাস,
ভেসে চলে মন, দূরে ভেসে চলে সুরভি প্রশ্বাস,
........জানি না কোথায়—
ব'সে আছি অন্ধকারে নিশীথ প্রচ্ছায়,
পাপাড়ি যায় না দেখা, আজ শান্ত ধমনীর আগ্নেয় উৎসব।
শুধু একা করি অনুভব
তোমার হারানো গন্ধ সুরভি প্রশ্বাস,
মনের অলিন্দে শুধু দেখা দেয় তন্দ্রাতুর তোমার আকাশ।

এবং

মুগ্ধ মন আকুল সৌরভে
নাহি জানি ভুলেছে সে কবে
রজনীগন্ধার সিগ্ধ ভীরু বাতায়নে,
রুদ্ধ কারাদ্বার ভাঙি আজ সে করিছে দূরে কার অন্বেষণ।

[ঝরোকা'য়]

www.pathagar.com

এবং

রাত্রিভর ডাহুকের ডাক...
এখানে ঘুমের পাড়া, স্তব্ধ দীঘি অতল সুপ্তির!
দীর্ঘ রাত্রি একা জেগে আছি।
ছলনার পাশাখেলা আজ পড়ে থাক
ঘুমাক বিশ্রাম শাখে দিনের মৌমাছি
কান পেতে শোনো আজ ডাহুকের ডাক।

এবং

তারার বন্দর ছেড়ে চাঁদ রাত্রির সাগরে
ক্রামাগত ভেসে ভেসে পালক মেঘের অন্তরালে,
অশ্রান্ত ডুবুরি যেন ক্রমাগত ডুব দিয়ে তোলে
স্বপ্নের প্রবাল।

এবং

বেতস বনের ফাঁদে চাঁদ ক্ষয়ে আসে
রাত্রির বিষাদ ভরা স্বপ্নাচ্ছন্ন সাতোয়াঁ আকাশে।

এবং

হয়তো তোমাকে চিনি, চিনি ঐ চিত্রিত তনুকা,
বিচিত্র তুলিতে আঁকা
বর্ণ সুকুমার।
কিন্তু যে অপূর্ব সুর কাঁদাইছে রাত্রির কিনার
যার ব্যথাতিক্ত রসে জ'মে ওঠে বনপ্রান্তে বেদনা দুঃসহ,
ঘনায় তমালে, তালে রাত্রির বিরহ
সেই সুর পারি না চিনিতে।

[ডাহুক]

কিন্তু দেশজ সূত্রের এহে সম্পন্নতা ফর্‌রুখ আহ্‌মদে বেশী নেই। কাছের এ ঐশ্বর্য তাঁকে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখতেও পারে নি। কল্যাণ সম্পর্কে ভিন্নতর বোধ তাঁকে বারমুখী করে তুলেছে। তাঁর প্রবণতা তাই সম্পূর্ণ আরব-ইরান সংস্কৃতিকেন্দ্রিক এবং মুসলিম হিসাবে এ ক্ষেত্রে সচেতনভাবেই তিনি একাত্ম এই অনুভবে : 'মোরা মুসলিম দরিয়ার মাঝি মওতের নাহি ভয়।' দেশ এবং কাল উভয় দিক থেকে দূরায়ত ঐতিহ্য প্রেরণার উজ্জীবনের মূল সূত্রটাও এইখানেই। তবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যের সঙ্গে জীবন-ধারণার বিমূর্ত প্রতিক্রিয়ার যে সংযোগ রয়েছে, তাও একান্তই অস্পষ্ট নয়। কিন্তু সেখানে পরিপার্শ্ব ও সাম্প্রতিক জীবন নেই। জীবনের উদ্ভিদ্যমানতা evolving life নেই বলে আধুনিক কাব্যের অন্যতম লক্ষণ বিশ্লেষণদর্শিতাও নেই।

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদ মুসলিম পুনর্জাগরণের আদর্শে বিশ্বাসী। তাঁর কাব্যে ঐতিহ্য ও আদর্শের পারম্পর্য কি তা সহজেই বোধগম্য এবং কোন্ প্রেক্ষিতে এই সমন্বিত উদ্বোধন তাও সহজেই অনুমেয়; কিন্তু তাতে ঐতিহ্যের স্বপ্ন যতখানি লাবণ্যে উদ্ভাসিত, জীবনের দ্বান্দ্বিক অবশ্যম্ভাবিতা ততখানি উজ্জ্বল নয়। ফলে আদর্শের অপরিহার্যতা বোধ এবং আবেদনও সেখানে পরোক্ষ। বিশেষত জীবনধারণার সঙ্গে আদর্শের যোগ স্থাপিত করার চেষ্টা করা হয়েছে প্রতীক ও রূপক দ্যোতনার মাধ্যমে। তাই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ঐতিহ্য ব্যবহার জীবনরসে নয়, প্রতীকরসে সিঞ্চিত। একটি উদাহরণে কথাটা পরিষ্কার হবে ঃ

১. নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ!
পাকে পাকে ঘুরে তীরবেগে ছুটে আবর্তে দিশাহারা,
ক্ষুধার ধমকে ঘাস ছিঁড়ে খেয়ে আকাশে জাগায়ে সাড়া,
জালিমের চোখ আগুনে পোড়ায়ে গুঁড়ায়ে পাপের মাথা
দেখেছি সবুজ দরিয়া জাজিমে স্বপ্ন রয়েছে পাতা।

[সিন্দাবাদ]

৩. সওদাগরের দল মাঝে মোরা উঠায়েছি আহাজারি,
ঘরে ঘরে ওঠে ক্রন্দন-ধ্বনি আওয়াজ শুনছি তারি।
ও কি বাতাসের হাহাকার, ও কি রোনাজারি ক্ষুধিতের!
ও কি দরিয়ার গর্জন, ও কি বেদনা মজলুমের!
ও কি ক্ষুধাতুর পাঁজরায় বাজে মৃত্যুর জয়ভেরী !
পাঞ্জেরী !
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রুকুটি হেরি;
দেখ চেয়ে দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী কত দেরী।।

[পাঞ্জেরী]

৪. আজকে তোমার পাল ওঠাতেই হবে,
ছেঁড়া পালে আজ জুড়তেই হবে তালি,
ভাঙা মাস্তুল দেখে দিক করতালি
তবুও জাহাজ আজ ওঠাতেই হবে।

[সাত সাগরের মাঝি]

উদ্ধৃতিগুলো এতই প্রাঞ্জল যে, কি আদর্শে এ উজ্জীবিত এবং ব্যবহৃত প্রতীকের আড়ালে মূল বক্তব্যটাই বা কি, তা বোধ করি ব্যাখ্যা করে বোঝার প্রয়োজন নেই। প্রতীকের আধারে যে ঐতিহ্য ও আদর্শ অবিমিশ্র হয়েছে, সে দিকেই আমি এ থেকে ইঙ্গিত দিতে চাচ্ছি। নজরুল-কাব্যেও মুসলিম ঐতিহ্যের ব্যাপক ব্যবহার রয়েছে, যদিও

www.pathagar.com

তা প্রতীকী আধারে উপস্থাপিত নয়। এ ক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে ঐতিহ্যচেতনার সাহায্যে নজরুল তাঁর কাব্যে জীবন ও জীবন-জিজ্ঞাসার বিপুল আলোড়ন সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যে এর দ্বারা প্রতীকী আমেজ এসেছে বটে, জীবনের প্রবল তোড় সেখানে প্রবেশ করতে পারে নি। সাম্প্রতিকতা-সংলগ্ন সুরের একটি আভাসিত সমার্থকতা সেখানে উপলব্ধি করা যায় মাত্র। পরিশীলনের অভাবে নজরুলের বিপুল জীবন-উপকরণ সম্পূর্ণ কাব্য-উপকরণে পরিণত হয়ে উঠতে পারে নি। অন্যপক্ষে ফর্‌রুখের ঐতিহ্য-উপকরণ কাব্য-উপকরণে পরিণত হয়েছে। কিন্তু এই সাফল্যের জন্যে জীবনের স্বাভাবিক সম্প্রসারণের সম্ভাবনাকে যেন ত্যাগ করতে হয়েছে বলে মনে হয়। সিদ্ধির এই সহজ পথটাকেই একক ও একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে ধরতে অসম্পূর্ণতা আছে বৈকি।

কিন্তু এ-ক্ষেত্রে কয়েকটি কবিতাকে ব্যতিক্রম হিসেবে অবশ্যই গণ্য করা প্রয়োজন। কবিতা কয়েকটি হল ঃ ‘ঝরোকা’, ‘ডাহুক’, ‘লাশ’ এবং ‘আউলাদ’। নিঃসন্দেহে এই কবিতাগুলোতে ঐতিহ্য, আদর্শ এবং জীবন একটি সমন্বিত ভিত্তি পেয়েছে। এই ব্যাপকতার দিকে পা বাড়াতে অবশ্য ফর্‌রুখ আহ্মদের মধ্যে কোনো উৎসাহই দেখা যায় নি। বরং অতীতের কাল্পনিক ভ্রান্তি ও ক্রটির প্রতি বিমুখতায়, পরিমার্জনার বিদ্রোহে এবং ভবিষ্যতের কাল্পনিক সংশোধনের উদ্যোগে, পুনর্গঠন সম্ভাবনায় তিনি একনিষ্ঠ উৎস খুঁজে পেয়েছেন—তাঁর মানস শুধু এই বৃত্তেই আবর্তিত হয়েছে পরবর্তী সময়ে ঃ

শুধু গাফলতে, শুধু খেয়ালের ভুলে
দরিয়া অথই ভ্রান্তি নিয়াছি তুলে,
আমাদেরি ভুলে পানির কিনারে মুসাফির দল বসি,
দেখেছে সভয়ে অস্ত গিয়াছে তাদের সেতারা শশী;
মোদের খেলায় ধূলায় লুটায়ে পড়ি
কেঁদেছে তাদের দুর্ভাগ্যের বিস্বাদ শর্বরী।

[পাঞ্জেরী]

সে যাই হোক, এখানে একটি বিষয়ে পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, অতীতটা কাব্য নয়, অতীতকেন্দ্রিক আদর্শবোধও কাব্য নয়। কাব্য অতীতনির্ভর দূরায়ত স্বপ্নটা, আদর্শভিত্তিক উদ্বুদ্ধ আকাঙ্ক্ষাটা। সুতরাং ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মুসলিম পুনর্জাগরণবোধ এবং সে বিষয়ের বক্তব্যকে কাব্য বলে ভুল করার কোনো কারণ নেই। কবিতায় যে ধ্যান, কল্পনা ও চিত্রায়িত স্বপ্ন ফুটে ওঠে, কাব্য হল তাই। এ সূত্রে সামান্য হেরফের অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয় ডেকে আনে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদই এই সঙ্কটের এক বিশিষ্ট প্রমাণ। কেননা এই পরিক্রমায় তাঁর সফলতা ও বিফলতার পাল্লা সমানভাবে ভারী। ‘সাত

www.pathagar.com

সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থকে সাফল্যের নিদর্শন হিসেবে গ্রহণ করা যায়। অন্যপক্ষে 'সিরাজাম মুনীরা'-ও একটি কাব্যগ্রন্থ বটে, কিন্তু এর প্রকৃত কাব্যমূল্য সম্পর্কে আশা করি কারো কোনো মোহ থাকার কথা নয়। অবশ্য নবী এবং খোলাফায়ে রাশেদীন এবং অন্যান্য ধর্মীয় নেতা ও ধর্মীয় বিষয়ের নাম-মাহাত্ম্য ও গুরুত্বই যদি আমাদেরকে প্রথমেই বিচলিত করে ফেলে, তাহলে আমার বলবার কিছু নেই। অথচ কাব্যগুণ যেখানে গৌণ হয়ে পড়েছে এমন উৎসরণের দিকেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সর্বাত্মকভাবে নিবিষ্ট হয়ে পড়েছেন ধীরে ধীরে। বেশ কিছুকাল আগের এমন একটি নমুনা হল ঃ

আল্লাহর দেওয়া বিশ্ববিধান
ইসলামী শরিয়ত
সে বিধানে মোরা গড়িয়া তুলিব
এই পাক হুকুমত ।। . . . .
তৌহিদে রাখি দৃঢ় বিশ্বাস
আমরা সৃজিব নয়া ইতিহাস
দেবো আশ্বাস দুনিয়ার বুকে
দেখাব নতুন পথ ।।
সারা মুসলিম দুনিয়াকে বেঁধে
একতার জিনজিরে
ফিরায়ে আনিব হারানো সুদিন
নয়া জামানার তীরে ।।
আলী, উসমান, উমরের দান
নেব তুলে মোরা জেহাদী নিশান
নেব মোরা ফের আবুবকরের
সত্য সে খিলাফত ।।

[তারানা-ই-পাকিস্তান]

এইটি একটি গান। পুরো উদ্ধৃত করলাম এই জন্য যে, এতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আদর্শের মূল বক্তব্যটা বিধৃত রয়েছে। তিনি পাকিস্তানের কাঠামোয় খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শের পুনঃসংস্থাপনের স্বপ্ন দেখেছেন এবং তাঁর এ স্বপ্ন যে সিদ্ধান্তে উৎকর্ষ পেয়েছে, তা হল ঃ

কাব্য নয়, গান নয়, শিল্প নয়-শুধু সে মানুষ
নিঃস্বার্থ, ত্যাগী ও কর্মী, সেবাব্রতী-পত্রের যে জাগাতে
সমস্ত ঘুমন্ত প্রাণ,—ঘুমঘোরে যখন বেহুঁশ
জ্বালাতে পারে যে আরো ঝড়-ক্ষুব্ধ অন্ধকার রাতে;

যার সাথে শুরু হয় পথ চলা জাগ্রত যাত্রীর
দিল সে ইশারা আজ আত্মত্যাগ হাতেম তা'য়ীর।।

[নৌফেল ও হাতেম]

নিশ্চিতভাবেই এতে কাব্যবোধের চেয়ে কর্মপন্থা বড়। একটি কবির বিকাশের পক্ষে এ যে কত আত্মবিরোধী, তা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস মাত্রই প্রমাণ দেবে। ধর্ম বা আদর্শচেতনা বা কোনো প্রকার চেতনার সঙ্গেই কাব্যের বিরোধ নেই। কিন্তু তা যদি কবির বোধ ও কল্পনাকে গ্রাস ও আচ্ছন্ন ক'রে কেবল প্রচার ও কর্মসূচীর ভাষা হয়ে ওঠে, তাহলে মাত্র কবিতার অপমৃত্যু ঘটে স্বাভাবিকভাবে। তাছাড়া উপরোক্ত উদ্ধৃত দুটো শিরোনাম ও প্রসঙ্গ-টীকা থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিলে ওতে যুগচিহ্নেরও কিছু পরিচয় খুঁজে পাওয়া যাবে না। নজরুলও মুসলিম গৌরবের উল্লেখে জাগরণমূলক উদ্দীপনার সঞ্চার করতে চেয়েছেন। সেখানে মানবিকতারই প্রধান আবেদন, সমমর্মিতাই প্রধান সুর। কিন্তু ফররুখ আহ্‌মদ যতই এগিয়ে গেছেন ততই তার লেখায় বিশিষ্ট আদর্শ, বিশিষ্ট আন্দোলন, বিচ্ছিন্ন পথ এবং স্বাতন্ত্র্য-সীমিত প্রচার প্রধান হয়ে উঠেছে। কাব্যের আবেদন সর্বজনীনতার ভিত্তি থেকে সরে এসেছে ধীরে ধীরে। আর সবচেয়ে বড় কথা হলো এই যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তার আদর্শের সঙ্গে সাম্প্রতিক উদ্ভিদ্যমান জীবনের যোগ ঘটাতে পারে নি। জীবনের জীবন্ত প্রবহমান স্রোত কয়েকটি মাত্র ব্যতিক্রম ছাড়া কোথাও তাঁর কাব্য স্পর্শ করে নি। কয়েকটি ধারণাগত মৌলিক প্রত্যয়ে তিনি উদ্বুদ্ধ হয়েছেন এবং তাঁর বিমূর্ত প্রক্ষেপেই মাত্র তিনি সন্তুষ্ট থাকতে চেয়েছেন। আয়ুর অগ্রসরমান অভিজ্ঞতা তার কাছে কোনো মূল্য পায় নি—তার কাব্যে তা পরিশীলিত রূপায়ণে (pure experience) মণ্ডিত হওয়ার সুযোগও পায় নি।

অথচ নজরুলের উদ্যত কণ্ঠের অব্যবহিত পরেই 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে ফররুখের উদ্যত তন্ময় কণ্ঠ শোনা গিয়েছিল। নজরুলের উচ্চকিত আবেগ উদ্বেলতার পরে ফর্‌রুখের মথিত মন্দ্রিত ধ্বনি ব্যথিত সংযমে স্বাপ্নিক সাহসের উদ্বুদ্ধ পরিচয় আমরা পেয়েছিলাম। নজরুলের অতীত উল্লেখ যেখানে জনসভার উল্লেখের মত শিরায় দিয়েছে ঘা সেখানে ফর্‌রুখের উল্লেখ স্পর্শ হেনেছে চেতনায়, মননে, মনোগঠনে, মানসে! নজরুলের Attitude ছিল শুধুই জাগরণের, ফর্‌রুখের ছিল উদ্বোধনের। লক্ষণীয় যে ফর্‌রুখের উল্লিখিত গুণগুলোর সবগুলোই অধিকতর পরিণত কবিগুণ। তার অর্থ এই যে, ফর্‌রুখ আহমদেরদ কবি-সাফল্যের সম্ভাবনা অন্তত ঐতিহ্য পর্যায়ে নজরুলের চেয়ে বেশী ছিল। কিন্তু আশ্চর্য এই যে নজরুলের সমান কবি-সাফল্যও তিনি অর্জন করতে পারেন নি। এমন কি চেতনাগত দিক থেকে নজরুলই তাঁর চেয়ে অধিকতর আধুনিকও রয়ে গেছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সম্ভাবনা 'সাত সাগরের মাঝি'তেই আভাস দিয়ে বিলীন হয়ে গেছে এই প্রতিশ্রুতি সার্থকতার পথে আর এগোয় নি। এর কারণ এই যে, নজরুল অধিকতর কম কবি-পরিশীলন নিয়েও জীবনের

বিশ্বাসযোগ্যতার মধ্যে আবর্তিত হয়েছেন, প্রবহমানতায় তিনি সংযোগ রেখেছেন, সঞ্চারিত হয়েছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্গে বর্তমানের ঘটমানতার সঙ্গে সাম্প্রতিকতার সংক্ষোভের সঙ্গে যোগ আর কিছুতেই ঘটিয়ে তোলেন নি অর্থাৎ মুহূর্তের পটে তিনি জাগতেই চান নি।

অথচ বিষয় ও আদর্শ যে ভাষায় কাব্য হয়, যে ছবিতে চিত্রকর হয়, যে মূর্ছনায় লিরিক হয়, যে ধ্যানে আত্মগত হয়, যে কল্পনায় বাস্তবতা ও ঘটমানতা crudeness ছাড়িয়ে ওঠে এবং যার দ্বারা বিশেষ বক্তব্যের প্রশ্ন-সাপেক্ষতার ঊর্ধ্বে শৈল্পিক রসে স্বচ্ছন্দ হয়ে উঠতে পারে তা ফর্‌রুখের অনায়ত্ত ছিল না ('সাত সাগরের মাঝি' কাব্য গ্রন্থ এর প্রমাণ) এবং কী করে এই কাব্যপদ্ধতি জীবনের সঙ্গে মিশে তার পরিচয়ও তার মধ্যে রয়েছে। ('সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থের 'ডাহুক', 'লাশ'. 'আউলাদ', 'ঝরোকা'য় এবং কয়েকটি সনেট এর নিঃসন্দেহ প্রমাণ হিসেবে উপস্থিত।) কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বোধ করি কাব্যের এই পথে উৎসারিত হওয়াটা খুব যথাযথ ও ঐকান্তিক মনে করতেই পারেন নি। শেষ পর্যন্ত কাব্যের চেয়ে আদর্শ বড় হয়ে উঠেছে তার কাছে, আদর্শ সাধনাকেই আঁকড়ে ধরেছেন তিনি প্রাণপণে। ফলে অবশ্যম্ভাবী বিপর্যয়টা নেমে এসেছে সহজেই সরল পথেই।

Yeats-এর প্রথম দিকের কবিতায় ন্যাশনালিজমকেন্দ্রিক আদর্শবোধ প্রধান ছিল। কিন্তু Yeats বুঝতে পেরেছিলেন শুধু এমন নির্ভরতার মধ্যে কাব্যের অগ্রসরতা ও বিকাশ সম্ভব নয়। তিনি জেনেছিলেন ঃ

> The modern world is more powerful than any propa ganda, that no nation can isolate itself from the crisis of the modern world.

একজন আধুনিক কবির পক্ষে এই জীবনদৃষ্টির প্রয়োজন যে কতখানি তা সহজেই অনুমেয় ফলে Yeats এগিয়ে গেছেন। আর তাছাড়া নিজের দেশের Legend ও lory here-এর উপর Yeats-এর দক্ষতাও ছিল অপরিসীম। এতে করে ঐতিহ্য সঞ্চরণে দেশের হৃদয়-অভ্যন্তরে প্রবেশের স্বাভাবিক সূত্রও Yeats-এর সহজাত আয়ত্তে ছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ঐতিহ্যবোধের একদিকে একনিষ্ঠ অচল সীমাবদ্ধতা এবং অন্যদিকে দেশজ সূত্র থেকে বিচ্ছিন্নতাই যে তাঁর কাব্যভাবনাকে স্থবির প্রবাহচ্যুত ও আত্মসর্বস্ব করে তোলার অন্যতম কারণ তা সহজেই ধারণা করা যায়। Yeats-এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে তার আজীবন প্রিয়া Maude Gonne উগ্র বিপ্লবী আদর্শ এবং O'Leary-এর প্রভাবিত দেশপ্রেম তাকে এককভাবে আবদ্ধ করে রাখতে পারে নি এককালে Yeats, যখন তিনি Still a young man he began to conceive a plan for bringing together the two halves of Ireland so as to build a `unity of life' ` that would produce a great Literature.' (Crisis in Engl... Poetry-VDS Pinto.) এমন ধারণাও পোষণ করতেন। তিনি এই ধার

www.pathagar.com

নিজেকে ধরে রাখেন নি। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন প্রথমত কোনো একক বিষয়ের প্রতি আজীবন সীমাবদ্ধ একমুখিতা কখনও শিল্পের মুক্তি আনতে পারে না। কবির বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের ধারাবাহিকতা অবশ্যই রক্ষিত হতে পারে, কিন্তু তা কেবলই পুনরাবৃত্তির মধ্যে বিধৃত হলে কবি বাঁচে না। তাকে অবশ্যই প্রবহমান জীবন ও পরিপার্শ্বের মধ্যে সত্য খুঁজতে হবে। কেননা একজন কবির আত্মবিকাশ হল তাঁর কাব্য সাফল্যের জন্যে একটি মৌলিক চাহিদা এবং এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিপত্তি ঘটায় যা তাহল পুনরাবৃত্তি ও সীমাবদ্ধতার একঘেঁয়েমি। কবির মনে স্বভাবতই সচলতা থাকবে, অগ্রসরপ্রবণতা থাকবে, প্রসারতা ও বিস্তৃতি থাকবে। কেননা কবিই একমাত্র স্রষ্টা-নতুনতর সৃষ্টির দিকে এগিয়ে যাওয়াই যার মূল লক্ষ্য। এমন কি তিনি নিজেই নিজের অনুকরণে স্থির থাকতে পারে না। তাহলেই তার মৃত্যু। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এই সংকট আরো প্রখর হয়ে উঠেছে দেশজ ভিত্তিতে তিনি তাঁর উদ্ভাবনার উৎস খুঁজে পান নি বলে। Yeats-এর অভিজ্ঞতা বোধ করি এ ব্যাপারে তাঁর সবচেয়ে বেশী সাহায্য করতে পারত।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আমাদের কাব্য সাহিত্যকে আধুনিক উত্তরণে প্রকৃত সাহায্যটা করেছেন তাঁর কাব্যভাষা এবং আঙ্গিকের প্রয়োগে। নজরুল-পরবর্তী যুগের লক্ষণ সম্পন্ন একটি বিকশিত কাব্যভাষার রূপ তাঁর কবিতায় আমরা লক্ষ্য করি। এ ভাষা শিল্পসজাগ এবং তন্ময়তায় উদ্বুদ্ধ ও পরিণত—যা সফল কাব্যভাষার একটি প্রধান চাহিদা। বোধ বক্তব্য স্বপ্ন-কল্পনা ও রুচির এক পরম মিলন ঘটেছে এই ভাষার ধ্বনি উদ্ভাবনার সঙ্গে। এর শব্দ সমাবেশ সঞ্চরণশীল এবং যদিও এতে ব্যবহৃত উপমার জগত প্রধানত দরিয়া, আকাশ, মরুভূমি ও অরণ্য এই কয়টি অঞ্চলের বিষয়সমূহের মধ্যে সীমাবদ্ধ তবু এদের আধুনিক বিচ্ছুরণ স্বভাব Centrifugal রয়েছে। সহজেই উপলব্ধি করা যায় এই আয়োজন পরিশীলিত এবং স্বাতিক্রমণী গুণসম্পন্ন। ভাষা ব্যবহারের ট্র্যাডিশনের ফল অবলীলায় তিনি আয়ত্ত করেছেন এবং কাব্য ভাষায় আধুনিক সমুন্নতির তিনি অংশীদার। অবশ্যই একথা এখানে বলা ভাল যে, সাফল্যের এই মর্যাদা 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থ এবং কতিপয় সনেটে যেমন প্রাপ্য ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অন্যান্য কবিতার বেলায় তেমন নয়।

লক্ষণীয় যে, কাজী নজরুল ইসলাম তার মুসলিম বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কবিতার সম্ভবত সবগুলোই তিনমাত্রার ছন্দে রচনা করেছেন: কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পয়ার এবং তিনমাত্রা উভয় ছন্দেই ঐতিহ্য-একান্ত কবিতাগুলো রচনা করেছেন। এতে এই দু'জন কবির এই ক্ষেত্রে ধারণার ভিন্নতা ও প্রয়োগের পার্থক্যও ধরা পড়ে।

নজরুলের এই প্রয়োগরীতি প্রয়োজনভিত্তিক এবং তাঁর কাব্যের এ একটা বিশিষ্ট ধারা মাত্র। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এই চেতনা মজ্জাগত এবং তাঁর সামগ্রিক উৎসারণের সঙ্গে এ জড়িত। ফলে তাঁর হৃদয়ের সকল স্পন্দনে এ ধরা পড়েছে। এ তাঁর যুগত অবিচ্ছিন্ন সুর—নজরুলের ক্ষেত্রে কোনক্রমেই একথা বলা যায় না।

www.pathagar.com

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

চলে গেছেন অপরাজেয়

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আর যাই হোন ভদ্রলোক ছিলেন না। ভদ্রলোকের যে একটা অনমনীয় মাপ আছে নমনীয়তার, বিনয়ের, আত্মসচেতনতার, সন্ধির ও সুবিধাবাদিতার সেই মাপে তাঁর মাপ হয় না—না তাঁর জীবনের, না তাঁর কাব্যের। সেইখানে সেই অভদ্রতাতেই তাঁর অসামান্যত্ব।

যাঁরা জানতেন তাঁকে, ছিলেন তাঁর নিকটবর্তী, তাঁরা কেউ কেউ কখনো কখনো আক্ষেপ করেছেন শুনেছি যে যদি তিনি ভদ্র হতেন, হতেন সহনশীল, যদি কবির অসামান্য শক্তির সঙ্গে মিলতো ভদ্রলোকের খাপ খাইয়ে চলা লোকরঞ্জন গুণাবলী তবে আরো অনেক বেশী আকর্ষণীয় হত তাঁর ব্যক্তিত্ব। হত কি না জানি না, হয়ত হত, কিন্তু মিলতো যদি সেই দুই অতি বিপরীত—অসামান্য শক্তি ও সামান্য ভদ্রতা, প্রচণ্ড শক্তি ও ভদ্র পরমুখাপেক্ষিতা তবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ হতেন না, কবি হতেন না তিনি নিজের মত। প্রবল ছিল তাঁর আবেগ, প্রাকৃতিক শক্তির মত তীব্র কল্পনাশক্তি এবং অনমনীয় ছিল চরিত্র। সমঝোতা, সুবিধাবাদিতা, নম্রতার পথানুসন্ধান তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না আদৌ। এই অনমনীয়তা তাঁকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে অনেকের কাছ থেকে, বিরূপ করেছে অনেককে, কিন্তু এই অনমনীয়তা রক্ষা করেছে তাঁর নিজস্বতাকে।

যদি চরমপন্থী না হতেন, হতেন যদি যখন যেমন-তখন তেমন, তবে নিশ্চয়ই তাঁর জাগতিক স্বাচ্ছন্দ্য বাড়তো পরিমাণে; সাজানো গোছানো স্বচ্ছন্দ জীবন যাপন করতে পারতেন, যেমন করেছেন তাঁর তুলনায় কম শক্তিসম্পন্ন অনেক কবি, লেখক ও বুদ্ধিজীবী। এখনো করছেন। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ভিন্ন ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

তাঁর কবিতা যাঁরা পড়েছেন—এবং সকলেই পড়েছেন, তাঁর সমসাময়িকদের মধ্যে তাঁর কাব্য-প্রতিভা আর কারো ছিল না এই বাংলাদেশে—তাঁরা দেখেছেন তাঁর প্রবল, প্রচণ্ড, অস্থির আবেগকে। বারবার তিনি যাত্রার কথা বলেছেন—অবিচল যাত্রার কথা। স্বর্ণ ঈগল, আকাশ, মাঝি-মাল্লা, নাবিক, তেজী ঘোড়া তাঁর কবিতায় ঘুরে ঘুরে এসেছে। তাঁর সিন্দাবাদ, হাতেম তা'য়ী, হযরত মুহাম্মদ (সঃ) যাত্রীই আসলে। সেই আশ্চর্য কবিতা 'ডাহুক'-এ সামান্য পাখি অসামান্য হয়েছে তার ডাকে ঃ

www.pathagar.com

রাত্রির অরণ্য তটে অশ্রান্ত পাখী
যাও ডাকি ডাকি।
অবাধ মুক্তির মত।

অন্যদিকে—

ভারানত
আমরা শিকলে,
শুনি না তোমার সুর, নিজেদেরি বিষাক্ত ছোবলে
তনুমন করি যে আহত।
এই ম্লান কদর্যের দলে তুমি নও,
তুমি বও
তোমার শৃঙ্খল-মুক্ত পূর্ণ চিত্তে জীবনমৃত্যুর
পরিপূর্ণ সুর।

তাই

তুমি মুক্তপক্ষ নিভৃত ডাহুক
পূর্ণ করি বুক
রিক্ত করি বুক
অমন ডাকিতে পারো। আমরা পারি না।

'পিঞ্জরের অন্ধ কয়েদী' বলেছে হাতেম তা'য়ীকে ঃ

কিন্তু কে যাবে সে মাঠে সুখ-তপ্ত গৃহকোণ ছেড়ে ?
কে আছে এমন যাত্রী, আছে কার মর্দমী এমন
রাত্রির বিলাস শয্যা ছেড়ে যেতে পারে যে সহজে
দুর্গম সড়কে ? কে আছে দরাজ দিল, মুক্ত মন
অন্যের দুর্বহ বোঝা নিতে পারে প্রাণান্ত প্রয়াসে
সর্বত্যাগী ? কে আছে প্রবৃত্তিজয়ী, তীব্র লালসায়
স্খলিত হয় না যার স্থির সত্তা দ্বন্দ্বে ও সংঘাতে ?
দৌলৎ, ইজ্জত, খ্যাতি অনায়াসে মাড়িয়ে কে পারে
মৃত্যুর সম্মুখে যেতে ব্যাথাদীর্ণ ইনসানের কাজে ?
পাই নাই সাড়া তার এতদিনে, জিন্দানখানায়
আসে নাই সে এখনো পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব যার;
তবু দীর্ঘ বিশ সাল আছি আমি তার ইন্তেজারে।

এই দুর্লভ যাত্রী ছিলেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নিজে। পরিপূর্ণ মনুষ্যত্ব চেয়েছেন, এবং সেই লক্ষ্যানুসন্ধানের কালে বিরোধী যে শক্তি অন্ধকার, অত্যাচার, হতাশ্বাস তাকে আঘাত করেছেন সর্বশক্তি দিয়ে। সেই নদীর মত ছিলেন তিনি যে নদী—

www.pathagar.com

প্রবহমান জীবনের নব জাগরণে
ভাসায়ে তরঙ্গ-ভঙ্গে জড়তা, জরার আক্রমণ,
চলে সে উদ্দাম গতি, শঙ্কা নাই সংঘাতের ক্ষণে
মুখাপেক্ষী নয় কারো, মানে না সে শৃঙ্খল বন্ধন।
অবরুদ্ধ হয় যদি যাত্রাপথে কভু অতর্কিতে
প্রচণ্ড আঘাতে ভাঙ্গে সব বাধা, সমস্ত বারণ
বন্যাবেগে মুছে ফেলে নেয় খুঁজে মুক্তি পৃথিবীতে
(অথবা সে যায় মুছে যত বাধা দৃঢ় বা ভঙ্গুর)।

সর্বোপরি বিরোধী ছিলেন তিনি মৃত্যুর। হারামী মওতকে দেখেছেন তিনি, কিন্তু তাকে মেনে নেন নি। 'লাশ' কবিতার সেই পংক্তিগুলো সুপরিচিত ঃ

হে জড় সভ্যতা!
মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ।
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ,
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়।
তোমার শৃঙ্খলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যুদীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও ঃ
ধ্বংস হও,
তুমি ধ্বংস হও।।

এই উক্তিতে কোন ভদ্রতা নেই ক্ষমা নেই কোন প্রকার সহনশীলতার, নিম্নকণ্ঠ আলাপের প্রসঙ্গ এখানে সম্পূর্ণ অবান্তর। ইবলিস ও জাহান্নাম সত্য, কিন্তু তারা ঘৃণার পাত্র। শুধু তাদেরকেই নয়, এই কবি আঘাত করেছেন তাদেরকেও 'জিঞ্জিরে আটক চিড়িয়া' যারা 'হীন কামনায় বুড়া'। এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনাচারী যারা তাঁর বিবেচনায় তাদেরকেও। হায়াত দারাজ খান ছেড়ে কথা কয়নি কাউকে, ক্ষমা করেনি কখনো। কাব্যচর্চা লড়াই তাঁর পক্ষে ছিল জঙ্গের ময়দান।

এই লড়াইয়ে সৌন্দর্যবুদ্ধির স্থান নয়। লড়াই আসলে সুন্দর জীবনের জন্যে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রখর শুভবুদ্ধি, ন্যায়-অন্যায়ের নির্ঘুম চেতনা কোন অবস্থাতেই শিথিল হয় নি। অন্যদিকে সৌন্দর্যচেতনা ছিল তাঁর কল্পনাশক্তির অবিচ্ছিন্ন অংশ। এই দুই-এর ভারসাম্য ছিল; দ্বন্দ্ব ছিল অবশ্যই, কিন্তু ভারসাম্যও ছিল, যে ভারসাম্য না থাকলে রচনা সার্থক কাব্য হয় না। প্রচারের দলিল হয়, নয়ত হয় বিশুদ্ধ কল্পনাচারী

www.pathagar.com

সত্তা। কিন্তু এই ভারসাম্য রক্ষা করা ক্রমশ কঠিন হয়ে পড়ছিল এই কবির পক্ষে, ক্রমশ তিনি প্রচারবিদ হয়ে পড়ছিলেন বেশী করে, ক্রমশ ঝুঁকে পড়ছিলেন মোল্লা-জীবনের দিকে, যে জীবন সৌন্দর্যমণ্ডিত নয়, যে জীবনের পক্ষপাত সুন্দরের দিকে নয়। সেই জন্যে কাব্যসৃষ্টি বিঘ্নিত হয়েছে। হাতেম তা'য়ী পরিকল্পনায় মহৎ এবং উচ্চভিলাষী, কিন্তু সৃষ্টিতে "সাত সাগরের মাঝি'র তুলনায় কম সুন্দর। তার কারণ ততদিনে ভারসাম্য, সেই প্রথম জীবনের ভারসাম্য, বিচলিত হয়েছে—আদর্শবাদী প্রচারকের অত্যন্ত দৃপ্ত ও বলিষ্ঠ ক্ষমতা প্রয়োগে। ফর্রুখ আহ্মদকে ভাবা যায় না তাঁর বিশিষ্ট অনুকরণীয় সৌন্দর্যবুদ্ধি বাদ দিয়ে। "সাত সাগরের মাঝি"র প্রত্যেকটি কবিতায়, "মুহূর্তের কবিতা"র প্রত্যেকটি সনেট সেই মনের অবারিত চিত্র আছে যে মনকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছে দূর যাত্রার স্বপ্ন যে মন একান্তভাবে রোমান্টিক।

ফর্রুখ আহ্মদের শব্দ ব্যবহার বিতর্কিত। তিনি আরবী-ফার্সী শব্দ ব্যবহার করেছেন, পুঁথি থেকে চয়ন করেছেন বাগ্বিধি। কিন্তু সেই সঙ্গে তদ্ভব ও তৎসম শব্দ আছে গা ঘেঁষাঘেষি করে। এবং তারা, সব শব্দ একত্র হয়েছে তাঁর সৌন্দর্যবুদ্ধির সতর্ক শাসনে। এই শাসনে কোথাও শিথিলতা নেই। তাঁর আদর্শনুসারী অন্য কবিরা ব্যর্থ হয়েছেন প্রায়ই, এই সৌন্দর্যচেতনার অভাবে। ফর্রুখ আহ্মদ হন নি। পুঁথির বাগ্বিধি ব্যবহার করেছেন, কিন্তু গ্রাম্য স্থূলতা কি বিশৃঙ্খলাকে প্রবেশাধিকার দেন নি কাব্যে। তদ্ভব শব্দ ও পুঁথির শব্দ বাস গড়েছে সৎ ও সৌহার্দ্যপূর্ণ প্রতিবেশীর মত। তার কারণ তাদের স্বভাবে আছে একই পৌরষ দৃঢ়তা, বলিষ্ঠতা। পুঁথি আর পুঁথি থাকে নি। সামান্য অসামান্য হয়ে উঠেছে। অন্যত্র যেমন এখানেও তেমনি, এই কবি আপোষ করেন নি। তাঁর জীবনযাত্রার উপকণে দারিদ্র ছিল অবশ্যই, সামান্য ছিল গৃহ, অকিঞ্চিৎকর ছিল আয়োজন, কিন্তু তার মধ্যে, সেই দারিদ্র্যের মধ্যে অত্যন্ত ধনী ছিলেন এই কবি, সবকিছু ছাপিয়ে, ছাড়িয়ে অনেক বড় হয়ে উঠেছেন, দীনতা কখনো স্পর্শ করতে পারে নি, আত্মকরুণা সাহস পায় নি কাছে এগুতে। রেডিওর সেই চায়ের দোকান, কমলাপুরের সেই মাঠ এরা নিজেরাও বড় হয়ে উঠত ফর্রুখ আহ্মদ যখন হাসতেন, অথবা হাঁটতেন, পুঁথির শব্দও তাই ফররুখ আহমদের হাতে তারা অন্য বস্তুতে পরিণত হয়েছে—সামান্যতা হারিয়ে।

ফর্রুখ আহ্মদ ইতিহাসকে ভালোবাসতেন। কিন্তু অনৈতিহাসিক ছিল তাঁর ইতিহাসচর্চা। তিনি পেছনে চলে যেতে চেয়েছেন, ভেবেছেন উদ্ধার করবেন অতীতের গৌরব। অনির্দিষ্ট, নাম না-জানা জগতে যাবার কথাই বলেছেন কবিতায়, যেতে চেয়েছেন অনিবর্চনীয় রহস্যলোকে, কিন্তু আদর্শবাদের অনিবারণ পরিচালনায় যে জগতের স্থাপন করেছেন সামনে তাতে অজানার স্থান ছিল না, কেননা সে এক পুরাতন,

www.pathagar.com

মৃত ও পূর্বনির্দিষ্ট জগৎ। ভ্রমণ করতে চেয়েছেন, কিন্তু যে পথে যাবেন সে পথটা বন্ধ ও অন্ধ, সে-পথ শেষ হয়েছে অনিবার্য দেওয়ালে।

যে-ইসলামকে তিনি চেয়েছেন পুনরুজ্জীবিত করতে, সে-ইসলাম অবশ্যই শাসক ও শোষকের প্রচারক্লিষ্ট জীর্ণ ধর্ম নয়। ব্যবসায়ের জন্যে নয়, নিপীড়ন তো নয়ই, ইসলামকে চেয়েছেন তিনি শোষণমুক্ত সমাজের নির্মাতা হিসাবে। এই চাওয়া, নিষ্ঠুর পরিহাস ভাগ্যের, তাঁকে শাসকদের কাছে নিয়ে গেছে, তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলদের কাতারে। তিনি ব্যবহৃত হয়েছেন প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির হাতে। পয়সা করেন নি। তাঁর সকল ভ্রমণই মানসিক। পাকিস্তান সৃষ্টি বাঙালী মধ্যবিত্তের জন্যে দেশ-ভ্রমণের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সেই প্রশস্ত পথের পথিক হন নি। আরব-ইরান দূরের কথা তিনি পশ্চিম পাকিস্তানেও যান নি। সরকারের সঙ্গে তাঁর সহযোগিতা ছিল না, সে সহযোগিতা অনেক প্রগতিশীল। করেছেন, করে বিত্ত গড়েছেন নিজের এবং প্রগতিশীলতাকেই সন্দেহভাজন করে তুলেছেন লোকসমক্ষে। কিন্তু ফররুখের নিজের কাজ, শোষণমুক্তি-পথের কাজ, সহায়তা দিয়েছে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে। এবং সেই কাজ তাঁকে বিচ্ছিন্ন করেছে দেশের প্রবহমান জনজীবন থেকে। তাঁর ইকবাল অবশ্য শাসকদের ইকবাল নন। তিনি বেছে বেছে অনুবাদ করেছেন শোষণবিরোধী ইকবালের। কিন্তু ইকবাল তো দূরের মানুষ, ইকবালের পাকিস্তান তো চূড়ান্ত বিচারে মিত্র ছিল না এদেশবাসীর। সৎ অভিপ্রায় এবং সততার সঙ্গে আদর্শবাদের চর্চা তিনি যত বেশী জোরে আঁকড়ে ধরেছেন ততই তিনি দূরে সরে গেছেন জনজীবনের কাছ থেকে। তিনি জনতার স্তরেই ছিলেন, জনতার বন্ধু ছিলেন মনে মনে; কিন্তু তাঁর আদর্শবাদী সাধনা জনতার লাইন থেকে ক্রমান্বয়ে দূরে সরিয়ে দিয়েছে তাঁকে।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে যখন প্রশ্ন ওঠে রাষ্ট্রভাষা নিয়ে, তখন পাকিস্তানবাদী এই কবি একথা বলতে দ্বিধা করেন নি যে—

> এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে। যদি তাই হয় তাহলে একথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। [সওগাত, আশ্বিন, ১৩৫৪]

আরো বলেছেন যে প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণী চাইবে না বাঙলা ভাষার সাংস্কৃতিক দীনতা ঘুচুক। কিন্তু তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস করতেন ঃ

> নিরক্ষর জনগণকে সকল দিক দিয়ে বঞ্চিত করবার চেষ্টা এঁদের এ পর্যন্ত সফল হলেও, আর সম্ভব হবে না। সময়ের চাকা তার গতি পরিবর্তন করেছে। জনগণের ন্যায়সঙ্গত দাবিকে চেপে রাখা কারুর সাধ্যেই কুলোবে না।

এ দুঃখ আমরা কোথায় রাখব যিনি এমন স্থিরনিশ্চয় ছিলেন জনগণের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে, পক্ষে ছিলেন সাধারণ মানুষের অত্যন্ত স্পষ্টভাবে, তাঁর পরিবর্তিত না হোক

www.pathagar.com

পরবর্তী আদর্শবাদ তাঁকে পরিচালিত করেছে সেই পথে যে পথ ঐ প্রতিক্রিয়াশীলদেরই উৎফুল্ল বিচরণ ভূমি।

এই পথ-নির্বাচনে ক্ষতি হয়েছে তাঁর কবিতারও। কল্পনার তেজী ঘোড়াকে তিনি আটক করে রেখেছেন অসুস্থ, দুর্গন্ধযুক্ত আস্তাবলে। তাতে নষ্ট হয়েছে স্বাস্থ্য। যে মৃত্যুকে তিনি অমন ঘৃণা করতেন সেই মৃত্যু প্রবেশ করেছে তাঁর কল্পনার জীবনে সবলে, সদম্ভে।

সমাজে অর্থনীতির যে প্রবল ও নিয়ামক প্রতাপ তাকে অবজ্ঞা করতেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। সেইখানে তিনি অনেক দূরে মার্কসবাদীদের পথ থেকে, যদিও তিনি পুঁজিবাদীকে ঘৃণা করতেন পুরোপুরি। সেইখানেই প্রধান দুর্বলতা তাঁর ইতিহাস-চেতনার। অর্থনীতিকে তিনি মূল্য দেন নি ব্যক্তি জীবনে, দেন নি সামাজিক চিন্তার ক্ষেত্রেও। যে জড় সভ্যতাকে তিনি পদাঘাত করতে চেয়েছেন প্রচণ্ড ঘৃণায় সেই সভ্যতার শক্তি ছিল তাঁর অর্থনীতিতে। তিনি যেমন ক্ষমা করেন নি সভ্যতাকে, সভ্যতাও ক্ষমা করে নি তাঁকে। ফিরিয়ে দিয়েছে আঘাত প্রত্যাঘাত করে।

জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে হয় যদি জড় সভ্যতাকে তবে সে কাজ একা করলে চলবে না, চলে নি কোনদিন, করতে হবে আরো অনেকের সঙ্গে মিলে। সম্মিলিত হাতে টান দিতে হবে তাকে ধরে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এই প্রয়োজনকে উপেক্ষা করেছেন। তিনি একাকী নেমেছেন লড়াইয়ে। নেমে পাশে পেয়েছেন যাদের তারা প্রগতিবিরোধী, অনেকেই আধ্যাত্মিক বস্তুবাদী, অর্থাৎ বিষয়ের ব্যাপারে উৎকটরূপে লোভী। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের পক্ষে ঘৃণা করবার কথা এইসব স্বার্থবাদীদের কিন্তু তিনি ঘৃণা করতে পারেন নি। আর পুঁজিবাদকে জড়বাদ বলে চিহ্নিত করায় ভ্রান্তি এই যে তাতে পুঁজিবাদের শোষণকারী চরিত্র অস্পষ্ট হয়ে যায়। পুঁজিবাদ ও সমাজবাদ একই চেহারায় ধরা দিয়েছে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে, কেননা উভয়কে দেখেছেন তিনি বস্তুবাদী হিসাবে—এই দেখায় দুয়ের মধ্যকার বিপুল তফাৎটা অবলুপ্ত হয়ে গেছে।

তাছাড়া তিনি লড়েছেন ইতিহাসের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে, পেছনের দিকে ফিরে। সেই দিকটা মৃত্যুর দিক। তিনি লিখেছিলেন,

> এবার যদি এ তাজী হয় বানচাল
> তক্তায় ভেসে পাড়ি দেব কালাপানি,
> হাজার জীবন হয় যদি পয়মাল
> মানব না পরাজয়।

মানেন নি পরাজয়। কিন্তু সমাজ বসে ছিল না। সে মৃত্যুকে প্রবিষ্ট করে দিয়েছে তাঁর কল্পনায়, যে কথা আগে বলেছি। কবিকে সে পরিণত করতে চেয়েছে মোল্লায়। ফররুখ আহ্‌মদের অসুন্দর কল্পনায় প্রবেশ করেছে। অন্তত রুষ্ট অকাব্যিক, অমিত্র এক

www.pathagar.com

সত্তা যে জেগে উঠেছে তাঁর মধ্যে সেটা সত্য। 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্যনাট্যে নায়ক হবার কথা হাতেমেরই। কিন্তু অর্থপুস্তক প্রণেতারা যে দেখিয়েছেন নৌফেল, প্রবল ও প্রচণ্ড প্রতিপক্ষ, নায়কবৈরী নোফেলই আসলে নায়ক ঐ নাটকে সেটা সত্যদর্শনই বটে। এতে অসন্তুষ্ট হবার কথা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কিন্তু নীতিবাদীতে কবিতে যে বিরোধ গড়ে উঠেছিল তিনি মানুন না মানুন তা বাস্তবিক। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ মাইকেলকে ভালো-বাসতেন। সাদৃশ্য ছিল দুজনের। অমিত্রাক্ষর প্রিয় ছিল ফর্‌রুখের; দৃঢ় ছিলেন তিনিও, যশোরের ছিলেন তদুপরি। কিন্তু মাইকেল যেমন করে রাবণকে পছন্দ করেছেন রামকে ফেলে তেমন কর্ম সম্ভব ছিল না এই কবির পক্ষে।

তিনি চলে গেছেন তাঁর নিজস্বতা নিয়ে, সন্ধি না করে পরাজয়কে না মেনে। অভদ্র জগৎ ভদ্রাচরণ করে নি তাঁর সংগে, যেমন তিনি নিজেও করেন নি জগতের সংগে। অত্যাচারী সভ্যতার ধ্বংসের প্রত্যাশিত মুহূর্ত আসে নি এখনো এদেশে, কবে আসবে কে জানে। একজন লড়েছিলেন তার বিরুদ্ধে, পরাজিত হন নি তিনি কিন্তু পরাভূত হয় নি শত্রু সভ্যতাও।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ

ফর্‌রুখের কবিতা ঃ তার শিল্পরূপ

ফর্‌রুখ-কাব্যের বৈশিষ্ট্য

বাংলা কাব্যে বিদ্রোহী-চেতনার বলিষ্ঠ রূপকার কাজী নজরুল ইসলাম। শুধু 'বিদ্রোহী' কবিতাতেই নয়, তাঁর এ-চেতনার শিল্প-রূপময় প্রকাশ ঘটেছে আরও অজস্র রচনায়। এই বিদ্রোহী চেতনার প্রকাশ ঘটাতে গিয়েই তিনি কবিতার শিল্পগুণ ও রূপ-সুষমাকে অনেক সময় গৌণ করে দেখেছেন। কেননা, কবিতার সামাজিক ভূমিকাই তখন তাঁর কাছে মুখ্য হয়ে গেছে। কবিতাকে শুধু রূপ ও সৌন্দর্যের তৃষ্ণা মেটানোর উপকরণ বিবেচনা না করে তিনি একে দেখেছেন মানব-মুক্তির হাতিয়ার রূপে, সামাজিক জাগরণ ও মুক্তি-পিয়াসী জনতার অনুপ্রেরণার উৎস হিসাবেও। কবিতাকে এভাবে ব্যবহার করতে গিয়েই নজরুল ইসলামকে উপজীব্যের প্রকৃতি ও ঐতিহ্যগত পটভূমি অনুসারে কাব্যের আঙ্গিক, ভাষা, ছন্দ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প ইত্যাদি শিল্প-উপকরণের ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সাধন নতুনত্বের আমদানী করতে হয়েছে। এবং এই সূত্রই তিনি হাত পেতেছেন ফার্সী-সাহিত্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত ভাণ্ডারে, হিন্দু ও মুসলিম পুরাণে, স্বদেশীয় ঐতিহ্যের সমৃদ্ধ আধারে। তাঁর কবিতার ভাষায় নতুনত্ব এনেছে আরবী-ফার্সী শব্দ, সংস্কৃতানুগ শব্দ ও আটপৌরে ঘরোয়া শব্দ এবং বাক-বন্ধের পাশাপাশি শিল্পসম্মত ও সৌন্দর্য-সুষমাণ্ডিত ব্যবহার।

নজরুলের আগেও বাংলা সাহিত্যে ফার্সী সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভাণ্ডার থেকে অনেক ঐশ্বর্য আহরিত হয়েছে। বাঙালী কবি ফার্সী কাহিনী-কাব্যের অনুবাদ ও রূপান্তর করেছেন, বাংলা কবিতায় সংস্কৃতানুগ শব্দের পাশাপাশি আরবী-ফার্সী শব্দ ও শব্দবন্ধ ব্যবহৃত হয়েছে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প সৃষ্টিতে ফার্সী-কবিতার রীতিভঙ্গি অনুসৃত হয়েছে। মধ্যযুগ থেকেই চলছে এই আহরণ ও অনুসরণের পালা। বস্তুত বাংলা কবিতায় মানব-মহিমার যে উদ্বোধন তাও ফার্সী ভাষা এবং সাহিত্যের প্রভাবের ফল। মধ্যযুগে ফার্সী সাহিত্য এবং আধুনিক যুগে ইংরেজী সাহিত্যের সংস্পর্শে আসার ফলেই বাংলা সাহিত্যের মুক্তি ঘটেছে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য হয়েছে সমৃদ্ধশালী। আধুনিক যুগে কাজী নজরুল ইসলামই ফার্সী সাহিত্য ও কাব্যভাণ্ডার থেকে অজস্র রত্নরাজি আহরণ করেছেন। নজরুলের আগে অবশ্য সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদারও কবিতার ভাষায় আরবী-ফার্সী শব্দ, বাকবন্ধ ও ফার্সী কাব্যের ঐতিহ্যবাহী উপমা-

www.pathagar.com

চিত্রকল্পের ব্যবহার করেছেন, লিখেছেন 'গজল'; কিন্তু ধর্মীয়, সামাজিক ও ঐতিহ্যের পটভূমির ভিন্নতার দরুন এবং সৃজনী প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বের কারণে নজরুলের হাতেই তা লাভ করেছে অতুলনীয় শিল্প-মহিমা। বস্তুতঃ নজরুল হিন্দু ও মুসলিম ঐতিহ্যের নবরূপায়ণের মাধ্যমে বাংলা কাব্যে প্রবর্তন করেন এক নতুন ও স্বতন্ত্র ধারা।

নজরুলের বিদ্রোহী চেতনা তাঁর পরবর্তী কবিদের মধ্যেও প্রসারিত হয়েছে। যদিও মুসলিম ঐতিহ্যআশ্রিত ধারাটি অনুসৃত হয়েছে প্রধানত মুসলমান কবিদের হাতেই। উপজীব্য আহরণে, জাগরণী ও উজ্জীবনী প্রেরণায় এবং কাব্যে আরবী ফার্সী শব্দের অকুণ্ঠিত ব্যবহার ও উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের নবরূপায়ণে এর পরিচয় স্পষ্ট। এ ব্যাপারে নজরুল তাঁর পূর্বসূরী ও উত্তরসূরী অনেক কবিকেই প্রভাবিত করেছেন। কিন্তু তাঁদের হাতে নজরুলীরীতির কাব্য ফসলের পরিমাণ বাড়লেও, জাত বদল হয় নি। কেননা, এর জন্যে যে সৃজনীক্ষমতা ও সচেতন-কাব্য প্রয়াসের দরকার তা এদের অধিকারে ছিল না।

নজরুলের পর তাঁর উত্তরসূরী কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মধ্যেই প্রথম এই সৃজনীক্ষমতার চমৎকার বিচ্ছুরণ লক্ষ্য করা গেল। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পূর্বসূরীর ঋণ স্বীকার করে, তাঁর কাব্যধারাকে আত্মস্থ করে নিয়ে, নতুন নির্মাণে ব্রতী হলেন, এ-ব্যাপারে তাঁর প্রধান অবলম্বন হলো সমৃদ্ধ পুঁথি সাহিত্য। যদিও সাহিত্যক্ষেত্রে একজন রোমাণ্টিক কবি এবং সুদক্ষ সনেটকার হিসাবেই ফররুখ আহ্‌মদের আর্বিভাব এবং প্রথম প্রতিষ্ঠা, তা হলেও তাঁর কাব্যসাধনার শ্রেষ্ঠতর ফসল তিনি উপহার দিয়েছেন মুসলিম ঐতিহ্য, বিশেষ করে পুঁথি সাহিত্যের নব ব্যবহার ও রূপায়ণের মাধ্যমেই। এ পথেই তিনি অর্জন করেছেন কাব্যে 'প্রতীক' ও 'রূপক' ব্যবহারের কৌশল, কবিতার ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পে প্রাণ-সজীবতা ও ধ্বনিমাধুর্য সৃষ্টির শৈল্পিক রীতি।

তাঁর কাব্যসাধনার প্রথম পর্বে ছিল রোমান্টিকতা, স্বপ্ন ও সৌন্দর্য-বোধেরই প্রাধান্য, যদিও কবিতায় স্বপ্ন এবং বাস্তবের দ্বন্দ্বও একেবারে অপ্রত্যক্ষ ছিল না। কবিতার ভাষা, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প ও রূপ-রীতিতে অনেকটা প্রথাগত রীতির অনুসরণ সত্ত্বেও সৃজনীপ্রতিভার অধিকারী এই কবির রচনাতে ছিল আবেগ অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ এবং স্বতন্ত্র কণ্ঠের উচ্চারণ। স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধের পাশাপাশ মানবিকতাবোধের প্রকাশও ঘটেছে তাঁর প্রথম জীবনের কবিতায়। কিন্তু এই সীমিত সাফল্যে সন্তুষ্ট না থেকে সৃজনী-প্রতিভাধর ফর্‌রুখ আহমদ কাব্যের নতুনরূপ নির্মাণের দিকে অগ্রসর হন। এ ব্যাপারে নজরুল ইসলাম এবং ইকবালের কবিতাই তাঁর প্রধান অনুপ্রেরণার উৎস হয়। ইসলামী আদর্শে গভীরভাবে বিশ্বাসী এবং মুসলিম রেনেসাঁয় প্রত্যয়ী হওয়া পর ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কাব্যের উপজীব্য আহরণ ও রূপরীতি নির্মাণের ক্ষেত্রে ভিন্নরীতির অন্বেষী হন। পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমিতে রেনেসাঁ আন্দোলনের সময়েই তিনি

www.pathagar.com

সচেতন প্রয়াসে কাব্যে মুসলমান ঐতিহ্যের ব্যবহার, বিশেষ করে চলতি ভাষার পুঁথি কাব্যের নবরূপায়ণের দিকে দৃষ্টি দেন। আরব্য উপন্যাসের 'সিন্দাবাদ' কাহিনীকে প্রতীকী উপস্থাপনের মাধ্যমে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নতুন ব্যঞ্জনায় ও গভীর তাৎপর্য মহিমায় মূর্ত করে তোলেন। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "সাত সাগরের মাঝি'র বিভিন্ন কবিতায় মুসলিম জাগরণ, বিজয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রতীক দুঃসাহসী নাবিক সিন্দাবাদের বিভিন্ন সফর অভিযানের আলেখ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে অনবদ্য চিত্ররূপময় ভাষায়। এসব কবিতায় আরবী-ফারসী শব্দসম্বলিত চলতি ভাষার পুঁথি থেকে আহরিত শব্দ, শব্দবন্ধ পাশাপাশি সংস্কৃতানুগ ধ্বনিগম্ভীর শব্দ ও শব্দবন্ধের সাথে একাত্ম সম্মিলনে অপরূপ হয়ে উঠেছে এবং নতুন সুর ও ধ্বনি নিয়ে বেজে উঠেছে।

'সাত সাগরের মাঝি'তে যেমন আছে স্বপ্ন, সৌন্দর্যবোধ ও উজ্জীবনের প্রেরণা, তেমনি আছে বন্দীদশার জন্য হাহাকার ও আহাজারী। আছে আত্মধিক্কার এবং নির্যাতিত নিপীড়িত ও দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িত ক্ষুধাতুর মানুষের জন্যে গভীর মমত্ববোধ। এ কাব্যের 'ডাহুক' কবিতায় অনুপম প্রাকৃতিক পরিবেশ ও রোমান্টিক আর্তির মধ্যে দিয় ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মুক্তসত্তার প্রতীক ডাহুক-এর অশ্রান্ত ডাকের আলেখ্য এবং আত্মধিক্কারে উদ্‌গত হয়েছে বন্দী-মানুষ ও সত্তার জন্যে হাহাকার। বৃটিশ আমলের পরাধীন স্বদেশের মানুষের জন্যে বেদনাবোধ-এর মাধ্যমে প্রতীকী তাৎপর্যে উপস্থাপিত হলেও কবিতাটি অনুপম ভাষা, উপমা-চিত্রকল্পে দেশকাল নির্বিশেষে সব বন্দী মানুষের বন্দীদশারই আলেখ্য। এ-গ্রন্থের 'আউলাদ' 'লাশ' ইত্যাদি কবিতায় মানবতার বিপর্যয়ের জন্যে হাহাকার এবং ক্ষুধাতুর মানুষের জন্যে বেদনা প্রকাশ পেয়েছে, বলিষ্ঠ ভাষায় উচ্চারিত হয়েছে মানবতাবিরোধী শোষক-সমাজ ও সভ্যতার প্রতি অভিশাপ। ইসলামের মানবতাবাদী আদর্শের প্রত্যয়ী কবি মানুষের মুক্তির প্রত্যাশায় ইঙ্গিত করেছেন 'হেরার রাজ তোরণের' দিকে—'সাত সাগরের মাঝি'কে আহবান জানিয়েছেন সেই রশ্মি ধরে, সফরের পর সফরে এগিয়ে যাওয়ার জন্যে। এই কাব্যগ্রন্থে সব আশা, স্বপ্ন এবং উজ্জীবনের প্রেরণাই ভাষা পেয়েছে রূপ ও সৌন্দর্যের পথ ধরে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এইসব কবিতায় সেই রূপ ও সৌন্দর্য ফুটিয়ে তুলেছে কবির গভীর এবং আন্তরিক অনুভূতি, সংস্কৃতানুগ শব্দের পাশাপাশি আরবী-ফারসী শব্দের শিল্পসম্মত অনুপম ব্যবহার এবং উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প সৃষ্টির সৃজনী কৌশল।

'সাত সাগরের মাঝি'তে আছে স্বপ্ন, প্রত্যাশা ও উজ্জীবনী প্রেরণা এবং মুক্তিপথের ইঙ্গিত। তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'তে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ রূপায়িত করেছেন মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সঃ), ইসলামের মহান চার খলীফা ও অন্যান্য সাধক দরবেশের মানবিক আদর্শ ও জীবন-মাহাত্ম্য। কিন্তু মূলত জীবনী-কাব্য হলেও, এ-গ্রন্থেও অনুপম কবিভাষায় ও উপভোগ্য উপমা-চিত্রকল্পে প্রকাশ পেয়েছে মানবতাবাদী আদর্শের উজ্জীবন

www.pathagar.com

ও প্রতীক্ষার প্রত্যাশা। চরিত্রবান, সেবাব্রতী ও কর্মী মানুষের দিকে এই প্রত্যাশাতেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে।

পরবর্তীকালে তাই তিনি পুঁথি-সাহিত্য থেকে আহরণ করে নিয়েছেন নৌফেল ও হাতেম চরিত্র। রচনা করেছেন মহাকাব্য "হাতেম তা'য়ী" ও পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য "নৌফেল ও হাতেম"। তাঁর রচনায় নৌফেল খ্যাতিলোভী অত্যাচারী শাসক এবং হাতেম তা'য়ী দানশীল, সেবাব্রতী ও মানবিক আদর্শেরই প্রতীক। "হাতেম তা'য়ী" মহাকাব্যের আঙ্গিকে রচিত হলেও তাতে নানা ছন্দ ব্যবহৃত। অন্য দিকে "নৌফেল ও হাতেম" কাব্যনাট্যে সংলাপ আঠারো অক্ষর পয়ারে সংরচিত। পুঁথি-সাহিত্যের কাহিনী ও ভাষা নিয়ে আখ্যানকাব্য ও নাট্যকাব্য রচনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম।

কাব্যবক্তারা বলেন, উত্তরাধিকারকে অন্ধভাবে গ্রহণ করার মধ্যে কোন কৃতিত্ব নেই। কবির মন তো নিষ্ক্রিয় মন নয়, সৃজনশীল মন। তিনি ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসাবে যাকে পান তাকে নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নেন। মাইকেল যেমন নিয়েছিলেন রামায়ণের কাহিনীকে। ফররুখ আহ্‌মদও এভাবেই পুঁথি-সাহিত্যের সম্পদশালী অংশ ও ঐতিহ্যমণ্ডিত উত্তরাধিকারদের নতুন করে ঢেলে সাজিয়ে নিয়েছেন, বিষয়বস্তুর প্রতীক রূপায়ণ ঘটিয়েছেন, ভাষার নব ব্যবহার, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পের মাধ্যমে কবিতাকে প্রাণবান ও আকর্ষণীয় করে তুলেছেন। নজরুলের হাতে পুঁথি ও পুরাণের এবং জসীম উদ্‌দীনের হাতে লোক-কাব্যের ঐশ্বর্যমণ্ডিত অংশের নব ব্যবহার এক্ষেত্রে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রেরণার অনেকখানি উৎস হয়েছে।

ফর্‌রুখ-কাব্য ঃ স্বকীয়তার সন্ধানে

প্রেম এবং প্রকৃতিই প্রাথমিক-পর্বে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছিলেন। রোমান্টিক ভাবানুভূতি, স্বপ্ন ও সৌন্দর্যবোধ এবং আশা-নৈরাশ্যের দোলাই কবিতায় উপমা-চিত্রকল্পের মধ্যে দিয়ে ভাষা পেয়েছে। ফররুখ আহ্‌মদ হতাশায় কখনো নিমজ্জিত হন নি, স্বপ্ন, সৌন্দর্য এবং রূপকল্পনাই তাঁর মনে আশাবাদ জাগিয়ে রেখেছে। এই আশাবাদে উজ্জীবিত হয়েই তিনি উচ্চারণ করেছেন ঃ

> এ আকাশ মুছে যাক—এ আকাশে এসেছে জীর্ণতা

বলেছেন ঃ

> তবে মুখ ঢাকো আজ হায় বন্ধ্যা আচ্ছন্ন সবিতা
> দীপ্তদিন তুলে ধরো আঁধারের কালো যবনিকা।

[নাটক]

মনে হয়, প্রাচ্যের দার্শনিক-মহাকবি আল্লামা ইকবালের কবিতার সংগে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অন্তরঙ্গ-পরিচয় তাঁর কাব্যসাধনার প্রাথমিক পর্বেই ঘটে গিয়েছিল; কেননা,

www.pathagar.com

ইকবালের বক্তব্যের সাথে এ-বক্তব্যের যথেষ্ট মিল আছে। ফররুখ আহমদ অনূদিত ইকবালের একটি কবিতায় আছে ঃ 'এ আকাশ জরাজীর্ণ, এইসব তারারা পুরান/আমি চাই সদ্যোজাত পৃথিবী নতুন।' ইকবালের মতো দার্শনিক মনের অধিকারী না-হলেও, কাব্যক্ষেত্রে প্রাচ্যের এই মহাকবির আদর্শের অনুবর্তিতা ফররুখ আহ্মদের রচনায় বিশেষভাবেই দৃষ্টিগ্রাহ্য।

কবিত্বশক্তির পরিচয় দীপ্ত হলেও ফররুখ আহ্মদের প্রথম দিকের রচনায় ভাষা, রীতিভঙ্গী, উপমা-চিত্রকল্প ইত্যাদির ব্যবহারে কোনো উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য কিংবা স্বাতন্ত্র্যের স্বাক্ষর মুদ্রিত ছিল না। কবিতার ভাষা ও ছন্দের ওপর তাঁর দখল ছিল সেই আদি-পর্বেই। বিশেষত সনেট-কবিতা রচনায় তাঁর দক্ষতা ছিল ঈর্ষণীয়! ব্যক্তিগত ভাবানুভূতি প্রকাশে, প্রেম ও সৌন্দর্যবোধের উচ্চারণে, প্রাকৃতিক পরিবেশ রচনায় তিনি প্রথমাবধিই নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। সে-সময়ে নাগরিক জীবন পরিবেশের পটভূমিকায় রাত্রির রূপচিত্র ফুটিয়ে তুলেছেন প্রশংসনীয় দক্ষতায় ঃ

কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি। ডিপোতলে এঞ্জিন বিকল
সুদীর্ঘ বিশ্রান্ত শ্বাস ফেলে জাগে ফাটা বয়লার,
—অবরুদ্ধ গতিবেগ। তারপর আসে মিস্ত্রিদল
গলানো ইস্পাত আনে, দৃঢ় অস্ত্র হানে বারবার।

জ্বলন্ত অগ্নির তাপে এই সব যন্ত্র-জানোয়ার
দিনরাত্রি ঘোরে ফেরে সুদুর্গম দেশে, সমতলে
সমান্তর, রেলে রেলে, সেতুপথ পার হয়ে আর
আর অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে দার্জিলিংয়ে আসামে জঙ্গলে।

আহত সন্ধ্যায় তারা অবশেষে কাঁচড়াপাড়াতে।
দূরে নাগরিক আশা জ্বলে বাল্‌বে লাল-নীল পীত,
উজ্জীবিত কামনার অগ্নিমোহ অশান্ত ক্ষুধাতে;
কাঁচপাড়ার কলে মিস্ত্রিদের নারীর সঙ্গীত।
(হাতুড়িও লক্ষ্যভ্রষ্ট) ম্লান চাঁদ কৃষ্ণপক্ষ রাতে
কাঁচড়াপাড়ায় জাগে নারী আর স্বপ্নের ইঙ্গিত।

[কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি ঃ সওগাত ঃ পৌষ ১৩৪৫]

কিন্তু সনেট-এর ঘনবদ্ধ সুঠামরূপ নির্মাণে দক্ষতা সত্ত্বেও ফররুখ আহ্মদের রচনায় কোন স্বতন্ত্র শিল্প-মহিমার উদ্বোধন তখনও ঘটে নি। বস্তুত, আরব্য-উপন্যাসের উজ্জ্বল-ঐশ্বর্যময় কাহিনীর সাথে অন্তরঙ্গ পরিচয় এবং ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্যের সাথে গভীর নৈকট্যের বোধ আবিষ্কৃত ও স্থাপিত হওয়ার পর থেকেই ফররুখ আহ্মদ

www.pathagar.com

যেন নিজের মধ্যে তাঁর স্বতন্ত্র কবিসত্তাকে খুঁজে পান। ঐতিহাসিক কাহিনীর আলোকে, আরব্য-উপন্যাসের ঘটনার ছায়ায় মুগ্ধচিত্ত কবি বহির্গত হন স্বপ্ন পরিভ্রমণে, দূর অতীতের বাদশাহ্ হারুনার রশীদের কালের নৈশ-নগরী জীবন্ত হয়ে ধরা দেয় তাঁর কল্পনার দৃষ্টিতে ঃ

অপূর্ব কাহিনী সেই মনে হয় সে নিশির ডাক,
কারা যেন ডেকে গেল মধ্যরাত্রে, "হারুনার রশিদ।"
"কারা ডাকে ?—শুধালো না চাহিল না ফিরিয়া বারেক
প্রাসাদ ছাড়িয়া নীচে নেমে এলো হারুনার রশিদ ॥

কালঘুমে, মোহে, স্বপ্নে আচ্ছন্ন, নিমিল দু'নয়ন—
বাগদাদের সৌধশিরে আলোছায়া, চাঁদ দেয় পাড়ি—
মাটির নিশ্বাস পড়ে, শোনা যায় বুকের স্পন্দন,
ছায়ামূর্তিদের পিছে চলে একা হারুনার রশিদ ॥

অনেক অনেক রাত্রি পার হয়ে চলেছে হারুন,
বাগদাদের রাজপথ, স্বপ্ন, তন্দ্রা আলিফ-লায়লা,
সম্মুখে চলেছে ছায়া, কোন কথা কেউ শুধাবে না,
উত্তর দেবে না। শুধু দেখে যাবে হারুনার রশিদ ॥

অপূর্ব কাহিনী সেই, সে কাহিনী অসংখ্য অশেষ।
ছায়ামূর্তিদের পিছে চলে একা হারুনার রশিদ ॥

[হারুনার রশিদ ঃ সওগাত ১৩৪৯]

স্বপ্নে কল্পনায় এ-ভাবেই শুরু হয় ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ইতিহাস পরিক্রমা। একদিকে বর্তমানের পটভূমিতে আপন পরিবেশে বাস্তব জীবনের রূঢ় চিত্র ও সংগ্রামী চেতনার আলেখ্য রচনা, অন্যদিকে ইতিহাসের আলোকে অন্তহীন মানব-যাত্রার আনন্দ-বেদনার কাহিনীর উপস্থাপন এবং আশাবাদের উচ্চারণ ঃ

সে-পথের ধুলি তুলে শুধানু তাদের ইতিহাস ঃ
আনন্দ বেদনা আর ঘরভাঙা, ঘরের আশ্বাস,
সে-পথের ধুলি নিয়ে অন্তরের বাতায়ন খুলি
ধূলি-স্তূপ মাঝে আমি দেখিলাম হয়ে গেছি ধূলি।
দেখিলাম মরুপ্রান্তে চেঙ্গিসের করোটি মিনার
আকাশের প্রান্ত ছুঁয়ে পরশিছে ধুলির কিনার,
দেখিলাম সমুদ্রের যাযাবর মিশেছে ধূলায়
সহস্র রজনী-কথা বাগদাদের ধূলি জনতায়।

চরম ব্যাথার দিন, হে পথিক ! যদি ভুলে থাকো
স্বপ্নের রঙিন ক্ষণ কোনদিন তুমি ভুলোনাকো,
ব্যাথ্যা বারিধির বুকে সেই স্বপ্ন সে আশার দীপ
শূন্যতার মরুরাত্রে ধরিবে সে পথের প্রদীপ।

[পথিক ঃ সওগাত ঃ কার্তিক ১৩৪৯]

ইতিহাস পরিক্রমার পাশাপাশি ফর্‌রুখ আহমদের স্বপ্ন-কল্পনা ও বাস্তব জীবন-চেতনায় স্থান করে নিয়েছে তাঁর আপন সন্নিহিত পরিবেশ প্রাকৃতিক পটভূমি, নৈশ নগর চিত্র, এবং একই সংগে দূর সমুদ্রযাত্রার ইশারা। জীবনকে তিনি দেখেছেন সমুদ্রেরই প্রতীকে—এর ফেনোত্তাল প্রসারিত নীলের দূরবিসারী মহিমায়। তাই কবিজীবনের সেই প্রথম পর্বেই তাঁর উচ্চারণে বারবার ধরা দিয়েছে দূরের বিশাল নদী-সমুদ্র। তিনি প্রত্যাশা করেছেন অথৈ অন্ধকার রাতের শেষে সূর্যকরোজ্জ্বল দিন। গাঢ় অন্তরানুভূতি এবং জীবনবোধের কথা বলতে গিয়ে সমুদ্রের উপমায় ফিরে গেছেন, প্রত্যাশা-শিহরিত ভাষায় তুলে ধরছেন আশাবাদ ঃ

সাত সমুদ্র তের নদী পার
অমাবস্যার গাঢ় আঁধার
রাত্রির মেঘ ছাড়ায়ে তোমার
নব পূর্ণিমা আলো।
দিগন্তের হে অভিযাত্রিক!
শোন কান পেতে
আকাশ, সাগর, নীলা শান্তির আনন্দে ওঠে মেতে;
দুলে ওঠে ফেনপুঞ্জ মুক্ত-সম্ভাবনাময়,
দোলে কলরোলে
জীবন-সমুদ্র আজি ফিরিতেছে দিকে দিকে
উদাত্ত কল্লোলে।

[জীবন-সমুদ্র ঃ সওগাত ঃ মাঘ ১৩৪৯]

সমুদ্র-সন্ধানী, প্রসারিত-জীবনের প্রত্যাশী এই স্বপ্ন-মুগ্ধ রোমান্টিক কবির দৃষ্টিতে দুর্যোগময়, ফেনোত্তাল, গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা 'সাত সাগরে'র ছবি কবি-জীবনের প্রাথমিক-পর্বেই বারবার ধরা দিয়েছে। 'সমুদ্র', 'নাবিক' হয়েছে তাঁর বহু কবিতার উপজীব্য। কিন্তু শুধু রোমান্টিক উপলব্ধি ও অভীপ্সা এবং স্বপ্ন-সৌন্দর্য বোধের প্রকাশের প্রয়োজনেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কবিতায় এসবকে উপজীব্য হিসাবে গ্রহণ করেন নি, বাঞ্ছিত বন্দরের ছবিও তাঁর জীবন-সন্ধানী কবি-দৃষ্টিতে স্পষ্ট হয়ে রূপ পেয়েছে, তাই আশা-ঝলকিত

www.pathagar.com

ভাষায় বন্দর-এর প্রতীকে তাঁর লক্ষ্যে পৌছার কথা তিনি একাগ্রচিত্তে উচ্চারণ করেছেন—সামনের দুস্তর বাধা, তরঙ্গের কুটিল অভিঘাত পেরিয়ে অশ্রান্ত যাত্রার গতিময় সংগ্রামী রূপ ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

ভাঙে সমুদ্রের তীর চূর্ণ হয়ে বালুবেলা পরে
ভাঙে পৃথিবীর তট দুস্তর সে সর্বগ্রাসী ঝড়
ডুবে যায় অস্তমুখী সূর্য এক অজ্ঞাত বন্দরে
কালো আকাশের নীচে জাগে তার জীবন্ত কবর ঃ
হাল ধরে তবু দেখি সে নাবিক, রাত্রির প্রহরে,
সিন্ধু-শকুনের চোখে খোঁজে তার বাঞ্ছিত বন্দর ॥

[নাবিক ঃ সওগাত ঃ অগ্রহায়ণ ১৩৫১]

নদী সমুদ্র এবং সমুদ্র-সন্ধানী 'নাবিক' ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সমসাময়িক ও পূর্বসূরি বহু কবির রচনারই উপজীব্য হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের বহু কবিতার পটভূমি, দার্শনিক-তাৎপর্য-উৎসারিত বক্তব্য সমুদ্র-কেন্দ্রিক, নজরুলের 'সিন্ধু' তো বিরহী-হৃদয়ের আবেগ-আকুলতার উচ্ছল প্রতীক। জীবনানন্দ দাশও তাঁর একাধিক কবিতায় 'নাবিক'কে প্রসারিত সমুদ্রবক্ষে দূরচারী 'সিন্দাবাদ'-এর মুক্তচারিতার রূপে প্রত্যক্ষ করেছেন। নিজেদের 'শৃঙ্খলিত মনের'র জন্যে প্রকাশ করেছেন আত্মগত আহাজারী। কিন্তু সেই আহাজারী একান্তভাবে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ও রোমান্টিক। স্বপ্ন-উৎসারিত এবং তন্ময়-কণ্ঠে জীবনানন্দ বলেছেন ঃ

কবে তব হৃদয়ের নদী
বরি নিল অসম্বৃত সুনীল জলধি।
সাগর-শকুন-সম উল্লাসের রবে
দূর-সিন্ধু ঝটিকার নভে
বাজিয়া উঠিল তব দূরন্ত যৌবন।
পৃথ্বীর বেলায় বসি, কেঁদে' মরে আমাদের শৃঙ্খলিত মন।
—সহস্রের অঙ্গুলি-তর্জন
নিত্য সহিতেছি মোরা, বারিধির বিপ্লব গর্জন
বরিয়া লয়েছ তুমি—তারে তুমি বাসিয়াছ ভালো ;
তোমার পঞ্জরতলে টগ্‌বগ করে খুন—
দুরন্ত, ঝাঁঝালো।

[নাবিক ঃ ঝরা-পালক]

জীবনানন্দের এই অনুভূতির আত্মগত উচ্চারণে ভাষা ও রীতিভঙ্গীর দিক থেকে নজরুলের প্রভাব অনুভূত। উল্লেখ্য, কবি-জীবনের এই পর্বে জীবনানন্দ নজরুলের দ্বারা ছিলেন বিশেষ প্রভাবিত।

www.pathagar.com

জীবনানন্দ দাশের মতো প্রেমেন্দ্র মিত্রও দূর-সমুদ্রের ডাক শুনতে পেয়েছেন। জীবনানন্দের দৃষ্টিতে নাবিক মুক্ত এবং সফরচারী জীবনের অন্য নাম। ফেনোত্তাল সমুদ্র পাড়ি দিয়ে এক 'সাগর' থেকে অন্য 'সাগরে' সে চলে যায়। বিচিত্র দিকচক্রবাল, দেশ-দেশান্তর ও রূপময় সৌন্দর্যদীপ্ত জগৎ তার সামনে প্রসারিত হয়। কিন্তু প্রেমেন্দ্র মিত্র এমন মুক্ত সফরের তৃপ্তিবোধ করেন না, ব্যক্তিমনের প্রতীকে তিনি সমুদ্রচারী নাবিককে অনুভব করলেও মাটির মমতা তাঁকে গ্রাস করে রাখে, প্রেমের আহ্বানে তিনি বন্দী হয়ে যান। তাই আত্মগত উচ্চারণে প্রেমেন্দ্র মিত্রেরও জিজ্ঞাসা ঃ

শুনি জাহাজের ডাক সুদূর বন্দরে.
ডাকে সারা রাত।
সাড়া কেউ দেয় না'ত, ওরা ত ঘুমায়, তবে,
তুমি আমি কেন বা অস্থির!

জানালা রুধিয়া দাও,
জাহাজ ডাকিয়া যাক
সুদূর বন্দরে।
দিগন্ত-পিপাসা যদি
কিছুতে না মেটে, তবে,
এস খুঁজি দু'জনার চোখে।

[জাহাজের ডাক]

কিন্তু ফর্‌রুখ আহমদের কবিতায় নাবিক অশ্রান্ত-সন্ধানী, সমুদ্র-বিজয়ী 'সিন্দাবাদ'। তাই পরিচিতি 'মৃত্তিকার ডোর' ছিঁড়ে ফেলে সে এক সমুদ্র থেকে অন্য সমুদ্রে পাড়ি জমাতে উৎসুক। 'নাবিক'-এর প্রতীকে ফর্‌রুখ আহমদ স্বপ্ন-মুগ্ধ মনের দূরচারিতার আকাঙ্ক্ষা এবং অভিব্যক্তিকেই যেন ভাষা দেন। আত্মগত ও একাগ্র উচ্চারণে বলেন ঃ

মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙ্গে যায়
দূর সমুদ্রের ডাক শুনি'
(যেন মেঘে মেঘে চাপা দৃঢ় বজ্রস্বরে)
তৃষিত বনানী-বক্ষ মোর।
হে নাবিক ! হে মাঝি সিন্দাবাদ !
ভেঙে ফেলো পরিচিত মৃত্তিকার ডোর।

[সসাগরা ঃ সওগাত ঃ চৈত্র ১৩৫১]

কিন্তু ফর্‌রুখ আহমদের এ-সব কবিতায় সমুদ্রের আহবান এবং দূরের বন্দরের ডাক, সেই সংগে সমুদ্র-সফরে বেরিয়ে পড়ার গভীর আকাঙ্ক্ষা ও আকুতি ভাষা পেলেও

www.pathagar.com

প্রতীকের ব্যবহার কোনো উল্লেখযোগ্য স্পষ্ট রূপ নেয় নি। কবিতার ভাষা, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, চিত্রকল্প ব্যবহারেও স্বাক্ষরিত হয় নি তেমন কোনো স্বাতন্ত্র্যের পরিচয়। তাঁর 'সিন্দাবাদ' কবিতাটিতেই এ ব্যাপারে ভিন্ন রীতিভঙ্গীর অনুসরণ উজ্জ্বল ও বর্ণাঢ্যরূপে প্রত্যক্ষ করা গেল। নাবিক, নদী-সমুদ্র ও প্রত্যাশিত বন্দর রূপ পেল ইতিহাসের পটে, আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসে ও উজ্জীবনী প্রেরণায়। 'সিন্দাবাদ'-এর প্রতীকে তিনি ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষাকেই ভাষা দিলেন; কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রশংসনীয় বৈশিষ্ট্য এই যে, তিনি উপজীব্য ও বক্তব্য বিষয়টিকে প্রত্যক্ষভাবে না এনে, রূপপ্রতীকের মাধ্যমে পরোক্ষ-পদ্ধতিতে রূপায়িত করার বিশেষ কবি-কৌশল অবলম্বন করেছেন; ফলে বক্তব্যপ্রধান এবং উদ্দীপনা-আশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও এই পর্যায়ে তাঁর কবিতা হয়ে উঠেছে আবেগ ও অনুভূতিসঞ্জাত, অথচ শিল্পরূপময়। 'সিন্দাবাদ' কবিতায় তাঁর 'সমুদ্র ও নাবিক'কেন্দ্রিক অন্যান্য কবিতার মতো কেবল রোমান্টিক স্বপ্ন-কল্পনা এবং দিগন্তবিসারী নীল-সমুদ্রে বেরিয়ে পড়ার আকুতিই প্রকাশ পেলো না, সেই সংগে সংগ্রাম-দুস্তর পথে বাধা-বিঘ্নময় ফেনোত্তাল সমুদ্রে পাড়ি জমিয়ে প্রত্যাশিত বন্দরে পৌছার আকাঙ্ক্ষাও দীপ্ত হলো। একটি বিশেষ আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসে তাঁর স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হওয়ার ফলে কবিতাটি ব্যক্তি-কেন্দ্রিকতা থেকে প্রসারিত হলো সমাজ-কেন্দ্রিকতায়, একটি আদর্শ-উজ্জীবিত ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক মানব-গোষ্ঠীর স্বপ্ন ও প্রত্যয়ী আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হিসাবে ঃ

> 'অশ্রান্ত সন্ধানী' 'সমুদ্র-বিজয়ী' নাবিক সিন্দাবাদ ফর্‌রুখ আহমদের দৃষ্টিতে 'মুসলিম সমাজ' 'মুসলিম চেতনা' 'মুসলিম গৌরব' ও 'মুসলিম অভিযানের প্রতীক; হেরা পর্বত অনুপ্রেরণার উৎস, আদর্শভূমি ও স্বর্গের প্রতীক॥যেখানে হযরত মোহাম্মদ (সঃ) ঐশী আহবান লাভ করেছিলেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদই প্রথম কবি, যিনি সাফল্যের সংগে মুসলিম অতীত ও মুসলিম পুরাকাহিনীকে বাংলা কাব্যে কাজে লাগিয়েছেন—উর্দূ কাব্যে যেমন কাজে লাগিয়েছেন ইকবাল।
>
> [সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃষ্ঠা ৫০]

কবিতায় স্বপ্ন-কল্পনা ও আদর্শের উজ্জীবনের প্রেরণাকে রূপক ও প্রতীকের মাধ্যমে তুলে ধরা এবং বক্তব্যের শিল্পরূপময় প্রকাশেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিশেষ কৃতিত্ব। ছন্দো-ধ্বনিময় ইমেজোচ্ছল ভাষায় চিত্রের পর চিত্র সাজিয়ে তিনি "সাত সাগরের মাঝি"র সমুদ্র-সফরের রোমাঞ্চকর আলেখ্য রচনা করেছেন। দুঃসাহসী নাবিক সিন্দাবাদের 'জাহাজ'ই কবির আশ্চর্যকল্পনায় ও সৃজনীপ্রতিভার স্পর্শে 'দরিয়ার সাদা তাজী'—এক দুরন্ত নেশা সন্ধানী-জীবনের প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তাই ফেনোত্তাল সমুদ্রের প্রসারিত দিগন্ত, 'পাহাড় বুলন্দ ঢেউ' পেরিয়ে প্রত্যাশিত বন্দরে দিকে অকুতোভয় যাত্রার জন্যে কবির আহ্বান ঃ

www.pathagar.com

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক ;

[সিন্দাবাদ]

*

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী !
খুরের হল্‌কা ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে,
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী...

[বা'র দরিয়ায়]

'দরিয়ার মাতাল অন্ধ তাজী' সমুদ্র থেকে সমুদ্রে পাড়ি দেওয়ার প্রবল নেশায় তীরবেগে ছুটে চলেছে সামনের দিকে, সিন্ধু-ঈগল পাশে পাশে পাড়ি দিচ্ছে ফেনোত্তাল রাতে। দিগন্তে 'কালো টাইফুন মেঘ' জমা হয়ে আসে, বাতাসে ঝড়ের হাহাকার, সমুদ্র জুড়ে বিশাল অন্ধ ঢেউ। কিন্তু তবুও দুঃসাহসী সিন্দাবাদের যাত্রার বিরাম নেই, কেননা 'শত বাধা সমুদ্র পর্বত' পার হয়ে তাকে পৌঁছাতে হবে উদ্দিষ্ট বন্দরে। শ্রান্তি ও অবসাদ কাটিয়ে, মাটির মমতা ও প্রিয়া-মিলনের অত্যুগ্র কামনাকে ভুলে পাড়ি জমাতে হবে 'বা'র দরিয়ার'। কেননা, তার লক্ষ্য তো 'হেরার রাজ-তোরণ' ঃ

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ-তোরণ
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কেঁপে'
এখানে এখন অজস্রধারা উঠেছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজ-তোরণ।

[সাত সাগরের মাঝি]

লক্ষণীয়, সমুদ্রের প্রতি প্রবল আকর্ষণ, সমুদ্র-সফরে বেরিয়ে পড়ার আকুতি ফর্‌রুখ আহমদের অনেক রোমান্টিক স্বপ্নমুগ্ধ কবিতায় সেই প্রাথমিক পর্বেই ভাষা পেয়েছে; কিন্তু সে সব কবিতায় আরব্য উপন্যাসের সিন্দাবাদ কাহিনীর প্রতীক রূপায়ণ এবং ইসলামের ইতিহাস-চেতনা, মুসলিম জীবনাদর্শ ও ঐতিহ্যপ্রীতি তেমন বাঙময় হয় নি; কিন্তু 'সিন্দাবাদ' কবিতা থেকেই উপজীব্যের সাথে সাথে ভাষা, বাকভঙ্গী, উপমা-চিত্রকল্প ও রূপপ্রতীকে আশ্চর্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। মুসলিম পুরাকাহিনী ও আরব্য-উপন্যাসের ঐশ্বর্যময় ভাণ্ডার থেকে আখ্যান ও চরিত্র-সংগ্রহের সাথে সাথে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কবিতার ভাষা ও বাকরীতিতেও আরবী-ফারসী শব্দ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করেন; পুঁথি-সাহিত্যের সমৃদ্ধশালী অংশ থেকে চয়ন করেন আরবী-ফারসী ঐতিহ্য-

আশ্রিত এবং মুসলিম সংস্কৃতি ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচায়ক 'চলতি ভাষার' শব্দাবলী। শুধু ভাষায় নয়, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্পেও রূপ পায় এই বৈশিষ্ট্যের পরিচয়। ফর্‌রুখ আহমদের কল্পনা-প্রতিভা ও সৃজনীক্ষমতার স্পর্শে তাঁর কবিতার স্বতন্ত্ররূপ হয়ে ওঠে জীবন্ত। 'সাত সাগরের মাঝি'র কবি বাংলাকাব্যে অনন্য প্রতিভা হিসাবে অর্জন করেন সশ্রদ্ধ স্বীকৃতি।

ফর্‌রুখ-কাব্যে আঙ্গিক-বৈচিত্র্য

ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক—এই তিনটিই সাহিত্যের প্রধান ও অপরিহার্য অবলম্বন। কবিতা, গল্প-উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্যের যে-কোনো শাখা এবং রূপ-রীতির রচনার জন্যই ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক চাই। ভাবকে অবলম্বন এবং কেন্দ্র করেই ভাষা রূপ পায়, কোনো বিশেষ আঙ্গিক ও রূপরীতিতে ভাব বা বক্তব্য-বিষয় মূর্ত হয়ে ওঠে। এ জন্যই সাহিত্যবেত্তারা বলেন, ভাব নেই অথচ রূপ আছে, সৃষ্টির জগতে এমনটি কল্পনা করা যায় না। সাহিত্যের আদিতম ও সুন্দরতম শাখা কবিতা সম্পর্কে কথাটি আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য। কবি তাঁর আবেগ, অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও স্বপ্নকল্পনাকে ভাষা দেন, ভাষা ও শব্দধ্বনির সহায়তায় নির্মিত উপমা-উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পের সাহায্যে তাকে অভিব্যক্তিময় এবং আকর্ষণীয় করে তোলেন। কবিতা শুধু শব্দ দিয়ে রচিত হয় না, কবিতার জন্যে ভাব এবং বক্তব্যেরও প্রয়োজন। হয়তো সে-ভাব অস্পষ্ট, অনভিব্যক্ত কিংবা জটিলতা আক্রান্ত হতে পারে, হতে পারে ম্লান ও ধূসর। কিন্তু কবিতা রচনার জন্যে কোনো-না-কোনো ভাব বা বক্তব্য অবশ্যই চাই। তবে ভাবের এই আশ্রয় কবিতায় প্রাধান্য বিস্তার করবে, না রূপের মহিমা মুখ্য হয়ে উঠেবে, তাও নির্ভরশীল কবিমানস ও কবিতা-জননের বিশেষ প্রক্রিয়ার ওপর।

কিন্তু সাহিত্যের ভাব, ভাষা ও রূপ॥যাই বলি না কেন, তাকে কোনো-না-কোনো আঙ্গিক অবশ্যই অবলম্বন করতে হয়। কেননা, আঙ্গিক বা অবলম্বন না থাকলে ভাব, ভাষা ও রূপরীতি সুপ্রকাশিত ও মূর্ত হতে পারে না। আঙ্গিক ভাব, ভাষা ও রূপরীতির অবলম্বন এবং নিয়ামক বলেই তা সুনির্দিষ্ট, সংহত এবং সুন্দর রূপ পরিগ্রহ করে। শুধু ভাব বা বক্তব্য বিষয়ই নয়, বস্তুত আঙ্গিকই সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার রূপপ্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয়। গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি যে স্বতন্ত্রধর্মী এবং একটি থেকে অন্যটি আলাদা—আঙ্গিক স্বাতন্ত্র্য, এবং বৈশিষ্ট্যই প্রধানত তার মূলে। কেননা ভাষা এবং ভাষার সাহায্যে নির্মিত উপমা-উৎপেক্ষা-চিত্রকল্প ইত্যাদি সাহিত্যের যে কোন শাখারই অবলম্বন এবং সৃজনীবৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক। এমন কি, ভাষার যে স্বাভাবিক ছন্দধ্বনি তাও কবিতার কোনো একক কিংবা নিজস্ব সম্পদ নয়। গদ্যের ভাষারও ছন্দ-ধ্বনি, তান ও লয় আছে, এবং গদ্যেও উপমা-উৎপ্রেক্ষা-চিত্রকল্প ইত্যাদি রচিত ও

www.pathagar.com

ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আঙ্গিকের এবং রূপরীতির দিক থেকে দেখতে গেলে, কবিতার আঙ্গিক ও গদ্য রচনার আঙ্গিকের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। বস্তুত কবিতা ও গদ্যরচনা প্রকাশরূপের মধ্যেও আছে স্বাতন্ত্র্য ও পার্থক্য। হয়তো এ কারণেই যে-কোন কবির পক্ষে গদ্য রচনা সম্ভব হলেও গদ্য লেখক মাত্রের পক্ষেই কবিতা রচনা সম্ভব নয়।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে আঙ্গিকের গুরুত্ব কোনো দিক থেকেই অস্বীকার করা চলে না, বরং আঙ্গিককে অনেকক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে বেশী গুরুত্বই দিতে হয়। যেহেতু ভাব, ভাষা ও আঙ্গিক এই তিনটিই সাহিত্যের প্রধান ও অপরিহার্য অবলম্বন, সে-কারণে প্রতিভাবান ও সৃজনধর্মী লেখকরা তিনটির প্রতিই বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে থাকেন, এবং ভাব বা বক্তব্য বিষয়ের আবেদনশীল, সুন্দর ও শিল্পরূপময় প্রকাশের জন্যে নতুন, স্বতন্ত্রধর্মী ও নিজস্ব ভাষা এবং আঙ্গিক তৈরি করে নেন। ভাব ও ভাষার বৈচিত্র্যময়তা যেমন আঙ্গিক এবং রূপরীতির বৈচিত্র্যময়তা, তেমনি লেখকের প্রতিভা ও সৃজনধর্মিতারই পরিচয় বহন করে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায়ও ভাব, ভাষা ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে তাঁর সৃজনশীলতা ও বৈচিত্র্যময়তার পরিচয় স্বাক্ষরিত হয়ে আছে। শুধু আঙ্গিকের দিক থেকে দেখতে গেলেও লক্ষ্য করা যাবে যে, তাঁর হাতে সৃজিত হয়েছে সনেট ও চতুর্দশপদী কবিতা ; তিনি লিখেছেন দীর্ঘ খণ্ড ও নাট্যিক কবিতা; রচনা করেছেন কাব্য-নাটক ও মহাকাব্য। ছন্দোযুক্ত কবিতার দক্ষ রূপকার এবং এই আঙ্গিক মাধ্যমের নিষ্ঠাবান সাধক হলেও তাঁর জীবনের প্রায় শেষ-পর্বে তিনি রচনা করেছেন বহুসংখ্যক গদ্যকবিতা ও মুক্তছন্দের কবিতা। এই তথ্যের মধ্যেই অবশ্য ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সৃজনশীলতা ও আঙ্গিকসাধনা এবং কবিতার আঙ্গিকবৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্যধর্মিতার পরিচয় নিহিত নেই, কেননা, তাঁর পূর্বসূরি ও উত্তরসুরি কবিদের মধ্যেও অনেকেই উপরোক্ত বিভিন্ন আঙ্গিকের কবিতা রচনা করেছেন। বস্তুত ফর্‌রুখ আহমদের কাব্যআঙ্গিকের বৈচিত্র্য, স্বাতন্ত্র্যধর্মিতা এবং এক্ষেত্রে তাঁর সাফল্যের পরিমাপ করতে হলে পূর্বসূরি ও উত্তরসুরিদের সাথে তুলনামূলক আলোচনায় তা করতে হবে।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্য-আঙ্গিকের আলোচনায় স্বভাবতই সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার প্রসঙ্গ আসে। কেননা, যতদূর জানা যায় সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার সুদক্ষ রূপকার হিসাবেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রথম সুধী সমালোচক মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অনেকের মতে, সনেট কবিতা রচনার মাধ্যমেই সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁর আবির্ভাব। রোমান্টিক স্বপ্নকল্পনা, উপমা-চিত্রকল্পের প্রাণ-সজীবতা ও অভিনবত্ব, বক্তব্যের প্রতীকী উপস্থাপনা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনেক সনেট ও চতুর্দশপদী কবিতাকেই স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করেছে। শুধু বিষয়বস্তুই নয়—আঙ্গিক ও রূপরীতির দিক থেকে দেখতে গেলেও তাঁর বিপুল সংখ্যক সনেটের মধ্যে বহু বৈচিত্র্য এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার সন্ধান মিলবে। সনেটের আঙ্গিক ও মিল-বিন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় তিনি যেমন বাংলা

www.pathagar.com

সনেটের আদি স্রষ্টা মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাছ থেকে পাঠ নিয়েছেন, তেমনি পূর্বসূরি আরও অনেক কবি এবং তাঁর সমসাময়িকদের দ্বারাও অনুপ্রাণিত হয়েছেন। কিন্তু যেহেতু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন প্রতিভাবান ও সৃজনধর্মী কবি, সে কারণে তিনি পূর্বসূরিদের অনুগত অনুসরণই করেন নি, সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার আঙ্গিক এবং মিলবিন্যাসের ক্ষেত্রেও ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারকে নতুনভাবে ও বিচিত্র রূপে কাজে লাগিয়েছেন। সনেট রচনায় ফর্‌রুখ আহমদ কোনো এককেন্দ্রিক কিংবা সুনির্দিষ্ট নিয়মরীতি অনুসরণ করেন নি, তাঁর হাতে শেক্সপীয়রীয় পেত্রার্কীয় উভয় রীতিতেই যেমন সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা রচিত হয়েছে, তেমনি এমন অনেক কবিতা তিনি রচনা করেছেন, যা প্রথাগত ও প্রচলিত রীতির মধ্যে পড়ে না।

শিল্প-সাহিত্যে প্রধানত দু'ভাগে বিদ্রোহের সুর, নতুনত্বের বাণী ধ্বনিত হয়ে থাকে। এক. উপজীব্যের পরিবর্তনের ক্ষেত্রে, দুই. আঙ্গিকের বিবর্তনের ধারায়। কিন্তু যেহেতু বিষয়বস্তু এবং আঙ্গিকের সম্পর্ক অবিচ্ছিন্ন ও অঙ্গাঙ্গী সে-কারণে শিল্প-রচনার ক্ষেত্রে উপজীব্য নির্বাচনের ব্যাপারে যেমন নতুন বোধ ও মানসচেতনা কাজ করে, তেমনি এই উভয়বিধ সচেতনতা শিল্পীকে নতুন আঙ্গিকের অনুসন্ধানের অনুপ্রেরণা জোগায়। মাইকেল মধুসূদন দত্ত যে বাংলায় নতুন আঙ্গিক ও ভাবধারার রচনা—সনেট-এর প্রবর্তন করলেন, ইটালীয় কবি পেত্রার্ক থেকে অনুপ্রেরণা ও আদর্শের আদল নিলেন, সেও একই সৃজনী মন ও অনুসন্ধানী প্রেরণায়। ফর্‌রুখ আহ্‌মদও সনেট রচনায় প্রথাগত রীতির মধ্যে নিজেকে আবদ্ধ রাখেন নি, বিষয়বস্তুর চাহিদা অনুযায়ী এবং আত্মপ্রকাশের প্রয়োজনে আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এর ফলেই তাঁর হাতে সৃজিত হয়েছে অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ইত্যাদি ছন্দের এবং বিচিত্র আঙ্গিকের সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতা। প্রলম্বিত সনেট, সনেট সিকোয়েন্স রচনা তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষারই ফসল। সনেট বা চতুর্দশপদী কবিতার সীমিত পরিধির মধ্যে নাট্য-কাব্যের আঙ্গিক অনুসরণ এবং নাটকীয় গুণ সঞ্চারিত করে দেয়া যায় কিনা সে পরীক্ষা-নিরীক্ষাও করেছেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। সংলাপের ভাষায় রচিত নিম্নোক্ত কবিতাটির অংশবিশেষ থেকেই ব্যাপারটি স্পষ্ট হবে ঃ

> এক রাত্রে ডালিমের ডালে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল শিশির-
> বিন্দু বলেছিল তার গুলনার সেহেলির কাছে,
> আর এক রাত্রি যদি পাই আমি পথে জিন্দেগীর
> শেষ করে যাব তবে জীবনের যত স্বপ্ন আছে।
>
> শিশিরের কথা শুনে গুলনার বলিল তখন ঃ
> আমারো জীবনে আছে বহু গান বহু স্বপ্ন-সাধ,

www.pathagar.com

মুশতারী তারার মত হয় যদি সুদীর্ঘ জীবন
তাহলে থাকে না আর অতৃপ্ত আশার ফরিয়াদ।

[রাত্রির ঘটনা]

বাংলা সাহিত্যে বহু সার্থক সনেট ও অসংখ্য চতুর্দশপদী কবিতা রচিত হয়েছে। উপজীব্য বিষয়ের ব্যাপকতা ও আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং সংখ্যার দিক থেকে বিচার করতে গেলে, সনেট ও চতুর্দশপদী রচনায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অবস্থান হবে পুরোভাগে। সনেটে ও চতুর্দশপদী কবিতায় নাট্য-সংলাপের প্রয়োগ এবং নাটকীয় গুণ সঞ্চারের প্রচেষ্টা ফর্‌রুখ আহমদের পরীক্ষা-নিরীক্ষারই উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। নাটকে এবং কবিতায় নাট্যগুণ সঞ্চারের এই ব্যাপারটি অবশ্য ফর্‌রুখ আহমদের অন্যান্য কবিতারও একটি বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ও উল্লেখযোগ্য দিক। নাটক এবং কাব্যনাটকে তো বটেই, তার অনেক দীর্ঘ ও খণ্ড কবিতায়ও নাট্যগুণ অনুভবযোগ্য। নজরুল-কাব্যের বৈশিষ্ট্য ও স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে ঃ

> মহৎ কবিতার একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, তার কিছুটা নাটকীয় গুণ থাকে। নাটকীয় গুণ এই অর্থে যে, সকল শ্রেষ্ঠ কবিতাই নিজস্ব জীবন-সম্পদে সমৃদ্ধ। সে কবিতা পাঠে পাঠক নিজেদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস ধ্যান-ধারণাকে সাময়িকভাবে হলেও পরিহার করে পঠিত কবিতার জীবন-প্রবাহে আত্মসমর্পণ করেন। আচারশীল এই জীবনসম্পদের অভাব কবিতার দুর্বলতা প্রমাণ করে। নজরুলের সকল কবিতাতেই এই গুণটি স্পষ্ট, কখনো মাত্রাতিরিক্তভাবেই বর্তমান। পাঠককে টেনে নেবার, টেনে চালিত করার ক্ষমতা তাঁর কবিতার আছে, এবং যথেষ্ট পরিমাণেই আছে। সে কবিতা পাঠে আমাদের পাঠকচিত্ত চঞ্চল হয়, চালিত হয়।'

[সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, নজরুল সাহিত্য, পৃঃ ১২৬]

বস্তুত বাংলা সাহিত্যের অন্যান্য অনেক শ্রেষ্ঠ কবির রচনার মতো, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতাও যে পাঠককে টেনে নিয়ে যায়, তার চিত্ত স্পর্শ করে, নাটকীয় গুণ এর অন্যতম প্রধান কারণ। 'সাত সাগরের মাঝি' এবং 'সিরাজাম মুনীরা'র অনেক কবিতাই নাট্যগুণসমৃদ্ধ। এসব কবিতায় প্রতক্ষ্যরূপে সরাসরিভাবে বক্তব্যের উপস্থাপনা না করে অনেকটা নাটকীয় উন্মোচনে, অনুপম চিত্রকল্প ও উপমার সমাহারে এবং বর্ণনার বিস্তারের মধ্যে দিয়ে পাঠককে অভিভূত ও আচ্ছন্ন করে নিয়ে যাওয়া হয় অন্তিমের দিকে। শুধু 'সিন্দাবাদ', 'সাত সাগরের মাঝি', 'ডাহুক' ইত্যাদি রোমান্টিকধর্মী ও আদর্শ-আশ্রিত কবিতায়ই নয়, বক্তব্যসচেতন ও মর্মস্পর্শী ভাষায় রচিত কবিতা 'লাশ'-এর শুরুও অনেকটা নাটকীয় ভঙ্গীতে আকস্মিক উন্মোচনের মতো।

তবে নাটকীয় গুণ সমৃদ্ধ হলেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আলোচ্য কবিতাবলীতে নাট্যআঙ্গিক অনুসৃত হয় নি, অবশ্য, 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা'র অনেক

www.pathagar.com

কবিতাই নাট্য-সংলাপে রূপান্তরিত করা যায়। 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতাটিতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সর্বপ্রথম নাট্য-সংলাপ ব্যবহার করণ, কয়েকটি চরিত্রের কথোপকথন ও কাব্য-সংলাপের সহায়তায় সমুদ্র-বিজয়ী নাবিক সিন্দাবাদের অভিযানের রূপচিত্র ফুটিয়ে তোলেন। এই নাট্যগুণ ছাড়াও তাঁর বহু কবিতাতেই স্তবক বিশেষে ছন্দের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিষয় ও বক্তব্যের চরিত্র অনুসারে, উচ্চারণের ভিন্নতার প্রয়োজনে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কবিতায় নানা ছন্দ ও স্তবকবিন্যাস-কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, বিভিন্ন রূপের পারস্পরিক সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। আগেই বলেছি, কবিতায় আকস্মিকতা কিংবা নাটকীয়তার আশ্রয় তাঁর বহু খণ্ড কবিতায়ই অনুভবযোগ্য। পরিবেশ রচনা এবং পাঠকদের মানসিক প্রস্তুতির জন্যেই যেন তিনি কবিতায় মূল বক্তব্যের অবতারণার আগে এ ধরনের আকস্মিক উন্মোচন ঘটিয়েছেন। 'নৌফেল ও হাতেম' কাব্য-নাট্যে এবং মহাকাব্য 'হাতেম তা'য়ী'তে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং এই নাট্যকৌশল বিশেষভাবে অনুভবযোগ্য।

কীট্‌স, শেলী, গ্যেটে, হুইটম্যান থেকে শুরু করে মাইকেল, রবীন্দ্রনাথ, নজরুল এমনকি পরবর্তী স্বদেশী-বিদেশী কবিদের অনেকের রচনার সাথেই ছিল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ঘনিষ্ঠ ও অন্তরঙ্গ পরিচয়। তিনি তাঁদের অনেকের কবিতাই অবলীলায় মুখস্থ বলতে পারতেন। বাঙালী কবিদের মধ্যে মাইকেলের প্রতিই ছিল তাঁর সর্বাধিক অনুরাগ। সম্ভবত কবিতায় ঐতিহ্যের নব ব্যবহার, এবং নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায় মাইকেলের সাফল্যই ছিল বেশী। এটাই মাইকেলের প্রতি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনুরাগের প্রধান কারণ। উভয়ের রোমান্টিক মানসপ্রবণতা এবং ক্লাসিক রূপরীতির প্রতি আকর্ষণও হয়তো এই অনুরাগের পটভূমি রচনা করে থাকবে। আমার ধারণা, ফর্‌রুখ আহ্‌মদও কাব্যক্ষেত্রে আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী পর্যায়ে তাঁর কবিতার ঔজ্জ্বল্য এবং শিল্প-সৌষ্ঠবের অভাব অনেকখানি পুষিয়ে নিয়েছেন।

খণ্ড কবিতার পুনরাবৃত্তি এবং রোমন্থনের ক্ষতিকর প্রভাব ও বিপর্যয় থেকে বাঁচবার জন্য এবং পুঁথি-কাব্যের নবরূপায়ণ ও প্রতীকী ব্যবহারের প্রয়োজনে তিনি অবলম্বন করেছেন মহাকাব্য, নাট্যকাব্য ও পূর্ণাঙ্গ নাট্যকাব্য রচনার প্রকরণ। এরই ফলশ্রুতি তাঁর 'হাতেম তা'য়ী', 'নৌফেল ও হাতেম' ও 'ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক কাব্য'। ফর্‌রুখ আহমদের হাতে যেমন হাতেম তা'য়ী এবং নৌফেল ও হাতেম প্রতীকার্থ লাভ করেছে; তেমনি কবিতার আঙ্গিক ও রূপরীতির পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্বাক্ষরও বিধৃত হয়েছে। মহাকাব্য ও কাব্যনাটকের আঙ্গিকে পুঁথির কাহিনীর নবব্যবহার বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত এই প্রথম। কেননা, নজরুল তাঁর কবিতার ভাষায় এবং উপমা, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পে পুঁথির সম্পদসম্ভার অবলম্বন করলেও পুঁথির কোনো কাহিনী কিংবা চরিত্র নিয়ে নাটক অথবা আখ্যানকাব্য রচনা করেন নি। ফর্‌রুখ আহমদের কাহিনী কাব্য ও কাব্যনাটকে

www.pathagar.com

চরিত্রের দ্বন্দ্ব, মানস সংকট ও মানবিক আদর্শ রূপায়িত হয়েছে প্রতীক ব্যবহারের মাধ্যমে।

প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার এবং কবিতার ছন্দ ও আঙ্গিক নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রসঙ্গে ফর্রুখ আহ্মদের গদ্যকাব্য 'হাবেদা মরুর কাহিনী'র উল্লেখ অনিবার্যভাবেই আসে। খণ্ড কবিতায়, আখ্যানকাব্যে এবং নাটকে ফর্রুখ আহ্মদ নানাভাবে প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার ঘটিয়েছেন। কিন্তু সেসব ছন্দোবদ্ধ রচনায়ই ব্যবহৃত, গদ্যে কিংবা গদ্যছন্দের কবিতায় নয়। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' শুধু রূপকাশ্রিত কাব্যই নয়, গদ্যছন্দে রচিত অনেকগুলি কবিতার সমষ্টি। উল্লেখ্য, সৃজনধর্মী কবিরা আবেগ, অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা ফুটিয়ে তুলতে এবং বক্তব্যকে প্রকাশ করতে গিয়ে নতুন ভাষা, ছন্দ আঙ্গিক ইত্যাদি নির্মাণ করেন, নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ফর্রুখ আহ্মদের রচনায়ও এর পরিচয় আছে। তবে তাঁর কবিকর্মের বৃহত্তর অংশই ছন্দোবদ্ধ রচনা এবং কাব্য-আঙ্গিক-নির্ভর। কিছু কিছু গদ্য ছন্দের কবিতা লিখলেও 'হাবেদা মরুর কাহিনী'ই তাঁর একমাত্র গদ্যকাব্য। 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে তিনি আঙ্গিক ও ছন্দের প্রথাবদ্ধ রীতি এবং মনোটনি অর্থাৎ একঘেয়েমী ভেঙেছেন। অবশ্য প্রথাগত রীতি ভাঙার এই প্রচেষ্টা তাঁর মহাকাব্য 'হাতেম তা'য়ী'তেই লক্ষ্যযোগ্য। এই আখ্যানকাব্যে আঠার মাত্রার পয়ার এবং অমিত্রাক্ষর ছন্দ আগাগোড়া ব্যবহার না করে তিনি বিভিন্ন ছন্দ এবং স্তবক বিন্যাসরীতির অনুসরণ করেছেন। আঙ্গিক ও রূপরীতির দিক থেকে মাইকেলের বদলে গ্যেটেই হয়েছে তাঁর আদর্শ। তিনি অনুসরণ করেছেন অনেকটা ফাউস্ট-এর রীতি পদ্ধতি। তাঁর ব্যঙ্গ কবিতা 'তসবির নামা' ও 'নসিহত নামা'তে অনুসৃত হয়েছে অনেকটা ইপিগ্রামাটিক রীতি৷শেখ সাদীর "গুলিস্তাঁ"র সাথে যার সাযুজ্য রয়েছে বলে অনেকের অভিমত।

ছন্দ-নিপুণ ও রূপদক্ষ কবি ফর্রুখ আহ্মদের নবতর আঙ্গিকের রচনা "হাবেদা মরুর কাহিনী"র অন্তর্গত গদ্য কবিতায়ও স্বরপ্রবাহ, ধ্বনিদ্যোতনা এবং ছন্দের চোরা স্রোত অনুভব করা যায়। কিছু কিছু শব্দের স্থানান্তর ঘটিয়ে দুয়েকটি শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে এবং যতি, মাত্রা, পর্ব ইত্যাদির নববিন্যাসে গদ্যাংশকে রূপান্তরিত করা যায় পদ্য ছন্দে। একটি কবিতার অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি এবং রূপান্তর থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে, ফর্রুখ আহ্মদ লিখেছেন ঃ

কাফেলা এসে দাঁড়ালো
হাওয়ার মাঠ দশতে হাবেদায়...
জিন্দেগীর সবুজ নিশানা হারিয়ে
খা খা করছে যেখানে দিগন্ত ছোঁওয়া ময়দান,

www.pathagar.com

যেখানে পোড়ামাটি-রঙ ফসলের শূন্য মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গুমরে উঠেছে রাত্রিদিন...

গদ্য ছন্দে লেখা এই কবিতাংশকে পদ্য-ছন্দে রূপান্তরিত করা যেতে পারে অনায়াসে ঃ

কাফেলা দাঁড়ালো এসে সেই
অচেনা হাওয়ার মাঠ দশতে হাবেদায়
জিন্দেগীর সবুজ নিশানা যত হারিয়ে সুদূরে
খা খা করছে আজ যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া ময়দান
যেখানে রয়েছে যত পোড়ামাটি-রঙ আর
ফসলের ঢের শূন্য মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস গুমরে উঠেছে কেঁদে
শুনি রাত্রিদিন।

ভাব ভাষা ও ছন্দের সুদক্ষ রূপকার এবং আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অক্লান্ত ফর্‌রুখ আহমদ যদি গদ্য ছন্দে না লিখে পদ্য ছন্দে লিখতে চাইতেন, তাহলে উপরোক্ত কাব্যাংশ হয়তো অনেক বেশী প্রাণবান, সজীব এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠতে পারতো। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আঙ্গিকের নতুনত্বের জন্যেই সেদিকে যান নি। বক্তব্যের রূপকাশ্রিত অভিব্যক্তির প্রয়োজনে গদ্য ছন্দ অবলম্বন করেছেন। সুনির্দিষ্ট নিয়ম রীতির অধীনে ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনেকটা প্রথাগত রীতিকে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়, এবং সেক্ষেত্রে সামান্যতম ত্রুটিকেও ছান্দসিকেরা ছাড়পত্র দিতে চান না। কিন্তু ফ্রি ভার্স বা গদ্য কবিতা রচনার সুবিধা এই যে, তাতে ঐসব ক্ষেত্রে বেশ কিছুটা স্বাধীনতা নেয়া চলে, ফররুখ আহমদও সম্ভবত বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার জন্যে "হাবেদা মরুর কাহিনী"তে কাব্য আঙ্গিকের এই স্বাধীনতা নিয়েছেন, অবলম্বন করেছেন গদ্য ছন্দ। হতাশা, জীবনের রুক্ষতা এবং প্রাণহীনতার প্রতীকায়ন আর রূপকাশ্রিত উপস্থাপনই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে নিরেট গদ্য-ছন্দ অবলম্বন এবং আবেগরহিত ও লাবণ্যহীন ভাষা ব্যবহার অস্বাভাবিক কিছু নয়।

রূপক ও প্রতীক

১. ফর্‌রুখ আহ্‌মদের "হাবেদা মরুর কাহিনী" গদ্য-ছন্দে লেখা একটি 'রূপক' কাব্য। কবিতায় রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের তাৎপর্য, এবং এ ক্ষেত্রে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রচেষ্টা ও সাফল্যের পরিমাপ করতে হলে, একথা প্রথমেই মনে রাখতে হবে যে, কবিতায় রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার কবির গভীর জীবনবোধ এবং জীবন-দৃষ্টির পরিচায়ক। কিছুটা দার্শনিক মনের অধিকারী এবং জীবন ও জগৎ সম্পর্কে বক্তব্য-প্রবণ

www.pathagar.com

না হলে, রূপক ও প্রতীক ব্যবহারের দিকে কবি-মন তেমন ঝুঁকতে চায় না; বক্তব্যের রূপকাশ্রিত এবং প্রতীকী উপস্থাপনার গুরুত্ব ও তাৎপর্য থেকে যায় উপলব্ধি ও বোধের অগোচরে।

বস্তুত, অনুভূতি, উপলব্ধি স্বপ্ন-কল্পনা ও আবেগ-আর্তিকে যারা সরল উপস্থাপনায় এবং নিছক বর্ণনার মাধ্যমে তুলে ধরে পরিতৃপ্তি বোধ করেন না, তারা গভীরতা ও ব্যঞ্জনধর্মিতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে রূপক ও প্রতীকাশ্রয়ী হন। ব্যক্তিমনের প্রকাশে যেমন, সার্বজনীন মনের প্রকাশে এবং জাতীয় চৈতন্যের রূপায়ণেও তেমনি, অনেক কবিকেই রূপক ও প্রতীকের শরণ নিতে দেখা যায়; কারো কারো সৃষ্টিতে রূপক এবং প্রতীক অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কের মতো হয়ে দাঁড়ায়, যেমন চিত্রকল্পের মধ্যে উপমাও অন্তর্লীন বা সংগোপন থাকে, তেমনি রূপক-প্রতীকও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা ছাড়াও পরস্পর অন্তরিত হয়ে থাকে।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায়ও রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার আছে। তাঁর রচিত খণ্ড কবিতায় যেমন, তেমনি কাহিনীকাব্যে এবং নাটকেও প্রতীকের ব্যবহার দৃষ্টিগ্রাহ্য, অনুভবযোগ্য। তাঁর "সাত সাগরের মাঝি" কাব্যগ্রন্থে নাবিক, নদী-সমুদ্র ও প্রত্যাশিত বন্দর রূপ পেয়েছে ইতিহাসের পটে, আদর্শ-আশ্রিত প্রতিভাসে ও উজ্জীবনী প্রেরণায়।

'সিন্দাবাদ'-এর প্রতীকে তিনি ইসলামী আদর্শ ও মুসলিম সভ্যতার পুনরুজ্জীবনের আকাঙ্ক্ষাই ভাষা দিয়েছেন। এ-ক্ষেত্রে তিনি উপজীব্য ও বক্তব্য বিষয়কে প্রত্যক্ষভাবে না এনে রূপ-প্রতীকের মাধ্যমে পরোক্ষ-পদ্ধতিতে রূপায়িত করার বিশেষ কবি-কৌশল ও শিল্পরীতি অবলম্বন করেছেন। ফলে নাবিক, সমুদ্র, নিশান, পাখি, পাঞ্জেরী ইত্যাদি একটি আদর্শ-উজ্জীবিত ও সভ্যতা-সংস্কৃতির ধারক মানব-গোষ্ঠীর নতুন ও প্রত্যয়ী আকাঙ্ক্ষার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছে। "অশ্রান্ত সন্ধানী, সমুদ্রবিজয়ী নাবিক 'সিন্দাবাদ' ফর্‌রুখ আহমদের দৃষ্টিতে 'মুসলিম সমাজ' ও 'মুসলিম চেতনা', মুসলিম গৌরব ও অভিযানের প্রতীক, 'হেরা' পর্বত অনুপ্রেরণার উৎস, আদর্শ ভূমি ও স্বর্গের প্রতীক— যেখানে হজরত মোহাম্মদ (সঃ) ঐশী আহ্বান লাভ করেছিলেন।" (সৈয়দ আলী আশরাফ, বাংলা সাহিত্যে মুসলিম ঐতিহ্য, পৃ. ৫০)

বিশ্বের বিভিন্ন দেশের কাব্যেই পাখি একটি বহুল-ব্যবহৃত 'প্রতীক' ও 'রূপক'। বাংলা সাহিত্যেও যুগে যুগে পাখি রূপক ও প্রতীক হয়ে ভাষা পেয়েছে। সেই প্রাচীন কবিতা ও আদি গীতিগাঁথার কথা না হয় বাদ দেয়া যাক, আঠার শতকের মরমী কবি লালন ফকির যখন উচ্চারণ করেন ঃ

খাঁচার ভিতর অচিন পাখি কেমনে আসে যায়,
ধরতে পারলে মনো-বেড়ি দিতাম তাহার পায়।

www.pathagar.com

তখন এর রূপকী ও প্রতীকী ব্যঞ্জনা চেতনায় আঘাত হানে, মুগ্ধ করে। আধুনিক কালের কবিরাও ব্যক্তিসত্তার প্রতীকে, অজানা ও রহস্য-নিবিড় মনের রূপকে এবং আরও নানাভাবে পাখিকে দেখেছেন, বিচিত্রধর্মী কবিতা লিখেছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায়ও 'পাখি' একটি প্রধান প্রতীক। তিনি যখন 'ডাহুক'-এর প্রতীকে মুক্ত-মানুষ ও আত্মার কথা বলেছেন, এবং শৃংখলিত সত্তার জন্যে আহাজারী করেছেন, তখনও কাব্য-সৌন্দর্যের উদ্বোধনের পাশাপাশি সমকালীন জীবনচেতনাও বাঙ্ময় হয়েছে।

কীট্‌সের মতো 'পাখি'কে মুক্ত-আত্মার প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করেছেন ফর্‌রুখ আহমদ 'ডাহুক' কবিতায়। কীট্‌সের 'নাইটিঙ্গেল' যেমন পয়েজি বা শিল্পকলার নামান্তর, ফর্‌রুখ আহমদেও 'ডাহুক' তেমনি মুক্ত-আত্মার প্রতীক॥মুক্তিপিয়াসী মনের সংগ্রামের সঙ্গে মুক্ত-আত্মার একটা তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপিত হয়েছে 'ডাহুক' কবিতায়। পার্থক্য সম্ভবতঃ এই যে, কীট্‌স 'নাইটিঙ্গেল'-কে আবহমান কালের পটভূমিকায় স্থাপন করেছেন, আর 'ডাহুক' একটি বিশেষ সময়-পরিস্থিতিতে ইতিহাসের পটভূমিকায় চিত্রিত। প্রত্যক্ষভাবে কোনো উল্লেখ না থাকলেও বৃটিশ-পরাধীনতা যুগের মর্মবেদনা এবং উপমহাদেশের মানুষের মুক্তিকামী মনের প্রতিফলন আর স্বাধীনতার আকাঙক্ষাও যে এতে বাঙময়, তা বুঝে নিতে কষ্ট হয় না।

একালে রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার শুধু মানস-সংকট, আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা, উপলব্ধি, জীবনচেতনা ও অন্বেষার মধ্যেই সীমায়িত নেই, তার এলাকা আরও বিস্তৃত হয়েছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনেক কবিতায়ও এর পরিচয় মেলে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন ইসলামী আদর্শ ও জীবন-দর্শনে বিশ্বাসী, আধ্যাত্মিকতায়ও তিনি ছিলেন স্থির প্রত্যয়ী, মুক্তিসন্ধানী। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বলতেন, তিনি 'ডাহুক'কে নিঃসঙ্গ সাধকের জিকির এবং তার সাধনার সাফল্যের প্রতীক হিসাবেও ব্যবহার করেছেন। ডাহুক রাতভর ডাকতে-ডাকতে গলায় রক্ত তুলে ডিমে তা ছড়িয়ে দিয়ে ওম দিলেই নাকি বাচ্চা ফোটে। সাধকের সাধনা এবং সাফল্যও অনেকটা ঐ রকমই।

ব্যবহারের স্বাতন্ত্র্য এবং তাৎপর্য যাই হোক, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যসাধনায় 'প্রতীক'-এর ব্যবহার একটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপার। তিনি তাঁর সনেটে এবং সনেট-সিকোয়েন্সেও 'পাখি'র প্রতীকে এ যুগের যন্ত্রণা এবং গ্লানিবোধ ফুটিয়ে তুলেছেন, 'নদী'র প্রতীকে রূপায়িত করেছেন গতিময় জীবন ও আদর্শের উজ্জীবন। বস্তুত ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বহু কবিতায় নদী-নিসর্গ এসেছে জীবনের প্রতিরূপ, এবং প্রাণ-সত্তা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক ও উজ্জীবনী প্রেরণা হয়েই। শুধু খণ্ড কবিতায় এবং সনেটেই নয়, দীর্ঘ কবিতায় ও কাহিনী-কাব্যেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় রয়েছ রূপক ও প্রতীকের ব্যবহার। 'হাতেম তা'য়ী' কাব্যে 'নুররেজ' ফুলের প্রতীকে বর্তমান সভ্যতার অন্ধত্ব

www.pathagar.com

ঘুচানোর পথ-নির্দেশ করেছেন তিনি। এ-কাব্যে প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে একাধিক ক্ষেত্রে।

২.

'রূপক' ব্যবহারের কথা বিশেষভাবে বলতে গেলে, ফর্‌রুখ আহমদের কাব্যগ্রন্থ "হাবেদা মরুর কাহিনী" (যা কবির জীবদ্দশায় ছিল অপ্রকাশিত)-এর উল্লেখ অনিবার্যভাবেই করতে হয়। খণ্ড কবিতায়, আখ্যান-কাব্যে এবং নাটকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নানাভাবে 'প্রতীক' ও 'রূপকের' ব্যবহার ঘটিয়েছেন, কিন্তু সে সব ছন্দোবদ্ধ রচনায়ই ব্যবহৃত, গদ্যে কিংবা গদ্য-ছন্দের কবিতায় নয়। "হাবেদা মরুর কাহিনী" শুধু রূপকাশ্রিত কাব্যই নয়, গদ্যে-ছন্দে রচিত অনেকগুলি কবিতার সমষ্টি। খণ্ডকবিতা হলেও ভাব ও বক্তব্যের দিক থেকে পারস্পরিক অন্বয়ধর্মী ও অন্তর্নিহিত সম্পর্ক আছে এসব কবিতায়। বইয়ের পাণ্ডুলিপির 'ভূমিকা'য় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ লিখেছেন ঃ

> রূপকথার 'হাবেদা মরুর' অন্য নাম হাওয়ার ময়দান। নিঃসীম শূন্যতা আর হতাশার ব্যঞ্জনা আছে এ মাঠের সাওয়ালে। "হাবেদা মরুর কাহিনী" গদ্যে লেখা রূপক কবিা ; ঈসায়ী ঊনিশ শো' সাতান্নর শেষভাগে এই বইয়ের সূচনা আর উনিশ শো আটান্নর প্রথমার্ধে এর সমাপ্তি। ১৩৭৭ হিজরীর ঈদ-উল-আজহার দিনে এই বইয়ের শেষ কবিতা লেখা হয়। দুর্নীতি, অব্যবস্থা আর হতাশা যখন সারাদেশে ছেয়ে ফেলেছিল। [কবির হাতে লেখা মূল পাণ্ডুলিপি থেকে।]

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত এবং 'হায়াত দারাজ খান পাকিস্তানী' ছদ্মনামে সাপ্তাহিক "আজ" পত্রিকায় প্রকাশিত ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'ঐতিহাসিক-অনৈতিহাসিক কাব্য' শীর্ষক ব্যঙ্গ-কাব্যেও তিনি ঐতিহাসিক চরিত্র মীরজাফরের জবানীতে তদানীন্তন শাসক-শোষক ও অন্যান্য সমাজবিরোধী 'নীতিবিদদের' তীব্র সমালোচনা করেছেন। আঠারো মাত্রার অক্ষরবৃত্ত ছন্দে ও প্রবহমান পয়ারে রচিত এই দীর্ঘ ব্যঙ্গকাব্যটি পত্রিকায় প্রকাশের পর তাঁকে নাকি তদানীন্তন কর্তৃপক্ষীয় কেউ কেউ 'কম্যুনিস্ট কবি' বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছিলেন, এমন কি-সে-আমলে তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশও লেলিয়ে দেয়া হয়েছিল।

তৎকালীন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবস্থায় দুনীর্তি, অব্যবস্থা, আদর্শহীনতা আর হতাশা দেখে আদর্শবাদী ও সমাজ সচেতন এবং মানবতাবাদী কবি ফর্‌রুখ আহমদের মন কতটা বেদানার্ত হয়েছিল, তার পরিচয় আছে "হাবেদা মরুর কাহিনী"র অন্তর্গত রূপকাশ্রিত কবিতাগুচ্ছে। একটি কবিতার উদ্ধৃতি থেকেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে ঃ

মনে হয় বন্দী হয়ে আছি
ক্লেদ-পংকিল এক দুঃসহ বন্দীখানায়
(বাদগর্দ হাম্মামের মতই যা ভয়াবহ)

www.pathagar.com

শান্তির চিহ্ন নাই যেখানে
শুধু মধ্যরাত্রে শোনা যায় শয়তানের অট্টহাসি
মানুষ বেঁচে আছে কিন্তু মুর্দার শামিল।
এদের চলা-ফেরা, ওঠা-বসা
সব কিছুই নিষ্প্রাণ,
জড় পদার্থের মত
ঠাণ্ডা,
অনুভূতিহীন।
বিদেশী মুসাফিরের যদি কেউ এখানে আসে
চমকে ওঠে। বলে ঃ এ কোন জমিনে এলাম ?
যদি কেউ বলে ঃ জিন্দেগানীর পথ
খোলা আছে এখনো।
এরা তখন তাকায় বিকারের রোগীর মত
ঘোলাটে, আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে
(হয়তো বিশ্বাস করে না)।

কারণ সত্যিকার মুক্তির পথে
চায়ি নি কেউ এদের নিয়ে যেতে,
চেয়েছে কাহিনীর সেই প্রতারক হাজ্জামের মত
শুধু ভুলিয়ে রাখতে মিথ্যা প্রবঞ্চনায়।

জীবনকে এখন আমরা দেখছি
সেই অতন্দ্র রোগীর মত
রাত্রির দীর্ঘ প্রহর যার সামনে কেটে গেছে
স্বপ্নহীন আর শান্তিহীন,
ভোরের আলোকেও যে শুধু দেখছে
অন্ধকারের তিক্ত বিভীষিকা।

এই 'হাবেদা মরুর' প্রতীকে স্বদেশের তৎকালীন অবস্থাই যে বিধৃত, তা বুঝে নিতে কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু রূপক ও প্রতীকের বৈশিষ্ট্যই এই যে, তা বিশেষ দেশ, সময় এবং বক্তব্যকে ধারণ করলেও, গভীরতর ও ব্যাপকতর ব্যঞ্জনার কারণেই তা অর্জন করে অনেকটা সার্বজনীনতা। আসলে, 'হাবেদা মরু' প্রাণহীনতা, রুক্ষতা, হতাশা, অন্ধকার এবং বিভীষিকারই প্রতীক, এবং এ-কারণেই এর রূপকাশ্রিত উপস্থাপনাও ব্যাপকতর ও সার্বজনীন আবেদনের অধিকার রাখে।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যেমন কীট্‌সের মতো 'পাখির' প্রতীকী ব্যবহার করেছেন, তেমনি তিনি টি, এস, এলিয়টের মতো 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে নিয়েছেন প্রতীক রূপকের আশ্রয়। এলিয়টের 'ওয়েস্ট ল্যাণ্ড' বা 'পোড়া জমি' 'ফাঁপা মানুষ' আধুনিক ইউরোপীয় সভ্যতার অবক্ষয়ের আর বন্ধ্যাত্বেরই প্রতীক। যদিও তিনি যুগ-সমস্যায় পীড়িত ও হতাশায় দীর্ণ মানুষকে ভবিষ্যতের আশা-আশ্বাসের বাণী শুনিয়েছেন।উজ্জীবন ও মুক্তির পথ দেখিয়েছেন। আধুনিক সভ্যতার অবক্ষয়ী রূপ অঙ্কন করতে গিয়ে টি, এস, এলিয়ট মৃত্যুর আতঙ্কে অস্থির ও হতাশায় দীর্ণ মানুষকে অবলোকন করেছেন, আত্মার নিপীড়নে পর্যুদস্ত 'ফাঁপা' মানুষের মখোমুখি দাঁড়িয়েছেন।কিন্তু ক্ষণ-মুহূর্তের জন্যেও হতাশাকে বরণ করে নেন নি। জীবনের প্রতি অনিঃশেষ আশাবাদ, দার্শনিক প্রজ্ঞা ও অভিজ্ঞান এবং সর্বোপরি মননশীল অনুপ্রাণনা তাঁকে জীবনের সঞ্জীবনী-উৎসের দিকে টেনে নিয়ে গেছে—বন্ধ্যাভূমিতেও তিনি মৌসুমী ফসলের প্রতীক্ষা করেছেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদেও আছে অনিঃশেষ আশাবাদ এবং আদর্শ উজ্জীবনের, নতুন সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা। 'হাবেদা মরুর' প্রতীকে এবং এই রুক্ষ ও প্রাণহীন ভূমির রূপকী-উপস্থাপনায় স্বদেশের একটি বিশেষ সময় সন্ধিক্ষণের হতাশাময় আলেখ্য তুলে ধরলেও আশাবাদী কবিকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে বিশ্ব-শান্তির কথা, সর্বমানবের কল্যাণের আকাঙ্ক্ষা ঃ

যেন বঞ্চিত বনি আদমের এই দীর্ঘশ্বাস
রূপ নিতে পারে শান্তির প্রশ্বাসে,
যেন এই তৃষাতপ্ত হাবেদার মরু মাঠ
আবার হতে পারে
সুন্দর শান্তিময় মাটির জান্নাত
দুনিয়ার সকল মানুষের জন্যে
দুনিয়ার সকল মানবীর জন্যে।

ইসলামী আদর্শ, ঐতিহ্য ও মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা, এবং শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই এটা সম্ভব, ঐতিহ্যবাদী ও মানবকল্যাণকামী কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এই গভীর এবং আন্তরিক বিশ্বাসও ভাষা পেয়েছে আলোচ্য কাব্যগ্রন্থে। প্রত্যক্ষভাবে যেমন, নানা প্রতীক এবং রূপকের মাধ্যমেও তা অভিব্যক্ত হয়েছে।

৩.

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় প্রতীক ও রূপকের ব্যবহার যেমন বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার, তেমনি তাঁর রচনায় আঙ্গিকের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, এবং ছন্দের বৈচিত্র্যময় ব্যবহারও বিশেষ উল্লেখনীয়, দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। সৃজনধর্মী কবিরা আবেগ-অনুভূতি, স্বপ্ন-কল্পনা ফুটিয়ে তুলতে গিয়ে যেমন, বক্তব্য প্রকাশের জন্যে তেমনি নতুন

www.pathagar.com

ভাষা, ছন্দ, আঙ্গিক ইত্যাদি নির্মাণ করে নেন নানাভাবে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ছন্দ-নিপুণ এবং রূপদক্ষ কবি ফর্‌রুখ আহমদ ছন্দোবদ্ধ কবিতায়ও বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন, বিভিন্ন ধরনের ছন্দে এবং আঙ্গিকে রূপায়িত করেছেন তাঁর বক্তব্য, ভাবনা-বেদনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার কথা। তাঁর কবিকর্মের বৃহত্তর অংশই ছন্দোবদ্ধ রচনা এবং কাব্য-আঙ্গিক নির্ভর। কিছু কিছু গদ্যছন্দের কবিতা লিখলেও "হাবেদা মরুর কাহিনী"ই একমাত্র গদ্য-কাব্য।

কবিতার ছন্দ নিয়ে ফর্‌রুখ আহমদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং তাঁর গদ্য-কবিতা সম্পর্কে ইতিপূর্বের এক আলোচনায় লিখেছিলাম, 'অন্ত্যমিলযুক্ত, ছন্দোধ্বনিময় কবিতা রচনাতেই ছিল তাঁর বিশেষ প্রবণতা। তাঁর গদ্য-কবিতা, মুক্তছন্দের কবিতা (ফ্রি-ভার্স) প্রায় নেই বললেই চলে। যতদূর জানি, তিনি ছদ্মনামে কিছু গদ্য কবিতা লিখেছিলেন। ---কবি জীবনের শুরুতে তিনি কোনো গদ্য-কবিতা কিংবা মুক্ত–ছন্দের কবিতা লিখেছিলেন কি না জানি না। তবে মাসিক 'সওগাত' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রথম কবিতাটি গদ্য-ছন্দে রচিত ঃ

মাধবী বিতানের পাশে তার ছায়া-বিতান।
তবু সে ফুটলো না মধুরাতে বসন্তের বিহ্‌বলতায়
সঙ্গী বসন্ত যেদিন লুটে পড়ল
অন্তিম-নিঃশ্বাসে, সেদিন
থেকেই বুঝি তার মনে সত্যিকারের
অশ্রুর পরাগ জমতে
আরম্ভ করেছে। সঙ্গীহীনা সে এক কেতকী।

[আঁধারের স্বপ্ন]

১৩৪৫ সালের পৌষ সংখ্যা (১৯৩৮) "সওগাত"-এ প্রকাশিত এই সুদীর্ঘ কবিতাটি গদ্য-ছন্দে রচিত এবং এতে কোনো 'পংক্তি শেষের অন্তমিল'ও নেই। কিন্তু কবিতাটির অনেক পংক্তিই সুনির্দিষ্ট ছন্দে, মাত্রায় ও পর্বে ভাগ করা যায়। যদিও সর্বত্র একই নিয়ম-রীতি এবং মাত্রা ও পর্বের অনুসরণ নেই। কবিতাটিতে শেষের দিকে আশ্চর্যজনকভাবে পংক্তি-শেষের 'মিলও' দু'য়েকটি এসে গেছে। এইসব স্তবক পুরোপুরি ছন্দে সমাপ্ত ঃ

তোমার বুকের গন্ধে কখন ঘুমিয়েছিলাম একা
তোমার মনের কোণে,
পেলব তোমার পাপড়ি দলে সবার অগোচরে
ছিলাম সঙ্গোপনে।
কোন্ সুদূরের স্বপন-মায়ার কাজল-ঘুমের মোহে
জানতে পারি নি তা

www.pathagar.com

আজকে দেখি উঠছে ফুটে আমার মনের কোণে
তোমার মনোলিখা।
বাদল রাতে তোমার গীত অশ্রু রুধির ধারা
শুনছি জেগে একা,
আমার মনের গান যে মেশে তোমার মনের ছায়ে
মেলে মনের লেখা।

[আঁধারের স্বপ্ন]

এই কবিতার গদ্যাংশে ও পদ্যাংশে, কবির জীবনের প্রাথমিক পর্বের রচনা বলেই, ভাষা ও রীতিভঙ্গীর দিক থেকে রাবীন্দ্রিক-প্রভাবের পরিচয়ও মেলে। কিন্তু কবিতায় এমন গদ্য ও পদ্যের পাশাপাশি সংস্থাপন ফর্‌রুখ আহমদের অন্য কোনো কবিতায় রয়েছে কিনা, জানি না। তবে তাঁর বহু কবিতাতেই স্তবক-বিশেষে ছন্দের বৈচিত্র্যময় প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। বিষয় ও বক্তব্যের চারিত্র্য অনুসারে, উচ্চারণের ভিন্নতার প্রয়োজনে, তিনি কবিতায় নানা ছন্দ ও স্তবক-বিন্যাস কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন, বিভিন্ন রূপের পারস্পরিক সন্নিবেশ ঘটিয়েছেন। কবিতায় আকস্মিকতা কিংবা নাটকীয়তার আশ্রয় তাঁর বহু কবিতায়ই অনুভবযোগ্য। পরিবেশ রচনা এবং পাঠকদের মানসিক প্রস্তুতির জন্যেই যেন তিনি কবিতায় মূল বক্তব্যের অবতারণার আগে এক ধরনের আকস্মিক উন্মোচন ঘটিয়েছেন। 'হাবেদা মরুর কাহিনী' পড়তে গিয়েও এটা উপলব্ধি করা যাবে।

গদ্য-কাব্য তথা গদ্য-ছন্দের কবিতা রচনায় ফর্‌রুখ আহমদ কতটা সাফল্য অর্জন করেছেন, তা ছান্দসিক-সমালোচক এবং সুধী পাঠকদের বিবেচনার বিষয়। তবে, গদ্য কবিতা তথা গদ্য-ছন্দের কবিতার চারিত্র্য সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত, এই মূল্যায়নে সহায়ক হতে পারে। মনে রাখা দরকার যে, সাধারণ পাঠক আন্ত্যমিলকেই প্রধানত কবিতার ছন্দ বলে ধারণা করে থাকেন, এবং অন্ত্যমিলবর্জিত হলেই, সাধারণভাবে কবিতা গদ্য কবিতা বলে গণ্য হয়। প্রথাগত রীতিতে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনুসৃত হলেও অন্ত্যমিল না থাকলে কবিতা 'গদ্য কবিতা' অভিধায় সাধারণতঃ চিহ্নিত হয়।

কবিতার ছত্রান্তে, বর্ণের পারস্পরিক ধ্বনিগত মিলকেই সেই সুদূর অতীত কবিওয়ালার যুগে যেমন, একালেও তেমনি, কবিত্বশক্তির প্রকাশ হিসাবে সাধারণ্য গণ্য করা হয়। কাব্যপাঠ ও উপভোগের এই ঐতিহ্যগত ধ্যান-ধারণা থেকেই সাম্প্রতিককালের পাঠক পর্যন্ত অন্ত্যমিলহীন ছন্দোবদ্ধ যে-কোন কবিতাকেই গদ্য কবিতা হিসাবে গণ্য করতে কুণ্ঠিত হন না, তারা ভুলে যান যে, গদ্য কবিতারও এক ধরনের ছন্দ এবং ছন্দ-স্পন্দ রয়েছে, আর ছন্দনিপুণ কবি ছাড়া সার্থক গদ্য-কবিতা লেখাও সম্ভব নয়।

সুনির্দিষ্ট নিয়ম-রীতির অধীনে ছন্দোবদ্ধ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে মাত্রা, যতি, পর্ব ইত্যাদি অনেকটা প্রথাবদ্ধরীতিতে মেনে নিয়ে অগ্রসর হতে হয়, এবং সেক্ষেত্রে

www.pathagar.com

সামান্যতম বিচ্যুতিকেও ছান্দসিকেরা ছাড়পত্র দিতে চান না ; কিন্তু 'ফ্রি-ভার্স' বা গদ্য-কবিতা রচনার সুবিধা এই যে তাতে ঐ সব ক্ষেত্রে কিছুটা স্বাধীনতা নেয়া চলে; ফ্রি-ভার্সের প্রতি কবিদের ঝোঁকের উৎস সম্ভবত এটাই। ফর্‌রুখ আহমদও সম্ভবতঃ বক্তব্য প্রকাশের সুবিধার জন্যেই 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে এই স্বাধীনতা নিয়েছেন, অবলম্বন করেছেন গদ্যছন্দ। ছন্দোবদ্ধ রচনার একঘেঁয়েমি পরিহার করার এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজনেও হয়তো তিনি এই রীতি অবলম্বন করে থাকবেন। হতাশা, জীবনের রুক্ষতা এবং প্রাণহীনতার প্রতীকায়ন আর রূপকাশ্রিত উপস্থাপনই যেখানে লক্ষ্য, সেখানে নিরেট গদ্যছন্দ অবলম্বন এবং আবেগরহিত, লাবণ্যহীন ভাষা ব্যবহার অস্বাভাবিক কিংবা বিচিত্র কিছু নয়।

অবশ্য 'বহিরাচারী ছন্দমাপকে' বর্জন করলেও গদ্য কবিতায়ও শব্দের অন্তরাশ্রয়ী যে ছন্দ এবং পরস্পর বন্ধনে যার দ্যোতনা॥সেই-ছন্দকে বর্জন করা সম্ভব নয়, এবং বর্জন করলে, করতে গেলে, কাব্যছন্দের মুক্তি তো দূরের কথা, কাব্যসৃষ্টি হওয়াই অসম্ভব। কারণ, প্রচলিত ছন্দের চারিত্র্য এবং পরিমাপ অনুসরণ না করলেও, প্রত্যেকটি শব্দের এবং সে-সবের ধ্বনিগত পরস্পর বন্ধনের যে একটি ধ্বনিগত সুসাম্য, মিল এবং দ্যোতনা আছে, এ-সম্পর্কিত সচেতনতা মুক্তছন্দের অনুসারী কবির জন্যেও অপরিহার্য। "হাবেদা মরুর কাহিনী"তে যখন আমরা পড়ি ঃ

কিন্তু এখানে
এখানে এই অমিল, ছন্দহীন প্রাণের পৃথিবীতে
কাঁকর-বিছানো মাঠে,
বালুরুক্ষ বিয়াবানে
আমাদের দিন কেটে যায়
হাবেদা মরুর মাঠের
বাতাসের দীর্ঘশ্বাস শুনে

তখন অন্তমিলহীন, এই গদ্য-উচ্চারণও মনে ছন্দের দ্যোতনা জাগায়। মুক্তছন্দের কবিতা রচনার ক্ষেত্রেও শব্দ-নির্বাচনের ব্যাপারে অমনোযোগ কিংবা অসতর্কতা কবিতার সুশৃঙখল অন্তর-প্রকৃতিকে ক্ষুণ্ন করতে পারে। কারণ, গদ্য কবিতার ছন্দ যদিও সুনির্দিষ্ট কিংবা নিরূপিত ছন্দ নয়, তা'হলেও ছন্দস্পন্দ (রিদম) এবং যাকে বলা যেতে পারে ছন্দের অন্তপ্রবাহ কিংবা চোরাস্রোত, তা-ও শব্দ-নির্বাচনের এই অসতর্কতা ও অমনোযোগের কারণে বিশেষভাবে ব্যাহত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মতো শব্দ-সচেতন, ভাষা-ব্যবহারে দক্ষ কবির ক্ষেত্রেও যে এমনটি না ঘটেছে, এমন নয়। "হাবেদা মরুর কাহিনী'তেও তিনি বক্তব্য প্রকাশের অবারণ ঝোঁকে

www.pathagar.com

অনেক অ-কাব্যিক ও নিতান্ত গদ্যাত্মক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কবির বদলে হয়ে উঠেছেন বক্তা। যিনি লিখেছেন এমন অনুপম আকর্ষণীয় স্তবক ঃ

বিষণ্ন সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে
কাল জেগে উঠেছিল
এক মজানদীর কাহিনী
(উচ্ছল পারার মত আকাশের সেই আর্শি
মুখ দেখতো যাতে
সংখ্যাহীন তারা আর চাঁদ,
পাল তুলে যেত দূরের নৌকা
উদ্দাম স্রোতে ভাসমান রাজহাঁসের মত
সে নদী এখন গেছে শুকিয়ে,
তার বালুবক্ষে এখন ঘুরে বেড়ায়
তপ্ত হাওয়ার শ্বাসে
বহু যুগ আগেকার এক বিগত দিনের কান্না।)

আর মনে হয়েছিল
এখনো সে নদী পারে বাঁচতে
এখনো সে পারে ফিরে পেতে
তার বহমান তরঙ্গ
উদ্দাম গতিবেগ
প্রবল প্রাণোচ্ছ্বাস ;
যদি সে খুঁজে পায়
শুধু তার মূলের ঠিকানা।

তিনিই সকল রূপক, প্রতীক ও কাব্যের আড়াল ছিন্ন করে আত্ম-সমালোচনার আঘাত হেনে একেবারেই গদ্যাত্মক ও অ-কাব্যিক ভাষায় বলেছেন এই উপলব্ধির কথা ঃ

যেদিন থেকে আমরা নিয়েছি
ঈমানের পরিবর্তে বে-ঈমানী
একতার পরিবর্তে অনৈক্য
আর শৃঙ্খলার পরিবর্তে বিশৃঙ্খলা
(কদর্য উচ্ছৃঙ্খলতা)
শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই
আমাদের চূড়ান্ত দুর্গতি।

www.pathagar.com

মনে রাখতে হবে, 'ফ্রি-ভার্স' বা গদ্য-কবিতায় ব্যবহৃত শব্দাবলী গদ্যাত্মক হয়েও থাকে অনেকখানি কাব্যধর্মী এবং এই চারিত্র্যের কারণেই উল্লেখিত বিশেষ রীতির কবিতা 'গদ্য-কবিতা' এই অভিপ্রায় চিহ্নিত। ছন্দোবদ্ধ এবং পদ্যবন্ধের কবিতায় যে-ধরনের শব্দ-নির্বাচিত ও ব্যবহৃত হয়, অনিবার্য কারণেই তার কিছুটা অলংকৃত ও প্রসাধিত চারিত্র্য থাকে—থাকে কাব্যগন্ধী লাবণ্যের ছটা। ফররুখ আহ্মদের ছন্দোবদ্ধ এবং অন্ত্যমিলযুক্ত কবিতায় কবিত্বময় ইমেজোচ্ছল ভাষার উজ্জ্বল পরিচয় আছে। 'সিন্দাবাদ' প্রতীকে তিনি যখন উচ্চারণ করেন :

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ
পাহাড় বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক ;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ।

*

সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী ;
খুরের হল্কা॥ধারালো দাঁড়ের আঘাতে ফুলকি জ্বলে,
সমুদ্র থেকে সমুদ্রে ঘোরে দরিয়ার সাদা তাজী
তুফানের মাঠ পাড়ি দেওয়া তার একী দুরন্ত নেশা।

তখন বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্যদীপ্ত ভাষার বন্ধনে এবং ছন্দ-ধ্বনিময় বাক-প্রতিমার এক অনুপম আলেখ্যই অংকিত হয়, বাঙময় হয়ে ওঠে। নিরূপিত ও সুনির্দিষ্ট ছন্দে এ-ধরনের কাব্যধর্মী, লাবণ্যময় এবং বলিষ্ঠ ও সৌন্দর্য-দীপ্ত ভাষা ব্যবহার অপেক্ষাকৃত সহজ এবং বিধিবদ্ধ, কিন্তু গদ্য-কবিতায় শব্দ-নির্বাচন ও ভাষা-ব্যবহারে প্রশ্নে এমন রীতিবদ্ধতা অপরিহার্য নয়, এ-কারণেই গদ্য-কবিতায় শব্দ-নির্বাচন ও ব্যবহারের স্বাধীনতা কিছুটা বেশী। কিন্তু তবুও, গদ্য-কবিতা মূলত কবিতাই, এবং ভাষার ক্ষেত্রে ঘরোয়া-আলাপচারী ভঙ্গী ব্যবহারের অবকাশ এতে বেশী, আর গদ্য হলেও, এই কবিতায়ও ছন্দের চোরাপ্রবাহ রয়েছে, সে কারণে সাধারণত ছন্দ-নিপুণ কবির হাতেই গদ্য-কবিতাও প্রাণবান এবং সজীব হয়ে ওঠে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে এ কালের অনেক আধুনিক কবির রচনায়ই এর পরিচয় আছে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ভাষায় বলা চলে, কবিতার ভাষায় যে 'অভব্য বস্তুতন্ত্র' তাতেও ছন্দঃস্রোত প্রবাহিত ; এবং শব্দের 'ক্যাডেন্স' অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ মূলত বক্তব্যের ও সে-অনুসারে উচ্চারণের প্রকৃতি অনুযায়ী ধ্বনিত। অনিরূপিত ছন্দোবদ্ধ কবিতায় শব্দের এই ক্যাডেন্স অর্থাৎ স্বরপ্রবাহ প্রাধান্য পায় না, কারণ সেখানে মাত্রানুযায়ী শব্দ উচ্চারিত হয়

www.pathagar.com

বলে এবং ভাবযতি অনুসারে ছেদ পড়ে বলে, পূর্ণ এবং অপূর্ণ পর্বে ছন্দই প্রাধান্য বিস্তার করে রাখে; কিন্তু গদ্য-ছন্দের কবিতায় শব্দের ক্যাডেন্স বা স্বরপ্রবাহই অধিক গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, গদ্যছন্দের প্রকৃতি অনেকখানি অন্তর্নিহিত। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় : "গদ্যই হোক পদ্যই হোক, রসরচনা মাত্রেরই একটা স্বাভাবিক ছন্দ থাকে। পদ্যে সেটা সুপ্রতক্ষ্য, গদ্যে সেটা অন্তর্নিহিত। সেই নিগূঢ় ছন্দটিকে পীড়ন করলেই কাব্যকে আহত করা হয়। পদ্যছন্দবোধের চর্চা বাঁধা নিয়মের পথে চলতে পারে, গদ্যছন্দের পরিমাপবোধ মনের মধ্যে যদি সহজে না থাকে অলংকার-শাস্ত্রের সাহায্য এর দুর্গমতা পার হওয়া যায় না। অথচ অনেকেই মনে রাখে না যে, যেহেতু গদ্য সহজ সে-কারণেই গদ্যছন্দ সহজ নয়।"

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর কবি-জীবনের বৃহত্তর অংশই ব্যয় করেছেন পদ্যছন্দের চর্চায় এবং এ-ক্ষেত্রে তিনি রেখেছেন দক্ষতা ও সাফল্যের স্বাক্ষর। শুধু ছন্দের বিভিন্নরূপ এবং বৈচিত্র্যধর্মী ব্যবহারেই নয়, কবিতার অন্ত্যমিলেও এই দক্ষতা এবং সাফল্যের স্বাক্ষর আছে। গদ্যকাব্য আলোচ্য 'হাবেদা মরুর কাহিনী'তে তিনি ছন্দের প্রথাবদ্ধ রীতি এবং মনোটনি অর্থাৎ একঘেঁয়েমী ভেঙেছেন। তিনি যখন উচ্চারণ করেন :

কাফেলা এসে দাঁড়ালো
হাওয়ার মাঠ দশ্‌তে হাবেদায়......
জিন্দেগীর সবুজ নিশানা হারিয়ে
খা খা করছে যেখানে দিগন্তছোঁয়া ময়দান,
যেখানে পোড়া মাটি রঙ ফসলের শূন্য মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে গুমরে উঠেছে রাত্রিদিন
কাফেলা এসে দাঁড়ালো সেই রুক্ষ বিয়াবানে
সবচেয়ে প্রাণবন্ত চারা গাছ
যে মাটিতে মাথা তুলে
কুঁকড়ে শুকিয়ে মারা গেছে
যে মরাগাছের শুকনো ডালে দেখেছি
ঝড়ো সন্ধ্যায় হিংস্র জ্বীনের নর্তন।

তখন এই গদ্য কবিতায়ও স্বরপ্রবাহ, ধ্বনি-দ্যোতনা এবং ছন্দের চোরাস্রোত অনুভব করা যায়। কিছু কিছু শব্দের স্থানান্তর ঘটিয়ে, দু'য়েকটি শব্দ সংযোজনের মাধ্যমে এবং যদি, মাত্রা, পর্ব ইত্যাদির নব-বিন্যাসে এই গদ্যাংশকেও রূপান্তরিত করা যায় পদ্যছন্দে। যেমন ঃ

কাফেলা দাঁড়ালো এসে।
কাফেলা দাঁড়ালো এসে। সেই

www.pathagar.com

অচেনা হাওয়ার মাঠ। দশ্‌তে হাবেদায়.......
জিন্দেগীর। সবুজ নিশানা যত। হারিয়ে সুদূরে
খা খা করছে আজ। যেখানে দিগন্ত ছোঁয়া। ময়দান
যেখানে রয়েছে যত। পোড়া মাটি রঙ আর।
ফসলের। ঢের শূন্য। মাঠ
বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে। গুমরে উঠছে কেঁদে।
শুনি রাত্রিদিন।

ভাষা ও ছন্দের সুদক্ষ রূপকার ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যদি গদ্যছন্দে না লিখে, পদ্যছন্দে লিখতে চাইতেন, তা'হলে উপরোক্ত কাব্যাংশ হয়তো অনেক বেশী প্রাণবান, সজীব এবং আকর্ষণীয় হয়ে উঠতো। শুধু ফর্‌রুখ আহ্‌মদেরই নয়, যে-কোনো প্রতিভাবান এবং ভাষা ও ছন্দের দক্ষ রূপকার কবির হাতেই তেমন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। কেননা, গদ্যছন্দে রচিত হলেও, উপরোক্ত রচনাংশে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, আর এটা সম্ভব হয়েছে এ-কারণে যে, পদ্যছন্দের দক্ষ রূপকার ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মনের মধ্যেও গদ্যছন্দের পরিমাপবোধ ছিল, আর এটাও মনে রাখা দরকার যে, 'গদ্য কিংবা পদ্য' যাই হোক না কেন, ভাষামাত্রেরই যে একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে, এই বোধ যাঁর নেই, তাঁর পক্ষে 'অলংকার শাস্ত্রের' সহায়তায় কোনো ছন্দই যথার্থরূপে আয়ত্তে আনা সম্ভব নয়। ভাষার এই স্বাভাবিক ধ্বনিপ্রবাহ এবং ছন্দোময়তা সম্পর্কে সচেতনতাই মাত্র ভাষার ব্যবহারকারীকে এর বৈচিত্র্যময় ছন্দ এবং ছন্দোপ্রকৃতি আবিষ্কারে সহায়তা করতে পারে। এমন সহায়তা পেয়েছেন বলেই, ফর্‌রুখ আহ্‌মদও গদ্য ছন্দেও অসফল হন নি ; বস্তুত, "হাবেদা মরুর কাহিনী"তে তাঁর সাফল্য, কবির অন্যান্য কাব্যের তুলনায় অনেক ন্যূন হলেও, একটি রূপকাশ্রিত গদ্যকাব্য হিসাবে এ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এক উল্লেখযোগ্য রচনা।

www.pathagar.com

আবূ হেনা মোস্তফা কামাল

ব্যতিক্রমী শিল্পী

মধ্যবিত্ত সমাজ-পরিমণ্ডলে তিনি লালিত হয়েছিলেন—কিন্তু তাঁর কবি-মানস তথাপি সেই সীমাবদ্ধ জীবন-শাসিত নয়। আধুনিক বাংলা কবিতায় যখন নগর সভ্যতার কোলাহল প্রবল, সেই সময়ে ফর্‌রুখ নতুন প্রতীক, উপমা ও উৎপ্রেক্ষার এক স্বতন্ত্র কাব্য-আবহ রচনায় সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর এই সাফল্যের মূলে ছিলো ভিন্নতর ঐতিহ্যের প্রেরণা ও অবলম্বন। সংক্ষেপে বলা যায়, বাংলা কবিতায় তিনি সুদূরপ্রসারী সমুদ্র ও দিগন্তের স্বপ্ন সঞ্চার করেছিলেন। মানসিক নিঃসঙ্গ ও দূরত্ব রবীন্দ্র-প্রতিভারও অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যে সেই নিঃসঙ্গতার সংগে জড়িয়ে আছে গভীর বিষাদ ও অতৃপ্তির মূর্ছনা। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সেদিক থেকে ব্যতিক্রম। তাঁর সমুদ্র যাত্রায় বিপদের পরিবর্তে আছে উল্লাস। উত্তর-তিরিশের বাংলা কবিতায় যে ক্ষয় ও যন্ত্রণার চিহ্ন উৎকীর্ণ, ফর্‌রুখ তারও অংশীদার নন।

সম্ভবত এ পথে তিনি কাব্যের মুক্তি প্রত্যক্ষ করেন নি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত শব্দ ও পরিবেশের গতানুগতিক—কোনটিই তাঁর অনুমোদন লাভ করে নি। প্রায় বিস্মৃত দোভাষী পুঁথির জগৎ থেকে অপরিচিত শব্দাবলী তিনি পুনরুদ্ধার করেছেন, তাদের কাব্য সম্ভাবনাকে দক্ষ কারিগরের মতো যাচাই করেছেন এবং নতুন ব্যঞ্জনায় সেইসব শব্দরাজিকে পরে কবিতায় ব্যবহার করেছেন। আরব্য উপন্যাসের কাহিনীর নির্বাচিত ভগ্ন অংশকে পুনরুজ্জীবিত ক'রে ছড়িয়ে দিয়েছেন তাঁর কবিতার অবয়বে। তাঁর কবিতা পড়লে চোখে ভেসে ওঠে এক অবধারিত নীল সমুদ্র, আলিফ লায়লার রাত, আখরোট অথবা বাদাম-খোবানির বন, জাফরান-জেসমিনের দীপ্ত পাপড়ি, জাহাজ-মাস্তুল-নাবিক; মোট কথা, মধ্যবিত্ত জীবনের নোঙর-মুক্ত একনায়কের মতো ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বাংলা কবিতাকে বহিঃসমুদ্রে মুক্তি দিতে চেয়েছিলেন। অত্যন্ত অকালে তাঁর জীবনের ওপর যবনিকাপাত হয়েছে। অতএব,—প্রকাশিত কবিতাবলীর ভিত্তিতে তাঁর সাফল্যের পূর্ণাঙ্গ পরিমাপ হয়তো আর সম্ভব হবে না। তথাপি সম্প্রতি প্রকাশিত ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা এই ব্যতিক্রমী শিল্পীর কবি ব্যক্তিত্বের মূল্যায়নে অনেকটা সহায়ক বলে মনে করি।

শতাধিক কবিতার সংকলন এই গ্রন্থে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত দু'ধরনের কবিতাই অন্তর্গত। "সাত সাগরের মাঝি", "সিরাজাম মুনীরা", "নৌফেল ও

www.pathagar.com

হাতেম", "মূহূর্তের কবিতা" ও "হাতেম তা'য়ী"র নির্বাচিত কবিতাগুচ্ছ যেমন এতে সংকলিত হয়েছে, তেমনি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলীও। এইসব কবিতা-পসরা এক নজরে দেখেই বোঝা যায়, ফর্‌রুখ ছিলেন নিরীক্ষাধর্মী সচেতন শিল্পী। দীর্ঘ গীতি-কবিতা, সনেট, স্যাটায়ার, কাব্যনাট্য, শিশু কবিতা, কাব্যসাধনার সকল ক্ষেত্রেই তাঁর প্রবেশ ছিল অনায়স, সহজসাধ্য। সংকলিত কবিতাবলীর ভেতরে একটি বিভাগ পাঠক ও সমালোচকের দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বিভাগ একদিকে যেমন বিষয়গত, অন্যদিকে তেমনি কলাগত। সমস্ত কবিতার রচনাকাল উল্লেখিত হয় নি বলে এর কালানুগত সামাজিক ব্যাখ্যা দেয়া সম্ভব নয়। কিন্তু একথা স্পষ্টই বোঝা যায় যে, ফর্‌রুখের কবি-ব্যক্তিত্বের ভেতরে একটি প্রচণ্ড দ্বিধা উপস্থিত ছিলো। অন্যথায় যে কবি আশ্চর্য সাংগীতিক শব্দাবলীর যোজনায় অবলীলায় মধ্যবিত্ত চেতনার বলয়কে বিদীর্ণ করে স্বপ্ন সৃজন করতেন, তিনিই কি করে আটপৌরে শব্দের তির্যক ব্যবহারে উগড়ে দিতেন তীব্র তিক্ত হলাহল ? আমি আগেই বলেছি, অকালে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পরলোক গমন করেছেন,—অতএব, তাঁর প্রতিভার পরিণতি এখন গবেষকের অনুমানসাপেক্ষ, এসব সত্ত্বেও বলতে পারি যে, ফর্‌রুখ আহমদকে কেবল স্বাপ্নিক দূরচারী রোমান্টিক কাব্যকর্মী বলে চিহ্নিত করলে তাঁর প্রতিভার প্রতি সুবিচার করা হয় না।

চল্লিশের দশকে ফর্‌রুখের আবির্ভাব এবং পঞ্চাশের দশকে তাঁর চূড়ান্ত শৈল্পিক প্রতিষ্ঠার কাল। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় কি রবীন্দ্রপ্রভাব ছিল ? 'বৈশাখ' কবিতার একটি স্তবক এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে ঃ

চৈত্রের বিশীর্ণ পাতা রেখে গেছে শেষ চিহ্ন সালতামামীর,
ফাল্গুনের ফুলদল (কো'কাফের পরী যেন) আজ শুধু কাহিনী স্মৃতির,
খররৌদ্রে অবসন্ন রাহী মুসাফির যত পথপ্রান্তে নিঃসাড়, নিশ্চল,
আতশের শিখা হানে সূর্য রশ্মি লেলিহান ঝিমায় মুমূর্ষ পৃথ্বিতল,
রোজ হাশরের দগ্ধ তপ্ত তাম্র মাঠ, বন, মৃত্যুমুখী নিস্তব্ধ নির্বাক;
সুরে ইস্রাফিল কণ্ঠে পদ্মা মেঘনার তীরে এসো তুমি হে দৃপ্ত বৈশাখ।

[বৈশাখ ঃ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

এই কবিতার স্তবকবিন্যাস এবং মেজাজে 'বর্ষশেষ' কবিতার প্রতিধ্বনি স্পষ্ট। কিন্তু লক্ষণীয় যে, শব্দ ও চিত্রকল্প রচনায় ফর্‌রুখ আদৌ রাবীন্দ্রিক নন। 'রাহী মুসাফির', 'আতশের শিখা', 'সুরে ইস্রাফিল কণ্ঠে' প্রভৃতি শব্দগুচ্ছ তাঁর আত্মস্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত। সম্ভবত রবীন্দ্রনাথের 'বর্ষশেষ'-এর বলিষ্ঠতা তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো, কিন্তু একজনের ক্ষেত্রে যখন উপনিষদ ও হিন্দু পুরাণ অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস—অপরের চৈতন্যে তখন ইসলাম ও মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস পরম নির্ভর। অতএব, উভয়ের কবিতার স্বাদ ভিন্ন হতে বাধ্য। 'বর্ষশেষ'-এর সঙ্গে নিকট-সাদৃশ্য সত্ত্বেও 'বৈশাখ' একটি পৃথক কবিতা। নিষ্ঠাবান সৎশিল্পীর মতো এই প্রভাবকে তিনি অচিরেই অতিক্রম করেছিলেন। অচিরেই

www.pathagar.com

তিনি নতুন জগৎ, নতুন ভাবনা ও ভাষা আবিষ্কার করেছিলেন। একজন সৃজনধর্মী শিল্পীর বেলায় সেটাই তো স্বাভাবিক। সুধীন দত্ত, জীবনানন্দ এবং বুদ্ধদেবকেও একই সংকটের আবর্ত পার হতে হয়েছে। এবং সৃষ্টির এই বেদনাদায়ক অভিজ্ঞতা উত্তীর্ণ হতে পেরেছিলেন বলেই তাঁরা মৌলিক শিল্পী।

বাংলা কবিতায় মধ্যপ্রাচ্যের আবহ রচনায় মোহিতলাল প্রয়াসী হয়েছিলেন। কিন্তু এই ধারায় শ্রেষ্ঠ সাফল্য বোধ করি, অর্জন করেছিলেন কাজী নজরুল ইসলাম। ফর্‌রুখ সম্ভবত সেই সাফল্যকে আরো এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে গেছেন। নজরুলের কবিতায় মধ্যপ্রাচ্য এসেছে কেবল আবহ নির্মাণের প্রয়োজনে—মুসলিম প্রসঙ্গ অথবা ইসলামের ইতিহাস তাঁর কবিতায় এসেছে দৃশ্য ঘটনা অথবা চরিত্র রূপায়ণের গরজে। গীতিকার ও সঙ্গীতশিল্পী নজরুল ইরানী আবহাওয়া সৃষ্টি করেছিলেন শব্দ নির্বাচন ও যোজনার অপূর্ব কৌশলে। কিন্তু ফর্‌রুখের কৃতিত্ব সেখানেই সীমাবদ্ধ নয়। তিনি মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাস ও কিংবদন্তী থেকে সংগৃহীত মৃত উপকরণে নতুন প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ক্রমাগত ব্যবহারের ভেতর দিয়ে শব্দ প্রতীকী ব্যঞ্জনায় সমৃদ্ধ হয়েছিলো। মোটকথা, ফর্‌রুখ আহমদ ঐতিহ্যকে ব্যবহার করেছেন এলিয়েটীয় অর্থে, তিনি নিজেই যেন আরব্য উপন্যাসের নায়ক,—সেই কল্প জগতের সম্ভাব্য সমস্ত অনুষঙ্গ যেন তাঁরই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অংশ। ত্রিকালজ্ঞ ঋষির মতো, সন্তের মতো, কেবল বর্তমান নয়, অতীত ও ভবিষ্যতের ভেতরে উজ্জীবিত হয়েছেন তিনি। এই ক্ষেত্রে নজরুলের সংগে তাঁর পার্থক্য। ফর্‌রুখের সিন্দাবাদ কেবল আরব্য উপন্যাসের চরিত্র নয়—এই সিন্দাবাদ এক আশাবাদী চেতনার প্রতীক, বারবার সমুদ্র-যাত্রায় বিপর্যস্ত হয়েও যার অভিযাত্রী আত্মা ক্লান্তি স্বীকার করে না—সেই অপরাজেয় মানবিক সত্তার প্রতীক। একই অর্থে শাহেরজাদী, হাতেম তা'য়ী, নৌফেল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যপরিমণ্ডলে বারবার ফিরে এসেছে। বস্তুত ফর্‌রুখের কবি-ব্যক্তিত্ব বুঝতে হলে এই সব প্রতীকের মর্ম হৃদয়ংগম করতে হবে। কেননা, যতোদূর জানি, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ একটি বিশেষ জীবনবোধে উদ্দীপ্ত ছিলেন; তাঁর আদর্শ ক্রমশ কাব্যবিশ্বাসে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই বিশ্বাস বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের কাব্য-রসিকের কাছে বাতিল হতে পারে, না-ও পারে ; কিন্তু সে কথা অবান্তর। আসল কথা হল, এ বিশ্বাস কতটুকু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সিদ্ধি। আমাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনায় কাব্যবিচারের অবকাশ নেই—কিন্তু একথা বলতে দ্বিধা নেই যে, বাংলা কবিতায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তিত্ব। আর ব্যতিক্রম যেহেতু বিনা বিচারে গৃহীত অথবা স্বীকৃত হয় না, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যপ্রয়াসও সেজন্যে সকল সামাজিকের অকুণ্ঠ সমাদার পায় নি—অথবা হয়তো পাবে না। তাতে একথা প্রমাণিত হয় না যে, তাঁর কাব্যকলা অকিঞ্চিৎকর—বরং উল্টোটাই।

দূরচারী স্বাপ্নিক ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে এ পর্যন্তই। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার পাঠক অবশ্যই লক্ষ্য করবেন যে, ফর্‌রুখ ক্রমশ সমুদ্র থেকে বন্দরে ফিরে আসছিলেন। সেই বন্দর তাঁর নিজস্ব জন্মভূমির নিসর্গ পথ-প্রান্তর। 'ময়নামতীর মাঠে' 'মতিঝিল' অথবা

www.pathagar.com

'সিলেট স্টেশনে একটি শীতের প্রভাত' শীর্ষক কবিতাগুচ্ছে এই উক্তির সমর্থন মেলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতায়—গীতাঞ্জলি-গীতিমালা পর্বের পর যেমন এক অশরীরী জগতের স্মৃতিচিহ্ন সহজেই লক্ষণীয়—তেমনি "সাত সাগরের মাঝি"র পরে উল্লেখিত কবিতাবলীতে লেগে আছে সমুদ্রের স্বাদ। দেশজ নিসর্গকেও আগন্তুকের চোখে দেখেছেন ফর্‌রুখ—সেই দৃষ্টিতে এক সংগে মিশে আছে মমতা ও বিস্ময়। একটি স্তবক উদ্ধৃত করা হল ঃ

মাঠের সীমান্ত ঘেঁষে যেখানে প্রাচীন ঝাউগাছ
(নির্জন পথের ফৌজ) বাতাসের শোনে দীর্ঘশ্বাস,
যেখানে সমস্ত দিন নদীতীরে খঞ্জনের নাচ,
যেখানে মাটির কান্না সারাক্ষণ কাঁদায় আকাশ,...
সেখানে অনেক রাতে ঝাউশাখে ঘোড়া বেঁধে রেখে
জ্বিনের শা'জাদা নামে ময়নামতীর ফাঁকা মাঠে।
উজ্জ্বল আগুন-রঙ শা'জাদার (জানে না অনেকে)
কি যেন খোঁজে সে একা অন্ধকারে কুঞ্চিত ললাটে!

ঝাউ ডালে বাঁধা ঘোড়া অসহিষ্ণু মেঘের মতন
ঘুমন্ত মাঠের বুকে হ্রেষা রবে কাঁপায় কখন
(আলেয়ার শিখা জ্বলে নাসারন্ধ্রে)! শা'জাদা উন্মন
দীওয়ানার হালে ঘোরে (দেখেছে প্রবীণ বৃদ্ধ কোন)
জমাট আঁধার যেই চিড় খায় মোরগের ডাকে
ঘোড়ায় সওয়ার হ'য়ে মিশে যায় যে রাতের বাঁকে।

[ময়নামতীর মাঠে ।।১।। ঃ মুহূর্তে কবিতা]

পরিচিত প্রকৃতি ও রূপকথার এই কুশলী ব্যবহার ফর্‌রুখের পরিণত কাব্যসাধনায় বিরল নয়। কিন্তু ফর্‌রুখের সকল সৃষ্টির কালানুক্রমিক বিন্যাস ও মূল্যায়ন না হলে তাঁর সম্পর্কে সমস্ত সিদ্ধান্তই আনুমানিক থেকে যাবে। এজন্যে প্রয়োজন, তাঁর যাবতীয় রচনার মুদ্রণ ও প্রকাশ। তাদের রচনাকালের সঠিক সময় নির্ধারণ। সে কাজ অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয় সুযোগ্য গবেষক হাতে তুলে নেবেন।

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এই সংশয়, ক্ষুদ্রতা ও গ্লানিতে আকীর্ণ শতাব্দীর কাছ থেকে বিদায় নিয়েছেন, হয়তো অন্য কোনো সমুদ্রের পথে পাল তুলেছেন জাহাজে—যেখানে তাঁর দরাজ কণ্ঠের সংগে সংগত করবে উদ্দাম ঝড়ো বাতাস। আমাদের সশ্রদ্ধ অভিনন্দনের ধ্বনি কি তিনি শুনতে পাবেন কখনো?

www.pathagar.com

আল মাহ্মুদ

ন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গ কবি

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শত্রুদের মধ্যেও তাঁর কয়েকজন সত্যিকার গুণগ্রাহী ছিলেন তা আমরা জানতে পারি তাঁর মৃত্যুর পর। কবিতা যে মানুষের উপকার বা অপকার কিছুই করে না, এই তত্ত্বে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বিশ্বাস করতেন না। তিনি মনে করতেন, কবিতা মানুষের চিত্তে যদি আনন্দের সঞ্চার করতে পারে তবে সে আঘাত করারও ক্ষমতা রাখে। তাঁর কবিতা যেমন অনেক মানুষের হৃদয়-তন্ত্রীতে ঝংকার তুলতো, তেমনি আবার অনেক মানুষ তাঁর কবিতার হাত থেকে রেহাই পেতে চাইতেন। পাকিস্তান আমলের শেষের দিকে তাঁর কবিতা যেসব পত্রিকায় প্রকাশিত হতো একদল মানুষ সে সব পত্রিকাকেও এড়িয়ে চলতে চাইতেন। তিনিও আবার এমন মানুষ ছিলেন, সে সময়কার সাহিত্যের সবচেয়ে মানসম্পন্ন আধুনিক পত্রিকা যিনি সম্পাদন করতেন সেই সিকান্দার আবু জাফরের অনুরোধকেও শেষ পর্যন্ত উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। যদিও উভয়ে ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু ও বিভাগ-পূর্ব কালের ঘনিষ্ঠ সাহিত্য-সুহৃদ। শেষ দিকে অবশ্য "সমকাল"-এর কবিতা-সংখ্যায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনুমতি না নিয়ে তাঁর একটি বা দুটি কবিতা ছাপা হয়েছিল। ছাপা হয়েছিল, সিকানদার আবু জাফরের এক ধরনের ব্যক্তিগত জিদের জন্য। ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে বহুবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও যখন তিনি "সমকাল"-এ লিখতে সম্মত হলেন না, "সমকাল"-সম্পাদক ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অন্যত্র মুদ্রিত একটি বা দু'টি কবিতা "সমকাল কবিতা-সংখ্যা"য় ছাপার ব্যবস্থা করেন। তখন "সমকাল-কবিতা সংখ্যা"কে একটি জাতীয় কবিতা সংকলনে রূপ দেবার কাজে আমি "সমকাল" সম্পাদককে খানিকটা সাহায্য করার জন্যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ থাকায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্বন্ধে তৎকালীন আধুনিক সাহিত্যের নেতৃত্বের আসনে উপবিষ্ট সিকান্‌দার আবু জাফরের অভিমত জানার আমার সুযোগ হয়। তিনি অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে তাঁর নাম উচ্চারণ করতেন। বলতেন, আমার বন্ধু ফর্‌রুখ। মাঝে মাঝে তাঁর কাছে যেতেন এবং ফিরে এসে এমন সব গল্প করতেন যে, সে সময়ে আমার মত একজন কবিতা লেখার প্রয়াসীর পক্ষে যা ছিল বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। প্রায়ই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিশ্বাস ধর্ম ও ইসলাম নিয়ে তৎকালীন প্রগতিশীল লেখকদের মধ্যে বেপরোয়া আলোচনা হতো। সবাই চাইতেন তাঁকে এড়িয়ে যেতে। আর যাকে একটা দেশের অধিকাংশ বুদ্ধিজীবী সচেতনভাবে এড়িয়ে যেতে চান, ইতিহাস তাকে এলোমেলোভাবে হলেও কিছু এমন গুরুত্ব দিয়ে বসে যা আমাদের বিচারে অভাবনীয়।

www.pathagar.com

আমরা ভাবতাম, তৎকালীন প্রগতিশীল চিন্তাধারার মানুষ মাত্রই বুঝি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সমালোচক ও শত্রু ছিলেন। পরে অবশ্য দেখা গেছে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অন্তরঙ্গতার আওতার মধ্যে যে সব কবি-সাহিত্যিক অবস্থান করতেন তারাও পরবর্তীকালে তাঁর সমালোচক হয়েছেন কিংবা ফর্‌রুখ আহমদ তাদের সাহিত্য-চর্চা নিয়ে ঠাট্টা-মস্করা করতে ছাড়েন নি। আহসান হাবীব, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহসান—এরা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কেউ বন্ধু, কেউ সমসাময়িক ছিলেন। এদের চিন্তাধারা সাধারণত রোমান্টিক-প্রেম, কাম ও প্রকৃতির দ্বারা বশীভূত ছিল। এদের কাউকেই আজ পর্যন্ত কোন সমালোচক জনগণের লেখক অথবা প্রগতিবাদী লেখক হিসাবে চিহ্নিত করেন নি। তবুও দেখা যায়, প্রগতিবাদীরা ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে যতটা অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করেছেন, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন ও সৈয়দ আলী আহ্‌সানকে ততটা অগ্রাহ্য করা হয় নি। বরং এরা তিনজনই আধুনিক কবিতার, অর্থাৎ বাংলাদেশের পঞ্চাশ দশকে কবিতা আন্দোলনের পূর্বসূরি হিসাবে যথাযোগ্য সম্মান ও প্রতিপত্তি পেয়েছেন ; যা ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে দিতে প্রগতিবাদীরা দ্বিধান্বিত।

তাহলে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কেন তা পান নি ? ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তো আর তাঁর উপরোক্ত বন্ধু বা সমসাময়িকদের চেয়ে কোন অংশেই ছোট কবি ছিলেন না। এর প্রধান কারণ হল, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আদর্শ। শুধু ধর্মের ব্যাপার হলে সম্ভবত ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পার পেয়ে যেতেন। ভাবা হতো, এ দেশে তো সবাই মুসলমান, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ একজন বড় মুসলমান কবি। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যেহেতু একজন বড়ো মুসলিম কবি হওয়ার চেয়ে 'ইসলাম' নামক একটি জীবনব্যবস্থাকে তাঁর কবিতার সাথে এ দেশের মাটিতে সরাসরি প্রোথিত করার স্বপ্ন দেখতেন, সে কারণে প্রগতিশীল অর্থাৎ মার্কস্‌বাদী চিন্তাধারার সাথে তাঁর আদর্শের এক অদৃশ্য সংঘাত সব সময়ে লেগেই ছিলো। এদেশে মার্কসীয় চিন্তাধারারার বুদ্ধিজীবী রাজনীতিক ও ছাত্রদের প্রথমাবধিই সংগঠিত দল ছিলো। যারা সদাসর্বদাই তাদের বিচারে জনগণের লেখকদের গুণগান গাইতেন এবং ফর্‌রুখ আহ্‌মদের তীব্র সমালোচনা ও তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল ও সাম্রাজ্যবাদের দালাল বলে আখ্যায়িত করে আনন্দ পেতেন। যদিও তা কোন কালেই লিখিত সাহিত্য আলোচনায় পর্যবসিত হতো না। কারণ তুলনামূলক সাহিত্যালোচনায় ফর্‌রুখকে অ-কবি, সাম্রাজ্যবাদের বা উপনিবেশবাদের দালাল হিসাবে চিহ্নিত করা যুক্তির দ্বারা সম্ভবপর ছিলো না। এ শুধু বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনগুলো অথবা তথাকথিত প্রগতিশীল সাহিত্যসভা যথা তৎকালীন "পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ" ইত্যাদির সাহিত্যলোচনাতেই সম্ভবপর ছিলো। কারণ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার মুসলমান সমর্থনকারীর সংখ্যা প্রচুর থাকলেও তাঁর আদর্শ ইসলামের রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠার আন্দোলনকারীর সংখ্যা সম্ভবত একেবারেই ছিলো না। আর থাকলেও যেহেতু দেশের উপনিবেশবাদী

www.pathagar.com

শাসক-শ্রেণী ইসলামকে (শুধু ধর্ম হিসাবে, জীবন ব্যবস্থা হিসাবে নয়) তাদের আত্মরক্ষার ঢাল হিসাবে ব্যবহার করছিল, সে কারণে এ দেশের যাঁরা একটি ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠার জন্য একদা রাজনৈতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করতেন, তাঁরা কোন বৈপ্লবিক পদক্ষেপ নিতে পারেন নি। এ ধরনের পদক্ষেপ সে সময় নেয়া সম্ভব হলে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যে সামাজিক সম্মান পেতেন তার কিছুটা প্রতিরূপ দেখা যায় পশ্চিম বঙ্গে ও সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সামাজিক সম্মান সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা দেখে। তুলনামূলকভাবে একজন বড়ো কবি হওয়া সত্ত্বেও যা ফর্‌রুখ আহমদ বাংলাদেশে পান নি। আমরা সকলেই জানি, দেশবিভক্তির পূর্বে ফর্‌রুখ আহমদ ও সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরস্পর গভীর পরিচয়সূত্রে ও একই আদর্শের সূত্রে বাঁধা ছিলেন। গভীর পড়াশোনা ও আধ্যাত্মিক অন্তর্দৃষ্টি ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে পবিত্র কুরআন নির্দেশিত এক ভবিষ্যৎ মানব সমাজের স্বপ্নদ্রষ্টা কবি করে তোলে। আর সুভাষ মুখোপাধ্যায় রুশ বিপ্লবের পর বর্তমান রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক রূপেরই নিরলস সমর্থক থেকে যান।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ইকবালের কবিতার দ্বারা যতটাই আপ্লুত হয়ে থাকুন না কেন, তাঁর দার্শনিক সূত্রসমূহের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত ছিলেন। বিশেষ করে 'মানুষের খুদী' ও ভবিষ্যতের পৃথিবীতে একটি অখণ্ড মানবসমাজে ইসলামের সম্ভাব্যতা নিয়ে ইকবালের সমগ্র দার্শনিক আলোচনা এই বাঙালী কবি অত্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়েছিলেন এবং গভীরভাবে তা বিশ্বাস করতেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যখন তাঁর কবিতায় ইসলামী সমাজব্যবস্থার কথা ও জড়বাদী সভ্যতার তীব্র সমালোচনা শুরু করেন, তখন আপাতদৃষ্টিতে পৃথিবীতে আজকের মত ইসলামী আন্দোলন কোন বিপ্লবী শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে নি। বরং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অবসানের সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলো জগতের সর্বত্র ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে আবদ্ধ, কিন্তু সদ্য আত্মচেতনায় উদ্বুদ্ধ, মুসলিম জাতিসমূহের স্বপ্ন ও পবিত্র ভবিষ্যৎবাণী-সমূহের অসারতা প্রমাণের জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মানচিত্রে ইহুদী কাল্‌সাপগুলোর জন্যে ষড়যন্ত্রের নতুন গর্ত খুঁড়ছে। জেরুজালেমের পবিত্র মসজিদের চতুর্দিক থেকে এর আদি বাসিন্দাদের বিতাড়ন করে সেখানে আমেরিকা, ইউরোপ ও রাশিয়ান ইহুদীদের জবরদস্তী আবাস্থল গড়ে তোলার পেছনে যে আসলে ইসলামের পুনরুত্থানের আশঙ্কাকে চাপা দেয়ার পুঁজিবাদী ও সমাজবাদী শক্তিসমূহের সম্মিলিত চেষ্টা, এতে কোন সন্দেহ নেই।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের উত্থানকালটা ছিলো এক অর্থে কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর জগৎব্যাপী বিপ্লবী শক্তি হিসাবে উত্থানের যুগ। মানবরচিত সামাজিক কাঠামো নির্মাণের আজ পর্যন্ত যতগুলি বৈপ্লবিক নীতিমালা তৈরি হয়েছে, মানতেই হবে সে সবের মধ্যে মার্কস ও এঙ্গেলসের কম্যুনিস্ট ইশ্‌তাহারই সম্ভবত পৃথিবীর দুঃস্থ মানুষের কাছে ও রাজনৈতিক বিপ্লবীদের কাছে ছিলো সবচেয়ে আকর্ষণীয় দলিল। পৃথিবীটা যদি আল্লাহ্‌র নিয়ম-নীতির

www.pathagar.com

বাইরে শূন্য থেকে উদ্ভূত কোন অর্থহীন ঘটনারই পরিণতি হতো, তবে কম্যুনিস্ট ইশতাহারকেই সম্ভবত মানবজাতির সমাজ-কাঠামো নির্মাণের অত্যাশ্চর্য দলিল হিসাবে মানতে একজন কবির, বিশেষ করে ফর্‌রুখ আহমদের মত মননশীল দার্শনিক কবির পক্ষে কোন বাধা ছিলো না। কারণ তাঁর যৌবনকালে তিনি আন্তর্জাতিক কম্যুনিস্ট পার্টিগুলোর নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগ, গভীর ও ব্যাপক সংক্রমণের কথা জানতেন। এবং অল্প কিছুকালের জন্য এই মতবাদে লিপ্ত হয়েও পড়েছিলেন বলে শোনা যায়। সে সময় অর্থাৎ দেশ বিভাগের পাঁচ-ছ'বছর আগে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যখন কলকাতার সবচেয়ে প্রগতিশীল ও বিপ্লবী সাহিত্য সাময়িকী 'পরিচয়'-এ কবিতা প্রকাশ করতে থাকেন, তখন তাঁর রচনার আঙ্গিকে ও বিষয়বস্তুতে শ্রমজীবী মানুষের প্রতি এবং শ্রমিক শ্রেণীকে সর্বহারা বিপ্লবের নেতৃত্বের সবচেয়ে উপযোগী শক্তি হিসাবে দেখতে তিনিও অভ্যস্ত ছিলেন। সেকালের কবিতায় ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মনোভঙ্গিটি কেমন ছিল, তা নীচের স্তবকটি থেকে খানিকটা আঁচ করা যাবে ঃ

যন্ত্রের গর্জন-শ্রান্ত তন্দ্রাতুর প্রেসম্যান দেখে
নতুন বিস্ময় এক ঃ পথচারী আহত বুলেটে,
নির্ভীক জনতা চলে বারুদের বুকে পথ কেটে ঃ
চলেছে শতাব্দীকাল যারা পথে ক্লান্তিচিহ্ন রেখে
যৌবন-বন্যার মত আজ তারা এসেছে অনেক,
আজ তারা প্রাণ পেল একসাথে কঠিন বুলেটে
আজ তারা প্রাণ পেল রক্তনীল তীক্ষ্ণ বেয়নেটে
রেখে গেল পথপ্রান্তে প্রাণবন্ত বলিষ্ঠ মৃত্যুকে—

[প্রেসম্যান ঃ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মোড় পরিবর্তন সম্বন্ধে অনেক অনেক কথা বললেও আমার মনে হয় কবির ইসলামের দিকে চিরজীবনের জন্যে প্রত্যাবর্তন ঘটেছিল গভীর পড়াশোনার মধ্য দিয়ে। তিনি ছিলেন ইংরেজী সাহিত্যের ছাত্র এবং ইংরেজী কবিতার রোমান্টিক অধ্যায়টির সাথে গভীরভাবে পরিচিত। এ ধরনের মানসিকতা নিয়ে দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদকে বুঝলেও কম্যুনিজমের সপক্ষে কিংবা সর্বহারা বিপ্লবের তৎকলীন তীর্থক্ষেত্র সোভিয়েত রাশিয়াকে তিনি নির্যাতিত মানুষের স্বর্গরাজ্য হিসাবে কল্পনা করতে সম্মত ছিলেন না। তা ছাড়া তখন উপমহাদেশে এমন কিছু ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়, যাতে একজন দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসাবে তিনি পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করেন এবং এই সমর্থনের মধ্য দিয়ে পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহর সাথে গভীর পরিচয় ঘটলে, তাঁর জীবনের মর্মমূল পরিবর্তিত হয়ে যায়। তিনি ইসলামকে আগামী পৃথিবীর

www.pathagar.com

মানবজাতির ধর্ম হিসাবে বিবেচনা করতেন। এ ধরনের মানবিক অবস্থা তৈরির পেছনে সম্ভবত ইকবালের খোলামেলা ইসলামী দর্শনের সহজ ও সাবলীল বর্ণনা ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে উজ্জীবিত করে থাকবে।

পাকিস্তান সম্বন্ধে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের স্বপ্নভঙ্গ হয় দেশবিভাগের অল্পকাল পরেই। যে পাকিস্তান আন্দোলনকে তিনি ভেবেছিলেন উপ-মহাদেশে ইসলামী সমাজব্যবস্থার প্রাথমিক উদ্‌ভবকাল বা বীজবপনের মুহূর্ত, অতি অল্প সময়ের মধ্যে কবির সে স্বপ্নের মনোভূমিতে আগাছা জন্মাতে থাকে এবং তমদ্দুন মজলিসের ভাষা আন্দোলন যখন পাকিস্তান সরকারের গুলিতে রক্তাক্ত হাহাকারে পরিণত হয়, তখন ফর্‌রুখের স্বপ্নের মনোভূমি চোরকাঁটার জঙ্গলে ভরে যায়।

এই সময়েই ফর্‌রুখ আহমদ একজন নিঃসঙ্গ মানুষে পরিণত হন। যে সব বিপ্লববাদীরা তখন ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিরোধিতা করতেন তাঁরা বিদ্রূপের অট্টহাসিতে ফেটে পড়েন আর যাঁরা ছিলেন এককালে কবির অন্তরঙ্গ বন্ধু ও আদর্শগত কারণে ভাইয়ের মত, তাঁরা ফর্‌রুখের ইসলাম সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক মতামতে ভীতত্রস্ত হয়ে সরে পড়তে থাকেন। শেষে তাঁর তিরোধানের পূর্ব পর্যন্ত তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বান্ধবহীন। বরং এ সময়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার গভীরতা নিয়ে পঞ্চাশ ও ষাট দশকের তরুণ কবিরা, যেমন হাসান হাফিজুর রহমান ও আবদুল মান্নান সৈয়দ, এমন মন্তব্য করেন যে, এ দেশের প্রগতিবাদীরা মানতে বাধ্য হন, তাঁর কবিতা তাঁদের বিচারে যতই পেছন দিকে ধাওয়া বলে মনে হোক না কেন, কাব্যগুণে তা অসাধারণ।

আজ যে যতই তর্ক করুক না কেন, মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কোন পার্টি বা রাষ্ট্র আর পৃথিবীতে বিপ্লবী শক্তি হিসাবে নিজেদের দাবী করতে পারে না। বরং আগ্রাসী শক্তি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক সর্বগ্রাসী লোলুপতা চারদিকে তার জিহ্বা বিস্তার করতে চাইছে। আফগানিস্তানে রুশ সৈন্যবাহিনী কি বিপ্লবী বাহিনী ? না কম্পুচিয়ায় ভিয়েতনামী বাহিনী বিপ্লবী ? আফ্রিকার শৃঙ্গে এসব বিপ্লবীদের গতিবিধি নিয়ে আজ সারা মহাদেশটি এক অনিয়শ্চয়তার মধ্যে মুহ্যমান হয়ে পড়েছে।

কোন একটি সামাজিক ও রাজনৈতিক আদর্শকে প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি একদল লোক বারুদ ও গন্ধকের পথকেই বেছে নেয়, তবে তাকেই বিপ্লবী শক্তি বলার কম্যুনিস্টদের তথাকথিত প্রবণতাটিকে যদি আজও কেউ মূল্য দেয়, তবে অবশ্য সাম্প্রতিককালের বিশ্বব্যাপী ঘাত-সংঘাতের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কসবাদের সম্পূর্ণ বিরোধী শক্তি ইসলামকেই বিপ্লবী শক্তি বলতে হবে। কারণ পবিত্র কুরআন প্রদর্শিত পথে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ইসলামী পদ্ধতিতে জীবন-যাপনের জন্যে কয়েকটি মানবগোষ্ঠী বারুদ, গন্ধক ও রক্তে পথে আগুয়ান হয়েছে। কোথাও তারা প্যালেস্টাইনী গেরিলা, কোথাও আবার পলিসারিও বা মিন্দানাও গেরিলা নামে আখ্যায়িত থাকলেও, উদ্দেশ্য তাদের

www.pathagar.com

একই। আর এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছে পৃথিবীর সবচেয়ে ভয়াবহ ও গৌরবজনক, বিপুল রক্ত ও আত্মদানকারী ইরানী বিপ্লব।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আদর্শ ইসলামের বিজয় সম্ভবত অস্তগামী বিংশ শতাব্দীকে বিদায় জানাবার আগেই পৃথিবীর কয়েকটি বিশাল ভূখণ্ডে তার নিশান উড়িয়ে দেবে। কারণ ফর্‌রুখ তাঁর জীবৎকালে ইসলামকে নিয়ে কাপুরুষদের সুবিধা লোটার কাড়াকাড়ি দেখলেও আজ বিশ্বব্যাপী আত্মদানকারী তরুণ-তরুণীরা নিজের রক্তের বিনিময়ে তা কিনে নিয়েছেন। কিনে নিচ্ছেন ইরানে, মিশরে, সিরিয়ায়, লেবাননে তথা সারা মধ্যপ্রাচ্যে। যেখানে রক্তদান ও আত্মত্যাগ নেই, সেখানে ইসলাম আসে না। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঠিকই বলতেন ঃ

যদিও শ্বাপদ তোলে বিষাক্ত ফণা,
যদিও এখানে অসহ্য হলো হীনতার যন্ত্রণা,
তবু বহু দূরে ডাক দিল আজ হেরার শিখর-চূড়া
ডেরার কপাট খোলো আজ, বন্ধুরা ;
পাশবিকতার ললাটে তীক্ষ্ণ তীর উদ্যত করো
এই সংগ্রাম...জেহাদে বৃহত্তরো—
প্রগাঢ় রক্তপাপড়ি খোলার মত
একটি নিমেষ দাও মোরে অন্তত।।

[এই সংগ্রাম ঃ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা]

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বড় গুণ হলো তিনি তাঁর মহতী আদর্শের, তাঁর সমকালে কোনো প্রতিফলন না দেখে তাঁর নিঃসঙ্গ মনোনিবাসে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। কোন-কিছুর বিনিময়ে তাঁর এই নৈঃসঙ্গকে তিনি বিসর্জন দিতে রাজি হন নি। এ জন্য দেখা যায়, তাঁর বন্ধু-বান্ধবের চেয়ে তাঁর বিপরীতপন্থীরাও তাঁর অস্তগমনে ব্যথিত হয়েছেন আন্তরিকভাবে। আবুল ফজল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা সংকলনের ভূমিকা লিখতে গিয়ে বলেছেন, "আমরা যারা কিছুটা বিপরীতপন্থী, তারাও তাঁর কবিতায় ধর্মীয় চেতনা ও ঐতিহ্যের একটা অনাবিল স্বাদ পেয়ে থাকি।"

এ স্বাদ তাঁর বন্ধুরাও পেয়েছিলেন কিনা ঠিক বোঝা যায় না। কারণ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা নিয়ে তাঁর সমসাময়িক কবি-বন্ধুরা তেমন কিছু লেখেন নি। আর ফর্‌রুখের মৃত্যুর পর কবি আবদুল মান্নান সৈয়দের সম্পাদনায় তাঁর যে শ্রেষ্ঠ কবিতার সংগ্রহটি প্রকাশিত হয়েছিল, তা ফর্‌রুখের মত কবির জন্য, কেন জানি মনে হয়, এক নিয়তিনির্ধারিত ব্যাপার মাত্র। কারণ আপাতদৃষ্টিতে অনেক সুহৃদের মধ্যে তাঁর অবস্থান কল্পনা করলেও আসলে তিনি ছিলেন যথার্থ অর্থে বন্ধুহীন। ন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গ যাত্রী।

www.pathagar.com

মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান

বিষয় ও ছন্দ-সমীক্ষায় হাতেম তা'য়ী

'হাতেম তা'য়ী' সম্ভবত কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যাদর্শের শ্রেষ্ঠ ফসল। ৩২৮ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ সুদীর্ঘ কাব্যগ্রন্থটি বাংলা একাডেমী কর্তক সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে। একটি আদর্শ জীবনের কল্পনা এবং পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের জাগরণের স্বপ্ন এই কাব্য রচনার প্রেরণামূল। প্রকৃতপক্ষে এই প্রেরণা-মূল থেকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সকল কাব্য প্রয়াসের উন্মীলন। 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা' কাব্যগ্রন্থদ্বয়, সনেট সংকলন 'মুহূর্তের কবিতা' এবং কাব্যনাট্য 'নৌফেল ও হাতেম' ও 'হাতেম তা'য়ী' প্রকাশের পর ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সম্পর্কে স্থিত চিন্তার অবকাশ ঘটেছে বলে মনে হয়।

স্মরণীয় যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবি-প্রতিভার উন্মেষ ঘটে নজরুলোত্তর আধুনিক কবিকূলের সমকালে। কিন্তু একনিষ্ঠভাবে তিনি ঐ আধুনিক কাব্যান্দোলনের মধ্যে বসেও ঐকতানে সুর না মিশিয়ে, আপন স্বতন্ত্র কবিকণ্ঠ ও চারিত্র্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরও তিনি আপন কাব্যাদর্শে অবিচল থেকেছেন। এবং এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, জসীম উদ্‌দীনের পর কবি-খ্যাতি অর্জনে বাঙালী মুসলমান কবিদের মধ্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে এখনও কেউ অতিক্রম করতে সমর্থ হন নি। এর একটা কারণ সম্ভবত এই যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে তাঁর আপন কাব্যাদর্শ প্রায় 'মিশনারী জীলের' সমার্থক। সাম্প্রতিককালে কোন কবির আপন কাব্যাদর্শের কাছে এতটা বিশ্বস্ততা খুব বেশী চোখে পড়ে না। প্রকৃতপক্ষে আধুনিক কাব্যাদর্শ প্রতিনিয়ত পরিবর্তমান, অস্থির, চঞ্চল ও নব নবোন্মেষশালিনী।

কিন্তু অচঞ্চল কাব্যাদর্শও যে কতটা ফলপ্রদ হতে পারে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তার বিরল দৃষ্টান্ত।

'পাকিস্তান আন্দোলন'-এর কবি বলেই যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে পুরোপুরি চেনা যায় তা মনে হয় না। অবশ্য 'পাকিস্তান আন্দোলন' তাঁর কাব্যপ্রেরণার এক শক্তিকেন্দ্র বটে। তবু, তিনি রাজনীতিক নন, হয়ত ধর্মপ্রবুদ্ধ ; তবে তিনি কবি। এবং পাকিস্তান আন্দোলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য ও ইসলাম ধর্মের আবেদন তাঁকে কাব্যধ্যানে উদ্বুদ্ধ করে। শেষোক্তটিই মুখ্য ; ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ আবেদন। ধর্মের আচার-অনুষ্ঠানাদি নয়, অন্তর্গূঢ় শক্তিকে তিনি স্পর্শ করতে চান। একে তিনি 'মানবতা' বলে চিহ্নিত

www.pathagar.com

করতে ইচ্ছুক। অর্থাৎ, যে উদার মানবিক আবেদন নিয়ে ইসলাম ধর্মের আবির্ভাব হয়েছিল তার স্বপ্নধ্যান ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে কাব্যপ্রেরণা দেয়। পাকিস্তান আন্দোলন তাই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাছে রাজনৈতিক বিষয় যতটা নয়, তার চেয়ে বেশী ইসলামী মানবতার আদর্শ বাস্তবে রূপায়ণের পরিবেশ সৃষ্টির সম্ভাবনার উজ্জ্বল স্বপ্ন। রাজনীতিক নন বলেই যে কোন নতুন রাষ্ট্র আজ যে সমস্ত জটিল দ্রুত পরিবর্তমান সামাজিক, অর্থনৈতিক ও বিচিত্রবিধ বহির্বিশ্বের প্রতাপের ও প্রচারের সম্মুখীন হয়—তা তাঁর চিন্তার পটে ধরা পড়ে না। এবং তিনি সহজেই আপন বিশ্বাসের জগতে অটল থাকেন। আর ইসলামী মানবতার আদর্শ সন্ধানে প্রতি মূহূর্তে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন।

এমনকি, যদি তার সন্ধানে তিনি ইসলাম-পূর্বকালে উপনীত হন তবুও তিনি অবিচল থাকেন, সমভাবেই আকৃষ্ট হন এবং সেই ইসলাম-পূর্ব যুগের বিষয়ের উপর আপন বিশ্বাসের অঞ্জন অনায়াসে প্রযুক্ত করেন। "হাতেম তা'য়ী" তার প্রমাণ। "হাতেম তা'য়ী" ইসলাম-পূর্ব যুগের প্রখ্যাত ঐতিহাসিক চরিত্র। পুঁথি সাহিত্যের মুসলমান কবির হাতে এ চরিত্র বাংলা কাব্যের অন্তর্গত হয়েছে। কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সে পুঁথিপাঠে ঐ চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। "হাতেম তা'য়ী"র মানবতা তাঁকে মুগ্ধ করেছে এবং তার মধ্যে আপন মনের রং মিশিয়ে তিনি আদর্শ জীবন কল্পনা করেছেন ; এবং পূর্ণ ইসলামী মূল্যবোধের কবিস্বপ্ন এই ইসলাম-পূর্ব কালের চরিত্রকে অবলম্বন করে বেড়ে উঠেছে।

মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব এবং সত্যের বিজয় হচ্ছে "হাতেম তা'য়ী" কাব্যের উপজীব্য। কাব্যের বিভিন্ন স্থানে কবি এই দ্বন্দ্বের চিত্র এঁকেছেন, উল্লেখ করেছেন, সমাধান নির্দেশ করেছেন ঃ

১. মিথ্যা ও সত্যের দ্বন্দ্ব তবু মনে জেগে ওঠে কেন ?

২. প্রশ্ন, প্রশ্ন, প্রশ্ন, শুধু—প্রশ্নের জটিল অন্ধকারে
বিভ্রান্ত এ মন ঘোরে ছায়াচ্ছন্ন রাত্রির কিনারে,
পায় না সে পথ খুঁজে, পায় না সে আলোর ইশারা;
অজ্ঞতার অন্ধকার ঝরোকায় ফোটে না সিতারা।

৩. মানুষের কিংবা মানবীর
সত্তা যদি ঘিরে রাখে শয়তানের কুহক জিঞ্জির
অসংখ্য সওয়ালে তার মরে মূর্খ অন্ধকার স্রোতে।
কিন্তু যে পেয়েছে পথ সত্য আর জ্ঞানের আলোতে
খোদার রহমত যাকে আছে ঘিরে—দেয় সে উত্তর
সাচ্চা দিল ; —যার হাতে মরে ইবলিসের অনুচর।

৪. তখনি সে পেল সত্য, বিশ্বাসের
শিখা অনির্বাণ,—নেভে নি যা নমরুদের ভ্রূকুটিতে,
থামে নি যা লেলিহান আগুনের মুখে ; পৃথিবীর
লক্ষ প্রলোভনে। সে সত্য-প্রত্যাশী আমি, আমি চাই
উন্মুক্ত উদার শান্তি জ্যোতিষ্মান সে সত্য আলোকে।

কেননা বঞ্চিত, ক্লান্ত, বিড়ম্বিত, বিক্ষত জীবনে
দেখেছি অশান্তি যত বেড়ে ওঠে অসত্যের মূলে ;
বেড়ে ওঠে বিষবৃক্ষ সামান্য মিথ্যার রক্তবীজে।

৫. এই আমীরানা ঠাঁট হ'তে পারে লোভনীয়, তবু
অন্তরের দীনতা সে ঢাকে না কখনো। শুধু জানি
সত্যের কণিকা তাকে তুলে নিতে পারে ঊর্ধ্বস্তরে;
মুছে দিতে পারে তার ম্লানিমা সে আলো প্রচ্ছদে।

৬. শান্তির নির্মল দীপ জ্বলে শুধু সত্যের আলোকে
কঠিন শ্রমের পথে ; যৌবনের আপ্রাণ প্রয়াসে।

৭. তুমি যে 'পথের পথী' সত্যান্বেষী। সে পথ আমারও!
সত্যের নিগূঢ় তত্ত্ব, খুঁজি আমি জ্ঞানের মঞ্জিল ;
কিন্তু অসত্যের বাধা দেখি পথে জেগে ওঠে আরও;
হৃদয়ের দুই প্রান্তে চলে শুধু মিথ্যার মিছিল।

৮. কিন্তু যে মহান কর্মী চলে ঈমানের দীপ্তি নিয়ে,
যার প্রেমে, মহব্বতে প্রাণ পায় বঞ্চিত জীবন
পায় সে সাফল্য খুঁজে।

৯. অসত্যের—
অশান্তির মূল যেন উৎপাটিত হয় পৃথিবীতে।

অসত্যের উপরে সত্যের অবশ্যম্ভাবী বিজয়ের কথা কবি পৌনঃপুনিকভাবে বলেছেন। পাপ-পুণ্যের চিত্রও তিনি এঁকেছেন স্পষ্ট রেখায় (দুসরা সওয়ালের অন্তর্গত 'খরজমের গোরস্তানে' দ্রষ্টব্য), লোভ প্রবঞ্চনা প্রভৃতি মানবীয় ত্রুটিকে তিরস্কার করেছেন তীব্রভাবে। তাঁর বিশ্বাসের জগতে নূররেজ ফুলের স্পর্শে অন্ধত্ব ঘোচে, খোদার নামের কুদরতে অসম্ভব সম্ভব হয়। কাহিনী-বর্ণনার প্রতিটি পর্যায়ে এ বিষয়ে কবিকণ্ঠ সোচ্চার। কখনো তা ভাষণের মত শোনায়;—এ সব অংশে কবির মনোভঙ্গি স্বচ্ছভাবে ধরা পড়ে ঃ

www.pathagar.com

১. দেখিল সে—লালসার অন্ধকারে মোহাচ্ছন্ন প্রাণ
পৃথিবী, মানুষ ভুলে নেমে গেল বিহ্বল অজ্ঞান।

২. বলিল হাতেম তায়ী—"যদি তারা বিকৃত স্বরূপ
দেখে নিত কোনদিন আত্মার দর্পণে, যদি তারা
দেখে নিত প্রবৃত্তির পাশবতা,—যা রেখেছে ঘিরে
বিকৃত কদর্য সত্তা পশুত্বের কাছে; তবে তারা
মরে যেত সে মুহূর্তে আতঙ্কিত, বিকৃত স্বরূপে,
কিম্বা বান্দা গোনাহ্‌গার ক্ষমা চেয়ে দরবারে আল্লার
ফিরে যেত ইনসানের মহান স্বরূপে।"

৩. আছে যার মর্দমী-এমন
আল্লাহ্‌র সৃষ্টির প্রতি মুহব্বত আছে যার দিলে
মানে না সে কোনদিন জালিমের জুলুম নিখিলে।

৪. পড়ে আছে অন্তহীন অন্ধকারে
শাসনে, শোষণে আর অন্যায়ের জগদ্দল চাপে
বিকলাঙ্গ মানুষের পৃথিবী বিশাল।

মজলুমের প্রতি, প্রবঞ্চিতের প্রতি, কবির দরদ স্বতঃস্ফূর্ত। এ প্রসঙ্গেও তিনি স্পষ্ট ও সোচ্চার। কবি দেখেছেন :

আল্লাহ্‌র রহমত, রেজা ঘিরে আছে একভাবে এই
দুনিয়া জাহান। মুক্ত আলো বায়ু নামে একভাবে
জনপদে, এক স্নেহচ্ছায়া ঘিরে আছে এ পৃথিবী
—আল্লার সংসার। তবু কেন এ বিভেদ ? ইবলিসের
কি দুরাশা ধ্বংস করে মানুষের ঘর ? কেড়ে নেয়
শিশুর মুখের হাসি, মুছে ফেলে শক্তি তরুণের,
স্তব্ধ করে বলদর্পী কি আশায় জ্ঞানীর জবান ?

মানুষের স্বার্থপরতা মানুষে মানুষে বিভেদের উৎস। সভ্যতা গর্বিত মন শাসন-শোষণের চক্রান্তজালের দূর বিস্তার অনুভব করে :

রক্ত-শোষণের পালা চলে নি কি অব্যাহত আজও
এই পৃথিবীতে ? সভ্যতা-গর্বিত মন জনপদে
দেখে না কি রাত্রিদিন সংখ্যাহীন যন্ত্র শোষণের,
ষড়যন্ত্র জাল শোষকের ? দেখে না কি চারপাশে
অনাহার-ক্লিষ্ট প্রাণ ভারগ্রস্ত মরে ?

www.pathagar.com

এর সমাধানের ভঙ্গি কবির কাছে অস্পষ্ট নয় :

বনি আদমের প্রাপ্য দাও তাকে ফিরায়ে আবার,
দাও ইনসানের হক। যে দৌলত আছে সঙ্গোপনে,
পাবে যা সামান্য শ্রমে; মনে রেখ একমাত্র তুমি
তার অধিকারী নও। দিল যারা স্বেদ ও শোণিত,
যাদের রক্তের মূল্যে বেবাহা দৌলত, সম্পদের
অধিকারী তারা, তারাই ঐশ্বর্য পাবে,—জিন্দেগীতে
পেল যারা ক্রমাগত বঞ্চনা; অথচ শ্রমশীল
প্রবঞ্চিত সেই সব বান্দা এলাহির।

এ কাব্যের কাহিনী হচ্ছে ঃ হুসনাবানুর হতাশ প্রেমিক মুনীর শামীর প্রতি করুণা-পরবশ হাতেম তা'য়ী কর্তৃক, হুসনা বানুর সাত সওয়ালের জবাবের সন্ধানে, সাতবার বিপদ শঙ্কুল সফর। হাতেমের বিপদবরণের কারণ প্রেমিক—হৃদয়ের মূল্যায়ন ঃ

মনে হল হাতেমের মত
লক্ষ প্রাণ বিনিময়ে যদি বাঁচে আশিক হৃদয়
তবু তার আছে সার্থকতা।

প্রকৃতপক্ষে এ কাব্যে হাতেমই একমাত্র সক্রিয় চরিত্র। হুসনা বানু কেবল প্রশ্ন-কারিণী আর মুনীর শামী হতাশপ্রেমিক। হুসনা বানুর প্রশ্নের পেছনে তার জ্ঞানস্পৃহার কথা কবি উল্লেখ করেছেন এবং সকল প্রশ্নের উত্তর পেয়ে তার জ্ঞানস্পৃহার নিবৃত্তি হল এ কথাও বলা হয়েছে। কিন্তু হুসনা বানু চরিত্রের প্রশ্নময়-প্রাণহীনতার মুক্তির কোন প্রচেষ্টা কবি করেন নি। হুসনা বানু যেন গল্প শুনতে ভালবাসে; "হাতেম তা'য়ীর বর্ণনা তাই কখনো সে যাচাই করে না। কেবল ষষ্ঠ সওয়ালের সূচনায় পঞ্চম সওয়ালের শেষের সফর কাহিনী সে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞাসা করেছে এবং ফলে পঞ্চম সওয়ালের শেষের সফর কাহিনী ষষ্ঠ সওয়ালের সূচনায় পুনরাবৃত্ত হয়েছে। পুনরাবৃত্তির দৈর্ঘও একটু বেশি। মুনীরের জন্যে হুসনাবানুর ব্যাকুলতা খুবই ক্ষণিক মনে হয়, কেননা কাব্যের শেষে তাকে সে কথা স্মরণ করিয়ে দিতে হয়েছে।

হতাশপ্রেমিক মুনীর শামীর চরিত্র প্রায় ক্লীবত্বের স্পর্শযুক্ত প্রেম-ব্যাকুলও বটে, কিন্তু তার জন্যে সাধনা-বিমুখ। সে জানে ঃ

প্রশ্নের পথ জটিল ভয়ংকর
পাবে পায়ে পায়ে হতাশার দেখা ; মৃত্যুর স্বাক্ষর।

কিন্তু সে পথে চলতে তাকে আদৌ আগ্রহী দেখা গেল না। নিজে সে অক্ষম এবং হাতেমের উপকার হাত পেতে নিতে লজ্জিত নয়। হাতেম তাকে বলে ঃ

www.pathagar.com

জীবনে মৃত্যু আসবেই একদিন,
পাব একদিন মওতের দেখা জিন্দেগানির পথে।
আশিক মুনীর ! কেন হও বে-চঈন
কবে মর্দমী হারায়েছে পথ দুরারোহ পর্বতে;
মৃত্যুর ভয়ে যাত্রী থেমেছে কবে ?
জানি না যা আমি দুনিয়া জাহানে—তাকে জানতেই হবে।

কিন্তু এতে মুনীরের পৌরুষ জেগে উঠবার মত আগুন জ্বলে না।

হাতেম পরোপকারে উৎসর্গিত প্রাণ, সত্যসন্ধানী, অসত্যের বিরুদ্ধে সর্বদা জেহাদে উদ্যত উদার হৃদয়, মহৎ, অতিমানুষ। হাতেমের প্রশংসা এই সমস্ত কাব্য জুড়েই আছে। যেমন ঃ

১. দুনিয়া জাহানে জাহের তোমার মর্দমী।

২. প্রবৃত্তির পাশবতা অনায়াসে যে করেছে জয়
তার কাছে ধরা দেয় চেনা কিংবা সম্পূর্ণ অজানা।

কবি হাতেমের সাহস বীরত্ব যুদ্ধ প্রভৃতিরও বর্ণনা দিয়েছেন। বাঘকে নিজের গোশত কেটে দিয়ে তার গ্রাস থেকে হরিণের প্রাণ রক্ষা করতে কিংবা মৃতপ্রায় জন্তুকে রক্তদান করতে হাতেমকে প্রস্তুত দেখা গেছে। রাক্ষসের অত্যাচার, জ্বিনের জুলুম, হালাকু জানোয়ারের গ্রাস প্রভৃতি থেকে বিপদগ্রস্ত মানুষ ও জনপদকে রক্ষা করতে হাতেম সদা ব্যগ্র। এবং এই মহত্ত্বের প্রভাময় হাতেম সর্বদাই অসাধারণ, অমানবিক ; মানবীয় স্খলন-পতন ত্রুটির ঊর্ধ্বে একটি একমাত্রিক চরিত্র।

এবং সমগ্র কাব্যে এই একমাত্রিকতা যেন বিশেষ নিষ্ঠার সঙ্গে চিত্রিত করা হয়েছে। সত্য ও অসত্যের দ্বন্দ্ব ও সত্যের জয়ের মত বিষয়কে কাব্যের উপজীব্য করা থেকে শুরু করে হাতেম, হুসনা বানু, মুনীর শামী প্রভৃতি চরিত্রের একমাত্রিকতা চিত্রণে কবি নির্দ্বন্দ্ব। এবং কবির বিশ্বাসের জগতের নির্দ্বন্দ্ব স্বরূপেরই তা পরিচায়ক।

কাব্যের অন্যান্য চরিত্র সাপ, জ্বিন প্রভৃতি হচ্ছে শয়তানের অনুচর এবং বলা বাহুল্য একমাত্রিক।

পুঁথির কাহিনী অনুসরণের ফলে সে কাহিনীর রূপকথার জগৎও কবি অবলীলায় চিত্রিত করেছেন ; যেমন, পানির নীচে ময়দান বা জাদু তালাব প্রভৃতি।

'হাতেম তা'য়ী'র সফরকে কবি প্রতীক হিসাবে দেখেছেন, বস্তুত কবির কল্পনায় সফর হচ্ছে সত্যসন্ধানের একমাত্র পথ, প্রতীকও বটে। সাত সাওয়ালের শেষে তাই হাতেম তা'য়ীর উক্তি ঃ

www.pathagar.com

যা জেনেছি, যা দেখেছি আমি
পিপাসা মেটে নি তাতে তৃষিত প্রাণের, র'য়ে গেছে
এখনো অনেক বাকী,—পূর্ণ জ্ঞান আমি চাই ;
জীবনের অভিজ্ঞতা চাই শুধু খিদমত সৃষ্টির।

অন্যত্র হাতেম তায়ী বলে ঃ

জানার সওয়াল নিয়ে চলি আমি আলমে আল্লার,
সব জেনে যেতে চাই,—যা কিছু রয়েছে সংগোপন
বিশ্ব রহস্যের মূলে।

হাতেম চরিত্র কল্পনায় যে একমাত্রিকতা আছে চরিত্রের মহত্ত্ব তাকে অতিক্রম করে যাবে—কবি সম্ভবত এ কথা ভেবেছেন, কখনো তা ঘটেছে বটে; কিন্তু সঙ্গত কারণেই অনেক সময়ই একই বক্তব্যর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে, পুনরাবর্তন ঘটেছে একই ভঙ্গিতে।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'হাতেম তা'য়ী' 'মেঘনাদ বধ কাব্য'-এর মত অষ্টাধিক সর্গে রচিত ('সর্গ' এই নামটি অবশ্য ব্যবহৃত হয় নি)। এতে মানুষ, পরী, জ্বিনের কথা আছে, পাতাল ও মর্ত্যে এর কাহিনী প্রসৃত, নায়ক-চরিত্রে নানা গুণের সমাহার বর্তমান এবং পাকিস্তান আন্দোলনের প্রেরণাসার এ কাব্য-রচনার প্রেরণা-মূলে। এতে অবশ্য 'মেঘনাদ বধ কাব্য', 'প্যারাডাইস লট', 'ইলিয়াড' বা 'ওডেসী'র মত চরিত্রের জটিলতা, ব্যক্তিত্বের সংঘর্ষ, ট্রাজেডীর তীব্রতা, মানব জীবনের বিচিত্রমুখী সম্ভাবনার ইংগিত, কি দুর্লঙঘ্য নিয়তির প্রভাব লক্ষ্যগোচর হয় না। এবং রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর অনুসরণে বলা যায় ঃ সভ্যতার অগ্রগতির সংগে সংগে মহাকাব্যের বিলোপ হয়। অর্থাৎ কাব্যের ফর্ম হিসেবে মহাকাব্যের ভূমিকা নিঃশেষিত হয়। সাম্প্রতিককালে তাই মহাকাব্যেরর চাইতে উৎকৃষ্ট কাব্যের প্রয়োজন বেশী। আমার তাই মনে হয়, "হাতেম তা'য়ী"তে যে সব উৎকৃষ্ট কাবাংশ্য আছে তার মূল্যই সমধিক।

এ কাব্যের উৎকৃষ্ট চরণসমূহে কবির মর্ত্যপ্রীতি বাঙ্ময়, যেমন—

দেখেছি সৌন্দর্য যত... ফুল, পাখী অরণ্য, প্রান্তর,
শিশির, সমুদ্র, নদী দেখি স্বপ্নালোকে। দেখি আমি
উজ্জ্বল আলোর ঝর্ণা,—যা দেখেছি প্রথম ভোরের
সফেদ রোশ্‌নিতে, আর যা দেখেছি সূর্যাস্তের তীরে
উজ্জ্বল আগুন রঙ, পাটল অথবা আরক্তিম
সন্ধ্যার মেঘের অন্তরালে, জরিন জরির আভা
দেখেছি যা বে-নেকাব পূর্ণিমার প্রথম প্রকাশে
প্রদীপ্ত, রূপালি স্রোতে দেখেছি যা জ্যোৎস্না-ঝরা মাঠে

www.pathagar.com

নিস্তব্ধ, নিথর রাত্রে বাধহীন অকুণ্ঠ যেমন
বন্যাধারা, তরুণের কলহাস্যে যে আলো উছল,
অশেষ ইঙ্গিতময় আঁখি প্রান্তে দেখেছি প্রিয়ার
যে আলো চকিতে, ঘুমন্ত দেখি তা আমি স্বপ্নঘোরে
আশ্চর্য সজীব আর পরিপূর্ণ মাধুর্যে প্রাণের !

'হাতেম তা'য়ী' কাব্যে কবি অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, ও স্বরবৃত্ত—তিন রকমের ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তবে অক্ষরবৃত্তের ব্যবহারই প্রধান। সমিল ও অমিল প্রবহমান এবং সনেটে তিনি সাধারণত সফলভাবে আঠারো মাত্রায় অক্ষরবৃত্ত প্রয়োগ করেছেন। ছয়মাত্রার মাত্রাবৃত্তেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ খুবই স্বচ্ছন্দ। স্বরবৃত্তের ব্যবহারে কিছু মাত্রার হেরফের লক্ষ্য করা গেল। ১৪১-৪২ পৃষ্ঠায়, মালেকা জরিন পোশের কিস্‌সা।। এক।।-এ পূর্ণ পর্বগুলোতে মাত্রা সংখ্যা চার। নিম্নালেখ অংশে পূর্ণ পর্বে পাঁচ মাত্রাও ব্যবহার করা হয়েছে ঃ

কখনো তারার।	আলোয় চলে	৫।৪
কখনো চলে।	দীপ্ত দিনে,	৫।৪
রাত্রি শেষের।	পথ চলা তার	৪।৪
হয় যে ভোরের।	রোশ্‌নি চিনে	৪।৪
কখনো চলে।	বিরান দেশে	৫।৪
শূন্য যে পথ ।	মড়কে	৪।৩
কখনো চলে।	প্রাণ জোয়ারে	৫।৪
উচ্ছ্বসিত ।	সড়কে	৪।৩

'হাতেম তা'য়ী'-এ প্রথম সংস্করণের ১৪৮ পৃষ্ঠায় ৪/৪/৪/৩ চালে প্রতি দু'চরণে স্বরবৃত্তে মাত্রা গণনা করা হয়েছে। কিন্তু ঐ পৃষ্ঠায় কয়েকটি পূর্ণ পর্বে যেমন—প্রথম চরণে 'সেহেলি আসে', এগারো চরণে 'এগিয়ে গেল', উনিশ চরণে 'তলিয়ে গেল', একুশ চরণে 'তাকিয়ে দেখে' এবং তেইশ চরণে 'দাঁড়িয়ে আছে' স্বাভাবিক উচ্চারণে, পাঁচ মাত্রা দাঁড়ায়। ১৪৯ পৃষ্ঠায়ও একই চালের, অর্থাৎ প্রতি দু'লাইনে ৪/৪/৪/৩, মাত্রা ব্যবহৃত হয়েছে এবং ঐ পৃষ্ঠায় তৃতীয় স্তবকের দ্বিতীয় চতুর্থ চরণে অপূর্ণ পর্বে দু'মাত্রা করে ধরা হয়েছে (বন্দর, অন্তর), এতে করে স্বাভাবিক গতির মধ্যে হঠাৎ ধাক্কা লাগে। ২৩০-৩৫ পৃষ্ঠায় 'পাখীর আলাপ' কাব্যাংশে ৪ মাত্রার স্বরবৃত্ত ব্যবহৃত হয়েছে। এখানেও ২৩০ পৃষ্ঠার ষষ্ঠ চরণে প্রথম পর্ব 'ছড়িয়ে গেল' সপ্তম চরণে প্রথম পর্ব 'ছড়িয়ে গেল', দ্বাদশ চরণে 'দাঁড়িয়ে আছে, চতুর্দশ চরণে' 'ছড়িয়ে লহু'; ২৩১ পৃষ্ঠায় তৃতীয় চরণে 'সাত-রঙা পাখা' এবং ২৩৩ পৃষ্ঠার বিংশ চরণে 'রয়েছে কাছে' স্বাভাবিক

www.pathagar.com

উচ্চারণে পাঁচ মাত্রা দাঁড়ায়। তবে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, 'এগিয়ে' 'তলিয়ে' 'তাকিয়ে' 'দাঁড়িয়ে', 'ছাড়িয়ে', 'ছড়িয়ে' প্রভৃতি শব্দে ইএ (ইয়ে) দ্বিস্বর ধ্বনি এবং 'রয়েছে' শব্দে ওএ (ওয়ে) দ্বিস্বর ধ্বনি আছে। দ্বিস্বর ধ্বনি বাংলা ছন্দে সাধারণত বদ্ধাক্ষর (Closed syllable) রূপে গণ্য হয় এবং তাহলে এ সব শব্দের মাত্রাসংখ্যা হয় চার। অবশ্য 'সেহেলি আসে' বা 'সাতরঙ্গা পাখা'র মাত্রা অস্বীকার করা সম্ভব নয়। পরেরটাকে 'সাত-রঙ পাখা' করে নেওয়া চলতে পারে।

"হাতেম তা'য়ী" প্রধানত কথ্যভঙ্গিতে রচিত। কবি চলিত বাংলার প্রতি মুগ্ধও বটেন। এ কাব্যের উৎসর্গ-পত্র তার প্রমাণ। তবু এ কাব্যে বেশ কিছু সাধু ক্রিয়াপদ চোখে পড়ল—যেমন, 'চলিত' 'দেখিল' 'ছুড়িল' ইত্যাদি।

এ কাব্যে মিল বিন্যাসে কবি যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। যে-কোন একটি দৃষ্টান্তেই তার স্বরূপ বোঝা যাবে ঃ

ঝিল্লীমুখর পৃথিবীর স্বর মনে বয়ে আনে নেশা
তবু জেগে থাকে চারপাশে এক মওতের আন্দেশা।

"হাতেম তা'য়ী" কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যাদর্শের শ্রেষ্ঠ ফসল এবং এ কাব্যে কবির প্রতিভা তুঙ্গতম পরিণতি লাভ করেছে।

www.pathagar.com

রফিকুল ইসলাম

ফর্‌রুখের আকাঙ্ক্ষা

যে কোন জীবন্ত, প্রাণবন্ত, মৌলিক ও সৃষ্টিশীল ব্যক্তিত্ব বিতর্কিত প্রতিভা; কারণ তাঁরা প্রচলিত মত ও পথের পথিক হন না। ফর্‌রুখ আহ্‌মদও ব্যতিক্রম নন। জীবদ্দশায় তিনি তাঁর আদর্শগত কারণে অনেক বিতর্কের সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু স্ব-আদর্শে তাঁর নিষ্ঠা সম্পর্কে কেউ কখনো প্রশ্ন তোলেন নি, বরং সে জন্যে তাঁর বিপরীত আদর্শবাদীরাও তাঁকে শ্রদ্ধা করেছেন। তৃতীয় বিশ্বের একটি সমস্যাসংকুল দেশের একজন-সৃষ্টিশীল প্রতিভার মধ্যে যদি আদর্শের উত্তাপ না থাকে এবং সে আদর্শ রূপায়ণের জন্যে যদি তিনি নিজেকে পরিপূর্ণরূপে নিয়োজিত না করেন, তাহলে তাঁর সৃষ্টি কর্মে একটা ফাঁক থেকে যায়। কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মধ্যে কোন আদর্শগত ফাঁক বা ফাঁকি ছিল না; তাই তাঁর কবিতায় আমরা একজন সতেজ কবিকে সর্বদা প্রত্যক্ষ করি। সুকান্তের পর এমন আদর্শনিষ্ঠ কবি বাংলা সাহিত্যে বিরল। একজন দক্ষিণপন্থী কবি হিসেবে তাঁর মধ্যে যে আদর্শনিষ্ঠার পরিচয় পাওয়া যায়, আমাদের দেশে কোন বামপন্থী কবির মধ্যে তেমনটি পাওয়া যায় না।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের "সাত সাগরের মাঝি" (১৯৪৪) আধুনিক বাংলা কবিতায় এক নতুন আবেগ সঞ্চার করেছিল। "সাত সাগরের মাঝি" যে প্রেরণা থেকে সৃষ্ট, তা এই উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও সংগ্রাম এবং তৎসঞ্জাত উদ্দীপনার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। বস্তুতঃ কাজী নজরুল ইসলামের ইসলামী উদ্দীপনামূলক সৃষ্টির যেখানে শেষ, ফর্‌রুখ আহমদের যাত্রা সেখান থেকে শুরু। নজরুলে যে আবেগ প্রথম বলিষ্ঠভাবে উচ্চারিত এবং যে জাগরণ সাধারণভাবে কাম্য ফর্‌রুখ আহমদ তা বিশেষ অর্থে, বিশেষ প্রেরণায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যের অভিসারী। তবে নজরুল চেয়েছেন নবজাগরণ আর ফর্‌রুখ আহমদ পুনর্জাগরণ।

ফর্‌রুখ আহমদ তাঁর অভিজ্ঞতা ও আকাঙ্ক্ষাকে প্রকাশ করেছেন কয়েকটি প্রতীকের সাহায্যে। "সিন্দাবাদ' ফর্‌রুখ আহমদের একটি বহুল ব্যবহৃত প্রতীক, যে নাবিক নিত্য নতুন দরিয়ায় তরী ভাসায়; সে নতুন জীবনের তাজা ঘ্রাণের প্রতীক। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এই সিন্দাবাদের সঙ্গে তাঁর স্বপ্নের, কল্পনার আদর্শ জগতে পাড়ি জমান।

> কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
> শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,

www.pathagar.com

ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ ব'য়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার, হে মাঝি সিন্দাবাদ!

[সিন্দাবাদ]

আরব্য উপন্যাসের সহস্র রজনীর কথক শাহেরজাদী ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রিয় নায়িকা, শাহেরজাদীর ঝরোকায় এসে মরু-সাহারায় চিড় খাওয়া শূন্য নিখিল প্রাণ ওয়েসিস খোঁজে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের রোমান্টিক মন বারবার শাহেরজাদীর ঝরোকার উদ্দেশ্যে ভেসে যায়, কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ মন স্বস্তি পায় মধ্যপ্রাচ্যের কোন মরূদ্যানে নয়, বরং বাংলার পরিচিতি পদ্ম-বনে।

তোমাকে সুন্দর করে সে আমার প্রেম
অন্তরের ঘ্রাণ
দিন রাত্রি ঝ'রে ঝ'রে পড়ে
দীর্ঘ পদ্মনাল বেয়ে পাপড়ির পরে....
ভ'রে ওঠে মনের আকাশ দীর্ঘশ্বাস অপরাহ্ন বেলা
পাপড়ির দ্বার রুধি' পথের সুরভি কোথা চলেছে একেলা,
পিছে ফেলে পরিত্যক্ত পাপড়ির বাস,
ভেসে চলে মন, দূরে ভেসে চলে সুরভি প্রশ্বাস,
...... জানি না কোথায়—

[ঝরোকা'য়]

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের রোমান্টিক মানস সুদূর অতীত স্বচ্ছন্দ বিহারী হলেও, আলেফ লায়লা, হাতেম তায়ীর জগৎ তাঁর কাছে বর্তমান পৃথিবী অপেক্ষা অধিকতর সত্য হলেও, শৃংখলমুক্ত পূর্ণচিত্তের প্রতীক হিসেবে তিনি বাংলাদেশের ডাহুক পাখীর ডাককেই গ্রহণ করেন। ডাহুকের ডাক কবির কাছে আকাশ-জমানো ঘন-অরণ্যের অন্তর্লীন ব্যথাতুর গভীর সিন্ধুর অপরূপ সুর, যে সুরে আত্মা জাগ্রত হয়, সৃষ্টির অসীম রহস্য উদ্ঘাটিত হয়: রাত্রির পেয়ালা পুরে উপচে-পড়া ডাহুকের সুর এক অফুরান সুরা বলে মনে হয় ঃ

চাঁদের দুয়ারে
যে সুরার তীব্র দাহে ভেসে চলো উত্তাল পাথারে,
প্রান্তরে তারার ঝড়ে
সেই সুরে ঝ'রে পড়ে
বিবর্ণ পালক,
নিমিষে রাঙায়ে যায় তোমার নিষ্প্রভ তনু বিদ্যুৎ ঝলক,

তীর-তীব্র গতি নিয়ে ছুটে যায় পাশ দিয়ে উল্কার ইশারা,
মৃত-অরণ্যের শিরে সমুদ্রের নীল ঝড় তুলে যায় সাড়া
উদ্দাম চঞ্চল;
তবু অচপল
গভীর সিন্ধুর
সুদুর্গম মূল হ'তে তোলো তুমি রাত্রিভরা সুর

[ডাহুক]

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিচরণ শুধু সুদূর অতীতে নয়, সৃষ্টির রহস্যালোকেই নয়। কবি আরব্য উপন্যাস আর কিংবদন্তীর দেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে স্বদেশের রূঢ় বাস্তবতায় জাগ্রত হন। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ সুকান্ত ভট্টাচার্যের মতোই ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে চঞ্চল ও ক্ষুব্ধ করেছে। পথের পাশে পড়ে-থাকা অনাহারী মানুষের লাশের মধ্যে তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন :

পড়ে আছে মৃত মানবতা
তারি সাথে মুখ গুঁজে।

[লাশ]

মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি;
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ নিখিলের অভিশাপ বও :
ধ্বংস হও
তুমি ধ্বংস হও —

[লাশ]

এ জড় সভ্যতার, এ মৃত সভ্যতার ধ্বংসস্তূপের ওপর ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যে পৃথিবী গড়ে তুলতে চান তা নতুন কোন পৃথিবী নয়, নতুন কোন সভ্যতা নয়। এ পৃথিবীতে তিনি গৌরবময় এক প্রাচীন সভ্যতার পুনঃপ্রতিষ্ঠা কামনা করেন, সে কারণেই হেরার রাজ-তোরণের উদ্দেশ্যে সাত সাগরের কিশতী ভাসাতে হয়। হেরার গুহা থেকেই তো সেই সভ্যতার বিকাশ হয়েছিল :

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত-সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।

www.pathagar.com

হে মাঝি! এবার তুমিও পেয়ো না ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক তারকার বিস্ময়,
ঝরুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে—যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজ-তোরণ।

[সাত সাগরের মাঝি]

'সিরাজাম মুনীরা'য় (১৯৫২) ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অভিজ্ঞতা ইসলামের উন্মেষ যুগের গৌরবময় ইতিহাসকে কেন্দ্র করে আবর্তিত। 'সিরাজাম মুনীরা'র জোতির্লেখা মুক্ত ঝরোকায় তৌহিদী মশাল বহন ক'রে যে যাত্রীদল চলে গেছেন, তাদের পথেই কবির বিচরণ। ইসলামের গৌরবময় যুগ সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা (সঃ) আর ইসলামের চার খলীফা আবুবকর, উসমান, উমর, আলী হায়দারের জন্যে স্মরণীয়। কবি তাদের গৌরবকে ছন্দোবদ্ধ করেছেন। সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা (সা) কবির দৃষ্টিতে ঃ

পূর্বাচলের দিগন্ত নীলে সে জাগে শাহানশাহের মত
তার স্বাক্ষর বাতাসের আগে ওড়ে নীলাভ্রে অনবরত।
ঘুম ভাঙলো কি, হে আলোর পাখী? মহানীলিমায় ভ্রাম্যমাণ
রাত্রি-রুদ্ধ কণ্ঠ হ'তে কি ঝ'রবে এবার দিনের গান ?

[সিরাজাম মুনীরা মুহাম্মদ মুস্তফা]

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের দৃষ্টিতে খলীফা 'আবুবকর সিদ্দিক' :

কেঁপে ওঠে যেথা উমরের মত বিশাল হৃদয় অগ্নিগিরি,
বিরাট সত্তা দাঁড়াও সেখানে অটল সত্যে আকাশ চিরি।

আর 'উমর-দারাজ দিল'—ফর্‌রুখ আহ্‌মদের চোখে :

দেখি সে চলেছে .... মরু মুসাফির .... কোথায় কে জানে
পিঠে বোঝা নিয়ে মৃত বিয়াবান ছাড়ায়ে কী টানে!
চ'লেছে নিয়ে সে মানবতা—যেথা মরু নিষ্প্রাণ,

কবির দৃষ্টিতে 'ওস্‌মান গণি' :

নবীজীর হাতে তার হাত রেখে পেল যে নির্ভয়;
যার ছায়াতলে বসি পথিক খুঁজিয়া পেল
জীবনের প্রশান্ত আশ্রয়;

'আলী হায়দার' স্বাভাবিকভাবেই ইসলামী শৌর্যের প্রতীক :

মরু-আফতাব উড়ে চলে তার ঘোড়ার খুরে,
তল্‌ওয়ার খাপে সূর্যের খা'ব প'ড়ছে ঝু'রে,

www.pathagar.com

চম্‌কালো ঐ দিগন্তে ও কি বজ্র-নার,
অথবা আলীর শাণিত দু'ধারী জুলফিকার ?

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় ধর্ম একটি প্রধান উপাদান; কিন্তু তিনি আধ্যাত্মিক সাহিত্য রচনা করেন নি, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ মরমী কবি ছিলেন না। ধর্মীয় চেতনা তিনি ব্যবহার করেছেন ব্যক্তির চিত্তমুক্তি বা মোক্ষলাভের জন্যে নয়, বরং ধর্মীয় আদর্শে সমষ্টির রাজনৈতিক জীবন পুনর্গঠনের জন্যে। তাহলেই কবির কাম্য আদর্শ-মানুষ বা মুমিন সৃষ্টি হবে। যে মানুষ তওহীদের আদর্শে গঠিত সে পরিপূর্ণ মানবতার প্রতীক। সে মুমিনদের নিয়েই হেরার আলোকে আদর্শ মানবসমাজ গঠিত হবে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সমস্ত সৃষ্টিকর্ম ঐ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যেই নিয়োজিত ও নিবেদিত।

'মুহূর্তের কবিতা'য় (১৯৬৩) ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কিংবদন্তী আর ইতিহাসের রাজ্য থেকে কিছুক্ষণের জন্যে বিশ্রাম গ্রহণ করেছেন। এ কাব্যের কিছু সনেটে পরিচিত পৃথিবী, পারিপার্শ্ব, বাংলার প্রকৃতি উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। কয়েকটি সনেটে কবি নিজেকে উন্মুক্ত করেছেন অন্তরঙ্গ আলোকে :

ঘাসের সবুজ শীষে অরণ্যে রঙ জেগে আছে!
তোমার দু'চোখে নীল মেঘমুক্ত আকাশের আলো
আমার সত্তায় আজ নবতর বিস্ময় জাগালো
জীবনের সব স্বপ্ন সংগোপন দেখি চারা গাছে।

[প্রত্যয়]

অথবা :

কিছু লেখা হ'ল আর অলিখিত র'য়ে গেল ঢের,
কিছু বলা হ'ল আর হয় নি অনেক কিছু বলা;
অনেক দিগন্তে আজও হয় নাই শুরু পথ চলা;
কে জানে সকল কথা! কে পেয়েছে সংজ্ঞা সময়ের ?

[শেষ কথা]

ঐ সব কবিতায় যে লিরিক তা অকৃত্রিম, কিন্তু কবি সর্বদা তার পরিচর্যা করেন নি। "হাতেম তা'য়ী"তে কবি পুঁথির জগতে প্রত্যাবর্তন করেছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্য-প্রেরণার অন্যতম উৎস পুঁথি-সাহিত্যের ঐতিহ্য; যার আধুনিক রূপকার তিনি। য়েমনের শাহ্‌জাদা তা'য়ীপুত্র হাতেম ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আদর্শ নায়ক, যে এলাহির নামে নিজের সম্পূর্ণ সত্তা উৎসর্গ করে আর ইনসানের খেদমতের জন্য এলাহির রেজামন্দি চেয়ে নেয়, যে নৌ-জোয়ানের ঈমান সুদৃঢ়, যে তার সর্বস্ব বিলিয়ে দেয় বিশ্ব-মানুষের কাজে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আদর্শায়িত সেই মানবের চিত্র :

www.pathagar.com

য়েমনের শাহ্‌জাদা তা'য়ীপুত্র হাতেম যে দিন
আত্মজিজ্ঞাসার মুখে পেলো খুঁজে পথের নির্দেশ
(ইনসানের খিদমত আর মুক্ত প্রজ্ঞার সন্ধান
বিশ্ব-রহস্যের মূলে); তন্দ্রাহারা মোরাকাবা শেষে
সত্যের ইশারা পেয়ে জেগে ওঠে উল্লাসে যেমন
ধ্যানী সাধকের আত্মা, সেই মত 'য়েমনী হাতেম
সংকীর্ণতামুক্ত চিত্তে পেলো ফিরে দীপ্ত অনুভূতি
জীবনের,—অন্ধ কূপে এল যেন সুবে উম্মীদের
মুক্ত রশ্মিপ্রবাহ বিপুল।

[হাতেম তা'য়ী]

স্মরণীয় যে, 'নৌফেল ও হাতেম' নাটকেও হাতেম আদর্শায়িত। কিন্তু ব্যক্তি ফর্‌রুখ আহমদের জীবন আশা ও স্বপ্নভঙ্গের আঘাতে জর্জরিত, তাই এ পৃথিবী থেকে তিনি নীরব অভিমানে বিদায় নিয়েছেন। কবির ভাষায় বলা যায় যে, তাঁর বন্য স্বপ্নেরা হয়তো জীবনের লাল নীল পুষ্পপর্ণে ফুটেছিল, তবে পরিণতিতে তা শুধু অশ্রুর কাহিনীতে রূপান্তরিত। কবির নিজের কবিতায় যে কথা অনেক আগে বর্ণিত হয়েছিল—

হে বন্য স্বপ্নেরা মোর! আজিকার মৃত্যু-নিকেতনে
যে ছায়া পড়িছে নিত্য ছাইচাপা তোমার প্রেক্ষণে,
সে ডুবন্ত ছায়া শুধু দিশাহারা নিরাশা ব্যাকুল
অথই নৈরাশ্য তলে ডোবে নিয়ে আহত মাস্তুল।
অনেক অনেক আগে ছিঁড়ে গেছে পাল, ভাঙা হাল,
ধ্বংসের জোয়ারে ওঠে অগণন প্রমত্ত উত্তাল
কালো জল। ডোবা পাহাড়ের কোন অজ্ঞাত শিখরে
অবেলায় অপঘাতে পাথারের জলে তারা মরে।

www.pathagar.com

শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ

ফর্‌রুখের অভিনবত্ব

১.

দুটি মৌল প্রশ্নের জবাবের উপর কবির কাব্যপ্রতিভার মৌলিকতা প্রমাণিত হয়। তিনি কি দিতে পেরেছেন কোন নতুন ভাবনা, তিনি কি দিতে পেরেছেন কোন নতুন আঙ্গিক ? এবং বলা বাহুল্য, ভাবনার অভিনবত্বই আঙ্গিকের রূপ পরিবর্তন করে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যপ্রতিভার বিচারে তার অভিনবত্বের পরিচয় হবে ঐ মৌল জিজ্ঞাসার উত্তর।

বিংশ শতাব্দীর যে দশকে ফর্‌রুখ আহমদের উন্মেষ সে দশক বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যগত সকল ধারাকে বদলে দিয়েছিল। পাশ্চাত্য সাহিত্যের প্রবল অনুসরণ ও অনুকরণ নবীন লেখকদের মনে যে নতুন চিন্তার উদ্ভব ঘটিয়েছিল, তাতে স্বদেশী লেখার ও শিল্পের আদর্শ চিড় না খেয়ে পারে নি। দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক চিন্তার দ্রুত উন্নতির সংগে সংগে বিশ্ব-অর্থনীতি ও রাজনীতির পট-পরিবর্তনের অবিশ্বাস্য গতি এবং প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা মানবজাতির সৃষ্টিক্ষমতার চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়ায় এবং বলা বাহুল্য বিজ্ঞান ও মনন-চিন্তায় অগ্রসর-সমাজ তার উত্তর দিতে বিলম্ব করে নি।

এখানে বলা ভাল, যে রেনেসাঁসের উদ্দীপনা নতুন ইউরোপের জন্ম দিয়ে তার শিল্পসাহিত্য, শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে মানবসভ্যতার তুঙ্গ শীর্ষে আরোহণ করতে সাহায্য করেছিল—তার বাতাস অনেক দেরীতে ভারতবর্ষের গায়ে লাগে এবং আরও বেশী দেরী করে লাগে ভারতীয় মুসলমান সমাজের গায়ে। মানুষকে এগিয়ে যেতে হবে; কিন্তু কোন্ আদর্শের বিমানে চড়ে তাকে আকাশ পাড়ি দিতে হবে, সে নির্দেশ মানুষ পায় তার সমাজের নৃপতিতুল্য নেতার কাছ থেকে। বাঙালী মুসলমান সমাজের সেই দিকনির্দেশকারী উপযুক্ত নেতার অভাব তাকে নতুন দিগ্বলয়ে উত্তীর্ণ হতে বাধা দিচ্ছিল। অর্থনৈতিক উন্নতি ভিন্ন যে কোন মানবসমাজই সভ্যতা ও সংস্কৃতিতে উন্নত হতে পারে না, এই প্রথম ও প্রধান এবং মৌল জ্ঞান মুসলমান সমাজের ধ্যান-ধারণার সঞ্চারিত ও সঞ্জীবিত করার মত বিজ্ঞান-ভিত্তিক সুস্পষ্ট নীতিমালা নিয়ে কেউ এগিয়ে আসেন নি। প্রতিযোগিতার জগতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করে উপরে ওঠা অসম্ভব। আর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় বিজয়ী হওয়ার জন্যে দরকার শক্তির; সেই শক্তি অর্জনের জন্যে প্রয়োজন শিক্ষার; সেই শিক্ষালাভের জন্যে প্রয়োজন আর্থিক সংগতির। ইংরেজ আমলে এই আর্থিক সংগতির

www.pathagar.com

অভাব মুসলমান সমাজকে পিছনে ঠেলে রাখে। কলকাতা সমাজে যখন রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, ভূদেব, নবীন এবং পরবর্তীকালে দেবেন্দ্রনাথ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের বিশাল উপস্থিতিতে হিন্দুসমাজের দরবারগৃহ আলোকিত, তখন মুসলমান সমাজ প্রভাত-পূর্ব-অন্ধকারে সুপ্ত ও নিদ্রিত।

মুসলমান সমাজে রাজনারায়ণ দত্ত ছিলেন না, তাই মধুসূদনের জন্ম হয় নি; দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন না, তাই রবীন্দ্রনাথের জন্ম হয় নি। বৈভবের আশীর্বাদ ছিল বলেই একজন ব্যারিস্টার সোহ্‌রাওয়ার্দী কিংবা একজন ফজলুল হক জন্মেছিলেন। কিন্তু তখন শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, শিল্পচর্চায় হিন্দুসমাজ অনেক এগিয়ে গেছে। ফলে মুসলমান সমাজের প্রতিযোগিতা প্রথমে বিশ্ব-সমাজের সংগে শুরু না হয়ে শুরু হল হিন্দু-সমাজের সংগে। একজন মধুসূদন যখন দান্তে, ভার্জিল, টাসো অথবা মিলটন হবার চেষ্টায় জীবনপাত করছেন, তখন একজন কায়কোবাদ অথবা ইসমাইল হোসেন শিরাজী কোনক্রমে মধুসূদনের অনুকরণে বীরগাঁথা রচনায় জীবনপাত করছেন। ভাবছেন না, এর পরিণতি অন্ধকারে, না আলোকে। ভাবছেন না, যে আঁধারে তাঁর চিন্তার পরিবেশন— সেটা তাঁর নিজের, না অন্যের। সুতরাং শেষ বিচার তার পক্ষে যাবে, না বিপক্ষে যাবে। প্রতিযোগিতার এই পরিবেশ সামান্য হওয়াতে আকাঙ্ক্ষার পরিমাণ সীমিত হয়ে যায়। বলা বাহুল্য, এই সীমিত আকাঙ্ক্ষার জগতে কম-বেশী আমাদের সকলের জন্ম, তাই আমাদের শিল্প ও সংস্কৃতিচর্চার জীবন আজও অনুকরণসর্বস্ব হয়ে আছে।

এই অনুকরণ-প্রতিযোগিতা থেকে বেরিয়ে আসার কৃতিত্বই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মৌলিকতা। ত্রিশ অথবা চল্লিশ দশকের আধুনিক কবি-বন্ধুদের অনুকরণে আধুনিক ভঙ্গি রপ্ত করে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কিছু কবিতা লেখার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু গোষ্ঠীভুক্ত হয়ে সাহিত্য-চর্চা করলে যে নিজের ব্যক্তিত্বকে বিসর্জন দিতে হবে, এই জ্ঞান অবিলম্বে ফর্‌রুখের অন্তরে আশ্রয় লাভ করে এবং তিনি নির্দ্বিধায় নিজের পথ খুঁজে পাওয়ার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হন। তিনি নিজের ভাষার রূপ পরিবহন করেন, আঙ্গিক পরিবর্তন করেন এবং এক আদর্শ চিন্তার দিগন্ত উন্মোচন করেন। চলিষ্ণু যে চিন্তার স্রোতে শিল্প-জগতের অধিকাংশ মানুষ সন্তরণ করছিলেন, সেই একই নদী-স্রোত তাঁকে আকর্ষণ করে নি। তিনি শিল্পী ছিলেন, কিন্তু শিল্পের পরিধিহীন, বন্ধনহীন বিদ্রোহী জীবনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি ধর্মীয় অনুশাসনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মানবিক জীবনের পক্ষপাতি ছিলেন এবং ইসলামকে শুদ্ধ সংযত এবং মানবিক সৌন্দর্যসম্পন্ন ধর্ম মনে করাতে অন্য কোন আধুনিক মানবহিতৈষণার দর্শনে আত্মসমর্পণ করাকে তিনি অপ্রয়োজন বলে মনে করতেন। নিজের ধর্মের অনুশাসনের মধ্যে এইভাবে তিনি আত্মবন্ধ হন এবং নিজের ব্যক্তিত্বকে ধর্মাদর্শের মধ্যে বিলুপ্ত করার চেষ্টা করেন। কেননা তিনি জানতেন, যে ধর্মাদর্শে তিনি আত্মসমর্পণ করেছেন তা মানবিক ধর্মাদর্শ—যা মানুষের জন্য, সর্বাংগ-

www.pathagar.com

সুন্দর, মানবজীবনের জন্য এবং বিশ্বশান্তির জন্য আদর্শ। 'সাত সাগরের মাঝি', 'সিরাজাম মুনীরা' 'নৌফেল ও হাতেম' এবং সর্বশেষে 'হাতেম তা'য়ী' গ্রন্থে এই ইসলামিক আদর্শকেই তিনি প্রচার করেছেন, কিন্তু প্রচারকের ভাষায় নয়, কবির ভাষায়, শিল্পীর ভাষায়। এবং বলা বাহুল্য, সেইখানে তিনি শিল্পীর ধর্মকে লংঘন করেন নি। এই ধর্মকে জানার জন্যে যে শিক্ষার প্রয়োজন, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সে শিক্ষা ছিল। কাব্যের কলা-কৌশলগত দিকের চর্চা করেছিলেন বলে আঙ্গিক-ভাবনায় তিনি সৃষ্টিক্ষমতার পরিচয় দিয়েছেন। কাব্যভাবনায় তিনি আধুনিক না হলেও কাব্যআঙ্গিক ভাবনায় তিনি আধুনিক। এবং সেখানে শুধু বাঙালী মুসলমান সমাজের একজন প্রধান কবি হিসেবে নন, একজন প্রধান বাঙালী কবি হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনি কোন নতুন ছন্দ হয়ত আবিষ্কার করেন নি—কিংবা কোনো নতুন কাব্য ভাষায় হয়ত বা মৌলিক স্রষ্টা তিনি নন; কিন্তু এই প্রতীক কাব্য-রচনায় তাঁর মৌলিকত্ব সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। আর এর মৌলিকত্বের প্রমাণ তাঁর কাব্যের রস-ব্যঞ্জনা। কবি কি বলেছেন সেটা শিল্পীর চোখে বড় কথা নয়, কবি কেমনভাবে বলেছেন শিল্পীর চোখে সেটা বড় কথা। প্রতীকধর্মী করে তুলতে গিয়ে কাব্যকে সৃষ্টি পরীক্ষার জন্যে নীরস বাকসর্বস্বতায় পর্যবসিত করা তাঁকে পক্ষে অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তিনি যখন লিখলেন :

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হল জানি না তা'।
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা।
তবু জাগলে না ? তবু তুমি জাগলে না ?
সাত সাগরের মাঝি চেয়ে দেখো দুয়ারে ডাকে জাহাজ,
অচল ছবি সে, তসবির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তার ওড়ে না কো,
হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো ঃ
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি-মাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতী আবার ভেসেছে সাগরজলে,
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ-তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙ্গে চলে সব বাঁধ।
তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাসনাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না? তবু তুমি জাগলে না?

[সাত সাগরের মাঝি]

তখন তা রসাত্মক বাক্যে রূপান্তরিত হল। এই লাইন ক'টি পড়লে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ মুসলমান কি হিন্দু, ইহুদী কি খ্রীস্টান, জৈন কি বৌদ্ধ, সে কথা কেউ মনে করবেন না;

www.pathagar.com

মনে করবেন তিনি কাব্যিক পরিমণ্ডলে অবস্থান করছেন। ভাষা রূপক বলে এখানে ঠিক কাকে, কোন সমাজকে অথবা জাতিকে অথবা কোন সম্প্রদায়কে আহবান করছেন, ডাক দিচ্ছেন অথবা আমন্ত্রণ জানাচ্ছেন, সেটাও বোঝার উপায় নেই। আর তা নেই বলেই এটা শুদ্ধ শিল্পের ভাষা হিসেবে, সকল শিল্পীর শিল্পধর্মের ভাষা হিসেবে এই কবিতা গ্রাহ্য হবে বলে আশা করা যায়। বস্তুতঃ এই বাচনভঙ্গিই ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে নজরুল ইসলাম থেকে পৃথক করে। অগ্নিবীণা"র বিস্ফোরিত নজরুল ইসলাম যখন বলেছেন :

জাগো ওঠো মুসলিম হাঁকো হায়দারী হাঁক
শহীদের খুনে সব লালে লাল হয়ে যাক।

তখন ফর্‌রুখ বলছেন :

তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাসনাহেনা
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না? তবু তুমি জাগলে না?

একটাতে আমরা চাবুক মেরে জাগানোর চেষ্টা লক্ষ্য করি, অন্যটাতে স্পর্শ বুলিয়ে ঘুম ভাঙানোর চেষ্টা দেখি। এই সুস্পষ্ট পার্থক্য বলে দেয় যে, ফর্‌রুখ আহমদ নতুন ভঙ্গিও আমাদের দিতে পেরেছেন। সুতরাং বাংলা সাহিত্যে তিনি সত্যিকারভাবে একজন মৌলিক প্রতিভাবান কবি।

২.

একজন সত্যিকার কবির তিনটি প্রধান গুণ থাকা আবশ্যক বলে আমি মনে করি। তাঁর সুস্পষ্ট একটি জীবন দর্শন থাকতে হবে, তাঁর কাব্য-আঙ্গিকের স্বাতন্ত্র্য ও মৌলিকত্ব থাকতে হবে এবং তাঁর বক্তব্যে তীব্রতা থাকতে হবে। শেষের এই গুণটি আন্তরিকতা থেকে জন্ম নেয়। অর্থাৎ সত্যিকার কবিকে হতে হবে আন্তরিক ও সৎ। কিন্তু সততা ও আন্তরিকতার জন্ম হয় কোথা থেকে? আমি এক কথায় বলব ভালবাসা থেকে। ভালবাসাই সত্যিকার কবি ও কাব্যের জন্মরহস্য।

এই ভালবাসা একজন মানুষের প্রতি হতে পারে, আবার অনেক মানুষের প্রতি হতে পারে। এই ভালবাসা জন্ম নিতে পারে দেশ, জাতি, প্রকৃতি ও ধর্মপ্রেম থেকেও। একটি কথা প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, নিছক কাব্যকে ভালবেসে যাঁরা কবি হন তাঁদের কাব্যে মানুষের জন্য বিশেষ জানবার, বুঝবার অথবা শিখবার থাকে না। মনে রাখতে হবে, ফর্‌রুখ আহমদ সেই জাতের কবি নন যাঁরা কাব্যকে ভালবেসে কবি। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সেই কবি যিনি তাঁর জাতিকে ভালবেসেছিলেন, তাঁর দেশ ও দেশের মানুষকে ভালবেসেছিলেন, যিনি তাঁর ধর্ম ও মানবতার ধর্মকে ভালবেসেছিলেন।

কিন্তু এবার একটা প্রশ্নের সামনে আমাদের দাঁড়াতে হবে। শুধু ভালবাসাই যদি কবির জন্ম দেয়, তাহলে কবির কি শিখবার কিছু প্রয়োজন থাকে না? বাংলা সাহিত্যের

www.pathagar.com

একজন বিখ্যাত কবি যে প্রেরণায় আস্থা হারিয়েছেন বলেছিলেন, এই স্তরের প্রশ্ন সেটা। কবির অবশ্যই শিখবার আছে, আর সেখানেই ওঠে আঙ্গিকের কথা। কথা বললেই তো কথা সুন্দর হয় না। বলার ভঙ্গির জন্য কথা সুন্দর হয়, কবিতাও। এই ভঙ্গি কব্যের আঙ্গিক, আর একে সাধনা ও অধ্যবসায়ের দ্বারা আয়ত্ত করতে হয়। এ প্রসঙ্গে সৃষ্টিশীল প্রতিভার কথা এলেও শিক্ষার কথাটি উপেক্ষা করা যায় না। বলা বাহুল্য, ফর্‌রুখে আমরা এই শিক্ষা ও সাধনালব্ধ উৎকৃষ্ট আঙ্গিকের সাক্ষাৎ পাই, যা স্বাতন্ত্র্যে ও মৌলিকত্বে উজ্জ্বল, যা তীব্রতা প্রকাশে শক্তিমান, যা অন্তরে সঞ্চরিত হওয়ার জন্যে ভেষজ শক্তিতে বলবান।

এ-কথার শেষে আবার আমরা সেই ভালবাসার কথায় ফিরে যাই। বলেছি, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর দেশ, জাতি ও তাঁর ধর্মকে ভালবেসেছিলেন। তাঁর ধর্ম বলতে এখানে বলা ভাল যে, ফর্‌রুখ ইসলামকে ভালবেসেছিলেন। পূর্বে উল্লেখ করেছি এই ইসলামকে তিনি মানবতার শ্রেষ্ঠ ধর্ম হিসেবে ভালবেসেছিলেন। মানুষকে ভালবেসেছিলেন বলেই তিনি মানবতার ধর্ম ইসলামকে ভালবেসেছিলেন। কবির যে একটা সুস্পষ্ট জীবনদর্শন থাকা দরকার, সে সুস্পষ্ট জীবনদর্শন তাঁর ইসলাম। ইসলামী জীবনাদর্শই ফর্‌রুখের জীবন-দর্শন। এক্ষেত্রে ফর্‌রুখ যে সততা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছেন, বাংলাদেশের সাহিত্য তার কোন তুলনা নেই। ফর্‌রুখের এ নিষ্ঠা ও সততার কারণ ইসলামী জীবনদর্শনে ফর্‌রুখের গভীর জ্ঞান ও উপলব্ধি। ইসলাম সম্বন্ধে তাঁর পরিচ্ছন্ন বোধ তাঁকে নিষ্ঠাবান ও অটল করে তুলেছিল।

ফর্‌রুখের উপর অন্যান্য মতবাদের প্রভাব বিস্তারের যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। যেকালে তিনি জন্মেছিলেন এবং যে যুগে তাঁর কাব্যিক প্রতিভা বিকশিত হয়ে উঠেছিল, সেকালে ও সে যুগে প্রতিভাবানদের পক্ষেও গড্ডলিকাপ্রবাহে ভেসে যাওয়া সম্ভব ছিল। বিশেষ করে সাহিত্যপ্রবাহের একটি প্রবল গতিধারা থাকে, সাহিত্যের সেই নিজস্ব গতিধারায় যে কালিক দর্শন প্রতিরোধ মাড়িয়ে জমকালো মূর্তি হয়ে দাঁড়ায়, তাকে ডিঙ্গিয়ে নিজস্ব বলয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়ানো শার্দুল-শক্তি ব্যতিক্রমী প্রতিভার প্রয়োজন।

ফর্‌রুখের সেই কালটি কি ? সেই যুগটি কি ? ১৯৩৯-৪০ সালের দিকে ফর্‌রুখের কাব্যপ্রতিভার উন্মেষ ঘটে। রবীন্দ্রনাথ মারা যান ১৯৪১ সালে। অর্থাৎ ফর্‌রুখের উন্মেষকালে যেমন রবীন্দ্রনাথকে বেঁচে থাকতে দেখছি, নজরুল ইসলামকে বেঁচে থাকতে দেখছি তেমনি উজ্জ্বলভাবে, উপস্থিত থাকতে দেখছি শক্তিমান জসীম উদ্‌দীন এবং আধুনিক কাব্যের প্রসিদ্ধ বাঁক-নির্মাতা পাঁচ কবি—জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্তীকে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে তখন। পৃথিবীর মানুষ অন্যায়, অমানবিকতা, মৃত্যু-বিভীষিকায় আতঙ্কগ্রস্ত হ'য়ে দিশাহারা এবং নৈরাশ্যে মূহ্যমান। ধরতে গেলে যুগটা

www.pathagar.com

পুরোপুরি অবিশ্বাসের এবং নৈরাশ্যের। আধুনিক কবিরা এই ধ্বসে পড়া বিশ্বাস ও নৈরাশ্যের সুরটিকে তাদের কাব্যবীণায় বাজিয়ে চলেছিলেন। এই নৈরাশ্যের পাশাপাশি আশার একটি জীবনদর্শন নিয়ে দাঁড়িয়েছিল মার্কসীয় চিন্তা ; এবং মধ্যম শ্রেণীর দু'একটি কাব্যপ্রতিভার মধ্যে তার সুরও ঝঙ্কৃত হচ্ছিল। জন্ম হয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও সুকান্ত ভট্টাচার্যের। বাঁচার পথ যে আছে সে কথাটাই তাঁরা দৃপ্ত ভঙ্গিতে ঘোষণা করেছিলেন। অবশ্য তাঁদের ঐ সুর যে খুব নতুন তা নয়। তাঁদের কাব্যের ঐ সুর আমরা নজরুলে দেখেছি, এখানে অবশ্য তা নিয়ে আমরা আলোচনা করব না। কারণ এখানে শুধু আমাদের কালের চেহারাটা জেনে নেয়া প্রয়োজন। আর তা হল বিশ্বসাহিত্যে এলিয়ট, পাউণ্ড, লরেন্স, অডেন প্রমুখ কবি যে কুল-প্লাবনকারী ভাবাদর্শের সৃষ্টি করেছিল, বাংলা সাহিত্য মোটামুটি তা দ্বারা ছিল গভীরভাবে আক্রান্ত। যদিও এদের সংগে বোদলেয়ার, মালার্মে, র‍্যাঁবো এবং আরও অনেকের সুর জড়িয়েছিল, তবু কাব্যের বিষয় ও আঙ্গিকগত পরিবর্তনে এঁদের প্রভাব ছিল উচ্ছ্বসিতভাবে বিদ্যমান। মোটের উপর, বাংলা সাহিত্য ইউরোপ-আমেরিকার বিশ্বপ্লাবী ভাবনাধারায় নিমজ্জিত হয় এবং বাংলা সাহিত্যের নব্য ছোট-বড়-মাঝারি প্রতিভারা সেই চিন্তার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে। এঁদের অনেকের চোখ-ঝলসানো প্রতিভার দিকে নজরুল ইসলাম পিঠ ফিরিয়ে তাঁর মধুময় গানের রাজ্যে ডুবেছিলেন আর মহাশক্তিমান রবীন্দ্রনাথ পাঞ্জার লড়াইয়ে তাঁর বৃদ্ধ কব্জির শক্তি পরীক্ষা করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই লড়াইয়ের সৃষ্টিও ছিল অভিনব এবং যে কোন প্রতিভাকে অনুপ্রাণিত করার মত।

কিন্তু ফর্‌রুখ এইসব বিপুল প্রভাব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রভাবে নিজের পথ তৈরি করার চেষ্টা করলেন। ফর্‌রুখকে বাঁচালো তাঁর ঐতিহ্যগত বিশ্বাস ও চেতনা। একথা অনস্বীকার্য যে, ফর্‌রুখের উপর নজরুল ইসলামের প্রভাব ছিল। কিন্তু নিষ্ঠা, ঐকান্তিকতা, ও অ-জটিলতায় তিনি ছিলেন নজরুল থেকে পৃথক। তাঁর অবিভাজ্য বিশ্বাসের দৃঢ়তা বুঝতে বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয় না। নজরুলের চিন্তায় যে মিশ্র ভাবনার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, তার কোন চিহ্ন নেই ফর্‌রুখের কাব্যে।

তাঁর জীবনী থেকে বোঝা যায় যে, স্বল্প ও ক্ষণস্থায়ী কালের জন্যে তিনি একদা বামপন্থী আন্দোলনে জড়িত হয়েছিলেন। তাঁর সে সময়ের দু'চারটি লেখায় সে ধরনের ভাবের প্রচ্ছায়া পড়েও ছিল হয়ত। কেননা তিনি মানুষকে ভালবেসে মানবতার ধর্ম হিসেবে ঐ দৃষ্টি-ভঙ্গিতে ভাবতে শুরু করেছিলেন। কিন্তু অচিরকালের মধ্যে তাঁর সেই উন্মেষকালের চিন্তার এই কারণে অবলুপ্তি ঘটে যে, ইসলামকে জানার পর সাম্য ও শান্তির বাণী শিখতে আর কোথাও যাওয়ার তাঁর প্রয়োজন পড়ে না। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তায় ইসলাম মানুষের জন্যে যা দান করেছে, মার্কসীয় ভাবনায় তাকে অতিক্রম করার শক্তি নেই। এই বিশেষ বোধে উজ্জীবিত হওয়ার সংগে

www.pathagar.com

সংগেই ফর্‌রুখ তাঁর নিজের পথ বেছে নিলেন এবং তাতে আত্মসমর্পিত হয়ে আজীবন কাব্য সাধনা করে গেলেন।

• চিন্তা ভাবনায় ফর্‌রুখ তাঁর সুচিহ্নিত পার্থক্য বজায় রাখলেও এবং বিশ্বের বিভিন্ন মতবাদের বিমিশ্রিত চিন্তায় অনুপ্রাণিত না হলেও ফর্‌রুখ কি আধুনিক কাব্যভাবনা থেকে সম্পূর্ণ পিঠ ফিরিয়েছিলেন ? পৃথক সংস্কৃতিচিন্তা থাকলেও, পুঁথি-সাহিত্যচর্চার একজন প্রখ্যাত প্রবক্তা হলেও কাব্যের আঙ্গিক চিন্তায় সাহিত্যের ঐতিহাসিক গতিধারা থেকে ফর্‌রুখ নিজেকে সরিয়ে নেন নি। এখানে তিনি বিশ্বসাহিত্য এবং গোটা বাংলা সাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক হিসেবে চিহ্নিত। তাঁর কাব্যে আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের প্রাচুর্য সেই বৈশিষ্ট্যটিকে ম্লান করতে পারে নি।

একদিকে গ্যেটে, মিলটন, এলিয়ট ও শেলী পাঠ এবং অপরদিকে মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল, নজরুল, জীবনানন্দ ও প্রেমেন পাঠ ফর্‌রুখের কাব্য-আঙ্গিক ভাবনা ও গঠনে যে প্রচুর উপাদান জুগিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নিজেকে একজন রোমান্টিক কবি বলে মনে করতেন, কিন্তু তাঁর কাব্য-আঙ্গিকের মধ্যে রয়েছে ধ্রুপদ আঙ্গিকের ঘনতা, নিটোলতা ও দৃঢ়তা। আছে প্রতীক ব্যবহারের নিপুণতা, যা তাঁকে তাঁর পূর্বসূরিদের থেকে স্বতন্ত্র মর্যাদা দান করেছে। দক্ষ শিল্পীর মত তিনি তাঁর কাব্য-আঙ্গিকে যে পরিশ্রম ও সৌন্দর্যের স্বাক্ষর রেখেছেন, সে যে তাঁর কালেরই শিক্ষা, এ কথাটুকু আমি নিঃসঙ্কোচে বলতে পারি।

www.pathagar.com

আবদুল মান্নান সৈয়দ

দরিয়ায় শেষ রাত্রি : প্রতিভূ কবিতা

কবি কি বহিঃপৃথিবীর, বা বস্তুপৃথিবীর বাসিন্দা? শারীরিকভাবে তো তাই-ই, একটি বিশেষ দেশ বা সময়-খণ্ডে কবি বাস করেন, সেই বিশেষ দেশ ও সময়ের হাওয়া তাঁর রচনায় অবশ্যই থাকতে পারে, কিন্তু একই সঙ্গে কবি দেশোত্তর ও সময়োত্তর। সেই দেশোত্তর দেশ ও সময়োত্তর সময় একান্তভাবেই কবির মনোপৃথিবীর, যেটুকু বস্তুদেশ ও বস্তুসময় কবির মনোপৃথিবীতে জায়গা করে নেয়, তা-ও তারই বিশিষ্ট মনের প্রাণীজগৎ, উদ্ভিত জগৎ ও ধাতুজগতের এক স্বতন্ত্র পৃথিবী।

'সাত সাগরের মাঝি' ১৯৪৪ সালে প্রকাশিত হয়। এর কবিতাগুলি লেখা ১৯৪৩-৪৪ সালে; ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বয়স তখন চব্বিশ-পঁচিশ। পৃথিবীতে তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঘনঘোর সচল তমসা, বাংলাদেশে তখন দুর্ভিক্ষ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মনোপৃথিবী তখন কোথায়? তিনি লিখলেন 'লাশ' ও 'আউলাদ'-এর মতো কবিতা, এবং পত্রস্থিত আরো কিছু কবিতা, যা সরাসরি দুর্ভিক্ষের নীল কষ্ট আর লাল রাগ থেকে বেরিয়ে এসেছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সমসাময়িক কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'লাশ' কবিতাটি তখনই তাঁর সম্পাদিত মন্বন্তর বিষয়ক কবিতা সংকলন "আকাল"-এ গ্রহণ ক'রে ফর্‌রুখকে সম্মানিত করলেন। কিন্তু মূল ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তখন কোথায়? এক সমুদ্রযাত্রী নাবিকের মতো বেরিয়ে পড়েছেন তিনি কলকাতার মানুষী জঙ্গল থেকে। লিখছেন 'সিন্দাবাদ', 'বা'র দরিয়ায়', 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি ', 'বন্দরে সন্ধ্যা', 'পাঞ্জেরী', 'সাত সাগরের মাঝি' এবং আর একগুচ্ছ কবিতা, যা সমুদ্র প্রাসঙ্গিক।

হাঁ, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' একটি কবিতা পর্যায়েরই স্তম্ভের মতো, যার মধ্যে কবির অনেকগুলি বিশিষ্টতা গুচ্ছীকৃত হয়েছে। একটি বিশেষ সময়ের ও মনের ফসল এই কবিতাটি। উত্তরকালে ফর্‌রুখ চলে এসেছিলেন অন্য জগতে, তখন আর এ ধরনের কবিতা তাঁর হাত থেকে আমরা আশা করতে পারি না। একটি প্রাসাদের বহির্মহল থেকে অন্দর মহলে যাবার মতো করে আমরা এই কবিতার বহিঃকারুকাজ থেকে ক্রমশ এর হৃদয়ে প্রবেশ করতে চাই।

এক ঃ ছন্দ। মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দে লেখা এই কবিতাটি। অমিত্রাক্ষর যদি হয় ছন্দোজগতে প্রথম বিপ্লব, তাহলে মুক্তক ছন্দকে বলতে হয় দ্বিতীয় বিপ্লব। অমিত্রাক্ষর ও মুক্তক কোনো ছন্দ নয়, এক-একটি ছন্দের বিশিষ্ট কুশলতা। 'মেঘনাদবধ কাব্য'

www.pathagar.com

প্রথম বিপ্লবের বাহন, দ্বিতীয় বিপ্লবের মাধ্যম রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতা গ্রন্থ ও নজরুলের 'বিদ্রোহী' কবিতাটি। মুক্তক অক্ষরবৃত্তে লেখা 'বলাকা'-র প্রধান কবিতাগুচ্ছ, আর মুক্তক মাত্রাবৃত্তে লেখা 'বিদ্রোহী'। সেই হিসেবে 'বিদ্রোহী'র প্রকাশ-সাল ১৯২২ মুক্তক মাত্রাবৃত্তেরই জন্মমুহূর্ত। আধুনিককালে মুক্তক অক্ষরবৃত্তির বহুব্যাপ্ত পরিচর্চার মধ্যে দু'একটি চাবি-কবিতা মুক্তক মাত্রাবৃত্তেও লেখা হয়েছে। এই মুহূর্তে আমার কয়েকটি কবিতার কথা মনে পড়ছে ঃ বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী' (রচনাকাল ঃ ১৯২৯), বিষ্ণুদে-র 'ঘোড়সওয়ার' (রচনাকাল ঃ ১৯৩৫), প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'সুদূরের আহবান' (রচনাকাল ঃ বিশের দশক) প্রভৃতি।

একথাও এখানে মনে করা যেতে পারে, এসব কবিতার আধার গ্রন্থগুলিতে— বুদ্ধদেব বসুর 'কঙ্কাবতী', বিষ্ণুদে-র 'চোরাবালি', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'প্রথমা'-য় মুক্তক মাত্রাবৃত্তের ব্যাপক ব্যবহার ঘটেছিল। সাধারণভাবে বলা যায়, বিশের দশকেই মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ছন্দের বিশদ পরিচর্চা হয়েছিলো—এবং এর পিছনে যে নজরুলের উদ্বোধনা কাজ করেছিলো তাতে কোনো সন্দেহ নেই। জীবনানন্দ দাশের ভিতরসন্ধানী আলো এসে পড়েছিলো ছন্দেরও গভীর মর্ম-পৃথিবীতে। সেজন্যেই মুক্তক মাত্রাবৃত্ত সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, "মাত্রাবৃত্ত মুক্তক উদাহরণ বাংলা কবিতায় বেশী নেই—এ যুগের অবাধ উচ্ছৃংখলতা দমন করার জন্য সর্বব্যাপী নিপীড়নের যে পরিচয় পাওয়া যায় রাষ্ট্রে ও সমাজে—সেইটে কাব্যের ছন্দালোকে নিঃসংশয়রূপে প্রতিফলিত হলে মাত্রাবৃত্ত মুক্তকের জন্ম হয় কিনা ভেবে দেখা যেতে পারে। যদি হয় এবং কবিতার ছন্দ যদি যুগের নাড়ী-মূলের নির্দেশ দান করে, তাহলে এরকম মুক্তকে প্রচুর কবিতা আশা করা যায়। কিন্তু কোথায় তা?"

জীবনানন্দ, বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্রের পরের জেনারেশনের কবি ফর্‌রুখ মুক্তক মাত্রাবৃত্তে এক সময় প্রচুর কবিতা লিখেছিলেন। তাঁর সমসাময়িক চল্লিশের কবিদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী মুক্তক মাত্রাবৃত্ত প্রধান 'কঙ্কাবতী', 'চোরাবালি', 'প্রথমা', 'অমাবস্যা'-র সংগে উত্তরকালের মুক্তক মাত্রাবৃত্ত-প্রধান 'সাত সাগরের মাঝি'-র উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতায় মুক্তক মাত্রাবৃত্ত ব্যবহারের অন্য দু'টো দিক লক্ষণীয় ঃ প্রথমত, দীর্ঘ বা ছোটো কাব্যনাট্যে মুক্তক মাত্রাবৃত্ত খুব কম হয়েছে বাংলা কবিতায়, হয়তো ছোটো নাটকেই মুক্তক মাত্রাবৃত্ত বেশী সফল--দীর্ঘ নাটকে একঘেয়ে লাগতে পারে ঃ আর দ্বিতীয়ত, জীবনানন্দ-কথিত 'যুগের অবাধ উচ্ছৃংখলতা দমন করবার জন্যে' মুক্তক মাত্রাবৃত্তের যে ব্যবহার, ফর্‌রুখের 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতাতেও ভিতর থেকে তা সত্যি।

দুই ঃ শব্দ, উপমা, ইমেজ। আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিখ্যাত কুশলতা এই কবিতাতেও পরিপূর্ণ উপস্থিত। আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহারের যে

www.pathagar.com

ঐতিহ্য সূচিত হয়েছিলো সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলালের হাতে, যাকে নজরুল একটি অসামান্য ঐশ্বর্যে ভ'রে দিয়েছিলেন এবং একটি ঐতিহ্যচেতনায় যুক্ত করেছিলেন, ফর্‌রুখ তাকে সম্প্রসারিত করেছেন আরো। ফর্‌রুখের আরবী-ফারসী শব্দের ভাঁড়ার নজরুলের কাছে বহুলাংশে ঋণী , কিন্তু তাঁর পরেও তিনি নতুন, অনুচ্ছিষ্ট; কিন্তু তাঁর কাব্যাবহে সুপ্রযুক্ত শব্দাবলী সংযোজন করেছেন ঃ এই কবিতা থেকেই চয়ন করা চলে এরকম একগুচ্ছ শব্দ; সী-মোরগ (বিশাল পাখি, পুঁথিসাহিত্যে ব্যবহৃত, সী-গালের অনুষঙ্গ জাগিয়েই দ্যায়); খিমা (তাঁবু), কাবাব-চিনি (এক জাতীয় মশলা), আলমাস (এক জাতীয় মূল্যবান পাথর), গওহর (এক জাতীয় মূল্যবান পাথর) খিজির, (হযরত খিজির, ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ, অন্য অর্থ ঃ সবুজ), ওজদ (শরীর), জওহর (এক প্রকার মূল্যবান পাথর); আলম (বিশ্ব-চরাচর), আকীক (এক জাতীয় পাথর), সন্দল (চন্দন) এই শব্দগুচ্ছ নজরুল ব্যবহার করেন নি, এর পরিবেশও এর নিজস্ব; ফলে আরবী–ফারসী শব্দ ব্যবহার করে ফর্‌রুখ অ-নজরুলীয় এক নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করেছেন। সেই সঙ্গে উপমা, উৎপ্রেক্ষা ইমেজের একটি ফর্‌রুখী কৃষ্টি সৃষ্টি হয়ে গেছে এই কবিতায়।

উৎপ্রেক্ষা :

১. বুঝি সী-মোরগ সাথীহারা তার দরিয়ায় শেষ রাতে
ঝড় বুকে পুরে বসেছিল মাস্তুলে।

২. যেন সুলেমান নবীর শিকলে বন্দী বিশাল জ্বিন
ছাতি চাপড়ায়ে কেঁদেছিল কাল সারারাত---সারারাত,

৩. আল্লার এই অশেষ আলমে অফুরান রূপ, রস
জমে গাঢ় হয়ে দূর সফরের আশা যেন হীরাকষ

উপমা ঃ

১. কাফেলার বাঁশী বয়ে এনেছিল জহরের মত ব্যথা।

২. হালের মুঠির মত আমাদের কব্‌জা সিন্দাবাদ।
দরিয়ার মত দারাজ সিনায় আজ নামে পেরেশানি,

ইমেজ ঃ

১. বুঝি সী-মোরগ সাথীহারা তার দরিয়ায় শেষ রাতে
ঝড় বুকে পুরে বসেছিল মাস্তুলে।

২. ডাকে বাগ্‌দাদী খেজুর শাখার শুক্লা রাতের চাঁদ
মাহগির বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোৎস্নার জাল

www.pathagar.com

৩. কাল ঝোড়ো রাতে দাঁড়ের আঘাতে দামী জেওরের মত
হীরা জওহর ফুটেছিল বার দরিয়ার নীল ছাঁচে
৪. আহা ভুলে গেলে আকীকে গড়া এ দরিয়া নীল-মহল,
নামে জিল্‌কদ রাতের শা'জাদী তের তবকের চাঁদ।
৫. জাজিমের বুকে ছড়ানো পাথর-দানা।

আরো লক্ষণীয়, জীবনানন্দশোভন এলোমেলো অন্ত্যমিলের বিন্যাস, ক্রিয়াপদের বিচিত্রতা সমস্ত ছবিটাকে সচল উজ্জ্বল করে তুলেছে :

আমার বুকের সকল পর্দা উঠেছিল দুলে দুলে
এসেছিল এক সী-মোরগ তার চঞ্চুতে মাটী ব'য়ে
আমার আতশী রগের রক্ত গলেছিল আঁসু হয়ে—
দুলে উঠেছিল আবছা আলোয় দরিয়ার নোনা পানি
নাড়ী-ছেঁড়া ব্যথা মউজের মুখে জেগেছিল কাতরানি;

[সাত সাগরের মাঝি]

তিন ঃ পুনর্নির্মাণ ও প্রতীক। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রকৃত কবি বলেই তাঁর বক্তব্যকে সব সময় কবিতার জামা-কাপড় পরিয়েই উপস্থিত করেছেন। 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' এবং "সাত সাগরের মাঝি"-র অন্যান্য কবিতাও জাগরণেরই কবিতা, কিন্তু তা কখনোই নগ্ন ও Direct নয়, তাঁর নিজের ভাষাকে একটু বদলে বলতে পারি,তাঁর বিশ্বাসের নীল ছাঁচে তাঁর কবিতার এইসব হীরা-জওহর ফুটে উঠেছে। এ যুগের অনেক কবির মতো ফর্‌রুখেরও প্রধান একটি আশ্রয়—প্রাচীন গ্রন্থ। নজরুল ইসলামের একটি প্রধান নির্ভর ছিলো ইসলামিক পুরাণ। ফর্‌রুখ আশ্রয় করলেন বিশ্বসাহিত্যের একটি অত্যুল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, আরব্যোপন্যাস, ইসলামিক ঐতিহ্যের এক আলোকোজ্জ্বল আধার। (আরব্যোপন্যাস বা আরব্য রজনী, আরবী ভাষায় লেখা মধ্যযুগের এক মহান গ্রন্থ। দশম শতাব্দীর দিকে আরব্যোপন্যাসের কাহিনীগুচ্ছ মুখে মুখে ফিরতো, আরো কাহিনী যুক্ত হয়ে ১৪৫০ সালের দিকে বর্তমান আকার পায় , প্রাচ্য ধরনের একটি বিশাল Frame-Tale বা কাহিনীবৃত্তে। প্রথম ইয়োরোপীয় অনুবাদ হয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে।) সিন্দাবাদ নাবিকের কাহিনী আরব্যোপন্যাসের পরিচিততম কাহিনীর একটি। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের নায়ক হয়ে উঠলো এক সমুদ্রের দুঃসাহসী অভিযাত্রী, সিন্দাবাদ—যার মহিমা পৌরাণিক নায়কেরই তুল্য। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ একালের কবি-শিল্পী, সিন্দাবাদকে অবিকল ব্যবহার করলেন না তিনি, ভরে দিলেন তার ভিতরে নিজের আশা, সিন্দাবাদের কাহিনীকে পুনর্নির্মাণ করে নিলেন নিজের অর্থে ও তাৎপর্যে। পথ-সন্ধানী এ যুগের মুসলমানের নেতা হয়ে উঠলো তাঁর কবিতার সিন্দাবাদ। আবার তাঁর এক-একটি

www.pathagar.com

কবিতা, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' একটি নির্নিমেষ প্রতীকে শিখায়িত। সমুদ্র, সিন্দাবাদ, মাল্লারা, জাহাজ, বাগদাদ—সবই সেই কেন্দ্রপ্রতীকে স্থির।

চার ঃ কবিতা-নাট্য। কবিতার আঙ্গিকের ক্ষেত্রে ফর্‌রুখ চিরকালই দুঃসাহসী, অভিযাত্রিক, ক্রমাগত নতুন নতুন দেশ সফর করেছেন। পরবর্তীকালে যিনি পূর্ণাঙ্গ কাব্যনাট্য লিখবেন, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' তাঁর উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা। তাঁর অগ্রজ কবি জসীম উদ্‌দীন তাঁর কবিতার নাট্যগুণ লক্ষ্য করেছিলেন; সম্ভবত সত্যের আরো কাছাকাছি পৌঁছানো যায় ফর্‌রুখের কবিতায় লিরিক ও নাট্যের সমীভবনের শনাক্তিকরণে। তাঁর প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের মতো, কিংবা অগ্রজ সুধীন্দ্রনাথ দত্তের মতো, তাঁরও লক্ষ্য শব্দ ও কাব্যের ধ্বনিময়তা। নাট্যগুণ, আবৃত্তিযোগ্যতা তাঁরও অন্বিষ্ট। কিন্তু ঐ দুই কবির মতো তিনিও মর্মে মর্মে রোমান্টিক। তাঁর নাটকীয়তার ভিতরে-ভিতরে তাই গাঁথা হয়ে যায় উধাও কল্পনা, অবাধ কল্পনা। তাই ফর্‌রুখের কবিতার শুধুমাত্র নাট্যগুণের দিকে তাকালে তাঁর কাব্যগুণ থেকে বঞ্চিত হতে হবে। যে ক'টি কবিতায় ফর্‌রুখ এই দুই আপাতপ্রতীপ গুণকে মিলিয়েছেন, 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' তার মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ উদাহরণ।

পাঁচ ঃ তিরিশের কবিতায় যে-দূরযাত্রিকতা সূচিত হয়েছিলো প্রেমেন্দ্র মিত্র-জীবনানন্দের কবিতায়, যে আরব্য-পারস্য সন্দীপন শুরু হয়েছিলো নজরুল-মোহিতলালের কবিতায়, চল্লিশের কবিতায় ফর্‌রুখ তার শ্রেষ্ঠ ধারক। 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' কবিতায় আশ্চর্য সামুদ্রিক পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে এক বিদেশী স্বাদ দেয়।

সব মিলিয়ে 'দরিয়ায় শেষ রাত্রি' ফর্‌রুখের একটি প্রতিভূ কবিতা, যার মধ্যে তাঁর অনেকগুলি বিশিষ্টতা পুষ্পিত হয়ে উঠেছে।

www.pathagar.com

আফজাল চোধুরী

কাফেলার ফর্‌রুখ

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের 'কাফেলা' নামের কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর নিকটজন ও অন্যতম বিশেষজ্ঞ-কবি মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ গ্রন্থটির সংক্ষিপ্ত ভূমিকা লিখেছেন এবং কালানুক্রমিকভাবে 'কাফেলা'র অবস্থান সম্পর্কিত তথ্যাবলী সন্নিবেশ করে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মরণোত্তর প্রকাশিত এই কাব্যটির যথাস্থান নির্ণয়ের প্রয়াস পেয়েছেন। মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র প্রতিবেদনটি এইরূপ :

> ফর্‌রুখ আহ্‌মদ 'কাফেলা' নামে একটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের বাসনা তাঁর মনে আমৃত্যু লালন করে গেছেন। এই বাসনার জন্ম হয়েছিল বিভাগপূর্বকালে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্য–সাধনার প্রায় প্রাথমিক পর্বেই। এক অর্থে 'কাফেলা' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সাত সাগরের মাঝি'র সমসাময়িক ও সহযাত্রী, প্রায় একই সময়ে অর্থাৎ বিভাগপূর্বকালে ১৯৪২-৪৩ সালের দিকেই 'কাফেলা' ও 'সাত সাগরের মাঝি'র পাণ্ডুলিপি কবি তৈরী করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে হয়তো দ্বিতীয় চিন্তার ফলে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ 'কাফেলা'র পাণ্ডুলিপির অন্তর্গত কিছু কবিতা নিয়ে তৈরী করেন তাঁর তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'র পাণ্ডুলিপি।

ভূমিকাংশে বিবৃত তথ্যে আরও জানা যায়, কবির স্বহস্ত রচিত 'কাফেলা'র পাণ্ডুলিপিতে 'সিরাজাম মুনীরা'র (১৯৫২) বেশ কিছু কবিতা অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং 'সিরাজাম মুনীরা'র ভাবকল্পনা পরবর্তীকালে উদ্ভাবিত; ফলে 'কাফেলা' ঐ সময়ের কবিপ্রেরণার ধারক অন্যতম আদিপাত্র, যদিও চল্লিশ দশকের প্রথমপাদের এসব রচনা আজ আশির দশকে প্রকাশিত ও আলোচিত হতে যাচ্ছে। তাও কবির মরণোত্তর পর্বে। হায়রে এদেশের কবি-ভাগ্য—বিশেষত ফর্‌রুখ আহ্‌মদের!

অবশ্য ঐ একই তথ্যের উৎস থেকে জানা গেল যে, 'কাফেলা'র পাণ্ডুলিপিকরণ-প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল এবং ১৯৪৩-৫৮ সালের মধ্যবর্তী বেশ কিছু রচনা এতে অবস্থান লাভ করেছে ঃ 'ঈদের স্বপ্ন', 'মেঘনাতীরের চাষীকে', 'বর্ষায়', 'আরিচা-পারঘাট', 'বৈশাখ', 'ঝড়' ইত্যাদি প্রতিনিধিত্বমূলক কবিতাবলী। আপন দেশ-কালে স্বস্তিবোধক এসব রচনা পরবর্তীকালেরই সৃষ্টি।৽এতে 'কাফেলা' ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবি–ব্যক্তিত্বের প্রসারিত ব্যাপ্তির ধারক একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ;—মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌র কথায় ঃ

www.pathagar.com

সেকালে প্রকাশিত হলে হয়তো এর (কাফেলার) কবিতা–সূচী অনেকটা অন্যরকম হতো এবং বিভাগ-পরবর্তীকালে লেখা অনেক কবিতাই এর অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ মিলতো না; ফলে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর স্বদেশের মাটিতে, ইতিহাস-ঐতিহ্যের ভিতে এবং প্রাকৃতিক পরিবেশেও যে গভীরভাবে নোঙ্গর বেঁধে রেখেছিলেন তা এ-গ্রন্থের কবিতা পড়ে উপলব্ধি করার ও অনুভবের সুযোগ মিলতো না। এদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থের বিলম্বিত প্রকাশও অনেকটা সৌভাগ্যের ব্যাপার। শুধু দুঃখ এই, কবি স্বয়ং তাঁর প্রিয় পাণ্ডুলিপি "কাফেলা"র গ্রন্থরূপ দেখে যেতে পারলেন না।

আসলে 'কাফেলা' সম্পর্কিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'সিরাজাম মুনীরা' গভীর ও নিকট-সম্পর্ক নিয়ে পাশেই হাজির-হাজির বলে উপস্থিত হয়ে যমজ সম্পর্ক বিস্তার করে। ফলে 'কাফেলা'র সত্তায় 'সিরাজাম মুনীরা'কেও ঝলমল করে জ্বলতে দেখি। এ দু'টি কাব্যগ্রন্থ ইসলাম ও তওহীদ–রস্‌পিপাসু বাংলা ভাষা-ভাষীর নয়ন-যুগলের মতই সম্পূর্ণরূপে উন্মোচিত হয়েছে এই এতদিনে। এতকাল পরে বাঙালী মুসলিম চিত্তবৃত্তির সঞ্চয়ে একই তারকা সকাল ও সন্ধ্যাকাশে দুই রূপ নিয়ে জ্বলজ্বল করে ফুটে উঠেছে যেন, তাই যদি 'সিরাজাম মুনীর'কে প্রভাতের তারা রূপে গণ্য করি, তবে 'কাফেলা'কে সন্ধ্যাকাশের তারা রূপে অভিহিত করতে পারি। জানি, দু'টি তারা ভিন্ন নয়—একটিই।

মূলত আধুনিক বাংলা ভাষায় আজ পর্যন্ত বিরচিত তাবৎ কাব্যগ্রন্থের বহু বিষয় আছে, কিন্তু এ দু'টি কাব্যগ্রন্থের বিষয়-উপস্থাপনা সম্পূর্ণ অভিনব। ইসলামপ্রাসঙ্গিক উদ্দীপ্ত কাব্যচর্চা এই প্রথম তা বলছি না, তবে ইসলামের প্রতি গভীর অভিনিবেশ ও আত্মতা বিস্তারের ধ্যানোদৃপ্ত কাব্যরূপ এ দু'টি গ্রন্থে যে সিদ্ধি লাভ করেছে তা অতুলনীয় ও অবিনশ্বর। হ্যাঁ, এ দু'টি কাব্যগ্রন্থ ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে ইসলামের কবিরূপেই চিরঞ্জীব হওয়ার সামর্থ্য দান করেছে।

কিন্তু 'ইসলামের কবি' অভিধার অর্থ কি? চৌদ্দশ' বছরের দীর্ঘ ইতিহাসে শত শত মুসলিম প্রতিভাবান আরব-অনারব কবি যে কাব্যচর্চা করে গেলেন, তাঁরা কি জাতিতে মুসলমান হয়েও ইসলামের কবিরূপে গণ্য হতে পারেন না? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর বলা যায়—'না'। ইসলামকে জীবনমন্ত্ররূপে গ্রহণ করে এই পবিত্র আমানতের সংরক্ষণ ও প্রসারণের গভীর তিতিক্ষা যে কবির কাব্যে প্রতিফলিত হয় নি, তাঁকে অবশ্যই আরবী নামধারী ও মুসলিম জনক-জননীর সন্তান বলেই 'ইসলামের কবি' বলা যায় না কোন মতে। ইসলামকে কেন্দ্র করে কল্পনা ও আবেগের শক্তি যে কবি-চিত্তে দানাবদ্ধ এবং তৌহীদস্পৃহায় উদ্দীপ্ত হয়ে যিনি নিজেকে আল্লাহ্‌র জন্যে উৎসর্গিত গণ্য করেন, অবশ্যই তিনি 'ইসলামের কবি'। আর এ গুণ এত সুলভ নয় যে, ঝাঁকে ঝাঁকে নির্গত আরবী নামের সকল কবিকেই এই নামে অভিহিত করা যায়। দৃষ্টান্ত হল—হযরত হাসান বিন

www.pathagar.com

সাবেত (রা) ও হযরত লবীদ ইবনে রাবিয়া[১] (রা) দু'জন প্রখ্যাত সাহাবী ও কবি— যাদের 'ইসলামের কবি'রূপে গণ্য করা হয়। যদিও ইসলাম গ্রহণের পর লবীদ (রা) কবিতা রচনায় আত্মনিয়োগ করেন নি। কিন্তু তাঁদের সমসাময়িক মহিলা কবি খনসা ইসলামের জন্যে ব্যক্তিগতভাবে প্রচুর কুরবানী করা সত্ত্বেও ইসলামের কবিরূপে গণ্য নন। কেননা, তাঁর কাব্যচর্চায় ইসলামের আলো ফলিত হয় নি, গোত্রীয় স্পৃহার প্রাচীন ঐতিহ্যই বাণীবদ্ধ হয়েছে। অথচ তিনি নিজে ছিলেন প্রথম যুগের অত্যন্ত তেজস্বী মুসলিম মহিলা কবি। তেমনি কা'ব ইবনে যুহায়র মক্কা বিজয়ের পর কুখ্যাত দশজন অপরাধীদের একজন হয়েও পরবর্তীকালে ইসলাম গ্রহণ করে কালজয়ী 'নাতে রসূল' রচয়িতারূপে এখনো স্মরণীয় রয়েছেন। ফারসী কবিকুলের ব্যাপারটি ধরা যাক। মুসলমানদের মুখোজ্জ্বলকারী বহু প্রতিভাবান কবির অভ্যুদয় হয়েছে সেখানে। কিন্তু ইসলামের জীবনবেদ, এর বিপ্লবী মন্ত্রোচ্চারণ ক'জনার কাব্যের উপজীব্য হয়েছে? হযরত ফরীদউদ্দীন আত্তার ও মওলানা জালালউদ্দীন রুমীর কাব্যসম্পদ অথবা শেখ সা'দীর শাশ্বত হিতোপদেশ নিঃসন্দেহে আমাদের শ্লাঘার বিষয়। ইসলামের সৌন্দর্যানু-ভূতির নির্যাস ও প্রগাঢ় তাসাওফ-চর্চা ইসলামের অন্তর্শক্তির মহাবিকাশ ঘটিয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে, ঐটি ছিল ইসলামের ঐতিহাসিক অবক্ষয় যুগের সূচনালগ্ন। ফলে এই প্রাতস্মরণীয় মহাকবিকুল নিজেরা প্রচুর ভক্ত সমাদৃত হয়েও ছিলেন আসলে নিঃসঙ্গ। ফলে তাসাওফ-চর্চা আত্মরক্ষার ঢালের মত ব্যবহৃত হয়েছে। মানী, জরথুস্ত্র, প্লাটিনাস প্রমুখ প্রাচ্য জ্ঞানীর উত্তরাধিকার ইসলামের বিপ্লবাচরণের সঙ্গে সঙ্গতিশীল না হলেও এঁদের ধ্যানযোগে তা প্রতিফলিত হয়েছে। এই প্রবণতা আসলে প্রাচ্য-সম্পদ এবং ফারসী কবিগণ কমবেশী সকলেই এই সম্পদকে আপন চিত্তে ধারণ করেছেন। কেননা, মুসলমানদের শক্তির ভিত্তিমূলে তখন ক্রমান্বয়ে আঘাত করেছে বর্বর চেংগিজী সর্বনাশ। তখন সবেমাত্র মুসলিম দুনিয়া ক্রুসেডের ধ্বংসযজ্ঞ থেকে উঠে দাঁড়িয়েছিল স্রেফ।

দ্বাদশ শতকের মুজাদ্দেদ শায়খ আহমদ সরহিন্দী ইসলামের অভ্যুদয়ের পুরো একহাজার বছর পর প্রথম তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক দিক থেকে ইসলামের মৌল দর্শনের প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলেন এই উপমহাদেশে। ইসলামের তাবৎ পুনর্জাগরণ যুগে যুগে মহান সংস্কারকগণের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়ে আসছিল এবং ইতঃপূর্বে মযহাবের চার ইমাম, শায়খ আবদুল কাদির জিলানী, ইমাম গায্‌যালী, ইমাম ইবনে তাইমিয়ার মহান সংস্কার আন্দোলন মুসলিম জাহানের আত্মশক্তিকে জাগ্রত রেখেছিল। বলতে গেলে

১. হযরত লবীদ ইবনে রাবিয়া (রা) যদিও ইসলাম গ্রহণোত্তর জীবনে ঐশী বাণীর মুকাবিলায় নিজে মূক হয়ে গিয়েছিলেন, তবু নাতিপ্রজ এই কবি-ব্যক্তিত্বকেও ইসলামের কবিরূপেই অভিহিত করা হয়েছে।

www.pathagar.com

কবিতার জগতে এই বিপ্লবী সংস্কার-কর্মের চিত্ররূপময় সার্থক প্রতিফলন ঘটল কবি আলতাফ হোসেন হালী ও কবি ইকবালের রচনায় খ্রীস্টীয় উনিশ ও বিশ শতকের প্রথম পাদে মাত্র। ঐতিহাসিক অবক্ষয় যুগ অতিক্রম ও অবিচ্ছিন্ন মহাসংস্কার আন্দোলনের ফলশ্রুতি দেখা দিয়েছে ঐতিহাসিকভাবেই মাত্র সেই দিন। ইতঃমধ্যে ইউরোপের গোলামির শৃংখলতিক্ত অভিজ্ঞতা সূচিত হয়েছে মুসলিম বিশ্বে। আবার নতুন দুনিয়ার অভ্যুদয় হচ্ছে। তাই আবার নতুনভাবে ইসলামের দু'একজন সার্থক কবির আত্মপ্রকাশ হচ্ছে ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াতেই। উপমহাদেশের পশ্চিম প্রান্তে আলতাফ হোসেন হালী ও ইকবাল এবং পূর্বপ্রান্তে অবিসংবাদিতভাবে নজরুল ইসলামের পর ফর্‌রুখ আহ্‌মদই ইসলামের পুনর্জাগরণের মহান কবিসত্তা। তাঁর "সিরাজাম্‌ মুনীরা" ও "কাফেলা" গ্রন্থদ্বয় আমাদের এ দাবীর উজ্জ্বল অভিজ্ঞান মাত্র।

এখানে আসুন, একটি বিষয় আমরা বিচার করি যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আধ্যাত্মিক দীক্ষা ও সবকের যোগসূত্রটি কী? চারদিকে বিভ্রান্ত মতবাদের শ্বাপদ সংকুল দুর্গম পথে তিনি যে মানবমুক্তির দুরূহ লক্ষ্যে একাকী বিচরণ করলেন, সে অবস্থায় তাঁর সত্য-সাধনার নিকট-সম্পর্কটি ছিল কাদের সঙ্গে? মরণোত্তর গ্রন্থ 'কাফেলা'য় কোন উৎসর্গপত্র নেই। 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'সিরাজাম মুনীরা'য় তা আছে। 'সাত সাগরের মাঝি' কবি ইকবাল ও 'সিরাজাম মুনীরা' মওলানা আবদুল খালেকের প্রতি উৎসর্গিত। ইকবালের ওস্তাদ ও গুরু ছিলেন শামসুল উলামা মীর হাসান। ইকবাল শিল্পের দুরূহ চড়াই-উৎরাইয়ে গুরু হিসাবে বরণ করেছিলেন মওলানা জালালউদ্দীন রূমীকে। ফর্‌রুখ শিল্পচর্চার উজ্জ্বল গুরুরূপে বরণ করলেন ইকবালকে এবং আধ্যাত্মিক সাধনার সাক্ষাৎ গুরু হিসেবে পেলেন সূফী অধ্যাপক আবদুল খালেককে। অধ্যাপক আবদুল খালেক ছিলেন পীর আবুবকর সিদ্দিকী ফুরফুরাভীর খলীফা। ফুরফুরার পীর সাহেবের প্রশিষ্যরূপে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের আরেকটি পরিচয় তাঁর ভ্রাতৃপ্রতিম আশেকানের সমাজেও ছিল উজ্জ্বল। এই পটভূমিতে কবি ফুরফুরার পীর সাহেবের তরীকত সাধনার ঐতিহ্য-পরম্পরার সঙ্গে ছিলেন গভীরভাবে সংযুক্ত। ফুরফুরার পীর সাহেবের তরীকা ছিল নকশবন্দী-মুজাদ্দেদী, যার দীক্ষামার্গে হাজার বছরের মুজাদ্দেদ হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দীর কালজয়ী সাধনা ছিল প্রেরণা ও উদ্দীপনার উৎস। হযরত খাজা বাহাউদ্দীন নকশবন্দের প্রচারিত তরীকায় মুজাদ্দেদে আলফেসানীর সাধনা সংযুক্ত হওয়ায় উপমহাদেশে এই ভূমিকা নকশবন্দী-মুজাদ্দেদী নামে সুপরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীকালে হযরত শাহ ওয়ালিউল্লাহ্‌ দেহলভী ও সৈয়দ আহমদ বেরেলভীর মাধ্যমে ইসলামের এই আধ্যাত্মিক ধারা ইন্‌কিলাবী আন্দোলনে বিস্ফোরিত হয়। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এই যোগসূত্রেই ইসলামের মৌলবাদের প্রবক্তা কবিরূপে বাংলা ভাষায় যে

www.pathagar.com

প্রতিষ্ঠা পেয়েছেন, নিঃসন্দেহে 'সিরাজাম মুনীরা' ও 'কাফেলা'র কবিতাবলী তারই ইশতেহার মাত্র।

'সাত সাগরের মাঝি' পর্যায়ের দুর্বার দুরন্ত সমুদ্র-সফর 'কাফেলা'র স্থলপথ অতিক্রম করেছে বিপরীত প্রতীকী ব্যঞ্জনায়, যখন :

উঠের সারির পাশে জমা হল একে একে দৃঢ় অচপল
দূর যাত্রীদল।

[কাফেলা]

এখানে গতি নিরবচ্ছিন্ন, কিন্তু দুরন্ত নয়। বাধার উপলখণ্ডে, বিশ্রামের নিশুতি রাতে, 'সাতোয়াঁ আকাশে'র নীচে, এক ওয়েসিস থেকে অন্য ওয়েসিসে, গোটা মুসলিম জাহানের বিশাল জনপদসমূহে বিচরণের গভীর অভিজ্ঞতা নিয়ে এখানে 'কাফেলা' শাশ্বত পথ-পরিক্রমা করছে। এখানে 'কাফেলা' ও মনজিল–এর দ্বন্দ্ব রাহাগীরের হৃদয়কে পেন্ডুলামের মত দোলাচ্ছে এবং শেষতক পথ, অনন্ত পথই সত্য হয়ে উঠেছে। 'তায়েফের পথ', 'মদীনার মুসাফির'-বৃত্তি ও 'খলিফাতুল মুসলেমিন'-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকার, 'কারবালার ময়দানে এজিদের ছুরি' ঝলসানোর রূপ প্রত্যক্ষকরণ, শহীদ ইমামের প্রতি উম্মতে মুহম্মদীর হৃদয়বিদারক সংলাপ ইত্যাদি মুসলিম হৃদয়বৃত্তির মাটিফসমূহ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের তুলিতে সবাকচিত্তের মত মূর্ত রূপ লাভ করেছে। স্থলপথে ফর্‌রুখ-চিত্তের এই অধিভ্রমণ "কাফেলা"র চিত্রাঙ্কনের বিচিত্র সজ্জায় ও অর্থ-রূপময়তায় এবং প্রতীকী ব্যঞ্জনা বিস্তারে বেশ সার্থকতা লাভ করেছে। আর সমুদ্র-সফর যে এ অবস্থায় হেত্বাভাসরূপে পরিত্যক্ত হয়েছে তাও নয়। "কাফেলা"-গ্রন্থে 'দ্বীপ নির্মাণ' শীর্ষক একটি অত্যন্ত সফল কবিতা আছে। আদর্শের ইউটোপিয়া দ্বীপের জন্যে কোটি কোটি মানবাত্মার আত্ম-কুরবানীর গভীর কাহিনী এই কবিতাটির প্রতিপাদ্য বিষয়। সমুদ্রের দুরন্ত সফরের অভিজ্ঞতার পরিণত পর্যায়ে কবিকণ্ঠে বিজ্ঞাপিত হয়েছে ঃ

প্রবাল দ্বীপের গোড়াপত্তন হবে,
কি করে সে কথা হয়ে গেল জানাজানি!
দল বেঁধে এল অযুত প্রবাল কীট
কাঁপায়ে দু'পাশে দরিয়ার লোনা পানি।

[দ্বীপ নির্মাণ]

এককালে সাত সাগরের মাঝিরূপে সমুদ্রমন্থন করে মউজের মত্ত চূড়ায় গড়াগড়ি দিয়ে, সিন্দাবাদ ও দিগ্বিজয়ী মাল্লার দল সম্পর্কে যে মহা-প্রতীকী কাব্য রচনা করেছিলেন কবি, তিনি এখন সমুদ্রের গভীর সৃষ্টি-ক্ষমতায় তন্ময় হয়ে প্রবাল দ্বীপ রচনার কালোত্তীর্ণ ছবি অঙ্কন করেছেন ঃ

www.pathagar.com

অযুত, লক্ষ, কোটি প্রবালের দেহে
শত যুগ ধরি' সেই দ্বীপ গড়ে ওঠে,
কোটি প্রবালের তনুতে না হয় যদি
আরো বহু কোটি প্রবাল কীটেরা জোটে।
কবে দূরচারী পথিক পাখীরা এসে
কাকলি-মুখর সে দ্বীপে বাঁধবে ঘর,
জাগবে কখন প্রবাল দ্বীপের বুকে
নারিকেল শাখে স্বপ্নের মর্মর।

*

প্রবাল দ্বীপের গোড়া পত্তন হবে
কি করে পেয়েছে তারা সেই হাতছানি!
মৃত্যু যাদের ত্যাগের মহান ছবি
মওতেই তারা পায় যে জিন্দেগানি।।

[দ্বীপ নির্মাণ]

'সাত সাগরের মাঝি'র উত্তাল সমুদ্রগর্জন এখানে নেই, বরং অতল নিস্তব্ধতার মোরাকাবায় ফানা হয়ে যাবার প্রবণতাই বিদ্যমান। 'নতুন সফর' শীর্ষক কবির বিখ্যাত কবিতাটি বর্তমান গ্রন্থভুক্ত কবিতারূপে এখানে আলোচ্য সমুদ্র-সফর প্রসঙ্গে পুনরালোচিত হতে পারে। এ কবিতায় নায়ক সিন্দাবাদকে সরাসরি কবি কর্তৃক সম্বোধিত হতে দেখি। কবিতাটি 'সাত সাগরের মাঝি'-ভুক্ত হলে সংগতিশীল প্রতীয়মান হত। কিন্তু এ সংগতি হত বহিরঙ্গের। উক্ত গ্রন্থে আদর্শবাদ অনুচ্চারিত, প্রতীকতা প্রাধান্যপ্রাপ্ত। কিন্তু 'সিরাজাম মুনীরা' ও 'কাফেলা'য় আদর্শবাদ সু-উচ্চারিত, রূপক ও প্রতীক সু-আরোপিত। বরং 'নতুন সফর' দুরন্ত সমুদ্র-সফরের সুন্দর পরিসমাপ্তিব্যঞ্জক একটি সফল কবিতা এবং 'দ্বীপ নির্মাণ' শীর্ষক আলোচিত কবিতাটি বরং একটি নতুন মাত্রাযোজক। 'নতুন সফর' কবিতার কিছু উল্লেখযোগ্য পঙক্তি দেখুন :

জীবনের চেয়ে দৃপ্ত মৃত্যু তখনি জানি
শহীদী রক্তে হেসে ওঠে যবে জিন্দেগানি,

*

কা'বাকেন্দ্রিক জীবনের এই পরিক্রমা!
ক্লান্ত রাতের সংশয় মনে রেখো না জমা,
সব দরিয়াকে বাঁধবে তোমার ইত্তেহাদ;
সব প্রতিরোধ ভাঙবে তোমার এই জেহাদ।

www.pathagar.com

*

নতুন সফরে হবে এ কিশ্‌তী দিগ্বিজয়ী।

কবি-চিত্তের সামগ্রিক ক্যানভাসে নবগ্রন্থ 'কাফেলা'র প্রকৃতি বিচারের এই প্রয়াস এখন যতি টেনে গ্রন্থের মুখ্য কবিতাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি উপস্থাপন করা যাক। বিবিধ বক্তব্যের মোট ৩২টি খণ্ড কবিতা ও 'ইবলিস ও বনি আদম' শীর্ষক একটি নাট্য-কবিতা "কাফেলা"য় গ্রন্থিত হয়েছে। তথ্য-নির্দেশিকায় প্রায় সকল কবিতার প্রথম প্রকাশকাল ও পত্র-পত্রিকার নাম উল্লিখিত হয়েছে। আসলে লেখাগুলোর সাথে সচেতন ও সন্ধিৎসু পাঠকের পরিচয় হয়তো আগেই ছিল, ফলে 'কাফেলা' এগুলোর সংকলনগ্রন্থের নামরূপেই প্রতীয়মান হত, যদি গ্রন্থের পরিকল্পনাটি স্বয়ং কবির স্বকপোলকল্পিত না হত।

'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাবলীর নির্বিকল্প ভাববাদ 'কাফেলা'য় আরো লোকবেদ্য, সহজ, ব্যাপক, মৃত্তিকাসংলগ্ন হয়েছে, তবু 'কাফেলা', 'তায়েফের পথে', 'মদীনার মুসাফির', 'খলিফাতুল মুসলেমিন', 'এজিদের ছুরি', 'বেলাল', 'আলমগীর', 'নতুন মিনার', 'নতুন সফর', 'কোন বিয়াবানে', 'ঈদের স্বপ্ন', 'নয়াসড়ক', 'বিকেল', 'হে আত্মবিস্মৃত সূর্য', 'জাগো সূর্য-প্রদীপ্ত গৌরবে', 'বৈশাখ', ইত্যাদি আদর্শবাদ প্রোথিত কবিতাবলী জাজিরাতুল আরব থেকে বাংলা-আসাম পর্যন্ত সাক্ষাৎ পটভূমিকায় প্রকল্পিত হয়েছে এবং বাকসিদ্ধি লাভ করেছে। 'কিস্‌সাখানির বাজার' ও 'পুঁথির কাহিনী অবলম্বনে' শীর্ষক কবিতাদ্বয়ে তুর্কীস্থানীয় মুসলিম মানস-পটভূমিতে জীবনের রহস্য-বিষয়ক, মানবিক সুখ-দুঃখ বিষয়ক, ঐতিহ্যবাহী ভূয়োদর্শনকে উপজীব্য করে অভিনব আঙ্গিকে এক অপসৃত সৌন্দর্যলোকের সন্ধানে যাত্রা করা হয়েছে। 'স্বর্ণ-ঈগল', 'সৃষ্টির গান', 'চতুর্দশপদী', 'ইনকিলাব' ইত্যাদি কবিতাবলীতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিশ্ববীক্ষা ও স্বপ্ন-সাধের সরল উচ্চারণ বাণীরূপ লাভ করেছে। এই ব্যাপারটিতে ইকবালের মতই ফর্‌রুখ আহমদ আপন জাতিসত্তার প্রতিনিধি-পুরুষের সাবলীল কণ্ঠ লাভ করেছেন। 'ইনকিলাব' কবিতাটি থেকে উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

মরু-ঝন্‌ঝার মত উড়ে আসে, আসে ইসলামী ইন্‌কিলাব
এ ঝড়ের মুখে মরণ নিদালী কুয়াশা-চাদর টানি কি লাভ
আয় ইন্‌কিলাব!
আয় ইন্‌কিলাব!

*

আয়!
নির্যাতিতের মৃত্যু শীতের শিয়রে রক্ত দিন-ফাগুন,
জালিম দলের পাষাণ ভিতের প্রান্তে বজ্র আয় আগুন!

www.pathagar.com

খর তরবার হান রে দু'ধার করে যা উজাড় বিষের তূণ,
কঠিন আঘাতে পিষে যাবে সব মিথ্যাবাদীর ভীরু প্রলাপ!
আয় ইন্‌কিলাব!
আয় ইন্‌কিলাব!

এ গ্রন্থের মর্মভেদী কবিতাটির নাম 'দুই মৃত্যু'। কবিতাটিতে হযরত মুসা (আঃ)-কে সম্বোধন করে বর্তমানে পুঁজিবাদ ও সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখী দণ্ডায়মান ত্রিশংকু মুসলিম বিশ্বের আর্তিকে রূপদান করা হয়েছে :

দুই মৃত্যুর মাঝখানে মোরা দাঁড়ায়েছি আজ এসে
হে মুসা কালীম। দেখ চেয়ে পিছু কারুণের বেষ্টনী;
জাগে ফেরাউন নির্ভীক সম্মুখে।

কবিতাটির শেষাংশ এইরূপ :

তুমি জানবে না,—শুধু এ বেদনা মোর—
তবুও জানাতে চাই
ফেরাউন আছে, রয়েছে কারুণ
শুধু যে মুসাই নাই।।

'ঝড়', 'বর্ষায়', 'পদ্মা', 'আরিচা-পারঘাট' শীর্ষক কবিতামালার একগুচ্ছ চতুর্দশপদী (মোট ২৪টি) আঙ্গিক ও ভাববাচ্যতার ফর্‌রুখীয় সনেটরূপে আপন ঔজ্জ্বল্যে দেদীপ্যমান। মুসলিম বিশ্বাস ও জীবনের অনুষঙ্গ এসব প্রকৃতি, জনপদ, মানুষ সম্পর্কিত সনেটগুচ্ছে সাবলীল ব্যবহারে এমন স্বাচ্ছন্দ্য পেয়েছে যেন 'এই তো স্বাভাবিক' বলে ধারণা জন্মায়। সুদক্ষ অন্ত্যমিলের নিপুণ কারিগর হিসাবে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাজ এই সনেটগুচ্ছে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এবং "কাফেলা"র মৌল সুরের সঙ্গে সংগতিসম্পন্ন। এই আপাতঃ ভিন্ন আঙ্গিকের কবিতানিচয়ে প্রকৃতির শক্তিকে ঐশী ইন্‌কিলাবের অনুকূল গতিরূপেই গণ্য করা হয়েছে। এই গ্রন্থভুক্ত প্রকৃতি বিষয়ক বিখ্যাত কবিতা 'বৈশাখ'-এ কবির চিত্তে যে রূপক দানাবদ্ধ, তার পরিচয় নিম্নরূপ ঃ

মিথ্যা বাতিলের দুর্গ ধ্বংস করি, ধ্বংস করি বিভীষিকা সঞ্চিত রাত্রির
তৌহিদী পয়গাম কণ্ঠে যেমন দাঁড়ালো এসে মর্দে খোদা জালালী ফকির
মূসা কালীমের মত 'আসা' হাতে তীব্র দৃষ্টি বাংলার প্রান্তরে
চৈত্রের বিভ্রান্তি ভেঙ্গে তেমনি বৈশাখ এস খর রৌদ্রে......এস ঘরে ঘরে,

www.pathagar.com

তোমার সংঘাতে এই পৌত্তলিক জড়তার মৃত্যুম্লান শর্বরী পোহাক ;
কালের কুঠার তুমি নিষ্প্রাণ এ জনারণ্যে
এস ফিরে হে দৃপ্ত বৈশাখ।

আলোচ্য গ্রন্থের সনেটগুচ্ছে আদর্শের ও প্রকৃতির অভিন্ন বাকপ্রতিমা নির্মাণের কৌশল প্রায় সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে। এই কাজে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আপন বৈশিষ্ট্য এমনভাবে জাজ্বল্যমান করেছেন যে, পূর্ববর্তী বা পরবর্তী কোন কবিই তাঁকে যেন এ ব্যাপারে অতিক্রম করতে পারেন নি। ধ্রুপদী স্বজ্ঞায় উদ্দীপ্ত কবি অলংকারশাস্ত্রীয় তাবৎ গুণপণাই স্বীকরণ করেছেন ষোলআনা, যেন অনায়াসে, বিনা ক্লেশে।

www.pathagar.com

হাসান আবদুল কাইয়ুম

আমাদের চেতনার উচ্চারণে ফররুখ

আমাদের চেতনার উচ্চারণে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যে অনুভূতির আকর নির্মাণ করেছেন, স্বতঃস্ফূর্ত হৃদয়-আরশীর প্রতিফলনে তা এক উচ্ছ্বসিত ঝরনার মতো। ইতিহাসের দীর্ঘ সড়কে তিনি বিচরণ করেছেন সজাগ মুসাফিরের মতো। উদ্ভ্রান্ত হন নি কখনো, বরং ঐতিহ্যের মূল স্রোতধারায় তিনি অবগাহন করে আপন সত্তাকে জাগ্রত করায় হয়েছেন ব্যাপৃত। আর সেই জন্যেই তিনি আমাদের নিকটতম সুজন এবং কবি।

তিনি লিখেছেন প্রচুর। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময়কাল থেকে তাঁর লেখনী হিমাচলের দৃঢ়তা নিয়ে এগিয়ে এসেছে। তাতে ঝঙ্কৃত হয়েছে আমাদের চেতনার মূল সুর। তা মুসলিম বাংলার মন ও মানসকে নবায়ন করার প্রেরণা জুগিয়েছে।

১৭৫৭ সালে পলাশীর আম্রবাগে যে চেতনার ঘটেছিল পতন, তীতুমীর, হাজী শরীয়তুল্লাহ্, ফকীর মজনু শাহ, পীর মওলানা শাহ্ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী, মুন্শী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্, ইসমাইল হোসেন সিরাজী, মওলানা আকরাম খাঁ, কাজী নজরুল ইসলাম প্রমুখ বিপ্লবী নেতা, সূফী সাধক, বক্তা, কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিকের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ও তাঁদের বজ্রকঠিন আহবানে পুনর্জাগরণের যে তরঙ্গ উদ্বেলিত হয়ে ওঠে, তারই ফসল কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। তিনি ভাবনাকে উচ্চারণের সাথে সংযুক্ত করে এগিয়ে এলেন নতুন প্রাণের অনুভবে। আপন বৈশিষ্ট্যে বেগবান হয়ে স্বতন্ত্র উচ্চারণে তিনি আহ্‌বান জানালেন কাবাকেন্দ্রিক জীবনপথে। ইতিহাসকে করলেন তাঁর কবিতার উপজীব্য। ঐতিহ্যকে করলেন মূল উপাদান। মক্কার হেরা গুহা থেকে ৬১০ খ্রীস্টাব্দের রমজান মাসের শেষ দশকে যে আলোর মশাল বিচ্ছুরিত হয়ে সারা বিশ্বে নতুন সমাজের সৃষ্টি করেছিল, তিনি সেই আলোর মিছিলে সবাইকে আহবান জানালেন। হেরা গুহাকে তিনি দেখলেন সংগ্রামের প্রেরণাকেন্দ্র রূপে। তিনি লিখলেন :

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে
তবু দেখা যায় দূরে ঐ দূরে হেরার রাজ-তোরণ,
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠেছে দুচোখ ছেপে,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ—

[সাত সাগরের মাঝি]

www.pathagar.com

তিনি লিখলেন হেরার রাজ-তোরণ থেকে উৎসারিত যে জীবনচেতনা, জীবনপথ—সে পথে চলতে নানা বাধা। অনেক মরু-সাগর, পাহাড়-পর্বত পাড়ি দিয়ে সেই সত্যিকারের শান্তির পথে উত্তরণ করা সম্ভব। তাঁর ভাষায় :

হে মাঝি! এবার তুমিও পেয়ো না ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক-তারকার বিস্ময়,
ঝরুক এ ঝড়ে নারঙ্গী পাতা, তবু পাতা অগণন
ভিড় করে—যেথা জাগছে আকাশে হেরার রাজ-তোরণ।
সে পথে যদিও পার হতে হবে মরু,
সে পথে যদিও দরিয়ার নোনা পানি
তবুও সে পথে আছে মঞ্জিল, জানি আছে ছায়াতরু
পথে আছে মিঠা পানি।

[সাত সাগরের মাঝি]

কবির লেখনীতে সেই মোহিনী শক্তি কাজ করেছিল, যে মোহিনী শক্তি সম্পর্কে টমাস কার্লাইল বলেছেন :

These Arabs, the man Mahomet and that one century. Is it not as if a spark had fallen only, one spark, on a world of what seemed black unnoticeable sand, but too! The sand proves explosive powder blazes heaven high from Delhi to Granada.

কবি জীবন-পথের সন্ধান পেয়েছিলেন ইসলামের মহান নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা আহমদ মুজতবা (সঃ)-এর জীবনাদর্শের মধ্যে। তিনি নবীজীকে অতি আপনার অন্তর দিয়ে দেখেছিলেন। তাঁর কাব্যগ্রন্থ 'সিরাজাম মুনীরা'এর এক জ্বলন্ত নজীর। এ গ্রন্থের প্রথম কবিতায় তিনি নবীপ্রেমের এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। তিনি লিখেছেন :

তোমার পথের প্রতি বালুকায় এখনো উদার আমন্ত্রণ
ঘাসের শিয়রে সবুজের ছোপ জাগায়ে স্বপ্ন দেখিছে বন।
তব শাহাদৎ অঙ্গুলি আজও ফিরদৌসের ইশারা করে,
নিখিল ব্যথিত উম্মত লাগি' এখনো তোমার অশ্রু ঝরে,
তোমার রওজা মুবারকে আজও সেই খোশবুর বইছে বান,
চামেলির ঘ্রাণ, অশ্রুর বান এখনো সেখানে অনির্বাণ।

[সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ মুস্তফা]

তওহীদকে কবি জীবনের মূলমন্ত্র হিসেবে গ্রহণ করেন। হৃদয়ের অনুভবে কাজ-কর্মে তিনি ছিলেন একজন খাঁটি মুসলমান। খুলাফায়ে রাশেদা ও ইসলামের ইতিহাসের

www.pathagar.com

বীরপুরুষদের তারুণ্য তাঁকে আকৃষ্ট করেছিলো, তাই তিনি তারুণ্যের উচ্ছলতায় আমাদের তরুণ সমাজকে জাগ্রত করার প্রয়াসে লিখলেন ঃ

নিশান আমার! একদিন তুমি হে দূত ঊষার
খালেদের হাতে, তারেকের হাতে, হ'য়েছ সওয়ার
উমর আলীর হাতের নিশান নবীজীর দান,
আমাদের কাছে নিশান তোমার শিখা হলো ম্লান
তুমি আনো ফের হেরার মাঠের মরু সাইমুম,
ভাঙ্গা আঁধারের শিখর, ওড়াও জড়তার ঘুম,—

[নিশান : সাত সাগরের মাঝি]

আরব্য উপন্যাসের দুঃসাহসিক চরিত্র নাবিক সিন্দাবাদকে কবি তারুণ্যের প্রতীক হিসাবে দাঁড় করিয়ে আমাদের তরুণ সমাজকে আহ্বান জানালেন :

কেটেছে রঙিন মখমল দিন, নতুন সফর আজ,
শুনছি আবার নোনা দরিয়ার ডাক,
ভাসে জোরওয়ার মউজের শিরে সফেদ চাঁদির তাজ,
পাহাড়-বুলন্দ ঢেউ বয়ে আনে নোনা দরিয়ার ডাক;
নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দাবাদ।

[সিন্দাবাদ]

তিনি আরো লিখলেন :

ভেঙ্গে ফেলো আজ খাকের মমতা আকাশে উঠেছে চাঁদ,
দরিয়ার বুকে দামাল জোয়ার ভাঙছে বালুর বাঁধ.
ছিঁড়ে ফেলো আজ আয়েশী রাতের মখমল-অবসাদ,
নতুন পানিতে হাল খুলে দাও, হে মাঝি সিন্দাবাদ!

[সিন্দাবাদ]

কবি ফুরফুরা শরীফের পীর হযরত মওলানা শাহ সূফী আবু বকর সিদ্দিকী (রঃ)-এর অন্যতম খলীফা প্রফেসর আবদুল খালেকের সংস্পর্শে এসে এল্‌মে তাসাউফ বা আধ্যাত্মিক বিদ্যায় তা'লীম গ্রহণ করেন। তাসাউফের বেশ কিছু সবক তিনি লাভ করেছিলেন বলে জানা যায়। 'সিরাজাম মুনীরা' গ্রন্থখানি পীর আবদুল খালেককে উৎসর্গ করে লিখেছেন ঃ

তৌহিদী মশাল বহি চলে গেছে যারা যাত্রীদল
—পাথর চাপানো ভার, আঘাতের ভারী বোঝা টেনে,
অবিশ্বাসী শর্বরীর শিলা-বক্ষে সূর্য-তীর হেনে

www.pathagar.com

অগণ্য মৃত্যুর মাঝে নিষ্কম্প, নির্ভীক—অচঞ্চল,
তাদের কাফেলা মাঝে নিঃসংশয় অভিযাত্রী জেনে
মানুষের মুক্ত স্বপ্ন রেখে যাই অশ্রু সমুজ্জ্বল।

'সিরাজাম মুনীরা' গ্রন্থে 'গাওসুল আজম', 'সুলতানুল' হিন্দ', 'খাজা নকশবন্দ', 'মুজাদ্দিদ আলফেসানী' প্রভৃতি আলাদা আলাদা কবিতায় তাঁর এল্‌মে তাসাউফের প্রতি গভীর আগ্রহের কথার উল্লেখ রয়েছে। তাই তো ঐ একই গ্রন্থে 'প্রেম-পন্থী' কবিতায় কবি লিখেছেন :

তৌহিদের পানপাত্র ওষ্ঠে তুলি যে করিবে পান,
নিষ্প্রেম জীবন তার রাঙাবে যে তৌহিদী সুরায়,
সহস্র আগ্নেয় শিলা—বিচ্ছেদ-অনলে বহ্নিমান
অগণ্য সংকটে তার ডাক দেবে প্রেম-পরীক্ষায়।
মেটাতে পারে নি প্রজ্ঞা কোনদিন সে প্রাণ-পিপাসা।
সৃষ্টির প্রথম কথা শুধু প্রেম, শুধু ভালোবাসা।

'অশ্রুবিন্দু' কবিতায় কবি বলেন :

তোমার অশ্রুর বুকে সংগোপন সৌর জগতের
সকল ঐশ্বর্য, স্বপ্ন, সব আলো ; সব অন্ধকার ।
তোমার চিত্তের পথে যে তৃষিত—প্রদোষ-লোকের
মানিয়া অশ্রুর সংজ্ঞা রক্ত পূর্বাশার খোলে দ্বার।

*

নিয়ত জ্বলিয়া ওঠে অবরুদ্ধ চিত্তের পলুলে,
সে কথা পূর্ণতা পায় একটি নিটোল অশ্রুজলে।।

সূফীদের 'মান আরাফা নাফসুহু--ফাকাদ আরাফা রাব্বুহু' বাণীর মতো কবিও আত্মাকে জানার, চেনার সাধনায় যেনো মগ্ন। তিনি লিখলেন :

আজ সংগ্রাম নিজেকে চেনার—
মানবতা নিয়ে বেচা ও কেনার—
হাটের ভীড়ে,
সময় এসেছে সকল দেনার
সকল হিসাব মেটাতে ফিরে।

[আজ সংগ্রাম : সিরাজাম মুনীরা]

আত্মোপলব্ধির মধ্য দিয়ে কবি বিশাল জনতার দুঃখ-দুর্দশা উপলব্ধি করেছেন। ক্ষুধাতুর মানব সন্তানের রুগ্ন নিঃসাড় ছবি কবিকে ব্যথাতুর করে তুলেছে। কবি তাই লিখলেন :

www.pathagar.com

এই জনতার বিপুল অঙ্গে সাড়া দিতে চায় প্রাণ,
আবার সে নিতে চায় নার্গিস লালা পাপড়ির ঘ্রাণ,

[আজ সংগ্রাম : সিরাজাম মুনীরা]

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আমাদের চেতনার অতলান্তে বিচরণ করেছেন। তিনি সুতীব্র আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান হয়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছিলেন। অসত্য তাঁকে তাঁর এই দৃঢ়তায় বাধা সৃষ্টি করতে পারে নি। আদর্শচ্যুত করতে পারে নি তাঁকে কোন অপশক্তি। তাঁর জন্ম হয়েছিল এক উচ্চমধ্যবিত্ত পরিবারে ১৯১৮ খ্রীস্টাব্দের ১০ জুন। তাঁর পিতা খান বাহাদুর সৈয়দ হাতেম আলী সাহেব ছিলেন ব্রিটিশ ভারতীয় সরকারের একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। ছোট বেলায় তিনি লালিত হয়েছেন ধনী দুলাল রূপে। এতদসত্ত্বেও উপার্জনক্ষম হবার সাথে সাথেই তিনি দারিদ্র্যকে আপনার করে নেন। জীবন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসেন এক স্বতন্ত্র অঙ্গন নির্মাণে। নজরুল ইসলাম তখন কাব্যজগতে এক বেগবান শক্তি। স্বকীয় ভাষা নির্মাণে নজরুল তখন এক যুগস্রষ্টা আর সেই শুভক্ষণে ফর্‌রুখ এলেন নতুন অনুভবে এক পৃথক আস্বাদনে শব্দ-চয়নের মহৎ শিল্পী রূপে। তিনি এলেন আমাদের চেতনার উচ্চারণের কবি রূপে।

www.pathagar.com

মুহম্মদ নূরুল হুদা

একজন স্ববিরোধহীন কবি

যে কাব্য-বিতর্কের নাম ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তা থেকে খানিকটা দূরে সরে এসেই আলোচনাটি শুরু করা যাক। অর্থাৎ ফিরে যাওয়া যাক সেই উনিশ-বিশ বছরের সদ্যকিশোরোত্তীর্ণ এক তরুণের কাছে, যিনি দুরু দুরু বুকে কবিতাসুন্দরীর ঘরে পা রাখছেন। সেই কাব্যোন্মেষের যুগে 'সওগাত' পত্রিকার দ্বিতীয় সংখ্যায় (পৌষ ১৩৪৫) প্রকাশিত তাঁর কবিতাটির নাম 'আঁধারের স্বপ্ন'। কবিতাটির প্রথম স্তবক উদ্ধার করা যাক :

মাধবী বিতানের পাশে তার ছায়া বিতান।
তবু সে ফুটলো না মধুরাতে বসন্তের বিহবলতায়।

সঙ্গী বসন্ত যেদিন লুটে পড়ল অন্তিম নিঃশ্বাসে, সেদিন
থেকেই বুঝি তার মনে সত্যিকারের অশ্রুর পরাগ জমতে আরম্ভ
করেছে। সঙ্গীহীনা, সে এক কেতকী।

[আঁধারের স্বপ্ন : সওগাত, পৌষ ১৩৪৫]

লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, কবির পরিণত পর্বে যে আঙ্গিকের ও যে মেজাজের কবিতার সন্ধান আমরা পেয়েছি, তা থেকে এ কবিতার ব্যবধান মেরুদূর। কাজেই এই কবিতা দিয়ে ফর্‌রুখের কাব্যসাফল্যে নিরূপণ করার প্রচেষ্টা হাস্যকর। কিন্তু আমাদের মতে, কবি ফর্‌রুখের যথার্থ কবিচারিত্র্য ও কাব্য-মেজাজ অনুধাবন করতে হলে এই কবিতাটির উল্লেখ করা প্রয়োজন। কেননা, এ কবিতার আঙ্গিক, কাব্যভাষা ও বিষয় বিবেচনা করলে দেখা যাবে, এটি ফর্‌রুখের অন্যতম বৈশিষ্ট্যসূচক কবিতা। কবিতাটি গল্পের আঙ্গিকে লিখিত, তাঁর কাব্যভাষার প্রধান বাহন স্পন্দিত গদ্য এবং বিষয় রোমান্টিকতা চিহ্নিত। সহজেই বোঝা যায়, ফর্‌রুখ পূর্ববর্তী কবিতার ভাষা কতদূর এগিয়েছিলো, ফর্‌রুখ সে বিষয়ে কাব্যজীবনের শুরু থেকেই অত্যন্ত সচেতন ছিলেন। দেখা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের শেষ দিকের কবিতাগুলো যে গদ্যছন্দে ও গদ্যাকারে লিখিত এবং তথাকথিত রবীন্দ্রদ্রোহী বলে চিহ্নিত 'কল্লোল' ও তিরিশের কবিগোষ্ঠীও যে কাব্যের প্রকরণগত দিকটি পরিবর্তন করতে উৎসাহী হয়ে উঠেছেন, ফর্‌রুখ এ সত্যকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন এই কবিতায়। আরো লক্ষ্য করার বিষয়টি এই যে, ফর্‌রুখ

www.pathagar.com

আহ্‌মদের তুঙ্গ গ্রন্থ-ধৃত (যথা, 'সাত সাগরের মাঝি' ও 'হাতেম তা'য়ী') কবিতাগুলোর মতো এই কবিতায়ও একটি গল্পের পরোক্ষ আভাস আছে। সবশেষে ফর্‌রুখ যে মূলত রোমান্টিক মেজাজের কবি, এ কথাও এই কবিতা থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু 'আঁধারের স্বপ্ন' নয়, সেকালে লেখা তাঁর আরো কয়েকটি কবিতা, যেমন 'উপহার', 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি', 'কর্পূর', 'নাটক', 'চৈত্রসন্ধ্যার সুর', "চৈত্রপ্রভাতের সুর', 'ঝিল্লী', 'জীবন-সমুদ্র', 'প্রেক্ষণ', 'নাটকীয়', 'ব্ল্যাক আউট', 'হে বন্য স্বপ্নেরা' প্রভৃতি আরো বহু কবিতা এ কথার যথার্থতা প্রমাণ করে।

কিন্তু মূলত রোমান্টিক ও স্বপ্নমেদূর কবি হিসেবে তাঁর কাব্যজীববন শুরু হলেও তিনি অচিরেই বুঝতে পেরেছিলেন, নিজের কাব্যস্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করতে হলে তাঁকে এ পথ থেকে অবশ্যই সরে আসতে হবে। অন্তত একটি স্বতন্ত্র কাব্যভাষা যে তাঁর চাই-ই, একথা বুঝতে তাঁর মতো সচেতন কবির তো দেরী হওয়ার কথা নয়।

ঘটনাক্রমে ঠিক এই সময়েই দেখা দিয়েছিলো পঞ্চাশের সর্বনাশা মন্বন্তর যা তাঁর চেতনাকেও প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিলো। কিছুটা তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার গন্ধযুক্ত হলেও তাঁর কলম থেকে বেরিয়ে এলো 'লাশ' ও 'শকুনেরা' নামক বিখ্যাত কবিতা দু'টি। এই মন্বন্তর তাঁকে তাঁর বন্য স্বপ্নের অরণ্য থেকে টেনে আনলো লোকালয়ে, যেখানে জড়সভ্যতার অভিশাপগ্রস্ত মানুষের গলিত লাশের পাশাপাশি পুঁজিবাদী সভ্যতার সম্পদের পুঁজও স্তূপীকৃত হয়ে আছে। নিহত আলবাট্রস যেমন কোলরিজের আনসেন্ট ম্যারিনারের জ্ঞান-চক্ষু খোলার কাজ করেছিলো, তেমনভাবে পুঁজিবাদী জড়-সভ্যতার শহীদ এই 'লাশ' ও বাংলার নাবিক-কবি ফর্‌রুখের কবি-দৃষ্টিকে নতুনভাবে খুলে দিলো। তাই ১৩৫৪ সালে, মন্বন্তরের অব্যবহিত পর তিনি তাঁর অপেক্ষাকৃত অনুল্লিখিত ও গদ্যছন্দে লিখিত 'ব্যক্তিগত' শীর্ষক কবিতায় লিখলেন :

পার্ক সার্কাসের সাথে মেলাতে বাধে না
হাভিয়ার কোনো পল্লী,
                    পুঁজিবাদী পুঁজ
যেহেতু জমানো দেখি উক্ত ডাস্টবিনে
(যদিও সজ্জিত আহা বিচিত্র ভূষায়)!
দুর্মর তাকিদ আসে
পার্শ্ববর্তী বস্তি থেকে তবু;
'ইতরে'র মধ্যে আমি
খুঁজে ফিরি সত্তা মানুষের
ক্ষুধিত প্রাণীর শ্বাসে

www.pathagar.com

মেশায়ে নিজের দীর্ঘশ্বাস
আদর্শের পন্থা কতো দূরোরোহ বুঝি প্রতি পা'য়।
দিনরাত্রি চেয়ে দেখি বিপক্ষে আমার
অগণন ফেরাউন—কারুণের ব্যূহ
দেখি চেয়ে সড়কের
প্রতি প্রান্তে অসহায় বনি-ইস্রাইল,
তেমনি সন্ধান করে মূসা-কালীমের,
সারা পথ কেঁপে ওঠে বন্দী বেদনায়........
মজলুমের লোহুধারে ভেসে যায়.......

[ব্যক্তিগত : সওগাত, আষাঢ় ১৩৫০]

বস্তুত এই কবিতায় ফর্‌রুখের কাব্যিক ও আদর্শিক বিকাশের বীজ উপ্ত রয়েছে। 'লাশ' কবিতায় যেমন ঠিক তেমনি এ কবিতায়ও পুঁজিবাদ ও জড়বাদকে সমস্যার কারণ হিসেবে উল্লেখ করে সম্ভাব্য যে সমাধানের ইঙ্গিত তিনি দিয়েছেন, তা কোনো সর্বহারার সাম্যবাদ নয়, বরং তার সঙ্গে যুক্ত আছে ইসলামী ও ধর্মীয় চেতনা :

সংগ্রাম-বিধ্বস্ত মন ভুলে যায় সংঘাতের গ্লানি
জেগে ওঠে দিকে দিকে সর্বগ্রাসী আসন্ন জেহাদে
মুসা কালীমের খোঁজে সেনানী সে নির্ভীক সত্যের।

আমি এ প্রসঙ্গের উল্লেখ করছি এই জন্যে যে, পরবর্তী জীবনে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কেন ইসলামী ঐতিহ্যের পুনর্জাগরণের প্রয়াস পেয়েছিলেন, তার উত্তরও এই একটি কবিতাতেই নিহিত আছে। অনেকেই হয়তো দৃষ্টিভঙ্গিগত কারণে ফর্‌রুখ প্রদর্শিত সমাধানের প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করবেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও এটিই ছিলো ফর্‌রুখের কবিজীবনের ও ব্যক্তিজীবনের সমগ্র ও একাগ্র সাধনা। ফর্‌রুখের জীবনে ও সাহিত্যে এর কোনো বিরোধিতা নেই। এই আদর্শিক বিষয়ে তিনি ছিলেন সরল রৈখিকভাবে একাগ্র।

অভিযোগ উঠেছে, এই দৃষ্টিভঙ্গি ফর্‌রুখের কবিসত্তাকে একপেশে ও গণ্ডিবদ্ধ করে রেখেছে এবং ফর্‌রুখ সমকালীন জীবনকে অন্যান্য প্রাগ্রসর ধ্যান-ধারণার আলোকে বিশ্লেষণ করেন নি। কবিতাকে যাঁরা জীবনের সমালোচনা হিসেবে দেখতে চান, সামাজিক ভূমিকার সেই সব প্রগতিশীল পতাকাবাহকদের কাছে ফর্‌রুখ তাই একঘরে ও পক্ষপাতদুষ্ট এক কবি। কিন্তু আমাদের যুক্তি ভিন্নরূপ। আদর্শিক দ্বন্দ্বের জন্যে কোনো কবির কাব্য-ক্ষমতাকে খাটো করে দেখা আমাদের অভিপ্রেত নয়। তাই যদি হতো, তাহলে ইসলামিক পুনর্জাগরণের শ্রেষ্ঠতম দূত ইকবালকেও আমরা গৌণ কবি

www.pathagar.com

আখ্যা দেবার দুঃসাহস দেখাতাম। ফর্‌রুখের কাব্য-ক্ষমতার পরিমাপ করার জন্যে আমাদেরকে তাই আদর্শের কূপমণ্ডুকতার কথা না বলে অন্য প্রসঙ্গে যেতে হবে। ইকবালের সঙ্গে তুলনামূলক আলোচনায় এ সত্য আরো পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ইকবাল তাঁর আদর্শ ও প্রদর্শিত সমাধানের একটা দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, যা তাঁর সমকালীন দার্শনিক ভিত্তিকেও নতুনভাবে নাড়া দিয়েছিলো। ফর্‌রুখের কবিতায় আদর্শের জয়গান আছে, কিন্তু তার দার্শনিক ব্যাখ্যা নেই। কাজেই ফর্‌রুখও তাঁর বিপক্ষের অনেক প্রগতিশীল ও আদর্শবাদী কবির মতো কবি হিসেবে একটি আদর্শের ধ্বজাধারী হয়ে রইলেন, তার যুগোপযোগী ব্যাখ্যাতা হলেন না।

এই একই কারণে সমকালীন ঘটনাবলীর তাৎক্ষণিক ভাষ্যকার হওয়া সত্ত্বেও তিনি সার্বিক অর্থে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির কবিও হতে পারলেন না। এ পর্যায়ে স্পেন্ডার কথিত মডার্ন ও কন্টেম্পরারী সম্পর্কিত ধারণাটি স্মরণ করা যেতে পারে। স্পেন্ডার বলেছেন ঃ

> লেখক সম্প্রদায় যখন নিজেদের সামাজিক ভূমিকা পালন করতে গিয়ে বিভিন্ন সমকালীন দ্বন্দ্বের সংগে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন, তখন তাঁরা হন 'কন্টেম্‌পোরারী' বা সাম্প্রতিক। অন্যদিকে একজন সত্যিকারের 'মডার্ন' বা আধুনিক লেখক হলেন তিনি, যিনি সমকালীন জীবন ও সমস্যাকে অতীতকালীন প্রেক্ষাপটে দাঁড় করিয়েও তাকে একটি সর্বকালীন ও সর্বজনীন রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন।

বিশেষত মীথ, পৌরাণিক কাহিনী, উপকথা, পুঁথি সাহিত্য, লোকজ ঐতিহ্য ও লৌকিক উপদান প্রভৃতির আধুনিকীকরণের মাধ্যমেই এ কাজটি সাধিত হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ আমরা হোমারের 'ইউলিসিস', টেনিসনের 'ইউলিসিস' এবং জেমস জয়েসের 'ইউলিসিস'-এর কথা স্মরণ করতে পারি। গ্রীক জীবনের সার্বিক আচরণ ও জীবনযুদ্ধের প্রতিমূর্তি ও নায়ক যে ইউলিসিস, তাকে টেনিসন করে তুলেছিলেন ভিক্‌টোরীয় ইংল্যান্ডের প্রতিনিধি; এই ইউলিসিস নামে গ্রীক, কিন্তু জীবনাচরণে ভিক্‌টোরীয়। ঠিক অনুরূপভাবে জয়েসের নায়ক গ্রীকও নয় ভিক্টোরীয়ও নয়, সে ডারলিনের অধিবাসী এবং সমকালীন চেতন-অচেতন-অবচেতন জগতের একজন দুঃসাহসী মানসযাত্রী, যাঁর অন্তিম উদ্দেশ্য জটিল ও দুর্গম মানসদুর্গের রহস্যময়তায় নিজের প্রতিকৃতিকে সনাক্ত করা। বলা বাহুল্য, কল্যাণকামী জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্যে ফর্‌রুখ যে সিন্দাবাদ ও যে হাতেম তা'য়ীকে তাঁর কাব্যের নায়ক হিসাবে উপস্থাপিত করেছেন,তারা কেউ এ কালের জীবনাচরণের সঙ্গে নিজেদের আত্মীয়তা ঘোষণা করতে পারে নি। ফর্‌রুখের সিন্দাবাদ যেমন এখনো আমাদের কাছে এক মিথলজিক্যাল বা পৌরাণিক চরিত্র, তেমনিভাবে তাঁর হাতেম তায়ীও শুধুমাত্র একটি আদর্শের প্রতিমূর্তি। একজন পুনর্জাগরণ ও নবদিগন্ত উন্মোচনের প্রতীক, অন্যজন

www.pathagar.com

ইসলামী মানবতাবাদের প্রতীক। এরা কেউই যেনো রক্তমাংসের গড়া মানুষ নয়। হয়তো একালের নিরীশ্বরবাদী জড়-সভ্যতার প্রতি তীব্র অনীহাহেতু ফর্‌রুখ ইচ্ছাকৃতভাবেই তাঁর আদর্শবাদী নায়কের গায়ে এ যুগের জীবনাচরণের কোন কলুষ-স্পর্শ রাখতে চান নি। এতে হয়তো তাঁর ব্যক্তিগত ও আদর্শগত উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে, কিন্তু উল্লিখিত সাহিত্যিক মানদণ্ডে তাঁকে মডার্ন বা আধুনিক বলা কতখানি যুক্তিসংগত, তা অবশ্যই বিবেচনাসাপেক্ষ।

এই সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ফর্‌রুখের কবিকৃতি সমসাময়িক কাব্য-রসিকদের কাছে কোনোক্রমেই উপেক্ষণীয় নয়। স্বীকার করতেই হবে যে, বাংলা কাব্যকলার ইতিহাসে তিনি একজন ব্যতিক্রমোজ্জ্বল কবি-কারুকৃৎ। "কল্লোল" ও তিরিশের কবিদের গোষ্ঠীবদ্ধ প্রতাপের মুখেও তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে নিজের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন। এই গোষ্ঠীবদ্ধ আন্দোলনের সুফলটিকে বিস্মৃত না হয়েও আমরা বলতে পারি, এই আন্দোলন ছিলো রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে একটি কৌশলগত বিদ্রোহ। বাংলা কবিতার ধারাবাহিক অগ্রগমনের ক্ষেত্রে এটি একটি বৃহৎ লংকা-লাফ। আরো স্মর্তব্য যে, এ গোষ্ঠীর অধিকাংশ কবিই বিদেশী তথা ফরাসী ও ইংরেজী সাহিত্যের যৌনতাক্লিষ্ট অবক্ষয়ী রূপটিকে বাংলা কাব্যে আমদানী করে নিজেদেরকে বাংলা কবিতার স্বতন্ত্র অধীশ্বর হিসেবে চিহ্নিত করতে প্রয়াস পেয়েছিলেন। যে নেতিবাদ এঁদের কারো কারো জীবনদর্শন হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে, সেটিও বাঙালী তথা ভারতীয় দর্শনের ব্যাপার নয়। আরো লক্ষ্য করার বিষয় এই যে, বাংলা কবিতায় এইসব নেতিবাচক দর্শনের আমদানীর সপক্ষে কার্যত কোনো সামাজিক বা অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য ক্রিয়াশীল ছিলো না। ফর্‌রুখকে যারা ভিনদেশী ঐতিহ্যের ধারক-বাহক বলে কটাক্ষ করতে উৎসাহী, তাদেরকে এ কথাটা পুনর্বিবেচনা করতে হবে। কেননা, আগেই উল্লেখ করেছি, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ঐতিহ্য-অনুসন্ধানের প্রচেষ্টা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক; নিরাপত্তাকামী একটি বাঙালী তথা ভারতীয় জনগোষ্ঠীর স্বাতন্ত্র্য সন্ধানের প্রয়াস-প্রসূত। যা হোক, এই তীব্র সাহিত্যিক হট্টগোলের মধ্যেও ফর্‌রুখ নিজেকে চিহ্নিত করতে পেরেছিলেন প্রধানত দু'ভাবে ঃ ১. একটি স্বতন্ত্র কাব্যভাষার অধিকারী হয়ে এবং ২. বাংলা কাব্যে সমুদ্রপুরাণ ও মরু-পুরাণের ক্ষীণস্রোতা ঐতিহ্যকে সক্ষম হাতে সম্প্রসারণ করে।

স্বতন্ত্র ভাষাসন্ধানী এই কবির উপর যে সব পূর্বসূরি ও সমকালীন কবির প্রভাব পড়েছিলো, তাঁরা হলেন মাইকেল, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলাম। তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি' কাব্যগ্রন্থে সমুদ্রযাত্রার ও সমুদ্রমন্থনের যে গুরুগম্ভীর স্বর শোনা যায়, তার সঙ্গে মাইকেলের 'মেঘনাদবধ কাব্য'-এর স্বর-গাম্ভীর্যের সাযুজ্য আছে। পার্থক্যটা ছন্দের ও দৃষ্টিভঙ্গির। অন্যদিকে, মাইকেল যেমন সংস্কৃত-

www.pathagar.com

ঘেঁষা ধ্বনিপ্রধান শব্দমালার ব্যবহারে তাঁর ভাষার ভার বহুগুণ বৃদ্ধি করেছিলেন, ঠিক তেমনিভাবে ফর্‌রুখ আহমদও ধ্বনিপ্রধান আরবী-ফারসী শব্দমালার কবিতাসম্মত ব্যবহারের মাধ্যমে তাঁর ভাষাকে তরঙ্গায়িত ও বেগমান করেছেন। মাইকেলসহ উল্লেখিত চার পূর্বসূরির কাব্যভাষার সংশ্লেষ ঘটেছিল বলেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদও নিজের কাব্যভাষার নবায়নে উল্লেখযোগ্য সফলতা লাভ করেছিলেন। বাংলা কবিতায় তাঁর সুনির্দিষ্ট আসনটিকে শনাক্ত করতে হলে তাই তাঁকে মাইকেল, সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল ও নজরুলের পাশাপাশি স্থাপন করে একটি তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত করার প্রয়োজন আছে।

কেউ কেউ অবশ্য ফর্‌রুখের কাব্যভাষাকে ডেড ল্যাংগুয়েজ বা মৃতভাষা হিসাবে চিহ্নিত করতে আগ্রহী। তাঁদের মতে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে ইংরেজ পাদ্রীদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলা ভাষার যে নবায়ন, সেটিই হচ্ছে জীবন্ত বাংলাভাষা। ফর্‌রুখ আহ্‌মদও এ সত্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না; এবং এও আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বাংলা ভাষাতেই কবিতা লিখেছেন এবং পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পরে ভাষাবিতর্কে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে বাংলা ভাষার সপক্ষে রায় দিয়ে বলেছিলেন, "বাংলা ভাষার পরিবর্তে অন্য ভাষাকে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করলে এই দেশে ইসলামী সংস্কৃতিকে হত্যা করা হবে।" অর্থাৎ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বাংলা ভাষার পরিবহন ক্ষমতাকে তো কোনোকালে অস্বীকার করেন নি, বরঞ্চ তিনি তাকে তাঁর নিজস্ব আদর্শের একটি সক্ষম প্রচারমাধ্যম হিসাবে তুলে ধরেছিলেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের লেখা 'উর্দু বাংলা বিতর্ক' সম্পর্কিত একটি সনেট এবং ভাষা সম্পর্কিত কয়েকটি সনেটেও তাঁর এই মনোভাব সুস্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে। ইংরেজ পাদ্রীদের হাত থেকে বেরিয়ে আসা ইংরেজী বাক্যগঠন-প্রণালী নির্ভর ও ইংরেজী শব্দপুষ্ট তৎকালীন বাংলা ভাষাকে ইংরেজরাও সম্পূর্ণভাবে নিজেদের স্বার্থেই ব্যবহার করেছিলেন। বলা বাহুল্য, এই বাংলাভাষা ছিলো তাদের ধ্যান-ধারণার সফলতম প্রচারমাধ্যম। একই উদ্দেশ্যে যদি মুসলমানরা তাদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বাতন্ত্র্যের উন্মেষের কালে তাদের মুখে অহরহ ব্যবহৃত আরবী-ফারসী শব্দমালা বাংলায় প্রয়োগ করে থাকেন, তবে তাকে নিন্দনীয় বলা যায় না। বলা হয়েছে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অনেকটা জেদের জন্যে অপরিচিত আরবী-ফারসী শব্দাবলী তাঁর কাব্যভাষায় ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু তাতে তাঁর ভাষার ধ্বনিসঙ্গতি ক্ষুন্ন হয়েছে বলে তো জানা যায় নি। সংশ্লিষ্ট অপরিচিত শব্দটির অর্থোদ্ধারের সঙ্গে সঙ্গে যদি তা কবিতার পংক্তিতে অঙ্গীভূত হওয়ার অধিকার রাখে, তাহলে তাকে গ্রহণ করতে তো কোনো আপত্তি থাকার কথা নয়। প্রভূত সৃষ্টিশীল ফর্‌রুখ আহ্‌মদও সার্বভৌম সৃষ্টিকল্পনার অধিকারী ছিলেন, তাই তিনি এইসব অপরিচিত ও প্রায় অপরিচিত শব্দাবলীকে তাঁর তরঙ্গায়িত ও গতিময় ভাষার

www.pathagar.com

সঙ্গে একাত্ম করতে পেরেছিলেন। যে সামাজিক ও চেতনাগত ক্রান্তিকালকে তিনি অবলোকন করেছেন এবং যেখানে তিনি একটি নির্দিষ্ট পক্ষের সুস্পষ্ট সমর্থক ছিলেন, তাতে তাঁর এরকম জেদ থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। এটিকে আমরা বরং জেদ না বলে অনমনীয়তাই বলবো। যে-কোন কবির কাব্যকর্মের মূল্যায়নে তাঁর সমসাময়িক সামাজিক ঘটনাস্রোতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করলে মূল্যায়ন পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে পড়ার সম্ভাবনা সমধিক। আমাদের মতে, বাঙালী মুসলমানদের দৈনন্দিন মুখের ভাষায় আরবী, ফারসী শব্দের যে প্রাধান্য তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং বাংলা ভাষার পূর্ববর্তী অনেক প্রধান কবির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ফর্‌রুখ আহমদ তাঁর কবিতায় অত্যন্ত সচেতনভাবে যে ভাষা নির্মাণ করলেন, তা তাঁর সম্প্রদায়ের মৌখিক বাণীভঙ্গীরই কাব্যিক সংপৃক্তায়ন। এই মৌখিক ভাষা অবশ্যই জীবন্ত ভাষা। এই বিচারে ফর্‌রুখ আহ্‌মদও অবশ্যই এক জীবন্ত ভাষার কবি।

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সৃষ্টিশীল হৃদয় ছিলো যে কোন সৎ শিল্পীর মতো চির অতৃপ্ত। এই অতৃপ্তি শিল্পীকে তাড়িয়ে ফেরে এক প্রকরণ থেকে অন্য প্রকরণে, এক আধার থেকে অন্য আধারে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ক্ষেত্রেও এর ব্যক্তিক্রম দেখি না। কাব্য জীবনের শুরুতে গদ্যছন্দে কবিতা লিখতে আরম্ভ করেও, তাই দেখা যায়, পরবর্তী জীবনে শুধু ব্যাকরণসিদ্ধ ছন্দেই সমর্পিত হন নি, বরং ছন্দ নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষায়ও উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। 'সাত সাগরের মাঝি'র অধিকাংশ কবিতার বাহন মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। সমুদ্রের গর্জমান স্বরধ্বনিকে ধরে রাখার জন্যে এই ছন্দ যোগ্য বাহনই বটে। আবার দীর্ঘচরণে তীব্র বেগবান ও বিলম্বিত লয়ের অক্ষরবৃত্তের ব্যবহার করেছেন 'বৈশাখ' ও 'কাফেলা' শীর্ষক কবিতাদ্বয়ে। এ ছড়া প্রবহমান অক্ষরবৃত্ত বা মুক্তকের ব্যবহার কত সঙ্গীতময় ও বৈচিত্র্যময় হতে পারে, তার স্বাক্ষর রেখেছেন 'ডাহুক', 'দোয়েলের শিস' প্রভৃতি কবিতায়। ছন্দের বিচিত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও তিনি বারে বারে তাঁর কবিতার আঙ্গিক বদল করেছেন। কখনো লিখেছেন তীব্র সংরাগময় টিলেঢালা গীতিকবিতা, কখনো আঁটসাঁট বাঁধুনির সনেট, কখনো উদাত্ত আহ্বানকারী 'সিন্দাবাদ' বা 'বা'র দরিয়ায়-এর মত জাগরণী কবিতা, কখনো কাব্যনাট্য, কখনো টুকরো ব্যঙ্গ কবিতা আবার কখনো বা মহাকাব্য। এগুলো ছাড়া তাঁর শিশুতোষ কবিতা ও গানের সাজি তো রয়েছেই। তাঁর রচনা-প্রাচুর্যের দিকে চোখ ফেরালেও তাঁর বিশালত্ব কিছুটা আন্দাজ করে নেয়া যায়। এতো বিচিত্র পথে বাংলার খুব কম কবিই এগিয়ে গেছেন। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে নজরুল ইসলাম ও জসীম উদ্‌দীন ছাড়া সৃষ্টি -প্রাচুর্যের দিক থেকে অন্য কেউ তাঁর সমকক্ষ নন। তিরিশের কবিদের মধ্যে অবশ্য বুদ্ধদেব বসু ও বিষ্ণু দে-র কথা সহজেই মনে পড়ে। কিন্তু এঁরা কেউ প্রকরণগত বিচারে এতো বিচিত্র পথে এগোন নি।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সবচেয়ে উচ্চাকাঙ্ক্ষার রচনা সম্ভবত "হাতেম তা'য়ী"। এ গ্রন্থটিকে তিনি নিজে মহাকাব্যরূপে চিহ্নিত করতে আগ্রহী ছিলেন। সমসাময়িক সমালোচকদের অনেকেই এ গ্রন্থটিকে একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যকীর্তি হিসাবে স্বীকার করে নিলেও এটি আসলে কোন মহাকাব্য কিনা, এ সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করেছেন। এবং একালে কথাসাহিত্য, বিশেষত উপন্যাস যখন মহাকাব্যের স্থান দখল করে নিয়েছে, তখন মহাকাব্য রচনা করার আদৌ কোন যৌক্তিকতা আছে কিনা, তাও বিচার্য বৈকি। তবে শুধুমাত্র এ কারণে মহাকাব্যের প্রয়োজন ফুরিয়েছে বলে মনে করার সপক্ষে তেমন কোন সঙ্গত কারণ নেই। "ওডেসি ঃ ও মর্ডান সিকুয়েন্স" নামক সুবৃহৎ মহাকাব্যটির কথা এ প্রসঙ্গে স্মরণ করতে পারি। তিরিশের কবি জীবনানন্দ দাশও মনে করতেন, বাংলা কবিতায় অচিরে দীর্ঘ কবিতা ও মহাকাব্য রচিত হবে। আমরা ভুলি নি যে, বাংলা কাব্যে আধুনিকতার প্রথম সংপৃক্তায়ন ঘটেছিলো যে কবির কবিতায় তিনিও বাংলা ভাষার সফলতম মহাকবির আসনটি অলংকৃত করে আছেন। মাইকেলের পরেও অনেকে মহাকাব্য রচনায় উৎসাহী হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সৃষ্টি-প্রতিভার স্বল্পতাহেতু এঁদের প্রায় সকলেই ছন্দে ও শব্দে ঘটনার ঘনঘটা দেখিয়েই ক্ষান্ত হলেন, যথার্থ মহাকাব্য লিখলেন না। এ যুগে যে মহাকাব্য রচিত হবে, প্রাথমিক মহাকাব্য বা সেকেন্ডারী এপিক। মাইকেল ছাড়া হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতিরা এই সত্যটিকে সম্যক উপলব্ধি করলেও, তাঁকে বাস্তবায়ন করতে পারেন নি। মুসলমানদের মধ্যে সম্ভবত সৈয়দ ইসমাইল হোসেন সিরাজী ও কায়কোবাদই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের পূর্বে মহাকাব্য রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। দু'জনেই উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন ইতিহাস থেকে, কিন্তু তাকে আধুনিকীকরণ করতে পারলেন না। এদের বৈফল্যের উদাহরণ সামনে রেখেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তাঁর "হাতেম তা'য়ী" রচনায় ব্রতী হয়েছিলেন। পুঁথি সাহিত্য ও আরব্যোপন্যাস থেকে উপাদান সংগ্রহ করেছিলেন তিনি, ভাষারও আধুনিকীকরণ করলেন; কিন্তু পরিণামে সেই পুরনো পাঁকে আবদ্ধ থেকে গেলেন তিনিও। অর্থাৎ হাতেম তা'য়ীকে একালের মন ও মানসিকতার আলোকে একজন সচল ও জীবন্ত মানুষ হিসেবে না গড়ে গড়লেন একটি আদর্শের প্রতীক হিসেবে। স্পেনসারের 'ফেয়ারী কুইন'-এর নায়ক রেডক্রস নাইট-এর সঙ্গে হাতেম তা'য়ীর আশ্চর্য মিল লক্ষ্য করা যায়। দু'জনেই আদর্শের প্রতীক মাত্র, দুজনেই পরম সত্যের সন্ধানে বেরিয়েছেন এবং একের পর এক ড্রাগন বা অন্যান্য অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধে জয়লাভ করে পরিশেষে সত্যের মুখোমুখী হয়েছেন। কাহিনীগত দিক থেকে এই দুই কাহিনী কাব্যের মিল থাকলেও প্রকরণগত পার্থক্য বিস্তর। স্পেন্সার সর্বত্র একই ছন্দে স্পেনসারীয়ান স্তবকের সাহায্যে কাহিনীটি বর্ণনা করেছেন। তার কাহিনীতে অনেকগুলো এপিসোড বা পার্শ্বঘটনা আছে যা শুধুমাত্র চেতনাগত দিক থেকেই একে অপরের সঙ্গে সংযুক্ত। গ্যাটে রচিত

'ফাউস্ট'-এ অনেকটা এই রীতি অনুসৃত হয়েছিল। এসব কারণে প্রকরণগত দিক থেকে তাঁর "হাতেম তা'য়ী" উল্লেখযোগ্য সৃষ্টিকর্ম। কিন্তু পরিশোধিত মহাকাব্যের যে প্রধান বৈশিষ্ট্য বর্তমানকে অতীতের সংগে সংস্থাপন করে তার নবমূল্যায়ন করা, তা তাঁর কাব্যে নেই। এই কারণে এই কাব্যটিকে বড়জোর 'ফেয়ারী কুইন'-এর মত রোমান্টিক এপিকের গোত্রভুক্ত করা যেতে পারে। কিন্তু পরিপূর্ণ মহাকাব্যের মর্যাদা দেয়া যেতে পারে না।

সবশেষে আবার ফিরে যাওয়া যাক ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শাশ্বত কবিসত্তাটির কাছে। জীবনাচরণে ও শিল্পাচরণে তিনি পরিপূর্ণ এক সত্তা, যে সত্তা সর্ব-অর্থে মানবতার মুক্তি কামনা করেছে ব্যক্তি-আত্মার পুনর্জাগরণের মাধ্যমে। এ শুধু জাগরণই নয়, এ ডাহুকের (ডাহুকের ডাক মুমিনের জিকিরের প্রতীক) কণ্ঠনিঃসৃত রক্তের উষ্ণ পরশে ডিম থেকে নতুন ডাহুকরূপী মানবাত্মার জাগরণের স্মারকও বটে। রূপদক্ষ ও শাশ্বতের স্পর্শধন্য এই কবি এভাবেই শিল্প, জীবন ও বিশ্বাসের মধ্যে একটি স্ববিরোধহীন সমীকরণকে মেলাবার প্রয়াস পেয়েছিলেন।

www.pathagar.com

সৈয়দ আবুল মকসুদ

তাঁর স্বপ্নরাজ্যে তিনি একা

আধুনিক বাংলা কবিতার দুই পরাশক্তি রবীন্দ্রনাথ ও নজরুল যখন তাঁদের সৃজনশীলতার স্বর্ণকাল অতিক্রম করেছেন সেই বিশের ও তিরিশের দশকেই আবির্ভাব হয় কতিপয় বৃহৎ শক্তির, যাঁরা উল্লিখিত দুই পরাশক্তির আওতায় অপেক্ষাকৃত বাইরে পৃথক পৃথক পরিমণ্ডল সৃষ্টির আরাধনায় নিয়োজিত হন। তাতে তেমন কোনো ভূকম্পন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব না হলেও একটি সম্মিলিত জোট-নিরপেক্ষ শক্তির সূচনা হয়। এই জোট-নিরপেক্ষ শক্তির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সদস্য হলেন মোহিতলাল, সুধীন্দ্রনাথ, জসীম উদ্‌দীন, জীবনানন্দ, বুদ্ধদেব বসু, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ। এঁদের অব্যবহিত পরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে, বাংলা কাব্যে এক সম্পূর্ণ নতুন সুর ও জীবনাদর্শের আমদানী করেন অমিততেজ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ছিলেন এক বেপরোয়া অভিযাত্রিক, কিন্তু তাঁর অভিযাত্রায় তিনি ছিলেন একা, কোনো সহযাত্রী বা অনুগামী ছিলো না তাঁর, তাঁর অনুগামী হওয়াও সম্ভব ছিলো না এ কালের আর কোনো শক্তিশালী কবির পক্ষে। কারণ একাধারে শিল্পী ও মিশনারী ছিলেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, একটি রেখে অপরটি বর্জন তাঁর পক্ষে ছিল অসম্ভব। তিনি তাঁর জীবনবেদ ও জাতীয় সামাজিক মতাদর্শ পরিবেশন করার পাত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কবিতাকে। এ কারণে তাঁর কবিতাই তাঁর জীবনবেদ, তাঁর জীবনবেদই তাঁর কবিতা।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ব্যক্তিগত জীবনাদর্শ এবং তাঁর কাব্যের দর্শন আগাগোড়া একই সমান্তরাল রেখায় প্রবাহিত হয় নি। পথ ও মতের পরিবর্তন ঘটেছে তাঁর জীবনেও, তবে ঘটেছে একবার—মাত্র একবার।

রিপন কলেজ থেকে ১৯৩৯ সালে আই. এ. পাস করে স্কটিশ চার্চ কলেজ এবং সেন্ট পল কলেজে দর্শন এবং ইংরেজিতে কিছুকাল পড়াশোনা করেন। এ সময় প্রখ্যাত বিপ্লবী কম্যুনিস্ট এম. এন. রায়ের মতাদর্শের প্রতি তিনি অনুরক্ত হন এবং র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্টদের সংস্রবে চলে যান। এটি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তার অল্প কিছুকাল পরের কথা। তবে বামপন্থী বিপ্লবীদের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নি। বিশ্বযুদ্ধের দাবানল নিভতে যাবার আগেই ফর্‌রুখের মতাদর্শ মোড় নেয়। কৃষক-শ্রমিক-মেহনতী মানুষের মুক্তির ব্যাপারে প্রতিশ্রুত বলেই তিনি কম্যুনিস্টদের সংস্পর্শে

www.pathagar.com

আসেন এবং তাঁদের সংগে কাজ করতে থাকেন। তবে লাহোর প্রস্তাব পাস হবার পর মুসলমানদের জন্যে পৃথক রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের দাবী যতোই জোরদার হচ্ছিলো, ততোই তিনি সমাজবাদী শিবির থেকে প্রত্যক্ষভাবে দূরে সরে যেতে থাকেন। তারপর এক সময় একেবারে বিপরীত বলয়ে চলে যান, কিন্তু মানবতাবাদের মূলমন্ত্র থেকে আমৃত্যু তিনি একচুলও বিচ্যুত হন নি। তাঁর কাব্যের ইসলাম আর ধর্মান্ধদের ইসলামের মধ্যে ব্যবধান সাত সাগরের।

সমাজতন্ত্রী বিপ্লবীদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়েই যে তিনি ইসলামের জীবনাদর্শে সমর্পিত হন তা অনুমান করা ঠিক নয় এ জন্যে যে, কোন দিন তিনি কম্যুনিস্টদের সম্পর্কে কটূক্তি করেন নি। তবে তিনি তাঁর নিজের মতাদর্শের প্রতি অবিচল এবং অমিততেজে প্রচারও করেছেন। ধীরে ধীরে ফর্‌রুখ হয়ে ওঠেন কবি ও প্রচারক। তিনি বস্তুবাদের বিরোধিতা করেছেন কিন্তু মানবতাবাদী ছিলেন আমৃত্যু। জড়-সভ্যতাকে তিনি জাহান্নামের দ্বারপ্রান্তে নিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, এ চাওয়ার মধ্যে কোনো ফাঁকি ছিলো না, কোনো স্বার্থ ছিলো না।

যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ধনতন্ত্র ও অন্যান্য সামাজিক বিস্ফোটকের বিরুদ্ধে কলম তুলে নিয়েছিলেন কবিজীবনের শুরুতে এবং শপথ নিয়েছিলেন যতোদিন ধনতন্ত্রের কবর খোঁড়া না হচ্ছে ততোদিন কলম অব্যাহত চালাবেন, সেই ফর্‌রুখ আহ্‌মদ পাকিস্তান জন্মের প্রাক্কালে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। এই পুনর্জন্মের পিছনে যে কোনো স্বার্থবুদ্ধি ছিলো না, তা তাঁর মহাশত্রুও স্বীকার করে থাকেন। পাকিস্তান হবার পর তিনি চেয়েছিলেন বাঙালী মুসলমানের বিকাশ,কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে হলো তা বিঘ্নিত। আঘাত পেলেন তিনি, প্রচণ্ড আঘাত। শাসক সমাজের অপকীর্তি অজ্ঞাত থাকলো না তাঁর কাছে। কিন্তু এ অবস্থার মধ্যেও তাঁর মতাদর্শে তিনি রইলেন অনড়।

১৯৪৭ সালে কিছুদিন কলকাতা পার্ক সার্কাসে সিকান্দার আবু জাফর আর তিনি এক মেসে থাকতেন। নিজের কথা ফর্‌রুখ কোনোদিন নিজে বলতেন না, কি সিকান্দার আবু জাফরের সঙ্গে আমাদের মধ্যে যাদের ঘনিষ্ঠতা ছিলো তারা শু তৎকালীন ভারতীয় বামপন্থী আন্দোলনে তিনি নিজেকে কিভাবে নিয়োজিত করেছি । সুভাষ মুখোপাধ্যায়দের সঙ্গে এই সময়ই গড়ে ওঠে তাঁর বন্ধুত্ব; সে বন্ধুত্ব ত্যু ছিলো।

পাকিস্তান সৃষ্টি বাঙালী উচ্চ মধ্যবিত্তদের সামনে এই নগদ প্রাপ্তির দা খুলে দেয়। এই দরোজা দিয়ে ঢুকে অনেকেই রাতারাতি আঙুল ফুলে কলাগাছ ছে, কিন্তু বেশীর ভাগই যাঁরা কৃষক শ্রমিক কামার কুমার মেহনতী মানুষ তাঁরা ক ন অন্ধকার এক বিপজ্জনক প্রান্তরে প্রবেশ। ফর্‌রুখ ছিলেন শেষ দলটির পক্ষে পরিতাপের বিষয়, তাঁর কাব্যচর্চা পরোক্ষভাবে মদদ জুগিয়েছে প্রথম দলটিকে, সক শোষক।

ইসলামের মুখোশধারী সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান জনসাধারণ নিয়ে গঠিত পাকিস্তানে নেতাদের ওয়াদা মোতাবেক প্রতিষ্ঠিত হবে ইসলামী হুকুমত এবং যেহেতু ফর্‌রুখ বিশ্বাস করতেন যে, ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনব্যবস্থা; তাই ঐসলামিক ধর্মাচার ও দর্শনের প্রতি নিজেকে সমর্পণ করেন তিনি, তার ছাপ পড়ে তাঁর কাব্যে, প্রবলভাবে। গত হাজার বছরে নানা ঘাত-প্রতিঘাত এবং মুসলমানদের আলস্যের কারণে ইসলামের প্রচণ্ড শক্তির যে সুধা শুকিয়ে গিয়েছিলো, তিনি সর্বান্তঃকরণে চেয়েছিলেন তার পুনরুদ্ধার, তাই ইসলামের পুনর্জাগরণের স্বপ্নে বিভোর ছিলেন তিনি। তা ছাড়া ইসলামের ন্যায় বিচার ও সাম্য-মৈত্রীর আদর্শে অবিচল আস্থা ছিলো তাঁর।

যশোরের এক সচ্ছল ও সম্ভ্রান্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। কলেজ জীবন পর্যন্ত দামী পোশাক-পরিচ্ছদ পরতেন তিনি। বিপ্লবী রাজনীতির সংস্পর্শে আসার পর সেই বিলাসিতা তিনি বর্জন করেন এবং আমৃত্যু ইস্তিরী ছাড়া মারকিনের পাজামা-পাঞ্জাবীই ছিলো তাঁর পোশাক। অর্থাভাবে বিনা চিকিৎসায় সন্তান-বিয়োগ ঘটেছে তাঁর। না খেয়ে থেকেছেন, তবু কারো কাছে তিনি হাত পাতেন নি। নিজেও বিনা চিকিৎসায় পুষ্টিহীনতায় মৃত্যুবরণ করেন। শামসুর রাহমানের ভাষায় ঃ তিনি মারা গেছেন একেবারে নিঃস্ব অবস্থায়।

অমিততেজ ও উদ্ধত ফর্‌রুখ যদি পাক-শাসকদের প্রতি একটু মৃদু হেসে তাকাতেন, তা হলেই ফিরে যেতো তাঁর জাগতিক অবস্থা। কিন্তু তিনি ঘৃণার সঙ্গে তাঁদের থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছেন আজীবন। তাঁর বিশ্বাসে কোনো খাদ ছিলো না, তাঁর বক্তব্য ছিলো স্পষ্ট ঋজু ও দ্ব্যর্থহীন। পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বাঙালী স্তাবকদের সংখ্যা খুব সীমিত ছিলো না, এ ব্যাপারেও তিনি ছিলেন স্পষ্ট। তিনি লিখেছিলেন ঃ

> পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ নিয়ে যথেষ্ট বাদানুবাদ চলছে। আর সবচাইতে আশার কথা এই যে, আলোচনা হয়েছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে, জনগণ ও ছাত্র সমাজ অকুণ্ঠভাবে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছেন। সুতরাং এটা দৃঢ়ভাবেই আশা করা যায় যে, পাকিস্তানের জনগণের বৃহৎ অংশের মতানুযায়ী পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নির্বাচিত হবে।
>
> যদি তাই হয়, তাহলে এ কথা নিশ্চিতভাবেই বলা যায় যে, বাংলা ভাষাই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে। কেন হবে এ নিয়ে পুনরাবৃত্তি করতে চাই না। কিন্তু একটা কারণে আমাকে বাধ্য হয়ে দু'একটি কথা প্রসঙ্গত বলতে হচ্ছে।
>
> কিস্তানের, অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা যে বাংলা হবে এ কথা ᷊দীসম্মত হলেও আমাদের এই পূর্ব পাকিস্তানেই কয়েকজন তথাকথিত ᷊ ব্যক্তি বাংলা ভাষার বিপক্ষে এমন অর্বাচীন মত প্রকাশ করছেন যা লজ্জাজনক। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপান্তরিত করলে ইসলামী সর্বনাশ হবে এই তাঁদের অভিমত।

কী কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পিছনে কাজ করছে এ কথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি। যে মনোবৃত্তির ফলে প্রায় দু'শো বছর বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিলো, সেই অন্ধ মনোবৃত্তি নিয়েই আবার আমরা ইসলামকে গলা টিপে মারার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছি। [সওগাত, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৪৭]

যে ইকবাল ছিলো তাঁর আদর্শ কবি সেই ইকবালের ভাষা উর্দুকে যখন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার ষড়যন্ত্র করছিলো প্রতিক্রিয়াশীলরা, তখন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আরো কঠোর ভাষায় তাঁদের নিন্দা ও তাঁদের চক্রান্তের প্রতিবাদ করেন। এতেও ফর্‌রুখের ভেতরের চেহারা উদ্ভাসিত হয়েছে। সততা, আপোসহীনতা ও অনমনীয়তাই ছিলো তাঁর চারিত্র।

২.

স্বনামে, ছদ্মনামে অজস্র কবিতা লিখলেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার বই-এর সংখ্যা খুব বেশী নয়। "সাত সাগরের মাঝি"র (১৯৪৪) পর তাঁর জীবদ্দশায় যে সব কাব্যগ্রন্থ ও কাব্যনাটক প্রকাশিত হয়েছে সেগুলো 'সিরাজাম মুনীরা' (১৯৫২), 'নৌফেল ও হাতেম' (১৯৬১), 'মুহূর্তের কবিতা' (১৯৬৩), 'হাতেম তা'য়ী' (১৯৬৬), এবং 'নতুন লেখা' (১৯৬৯)। তাঁর শিশু-কিশোর বইগুলো হলো : 'পাখীর বাসা' (১৯৬৫), 'হরফের ছড়া' (১৯৭০) এবং 'ছড়ার আসর' (১৯৭০)। কবির মৃত্যুর পরপর, তাঁর প্রথম মৃত্যুবার্ষিকীতে ১৯৭৫-এ ফর্‌রুখ স্মৃতি তহবিল চট্টগ্রাম থেকে আবদুল মান্নান সৈয়দ-এর সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। ১৯৭৬ সালে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর সম্পাদনায় বেরোয় 'হে বন্য স্বপ্নেরা'। সর্বশেষে প্রকাশিত হলেও এ বইতেই স্থান পেয়েছে কবির প্রথম দিকের রচনা। এ ছাড়া ১৯৫২-তে প্রকাশিত ইকবালের কবিতাতে আবুল হোসেন এবং সৈয়দ আলী আহসানের সঙ্গে গ্রথিত হয়েছে ফর্‌রুখ আহ্‌মদেরও অনূদিত একগুচ্ছ কবিতা। আহ্‌মদ পাবলিশিং হাউস এবং বাঙলা একাডেমীর যৌথ উদ্যোগে বেরিয়েছে মোহাম্মদ মাহ্‌ফুজউল্লাহ্‌ এবং আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত 'ফর্‌রুখ রচনাবলী'র প্রথম খণ্ড। তবে এখানে ঐতিহাসিক কারণে উল্লেখ করা দরকার যে, ১৯৪৬-এ কলকাতা 'মৃত্তিকা সাহিত্য সদন'-এর পক্ষ থেকে কাজী আফসারউদ্দীন আহ্‌মদ 'আজাদ করো পাকিস্তান' নামে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিশ পৃষ্ঠার কবিতা ও গানের একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন। এটি আর কখনো পুনর্মুদ্রিত হয় নি, 'ফর্‌রুখ রচনাবলী'র প্রথম খণ্ডে এটি সংযোজিত হয়েছে।

ফর্‌রুখের কবি-জীবনের একটি রাজনৈতিক ও সামাজিক পটভূমি রয়েছে, যার উল্লেখ ছাড়া তাঁর কাব্যবিচার প্রায় অসম্ভব। "১৯৪০ সালে ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাব পাস হওয়ার পর মুসলমানদের স্বাধীনতা, আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্ম-বিকাশের লক্ষ্যে সূচিত

www.pathagar.com

হয় রেনেসাঁ আন্দোলন। ১৯৪১ সালে কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটি। রাজনীতি, শিক্ষা, তমদ্দুন, সাহিত্য, অর্থনীতি এককথায় জীবনের সর্বক্ষেত্রে স্বকীয়তার সাধনা এবং আত্মশক্তির উদ্বোধনই ছিলো এই আন্দোলনের অভীষ্ট লক্ষ্য।"[১]

কিছুকাল পরে ফর্‌রুখ এই রেনেসাঁ সোসাইটির মতাদর্শের প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েন এবং এ জন্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বাঙালী মুসলমানের একটি স্বতন্ত্র সুর ও সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে কাজ করতে থাকেন। এ ব্যাপারে তিনি মুসলমাদের রচিত পুঁথি-সাহিত্যের ভাণ্ডারে হাত বাড়িয়ে দেন। সেখানে প্রচুর মাল-মসলা পেয়েও যান। সে সব মাল-মসলার অর্থাৎ ইসলামী পুরাণের পুনর্ব্যবহার করতে থাকেন আধুনিক প্রকরণে। এ করে তাঁর কাব্যে নির্মিত হয় এক নতুন ডিকশন ভাষাভঙ্গি। একটি জিনিস অতি স্পষ্ট যে, কবি-জীবনের শুরুতে ফর্‌রুখের কবিতায় পুঁথি সাহিত্যের আরবী-ফারসী শব্দ খুব কমই ব্যবহৃত হয়েছে। পরবর্তীতে অপ্রচলিত শব্দ ভারাক্রান্ত করে ফেলেছে তাঁর কাব্যের শরীর, আবার কখনো করেছে দীপ্তিমান। নিজের কবিতা সম্পর্কে ফর্‌রুখ তেমন কিছু বলেন নি। ১৯৭০ সালে ঢাকার বেতার ভবনে কবি আজিজুর রহমানের কল্যাণে কয়েক মিনিটের জন্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে তাঁর সাহিত্যদর্শন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার দুর্লভ সুযোগ পেয়েছিলাম। দু'চারটি কথায় যেটুকু জেনেছিলাম তার সারাংশ এ রকম ঃ পৃথিবীর বহু সভ্য জাতি যুগ যুগ ধরে তাঁদের মহাকাব্য থেকে—তাঁদের বীরগাঁথা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ ক'রে থাকে, যেমন গ্রীকদের ইলিয়াড অডিসি, হিন্দুদের রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদি। বাঙালী মুসলমানদের কোনো মহাকাব্য নেই। আরব্য রজনীর রূপকথায় যে মহাকাব্যিক উপাদান ছড়িয়ে আছে, যে বীর কাহিনী রয়েছে, তা যে কোনো নিস্তেজ ঘুমন্ত মুসলিম জাতিকে জেগে উঠতে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। এ বোধ থেকে সিন্দাবাদ, হাতেম তা'য়ী, শাহরিয়ার, শাহেরজাদী, নৌফেল প্রভৃতি রূপকথার নায়ক-নায়িকাদের বাংলা কাব্যে তুলে নিয়ে এসেছেন তিনি।

যাই হোক যে কোন মৌলিক কবির কাজই গতানুগতিক পুরোনো পথ থেকে, নিরীক্ষার নতুন রাস্তায় চলা। ফর্‌রুখ ছিলেন মৌলিক ও নিরীক্ষাধর্মী কবি। ইসলামের পুনর্জাগরণের কবি হিসাবে তাঁকে অভিহিত করা হয় এবং তা সঙ্গতভাবেই। তাঁর আগে নজরুল ইসলাম ইসলামী পুরাণ প্রয়োগে এবং আরবী-ফারসী শব্দাবলীর ব্যবহারে অতুলনীয় দক্ষতা দেখিয়েছেন। তবে নজরুল আর ফর্‌রুখ এক ধারার কবি নন। তাঁদের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যেও দুস্তর ব্যবধান। বলা বাহুল্য, ফর্‌রুখ নজরুলের অনুকারকও নন। মাইকেল এবং ইকবাল ছিলেন ফর্‌রুখের প্রিয় কবি, তাঁর আদর্শ কবি। যদিও তিনি তাঁদের অন্ধ অনুকরণ করেন নি। যে মহাকাব্য দু'টি তিনি জীবনে

---

১. ফর্‌রুখ রচনাবলী, ১ম খণ্ড : পরিশিষ্ট, পৃঃ ৩০৮।

www.pathagar.com

সংখ্যাহীন বার পড়ে প্রায় মুখস্থ করে ফেলেছিলেন তা হলো 'ফাউস্ট' এবং 'মেঘনাদবধ কাব্য'।

এ যুগের বাংলা কবিতায় ফর্‌রুখের মত বিষয় এবং প্রকরণ-সচেতন কবি আর নেই বললেই হয়। নানা ছন্দে যেমন তিনি লিখেছেন, তেমনি বিভিন্ন প্রকরণেও তিনি ঢেলেছেন তাঁর চিন্তা ও জীবনদর্শনকে। গীতিকবিতা, গাঁথা, সনেট, অনুবাদ কবিতা, নাট্য কবিতা, কাব্যনাট্য, মহাকাব্যসুলভ কাহিনীকাব্য, কবিতা, গান, প্রভৃতি নানা দিকে তিনি নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেব বসুর পরে ফর্‌রুখ আহ্‌মদই সম্ভবত ফর্ম নিয়ে বেশী অনুশীলন করেছেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রতিটি কবিতার বই-ই অনন্য, "সাত সাগরের মাঝি"র সুন্দর কবিতাবলীর মতোই আশ্চর্য নিটোল তাঁর 'মুহূর্তের কবিতা' সনেটগুচ্ছ। এমন কি ধর্মীয় আবেগে আপ্লুত 'সিরাজাম মুনীরা'র কবিতাগুলোতেও অসাধারণ সুন্দর কাজ রয়েছে। নজরুলের 'উমর ফারুক' আর ফর্‌রুখের 'উমর-দারাজ দিল'-এর মধ্যে মিল ও দূরত্ব রয়েছে বটে, কিন্তু দুটিই সুখপাঠ্য কাহিনী-কবিতা। সুশাসকের প্রতীক হিসেবে বন্দিত উমর; তাই তিনি বলেন ঃ

> আজকে উমর-পন্থী পথীর দিকে দিকে প্রয়োজন
> পিঠে বোঝা নিয়ে পাড়ি দেবে যারা প্রান্তর প্রাণ-পণ,
> ঊষর রাতের অনাবাদী মাঠে ফলাবে ফসল যারা,
> দিক-দিগন্তে তাদেরে খুঁজিয়া ফিরিছে সর্বহারা!
> যাদের হাতের দোররা অশনি পড়ে জালিমের ঘাড়ে
> যাদের লাথির ধমক পৌঁছে অত্যাচারীর হাড়ে,
> সে ভয়ঙ্কর, সেই প্রশান্ত মধ্যদিনের রবি,
> এই মজলুম দুনিয়ার খা'ব—নিত্যদিনের ছবি।

কবি-জীবনের শুরুতে মার্কসবাদের দীক্ষা থেকেই হোক আর পরবর্তীতে ইসলামের আদর্শ থেকেই হোক, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সর্বহারা ও মজলুম (শব্দ দুটি উপর্যুপরি ব্যবহৃত হয়েছে তাঁর কাব্যে) জনতার পক্ষেই ছিলেন। সারাজীবন তিনি জালিম ও অত্যাচারীকে শয়তানের মতো ঘৃণা করতেন। তা করতে গিয়ে ধীরে ধীরে তিনি প্রচারক ও নীতিবাদী হয়ে পড়েন; তাঁর কবিতায় বক্তব্য প্রাধান্য পেতে থাকে, কখনো কখনো কাব্যগুণ নষ্ট করেই। তা হ'লেও তাঁর 'নৌফেল ও হাতেম', এবং 'হাতেম তা'য়ী' দুটি স্মরণীয় সৃষ্টি। পুরাণে আধুনিক ও নতুন পোশাক পরানোর প্রয়াস পৃথিবীর সকল ভাষায় বিদ্যমান, ফর্‌রুখও সচেতনভাবেই চেয়েছিলেন তাই। তবে 'মেঘনাদবধ কাব্যে' রাবণই নায়ক ফর্‌রুখের কাব্যে কিন্তু হাতেম নয় নৌফেল নায়ক। ষাটের আইয়ূবের অত্যাচারী দশকেই প্রকাশিত হয় 'নৌফেল ও হাতেম' :

www.pathagar.com

একবার ভেবো না তুমি, অত্যাচারী জালিমের ভয়ে
থেমে যাবে মানুষের মনুষ্যত্ব। জুলুম-শাহীর
ত্রাসনে হয় নি শেষ কোনোদিন ধর্ম, নীতি; শুধু
মিশে গেছে জালিমের নাম ও নিশানা।

অথবা—

এ মাটিতে,
হীন স্বার্থে কলংকিত জুলমাতের হিংস্র অন্ধকারে
যেখানে দুর্লভ জানি মনুষ্যত্ব, মর্দমী, সেখানে
হাতেম তা'য়ীর ত্যাগ অন্তহীন দরিয়ার মতো,
হাতেম তা'য়ীর শির পর্বতের মতো মহীয়ান,
সুবহে উম্মীদের মতো মুখ তার উজ্জল রওশন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ মানবতার কবি। হাতেম তা'য়ী তাঁর কাছে পরিপূর্ণ মানবের প্রতীক। দুঃসাহসী, সৎ ও কর্মঠ মানুষের উপমা ও প্রতিভূ হাতেম। তাই হাতেমকে নিয়ে তিনি রচনা করেন মানবতাবাদী কাব্য "হাতেম তা'য়ী"। এটিও একটি উল্লেখযোগ্য অনন্যসাধারণ কাহিনী-কাব্য। মধ্যষাটে এ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। জালিমের অত্যাচার বাড়ছে, অপরদিকে অধিক সংখ্যক লোক দিন দিন সর্বহারা হচ্ছে এটা অনুভব করে অতীত ও স্বপ্নচারী কবি প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিলেন। তবে ভাষার কারণে দিন দিন পাঠকের সঙ্গে তাঁর একটি দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে; তাঁর পাঠকের অভাব ছিলো না কোনোদিনই, কিন্তু তিনিই সচেতনভাবে পাঠক-রুচিকে অগ্রাহ্য করেছেন। অবশ্য সহজখ্যাতিতে আস্থা ছিলো না তাঁর, আত্মপ্রচারেও ছিলেন তিনি বিমুখ :

মনে রেখো পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কর্মী শ্রেষ্ঠ সে খাদিম
চায় না সুলভ খ্যাতি যে আত্মপ্রচারে, মিশে থাকে
দুঃখে-সুখে মানুষের এ প্রাণ-প্রবাহে—

[নৌফেল ও হাতেম]

আত্মপ্রচার করে সুলভ খ্যাতি তিনি পান নি, অসামান্য কর্মের বিনিময়েই তিনি পেয়েছেন জীবদ্দশাতেই প্রচুর খ্যাতি। কিন্তু সেই খ্যাতি কুড়িয়ে সমাজের দশজন মানুষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উপরে উঠে আসেন নি। আমৃত্যু মিশেছিলেন দুঃখে-সুখে মানুষের প্রবাহে।

হযরত মুহম্মদ (সঃ)-এর উপর যতো কবিতা বাংলা কাব্যে রচিত হয়েছে, তাঁর মধ্যে নজরুলের 'ফাতেহা দোয়াজদাহাম' এবং ফর্‌রুখের 'সিরাজাম মুনীরা'ই শ্রেষ্ঠ। 'সিরাজাম মুনীরা'-এর মতো শুধু ধর্মীয় কাব্যগ্রন্থ নয় 'হাতেম তা'য়ী'র মতো অসামান্য

www.pathagar.com

কাহিনী কাব্য নয়, অজস্র রোমান্টিক নিটোল কবিতাও রয়েছে তাঁর। তাঁর কবিতায় রোমান্টিকতা ও মননশীলতা ছিল পাশাপাশি—একাধারে ছিলেন তিনি রোমান্টিক ও ক্লাসিক, স্বাপ্নিক ও বাস্তববাদী, আধ্যাত্মিক ও সচেতন জীবনবাদী কবি। তা ছাড়া তিনি বাংলা ভাষার শ্রেষ্ঠ প্রতীকী কবিদের একজন। তাঁর 'সাত সাগরের মাঝি'তেই আমরা প্রত্যক্ষ করি প্রতীক রূপকের আশ্চর্য ও নিপুণ ব্যবহার। সমুদ্র, জাহাজ, নাবিক, বন্দর ইত্যাদি প্রতীক বারবার ঘুরে ঘুরে এসেছে তাঁর কাব্যে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সনেট উৎকর্ষতায় বাংলার শ্রেষ্ঠ সনেটগুলোর সমান। যদিও তাঁর ক্ষমতার সিংহভাগই ব্যয় হয়েছে অন্যত্র ভিন্ন ধরনের কবিতায়।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এই শতকের বাঙালী কবিদের একজন; কিন্তু তিনি নিজে হতে চেয়েছেন বাঙালী মুসলমানের কবি-সমাজের একটি অংশের কবি। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ কবি বলেই তাঁকে বিচার করতে হবে সমগ্র বাংলা কাব্যের পটভূমিতে। সেটা করতে গেলেই ধরা পড়বে তাঁর বড়ত্ব ও সীমাবদ্ধতা। ফর্‌রুখের প্রশংসায় পঞ্চমুখ এমন কবি-সমালোচকের সংখ্যা এ দেশে প্রচুর, কিন্তু এই কবি এ দেশে তাঁর একটি দুর্বল উত্তরসুরিও রেখে যেতে পারেন নি, পারেন নি তাঁর সমকালের কাব্যসাহিত্যকে প্রভাবিত করতে; তাতে তাঁর নিজের কাব্যের কোন ক্ষতি হয় নি, কিন্তু সম্প্রসারিত হয় নি আমাদের কাব্যের জগৎ। তাঁর অনুজ কবিরা তাঁকে বিগলিত হয়ে মুখে তারিফ করেছেন, কিন্তু সচেতনভাবে সরে থেকেছেন দূরে। তাঁকে অনুসরণ করলে ইতিহাসের পিছনের দিকে যেতে হবে, তাই তাঁর উত্তরসুরি বা অনুসারী হওয়া সম্ভব নয়, হ'লে হতে হবে তাঁর অক্ষম তালেব-ইলেম, তা হতে চান নি কেউ।

চল্লিশের সেই উত্তাল উষ্ণ ও দুঃখের দশকে যে সব কবির আবির্ভাব, তাঁদের মধ্যে সুকান্ত এবং ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ক্ষমতা এবং সম্ভাবনা ছিলো সবচেয়ে বেশী—এমন কি তাঁদের অন্তরঙ্গ বন্ধু শক্তিশালী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের চেয়েও বেশী। কিন্তু বাঙালী কবিদের কাফেলায় ফর্‌রুখ আহমদ হেঁটেছেন বলিষ্ঠ পদক্ষেপে নিজস্ব ভঙ্গীতে, কিন্তু একা। অবশ্য সেখানেই তাঁর বৈশিষ্ট্য, সেখানেই তিনি অনন্য। তবে নিঃসন্দেহে চিরকাল এ কথা স্বীকৃত হবে যে, বাংলা কাব্যসাহিত্যের সাগরে মূল্যবান মাল-মসলা নিয়ে এক বিরাট কিশতীতে তিনি পাড়ি দিয়েছেন দুঃসাহসিক সিন্দাবাদের মতো।

www.pathagar.com

সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম

কাল-সচেতন ফর্‌রুখ : তাঁর কবিতা

১.

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় সমুদ্রমন্থনের শব্দ শোনা যায়। সমুদ্রের বিশালতা, ব্যাপ্তি ও গভীরতা তাঁর কাব্যের প্রকৃষ্ট সংজ্ঞা। সুদূরপ্রসারী কল্পনা, নিজস্ব কৃষ্টি-সংস্কৃতিতে অটল বিশ্বাস, মুসলিম রেনেসাঁর নতুন মূল্যায়ন এবং তাঁর কাব্যে এর ভিন্নতর প্রতিফলন ও কোন কোন ক্ষেত্রে আরেক রেনেসাঁর দিগন্ত উন্মোচন, এসব তাঁর কবিতাকে চিহ্নিত করার জন্য তাঁর কাব্যসাধনার শুরু থেকে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। কিন্তু তাঁর কবিতার এই অন্যতম প্রধান রূপকটির মধ্যেই সমুদ্রের মত ব্যাপ্ত ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতাকে মাত্র ক'টি অনুষঙ্গেই চিহ্নিত ও সীমিত করা তাঁর কবিতার সর্বগামিতাকে পরিহাস করা মাত্র। তিনি আমাদের সময়ের বোধ করি সবচেয়ে নিঃসঙ্গ কবি। অবশ্য তা শুধুমাত্র আত্মিক অর্থে নয়, তাঁর নিঃসঙ্গতা, তাঁর কাব্যের মতই, সমসাময়িক কাব্য আন্দোলনসমূহের সঙ্গে অসঙ্গতিজনিত। তার বড় কারণ ফর্‌রুখ আহমদ অত্যন্ত সচেতন শিল্পী। আত্মসচেতন ও স্বতন্ত্র। এবং অনেক ক্ষেত্রে লক্ষণীয়ভাবে ভাবাদর্শী। এই স্বাতন্ত্র্য, এই আত্ম-অভিমান ও ভাবাদর্শিতা তাঁর পক্ষে কাজ না করে তাঁর বিপক্ষে কাজ করেছে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর তাঁকে পাকিস্তানী আদর্শের প্রচারক বলেও আখ্যায়িত করা হয়েছে। তাঁর কবিতায় যে সুদূর অতীত বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিত্রিত হয়েছে, বলতে গেলে মুসলিম কিংবদন্তী ও ইতিহাসের পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা তাঁর কল্পনার রসায়নে আপ্লুত হয়ে ভাষা পেয়েছে; সেই কাব্যসৃষ্টির বিরল সৌন্দর্যকে মোটা দৃষ্টিতে ও যেভাবে স্থুলবুদ্ধিতে পাকিস্তানের ভিত্তিভূমি রচনার মাল-মসলা বলে বিবেচিত হয়েছে, আর তাঁকে নিয়ে এক শ্রেণীর পাঠক-সমালোচক-পৃষ্ঠপোষক যে উচ্চবাচ্য শুরু করলেন, তার ডামাডোলে তাঁর সত্যিকার কবিশক্তি অনুদ্‌ঘাটিত ও অনুল্লেখ্য থেকে গেল। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য, বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান কবি হয়েও এবং আধুনিক কবিদের অনেককেই কল্পনা ও কবিশক্তিতে অনেক দূরে ফেলে এসেও 'পাকিস্তানী' ও 'ইসলামী' বলে চিহ্নিত হয়ে তিনি স্থবির হয়ে পড়ে রইলেন। অথচ ত্রিশের দশকের অনেক কবি থেকে যে তিনি অনেক বেশী শক্তিশালী অনেক বেশী অনুভূতিশীল, অনেক বেশী গতিশীল, এটা কোন অতিকথন নয়, ঐতিহাসিক এবং বাস্তব সত্য। এই প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয় তাঁর তথাকথিত 'ইসলামী' বা 'পাকিস্তানী'

www.pathagar.com

কবিতাসমূহের পুনর্মূল্যায়ন নয়, যদিও সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে, সম্পূর্ণ নতুন ভূমি থেকে এদের পরীক্ষা করে দেখার সময় এসেছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যে একাধিক অর্থে আধুনিক ছিলেন, ত্রিশ দশকের অনেক কবির তুলনায় বহু উর্ধ্বে ছিল তাঁর সমাজচেতনা ও কালচেতনা, এ প্রবন্ধে তার উপর সামান্য আলোকপাতের চেষ্টা করা হবে। ত্রিশের দশকে বাঙলা সাহিত্যে যে বিস্ফোরণ হয়েছিল তার একটি শক্তি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, যদিও তাঁর অধিকাংশ লেখা চল্লিশ দশকে সম্পন্ন। কিন্তু ত্রিশ দশকের শেষার্ধে কিছু কিছু কবিতা রচিত হয়েছে তাঁর। সামগ্রিকভাবে ত্রিশ দশকের আন্দোলনের অগ্রযাত্রার তিনিই ছিলেন শেষ কাণ্ডারী।

২.

মুসলিম নবজাগরণ উপমহাদেশের ধ্যান-ধারণা ও চিন্তার জগতে একটি সুদীর্ঘ ছায়াপাত করেছিল। মুঘল আমলের শেষদিকে যে অনিশ্চয়তা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি-চেতনার ভিত্তিমূল কুরে খাচ্ছিল, বৃটিশ সাম্রাজ্যের দু'শ বছরে তা-ই যেন প্রকাণ্ড হয়ে দাঁড়ালো। ধ্বংসের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ধর্মান্ধ সমাজ প্রাচীন কৃষ্টি ও তমদ্দুনের চাদরে নিজেকে জড়িয়ে রেখে আত্মপ্রসাদ লাভ করতে চেয়েছে, কিন্তু এই আত্ম-বিস্মরণ খুব সহজেই বাস্তবকে তুলে ধরতে সাহায্য করেছে। ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে মুসলিম সমাজ আত্ম-আবিষ্কারের তাগিদ অনুভব করতে লাগল। ঘটনাপ্রবাহ প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যেভাবে মোড় নিতে শুরু করল, তাতে এই সত্য পরিষ্কার হল যে, ভারতীয় উপ-মহাদেশ খণ্ডিত হবেই। স্বভাবতই মুসলমান সমাজ নিজস্ব বাসভূমির তাগিদ ও ঐতিহাসিক কারণে এই তাগিদের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি উপলব্ধি করতে লাগল। দু'টি বিশ্বযুদ্ধের মধ্যে তাই মুসলমান সমাজ মুক্তির স্বপ্নে আন্দোলিত হল; তাদের কৃষ্টি, কলা ও সাহিত্যকেও সর্বভারতীয় কৃষ্টি কলা ও সাহিত্য থেকে স্বতন্ত্র করতে বদ্ধপরিকর হল। কিন্তু সর্ব ভারতীয় কৃষ্টিতে মুসলমানের সক্রিয় অংশগ্রহণ, পৃষ্ঠপোষকতা ও বহুলাংশে এর পরিমার্জনা ও উন্নয়ন—এই সত্যগুলো সাময়িক নবজাগরণের পিছনে পড়ে রইল যাকে সামগ্রিক বাস্তবতা থেকে আলাদা করা যায় না বা যা আলাদা করার মানে সত্যকে শীর্ণ, সংকীর্ণ করে তোলা; এই অচ্ছেদ্য কৃষ্টিকেই তাঁরা খণ্ডিত করতে শুরু করলেন। এই সময়ে আমরা দু'জন কবির সাক্ষাৎ পাই যাঁদের কাব্য ভাবনায় বিস্তর অমিল থাকা সত্ত্বেও অন্ততঃ এক জায়গায় মিল ছিল। সেটা হল ইসলামের অতীত জয়যাত্রা ও তৎকালীন বিখ্যাত চরিত্রসমূহ, তাঁদের মহত্ত্ব, চারিত্রিক গুণাবলী ও অপরাজেয় মনোবলকে সমকালীন নবজাগরণের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে। এ দু'জন কবি হলেন ইকবাল ও কাজী নজরুল ইসলাম। বস্তুত এ দু'জন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে অনেকাংশে প্রভাবিত করেছেন। পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা ইকবালের কবিতায় আরব ও

www.pathagar.com

ইসলাম অত্যন্ত সজীব ও বাঙময় হয়ে ফুটে উঠেছে। এবং নজরুল ইসলামের কবিতায় খলীফা উমর বা খালেদ প্রভৃতি অত্যন্ত জীবন্ত হয়ে মূর্ত হয়েছেন। কিন্তু এঁদের কাব্যপ্রয়াস কোন খণ্ডিত চেতনার বহিঃপ্রকাশ নয়। তাঁরা প্রকৃত অর্থে সর্বভারতীয় ছিলেন, এলিয়ট-কথিত ব্যক্তি ও ঐতিহ্যের চমৎকার সমন্বয় পাওয়া যায় এঁদের কবিতায়। অবশ্য ইকবাল এ ব্যাপারে যতখানি বিশ্বজনীন ছিলেন, তার থেকে বেশী ছিলেন নজরুল ইসলাম। ইকবালের দার্শনিক মন সমকালীন চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছে কয়েকটি সম্ভাব্য পথের নির্দেশ দিয়ে এবং নজরুল একান্তভাবেই কবি ছিলেন বলে জোর দিয়েছেন মানবিক গুণাবলীর উন্মেষের উপর। কিন্তু বৃহদর্থে এ দু'জন কবি সমকালীন গণমানসকে উদ্বুদ্ধ করেছেন, চমৎকৃত করেছেন, এবং আন্দোলিত করেছেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রথাসিদ্ধ কবি ছিলেন, এ কথা সর্বৈব সত্যি নয়। মাঝে মাঝে তাঁর কবিতায় প্রথাবিরোধিতা, যা থীম থেকে শৈলীর ক্ষেত্রে বেশী প্রযোজ্য এবং নানানভাবে উচ্চারিত। (অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে তিনি বিচিত্রভাবে ব্যবহার করেছেন, মাত্রাবৃত্ত ছন্দকে নতুন ডাইমেনশনে স্থাপিত করেছেন; একদিকে মুক্তছন্দের সাবলীল গতিতে ভেলা ভাসিয়েছেন, অন্যদিকে সনেটের মত নিয়মনিষ্ঠ ও ধ্রুপদী সাহিত্যের শৃংখলা সমন্বিত কবিতাও রচনা করেছেন)। কিন্তু যখনি তিনি প্রথাসিদ্ধতার নকল ভূমিতে প্রবিষ্ট হয়েছেন, তখনি অনেকটা স্বেচ্ছায় তিনি তাঁর কল্পনা ও মননশক্তিকে শৃঙ্খলিত করেছেন। তুলনায় নজরুল ইসলাম (বা মোহিতলাল মজুমদার) অনেক বেশী স্বাধীন। নজরুল ইসলাম এসব hackneyed উপমা চিত্রকল্প ব্যবহার করেছেন সত্যি, কিন্তু ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিতে, ভিন্ন মেজাজে। ফলে তারা নতুন অর্থ লাভ করেছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যখন ইরান-তুরান বা আরবের দিকে দৃষ্টি মেলেন, কেন জানি না, তিনি এক ধরনের সবল উৎসাহ অনুভব করেন, এবং অনেক ক্ষেত্রে সেই অতীতে ঢোকার ছাড়পত্র হয়েছে তাঁর স্বচ্ছন্দ সাবলীল গতি ও ভাষার স্বচ্ছতা।

যে কারণে পুঁথিসাহিত্যে বিষয়ের সত্যাসত্য অপেক্ষা প্রকাশের ক্ষেত্রে বেশী প্রাধান্য দিত, সেই একই কারণে ফর্‌রুখ আহমদ অনেক ক্ষেত্রে বর্ণনাপ্রধান হয়ে পড়েছেন। পুঁথিসাহিত্য, বিশেষ করে মুসলমান পুঁথিলেখকের সৃষ্টিতে একটি বিশেষ কমপ্লেক্স প্রাধান্য পেয়েছে। হিন্দুদের যেমন দেবদেবীগণ অসম্ভবকে সম্ভব করে তুলে সাধারণ পাঠকের মনে বিস্ময়ের সৃষ্টি করতেন, সেরূপ মুসলমান পুঁথি সাহিত্যের বীরপুরুষরা অসম্ভবকে সম্ভব করার সাথে সাথে এমন সব কাজ করে বসতেন যা ধর্মীয় কষ্টিপাথরে অনুচিৎ বলে বিবেচিত হওয়া উচিত। হযরত হামজাকে নিয়ে রচিত পুঁথিতে তাঁর বীরগাঁথার পাশাপাশি তাঁর অসাধারণ শক্তির পরিচয় দানের জন্য তাঁকে অসংখ্য রমণীবেষ্টিত রাখা হয়েছে, তাঁর আয়ু হয়েছে একশ বছর। সাধারণ পাঠক এতে উৎফুল্ল

www.pathagar.com

হত, এবং বর্ণনার যাদুকরী গুণে সবকিছুই সম্ভবপর বলে মনে হত। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় উনবিংশ শতাব্দীর পুঁথি সাহিত্যের সচেতন ছাপ দেখা যায়। বিষয়বস্তু নির্বাচনে তিনি পুঁথিসাহিত্যিকদের মত সর্বজন পরিচিত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবিশেষের জীবন, বিশেষ অবস্থাসূচক ঘটনা ইত্যাদির প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়েছেন। কিন্তু পুঁথিসাহিত্যের সবচেয়ে বড় প্রভাব তাঁর বর্ণনাভঙ্গিতে। অত্যন্ত সচেতনভাবে শব্দকল্প রচনা ও চয়নের মাধ্যমে, আবহ নির্মাণের কুশলতায় ও নানা অপরিচিত শব্দ থাকা সত্ত্বেও পুঁথিসুলভ গতি ও স্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি তুলে ধরতে পেরেছেন। উদাহরণ :

১. কেটেছে রঙিন মখমল দিন ওজুদে চিকনা সরে,
তবু দূরচারী সফরের ঢেউ ভেসে এল বন্দরে,
হাতীর হাওদা ওঠাও মাহুত কিংখাব কর শেষ;

[সিন্দাবাদ]

২. ডাকে বাগ্‌দাদী খেজুর শাখায় শুক্লা রাতের চাঁদ
মাহগির বুঝি দজলার বুকে ফেলে জ্যোৎস্নার জাল,

[দরিয়ায় শেষ রাত্রি]

৩. যখন রক্তিম চাঁদ অন্ধকার তাজীতে সওয়ার
উঠে আসে দিগ্বলয়ে, ওয়েসিস নিস্তব্ধ নির্জন,
দূরে পাহাড়ের চূড়া ধ্যানমৌন—

[হাতেম তা'য়ী]

অর্থাৎ বর্ণনায় ফর্‌রুখ আহমদ অদ্বিতীয়। কিন্তু নিসর্গ তাঁর কাছে সৌন্দর্যমণ্ডিত প্রেক্ষাপটে—অথবা অপ্রাপ্ত সম্ভাবনা। আধুনিক কবিদের মতো নিসর্গকে তিনি জটিল মানসিক অবস্থার প্রতিফলন হিসাবে দেখেন নি। ইংরাজী কবিতার সমসাময়িক কবিরা যে অর্থে নিসর্গ ব্যবহার করেছেন বা তারো আগে এলিয়ট, অডেন যে অর্থে ব্যবহার করেছেন বা তাঁর সমসাময়িক বাঙালী কবিরা যে সূক্ষ্ম ও দূরবর্তী অর্থে নিসর্গ ব্যবহার করেছেন, তিনি সেই জটিল মানসিক বা আধ্যাত্মিক অর্থে নিসর্গ চিত্রিত করেন নি। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় নিসর্গ প্রধান উপস্থিত বিষয় নয়, যেমন জীবনানন্দ দাশের কবিতায়। তাঁর কবিতায় নিসর্গ বর্ণনামূলক এবং সহজ ও সরল অর্থে বর্ণিত। এজন্য তাঁর উপমা-চিত্রকল্প নিসর্গ-কেন্দ্রিক হলেও পুরোপুরি নিসর্গনির্ভর নয়। সমসাময়িক কালের অনেক বাস্তব চিত্রও তাঁর কাব্যে স্থান পেয়েছে। তথাপি এ কাজে তাঁর কুশলতা দেখে বিস্মিত হতে হয়। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার একটি বিশেষ গুণ হল এই যে, যে মেজাজে তিনি লিখতে শুরু করেন, যে অবস্থা বা অনুভূতি বা অভিজ্ঞতার বর্ণনা দিতে

www.pathagar.com

আরম্ভ করেন, রূপক উপমা চিত্রকল্পের স্রোতে কোথাও তা স্খলিত হয় না, নষ্ট হয় না। অভিজ্ঞতা, অনুভূতির এই সম্পূর্ণতা তাঁর কাব্যকে যথেষ্ট স্থৈর্য্য দিয়েছে, ব্যাপ্তি ও গভীরতা দিয়েছে। তাঁর উপমা-চিত্রকল্প রচনার পটুতার কয়েকটি উদাহরণ :

১. যেমন শীতের পাখী উড়ে গেলে রক্তিম পালক
পড়ে থাকে ক্ষীণস্রোতা নদী তীরে
......ফসলের
দিনশেষে রিক্তমাঠে শস্যদানা,

[হাতেম তা'য়ী]

২. উটের ঘন্টার শব্দে ম্লান মরু-বালু ওড়ে, মুছে যায় বেলা,

[কাফেলা]

৩. হীরার কুচির মত এ হৃদয় পৃথিবীর ক্রুর নিষ্পেষণে

[হীরার কুচির মত]

৪. তারাফুল ফোটানো সে কোন নলবনে গভীর মেঘের
ছায়াম্লান মাটির বাঁশরী সুর ভেসে চলে ডাহুকের

[মধুমতীর তীরে]

৫. আমার হৃদয় স্তব্ধ, বোবা হয়ে আছে বেদনায়
যেমন পদ্মের কুঁড়ি নিরুত্তর থাকে হিমরাতে
যেমন নিঃসঙ্গ পাখী একা আর ফেরে না বাসাতে।

[ক্লান্তি]

৬. রাত্রির পেয়ালা পুরে উপচিয়া প'ড়ে যায় ডাহুকের সুর
শুধু সুর ভাসে
বেতস বনের ফাঁকে চাঁদ ক্ষয়ে আসে
রাত্রির বিষাদ ভরা স্বপ্নাচ্ছন্ন সাতোয়াঁ আকাশে।

[ডাহুক]

এরকম অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায়। রূপ-রস-গন্ধময় নিসর্গ বর্ণনায় তিনি জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে তুলনীয়। জীবনানন্দ দাশ যেমন তাঁর ইতিহাস-ভূগোল চেতনায় সুদূর মিশর-ব্যাবিলনের চিত্রবর্ণনা দিয়েছেন অত্যন্ত রোমান্টিক মেজাজে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদও আরব-ইরানের যে-কোন বর্ণনায় তেমনি সাবলীল, রোমান্টিক। কিন্তু সর্বত্র এক জিনিস পাঠকের দ্রুত দৃষ্টি আকর্ষণ করে ঃ ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নিসর্গ বর্ণনায় উচ্ছ্বসিত নন কখনো, বরং একটি মৃদু বেদনা, কোমল অনুভূতি তাঁকে ঘিরে রেখেছে সবসময়।

www.pathagar.com

এই বেদনা কি তাঁর সহজাত অর্থাৎ যুগদেশকালের প্রতি সচেতন অনুভূতিসমূহের ভিতর প্রকাশ? মাত্র কয়েকটি উদাহরণ :

১. নৈশ কুকুরের ডাক মিশে যায়, দূরে মিশে যায়—
আমাকে ঘিরিয়া ফেলে মিশরের প্রেতায়িত স্বর

[অপসৃতা]

২. বর্ষার মেঘের নীচে ছায়াচ্ছন্ন আরিচায় এসে
মনে হ'ল পারঘাট যেন এক নিষ্প্রাণ কবর

[আরিচা-পারঘাট]

৩. যে চায় বাঁচতে এই পৃথিবীর আশা, ভালবাসা,
ময়নামতীর মাঠে কাঁদে তার অতৃপ্ত পিপাসা।।

[ময়নামতীর মাঠে।। ৪]

৪. এখন বহে না হাওয়া এ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের ধারে,
এই অজগর রাত্রি গ্রাসিয়াছে সকল আলোক,
সোহরাবের লাশ নিয়ে জেগে আছে নিঃসঙ্গ রুস্তম।

[স্বর্ণ-ঈগল]

তাঁর কাব্যের সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এই বিষাদ বাতাস। একটি অস্বচ্ছ, অস্পষ্ট এবং ধরা-ছোঁয়ার বাইরের কোন জগৎ থেকে যেন তিনি উঠে এসেছেন, পৃথিবীর সকল দিগন্তে আবিষ্কার করেছেন নামহীন এই বিষাদ অনুভূতিকে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সমসাময়িক বিষয়বস্তু নিয়ে যে সব কবিতা লিখেছেন, সে সবের সর্বত্রই এক স্তব্ধ স্থবির ও দুঃখভারাক্রান্ত জীবন চিত্রিত করেছেন। অতীতাশ্রয়ী কবিতার বহুলাংশেও সেই একই বিষণ্ণতার উপস্থিতি। যেন উভয় জগতেই তিনি একই অনুভূতির অশুভ ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন। জীবনানন্দ দাশের মত এক্সপ্রেশনিস্ট ধ্যানধারণায় তিনি কতখানি প্রভাবিত হয়েছিলেন বলা মুশকিল, তবে তাঁর কবিতায় একটি ক্ষীণ ফলগুস্রোতের মত যে নিঃসঙ্গতা, বেদনা ও নৈরাজ্যের স্রোত বহমান, তার সাথে এক্সপ্রেশনিস্ট ভাবধারার একটি স্বাভাবিক মিল চোখে পড়ে বৈকি। এবং অন্য অর্থে আমরা যদি এক্সপ্রেশনিস্ট প্রকাশভঙ্গিকে সে যুগের কাব্যজিজ্ঞাসার এবং সমাজ-জিজ্ঞাসার বহিঃপ্রকাশ বলে ধরে নিই (যেভাবে বেশীর ভাগ কবি ও সমালোচক বা পাঠক ত্রিশের ও চল্লিশের দশক সম্বন্ধে এই রায় দিয়েছেন) তা হলে দেখা যাবে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা যুগ ও সমাজ দ্বারা কতখানি প্রভাবিত। অথচ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মত কবির মধ্যে এই প্রভাব অজান্তে, চোরাপথে কাজ করবে, এ তথ্য মেনে নেয়া সম্ভব নয়। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কতখানি যুগ ও কালসচেতন কবি ছিলেন, তাঁর কবিতার এই এক্সপ্রেশনিস্ট প্রকাশ ভঙ্গিমা থেকে তার

www.pathagar.com

কিছুটা আঁচ করা যায়। তিনি সময়ের ভিতরে দিয়ে, অনেক সময় ইতিহাসের চশমায়, বর্তমানকে দেখতে চেয়েছেন। কিন্তু যেসব ক্ষেত্রে তিনি সরাসরি সমকালের সামনাসামনি দাঁড়াতেন, সেসব ক্ষেত্রে তাঁর দাঁড়ানোর যতখানি ঋজুতা দেখা যেত, তার থেকে বেশী দেখা যেত অনুভূতি। সমকাল ও কালের সমস্যাগুলির সঙ্গে তিনি একাত্ম ছিলেন। তাঁর কবিসত্তার বড় অংশটি এই কালের সঙ্গে নাড়ীবন্ধনে আবদ্ধ ছিল, তাই তাঁর কবিতায় ঘুরে ফিরে একই কেন্দ্রে ফিরে আসার এত আয়োজন।

৩.

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে দু'জন কবির মিল অস্বীকার করার উপায় নেই—একজন ইংরেজ কবি ইয়েটস, অপরজন জীবনানন্দ দাশ। এর পূর্বে তাঁর সঙ্গে আমরা ইকবাল ও নজরুলের মিল নির্ণয় করেছি ঃ কিন্তু সেই সাযুজ্য সম্পূর্ণ থীম বা বিষয়বস্তু এবং দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত। প্রকাশের বেলায় এই দুই কবির সাথে তাঁর মিল সামান্যই; যদিও নজরুলের মত ছন্দোবদ্ধ প্রকাশে ফর্‌রুখ ছিলেন সিদ্ধহস্ত। কিন্তু ইয়েটস ও জীবনানন্দের সঙ্গে প্রকাশভঙ্গিতে ও বিষয়-ব্যবহারে তাঁর মিল সবচেয়ে বেশী লক্ষণীয়। ইয়েটস যেমন আইরিশ জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের নাভিমূলে থেকেও খুব সহজে নিজের কল্পনার জগতে পালাতে পারতেন, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অনেকটা ইয়েটস-এর মত নিজস্ব কল্পনা জগতে পাখা মেলতেন। কেল্টিক পুরাতত্ত্ব, রূপকথা, পুরাণ ও কিংবদন্তীতে ইয়েটস এক বিচিত্র পৃথিবীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। একদিকে যেমন তিনি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে নিজস্ব ঐতিহ্য-কৃষ্টি-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট করে স্বাধীনতার চেতনাকে জোরদার করেছিলেন, অন্যদিকে তেমনি ঐ সমস্ত পুরাতত্ত্বের রূপক ও প্রতীকের নতুন প্রেক্ষিত সংযোজন ও নতুন মূল্যায়নে ব্রতী হয়েছিলেন। তাঁর দূরাশ্রয়ী কল্পনা একটি সুন্দর ও সুস্থ জীবনধারায় প্রোথিত হল। ইয়েটস যে ভাসমানতার বিরুদ্ধে উচ্চকণ্ঠ ছিলেন এবং তার 'কন্যার জন্য প্রার্থনা' কবিতার Record in one dear perpetual place-এর সুবর্ণ সম্ভাবনাময় জীবনাযাত্রার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন, কেল্টিক মিথলজীর উর্বর জগতে সেইটি সম্ভাব্য, এবং দূরার্থে, একমাত্র সম্ভাবনা হয়ে দেখা দিল। ইয়েটস-এর মিথলজী শুধু কল্পনাভিত্তিক, অসম্ভব এবং অতিরঞ্জিত বলে যাঁরা উড়িয়ে দিতে চান, তাঁরা তাঁর বাস্তবতা ও কল্পনার দ্বন্দ্বের সুবর্ণ সমাধানটিকে খাটো করে দেখতে চান। কেল্টিক মিথলজীকে তিনি নিজের কল্পনা ও অনুভূতিতে সিক্ত করে পরিবেশন করেছিলেন; কেননা তিনি অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সেই মিথলজীর জগতে অংশগ্রহণ করেছিলেন, এর সৃষ্টিশীল কেন্দ্রে প্রবিষ্ট হয়েছিলেন। এই মিথলজী তাঁর নিজস্ব মিথলজী ও কেল্টিক মিথলজীর সমন্বয়। ফলে প্রকাশের ক্ষেত্রে তিনি প্রাণময় সাবলীল এবং সংহত হতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে, এমনকি সমষ্টিগতভাবেও, কেল্টিক পুরাতত্ত্ব

www.pathagar.com

তেমন গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব হতে পারত না, কেননা গ্রীক ও রোমান পুরাতত্ত্বের মত এর বহুমুখিতা, বৈচিত্র্য এবং স্তরবিন্যাস ছিল না। কিন্তু ইয়েটস এই মিথলজীকে আপন কল্পনা ও ভাবানুভূতিতে মিশিয়ে এমন চমৎকারভাবে পরিবেশন করেছিলেন যে, তারা একটি লুপ্ত পৃথিবীর ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য নিয়ে বেরিয়ে এল। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঠিক একইভাবে ইসলামী ঐতিহ্য ও কৃষ্টিকলায় আকৃষ্টি হয়েছিলেন। কিন্তু ইয়েটস-এর মত কাব্যিক স্বাধীনতা তাঁর ছিল না বলে তিনি ততটা সফল হতে পারেন নি। কিন্তু এলিয়ট যেমন কবির মনকে একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে তুলনা করেছেন, যার সংস্পর্শে নতুন নতুন বস্তু বিভিন্ন অর্থ বহন ক'রে পুষ্ট হয়, তেমনি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সেই সীমাবদ্ধতার মধ্যেও উৎকৃষ্ট প্রকাশ ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে এই প্রকাশভঙ্গি ও অতীতভূমিতে প্রবেশের ভঙ্গি দুই কবির ক্ষেত্রে সমান। দুই কবিই সমকালীন ঘটনার চাপে অতীতমুখী হয়েছিলেন। এবং যা আহরণ করে এনেছিলেন বর্তমানের প্রয়োজন মিটিয়েও তা বিশ্বজনকে উপহার দেওয়া গিয়েছিল। ইয়েটস-এর তুলনায় ফররুখ আহমদকে আরো বেশী রাস্তা অতিক্রম করতে হয়েছিল ঃ অপরিচয়ের বাধা তাঁর ক্ষেত্রে ছিল বেশী। একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন পৃথিবীতে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁর গ্রহণযোগ্য প্রতিটি জিনিস খুঁজে বের করে তা আত্মস্থ করে ফিরে আসা দুরূহ কাজ অবশ্যই; কিন্তু ইয়েটস-এর মত ফররুখ আহমদের গূঢ় তাগিদ ছিল। ইয়েটস-এর ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্যবোধ কতটা কাজ করছিল জানি না ; যদিও তাঁর আইরিশ পরিচয়টাই যথেষ্ট বড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই স্বাতন্ত্র্যবোধের পেছনে—কিন্তু ফররুখ আহমদ প্রধানত আরব-মিশরের দিকে ধাবিত হয়েছিলেন এই স্বাতন্ত্র্যবোধের তাড়নায়। এবং সকল শক্তিশালী কবির মত সহজেই তিনি অতীতের এই উর্বর জমিতে ফসল ফলিয়েছিলেন সম্পূর্ণ নিজস্ব তাগিদেই। ইয়েটস ও ফররুখ আহমদের মধ্যে এই প্যাটার্নটি খুব সহজেই চোখে পড়ে। দু'জনেই অতীতের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়েছিলেন প্রধানত সমকালের প্রয়োজনে, একটি বাহিরপ্রবাসী তাগিদে। কিন্তু অতি শীঘ্রই সেই তাগিদ একটি প্রচণ্ড আকর্ষণে পরিণত হয়েছে। তাঁরা উভয়েই নিজস্ব কবিমানসের গূঢ় তাগিদে সেই পৃথিবীর অধিবাসী হয়েছিলেন, দু'জনেরই মূলে ভাবাদর্শিতা কবিশক্তিকে সচল করতে সাহায্য করেছে। কিন্তু ইয়েটস যেখানে খুব সহজেই ভাবাদর্শিতা কাটিয়ে উঠতে সমর্থ হয়েছিলেন, ফররুখ আহমদ হয়তো কোনদিনই পরিত্রাণ পান নি তার হাত থেকে। ইয়েটস-এর বেলায় অবশ্য সমসাময়িক ঘটনাপ্রবাহ ভাবাদর্শিতার মোহ ছিন্ন করতে সাহায্য করেছে।

জীবনানন্দ দাশও অতীতাশ্রয়ী হয়েছেন। কিন্তু জীবনানন্দ দাশ কোন ভাবাদর্শিতা, সমকালের তাগিদ বা বাহিরপ্রবাসী কোন শক্তির প্রভাবে অতীতমুখী হন নি। তিনি হয়েছেন নিছক কল্পনার খাতিরে; তাঁর ইতিহাস-ভূগোলবিহারী মনের খোরাক জোগাতে। এবং যেহেতু কোন বাইরের দাবী ছিল না, তাই তিনি কোন সীমাবদ্ধতায় প্রভাবিত হন

www.pathagar.com

নি, এজন্যই ফর্‌রুখ আহ্‌মদের তুলনায়, জীবনানন্দ দাশ অনেক বেশী রোমান্টিক, অনেক বেশী সুদূরবিহারী। তিনি একটি বিশেষকাল বা ঘটনাপ্রবাহে থমকে থাকেননি; তিনি ইতিহাসের আগে প্রাগৈতিহাসিক লোকে, ভূগোলেরও বাইরে 'নবীন ভূগোল লোকে' মিশে গেলেন। সঙ্গতভাবেই তাঁর কবিতায় সুদূরের হাতছানি আরও ব্যাপক, আরও অর্থপূর্ণ। লক্ষণীয়, জীবনানন্দ দাশ কোন ঐতিহাসিক চরিত্র-চিত্রণে প্রয়াসী হন নি। তিনি এর অসুবিধাসমূহ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং এরূপ প্রচেষ্টা যে তাঁর কল্পনাকে সীমিত সংকীর্ণ করে দেয়, সে সম্পর্কেও তিনি সচেতন ছিলেন। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের মিল হল অতীতকে বর্তমানের মধ্য দিয়ে প্রকাশ করার ক্ষেত্রে। উভয় কবি এখানে সচেতন বাকশিল্পী। জীবনানন্দ দাশ যেমন দূরাশ্রয়ী চিত্রকল্প/রূপক/উপমার মাধ্যমে সুদূরকে অভিজ্ঞতার সীমানায় পৌঁছে দিয়েছেন, ফর্‌রুখ আহ্‌মদও কাল ও যুগের বাধা অতিক্রম করে প্রতিটি ঘটনা, চিত্রকে সমসাময়িক করতে চেয়েছেন প্রকাশের সাবলীলতার মধ্য দিয়ে। বলা বাহুল্য, সমসাময়িক এ দুই কবি অন্য যে-কোন কবির চেয়ে বেশী পরিশ্রমী, বেশী শক্তিশালী। অন্য কোন কোন কবির মধ্যে এই ইতিহাস-ভূগোল চেতনার প্রকাশ দেখা যায়, কিন্তু সর্বত্রই তা আধা-প্রচেষ্টা বা অসম্পূর্ণ ও নিস্তেজ প্রচেষ্টারূপে দেখা যায়। জীবনানন্দ দাশ তাই ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে প্রভাবিত করেছেন ঃ ক'একটি ক্ষেত্রে এই প্রভাবশৈলীর ছদ্মবেশ বেরিয়ে পড়ে ঃ যেমন—

১. সবে নীড়ে ফেরে পাখী, নিভে যায় আলো,
জ্বলে ওঠে আলো,

[দোয়েলের শিস]

২. সাড়ে আটটার ট্রেন উগারিয়া গেল তার আহার্য রাতের

[পটভূমি]

৩. এক রাতে ডালিমের ডালে স্নিগ্ধ উজ্জ্বল শিশির

[রাত্রির ঘটনা]

৪. দূরাচারী পাখীদের সাথে
নোঙর ভাসিয়া চলে পাখীদের পাখাতে পাখাতে।
তারপর চেয়ে দেখ শিশির কণিকা দুর্বাঘাসে

[নোঙর]

কোন সোচ্চার প্রভাব নয়, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের চিত্রকল্প, চিত্রপট ও আবহ রচনার কুশলতা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ছিল বলে এবং তাঁর কল্পনা ও চিন্তাশক্তির একটি সুস্থ সম্মিলন তাঁর কবিজীবনের শুরুতেই সম্ভব হয়েছিল বলে তিনি নিজস্বতায় ভাস্বর।

www.pathagar.com

লক্ষণীয়, আধুনিক বাংলা কবিতায় এক্সপ্রেশনিস্ট ভাবধারার সবচেয়ে সার্থক প্রকাশ জীবনানন্দে, সেদিক থেকে দেখতে গেলেও এই দুই কবির ভিতর একটি অনুচ্চকিত সাযুজ্য চোখে পড়ে। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় কোন অবস্থাতেই জীবনানন্দ দাশের প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী নয়। উপরোক্ত উদাহরণসমূহে, পুরোপুরি প্রভাব নয়, বরং প্রভাবের ইঙ্গিত রয়েছে। এবং এসব কবিতায়ই তিনি একাধিক সুর বাজিয়েছেন বলে অত্যন্ত স্বল্প সময়ের জন্য জীবনানন্দ দাশ উপস্থিত। বরঞ্চ বলা চলে, জীবনানন্দ দাশের প্রভাব তাঁকে পশ্চিম থেকে মুখ ফিরিয়ে নিজস্ব ভূমিতে প্রবেশের একটি সাময়িক অনুপ্রেরণা দিয়েছিল। উভয় কবি অতিমাত্রায় রোমান্টিক ছিলেন, অনুভূতি-প্রবণ ছিলেন, হয়তো সেই কারণেই দেশজ কৃষ্টিকলার লুপ্ত জগতের প্রতি ছিল প্রবল আকর্ষণ—যে আকর্ষণ অজানা ও অচেনা লোকের আকর্ষণ। কিন্তু দুই কবির ক্ষেত্রে এই সূক্ষ্ম চেতনা, পরিপূর্ণ অংশগ্রহণ ও ঐতিহ্যবোধের গর্ব এই দুই পল্লবে ছড়িয়ে পড়েছিল। সময়হীনতা, ইতিহাসের অতীত ইতিহাস চিরন্তন ঘটনাপ্রবাহের সুদূর উৎসের ভিতর দিয়ে তাঁরা নিজ দেশ ও সমাজকে প্রত্যক্ষ করেছেন। জীবনানন্দ দাশ বা ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কেউই একাত্ম হতে পারেন নি সেই অতীতের সঙ্গে। ব্যাবিলন, মিশর, নিনেভা, আফ্রিকার হরিৎ প্রান্তরে জেব্রা ইত্যাদি একটি প্রবল অনুভূতিপ্রবণ মনের কল্পনার বহিঃপ্রকাশ হিসাবে কাব্যিক বৈধ্যতা লাভ করেছে সত্যি, কিন্তু কবি ও তাঁর কাব্য সামগ্রীর মধ্যে দূরত্ব সম্পূর্ণ ঘুচিয়ে দিতে পারেনি। পাঠক এই অংশগুলিতে তার কল্পনার পরিপূর্ণ সদ্ব্যবহার করতে পারে বলে এবং অপরিচয়ের আস্বাদ করতে পারে বলে তাঁর অনুগামী হয়। কিন্তু কেন গানি জীবনানন্দ দাশ তাঁর সম্পূর্ণ অতীতাশ্রয়ী কবিতায় সম্পূর্ণ স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন না, বরং যে সব কবিতায় তাঁর কল্পনার উড্ডয়ন তাঁর পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে একসূত্রে গ্রথিত, সেসব কবিতায় তিনি উড়াল দেন আবার ফিরে আসেন এবং বস্তুত এই প্যাটার্নের পুনরাবৃত্তি কবিতাকে চমৎকার নতুনতর এক আবেদন প্রদান করে। এসব কবিতার ইম্প্রেশনিস্ট চিত্রকরদের মত খণ্ড খণ্ড চিত্র নির্মাণ হয়তো কোন আংশিক চিত্রকে প্রকাশ করে না, কিন্তু এর সামগ্রিক আবেদন অনস্বীকার্য। অতীত ও বর্তমানে যত বেশী স্বচ্ছন্দ আনাগোনা,কবি তত বেশী সার্থক। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যেখানে ঐতিহ্যমণ্ডিত তাঁর নিজস্ব অতীতের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখান, জীবনানন্দ দাশের মত তিনিও পক্ষপাতিত্বের মাত্রা অনুযায়ী স্বচ্ছন্দ অথবা অস্বস্তি বোধ করেন। আগেই বলা হয়েছে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অতীত বিষয়বস্তুগত এবং কল্পনার স্বাধীন বিচরণ উভয় দিক দিয়ে সীমিত। তিনি যত বেশী সেই অতীতে প্রবিষ্ট তত বেশী তাঁর স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ একটি অভাবিত উপায়ে এই অস্বাচ্ছন্দ্য কাটিয়ে উঠেছেন। জীবনানন্দ দাশ যেমন বাংলার চিরন্তন দৃশ্যাবলী ও দৃশ্যপটের পালাবদলকে তাঁর অতুলনীয় নিসর্গ বর্ণনায় ধরে রেখেছেন তেমনি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মাধ্যমে তাঁর কল্পনাকে ধাবিত করেছেন।

www.pathagar.com

তাঁর কাব্যের অনেকাংশে সমুদ্রের বিশ্বস্ত বর্ণনার দেখা মেলে, যে বর্ণনা তাঁকে বিষয় ও ঘটনাসমূহের ভীড় থেকে কল্পনার মুক্তাঙ্গনে নিয়ে আসে, তা আসলে তার অস্থির মনের শক্তিশালী বহিঃপ্রকাশ। লক্ষণীয়, অতি সাম্প্রতিক দেশজ চিত্র বর্ণনায় সমুদ্রের স্থান নেই, কারণ এসব কবিতায় তাঁর গতি সাবলীল। সমুদ্রের দেখা মেলে কবিতায়, যেখানে অপরিচয়ের দূরত্ব ঘোচানোর জন্য প্রেক্ষাপট ও নিসর্গ উভয় অর্থে সমুদ্রকে ব্যবহার করা হয়েছে। কতিপয় উদাহরণ ঃ

১. কালো আকীকের মত এ নিকষ দরিয়ার বুক ছিঁড়ে

[সিন্দাবাদ]

২. কাল ঝোড় রাতে দাঁড়ের আঘাতে দামী জেওরের মত
হীরা জওহর ফুটেছিল কত দরিয়ার নীল ছাঁচে,

[দরিয়ায় শেষ রাত্রি]

৩. ভাঙো দরিয়ার ঘূর্ণি তুফানে জীর্ণ প্রাচীন মন

[দরিয়ায় শেষ রাত্রি]

৪. আরব সমুদ্র-স্রোতে ক্রমাগত দূরের আহবান

[বন্দরে সন্ধ্যা]

৫. এ কী ঘন-সিয়া জিন্দেগানীর বা'ব
তোলে মর্সিয়া ব্যথিত দিলের তুফান-শ্রান্ত খাব

[পাঞ্জেরী]

সর্বত্রই অবস্থাবিশেষের এক একটি প্রতীক হয়ে উঠেছে তাঁর সমুদ্রবর্ণনা। অনুভূতিকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন বৃহত্তর প্রতিবেশে; বোধের রাস্তাগুলো ক্রমাগত প্রশস্ত করেছেন। যা ক্ষুদ্র প্রেক্ষাপটে ক্ষুদ্র পারিপার্শ্বিকতায় বাঙময় হত না, বৃদ্ধি পেত না, তাকে সমুদ্রের ব্যাপ্তি দিয়ে অনবদ্য করেছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ যখন সমুদ্রের রুদ্র মূর্তি, তার প্রচণ্ড রূপ আঁকেন, তখন তিনি ইংরেজ চিত্রকর টার্নারের মত অনন্য হয়ে ওঠেন। টার্নারের সমুদ্রচিত্র অংকনে শক্তি এবং গতির অপূর্ব সমন্বয় দেখা যায়, যা সমুদ্রের উন্মত্ত চিত্রটির সঠিক ও জীবন্ত প্রকাশ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায়ও তেমনি গতিময় এবং রুদ্র হয়ে দাঁড়ায় সমুদ্র। যে কারণে ত্রিশ দশকের কবিদেরকে বাইরের দিকে দৃষ্টি ফেলতে হয়েছে সে কারণে ফর্‌রুখ আহ্‌মদও সমুদ্রকে বেছে নিয়েছেন। ত্রিশের কবিরা বহুলাংশে বর্তমানকে প্রকাশ করতে গিয়ে অতীতকে কোন কোন সময় অস্বীকার করেছেন—সেই অতীতকে যা শুধুই ঘটনা সমষ্টির সমাহার। জীবনানন্দ দাশ যত সহজে এই অদূর অতীতকে পিছনে ফেলে এমন এক অতীতে উপস্থিত হয়েছিলেন যা কল্পনার চারণভূমি হিসাবে বৈধতা পেয়েছিল, অন্যান্য কবি সেই অতীতে তত সহজে পৌঁছোতে

www.pathagar.com

পারেননি। ফলে তাঁরা নিজেদের অতীত ও নিজস্ব মিথলজী সৃষ্টি করতে প্রয়াসী হয়েছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে সফল হয়েছিলেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় সমুদ্র তেমনি এক মিথলজীর বহিঃপ্রকাশ। তাঁর ভাবনা-চিন্তা, কল্পনা-অনুভূতির সহগামী হিসাবেই সমুদ্র বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অত্যন্ত নগর-সচেতন কবি ছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁকে স্বপ্নালু, ভাবাদর্শী এবং রোমান্টিক মনে হলেও তাঁর অতিমাত্রায় সমকালচেতন মন সব সময় সক্রিয় ছিল বর্তমানের জটিল জীবনযাত্রা, শূন্যতা, নির্জনতা, নৈঃসঙ্গ, আত্মিক অসারতা ও স্নায়ুবৈকল্যের রহস্য-উন্মোচনে। ১৯৪৩-এর মন্বন্তরের আনুষঙ্গিক পাশবিকতা, অমানুষিক বর্বরতা ও ধনী ও গরীবের মধ্যে ন্যক্কারজনক বৈসাদৃশ্য তাঁকে বিচলিত করেছিল। ত্রিশের যেকোন কবি থেকে তিনি অধিক মাত্রায় সমকালচেতন ছিলেন। এবং তাঁর ইসলামী ঐতিহ্যবোধের প্রয়োজনে লিখিত কবিতাসমূহ বাদ দিলে এত স্বল্প কথায় এত তীর্যকভাবে বর্তমানের সমস্যাসমূহ প্রকাশ করার ক্ষমতা অন্য কোন কবিতে দৃষ্ট হয় না। ফর্‌রুখ আহমদ ব্যক্তিকে নিয়ে বেশী ভাবিত ছিলেন না ; ব্যক্তির মধ্য দিয়ে সমাজকে দেখতেই তিনি উৎসাহী ছিলেন। এ কারণে তাঁর ব্যঙ্গ কবিতার সংখ্যা অনেক। তুলনায় প্রেমের কবিতা সংখ্যালঘু। প্রেমের কবিতা বা যে অর্থে প্রেম ভালোবাসার নিবিড় উচ্চারণ বিভিন্ন কবিতে ধ্বনিত হয়, তার সকল উপাদান ফররুখ আহমদে ছিল, কিন্তু প্রেমের কবিতা তিনি বেশী লেখেননি; কারণ বোধ হয় তাঁর ব্যক্তিকেন্দ্রিকতার প্রতি অনীহা। অথচ যখন তিনি প্রেমের কবিতা লিখেছেন, অতি উঁচুদরের কবিতা লিখেছেন। এবং ব্যক্তির সর্বোচ্চ প্রতীক হিসেবে সিন্দাবাদ তাঁর কবিতায় শুরু থেকে উপস্থিত। কিন্তু সিন্দাবাদ ব্যক্তির ভিতর দিয়ে ব্যক্তিহীনতায়, একের ভিতর দিয়ে বহুতে পরিণত হয়েছে।

মাত্র তিনটি কবিতার আলোচনা থেকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের প্রবল যুগকেন্দ্রিক মনের পরিচয় পাওয়া যাবে। 'লাশ', 'পটভূমি' এবং 'পোড়ামাটি' যেন তিনটি অঙ্গুলি তুলে সমকালকে শাসন করছে। ফর্‌রুখ আহমদের এই পর্যায়ের কবিতাসমূহে কোন অকারণ ভাবোচ্ছ্বাস নেই, কোন মোহ কী উত্তেজনা নেই। যেন আনুপূর্বিক প্রতিটি ঘটনা প্রতিটি অভিজ্ঞতা একের পর এক সাজিয়ে একটি প্রামাণ্য চিত্র খাড়া করেছেন। কিন্তু তাঁর বিদ্রোহী কবিসত্তা তীব্র ঘৃণার অগ্নি ছড়াচ্ছে প্রতিটি কবিতায়। নগরীকে তিনি সুস্থ চেতনার হন্তারক ধরে নিয়েছেন বুদ্ধদেব বসুর মত, সুধীন দত্তের মত, সমর সেনের মত, বিষ্ণুদের মত। কিন্তু নগরী তো মানুষেরই সৃষ্টি। তাই তিনি ওঁদের চাইতে এক ধাপ এগিয়ে মানবতার মুখোশটাকেই ছিঁড়ে ফেলতে উদ্যত হয়েছেন, মানুষের ব্যক্তিগত গ্লানির উৎসে অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন :

www.pathagar.com

মানুষের হাড় দিয়ে করেছ এ নগর-পত্তন
মরুভূমি হল বন, মরুভূমি মানুষের মন

[পোড়ামাটি]

[লক্ষণীয়, মরুভূমি, পোড়ামাটি ইত্যাদি নিসর্গ দৃশ্য এলিয়েটের Waste Land-এর সঙ্গে গভীর সম্পর্কযুক্ত। সমসাময়িক কবিদের মত এলিয়টের প্রভাব সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। সভ্যতাকে ও মানুষের সমাজকে মরুভূমি বা পোড়ামাটির সঙ্গে তুলনা করার এই প্রবণতা এলিয়টের পরে বহুব্যাপ্ত।] নগর সম্পর্কে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের দ্বিধাহীন মন্তব্য :

এখানে কলের ঝড়ে ঘুম ভাঙে শব্দিত জগতে
সন্ধ্যার জনতা হেথা কালি বয়ে নিয়ে যায়
মরমের পরতে পরতে

[পোড়ামাটি]

নগরী ও নগরজীবন শাপগ্রস্ত। মুক্তির সম্ভাবনা সুদূর এবং কবির ভাষায় যতদিন মানুষ এই যান্ত্রিকতায় নিষ্পিষ্ট হয়ে "সংকীর্ণ গলির পথে দৃষ্টিহীন কুকুরের মত/প্রেতাত্মার বোঝা" বইতে থাকবে ততদিন মুক্তি অসম্ভব। অন্যত্র :

বিকট শব্দে মেঘ বিছায়েছে নগরীর আকাশে ধূসর
রঙচটা বিবর্ণ চাদর
ট্রাফিকের আর্তনাদে, ট্রামে, বাসে পথের পাথর
ম্লান হয়ে যায় যেন... ... ...

[পটভূমি]

বা

এই সব শড়কে এখনো
মরা মানুষের প্রাণ
সংখ্যাহীন করোটি অম্লান,
পশুর মতন মৃত্যু সে খবর রয়েছে এখানে

[বিরান সড়কের গান]

কিন্তু সকল অসারতার পিছনে মানুষ নিজে। মানবিক কোন গুণের কোন অস্তিত্ব নেই, মানুষ নিজেই তার মৃত্যু এবং ধ্বংস ডেকে এনেছে। 'লাশ' কবিতায় কঠোর ভাষায় বিবেকহীন হত্যাকারী হিসাবে চিহ্নিত করে তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত করেছেন, সবচেয়ে বেশী সমকালচেতন কবিতা হিসাবে 'লাশ' শুধু একটি বিশেষ সময়ের করুণ ধ্বংসের সাক্ষীই নয়, বরং অনাগত সকল অমানুষিকতা, পাশবিকতার প্রতিও ঘৃণার মূর্তিমান এবং সরব প্রকাশ।

www.pathagar.com

জানি মানুষের লাশ মুখ গুঁজে পড়ে আছে ধরণীর পর
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে প'ড়ে আছে
নিসাড় নিথর
পাশ দিয়ে চলে যায় সজ্জিত পিশাচ, নারী নর

অতঃপর,

পৃথিবী চষিছে কারা শোষণে, শাসনে
সাক্ষ্য তার রাজপথে জমিনের 'পর

তাঁর কণ্ঠ ক্রমে সোচ্চার হতে হতে চিৎকারে পরিণত হচ্ছে ঃ

স্ফীতোদর বর্বর সভ্যতা
এ পাশবিকতা,
শতাব্দীর ক্রূরতম এই অভিশাপ
বিষাইছে দিনের পৃথিবী;

সমগ্র সভ্যতার প্রতি অনাস্থাবাণী উচ্চারণ করে কবি মানুষের নকল অস্তিত্বকেই অস্বীকার করছেন ঃ

কার হাতে হাত দিয়ে নারী চলে কাম সহচরী ?
কোন সভ্যতার ?
কার হাতে অনায়াসে শিশুকণ্ঠে হেনে যায় ছুরি ?
কোন সভ্যতার ?

এবং একটানে সভ্যতার মুখোশ ছিঁড়ে ফেলে কবি একটি ভয়ানক সত্যের সম্মুখীন হয়ে আঁতকে উঠেছেন :

জড়পিণ্ড হে নিঃস্ব সভ্যতা

এবং এই জড় সভ্যতার প্রতি তাঁর শেষতম অভিশাপ :

ধ্বংস হও—
তুমি ধ্বংস হও।।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অনুভূতি তীক্ষ্ণ ও কোমল ছিল বলে বেশীক্ষণ এই বীভৎস সত্যকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তাঁকে তাঁর কল্পনার অমল জগতে আশ্রয় নিতে হত। কিন্তু তাই বলে তিনি পলায়নপর কবি ছিলেন না। বাস্তবকে গ্রহণ করতে, বাস্তবের ভিতর চিত্র অংকন করতে, কোন কোন সময় এই জরাগ্রস্ত বাস্তবকে উন্মোচন করতে এবং 'লাশ'-এর মত কবিতায় বাস্তবকে আঘাতে আঘাতে চরম সত্যের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে তিনি কখনো পিছপা হননি। ত্রিশের কবিরা যেমন এলিয়ট বা অডেন অথবা স্পেন্সারের মতাদর্শে প্রভাবিত হয়েও কোন কোন ক্ষেত্রে অনুপ্রাণিত হয়ে ব্যক্তিকে

www.pathagar.com

সমাজের পটভূমিতে স্থাপন করে তাকেও তার সমস্যাগুলোকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন, ফর্‌রুখ আহমদও তেমনি বাস্তবকে অত্যন্ত নিকট থেকে খুঁটিয়ে দেখেছেন, বাস্তবকে ও বাস্তবের মেকী বহিরঙ্গকে ব্যবচ্ছেদ করেছেন। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সবার থেকে স্বতন্ত্র এই জন্য যে, তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র কৃত্রিমতা নেই।

ত্রিশের দশকের কোন কোন কবির কবিতা অনেক সময় নির্জীব ও কৃত্রিম মনে হয় ; যেমন সুধীন দত্তের নাস্তির বাতাসে ঘেরা কবিতাসমূহ একটি মতাদর্শ প্রচারের বাহন বলে মনে হয় অনেক সময়, সমর সেনের কবিতায় রোগগ্রস্ত মহানগরীই প্রধান উপস্থিতি বলে মনে হয় কোন কোন সময় এবং সমকালের সঙ্গে অতিমাত্রায় সম্পৃক্ত বলে এসব কবিতায় এক ধরনের ক্লান্তি পরিলক্ষিত হয়, যেন একঘেঁয়ে জীবনের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে গিয়ে কবিতাগুলোও একঘেঁয়ে হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মধ্যে সমকাল ও তার ভাবনা সমস্যা Obsess হয়ে দাঁড়ায়নি; ফলে ক্লান্তি বা একঘেঁয়েমির অভিযোগ তাঁর ক্ষেত্রে কখনো প্রযোজ্য নয়।

একই কবিতায় সম্পূর্ণ দুটি ভিন্ন সুর বাজানো ও তাদের সমন্বয়ে অন্য একটি সুর সৃষ্টি করা বাস্তবিকই প্রতিভার কাজ। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ একই সাথে বিভিন্ন কোটিতে, বিভিন্ন ভূমিতে সঞ্চরণ করতে পারতেন বলে ও তাঁর কল্পনা বিভিন্ন অনুষঙ্গে একই সাথে পল্লবিত হতে পারত বলে তিনি অনেক ক্ষেত্রে সত্যিকার কাব্যিক দ্বন্দ্ব ও সংঘাত সৃষ্টি করতে পারতেন। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী প্রতীক আন্দোলনের কবিরা এই গুণের পরিপূর্ণ বিকাশ দেখিয়েছেন, তাঁদের কবিতায় একাধিক, কোন কোন ক্ষেত্রে অগণিত অনুভূতির চিত্র এমন কি প্রেক্ষাপট পাশাপাশি বিদ্যমান। প্রকৃত অর্থে Contrast-এর এত সুন্দর উদাহরণ আর কোথাও নেই। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় একাধিক মানসিক ও কালিক অবস্থা ও চেতনা, বোধ বা অনুভূতি মূর্ত হয়েছে, এবং পাশাপাশি থেকেছে, সমসাময়িক থেকেছে। 'পটভূমি' কবিতায় তেমনি একটি চিত্র পাওয়া যায়। সমস্যাসঙ্কুল জরাগ্রস্ত এবং যান্ত্রিকতায় পিষ্ট নগরের প্রেক্ষাপট মুহূর্তে পরিবর্তিত হয়ে সুস্থ, সতেজ ও মুক্ত পাহাড়ী দৃশ্যপট উন্মোচিত হয়েছে, এবং এই পালাবদল স্বপ্নের গতিতে সম্পন্ন ঃ

ভেসে যায় চোখের পলকে
ফুটপাত, কারখানা, যন্ত্রপীড়া এই বদ্ধ ঘর—
শুনি যেন জীবন্ত উচ্ছল
প্রাণবন্ত জীবনের প্রসারিত পাখার খবর,
নিবিড় আঙ্গুর বন, বরফ জামানো চূড়া সুদৃঢ় পাথর।

ফর্‌রুখ আহমদ যেন এমনি একটি "প্রাণবন্ত জীবনের" জন্য অপেক্ষমাণ। যে পাহাড়ী ছেলেটি ছাতা-সারানোর শ্যেন-তীব্র স্বর তুলে শহরকে সচকিত করে যাচ্ছে, সে

www.pathagar.com

ঐ 'প্রাণবন্ত জীবনে'র প্রতিনিধি হিসাবে বিদ্রোহ ঘোষণা করে যাচ্ছে। কিন্তু আধুনিক ব্যক্তির দুর্ভাগ্য, মেকী যান্ত্রিকতায় এই শাশ্বত, সুস্থ ঘোষণাটির কোন দাম নেই ঃ

শতাব্দীর ব্যর্থতার রাজপথে ঘুরে ঘুরে ছাতা-সরানোর
তোলে তিক্ত সুর... ...

এই পরাজয় মানুষের গ্লানিকে চরমে পৌঁছে দেয়। কিন্তু এই পরাজয় শেষ কথা নয়। সমাজতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণায় লালিত কবির একটি কবিতা 'পাথরের দিন' এই প্রসঙ্গে তাঁর নির্ঘোষ বক্তব্য তুলে ধরেছে ঃ

দীর্ণ করি পাথরের মৃত স্তর সংগ্রাম আহত
দুঃস্বপ্নের শেষে আনে ফসলের রক্তিম সকাল।।

সেই একই ঘোষণা "বৈশাখ" কবিতায়। এই কবিতায় শেলীর Ode to West Wind-এর প্রভাব লক্ষণীয়। সমকালীন জীবনধারার প্রতি প্রচণ্ড অনাস্থা ও অসহিষ্ণুতাকে তিনি শেলীর মত প্রবলভাবে ব্যক্ত করেছেন।

৬.

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের ভাষা বর্ণনাধর্মী, চিত্রধর্মী। যে অবস্থা, অভিজ্ঞতা তিনি প্রকাশ করতে চান, তার পরিপূর্ণ প্রকাশের জন্য ভাষার কারুকাজ, চিত্রকল্প, উপমা, উৎপ্রেক্ষার মোহজাল সৃষ্টি করে তিনি তাকে পূর্ণতা দিয়েছেন। তাঁর আরবী ফার্সীর পক্ষপাতিত্ব সত্ত্বেও যে সত্যিকার শৈল্পিক মেজাজ প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর কবিতায় তা সহজাত বাঙালী ও অতিমাত্রায় দেশজ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সকল কবিতা পড়ার পর যে দুটি ধারণা জন্ম নেয় পাঠকের মনে তারা পরস্পরবিরোধী। যে শিল্পী সময়ের তাড়নায় ও নকল অনুভূতির তাগিদে অপরিচিত ভূমিতে প্রবেশ করে দিশাহারা হয়েছেন তিনি কত সহজে নিজেকে উদঘাটিত করতে পারেন আপন প্রতিবেশে, আপন দেশকালের গণ্ডীতে, তা যেমন অবিশ্বাস্য, তেমনি আনন্দের বিষয়। কয়েকটি চিত্র তাঁর কবিতার চিরন্তন মূলধন হয়ে থাকবে। তাঁর প্রকৃত কবিশক্তিকে জানতে হলে এদের অবহেলা করা সম্ভব নয়। এবং যাঁরা ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে ধর্মীয় ঐতিহ্যের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে তাঁকে খাটো করতে চান তাঁরা এ পর্যায়ের কবিতাগুলোকে পাশ কাটিয়ে যান। অথচ আসল ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এই কবিতাসমূহে মূর্ত ঃ

১. বেতস লতার তারে থেকে থেকে বাজে আজ বাতাসের
বীণা; ক্রমে তাও থেমে যায়,
প্রাচীন অরণ্যতীরে চাঁদ নেমে যায় ;
গাঢ়তর হল অন্ধকার

[ডাহুক]

www.pathagar.com

২. বাতাসের দীর্ঘশ্বাসে ঝিল্লীও নীরব, পাখীদের
বাসায় নিঃসাড় ঘুম

[সিলেট ঃ স্টেশনে ঃ একটি শীতের প্রভাত]

৩. ঘাসের সবুজ শীষে অরণ্যের রঙ জেগে আছে!
তোমা চোখে নীল মেঘমুক্ত আকামের আরঅ

[প্রত্যয়]

৪. তারাফুল ফোটানো সে কোন নলবনে গভীর মেঘের
ছায়াম্লান মাটির বাঁশরী সুর ভেসে চলে ডাহুকের—,

[মধুমতীর তীরে]

৫. উটের ঘণ্টার শব্দে ম্লান মরু বালু ওড়ে, মুছে যায় বেলা

[কাফেলা]

৬. গোধুলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
—অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ

[বন্দরে সন্ধ্যা]

অসংখ্য উদাহরণ দেয়া যায় তাঁর কবিতা থেকে। কিন্তু তাঁর কবিতার যে মহৎ গুণ—সম্পূর্ণতা আর সংহতি, তা এতে ক্ষুণ্ন হওয়ার সম্ভাবনা, কেননা ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা একটি ভাস্কর্যের মত—সমগ্র অংশটিই একটি বিশেষ অনুভূতি। অবস্থা/ অভিজ্ঞতা-নির্দেশক। কোন বিশেষ অংশে সম্পূর্ণকে পাওয়া দুষ্কর; অংশে পাওয়া যাবে না সম্পূর্ণর প্রকাশ। এবং সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কথা হল, যে চিত্রদৃশ্যপট তিনি নির্মাণ করেছেন, তারা সমগ্রের পরিপ্রেক্ষিতে বিচার্য; এককভাবে হয়তো এরা সৌন্দর্যমণ্ডিত, কিন্তু সমগ্রের সঙ্গে তাকে স্থাপন করলে আরো অর্থময়, সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়ে দাঁড়ায়।

ফর্‌রুখ আহমদ শক্তিশালী কবি, অনুভূতিশীল কবি, সচেতন কবি। দেশকাল ভূগোলের পরিপূর্ণ বিকাশ তাঁর কবিতায়। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় ভুল হবে কোন বিশেষ চিহ্নে তাঁকে আলাদা করে দেখলে। তাঁর কবিতার একটি পিঠ দেখে তাঁর সম্বন্ধে রায় দেয়ার প্রথা এখন বাতিল করা প্রয়োজন। যাঁর সৃষ্টি বিশাল, যাঁর নির্মাণ নিখুঁত, তাঁকে গণ্ডী ও স্থূল দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করা নির্বুদ্ধিতা।

www.pathagar.com

মুকুল চৌধুরী

ফর্‌রুখ-মানস পরিক্রমা

এক উদ্দীপনাময় কবি-স্রোত তিনি—ফর্‌রুখ আহ্‌মদ! প্রত্যাদেশের মিলন-মোহনা সন্ধানে যাঁর কবিতা উদ্দীপ্ত। তিনি নির্ভীক, তিনি স্পষ্টভাষী, তিনি সত্যদ্রষ্টা। তাই ভেতরে ভেতরে ছিলেন গোপন আত্মাভিমানী। তিনি দূরে দাঁড়িয়ে এমন এক দর্শকের দৃষ্টিতে জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন, যে জীবনের অনু-পরমাণুতে নিজকে প্রবাহিত করে আধুনিক মানুষের মন-মনন, হৃদয়াবেগ-কল্পনানুভূতি, ঈর্ষা-ঘৃণা, বিদ্বেষ-বিরুদ্ধতা, লোভ-লালসা, প্রেম-বিকার, বিড়ম্বনা-দ্বন্দ্ব এ সবকিছুকে তীব্র তীক্ষ্ণ বিশ্লেষণে একান্ত নিজস্ব ভঙ্গিতে পাঠকের সামনে পূর্ণতর অবয়বে এবং অচিন্তনীয় সুস্বাদে উপস্থাপন করেছেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা আস্বাদন করা কি পরিশ্রমসাপেক্ষ? তাঁর শব্দের আছে আলাদা মেজাজ! ভাবে আছে নিজস্ব আত্মা! এই শব্দ আর ভাবের সংমিশ্রণেই স্ব-আবিষ্কৃত আবেশ সৃষ্টি করেছেন তিনি।

অতএব শিল্পের অনুকারী অনুজ পদব্রাজকগণ এই সৃষ্টিশীলতার সফল উদ্ধারকারী হবেন এই তো স্বাভাবিক।

শিল্পের মাধুর্যে উত্তীর্ণ তাঁর কবিতা, আর প্রকরণের দিক থেকেও চমকপ্রদ। তবু প্রকরণের চেয়ে বিষয় আর শিল্পের চেয়ে আদর্শবাদকে বুঝি তিনি অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যথা ঃ

হারা সম্বিত ফিরে দিতে বুকে তুমি আনো প্রিয় আবহায়াত,
জানি সিরাজাম-মুনীরা তোমার রশ্মিতে জাগে কোটি প্রভাত,

[সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ ঃ সিরাজাম মুনীরা]

এবং—

পথে কেঁদে ফেরে এতিম শিশুরা সর্বহারার বিরাট দল,
জালিমের হাতে মার খেয়ে খেয়ে বৃথা মোছে তারা নয়ন জল।

[সিরাজাম মুনীরা মুহম্মদ ঃ সিরাজাম মুনীরা]

অথবা—

জান্নাতে ফিরদৌসের সব মুক্ত দরজা তোমাকে ডাকে ঃ
এস সিদ্দিক দরদী সঙ্গী যে ক'রেছ সাথী নিঃস্বতাকে।

[আবু বকর সিদ্দিক ঃ সিরাজাম মুনীরা]

www.pathagar.com

এবং—

এখানে কেবল আর্তস্বর,
এখানে তোমার নাই খবর,
প'ড়ে আছি যেন শ্রান্ত শব;
আজকে এখানে নাই উমর।

[উমর-দারাজ দিল : সিরাজাম মুনীরা]

তাঁর কবিতা-শরীরের সূর্যালোকের লাবণ্য স্মরণ করিয়ে দেয় এই সব পঙক্তিমালা। এ যেনো অলৌকিক, অপার্থিব আর 'রাশি রাশি ভারা ভারা' স্বর্গীয় সম্পদের সুষমা।

কাব্যের উপজীব্য উদ্ধারে তিনি বৈচিত্র্যের সন্ধানী। সুনিপুণ শব্দ-যোজনা আর অনুপম উপমা এ বৈচিত্র্যময়তাকে করেছে বিশিষ্ট এবং ভাষার বলিষ্ঠতা আর বর্ণনার চমৎকারিত্ব এনেছে স্বাতন্ত্র্য। রোমান্টিকতার অভাবও নেই—ঐতিহ্য সন্ধানের কৃপণতাও নেই, দু'য়ের সংমিশ্রণ অথচ পাঠকের সুদূরের পিপাসা নিবৃত্তিতেও সফলকাম তিনি। এ যেনো এক সম্মিলিত উচ্ছ্বাসে নবতর বোধের আবির্ভাব তাঁর কাব্য আর সত্তার আমূল অভিনিবেশ তাঁর জীবন-চর্চায়। অভিজ্ঞতার অতলস্পর্শে নাবিকের মতো মানস উদ্ভাবনার অবিমিশ্র রূপে তাঁর দিগন্ত প্রসারিত। বোধের উৎসারণে উৎসারিত সূর্যোদয় যেনো তাঁর সমুদয় কবিকৃতি।

বিবেকহীন সমকালও সেখানে বাদ পড়ে নি। দুর্ভিক্ষের প্রমত্ততায় পর্যুদস্ত সময় তের'শো পঞ্চাশ বঙ্গাব্দ। অযুত মানুষ অনাহারক্লিষ্ট। এ সময় প্রতিবাদী চেতনায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ কবিতা 'লাশ' লেখা হয়। 'লাশ' নিপীড়িত মানুষের প্রতিনিধিত্বকামী কবিতা-কর্ম। 'লাশ' অগণিত ভুখানাঙ্গা মানুষের প্রতি তাঁর দরদের শনাক্ততার ধারক। 'লাশ' তাঁর নিজের লাশ হওয়ার ভবিতব্য। লাশের মিছিলের মধ্যবিন্দুতে অগণিত লাশের সারথী হলেন তিনি। সর্বত্র লাশের দুর্গন্ধতা থেকে বিনির্গত ধোঁয়ার মতো উচ্চারিত হলো ঃ

জানি মানুষের মুখ লাশ গুঁজে প'ড়ে আছে ধরণীর পর,
ক্ষুধিত অসাড় তনু বত্রিশ নাড়ীর তাপে প'ড়ে আছে
নিসাড় নিথর,

*

কোন্ আজাজিল আজ লাথি মারে মানুষের শবে?
ভিজায়ে কুৎসিত দেহ শোণিত আসবে
কোন প্রেত অট্টহাসি হাসে?
মানুষের আর্তনাদ জেগে ওঠে আকাশে আকাশে।

[লাশ : সাত সাগরের মাঝি]

www.pathagar.com

তাঁর সকল কবিতার অর্গল উন্মোচিত করে দিলো এই একটি কবিতা। এ কবিতার শরীর তাঁর কবি-জীবনের মধ্যবর্তীতে মানবিক সত্তাকে কবিত্বের আলোতে দ্বিগুণ উদ্ভাসিত করে দিলো।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতায় ভাষার সংমিশ্রণ কোন কোন কবির মর্মালোকে বিব্রত বোধের প্রকাশ ঘটায়, অথচ ভাষার সমন্বয়ী কার্যকারণ গুণ নিষ্পন্নতায় তারাই আবার তাঁর প্রতি ঈর্ষায় জর্জরিত হন। হবেন না কেন? এই সংমিশ্রণ যে শৈল্পিক উত্তরণের অনুষঙ্গে ও প্রতিভার দীপ্তিতে জীবন-মরণ জয়ী। যথা ঃ

ডেকেছে আমাকে জিন্দিগী আর মওতের মাঝখানে
এবার সফর টান্‌বে আমাকে কোন্‌ স্রোতে কেবা জানে।

[সিন্দাবাদ : সাত সাগরের মাঝি]

অথবা :

আল্‌বুর্‌জের চূড়া যেন এক উড়ে আসে কালো দেউ
বজ্রের বেগে পাটাতনে ভাঙে পাহাড়ের মত ঢেউ,

[বা'র দরিয়ায় : সাত সাগরের মাঝি]

দু'তিনটি ভিন্ন ভাষাগত শব্দের সম্মিলিত ব্যঞ্জনার মধ্যে এক অনাস্বাদিত শূন্যতা বা হলোনেস সৃষ্টি হলো এখানে। শব্দের কারুকার্যে একটি ত্রিমাত্রিক সচলতা এলো যা বাংলা কবিতার এই খণ্ডে এভাবেই নতুন পথ উন্মোচিত করলো।

এদেশের জীবন ও প্রকৃতি কি তাঁর কবিতায় অনুপস্থিত? বাঙলার প্রকৃতি বরং রূপে ও সত্তায় অম্লান থেকে অপর বিশ্বের সৌন্দর্যালোকের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে তাঁর কাব্যে। মরুচারী দিগ্বিজয়ী, শৌর্য-বীর্য ও রূপচেতনা আমাদের ঐতিহ্যের সাথে একাত্ম হয়েছে এবং এই সংস্থাপন আর একাত্মতার সমন্বিত রূপ পাঠকের মনোলোকে দ্বন্দ্বরত সত্য-মিথ্যার দ্বান্দ্বিকতা নিষ্ক্রান্ত করে দিতে যথেষ্ট নির্দেশক হিসেবে কার্যকরী হয়েছে। যথা :

বাধা বন্ধহীন নদী, গতিবেগ উন্মুক্ত, অবাধ
মুক্ত জীবনের কিম্বা আজাদীর যেন সে প্রতীক
(জিঞ্জির, জিন্দান ভেঙে যে পেয়েছে পূর্ণতার স্বাদ
কিম্বা মঞ্জিলের দিশা,— যে পেয়েছে ঠিকানা সঠিক)
ভাসায়ে পথের বাধা সমুদ্রের ডাকে সে দীউয়ানা
চলে দুর্নিবার গতি স্থির লক্ষ্যে দৃষ্টি নির্নিমিখ!

[আরিচা-পারঘাট : কাফেলা]

এবং :

বঙ্গোপসাগর থেকে এল ভেসে মেঘের কাফেলা
জীবনের বার্তা নিয়ে স্নিগ্ধ, শ্যাম-মমতা মেদুর,

www.pathagar.com

পাড়ি দিয়ে বহু পথ, বালু-বক্ষ সমুদ্রের বেলা
গ্রীষ্মের উত্তপ্ত প্রাণে দিল এনে বর্ষণের সুর
(মত্ত ময়ূরের মন বনপ্রান্তে গেয়ে ওঠে "কে-কা")!
চৈত্রের ফাটল ধরা মাঠ, বন তৃষিত, বিধুর
দীর্ঘ প্রতীক্ষার শেষে দেখে চেয়ে মসীবর্ণে লেখা
নিবিড় মেঘের পটে চমকায় বিদ্যুৎ সর্পিল
(জান্নাতের হুর যেন অকস্মাৎ দিয়ে যায় দেখা,

[বর্ষায় : কাফেলা]

তিনি সকালের সূর্যোদয়, সায়াহ্নের সূর্যাস্ত কিংবা রাত জেগে প্রান্তরে হেঁটে হেঁটে আকাশের তারকারাশি দেখতেন কিনা জানি না। তবে তিনি দিবাস্বপ্নেও 'হেরার রাজ-তোরণ' দেখতেন। তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে নির্মিমেষ ছিলো এর রূপদর্শন। তাঁর মন্ময় আরাধনা ছিলো হেরার রাজ-তোরণ। সে কি দীর্ঘ মানস পরিভ্রমণ ? আকুতির শেষ নেই তাঁর; এজন্য বিনম্র সাধক তিনি। হেরার আলোকদৃষ্টির কাঁপনটুকু তাঁর হৃদয়কে যে বিশ্বস্ত করেছে, তাই এতো অবিশ্রান্ত আকুলতা। অনুভবের পরিচ্ছন্ন পরিচর্যায় একেও তিনি কবিতায় অর্জন করলেন এভাবে ঃ

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে,
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ,
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কেঁপে,
এখানে এখন অজস্র ধারা উঠছে দু'চোখ ছেপে
তবু দেখা যায় দূরে বহুদূরে হেরার রাজ-তোরণ---

[সাত সাগরের মাঝি]

বিবর্ণ মরুপথ ডিঙ্গিয়ে তিনি এখন বহু-প্রতীক্ষিত হেরার রাজ-তোরণের বিজয়োৎসবে উদ্দীপ্ত। বাঙলা কবিতায় তাঁর এই আগমন আকস্মিক। এ হাতছানিই তাঁকে কবির বড় শিরোপা এনে দিলো। এটা সম্ভব হয়েছিলো সত্যের সপক্ষে কথা বলার সাহস—মজলুম মানুষের সংস্পর্শের শোকে এবং সুনান্দনিকতার সুতীব্র ইচ্ছাশক্তিতে। হেরার আলোকরশ্মির বিভাই তাঁর চিত্তে প্রতিবিম্ব সৃষ্টি ক'রে সত্যবাদী কবির আসনে তাঁকে অভিষিক্ত করলো।

তাঁর কবিতায় কতো বিচিত্র শোভা-দীপ্ত, আরক্তিম, নীল, আনীল লোহিত, হরিদ্রাভ এবং আরো অজস্র রঞ্জন দীপক-কারুকাজ। দৃঢ়বদ্ধ সনেট তাঁর কবিতায় আনলো আরো স্বাস্থ্যোজ্জ্বল কান্তি। কবিতার এই আঙ্গিকবৈচিত্র্য তাঁর আরেক তৃপ্তিহীন অন্বেষার ফলশ্রুতি। এই পথের অভিব্যক্তিগুলো এক-একটি চমৎকৃত শিল্পকর্ম। সে অভিব্যক্তি যেমন সংহত তেমনি প্রচণ্ড শক্তিমত্তার ধারক। আকস্মিকতার প্রভাব যেমন—

www.pathagar.com

স্বাভাবিকতার প্রাণ-সজীবতাও সেক্ষেত্রে তেমন। উপরন্তু বক্তব্যের অভিনবত্ব ও সুস্পষ্ট উচ্চারণের স্বাক্ষর এক্ষেত্রে একটা চিরকালীন গ্রহণ-ক্ষমতার আগাম আভাস। তাঁর সনেটে আছে এক বিশিষ্ট সুস্বাদ আর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার প্রতিফলন। যেখানে সংহতি বা সততারও লেশমাত্র বিচ্যুতি নেই। তাঁর সনেটের একটা অবিচলিত ভঙ্গিমা আছে—এর পাঠ যে কোনো পাঠকের জন্য এক অরণ্যের মধ্যস্থলী। তার পরও সেখানে আবেগ এবং আদর্শবাদিতার কমতি নেই। এক্ষেত্রে বাংলা সনেটের আদি রূপকার মাইকেল মধুসূদনের কাছ থেকে পাঠ নিলেও কোন নির্দিষ্ট ফর্মকে তিনি এককভাবে অনুসরণ করেন নি। সেখানেও তিনি নতুনত্বের উদ্বোধন ঘটিয়েছেন। স্বরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত আর অক্ষরবৃত্তের আবর্তেই তিনি প্রলম্বিত বা সিকোয়েন্স-সনেটের নিরীক্ষায় সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন। সেখানে নাটকীয়তার গুণও সঞ্চালিত হয়েছে যা পাঠকের চিত্ত স্পর্শ করে অনায়াসে। এরকম একটা চিত্তস্পর্শী বিখ্যাত সনেট 'কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি'।

কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি। ডিপোতলে এঞ্জিন বিকল—
সুদীর্ঘ বিশ্রান্ত শ্বাস ফেলে জাগে ফাটা বয়লার,
—অবরুদ্ধ গতিবেগ। তারপর আসে মিস্ত্রিদল
গলানো ইস্পাত আনে, দৃঢ় অস্ত্র হানে বারবার।

জ্বলন্ত অগ্নির তাপে এই সব যন্ত্র-জানোয়ার
দিন রাত্রি ঘোরে ফেরে সুদুর্গম দেশে, সমতলে
সমান্তর, রেলে রেলে, সেতুপথ পার হয়ে আর
অভীষ্ট লক্ষ্যের পানে দার্জিলিংয়ে আসামে জঙ্গলে।

আহত সন্ধ্যায় তারা অবশেষে কাঁচড়াপাড়াতে।
দূরে নাগরিক আশা জ্বলে বাল্‌বে লাল-নীল-পীত ;
উজ্জীবিত কামনার অগ্নিমোহ—; অশান্ত ক্ষুধাতে
কাঁচড়া পাড়ার কলে মিস্ত্রিদের নারীর সঙ্গীত।

(হাতুড়িও লক্ষ্যভ্রষ্ট) ম্লান চাঁদ কৃষ্ণপক্ষ রাতে
কাঁচড়া পাড়ায় জাগে নারী আর স্বপ্নের ইঙ্গিত।।

[কাঁচড়া পাড়ায় রাত্রি : হে বন্য স্বপ্নেরা]

তাঁর কবিতার দেশাতত্মবোধের প্রগাঢ় অনুভূতি পাঠক-অন্তরলোকের ভাবশৈলীকে জাগিয়ে তোলে। কবিতায় দেশাত্মচৈতন্যের গভীরতা এতোই যা পাঠকের অন্তরলোকের উদ্বোধনী সুরের উন্মোচন ঘটায়। এক্ষেত্রে পাঠককে তিনি সমস্যায় আক্রান্ত করে ক্ষান্ত হয়ে যান নি, সমাধানেও নিষ্ক্রান্ত করেছেন। যেভাবে তিনি বর্তমান জীবনের ক্ষয়িষ্ণু অসুস্থতা আর অসংগতির সুসংগতিময় পথ দেখিয়েছেন ঠিক সেভাবে।

www.pathagar.com

তারপর বন্যা এল মৃত্যু-বেগে পদ্মার ফাটলে
জরাস্তব্ধ জীর্ণতটে জাগিল আকুল আর্তনাদ।

[পদ্মার ভাঙন : হে বন্য স্বপ্নেরা]

এবং ঃ

দু'শো বছরের খেলা। ব'লে গেল হাড়ের মিছিল
দু'শো বছরের মারীরোগ। সম্পূর্ণ রাখিয়াছিল
আন্তঃসার শূন্য করি। দেরী ছিল চরম পংকিল
আঘাতের পদ্মার পাড়ের মত চূর্ণ ক'রে দিল

[পদ্মার ফাটল : হে বন্য স্বপ্নেরা]

এক্ষেত্রেও যাযাবরী গতিবেগ সমানভাবে সঞ্চারিত তাঁর দেশাত্মবোধক কবিতার পঙক্তিমালায়।

কালান্তরের বাঙলা কবিতার ধ্রুপদী ঐতিহ্যের কবি-কারুকৃৎ এ কবির কবিতায় শুধু এ ভূখণ্ডেরই নয়, বরং গোটা মানবিকতার রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জা উঠে এসেছে আশ্চর্য কুশলী হাতের সুনিপুণ কারুকারিতায়। বিস্ময়কর প্রতীকে, বিদ্যুৎপ্রবাহী পটভূমিতে, অনন্য শিল্প-মাধুর্যে, তীক্ষ্ণ ও সাহসী কলমের ধারালো অভিব্যক্তিতে স্বদেশের ও বিশ্বের এমন অসাধারণ ব্যাপ্তি ইতিপূর্বে খুব কম কবির কবিতাতেই এমনভাবে রূপায়িত হয়েছে। তাঁর প্রায় প্রতিটি কবিতার পঙক্তিমালার এ আলাদা মেজাজও বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। পৃথিবীবাসী বহু মানুষের একটি সম্মিলিত আবেগের সঞ্চরণকে বহন করায়ই এটা সম্ভব হয়েছে। শতাব্দীর বাঙলা কবিতার দ্যুতিময় অভিধানে এক জ্যোতিষ্কোজ্জ্বল স্তম্ভ হিসেবে অবশ্যই তিনি চিহ্নিত হবেন। কারণ—স্রোতস্বিনী ঝর্ণার মতো যাঁর কবিতার গতি, ঐশ্বরিক নির্দেশনায় যিনি ছিলেন অনুবর্তী, প্রতীকে যাঁর কবিমনের উন্মীলন, চিত্রকল্পে যাঁর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উদ্ভাসন, ঐতিহ্যে যাঁর তওহীদী আবেগের চিত্রাংকন, সমুদ্র আর মরুচারিতা যাঁর কল্যাণকামিতার ভূয়োদর্শন, রোমান্টিকতা যাঁর পরিব্রাজক মনের মানসপট, নাগরিকতা যাঁর কবিতার দৃশ্যপট, ব্যঞ্জনা যাঁর মুক্ত সত্তার সাহসিক অরণ্যচারিতা, আদর্শবাদিতায় যিনি সুনিকেত ব্রতচারী, উপমা যাঁর উপস্থাপনার সাদৃশ্যাবলম্বী, মানবিকতায় তিনিই ছিলেন সুমিত বিশ্লেষক। অতএব অবশ্যই তিনি সফলতার চূড়োয় আরোহণ করতে সক্ষম হলেন।

আদর্শবাদিতা হচ্ছে আগুনের মধ্য দিয়ে আনন্দকে আবিষ্কার। সেখানে দাহন আছে, আকস্মিকতা আছে, মোহ আছে, নতুন সাফল্যের বিভা আছে। কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ আগুনের শিখায় সমর্পিত হয়েই আদর্শকে সযত্নে লালন করেছেন।

www.pathagar.com

ফাইজুস সালেহীন

ফর্‌রুখ-মানস : তাঁর কবিকৃতি

বাংলা তেরশো পঞ্চাশ সাল। মৃত্যুদীর্ণ সমগ্র বাংলাদেশ। মন্বন্তরপীড়িত বাংলার বিস্তীর্ণ জনপদ। চারদিকে ক্ষুধা আর মৃত্যুর আহাজারী। আকাল-আক্রান্ত মানুষের মিছিল উঠে আসে শহর-নগরে। রাজধানী কলকাতার ফুটপাতে প্রতিদিন ধুকে ধুকে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে অগণন ক্ষুধার্থ মানুষ। মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা বেশুমার বেওয়ারিশ লাশ সভ্যতাকে উপহাস করে, কিন্তু চলমান সভ্যতা মুহূর্তের জন্যেও থমকে দাঁড়ায় না। এমনি দুঃসময়ে একজন সাহসী কবির কবিতায় বাঙ্ময় হয়ে উঠলো প্রচণ্ড ধিক্কার। তাঁর নিম্নোদ্ধৃত শাণিত শব্দবাণ চমকে দিল সমাজকে ঃ

হে জড় সভ্যতা!
মৃত সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়।
তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি।

—এই বলিষ্ঠ প্রতিবাদী কবিতার জনক যিনি, তিনি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। নজরুলোত্তর বাংলা কবিতায় একটি বিশিষ্ট ধারার জন্ম দিয়ে তিনি নির্মাণ করেছেন নিজস্ব স্বতন্ত্র ভুবন। একথা নতুন করে বলবার অপেক্ষা রাখে না যে, নজরুল ইসলামই প্রথম বাংলা কবিতায় মুসলিম ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে কাব্যসুষমায় প্রস্ফুটিত করে তুলেছেন। মাইকেল-রাবীন্দ্রিক স্রোতধারা থেকে তিনি ভিন্নধারায় আত্মপ্রকাশিত। স্বীকার্য, তাঁর আরও অনেক পূর্ব থেকেই কাব্যকলায়, শিক্ষা-সাহিত্যে বাঙালী মুসলমান তার নিজস্ব জীবনবোধ তথা ধর্ম চেতনার বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে প্রয়াস পেয়েছেন। কিন্তু, তারা মাইকেল-রবীন্দ্র সীমানা অতিক্রম করতে পারেন নি। বিষয়গতভাবে ভিন্নতর মেজাজ সৃষ্টি করতে পারলেও আঙ্গিক প্রকরণে তাঁদের অধিকাংশই মাইকেল-রবীন্দ্র অনুসারী। সে কারণেই স্বতন্ত্র অবয়বে সেইসব সাহিত্যকর্ম সুপ্রকাশিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে নি। তদুপরি নিজস্ব ইতিহাস-ঐতিহ্য ও জীবনবোধের নতুনতরো সময়োপযোগী বিন্যাস-প্রবণতা তাঁদের

www.pathagar.com

মধ্যে বিরলদৃষ্ট। বরং সেক্ষেত্রে বৃত্তাবদ্ধ ঐতিহ্যপ্রীতি ছিলো প্রবল। নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে সেই উত্তরাধিকার ধারণ করেও নজরুল জন্ম দিলেন বেগবান প্রবাহ। গতানুগতিকতার দেয়াল ভেঙে দিলেন তিনি। বাণীভঙ্গি, প্রকাশ-প্রকরণে তিনি স্বকীয়তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখলেন।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নজরুলের সার্থক উত্তরসুরি। নজরুলকে তিনি আত্মস্থ করলেন। কিন্তু, তারপরও ফর্‌রুখ কাব্য-নির্মিতিতে বিস্ময়কর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দিতে সক্ষম হন। এ প্রসঙ্গেই বলা আবশ্যক যে, নজরুলোত্তর বাংলা কবিতায়, হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের অনেক কবির মধ্যেই তাঁর প্রভাব ব্যাপকভাবেই পরিলক্ষিত হয়। সমর সেন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য প্রমুখ নজরুলের সাম্যবাদী ও বিদ্রোহী মনোভঙ্গি ধারণ করে অগ্রসর হন। তাঁরা সঙ্গত কারণেই সম্পূর্ণ নজরুলকে ধারণ করতে পারেন নি। আবার নজরুলের প্রভাববলয় থেকেও তাঁদের বেরিয়ে আসা সম্ভব হয় নি ন্যূনতম মানসিক ঐক্যবোধের কারণেই। এই পরিপ্রেক্ষিতে সহজেই বোধগম্য যে, উল্লিখিত কবিবৃন্দ এবং প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের অন্য যে ক'জন কবি নজরুলানুগ হয়েছেন, তাঁদের কবিতাকর্মের মাধ্যমে নজরুল সুস্পষ্টরূপে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে নি। এমনকি নজরুলোত্তর মুসলমান কবিদের মধ্যে তাঁর প্রভাব পরিলক্ষিত হলেও বাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে নি। জসীম উদ্‌দীন, গোলাম মোস্তফা, আবদুল কাদির, বেনজীর আহমদ, কাজী কাদের নেওয়াজ প্রমুখ নজরুলের মত কবিতায় প্রচুর আরবী ফার্সী শব্দ। ব্যবহার করেছেন পুঁথি-সাহিত্য ও ইসলামের ইতিহাস থেকে কবিতার উপকরণ, উপমা-উৎপ্রেক্ষা সংগ্রহ করেছেন। আবার মাইকেল-রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরেও তাঁরা আসতে পারেন নি। নজরুলের বিদ্রোহী, সাহসী মনোভঙ্গি তাঁদের মধ্যে অনুপস্থিত তো বটেই, তদুপরি ঐতিহ্যবোধের গতানুগতিক ধারায় তাঁরা আবিষ্ট। এক্ষেত্রে ফররুখ আহমদ বিরল ব্যতিক্রম। তিনি নজরুল ইসলামকে শুধু ধারণ করলেন না, তাঁর কবিতার মাধ্যমে নজরুল পল্লবিত, বিকশিত হয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে ফররুখ নিজস্ব পৃথক আসন নির্মাণ করলেন আশ্চর্য কুশলতায়।

কবিতা-ভুবনে ফররুখ আহমদের পদার্পণ ইতিহাসের এক ক্রান্তিকালে। বিক্ষোভ তরঙ্গায়িত সমগ্র ভারতবর্ষ।—একদিকে বৃটিশের গোলামির জিঞ্জির ভাঙবার প্রাণান্তকর প্রয়াসে লিপ্ত ভারতবাসী। অপরদিকে মুসলমানদের ওপর প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের বৈরী মনোভাব। মুসলমান জনসমাজের আত্ম-বিকাশের পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেবার প্রচেষ্টায় লিপ্ত প্রতিবেশী সমাজের একশ্রেণীর রাজনৈতিক নেতা ও বুদ্ধিজীবী। এমত পরিস্থিতিতে মুসলমানদের স্বাধিকারের, পৃথক আবাসভূমির প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে ওঠে। অপর দিকে, বিদেশী শাসনের শৃংখলমুক্তির জন্যে কম্যুনিজম তথ্য মার্কসবাদী চিন্তা-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে যুবসমাজের, বিশেষ করে হিন্দু যুবকদের, একটা বিরাট অংশ।

www.pathagar.com

এই রাজনৈতিক পরিপ্রেক্ষিতের ছাপ পড়ে শিল্প-সাহিত্যের ওপর। বলা অনাবশ্যক যে, এই অবস্থা থেকে পলায়নের কোন উপায় ছিলো না। কবি-শিল্পীরা নিস্পৃহ থাকতে পারেন নি। পারবার কথাও নয়। এই অস্থির সময়ের গোড়ার দিকে প্রকাশিত হন নজরুল। নজরুলের কবিতা কর্মে সময়ের ছাপ সুস্পষ্ট। রাজনৈতিক দোলাচলে নজরুল একাৎ ওকাৎ হয়েছেন—একথাও স্বীকার্য। কিন্তু, শেষ পর্যন্ত তিনি আত্মবিস্মৃত হতে পারেন নি, হতে পারেন নি ঐতিহ্যবিমুখ। আবার উত্তরকালের ফররুখ আহমদের মত তিনি স্থিতধী আদর্শনিষ্ঠও হতে পারেন নি। 'গাহি সাম্যের গান/মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহীয়ান।'—এই ছিলো তার সবকথার শেষ কথা। নজরুলের এই মনোভঙ্গিটিই আংশিক ধারণ করেছেন পরবর্তীকালের মার্কসবাদী কবিগণ। আগেই উল্লিখিত হয়েছে যে, এঁদের মধ্যে সমর সেন, সুভাষ ও সুকান্তের নাম উল্লেখযোগ্য। এই সময়েরই কবি-পুরুষ ফর্‌রুখ আহমদ।

নজরুলের ভাবাদর্শ—তাঁর বিদ্রোহী মানসপ্রবণতা, ঐতিহ্যপ্রীতি সমাজমনস্কতা ও সাম্যবাদী চেতনায় তিনি উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন। পাকিস্তান আন্দোলনের কালে যে মুসলিম রেনেসাঁসের সূচনা হয়, তা নিঃসঙ্গে ফররুখ আহমদকে আরও দৃঢ়চিত্ত করে তোলে। এ অবস্থায় মনোগতভাবে প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের সাম্যবাদী কবিদের অনেকটা কাছাকাছি অবস্থান করেও ফররুখ আহমদ পৃথক এবং বাঞ্ছিত এক সড়কের মুসাফির হয়ে রইলেন। এটাই সম্ভবত ফর্‌রুখের সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

যে কোনো বিচারে ফর্‌রুখ আহমদ বাংলাদেশের বৃহত্তর জন মানুষের কবি। কবি-জীবনের প্রারম্ভিককাল থেকে শেষদিন পর্যন্ত তিনি ছিলেন অন্যায় আর অসুন্দরের বিপক্ষে। মেহনতি মানুষের জন্যে গভীর মমতায় আচ্ছন্ন ছিলো তাঁর সম্পূর্ণ মন। তাঁর কবিতার ছন্দে-শব্দে অনুরণিত নিগৃহীত মানুষের নিঃশব্দ প্রতিবাদ। মানুষে মানুষে অমানবিক বৈষম্যের পাশে ঘুণে-ধরা সভ্যতার ক্লেদাক্ত জৌলুস। এটা কবিকে পীড়িত করেছে গভীরভাবে। দেখে-শুনে তিনি বারবার মর্মাহত হয়েছেন, কিন্তু নিমজ্জিত হন নি হতাশার গভীর। তিনি প্রতিবাদী হয়েছেন, ব্যক্ত করেছেন আশাবাদ।

এই মৃত মরুতটে যদি তুমি দাঁড়াও সন্ধানী,
মানুষের এ মিছিলে দিতে পারো যদি গতিবেগ,
অনায়াসে সেই ঝড় আবার তুলিবে তারা টানি ;
মৃত মাঠে দিয়ে যাবে সাহারার উদ্দাম আবেগ।

—এই কবিতাংশে ফর্‌রুখ আহমদ যে প্রতীকী ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেন তা সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ কবিতার আবেগ এক রোমান্টিক আবহে পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে যায়। শব্দগত অর্থ উদঘাটনের আগেই পাঠক-মনে কবির বাণী পৌঁছে দেয়। কোনো সার্থক কবিতার এটি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। এই প্রসঙ্গে এলিয়টের উক্তি স্মরণযোগ্য—

www.pathagar.com

Genuine poetry can communicate, before it is understood.

এই বিবেচনায় ফর্‌রুখ আহমদ অবশ্যই সার্থকতার দাবী রাখেন। বস্তুত ফররুখ আহমদের কবিতার চরণে চরণে যে তরঙ্গায়িত ধ্বনি প্রবাহ তা পাঠকের চিত্তে একটি সুকুমার মোহমুগ্ধতা সৃষ্টি করে, একটি স্বপ্নাচ্ছন্ন নতুন সম্ভাবনার ইঙ্গিত আনে।

[শব্দের অনুষঙ্গে আধুনিক কবিতা : সৈয়দ আলী আহসান]

তিনি যখন বলেন,

হে নাবিক! তুমি মিনতি আমার রাখো
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি-মাল্লার দলে
দেখবে তোমার কিশতি আবার ভেসেছে সাগর জলে।
নীল দরিয়ায় যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ-তরঙ্গ কেটে কেটে চলে ভেঙে চলে সব বাঁধ।

তখন একই ললিত সৌন্দর্যকামী আহবান ঢেউ খেলে যায় পাঠক-হৃদয়ে। এর অন্তর্নিহিত বক্তব্য উপলব্ধির আগেই চিত্ত দোলায়িত হয়ে ওঠে। এখানে 'নাবিক', 'মাঝি-মাল্লা', 'কিশ্‌তি', 'নীল দরিয়া', 'পূর্ণচাদ'—ইত্যাদি শব্দ গভীর অর্থবহতায় বিস্তৃত। আভিধানিক অর্থের সীমানা ছাড়িয়ে শব্দগুলো কবিতাংশে বিশিষ্ট চেতনায় অভিব্যক্ত, গভীরতরো তাৎপর্যবাহী। ইংরেজী কবিতায় Imagist Movement-এর প্রবর্তক এজরা পাউণ্ডের মত ফর্‌রুখের এই কবিতায় এবং অধিকাংশ কবিতায় শব্দ তার অনুভবের যথার্থ প্রতীক হয়ে ওঠে। ধরা যাক এই কবিতাংশের কথাই—স্বতন্ত্র আসনে অবস্থান করে নয়, বরং সাধারণের সঙ্গে একাত্ম হয়েই সম্ভব কল্যাণগামী হওয়া। এখানে 'মাঝি-মাল্লার' সেই সাধারণেরই প্রতীক। বৃহত্তর জীবন-সমাজের রূপক 'কিশতি', আর 'পূর্ণচাঁদ' কবির মানসসৌন্দর্যের নিটোল উপমা।

ঘুণেধরা জরাজীর্ণ সমাজ বদলে এক নতুন সমাজ নির্মাণের অনিমেশ স্বপ্ন ছিলো স্বাপ্নিক কবি ফর্‌রুখ আহমদের। ফরাসী কবি পল এলুয়ার যেমন বলেন ঃ

সময় এসেছে যখন সব কবির উপর অধিকার ও কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে, এই কথা ঘোষণা করবার যে, তারা অন্য মানুষদের জীবনে, সর্বসাধারণের জীবনে গভীরভাবে প্রোথিত। ... মূক জনতার হয়ে কথা বলবার সাহস তার থাকা চাই।

[ভূমিকা : সুকান্ত সমগ্র]

তেমনই কবি ফররুখ আহমদের অনুভব নিশ্চিতভাবে সর্বসাধারণের জীবনে প্রোথিত। তাঁর কবিতায় সেই সাহসেরও পরিচয় বিধৃত। এই অনুভব আর সাহসের উজ্জীবনই কবিকে অবিচল আদর্শবাদিতা, স্বদেশের মৃত্তিকা ও প্রকৃতি-সংলগ্ন করে তোলে। ইসলামকে তিনি শুধুমাত্র একটি ধর্ম, একটি মূল্যবোধ কিংবা অনুভব হিসাবে

www.pathagar.com

গ্রহণ করেন নি। বরং এর অন্তর্নিহিত ভাবাদর্শকে তিনি জীবনাদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেন। মুক্তির কার্যকর ও বৈজ্ঞানিক মতবাদ হিসাবে মনে করেন। 'হেরার রাজ-তোরণ' —তাঁর মানসপটে সাম্যের, শোষণমুক্ত সমাজের অনিবার্য প্রতীক হিসাবে ধরা পড়েছে। এই আদর্শ, এই বিশ্বাস থেকে তাঁর সামান্যতম স্খলন ঘটে নি আমৃত্যু। সে কারণেই ইতিহাস-ঐতিহ্য তিনি বিস্মৃত হতে পারেন নি। নতুন দিনের স্বপ্নচারী হয়েও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অতীতকে উপেক্ষা করেন নি। সমকালীন অন্যান্য সাম্যবাদী কবির সাথে তাঁর বড় পার্থক্য এখানে। প্রতিবেশী সম্প্রদায়ের মার্কসীয় চিন্তার অনুগামী সাম্যবাদী কবিরা যখন তাদের অতীতকে মুছে ফেলতে, আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করতে প্রয়াসী, তখন ফর্‌রুখ আহমদ তাঁর ঐতিহ্যের শক্ত ভিতের ওপর দাঁড়িয়ে দিনবদলের ডাক দিয়ে এলেন।

পাশাপাশি বাংলাদেশের মাটি ও প্রকৃতির সঙ্গে তাঁর নাড়ির গভীর সম্পর্ক তাঁর কবিতায় সুপ্রকাশিত হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র আঙ্গিকপ্রকরণে :

বঞ্চিত তনু মনে শুধু জাগে রুক্ষ কঠিন হাড়,
শ্রাবণ-সঘন-বাদল-ঝরানো রজনী ব্যথা নিসাড়

[সাড়া]

অথবা—

সবুজের বন, বেতকির বন
সে কি শুধু হবে মনসা ঝোপ!

[নিশান]

কিংবা—

ধূলিতলে মিশে যায় রজনীগন্ধার-সুঠাম, সুগোল তনুতল,
ফোটায়ে বিশুভ্র দল, ঝরায়ে সুরভি অনর্গল
আরণ্য হেনার ঝড়ে সৌরভ মর্মরে
ভুলে যেয়ে আবর্তের টান।

এইভাবে ফর্‌রুখের কবিতায় প্রকৃতি উঠে এসেছে অবলীলায় বিভিন্ন প্রকরণে, নানা অভিব্যক্তি নিয়ে। তার আদর্শিক কবিতা কৃতিত্বে তিনি নিপুণতার সঙ্গে সংস্থাপিত করেন বাংলাদেশের প্রাকৃতিক উপকরণ। এই প্রক্রিয়ায় তিনি অন্বেষণ করেন অফুরান সৌন্দর্য। কালবৈশাখীর রুদ্র ভয়ংকর রূপের আড়ালে ফর্‌রুখ নতুন সংগ্রামের উপমা খুঁজে পান। প্রত্যয়-দৃঢ় কণ্ঠে আহবান করেন :

তুমি বিপ্লবের দূত জীর্ণ-প্রথা গতানুগতিক
ধ্বংস করি পৃথিবীকে জানাও সৃষ্টির সমাচার
মুহূর্তের মাঝে আনো জীবনের ধারা বৈপ্লবিক,
তোমার চলার তালে শেষ হয় রুগ্ন জড়তার।

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের এই প্রকৃতিলগ্নতা পূর্ববর্তী ও সমকালীন অপরাপর কবিদের থেকে স্বতন্ত্র। জীবনানন্দ দাশের মত তিনি শান্তি বা সিরিনিটির আবহ নির্মাণ করেন নি, জসীম উদদীন, বন্দে আলী মিয়া প্রমুখের মুগ্ধ প্রকৃতি বর্ণনার সঙ্গেও তা তুল্য নয়। বস্তুত ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কবিতায় নিরেট কলা-কৈবল্যবাদকে প্রত্যাখ্যান করে সুন্দরতম গন্তব্যের দিকে যাত্রা করেন। কিন্তু, সেই অভিযাত্রা অবশ্যই শিল্পিত, কুসুমিত। অসংযত শ্লোগানমুখর নয়। পূর্বসূরি নজরুলের বিদ্রোহী ও প্রতিবাদী চেতনাকে তিনি ধারণ করেন বটে, কিন্তু তাঁর অসংযম আর চাঞ্চল্যকে নয়। দু'একটি ব্যতিক্রম ছাড়া ফর্‌রুখের কবিতা পরিশীলিত, ঋজু। সে কারণেই নজরুলের অনুগামী হয়েও ফর্‌রুখ স্বকীয়তায় উজ্জ্বল। নজরুলের কবিতার ইসলামী চেতনার স্ফূরণ, বিদ্রোহের স্পর্ধিত উচ্চারণ নিঃসন্দেহে ফর্‌রুখকে আলোড়িত করেছিলো। নজরুলের মত তিনিও কবিতায় প্রচুর ব্যবহার করেছেন আরবী-ফারসী শব্দ। আমাদের লোক-সাহিত্য পুঁথিসাহিত্য থেকে সংগ্রহ করেছেন কবিতার উপকরণ উপমা। এই প্রক্রিয়ায় আধুনিক অবয়বে তিনি স্বরূপ অন্বেষণ করেছেন।

ফর্‌রুখ আহমদ কীটসের সৌন্দর্যতত্ত্বের নামে পলায়নবাদিতা প্রত্যাখ্যান করেন অত্যন্ত সচেতনভাবে।

What imagination seizes as beauty must be truth whether is existed before or not.

সুন্দর বলে যা অনুভূত হয় বাস্তবে তার অস্তিত্ব থাক বা না থাক তাই সুন্দর। এমত ধারণাকে ফর্‌রুখ কখনই প্রশ্রয় দেন নি। তিনি অবশ্যই সুন্দরের অন্বেষণ করেছেন, কিন্তু তা ভিন্নতরো, প্রচণ্ড রকম জীবননিষ্ঠ।

রাত্রির অরণ্যতটে হে অশ্রান্ত পাখী
নাও ডাকি ডাকি
অবাধ মুক্তির মত।'

[ডাহুক]

অথবা—

আজ আমি খুঁজে মরি
পাতায় পাতায়, ঘাসে ঘাসে,
পাই না তোমাকে। শুধু বহুদূর হতে গন্ধ আসে
ভেসে যায় মাঠ, মন মুহূর্তের রক্তিম প্রশ্বাসে।

[ঝরোকা'য়]

এইভাবে ফর্‌রুখ আহমদের কবিতায় অফুরান সৌন্দর্য, উদাত্ত কল্পনা তাঁর দীপ্ত আদর্শের উদ্ভাস নিয়ে উপগত। 'ডাহুকের অশ্রান্ত ডাক' কিংবা 'মুহূর্তের রক্তিম প্রশ্বাস'

www.pathagar.com

যে প্রতীকী দ্যোতনার জন্ম দেয় তা এক অনাবিল মুগ্ধতায় প্রকর্ষিত। কিন্তু, মুগ্ধ আবেশ নির্মাণ করতে গিয়ে তিনি জড় বাস্তবতা থেকে পলায়ন করেন নি।

যৌবনের প্রারম্ভিককালে ফররুখ আহমদ সম্ভবত বামপন্থী রাজনীতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। পরবর্তীতে বৃহত্তর জীবনোপলব্ধি তাঁকে টেনে নিয়ে আসে বাম-বৃত্তের বাইরে। ইসলামের মূলীভূত দর্শনের মধ্যে তিনি অন্বেষণ করেন মানুষের মুক্তি। সে কারণে একথা দ্বিধাহীনভাবে বলা যায় যে, চল্লিশ দশকের গোড়ার দিকে ফর্‌রুখের দৃষ্টিভঙ্গির বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলেও, তাঁর মৌল মানসপ্রবণতা থেকে যায় অপরিবর্তিত। 'হে বন্য স্বপ্নেরা' কবিতাগুচ্ছ তাঁর বামচিন্তার ফসল বলেই মনে হয়। কিন্তু, বিস্ময়করভাবে লক্ষণীয় যে, তাঁর পরবর্তী কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে পূর্বের কবিতাগুচ্ছের ভাবগত সাদৃশ্য রয়েছে। 'হে বন্য স্বপ্নেরা' কবিতাগ্রন্থে তিনি যেমন অত্যন্ত সাহসী হাতে উন্মোচন করেছেন সমকালীন রুগ্ন সমাজের ক্ষত, তেমনই পরবর্তীতেও তিনি বারবার কবিতায় ঝংকার তুলেছেন প্রতিবাদের, বিদ্রোহের। আহবান জানিয়েছেন নতুন দিনের। এখানে দু'একটি উদাহরণ তুলে ধরা যাক :

ঐ দেখো শিশু কাঁদে, ঐ শোন দিকে দিকে মৃত্যুর খবর,
চিরদিন বয়ে মরে ধরণীর সুপ্ত শিশু নিরাশার স্তর,
ওরা জাগে চিরদিন ব্যথাতুর ঘুমহারা রাত্রির প্রহর,
পেষণের মর্মান্তিক কালোচাপ রচিতেছে ওদের কবর,
কল-কারখানা গর্ভে আঁকড়িয়া প্রতিদিন ধনীর শহর,
মাঠে মাঠে, শস্যক্ষেতে জলে-স্থলে রচিতেছে ওদের কবর।

[পরিপ্রেক্ষিত : হে বন্য স্বপ্নেরা]

যৌবনের রাজনৈতিক চিন্তার বলয় থেকে বেরিয়ে এসেও কবি বললেন :

এখনো আঁধারে হানা দিয়ে ফেরে পুঁজিবাদী পাপ ;
এখনো আকাশ ভরে মানুষের আর্তরোলে ;
এখনো ছড়ায় পথে-প্রান্তরে কোটি অভিশাপ,
ধনতন্ত্রের প্রেত ঘোরে আজও চতুর্দোলে

[শিকল : কাফেলা]

শেষোক্ত কবিতা প্রসঙ্গে এখানে আরেকটি বিষয় উল্লেখের দাবী রাখে। আর সেই বিষয়টি হচ্ছে অবিচল আদর্শবাদিতা এবং এক্ষেত্রে তাঁর নিরাপোস ভূমিকা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, পারিপার্শ্বিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক গতি-প্রবাহ থেকে শিল্পী-কবিরা বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না। আর অনেকের মত ফর্‌রুখের কবিমানসেও সময়ের ছাপ স্পষ্ট, অপরাপর মুসলমান কবি-সাহিত্যিকের মত ফর্‌রুখ আহমদের মনেও

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দেলন একটি স্বপ্ন, একটি সুন্দর আকাঙক্ষার জন্ম দিয়েছিলো। সেই অনির্বাণ আকাঙক্ষার বহিঃপ্রকাশ ঘটে তাঁর সেই সময়ের বহু কবিতায়। একটি উদাহরণ :

—দু'শো বছরের সেই শৃঙ্খলিত প্রাচীন সড়ক
বিগত দুঃস্বপ্ন আজ দিগ্বলয়ে নতুন তর্জনী।
(সূর্যের সান্নিধ্য বুঝি নিশান্তের সীমানা পৃথক)
নতুন প্রাণের সাড়া যে ইঙ্গিতে ওঠে রণরণি ;

[নয়া সড়ক : কাফেলা]

কিন্তু, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অচিরেই সে স্বপ্ন-আকাঙক্ষা ভেঙে যায়। তখনই তিনি লিখলেন পূর্বোক্ত 'শিকল'-এর মত কবিতা। স্বপ্ন ভেঙে যাবার খবর দ্বিধাহীনভাবে তিনি উচ্চারণ করলেন এই কবিতায়।

ফর্‌রুখ আহমদ নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করতেন পৃথক জাতিসত্তায়। বাঙালী মুসলমানের আলাদা পরিচয়, আলাদা জীবন-সংস্কৃতির প্রতি তিনি ছিলেন বিশ্বস্ত। এমনকি, ইসলামী মূল্যবোধে প্রচণ্ডরূপে উজ্জীবিত হবারও আগে তাঁর কবি-মানসে এ বোধ জাগ্রত ছিল। "হে বন্য স্বপ্নেরা" কবিতাগুচ্ছেই তার অনেক প্রমাণ মেলে। যেমনঃ

দিনরাত্রি চেয়ে দেখি বিপক্ষে আমার
অগণন ফেরাউন-কারুণের ব্যূহ,
দেখি চেয়ে শড়কের
প্রতি প্রান্তে অসহায় বনি-ইস্রাইল
তেমনি সন্ধান করে মুসা কালীমের,
সারা পথ কেঁপে ওঠে বন্দী বেদনায়...
মজলুমের লোহু ধারে ভেসে যায়

[ব্যক্তিগত : হে বন্য স্বপ্নেরা]

এ প্রসঙ্গে আবুল ফজলের উক্তি প্রণিধানযোগ্য :

ইংরেজ যুগ, পাকিস্তান আমল, পরিশেষে স্বাধীন বাংলাদেশ—এ তিন সংঘাতমুখর যুগের অনেক ঝড়-ঝাপ্টায় আরো অনেকের মতো এ কবির জীবনও কেটেছে, এ ঝড়-ঝাপ্টায় অনেকেই বিচলিত হয়েছেন, হয়েছেন লক্ষ্যভ্রষ্ট। অনেক কবি-সাহিত্যিক-শিল্পীও এ পরিণতি এড়াতে পারেন নি। অনেকের মন-মানস নোঙরহীন নৌকোর মতো বারবার দোলা খেয়েছে, হয়েছে এ-কাৎ ও-কাৎ। কিন্তু, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ অবিচল থেকেছেন সর্ব অবস্থায় নিজের লক্ষ্য ও আদর্শে।

গভীর মানবপ্রেম, বিশিষ্ট সংস্কৃতিচিন্তা এবং গভীর ধর্ম অনুরাগ এই সব মিলিয়ে ফররুখ আহমদের যে মানস—তার ভিত্তি রচনায় আল্লামা ইকবালের দর্শনের প্রভাবও

www.pathagar.com

যথেষ্ট বলেই মনে হয়। ইকবাল সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য থেকেও বিষয়টি অনুমান করা যায় :

> ব্যক্তি ও সমাজকে তিনি দিয়েছেন সঠিক পথের নির্দেশ। কীটসীয় এস্কেপিজম তাঁকে অভিভূত করতে পারে নি, প্লেটোর দর্শন এবং ভারতীয় বৈরাগ্যের সুরকেও তিনি উপেক্ষা করেছেন। তাঁর মনের পূর্ণ পরিচয় পেতে হলে, আমাদের উঠতে হবে তাঁর মননের উচ্চস্তরে, যেখানে Iqbal stands on hill by himself.
>
> [Dr. R. A. Nicholson]

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সম্পূর্ণ মানস ধর্মবোধে উদ্দীপ্ত ছিল। কিন্তু তিনি যা ছিলেন না, তা হলো ধর্মান্ধ, আত্মপ্রবঞ্চক। ধর্মানুরাগের মুখোশ তিনি কখনো পরেন নি। চিন্তা-চেতনার ভণ্ডামীর আশ্রয় নেন নি ; যা সত্য ও সুন্দর বলে জেনেছেন তা তিনি বলেছেন অকপটে—দুঃসাহসী কণ্ঠে। ধর্মের নামে প্রবঞ্চনা, স্বার্থান্বেষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে তিনি কত বেশী সচেতন ও সোচ্চার ছিলেন, তা বোঝা যায় তাঁর একাধিক প্রবন্ধ থেকে। মাতৃভাষা প্রসঙ্গে তিনি যখন বলেন :

> বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষায় রূপায়িত করলে ইসলামী ঐতিহ্যের সর্বনাশ হবে, এই তাঁদের অভিমত।
>
> কী কুৎসিত পরাজয়ী মনোবৃত্তি এর পেছনে কাজ করছে একথা ভেবে আমি বিস্মিত হয়েছি। যে মনোবৃত্তির ফলে প্রায় দু'শো বছর বাংলা ভাষায় ইসলামের প্রবেশ প্রায় নিষিদ্ধ ছিল, সেই অন্ধমনোবৃত্তি নিয়েই আবার আমরা ইসলামকে গলা টিপে মারার জন্য তৎপর হয়েছি।

তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ফররুখ আহমদের মাতৃভাষাপ্রীতি প্রশ্নাতীত। বস্তুত বাংলার মৃত্তিকা, আলো-হাওয়া এবং মুসলিম ঐতিহ্যের রোশনাইয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর কবি-মানস। তিনি ছিলেন একজন বাঙালী, একজন মুসলমান—সেই অর্থে বাঙালী মুসলমান। এই সত্যেরই উদ্ভাসে প্রোজ্জ্বল ফর্‌রুখ আহ্‌মদের সৃষ্টি-সমগ্র।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

কবি অমর

www.pathagar.com

যিনি সত্যিকার কবি তাঁর মৃত্যু সাময়িক, চিরন্তন নয়; তিনি সাময়িকভাবে উপেক্ষিত ও অবহেলিত হতে পারেন, কিন্তু চিরদিনের জন্যে বিস্মৃত হতে পারেন না; তিনি তাঁর ভাবনার, কল্পনার ও শিল্প রচনার যে জগৎ সৃষ্টি করেন সে জগৎ সকল যুগের, সকল দেশের, সকল মানুষের আনন্দোপভোগের জগৎ। ফররুখ জীবনের শেষ অধ্যায়কে লক্ষ্য করে এবং তাঁর মৃত্যু-পরবর্তী ঘটনা থেকে তা আমরা উপলব্ধি করতে পারি। আমরা দেখি, প্রতিকূল সময়ে সত্য কবির পক্ষে বিবেকের কণ্ঠ হ'য়ে দাঁড়িয়ে যায়।

এখানে যে চারটি লেখা প্রকাশিত হল প্রথমটি কবির জীবনের অন্তিম কালে এবং পরবর্তী তিনটি কবির মৃত্যু-পরবর্তী কালে রচিত। এই লেখা কটি প্রমাণ করে কবির মৃত্যু নেই, কবি অমর।

অমূল্য-ইতিহাস

লেখা ক'টি আমরা আমাদের মূল বিষয় থেকে পৃথক করে ছাপলাম এই জন্যে যে, এ-গ্রন্থের মূল বিষয় থেকে চরিত্র-ধর্মে এরা কিছুটা পৃথক, কিন্তু কবি-জীবনের সার্বিক সমীক্ষা ও মূল্যায়নে এরা অমূল্য ইতিহাস।

বলা বাহুল্য, এই লেখাগুলো তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার ফল বলে এর দু'একটিতে ক্রুদ্ধ অসহিষ্ণু চিত্তের উৎক্ষেপ ঘটেছে। কিন্তু মুদ্রিত এই লেখা যেহেতু আজ ইতিহাস, তাই এদের পরিমার্জিত করা থেকে নিবৃত্ত থেকেছি।--সম্পাদক

www.pathagar.com

মৃত্যুর আগে

আহ্‌মদ ছফা

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কি অপরাধ

খবর পেয়েছি, বিনা চিকিৎসায় কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মেয়ে মারা গেছে। এই প্রতিভাধর কবি, যাঁর দানে আমাদের সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়েছে—পয়সার অভাবে তাঁর মেয়েকে ডাক্তার দেখাতে পারেন নি, ওষুধ কিনতে পারেন নি। কবি এখন বেকার। তাঁর মৃত মেয়ের জামাই, যিনি এখন কবির সঙ্গে থাকছেন বলে খবর পেয়েছি, তাঁরও চাকুরি নেই।

মেয়ে তো মারাই গেছে। যারা বেঁচে আছেন, কি অভাবে, কোন্ অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে দিনগুলো অতিবাহিত করছেন, সে খবর আমরা কেউ রাখি নি। হয়তো একদিন সংবাদ পাবো, না খেতে পেয়ে বৃদ্ধ কবি মারা গেছেন অথবা আত্মহত্যা করেছেন। খবরটা শোনার পরপর আমাদের কবিতাপ্রেমিক মানুষের কি প্রতিক্রিয়া হবে? ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মৃত্যু-সংবাদে আমরা কি খুশী হবো? নাকি ব্যথিত হবো? হয়তো ব্যথিতই হবো। এ কারণে যে, আজকের সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মতো একজনও শক্তিশালী স্রষ্টা নেই। এমন একজন স্রষ্টাকে অনাহারে রেখে তিলে তিলে মরতে বাধ্য করেছি আমরা। ভবিষ্যৎ বংশধর আমাদের ক্ষমা করবে না। অথচ কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মরার সমস্ত ব্যবস্থা আমরাই পাকাপোক্ত করে ফেলেছি। আমরা তাঁর চাকুরি কেড়ে নিয়েছি, তাঁর জামাই এবং অন্যান্য আত্মীয়-স্বজনদের সৎভাবে পরিশ্রম করে বাঁচবার রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছি। রাস্তাঘাটে কবির বেরোবার পথ বন্ধ করে দিয়েছি। প্রয়োজনীয় সবগুলো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আমরা ত্রুটি রাখি নি।

কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে আমরা এতো সব লাঞ্ছনার মধ্যে ফেলেছি, তার কারণ তো একমাত্র কবিতাই। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের একমাত্র অপরাধ তিনি একদা পাকিস্তানের সপক্ষে কবিতা লিখেছেন। তাঁর কবিতায় বিশেষ জীবনাদর্শের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ পেয়েছে। আর সে জীবনাদর্শটি দুষ্ট লোকের ভাষায় ইসলামী জীবনাদর্শ। এখন কথা হলো, তখন কি পাকিস্তানের সপক্ষে কবিতা লেখা অপরাধ ছিলো? আমরা যতটুকু জানি, পাকিস্তান এবং ইসলাম নিয়ে আজকের বাংলাদেশে লেখেন নি, এমন কোনো কবি-সাহিত্যিক নেই বললেই চলে। অন্য অনেকের কথা বাদ দিয়েও কবি সুফিয়া কামালের

পাকিস্তান এবং জিন্নাহ্‌র ওপর নানা সময়ে লেখা কবিতাগুলো জড়ো করে প্রকাশ করলে 'সঞ্চয়িতা'র মতো একখানা গ্রন্থ দাঁড়াবে বলেই আমাদের ধারণা। অথচ ভাগ্যের কি পরিহাস! কবি সুফিয়া কামাল বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক প্রতিনিধি হয়ে মস্কো-ভারত ইত্যাদি দেশ সফর করে বেড়াচ্ছেন আর ফর্‌রুখ আহ্‌মদ রুদ্ধদ্বার কক্ষে বসে অপমানে লাঞ্ছনায় মৃত্যুর দিন গুণছেন। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিরুদ্ধে আরেকটি অভিযোগ, আরবী-ফারসী শব্দ ব্যবহার করে বাংলা ভাষার সতীত্ব হানি করেছেন। কিন্তু কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নিজে বলেছেন, তিনি শব্দ নিয়ে এক্সপেরিমেন্ট করছেন। এই শব্দ নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কবিতার ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই দূষণীয় নয়। বিশেষত বাংলাদেশে এমন একটা সময় ছিলো, কবি-সাহিত্যেকেরা উর্দু-ফারসীঘেঁষা দেখাতে পারলে বর্তে যেতেন। তাঁদের অনেকেই এখন বাংলাদেশ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ পদে আসীন রয়েছেন। তাছাড়া ইংরেজী, জার্মান, সংস্কৃত ইত্যাদি ভাষা নিয়ে যাঁরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কবিতা গল্প লিখতে চেষ্টা করেছেন, তাঁদেরকে সেসকল রচনার জন্যে পুরস্কৃত করতেও আমাদের বাধছে না। এ সবের ফলে যে বাংলাভাষা সমৃদ্ধ হচ্ছে, সত্যিকার অর্থে সে বিচার কে করবে? অথচ অন্য কবি-সাহিত্যিক সকলে বাইরে রয়েছেন, কিন্তু শাস্তি ভোগ করছেন একা ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। এ কেমনধারা বিচার? ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বিরুদ্ধে যে দু'টি উল্লেখযোগ্য নালিশ রয়েছে, সেগুলো হলো—তিনি রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে চল্লিশজন স্বাক্ষরকারীর একজন। তিনি অন্ধভাবে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছেন। কিন্তু স্বাক্ষরদানকারী চল্লিশজনের অনেকেই তো এখনো বাংলাদেশ সরকারের বড়ো বড়ো পদগুলো অলংকৃত করে রয়েছেন। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে একা কেনো শাস্তি ভোগ করতে হবে? আর পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন না কে? আজকের বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তো এক সময়ে পাকিস্তান আন্দোলনে উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। সাতই মার্চের পূর্ব পর্যন্ত তিনি পাশাপাশি 'জয় বাংলা' এবং 'জয় পাকিস্তান' শব্দ দুটো উচ্চারণ করেছিলেন। তা হলে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অপরাধটা কোথায়? বলা হয়ে থাকে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময়ে তিনি অনেক বেশী সাম্প্রদায়িক বিষোদগার করেছিলেন। সেপ্টেম্বরের যুদ্ধের সমস্ত প্রমাণ এখনো নষ্ট হয়ে যায় নি। বাংলাদেশের সমস্ত লেখক-কবি-সাহিত্যিক সাম্প্রদায়িকতার প্রচারে কে কার চাইতে বেশী যেতে পারেন, সে প্রতিযোগিতায় নেমেছিলেন। কেউ যদি চ্যালেঞ্জ করেন, আমরা দেখিয়ে দিতে পারি। মানুষের স্মৃতি এতো দুর্বল নয় যে, হিং-টিং-ছট ইত্যাদি প্রোগ্রামগুলো ভুলে গেছে। ঐ সমস্ত প্রোগ্রাম যারা করেছে, সংস্কৃতির সে সকল কলমধারী গুণ্ডারা বাংলাদেশে বুক চিতিয়ে শিক্ষা-সংস্কৃতির আসন দখল করে আছে —কি আশ্চর্য, চাকুরী হারাবেন, না খেতে পেয়ে মারা যাবেন একা ফর্‌রুখ আহ্‌মদ!

www.pathagar.com

এতো সব দোষের মধ্যেও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কতিপয় গুণের কথা আমরা না উল্লেখ করে পারছি না। সেপ্টেম্বর যুদ্ধের পরে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে যখন প্রাউড অব পারফরমেন্স দেয়ার কথা ওঠে, তিনি অস্বীকার করেছিলেন। আমরা শুনেছিলাম, তিনি বলেছিলেন, একজন কবির ক্ষমতাদর্পীর হাত থেকে নেয়ার কিছুই নেই। খবর পেয়েছিলাম, সে প্রাইড অব পারফরেমন্স এমন একজন সাহিত্যসেবীকে দেয়া হয়েছিলো, এখন যত্রতত্র তাঁর শোক সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। সরকারী-বেসরকারী দলের সকলেই তাঁর কথা মনে করে শোকাশ্রু বর্ষণ করছেন। মজার কথা হলো, তিনিও দখলদার পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা বাধ্য হয়ে পাকিস্তানের সপক্ষে বক্তব্য রেখেছিলেন। যাকে নিয়ে এতো লাফালাফি হচ্ছে, তিনি যদি বেঁচে থাকতেন আজ হয়তো কারাগারেই থাকতেন। আমাদের কথা হলো, ফর্‌রুখ আহ্‌মদের মতো একজন শক্তিমান স্রষ্টার চাকুরী কেড়ে নিয়ে সপরিবারে তাঁকে মৃত্যুযন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করার পেছনে ন্যায়-নীতিসঙ্গত যুক্তিটা কি হতে পারে?

আমরা বাংলাদেশের আরো একজন খ্যাতনামা কবির কথা জানি, যিনি পাকিস্তানী দখলদার সৈন্যদের তত্ত্বাবধানে সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিকটির সম্পাদকীয় রচনা করেছিলেন। ঐ পত্রিকায় চাকুরী করেন এমন আর একজন কবি সম্পর্কে কানা-ঘুষা শোনা যাচ্ছে যে, তিনি পাকিস্তানী মেজর-ক্যাপ্টেনদের সাহায্যে নাম ভাঙিয়ে লাহোর-করাচী ছুটোছুটি করেছেন। কেউ যদি আমাদের বক্তব্যকে অসত্য মনে করেন, বাস্তব প্রমাণ দাখিল করতে পারবো।

কতো মুসলিম লীগ-জামাতে ইসলামীর গুণ্ডা, এন. এস. এফ.-এর চর সরকারী আনুকূল্যে পুনর্বহাল হয়েছেন, তাদের সংখ্যা হাজারকে হাজার; একজন-দু'জন নয়। কিন্তু শাস্তিভোগ করবেন —একজন আত্মমর্যাদা জ্ঞান-সম্পন্ন কবি! এ ধরনের অবিচার আমাদের এ বাংলাদেশেই হওয়া সম্ভব। প্রসঙ্গত ভূতপূর্ব 'পাকিস্তান অবজার্ভার' পত্রিকার কুখ্যাত বার্তা সম্পাদক এ. বি. এম. মূসার নাম করতে পারি। এই মূসা সাহেব মুক্তিযুদ্ধ চলা সময়ে কলকাতায় যেয়ে হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এ আওয়ামী লীগারদের বিরুদ্ধে যে বিষোদগার করেছিলেন, দেশপ্রেমিক নাগরিকদের মন থেকে সে স্মৃতি এতো তাড়াতাড়ি মুছে যায় নি। মুছে যাওয়া সম্ভব নয়। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের দেশপ্রেমিক সম্মানটি দিতেও রাজী ছিলেন না। হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড-এ তাদের রোবল বলে অভিহিত করেছিলেন। সেই মূসা সাহেব এখন বাংলাদেশের সংসদ সদস্য। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অপরাধ শেষ পর্যন্ত এই দাঁড়ায় যে, তিনি অন্যান্য বিশ্বাসঘাতকদের মতো স্লোগান বদল করতে পারেন নি। সৎ কবিরা অনেক সময় ধরতাই বুলিতে গা ঢেলে দিতে পারেন না। সেটাই তাঁদের একমাত্র অপরাধ। কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদও এই একই অপরাধে অপরাধী।

www.pathagar.com

অন্যান্য কবি-সাহিত্যিক, যাদের কোনো রকমের আদর্শবোধ নেই, চরিত্র নেই, সুবিধাবাদিতাই নীতি, আমরা জানি তাঁরা আজ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের নামে দু'টো সমবেদনার কথা কইতেও কুণ্ঠা বোধ করবেন। তারপরেও আমরা মনে করি, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ একজন বীর চরিত্রের পুরুষ। একজন শক্তিমন্ত কবি। আমাদের সাহিত্য থেকে তাঁর নাম কেউ মুছে ফেলতে পারবে না। এই সরকারের কাছে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের রুটি-রোজগারের পথ খুলে দিতে আবেদন করার কোনো সার্থকতা নেই। কেননা এ. বি. এম. মূসা সাহেবের মতো মানুষেরা এই সরকারের সংসদ সদস্য, হিং-টিং-ছটের কলমধারী গুণ্ডারা এই সরকারের সাংস্কৃতিক মন্ত্রণাদাতা। তাঁদের যদি বিবেক থাকতো, যদি সাহিত্য এবং সাহিত্যিকের প্রতি প্রেম থাকতো, কবিকে বৃদ্ধ বয়সে উপোস করতে হতো না।

আমরা কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে বাঁচাবার জন্যে, তাঁর পরিবারকে বাঁচাবার জন্যে, 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ সাহায্য তহবিল' গঠন করতে কবির অনুরাগীজন এবং দেশপ্রেমিক ও সংস্কৃতিপ্রেমিক জনগণের কাছে আবেদন রাখছি।

www.pathagar.com

ইবনে খলদুন

একটি মৃত্যু ঃ একটি জিজ্ঞাসা

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ চলে গেলেন।

অভিমান করে চলে গেলেন। সমাজ আমাদের বড় নির্দয়, নিষ্ঠুর পাষাণ। তাই সমাজের ওপর কবির ছিল নিদারুণ অভিমান। কিন্তু মুখ ফুটে সে কথা কোনদিন বলেন নি। তবু অজান্তে নিজেকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিয়ে তিনি চলে গেলেন।

ডঃ মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র মাজারের পাশে একটুখানি জমির জন্যে অনেকেই আকুতি জানিয়েছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফল হয় নি। সারা দেশের মানুষের যে কবি, তাঁর জন্যে দেশের লোক আড়াই হাত ঘুমাবার ঠাঁই দিতে চাইলো না। এসব দেখে কবি বেনজীর আহমদ বললেন, "আমার ভাইকে আমি আমার ডেরায় নিয়ে যাই।" বেনজীরের আমবাগানে চিরনিদ্রায় শায়িত হলেন জাগরণের কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ।

ফর্‌রুখের মৃত্যু নিছক মৃত্যু নয়—এ মৃত্যু এক মহাজিজ্ঞাসা। আজ শুধু জিজ্ঞাসাই রেখে যাবো দেশের মানুষের কাছে। মৃত্যুহীন তাঁর সব অবদানের কথা বলবো আর একদিন।

আর্থিক অনটন তাঁর ছিলো। কিন্তু তার চাইতেও বেশী ছিল সমাজের তরফ থেকে অবজ্ঞা, অবহেলা—সাংস্কৃতিক অবক্ষয় আর অবমূল্যায়ন। কবির প্রাণের সার্বজনীন মানবতাবাদী আদর্শ হলো সংকীর্ণতা ও সাম্প্রদায়িকতায় চিহ্নিত, অবজ্ঞাত ও অপখ্যাত। সমাজ ধনসম্পদ আর ক্ষমতার দাপটের মাপকাঠিতে সবকিছুর বিচার করে—শিল্প-সাহিত্যের এমনকি প্রতিভারও; এটাই ছিল তাঁর ব্যক্তিত্বের নির্মম কশাঘাত, তাঁর মানবতাবাদী সার্বজনীন আদর্শের অপমান। অসুখের চাইতে পুষ্টির অভাবই তাঁর শেষ দিনগুলোতে প্রকট হয়ে উঠলো। রোগের চাইতে বিয়োগের বহর হলো বেশী—হলো কাল।

অর্ধাহারে, অনাহারে, দুশ্চিন্তায় ও একরকম বিনা চিকিৎসায় সমাজের উপেক্ষার শিকার হয়ে ফর্‌রুখ বিদায় নিলেন। মানুষকে আঁধার থেকে আলোতে আনার যিনি সাধনা করেছিলেন, অবজ্ঞার আঁধার থেকে তিনি রেহাই পান নি। "দারিদ্র্য এবং মনুষ্যত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে যে কবি ছিলেন উচ্চকণ্ঠ, তারই নিষ্ঠুর যন্ত্রণায় ক্ষয়িত

www.pathagar.com

হয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করলেন তিনি নিঃশব্দে।" বঞ্চনা ও অনাদরের বিরুদ্ধে তাঁর ব্যক্তিগত করুণ কাহিনীর খবর কে রাখে?

একাত্তরের ডিসেম্বর থেকে শুরু করে দীর্ঘ ন'মাস আমরা তাঁকে বয়কট করে রেখেছিলাম। নির্জনে নিভৃতে ইস্কাটন কলোনীর কামরায় তিনি তিলে তিলে নিঃশেষিত হচ্ছিলেন। ছেলেমেয়ের মুখে দু'মুঠো খাবার তুলে দেওয়াই তাঁর পক্ষে ছিল ভার। এ অবস্থায় অনাদরে, অবহেলায় মরণপারে চলে গেলেন তাঁর বড় মেয়ে নাহার। তিয়াত্তরের মাঝামাঝি যখন তাঁর ডাক পড়লো বেতার থেকে, তখন কবি তাঁর বেতন ৯৫০ থেকে কমে ৬৫০-এ দাঁড়ালো। এ সময় বকেয়া বাড়ী-ভাড়া শোধ করে পেতেন মাত্র ৫০০ টাকা। অগত্যা বড় ছেলে মাহমুদ ডাক্তারী ছেড়ে টেক্সট বুক বোর্ডে ২২০ টাকার চাকরি নিতে বাধ্য হল। এ অবস্থায় ছোট দুই মেয়ে লালা ও ইয়াসমিনের বিয়ে দিতে গিয়েও তিনি হিমশিম খেয়ে গেছেন।

তাই সবার সাথে সুর মিলিয়ে বলতে হয়, ফর্‌রুখ মরেন নি, আমরা তাঁকে মেরেছি। "আমরা তিলে তিলে আরো একটি প্রতিভাকে খুন করলাম, বাংলা সাহিত্যের আরো অনেক দিকপালের মত ফর্‌রুখ আহ্‌মদকেও। আমরা তাঁর প্রতিভার মূল্য দিইনি। ডাকিনি সবার সামনে। বরং পেছনে বলে বেড়িয়েছি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ মোল্লাদের কবি।" কবি মধুসূদন, প্রবন্ধকার আবুল হোসেন, কবি আশরাফ আলী, কবি শাহাদৎ হোসেন এঁরা সবাই সমাজের অবহেলায় হয়েছেন ক্ষত-বিক্ষত। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের বেলায় এই তাচ্ছিল্যের বহর বেড়েছে বৈ কমেনি। কারণ ফর্‌রুখ ছিলেন সার্বজনীন মানবতাবাদী আদর্শে বিশ্বাসী—যার ভিত্তি হল তওহীদ—এ আদর্শ ছিলো নৈরাজ্যবাদী মানুষের কাছে মূল্যহীন, অপাঙক্তেয়।

একথা বলা চলে না যে, আর্থিক দিকে সুযোগ পেয়েও তিনি সদ্ব্যবহার করেন নি। জীবন ও জগৎ সম্পর্কে তাঁর দৃষ্টি ছিলো নির্মোহ ও স্বচ্ছ। জীবন বাস্তবতার স্বরূপ অনুধাবন করেই তিনি পাঠ্য-পুস্তক ও ছড়ার বই লিখতে শুরু করেন ও তাঁর কবিতার বই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করতেও চেয়েছিলেন। 'নৌফেল ও হাতেম' কলেজ স্তরে পাঠ্যতালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। কিন্তু 'নয়া-জামাত'-এর কয়েক খণ্ড স্কুল পাঠ্যরূপে চালু রাখা হয় নি। তিনি চিরকাল জনগণের কাছের মানুষই ছিলেন। কিন্তু আর্থিক সুবিধার জন্যে কৌটিল্যের বশবর্তী হয়ে স্বার্থের পূজা করতে পারেন নি ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ মেনে নিয়ে কাছের মানুষটির হয়ে বসে থাকতে পারেন নি।

তাই এ-প্রশ্ন এসে যায়—তাঁকে আড়ালে ঠেলে রেখেছিলো কে? সাহিত্যের আসর থেকে তাঁকে আচ্ছাদিত করেছিল কারা? যাঁরা সাহিত্যিক, আত্মীয়তার কথা বলেন, কাছের মানুষ হবার কথা বলেন, তাঁরা কি জানেন না যে, এই সেদিনও তাঁর বিরুদ্ধে অনেক সাহিত্যিক কাগজে লেখালেখি করেছেন? তাঁর বেতন একটুখানি বাড়িয়ে দিলে

www.pathagar.com

কষ্টের লাঘব হতো, কিন্তু এঁরা কি সে চেষ্টা কোনদিন করেছেন? বেতন বাড়িয়ে দেওয়া ত দূরের কথা, তাঁর বেতন ৯৫০ টাকা থেকে কেন ৬৫০ টাকা হয়েছিল সে কৈফিয়ৎ কি তাঁর কাছে তলব করা হয় নি? অনেক লোক আজ কুম্ভীর-কান্নায় ফেটে পড়েন, মিথ্যার বেসাতী দিয়ে কথার তুবড়ি ফোটাতে থাকেন; কিন্তু সময় থাকতে তাঁরা মর্যাদা দিতে চান নি, ভ্রূক্ষেপও করেন নি।

আজকের দিনে মনে পড়ছে, আমাদের দেশে কি করে প্রতিভাবানদের কাছ থেকে আরো বেশী অবদান পেতে পারি। যে সমাজ সভ্য বলে দাবী করে তার কাছে এ প্রত্যাশা অপ্রাসঙ্গিক নয়। কিন্তু আজ স্বীকৃতি ত দূরের কথা, অবহেলা এবং অবজ্ঞা যেন আমাদের মূল নিরিখ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমাদের চরিত্রগুণেই কি এমন হয়? মহত্ত্ব নামক পদার্থ আমাদের অভিধানে নেই কিনা জানি না। কবি, দার্শনিক, শিল্পী, সাহিত্যিকদের জীবনে দু'টি প্রশ্ন মৌলিক, —একটি প্রশ্ন স্বাধীনতার আর অপরটি মর্যাদার। স্বাধীনতার সাথে ইজ্জত ওতপ্রোতভাবে জড়িত। মানুষ হিসাবে শিল্পীর স্বাধীনতা ও ইজ্জত সভ্য সমাজের চিহ্নিত রূপ। ইজ্জত একদিকে মানসিক, অপরদিকে আর্থিক। আর শিল্পীর স্বাধীনতা দু'রকম—লিখবার আর টিক্‌বার। শিল্পীর স্বাধীনতা বিঘ্নিত হলে যে কেবল শিল্পীর ব্যক্তিগত মর্যাদাই ক্ষুন্ন হয় তাই নয়, শিল্পীর পরিসরও সীমিত হয়ে ওঠে—"পাখা মেলা" আর সম্ভব হয় না। সমাজ বঞ্চিত হয় সুন্দরের নব নব অনুভূতি থেকে, আর নতুন সুন্দর সমাজে পাড়ি দেয়ার পথে বাধা দেয় উঁচু পাথরের ভিড়। "গুণীর আদর" তখন স্লোগান আর হুজুগের পানিতে ভেসে যায়।

ফর্‌রুখের জীবনে এ সত্যই হয়েছে বড় নির্মম ও মর্মান্তিক। লঘু ও খণ্ডিত দর্শনে ছিল তাঁর ঘোর অবিশ্বাস। তওহীদবাদী মানবতাবাদী আদর্শে তাঁর ঈমান ছিল পাহাড়ের মতো অচল, অটল। কি স্বভাবে, কি অভাবে কোনদিন তিনি চাটুকারিতার আশ্রয় নিতে পারেন নি। দুনিয়ার তথাকথিত বৈভব সাফল্য তাঁর কাছে ছিল এক 'পাশবিক মত্ততা'। এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত। সহজ-সরল শিশুসুলভ কবির অনমনীয় ব্যক্তিত্ব ও আত্মমর্যাদাবোধ অনেকের মনেই বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কৃত্রিম জাগরণ বা রিভাইভালিজমে বিশ্বাসী ছিলেন না। তওহীদবাদের ওপর প্রতিষ্ঠিত এক সুখী-সুন্দর সমাজ গঠনই ছিল তাঁর স্বপ্নসাধনা। খালিক, মালিক আল্লাহ্ যেমন বিশ্বপালক, সবাইকে দেখেন তেমনি দলমতনির্বিশেষে সবাই বিশ্বজনীন মানবতার আলোকে জীবনের মৌলিক অধিকার, মর্যাদা ও সম্ভাবনা ফিরে পাবে—এ সাধনা মূলত তওহীদবাদের। আর এই নিরিখেই লিখতেন, বলতেন, পথ চলতেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ

সামনে চল সামনে চল
তৌহিদেরি সান্ত্রীদল
সামনে চল সামনে চল।

www.pathagar.com

*

হে মাঝি! এবার তুমিও
পেয়ো না ভয়,
তুমিও কুড়াও হেরার পথিক
তারকার বিস্ময়,

*

সে পথে যদিও পার হ'তে হবে মরু,
সে পথে যদিও দরিয়ার নোনা পানি,
তবুও সে পথে আছে মঞ্জিল,
জানি আছে ছায়াতরু
পথে আছে মিঠে পানি।

ফর্‌রুখ সাহিত্যে তওহীদবাদ ও প্রগতিবাদের সমন্বয় ঘটেছিল; কিন্তু এ দুটো তাঁর কাছে কোনো আলাদা সত্তা নয়। কারণ তওহীদবাদই প্রগতিবাদ। শুধু কাব্যগুণ বিচারেই নয়, তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার স্বীকৃতিতেও আদর্শের মূল্যয়ান খুব কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। জীবনের নির্দিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর সাহিত্যে অনুরণিত হয়েছে, তাঁর মৌলিক প্রতিভা ঐতিহ্যকে নতুন রূপে-রসে চিহ্নিত করেছে। তাসাউফ বা মরমীবাদ যেমন শরীয়তের প্রাণ তেমনি তাসাউফ হলো শরীয়তের দেহ। একটি ছাড়া অপরটি সুঠাম হতে পারে না, অপূর্ণ থেকে যায়। স্রষ্টা ও সৃষ্টিতে প্রাচীর তুললে এ আদর্শের রূপায়ণ অসম্ভব। কবি একদিকে স্রষ্টার কথা ভেবেছেন আর একদিকে মানবতা, একথা সঠিক নয়। সত্যি সত্যি এ দুয়ের মাঝে তিনি সমন্বয় করেছেন। যারা শরীয়তকে বাদ দিয়ে শুধু মরমীবাদের দিকে চলে যান, তাঁদের তিনি ঘোর সমালোচনা করেছেন। আর সূফীবাদকে অস্বীকার করে যাঁরা শুধু শরীয়ত ও আইনের উপরে জোর দেন, তাঁদেরকে তিনি তওহীদবাদের খণ্ডিত রূপকার বা একচোখা বলে অভিহিত করতেন।

আদর্শের ব্যাপারটি তাঁর কাছে কোনো বাইরের জিনিস ছিলো না। আর আদর্শ তাঁর কাব্যের কোনো বোঝাও হয়ে দাঁড়ায় নি, বরং বলাকার মতো আকাশে উড়িয়েছে, অশ্বের মতো মাটির পৃথিবীতে পথ দেখিয়েছে। বোঝার ভুলেই হোক অথবা যে কোনো কারণেই হোক অনেকে এভাবে বলতে চান—"ইসলামী আদর্শে ব্রতী হয়েও", "রাজনৈতিক আদর্শ যাই হোক", "স্বতন্ত্র ভাবাদর্শ হলেও", "ধর্মবোধ সব সময়ে খারাপ হয় না যেমন নাকি ফর্‌রুখের সাহিত্যে হয় নি"—এ কথা বলে বোঝাতে চান মোটামুটি দুটো জিনিস যে, তওহীদবাদী আদর্শ সার্বজনীন মানবতাবাদী, কল্যাণকামী আদর্শ নয়। আর তাই ফর্‌রুখ নিজস্ব ভাবাদর্শে মানবতাবাদী ছিলেন। তওহীদবাদের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্ক নেই। তাঁর শিল্পকর্মকে আদর্শ থেকে আলাদা করে দেখতে হবে (অর্থাৎ মনে

www.pathagar.com

মনে এই ভাবটা যে, আদর্শের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক যেন না থাকলেই ভাল হতো, শিল্পকর্মে তাঁর স্থান আরো উপরে চিহ্নিত করা চলতো)।

ফর্‌রুখের ঐতিহ্যচেতনার ধারা বেশ প্রশস্ত ও গভীর; বাংলা ও ইসলামী সাহিত্যের সাহিত্য-ঐতিহ্য তিনি আত্মস্থ করেছেন ও তওহীদবাদী আদর্শে রূপায়িত করতে প্রয়াস পেয়েছেন। আদর্শবান হওয়াটা কাঠিন্য বা অসহিষ্ণুতা নয়। ভণ্ডামি, অসত্য, অবিচার ও মুনাফিকীর বিরুদ্ধে অনড় মনোভঙ্গি মানবতাবাদ প্রতিষ্ঠারই অপর নাম, নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষার রূপে-রসে এটা সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠেছে। আদর্শহীনের কাছে তা পুনরুল্লেখ বলে মনে হয়। সময় ও শতাব্দীর গণ্ডিতে একে বাঁধা যায় না। কারণ অতীতের দিকে একটু তাকিয়ে নিলেও আগামীর পানেই ছিল তাঁর পথ-চলা। অতীত-গৌরবে তিনি ফিরে যান না, সেই গৌরবকে তিনি আজকের সমাজে প্রতিষ্ঠিত করতে চান। বিপর্যয় এসেছে এই নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা না করার ফলে আদর্শের বিভ্রান্তিতে, প্রকৃত আদর্শের স্মৃতিতে নয়, বিস্মৃতিতে।

ফর্‌রুখের সাহিত্য-চেতনা দেশজ ছিলো না এমন কথাও শোনা যায়। দেশীয় সূত্র না কি তাঁর সাহিত্যে মেলা ভার! এমনি ধারা সমালোচনা অর্বাচীন মনের পরিচয়। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ রোমান্টিক আদর্শবাদী কবি। তাই দেশ-বিদেশ সবই তাঁর কাছে সমান। দেশটা তাঁর কাছে মুহূর্তের পরিবেশ। প্রকৃতি ও মানুষ নিয়ে তাঁর কারবার। তাই দেশকে তিনি অস্বীকার করেন নি। সাথে সাথে আদর্শের বিশেষ একটি ঐতিহ্য ও আবহকে তিনি তাঁর কাব্যের বাহন করে নিয়েছেন। তাই চড়ুই পাখি ও ডাহুক আর আখরোট, বাদাম খুবানি একসাথে মিশে গেছে। ইংরাজী ও বাংলা সাহিত্যের সাহিত্য-ঐতিহ্যের সাথে, রুমী সাদী, ওমর খৈয়াম মিশে আল-কুরআনের সার্বজনীন মানবতাবাদ রূপায়িত হতে প্রয়াস পেয়েছে তাঁর কাব্যে। হেরার বুকে তিনি যেমন "তারকার বিস্ময়" প্রত্যক্ষ করেন, তেমনি প্রিয়ার মুখ চেয়েও "সিতারার মতো লায়লি তোমার নাম আমার মনের আকাশ ভরায়ে রাখে।" আদর্শের আলোকে সবকিছুই উজ্জ্বল; কিন্তু ভাষায় দেশজ ও বিদেশজ শব্দের অপরূপ ঝঙ্কার।

ভাষার সম্পর্কে তাঁর ধারণা থেকেই একথা পরিষ্কার হয়ে উঠবে। ভাষাকে কখনো তিনি আদর্শময় মনে করেন নি। ভাষাকে জেনেছেন তিনি শিক্ষা ও সৌন্দর্যের বাহন হিসেবে। তিনি যেমন একদিকে সহজ চলতি বাংলার পক্ষপাতী ছিলেন, তেমনি উর্দু ও বাংলা দুই ভাষারই উৎকর্ষ কামনা করতেন। ভাষা আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাই তিনি লিখেছিলেন, "ও আমার মাতৃভাষা বাংলা ভাষা খোদার সেরা দান।" পৌত্তলিকতাকে তিনি অসত্য বলে জানতেন। তাই বলে পৌত্তলিককে তিনি ঘৃণা করতেন না। কুরআন বলেন ঃ 'মূর্তিপূজকদের মূর্তিকে গালি দিও না, কেননা তারা ভুল করে আল্লাহ্‌কে গালি দিতে পারে।'

www.pathagar.com

যারা মনে করে যে, কোন একটি দলের অনুসারী না হলে ইসলামপন্থী হওয়া চলে না—কবি এই মতবাদে বিশ্বাসী ছিলেন না। তিনি যে এ মতে বিশ্বাসী ছিলেন না, এ কথা তিনি বলেছেন বারে বারে। অবশ্য এরা কবিকে এ দলে নেয়ার জন্যে পেছনে লেগেছিল সর্বক্ষণ। তবে তাতে কোন ফায়দা হয় নি। দরাজ-দিল মানুষটি সবার সাথে অমায়িক ব্যবহার করতেন। এটা দেখে কেউ যেন ভুল না বোঝেন যে, তিনি সেই দলের অনুসারী ছিলেন। সব দলের লোকের সাথে তিনি সমানভাবে মিষ্টি ব্যবহার করতেন। বাহ্যিক হাবভাব ও মিল দেখে অনেকে মনের মিল দাবী করেন। কিন্তু আদর্শের আসল মিল হলো মনে, ঈমানে ও আমলে—হৃদয়ের গভীর প্রদেশে, বাইরের লোক-দেখানো চমক যেখানে অবান্তর।

কবি সমাজতাত্ত্বিক ছিলেন না। তাই কিভাবে কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আদর্শকে সমাজের বাস্তবতার প্রেক্ষিতে রূপায়িত করা সম্ভব হবে, সে কাজ ছিল কবি-কর্মের এলাকার বাইরে। রূপায়ণের নতুন পদ্ধতি সম্পর্কে তাঁর ভাবপ্রবণ মন হয়ত সব সময় সংশয়হীন ছিল না। সমাজতাত্ত্বিক সূক্ষ্মতা কবিমনের কাছে আশা করা অনুচিত। তবে নতুন পদ্ধতির প্রতি সন্দেহকে আদর্শের প্রতি সন্দেহ বলা চলে না।

একবার এ দর্শনে আবার ঠিক এর বিপরীত দর্শনে আশ্রয় নেয়ার বেসাতিকে তিনি মনে-প্রাণে ঘৃণা করতেন। তওহীদবাদী মানববাদী আদর্শে তিনি ছিলেন অচল, অটল।

সাধারণভাবে হলেও কবি-শিল্পীর মর্যাদা ছিল তাঁর প্রাপ্য, আর বিশেষভাবে মানববাদী কবি হিসেবে তাঁকে দেওয়া উচিত ছিল আরো অনেক কিছু—অনেক মর্যাদা আর প্রশান্তি। কিন্তু এ সমাজ তাঁকে তাঁর সাধারণ পাওনা থেকেই বঞ্চিত করেছে এটাই হল বড়ো ট্রাজেডী। কিন্তু এ অপমান সমাজের। কবিকে এরা স্পর্শ করতে পারেনি—পারবে না। তাঁর মার্গে তিনি উজ্জ্বলতম রশ্মিতে চিরদীপ্তিমান থাকবেন চিরদিন।

কৃত্রিম মূল্যবোধ যে সমাজের চালক-বাহক সেখানে এমনিতেই কবি-সাহিত্যিকেরা করুণা, অবজ্ঞার কশাঘাতে জর্জরিত। কিন্তু ফররুখ আহ্‌মদের ট্র্যাজেডি নিহিত রয়েছে ইতিহাসের গভীর প্রদেশে, যা সাধারণ চোখে ধরা পড়ে না সব সময়।

এদেশের নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও বৈশিষ্ট্য বৃহত্তর তওহীদবাদী জনতার অন্তরের অন্তঃস্থলে হৃদয়ের গভীরে নিহিত। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহাযুদ্ধের পর এই বৈশিষ্ট্য আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করে ঃ এ স্বীকৃতি না পেলে দেশ স্বাধিকার বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পারতো না। আজকের দিনে নানা ঘাত-প্রতিঘাত ও কাঠামো পরিবর্তন সত্ত্বেও এটাই হলো ঐতিহাসিক সত্য। এর পেছনে যে সমাজতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য ছিলো তা রয়েছে অটুট, অম্লান। এ বৈশিষ্ট্যের অস্বীকৃতিকে ইতিহাসের বিকৃতি বললে বেশী বলা হবে না। ইতিহাসের বাস্তব স্বীকৃতির মধ্যেই রয়েছে আমাদের স্বাধিকারের শক্তির উৎস ও মজবুত

www.pathagar.com

বুনিয়াদ, ইতিহাসের বৈশিষ্ট্য-উজ্জ্বল তওহীদী গণসমাজের মানববাদী আদর্শই এর প্রাণনির্যাস।

কবি আদর্শকে শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বলে মনে করতেন না, ব্যাপক সার্বজনীন সমাজের আদর্শ বলে মনে করতেন। তাঁর আদর্শের সামাজিক দিকটা যাঁরা অস্বীকার করতে চান তাঁরা ফর্‌রুখ-কাব্যে ধর্মের মূল বাণী অনুপস্থিত বলে দেখাতে চান, এটা মস্তবড় ভুল, মাঝে-মধ্যে শুধু মানবতার কথা বলেছেন, এটা দেখাতে গিয়ে অনেকে "লাশ" কবিতাকে ব্যতিক্রম বলতে চান। আসলে কিন্তু তাঁর আদর্শের মূল সুরই বজ্রকণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। ললিত সুরে "হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি" বলে বিদায় নেবার আগে ডাক দিয়ে তিনি খুশী হন নি, বজ্রগম্ভীর কণ্ঠে ফরিয়াদ জানিয়ে তিনি বলেছেন ঃ

হে জড় সভ্যতা!
মৃত-সভ্যতার দাস স্ফীতমেদ শোষক সমাজ!
মানুষের অভিশাপ নিয়ে যাও আজ;
তারপর আসিলে সময়
বিশ্বময়
তোমার শৃংখলগত মাংসপিণ্ডে পদাঘাত হানি'
নিয়ে যাব জাহান্নাম দ্বারপ্রান্তে টানি
আজ এই উৎপীড়িত মৃত্যু-দীর্ণ-নিখিলের অভিশাপ বও ঃ
ধ্বংস হও —
তুমি ধ্বংস হও!

[লাশ : সাত সাগরের মাঝি]

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের গোটা কাব্য-সাহিত্যের সুনীল আকাশ কেউ যদি পরিভ্রমণ করেন তাহলে দেখবেন মানবতা ও ইনসাফই এই কাব্যের মূল সুর—গভীর অনুভূতিতে ও সুন্দর শৈলীতে স্নিগ্ধ স্নাত। ১৯৪৬-এর দাঙ্গার সময় তিনি আহত মানুষকে জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে নিজের বাড়ীতে নিয়ে চিকিৎসা ও খাবার ব্যবস্থা করেছেন। মানুষে মানুষে হানাহানি সহ্য করতে না পেরে ছুটে গেছেন তিনি অল ইণ্ডিয়া রেডিওতে কবিতা আবৃত্তি করতে ঃ

এবার দেখেছি নিজের রক্ত দেখেছি আর
রক্ত নেবার পাশবিক মত্ততা
এবার শুনেছি কোটি ফরিয়াদ শুনেছি আর
শত মুমূর্ষু কণ্ঠের আকুলতা

[নিজের রক্ত : ফর্‌রুখ-রচনাবলী]

www.pathagar.com

অথবা—

জালিমের হাতে পশুর প্রায়
আজও মজলুম মরিছে, হায়!
ছিঁড়িতে তাঁদের মরণের ঘের
হও মুজাহিদ আজি সামাল।।

[ওড়াও ঝাণ্ডা]

কবি স্বৈরতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। তা রাজনৈতিক ফ্যাসিবাদই হোক আর অর্থনৈতিক কমিউনিজমই হোক; দেশের মাটি ও আদর্শ-ঐতিহ্যের মাঝে তিনি যে সমঝোতা করেছেন, তাতে একথা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে। পরিশেষে কবির "সিরাজাম মুনীরা" থেকে কবির মানবতাবোধের মুখ্য সুরটা তুলে ধরলাম ঃ

এ নির্লজ্জ মানবতাহীন পশুদের যেথা ভীড়,
দ্বীনের রোশ্‌নী মুছে যারা টানে শামিয়ানা রাত্রির।
সেথা উমরের দোর্‌রা হানিয়া আনো পথ মুক্তির,
আনো আজাদীর শুভ্রতা, ভাঙো শঙ্কা ধরিত্রীর।

*

জ্বলে যাক এই ছলনা বিলাস মিথ্যার কারসাজি,
তোমার দোররা খলিফা আমার হস্তে উঠুক বাজি',
জাগুক সে দেখে শ্রান্তি-মগ্ন উৎপীড়িতের দ্বার,
ক্ষুদ্র কামনা ভুলুক স্বপ্ন তার!

www.pathagar.com

শামসুর রাহমান

নতুন পানিতে সফর এবার

আমরা যখন প্রথম লিখতে শুরু করি, তখন আমাদের জিভের ডগায় নাচতো কয়েকটি নাম —শওকত ওসমান, আহসান হাবীব, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ, আবুল হোসেন, আবু রুশ্‌দ, গোলাম কুদ্দুস, সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ এবং শামসুদ্দীন আবুল কালাম। আমাদের এই জগদ্দল সমাজে লেখক হওয়ার যে কি মানে তা আমি কাগজে কলম ছুঁইয়েই বুঝতে পেরেছিলাম। তাই আমাদের সমাজের এই অগ্রগণ্য লেখকদের সাহিত্যচর্চা বরাবরই আমার কাছে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় ঠেকেছে। তাঁদের সাহিত্য-ফসলের দিকে তাকিয়ে কৃতজ্ঞ বোধ করেছি সব সময়। তাই আমাদের আড্ডায় বার-বার ঘুরে-ফিরে উচ্চারিত হতো এই কয়েকটি নাম, উচ্চারিত হতো তাঁদের রচিত কতো পঙক্তি।

আমাদের বরণীয় এই আটজন লেখকের মধ্যে দু'জন লোকান্তরিত হয়েছেন। সৈয়দ ওয়ালিউল্লাহ্ তিন বছর আগে মারা গেছেন প্যারিসে, ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ইন্তেকাল করেছেন গত শনিবার আমাদের এই চিরচেনা ঢাকা শহরে। তিনি মারা গেছেন একেবারে নিঃস্ব অবস্থায়। না, ভুল বললাম। নিঃস্ব কথাটা তাঁর সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। তাঁর মানসিক ঐশ্বর্যের কোন কমতি ছিল না। তিনি রেখে গেছেন এমন কয়েকটি গ্রন্থ, যেগুলি পঠিত হবে দীর্ঘকাল। তাঁর বহু পঙক্তি বারবার গুঞ্জরিত হবে কাব্যপিপাসুদের স্মৃতিতে। যে কবিতা তিনি আমাদের উপহার দিয়ে গেলেন তা তাঁর স্মৃতিকে চিরদিন পাঠকদের মনে উজ্জ্বল করে রাখবে সত্য, কিন্তু কবিতা তাঁকে দেয় নি সচ্ছলতা, তাঁর পরিবারকে দেয় নি কোন নিরাপত্তা; সারা জীবন তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গেই ঘর করেছেন; জাহান্নামে বসে হেসেছেন পুষ্পের হাসি। দারিদ্র্য তাঁর শরীরকে ক্ষইয়ে দিয়েছিলো ভীষণভাবে, কিন্তু কখনো কামড় বসাতে পারে নি তাঁর মনের ওপর। তাঁর মতো অসামান্য কবি খুবই সামান্য একটা চাকরী করতেন। মাইনে পেতেন মাত্র ছ'সাত শ' টাকা; অথচ তাঁর ঘরে বারো-তেরোজন পুষ্যি। আজকের দিনে এই ক'টি টাকায় কি করে চালানো সম্ভব এত বড় সংসার? ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্যের সংসার যত জেল্লাদারই হোক না কেন, তাঁর সংসার বরাবরই খুব নিষ্প্রভ। দারিদ্র্য ম্লান করে দিয়েছিলো তাঁর সংসারের সুখ। পয়সা কামানোর দিকে কখনো মন ছিল না তাঁর। পারলে তিনি হয়তো চাকরিও করতেন না কখনো। ধরা-বাঁধা চাকরী করার মানসিকতা তাঁর ছিলো না। তিনি ছিলেন ভিন্ন ধাতুতে গড়া। তাই যখন তাঁকে রেডিও অফিসে

www.pathagar.com

দেখতাম একজন সামান্য চাকুরে হিসেবে, আমার কেমন যেন খটকা লাগতো। সেখানে বড় বেমানান লাগতো ফর্রুখ আহ্মদকে।

অনেক বছর আগের কথা। আমিও তখন রেডিওতে চাকরী করি। আমার জীবনের সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন দু'টি বছর আমি কাটিয়েছিলাম রেডিওতে। কিন্তু আমার সেই কর্মজীবনের একমাত্র আনন্দ ছিলো ফর্রুখ আহ্মদের সঙ্গে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দেয়া। মতাদর্শের দিক থেকে আমরা অবস্থান করতাম দুই বিপরীত মেরুতে। আমি জানতাম তাঁর ঝাঁঝালো রাজনৈতিক মতাদর্শের কথা, তাঁর অসহিষ্ণুতার কথা—কিন্তু এর কোনোটাই সে সময় আমার আর তাঁর সম্পর্কের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় নি। তিনিও ভাল করেই জানতেন আমার বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের কথা, আমার রাজনৈতিক মতামতের কথা। তাঁর সঙ্গে কখনো আমার কোনো রাজনৈতিক সংলাপ হয় নি। তিনি এড়িয়ে যেতেন, আমিও তাঁকে রাজনৈতিক তর্ক জুড়তে প্ররোচিত করি নি কোনো দিন। আমরা ঘন্টার পর ঘন্টা মেতে থাকতাম সাহিত্যালোচনায়। বিশেষ করে কবিতার কথা বলতে ভালবাসতেন তিনি, বিভিন্ন কবির পঙক্তিমালা তিনি আবৃত্তি করতেন তাঁর আশ্চর্য সুরেলা কণ্ঠে। ইংরেজী রোমান্টিক কবিকুল তাঁর মন হরণ করেছিলেন। তাঁর কণ্ঠে যখন-তখন ধ্বনিত হতো শেলী, কীটস্-এর অবিনাশী পঙক্তিমালা। যখন তিনি আবৃত্তি করতেন, তাঁর দীর্ঘ এলোমেলো চুল নেমে আসতো কপালে, ধারালো উজ্জ্বল চোখ হয়ে উঠতো উজ্জ্বলতর। তাঁর আরেকটি প্রিয় প্রসঙ্গ ছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের কবিতা। মধুসূদনের কথা বলতে গেলেই তাঁর কণ্ঠে বেজে উঠতো অন্যরকম সুর। মধুসূদনের কবিতা অনর্গল মুখস্থ বলে যেতে পারতেন তিনি।

শনিবার রাতে তাঁর মৃত্যু-সংবাদ শুনে ছুটে গিয়েছিলাম কবির ফ্লাটে। যে ফর্রুখ আহ্মদকে আমি বহুদিন বসে থাকতে দেখেছি আজিজিয়া রেস্টুরেন্টে, যে ফর্রুখ আহ্মদের সঙ্গে রেডিয়োর মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়েছি, যে ফর্রুখ আহ্মদের সঙ্গে রমনার কৃষ্ণচূড়াময় পথে হেঁটেছি বহুদিন, যে ফর্রুখ আহ্মদের সঙ্গে কথা বলেছি দিনের পর দিন, যে ফর্রুখ আহ্মদকে কাজের ক্লান্তির মধ্যেও কোনদিন এতটুকু ঝিমুতে দেখি নি, সেই ফর্রুখ আহ্মদকেই দেখলাম শায়িত তাঁর নিভৃত শয্যায়। তাঁকে দেখলাম নির্বাক, নিথর। কী আশ্চর্য, তিনি একবারও হাসিমুখে তাকালেন না আমার দিকে, বললেন না "কি, চলবে নাকি এক পেয়ালা?" না, তিনি এই প্রথমবারের মত আমাকে চা খেতে অনুরোধ করলেন না। অথচ তাঁর চা না খাওয়ানো ছিল অসম্ভব ব্যাপার। আমি অন্তত এমন একটি দিনের কথাও মনে করতে পারি না যে, আবন মিয়ার দোকানে গিয়ে ফর্রুখ আহ্মদের পাশে বসেছি এবং চা ও নিমকি খাই নি। চা না খাইয়ে তিনি ছাড়তেন না। কোন ওজর-আপত্তি তিনি শুনতেন না। 'আরে খাও খাও, কিস্সু হবে না', বলতেন সেই দরাজ-দিল মানুষটি।

www.pathagar.com

অমন নিথর, নিঃশব্দ ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে বড়ই বেমানান লাগছিল সেই বিছানায়। যেমন তাঁকে বেমানান মনে হতো রেডিও-র কাছে। তাঁর নিস্পন্দ শরীর আর তন্ময় নিদ্রার দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়লো তাঁরই কয়েকটি লাইন ঃ

এ ঘুমে তোমার মাঝি-মাল্লার ধৈর্য নেইকো আর,
সাত সমুদ্র নীল আক্রোশে তোলে বিষ ফেনভার,
এদিকে অচেনা যাত্রী চলেছে আকাশের পথ ধরে
নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজপাতা।
বেসাতী তোমার পূর্ণ করে কে মারজানে মর্মরে ?
ঘুমঘোরে তুমি শুনছো কেবল দুঃস্বপ্নের গাঁথা।
উচ্ছৃঙখল রাত্রির আজো মেটে নি কি সব দেনা?
সকাল হয়েছে। তবু জাগলে না ?
তবু তুমি জাগলে না ?

তিনি আর কোনদিনও জাগবেন না। তাঁর প্রায় আসবাবহীন সেই ঘরে দেখলাম ইতস্ততঃ ছড়ানো কিছু বই। দেখলাম, তাঁর খুব কাছেই রয়েছে তাঁর প্রিয় কবি মাইকেল মধুসূদন দত্তের কাব্যগ্রন্থ। মধুসূদনের অকৃত্রিম শুভার্থী এবং উনিশ শতকী বাংলার অন্যতম প্রধান গুরু ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রতিও ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অবিচল শ্রদ্ধা ছিল। তিনি প্রায়শই বলতেন, "বুঝলে শামসুর রাহমান, এই বিদ্যাসাগরের মতো, এক-দেড় জন ব্যক্তি আমাদের সমাজে জন্মালে এই পচা-গলা সমাজের চেহারাটাই পাল্টে যেতো।"

কখনো-কখনো জীবনের দুঃখ-দুর্দশার কথা উঠতো, উঠতো জীবন-সংগ্রামের কথা। এই প্রসঙ্গে একবার তিনি রাণা প্রতাপ সিংহের পলাতক দিনের গল্প বলেছিলেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে রাণা প্রতাপ ঘুরছেন বনে-প্রান্তরে। শত দুঃখ-দুর্দশা সত্ত্বেও তিনি আত্মসমর্পণ করেন নি আকবর বাদশাহের কাছে। কিন্তু যেদিন একটা বনবেড়াল তাঁর শিশুকন্যার হাত থেকে খাসের রুটি ছিনিয়ে নিয়ে খেলো, সেদিনই তিনি ধরা দিলেন আকবরের সৈন্যদের হাতে। তিনি একাধিকবার এই গল্প আমাকে শুনিয়েছেন। কেন এই গল্প বলতেন তিনি? হয়তো পুত্র-কন্যার মুখ চেয়ে চাকরী করতে বাধ্য হচ্ছেন বলেই এই গল্পই তিনি বলতেন, যেন নিজেকেই শোনাতেন সেই আত্মসমর্পণের অত্যন্ত মানবিক কাহিনী। হয়তো রাণা প্রতাপ সিংহের সঙ্গে কোথাও নিজের একটা মিল খুঁজে পেতেন।

আমি আজ তাঁর কাব্যের গুণাগুণ বিষয়ে কিছু বলবো না। এই মুহূর্তে ব্যক্তি ফর্‌রুখ আহ্‌মদই আমার কাছে বড় হয়ে উঠছেন বারবার। মনে জেগে উঠছে নানা

www.pathagar.com

স্মৃতির ভগ্নাংশ। তবে একথা অবশ্যই বলবো, তাঁর মৃত্যুতে অনেকখানি গরীব হয়ে গেলো আমাদের কাব্যক্ষেত্র। একদা তিনি লিখেছিলেন ঃ

গোধূলি-তরল সেই হরিণের তনিমা পাটল
অস্থির বিদ্যুৎ, তার বাঁকা শিঙে ভেসে এল চাঁদ,
সাত সাগরের বুকে সেই শুধু আলোক চঞ্চল।
অন্ধকার ধনু হাতে তীর ছোঁড়ে রাত্রির নিষাদ।

কিংবা—

আমি দেখি পথের দু'ধারে ক্ষুধিত শিশুর শব,
আমি দেখি পাশে পাশে উপচিয়া পড়ে যায় ধনিকের গর্বিত আসব
আমি দেখি কৃষাণের দুয়ারে দুর্ভিক্ষ বিভীষিকা,
আমি দেখি লাঞ্ছিতের ললাটে জ্বলিছে শুধু অপমান টীকা,
গর্বিতের পরিহাসে মানুষ হয়েছে দাস, নারী হলো লুণ্ঠিতা গণিকা

-এর মতো পঙক্তি। তাঁর লেখনী আর কোনোদিন চঞ্চল হবে না ভাবলেও দুঃখ হয়।

আমার এই লেখা খুবই অকিঞ্চিৎকর। তবে একটু সান্ত্বনা, অনেক বছর আগে দৈনিক 'মিল্লাত'-এর 'রবিবার'-এর ক্রোড়পত্রে আমি এই প্রতিভাবান কবির প্রতি আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেছিলাম একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধে। একজন অর্বাচীন উত্তরসাধকের সেই প্রবন্ধ পাঠ করে তিনি অখুশী হন নি, এই তথ্য আমার পক্ষে খুবই তৃপ্তিকর।

ফর্‌রুখ আহ্‌মদ কোন ব্যাংক-ব্যালান্স রেখে যান নি। রেখে যান নি কোন জমিজমা। তাঁর চিরনিদ্রার এতটুকু ঠাঁইয়ের জন্য জমি খুঁজতে গিয়েও বিড়ম্বিত হতে হয়েছে তাঁর অনুরাগীদের। শেষ পর্যন্ত উজ্জ্বল উদ্ধার হয়ে এলেন কবি বেনজীর আহমদ। তিনি বললেন, আমি আমার ফর্‌রুখ ভাইকে নিয়ে যাবো আমার ডেরায়। একজন কবিকে কবরস্থ করা হলো অন্য এক কবির বসতবাড়ির সীমানায়। তাঁর কবরের জমি নিয়ে যত ঝামেলাই হোক, তাঁর সন্তানেরা যত বঞ্চিতই হোক পার্থিব জমিজমা থেকে, তিনি রেখে গেছেন অন্যরকম বিঘা বিঘা জমি—যে জমির ফসল দেখে চোখ জুড়াবে সাহিত্য-পথযাত্রীদের। এই সমৃদ্ধ জমি পেছনে রেখে তিনি নিজে যাত্রা করেছেন নতুন রহস্যময় পানিতে, নিরুদ্দেশ সফরে।

www.pathagar.com

সানাউল্লাহ্ নূরী

জাতীয় চৈতন্যে ফর্‌রুখের প্রভাব

একজন কবিকে আমরা আজ স্মরণ করছি। তিনি যে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, এ সত্যটি কেবল তাঁর কবিতার শাণিত শব্দমালাতেই নয়—তাঁর শরীরী প্রতিকৃতিতেও আশ্চর্য এক অভিব্যক্তিতে প্রতিফলিত। তাঁর ছবিটি এক নজর দেখলে যে-কোনো সাধারণ মানুষও বলবে ছবির লোকটি আর সবার থেকে আলাদা। প্রশস্ত ললাটের নীচে দুই বিশাল চোখে এক অসাধারণ ঔজ্জ্বল্য। সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে তাকালে আপনা থেকে ধাঁধিয়ে আসবে চোখ। উন্নত নাসিকা। এক-হারা ঋজু গড়ন। চিবুক জুড়ে একরাশ পরিপাটি দাড়ি। চোখে কালোফ্রেমের চশমা। সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবির আটপৌরে পোশাক।

সামান্য এই মানুষটির সমগ্র অবয়ব জুড়ে কিন্তু এক অসামান্যতার স্পষ্ট ছাপ। গড্ডালিকা স্রোতের সঙ্গে পাল তুলে দিয়ে ভেসে বেড়াতে চাইলে কিংবা চলতি হাওয়ার পন্থী হলে সৌভাগ্যের অনেক উঁচু সোপানে উঠতে পারতেন তিনি। কিন্তু সেই সহজ-গম্য, লোভাতুর পথে চলার দুর্দমনীয় ইচ্ছায় কখনও আক্রান্ত হন নি তিনি। তার বদলে বেছে নিয়েছিলেন বিপরীত স্রোতকে। এ কারণেই দারিদ্র্য এবং যন্ত্রণা নিত্য-সহচর হয়েছিল তাঁর জীবনে। সমকালীন সমাজের নিদারুণ উপেক্ষা সমগোত্রীয়দের তীব্র শ্লেষ এবং আক্রমণেরও নিষ্ঠুর শিকার হয়েছিলেন তিনি প্রায় প্রতিনিয়ত।

কিন্তু এই কবি কোনো কিছুর কাছেই পরাভূত হন নি। দারিদ্র্য ঘুণাক্ষরেও তাঁর কবিসুলভ বিশাল ব্যক্তিত্ব এবং আত্মশ্লাঘাকে ক্ষীয়মাণ করতে পারে নি। তিনি বিশ্বাস করতেন, আপন বিবেক, মূল্যবোধ এবং কাব্যদর্শনের প্রতি বিশ্বস্ত থাকাই একজন মহৎ কবির সবচেয়ে বড় ধর্ম। তাঁর পরম নিন্দুকও স্বীকার করবেন, এই দায়িত্ব পালনে কখনও তিনি পরাঙমুখ হননি।

আমাদের প্রচলিত এই সমাজের সর্বত্র হীনমন্যতা, শঠতা, চাটুকারিতা, উচ্চমার্গীয় বুদ্ধিবৃত্তির আত্মগর্বী অন্তঃসারশূন্যতার এবং তার পাশাপাশি দুর্নীতি আর অনাচারকে নির্লজ্জ নগ্নতায় আধিপত্য বিস্তার করতে দেখেছেন তিনি। সমাজের এই ক্লেদাক্ত বিবর্ণ প্রতিচ্ছবি একজন কবি হিসাবে তাঁর বিবেক এবং সচেতন অনুভূতিকে রক্তাক্ত করে তুলেছিল। আর স্বাভাবিক কারণেই এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড আঘাত হানতে কিছুমাত্র তিনি দ্বিধা করেন নি। এই দায়িত্ব পালনে তিনি অসামান্য সাহসিকতা নিয়ে অবতীর্ণ হয়েছিলেন

www.pathagar.com

এক বিদ্রোহী কবি-পুরুষের ভূমিকায়। আমাদের জাতীয় জীবনে এবং জাতীয় প্রেরণার উজ্জীবনী উৎসমুখ সাহিত্যের আঙিনায় নজরুল ইসলামের পরে একক কোনো ব্যক্তিত্বকে যদি এই ভূমিকার পথিকৃৎ হিসাবে চিহ্নিত করতে হয়, তবে নিঃসন্দেহে তিনি এই নিরাপোস সাহসী কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ।

বাংলাভাষা আন্দোলনের আদি এবং শেষ পর্বে আমরা তাঁকে দেখেছি তেমন দুঃসাহসিকতায় তিনি লেখনী চালনা করেছেন তখনকার চাটুকার আর ক্ষমতাসীনদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে। ঘৃণায়, বিদ্রূপে এবং শ্লেষে তাঁর ব্যঙ্গাত্মক কবিতার শব্দমালা এক হাতিয়ারে পরিণত হয়েছিল। আর আমাদের সেকালের ছাত্র এবং তরুণ সমাজ কবিতার সেই হাতিয়ারকে পারঙ্গমতার সঙ্গে ব্যবহার করেছিল হীনমন্যতায় আক্রান্ত বুদ্ধিজীবী সমাজ আর রাজনীতির আঙিনার ক্ষমতা-শিকারী স্তাবক শ্রেণীর বিরুদ্ধে।

সে যুগে কোনো গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক সংগ্রাম এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মুখে যারা কথায় কথায় পাকিস্তানের অখণ্ডত্ব আর আদর্শের ধুয়া তুলতো, তাদের বিরুদ্ধেও তীব্র বিদ্রূপের খড়্গ উত্তোলন করতে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ বিন্দুমাত্র পিছু হটেন নি। 'হায়াত দারাজ খান' ছদ্মনামে লিখিত তাঁর ব্যঙ্গ কবিতাগুলিই এর বড় প্রমাণ। তথাকথিত 'আজাদীর আপ্ত' বাক্যে যাঁরা আমাদের জনগণকে শোষণে, ত্রাসনে, উপেক্ষায়, বঞ্চনায় জর্জরিত করেছিল, তাদের বিরুদ্ধে অবিরাম আঘাত হেনেছেন তিনি কবিতার পঙক্তিকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে।

একজন কবিও যে জাতীয় সংকটকালে অগ্রগামী নেতৃত্বের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারেন, সেই সত্যকে অপার নিষ্ঠায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। নির্দ্বিধায় এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন জাতীয় বিবেকের এক অপরাজেয় কণ্ঠস্বর, জাতীয় চৈতন্যের উদগাতা এবং এক দায়িত্বশীল কবি-পুরুষ। সেই অন্ধকার সময়ের হতাশা-বিক্ষত দুঃখময় দিনগুলির স্মৃতি যদি আমরা চারণ করি, তাহলে নতুন করে অনুভব করবো আমাদের বিশ্বাসকে কতটা বলীয়ান করেছিলেন এই কবি। হীনমন্যতা এবং অপসংস্কৃতির আবর্তে আমরা আপনাকেই হারিয়ে যেতে বসেছিলাম। কিন্তু ফর্‌রুখ আহ্‌মদ তখন আমাদের শোনালেন তিমির হননের গান। বললেন ঃ

পাঞ্জেরী!
জাগো বন্দরে কৈফিয়তের তীব্র ভ্রূকুটি হেরি,
জাগো অগণন ক্ষুধিত মুখের নীরব ভ্রূকুটি হেরি;
দেখ চেয়ে, দেখ সূর্য ওঠার কত দেরী, কত দেরী।

আপন বিশ্বাসে, আপন ইতিহাস এবং ঐতিহ্যের গৌরবে, আপন জাতিসত্তার মহিমায় কেমন করে সব হীনমন্যতাকে স্খলন করে বুক স্ফীত করে মাথা উঁচিয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়াতে হয়, কেমন করে সব বিপরীত স্রোতকে মাড়িয়ে উজানের অন্বিষ্ট প্রত্যাশার উজ্জ্বল লক্ষ্যভূমির দিকে যাত্রা করতে হয়, সেই চেতনায় আমাদের উদ্দীপ্ত করেছিলেন ফর্‌রুখ আহ্‌মদ। কিন্তু এসব সত্ত্বেও ফর্‌রুখকে কম শ্লেষ এবং সমালোচনার শিকার হতে হয় নি। তাঁকে 'প্রাচীনপন্থী' 'প্রবহমান যুগের ধারা-বিরোধী' এবং 'আড়ষ্টচিত্ত কবি' বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। বলা হয়েছে, সমাধির অন্ধকার থেকে ফর্‌রুখকে আর জাগ্রত করা যাবে না। কিন্তু এইসব উক্তি কি ব্যর্থ প্রমাণিত হয় নি? ফর্‌রুখ আবার নিজের স্বাতন্ত্র্যের অহংকার নিয়ে কবর থেকে জেগে উঠেছেন। এবং আমাদের জাতীয়-চৈতন্যে নতুন প্রেরণার অগ্নি সঞ্চার করেছেন। ফর্‌রুখের কবিতার মহৎ ভাবাদর্শ, তাঁর শব্দসম্ভার, তাঁর কবিতার অনুপম রচনা-শৈলী, শব্দ ব্যবহারে তাঁর পারঙ্গমতা, ঐতিহ্যলগ্ন হয়েও তাঁর কবিতার আধুনিক কাঠামো এবং বিশেষ করে তাঁর তীক্ষ্ণ সমাজ-সচেতনতা নিয়ে সত্তরের এই শেষ পর্বে ব্যাপক আলোচনা শুরু হয়েছে আমাদের সাহিত্যের চত্বরে। তাঁর 'লাশ' 'ডাহুক' 'সাত সাগরের মাঝি' 'সিন্দাবাদ' 'পাঞ্জেরী' প্রভৃতি কবিতা একজন যুগোত্তীর্ণ মহৎ কবি-শিল্পীর আপন উদ্ভাসনে ভাস্বর। তাঁর সনেটমালাতেও স্বাতন্ত্র্যের এই ঔজ্জ্বল্য লক্ষ্যগোচর।

বাংলা ভাষা, সাহিত্য এবং সংস্কৃতি ফর্‌রুখের কাছে কতটা ঋণী, অনাগত যুগই তার রায় দেবে। তবে কুণ্ঠাহীনভাবে সবাইকে স্বীকার করতে হবে ঃ এই কবির অসামান্য অবদানকে পাশ কাটিয়ে আমরা কিছুতেই পা বাড়াতে পারবো না।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

জীবন-পঞ্জি

গ্রন্থ-পঞ্জি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

ফর্‌রুখ আহ্‌মদের জীবন-পঞ্জি

১৯১৮ জন্ম ঃ ১০ই জুন; গ্রাম মাঝআইল, মাগুরা, যশোর। পিতা-মাতার দ্বিতীয় পুত্র। পিতা ঃ খান সাহেব সৈয়দ হাতেম আলী। মাতা ঃ রওশন আখতার। প্রথম মহাযুদ্ধের অবসান।

১৯২৪ মাতার মৃত্যু।

১৯৩৭ 'রাত্রি' শীর্ষক প্রথম কবিতা প্রকাশিত হলো মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্‌ (বাহার) সম্পাদিত 'বুলবুল' পত্রিকায় (শ্রাবণ ১৩৪৪)। এ-মাসেই 'পাপ-জন্ম' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। 'মোহাম্মদী' পত্রিকায় (আষাঢ় ১৩৪৪) অন্যান্য প্রকাশিত গল্প 'বিবর্ণ', 'মৃত বসুধা', ' যে পুতুল ডলির মা', 'প্রচ্ছন্ন নায়িকা' লিখলেন ১৩৪৪ - ৪৬ সময় পরিসরে। প্রাথমিক শিক্ষার সূচনা নিজ গ্রামের পাঠশালায়। পরবর্তীতে কলকাতা মডেল এম. ই. স্কুল থেকে প্রথম বিভাগে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কুল-জীবনে শিক্ষক হিসেবে সংস্পর্শ লাভ করলেন কবি গোলাম মোস্তফা, কথা সাহিত্যিক আবুল ফজল ও কবি আবুল হাশিমের। শিক্ষক আবুল ফজল কলকাতা যাচ্ছেন শুনে হুইটম্যান-এর 'লীভ্‌স অব গ্রাস' আনার জন্যে অনুরোধ করেন। সাহিত্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হলো কবি আহসান হাবীব, কথাশিল্পী আবু রুশদ, কবি আবুল হোসেন প্রমুখের সঙ্গে। কলকাতা রিপন কলেজে ভর্তি। বিষ্ণু দে, বুদ্ধদেব বসু, প্রমথনাথ বিশী—এঁদের পেলেন শিক্ষক হিসেবে। এ সময় বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো কবি-র গুচ্ছ-কবিতা।

১৯৩৮ এফ. আহমদ নামে 'ব্যায়াম শিক্ষক মোহাম্মদ জনাব আলী' শীর্ষক একটি সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশিত হলো (মোহাম্মদী, আশ্বিন ১৩৪৫)। কবি দার্শনিক আল্লামা ইকবাল-এর ইন্তেকাল। কবি লিখলেন ইকবালকে নিবেদিত কবিতা 'স্মরণী'। মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত মাসিক সাহিত্য পত্র 'সওগাতে' প্রথম কবিতা "আঁধারের স্বপ্ন" (পৌষ ১৩৪৪)। ১৯৪৭ (১৩৫৪) পর্যন্ত কলকাতা থেকে প্রকাশিত সওগাতে নিয়মিত লিখেছেন।

www.pathagar.com

১৯৩৯ আই. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ। স্কটিশ চার্চ কলেজ, কলকাতা, দর্শনে অনার্স নিয়ে বি. এ. ভর্তি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ফতেহ লোহানীকে পেলেন বন্ধু হিসেবে। শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ।

১৯৪১ স্কটিশ চার্চ কলেজ ছেড়ে ইংরেজি সাহিত্যে অনার্স নিয়ে বি.এ. ক্লাসে কলকাতা সিটি কলেজে ভর্তি। কাব্যে কোরআন শিরোনামে ' মোহাম্মদী' ও 'সওগাতে' বেশ কিছু সূরা-র স্বচ্ছন্দ অনুবাদ প্রকাশিত। ১৯৪০ সালে গৃহীত ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে কবি-র মতাদর্শগত পরিবর্তন। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরলোকগমন।

ফর্‌রুখের ব্যক্তিত্ব ও মনোবল ছিল পাহাড়ের মত উঁচু ও দৃঢ়। নীতি ও আদর্শের উপর তিনি ছিলেন সর্বদা অটল ও অনড়। তাঁর জীবনে যেমন দুঃখ এসেছে তেমনি অযাচিতভাবে অনেক সুযোগ ও প্রলোভনও এসেছে। সামান্য একটু নীতিবোধ বিসর্জন দিলে তিনি অনায়াসে অনেক কিছুর মালিক হতে পারতেন কিন্তু তিনি তা কখনো করেননি। মাথা উঁচু করে তিনি দারিদ্র্য বরণ করে নিয়েছেন। এক আল্লাহ্ ছাড়া আর কারো কাছে তাঁর মাথা কখনো নত হয়নি। সকল বাধা-বিপত্তি, দুঃখ-কষ্ট-দারিদ্র্য ও ঝড়-ঝঞ্ঝার মধ্যেও তিনি সিন্দাবাদ নাবিকের মত সর্বদা আলিফের মত মাথা খাড়া রেখেছেন। এমন উদার, নীতিবান, মহৎ দৃঢ়চেতা নিষ্কলুষ চরিত্রের আদর্শ চরিত্রের মানুষ পৃথিবীতে সত্যিই অতিশয় দুর্লভ।

এর পাশাপাশি বর্তমান যুগে আমাদের দেশের এক শ্রেণীর কবি-সাহিত্যিক-শিল্পী-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীর কথা বিবেচনা করলে দেখা যায়, সামান্য এনাম, পারিতোষিক, পুরস্কার-খেতাব ও বিত্ত-বৈভবের আশায় তারা নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি, চরিত্র এমনকি, 'সমরখন্দ-বোখারা' পর্যন্ত নিঃসংকোচে বিলিয়ে দিতে প্রস্তুত। ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এদের সামনে এক দুর্লভ চরিত্রের সমুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। কবি হিসাবে আমাদের সাহিত্য-জগতে এক অনন্য সাধারণ আদর্শ ব্যক্তিত্ব।

এ বড় মাপের মানুষটি কবি হিসাবে যেমন মানুষ হিসাবেও ছিলেন তেমনি উঁচু মানের। কবি হিসাবে তাঁর ছিল এক বড় কল্পনার রঙিন জগত। সে জগত ছিল তাঁর নিকট অতি প্রিয়। সে জগতে যেমন রয়েছে বাংলার শ্যামল প্রকৃতি, নদী-নালা, ফুল-পাখি, বিচিত্র কলরবপূর্ণ জনপদ, তেমনি সেখানে রয়েছে পাহাড়, সমুদ্র, ধূসর মরু অঞ্চল। সে জগতে যেমন রয়েছে হাসি-আনন্দ, প্রেম-ভালবাসা, দুঃখ-দারিদ্র্য, দুর্ভিক্ষ-বঞ্চনা আবার তেমনি রয়েছে ইসলামের অতীত গৌরবের কথা, নবী-রাসূল ও সাহাবায়ে কেরামের কথা। মুসলমানদের অতীত ইতিহাস, ঐতিহ্য, জাতীয় জাগরণের আশা-অভীপ্সাপূর্ণ স্বপ্ন-সম্ভাবনার কথা। সে স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য মুসলমানদেরকে স্বীয় আদর্শে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। আইয়ামে জাহিলিয়াতের যুগে ইসলাম যেমন শুধু আরব বিশ্বে নয়,

www.pathagar.com

সমগ্র পৃথিবীতে এক বিপ্লবী পরিবর্তন এনেছিল, সেই ইসলামী আদর্শ অনুসরণের মাধ্যমে আধুনিক ঘুণে ধরা, জ্বরাগ্রস্ত, অধঃপতিত বিশ্ব আজো মুক্তির নব দিগন্তে উপনীত হতে পারে। সেই ইপ্সিত কল্যাণময় বিশ্ব গড়ার স্বপ্নই দেখে গেছেন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ এবং সেই স্বপ্নের আশ্লেষ তিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন আমাদের মনে। তাই ফর্‌রুখ আমাদের জাগরণের কবি, স্বপ্নের কবি, তিনি আমাদের আশা-অভীপ্সা ও সম্ভাবনাময় ভবিষ্যতের কবি। তিনি আমাদের চির শাশ্বত আদর্শ ও গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্যের শক্তিমান কবি। তাই ফর্‌রুখ যেমন আমাদের একান্ত আপন, তেমনি তাঁর কাব্যের আবেদনও কালোত্তীর্ণ, অনিঃশেষ।

১৯৪২ বিয়ে হলো খালাতো বোন সৈয়দা তৈয়বা খাতুনের সঙ্গে। বিয়ে উপলক্ষে কবি লিখলেন 'উপহার' শীর্ষক একটি কবিতা। কবিতাটি প্রকাশিত হলো 'সওগাত' (অগ্রহায়ণ ১৩৪৯)। জাতীয় জাগরণের কবি কাজী নজরুল ইসলাম আক্রান্ত হলেন অনারোগ্য ব্যাধিতে।

১৯৪৩ কলকাতা আই. জি. প্রিজন অফিসে চাকরিতে যোগদান। 'বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য সম্মেলনের' সপ্তম অধিবেশনে কবি আবৃত্তি করলেন, দল-বাঁধা বুলবুলি ও বিদায় শীর্ষক কবিতা। শুরু হলো সাত সাগরের মাঝি, সিরাজাম মুনীরা, কাফেলা প্রভৃতি কাব্যের অন্তর্গত কবিতার রচনা। ফর্‌রুখ এ সময় রচনা করে চলেছেন ১৩৫০-এর মন্বন্তর বিষয়ক কবিতাগুচ্ছ।

১৯৪৪ কবি-র প্রথম কবিতাগ্রন্থ সাত সাগরের মাঝি প্রকাশিত। সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত আকাল-এ সংকলিত লাশ শীর্ষক কবিতা। আই. জি. প্রিজন সৈয়দ হাতেম আলীর মৃত্যু ঃ ১০ নভেম্বর ১৯৪৪।

১৯৪৫ পি.ই.এন. আয়োজিত রাইটার্স কনফারেন্স-এ বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলনের অগ্রণী নায়ক কাজী আবদুল ওদুদ ফর্‌রুখ-কাব্যের সম্ভাবনা সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করলেন। আবদুল কাদির ও রেজাউল করীম-সম্পাদিত কাব্য-মালঞ্চে সংকলিত হলো কবিতাত্রয় শিকার, হে নিশানবাহী ও সাত সাগরের মাঝি। সংকলনের ভূমিকায় গুরুত্ব লাভ করলো ফর্‌রুখ কাব্যপ্রসঙ্গ। যোগ দিলেন মোহাম্মদীতে। একটি অপ্রীতিকর ঘটনার দরুন প্রায় বছরখানেক পর মোহাম্মদী অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দিলেন।

১৯৪৬ আজাদ করো পাকিস্তান কাব্য-পুস্তিকা প্রকাশিত। সর্বভারতীয় দাঙ্গার প্রেক্ষিতে লিখলেন দাঙ্গা-বিরোধী গুচ্ছকবিতা। কলকাতা বেতারে আবৃত্তি করলেন, নিজের রক্ত শীর্ষক কবিতা। প্রসঙ্গত, আকাশবাণী-র গল্পদাদুর আসরেও কবি অংশগ্রহণ করতেন। জলপাইগুড়িতে একটি ফার্মে অল্প কয়েকদিন চাকরি করেন।

www.pathagar.com

১৯৪৭ মোহাম্মদী অফিসের চাকরিতে ইস্তফা দানের পর থেকে কবি বেকার জীবন যাপন করেছেন। এ বছরেই কবি আবদুল কাদির-রচিত নবীন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ নিবন্ধটি কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে সম্প্রচারিত হয়। কলকাতা ছেড়ে চলে আসেন শ্বশুরবাড়ি দুর্গাপুর, যশোর। পাকিস্তান ঃ রাষ্ট্রভাষা ও সাহিত্য শীর্ষক প্রবন্ধ প্রকাশিত (সওগাত, আশ্বিন ১৩৫৪)। ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান। অর্জিত হলো ৪৭-এর স্বাধীনতা।

১৯৪৮ কলকাতা থেকে সপরিবারে ঢাকায় চলে এলেন। ঢাকা বেতারে অনিয়মিত শিল্পী হিসেবে যোগদান। বেতারের প্রয়োজনে কবি এখান থেকেই নিয়মিত গান রচনা শুরু করলেন। আধুনিক, দেশাত্মবোধক, হাম্‌দ-নাত প্রভৃতি গানের পাশাপাশি কথিকা, নাটিকা, গীতিনাট্য, গীতিনক্‌শা—এ সব রচনাও শুরু। পঞ্চাশের দশক থেকে শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান কিশোর মজলিশ পরিচালনা শুরু। গদ্যনাটিকা রাজ-রাজড়া প্রকাশিত (পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিনীত-মুনীর চৌধুরী প্রমুখ এই নাটকে অভিনয় করেন)। শুরু হলো ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন।

১৯৫১ কার্জন হলে অনুষ্ঠিত ইকবাল-জয়ন্তী বর্জন, তরুণ লেখকদের আমন্ত্রণ না করার প্রতিবাদে।

১৯৫২ সিরাজাম মুনীরা প্রকাশিত। ঢাকা রেডিওর নিজস্ব শিল্পী হিসেবে বহাল হলেন। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে সালাম, রফিক, শফিকের শাহাদাতের ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার বাইরে, ঢাকা বেতারেই প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত। সোচ্চার হলেন ফর্‌রুখ। ঢাকায় অনুষ্ঠিত ইসলামী সাংস্কৃতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণ।

১৯৫৩ ফর্‌রুখ আহ্‌মদকে (পনেরো জন শিল্পীসহ) ছাঁটাই করা হলো। বেতারশিল্পীদের সতেরো দিনব্যাপী ধর্মঘটের প্রেক্ষিতে ফর্‌রুখ (অন্যান্য শিল্পীসহ) চাকরিতে পুনর্বহাল।

১৯৫৭ সিপাহী বিপ্লব শতবার্ষিকী সংগঠনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ। এ উপলক্ষে কবিতা ও গান রচনা।

১৯৫৮ ঢাকা বেতার থেকে নৌফেল ও হাতেম কাব্যনাট্য প্রচারিত। এই নাটক প্রযোজনা করেন ও নায়ক চরিত্রে অভিনয় করেন খান আতাউর রহমান।

১৯৬০ প্রেসিডেন্ট পুরস্কার প্রাইড অব পারফরমেন্স লাভ করলেন। এ বছরই বাংলা একাডেমীর পুরস্কার প্রাপ্তি (কবিতা) ও একাডেমীর ফেলো নির্বাচিত। বাংলা একাডেমী উদ্‌যাপিত নাট্য-সপ্তাহে নৌফেল ও হাতেম মঞ্চস্থ।

১৯৬১ কাব্যনাট্য নৌফেল ও হাতেম প্রকাশিত। এ সময়ে সরকারী সফরে উত্তর ও দক্ষিণ বাংলা ব্যাপকভাবে পরিভ্রমণ করেন। অধ্যাপক মুহাম্মদ আবদুল হাই-

www.pathagar.com

এর সভাপতিত্বে ঢাকা হলে অনুষ্ঠিত সংবর্ধনা-বাসরে প্রাণঢালা সংবর্ধনা পেলেন কবি। ফর্‌রুখ সাহিত্য-প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করলেন সৈয়দ আলী আহসান, মুনীর চৌধুরী, আহসান হাবীব, আবুল হোসেন, শামসুল হুদা চৌধুরী প্রমুখ।

১৯৬৩ মুহূর্তের কবিতা প্রকাশিত। এ বছরই ফারুক মাহমুদ-সম্পাদিত ধোলাই কাব্য সংকলন গ্রন্থে কবির ছদ্মনামে লেখা ব্যঙ্গ-কবিতা সংকলিত। সাহিত্য সপ্তাহ উদ্‌যাপিত হয়। এ উপলক্ষে চর্যাপদ থেকে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা পর্যন্ত আবৃত্তির আয়োজন করা হয়েছিল। এতে কবির ডাহুক কবিতাটির আবৃত্তি করেন অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম।

১৯৬৫ শিশু-কিশোর কবিতা সংকলন পাখীর বাসা প্রকাশিত। পাক-ভারত যুদ্ধের চেতানয় উদ্বুদ্ধ হয়ে কবি রচনা করলেন জঙ্গী জোয়ান চল বীর, শহীদের খুনরাঙা কাশ্মীর, জেহাদের ময়দানে চল যাই প্রভৃতি উদ্দীপনামূলক গান।

১৯৬৬ হাতেম তা'য়ী প্রকাশিত। এ বছর পাখীর বাসা কাব্যের জন্য ইউনেস্কো পুরস্কার ও হাতেম তা'য়ী কাব্যের জন্য আদমজী পুরস্কার পেলেন। শেষবারের মতো ঢাকার বাইরে, অগ্রজ সৈয়দ সিদ্দিক আহ্‌মদের সঙ্গে দেখা করতে ফরিদপুরে গেলেন। ফিরে এসে লিখলেন বৈশাখ, পদ্মা, আরিচা-পারঘাটে প্রভৃতি সারা-জাগানো কবিতা। দেশপ্রেমের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার প্রদত্ত সিতারা-ই-ইমতিয়াজ খেতাব প্রত্যাখ্যান করলেন।

১৯৬৮ শিশুতোষ ছড়াগ্রন্থ হরফের ছড়া প্রকাশিত।

১৯৬৯ শিশু-কিশোর কাব্যগ্রন্থ নতুন লেখা প্রকাশিত। সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত গবেষণা গ্রন্থ কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রকাশিত। প্রখ্যাত শিল্পী মোস্তফা আজীজ এ বছর (২৯ জুলাই) কবির একটি পোর্ট্রেট আঁকলেন। দেশব্যাপী শুরু হলো ঊনসত্তরের গণআন্দোলন।

১৯৭০ ছড়াগ্রন্থ ছড়ার আসর (প্রথম ভাগ) প্রকাশিত হলো। দীর্ঘ দুই দশকেরও অধিক কালব্যাপী কবি ঢাকা বেতারের সঙ্গে সম্পৃক্ত রইলেন। এ বছরই ঢাকা বেতারের মুখপত্র পাক্ষিক এলানের (বর্তমান বেতার বাংলা) নভেম্বর (১ম পক্ষ) ১৯৭০ সংখ্যার প্রচ্ছদ ও প্রসঙ্গ কথায় কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রসঙ্গ গুরুত্ব লাভ করলো। জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত।

১৯৭১ কবি ঢাকা বেতারে শেষবারের মতো কবিতা আবৃত্তি করলেন। রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়।

১৯৭৩ স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে চাকরির ক্ষেত্রে কবি বিপর্যয়ের সম্মুখীন হলেন। এ সময়ে ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কি অপরাধ (জনকণ্ঠ, ১ আষাঢ় ১৩৮০) শীর্ষক

www.pathagar.com

তীব্র, তীক্ষ্ণ প্রতিবেদন লিখলেন আহমদ ছফা। এই প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশ বেতার, ঢাকা কেন্দ্রের বাণিজ্যিক কার্যক্রমে পুনর্বহাল।

১৯৭৪ সামাজিক ও দৈনন্দিন নানাবিধ কারণে কবির মন ও শরীর ভেঙ্গে যায়। এ বছর জুন মাসে (আষাঢ় ১৩১৮) লিখলেন তাঁর সর্বশেষ কবিতা ঃ দুর্ভিক্ষ বিষয়ক কবিতা ১৯৭৪ (একটি আলেখ্য)। এ ছাড়া লিখলেন হাম্‌দ-নাত, গাদ্দাফী প্রাসঙ্গিক একগুচ্ছ কবিতা, তরজমা করলেন মাওলানা শফিউল্লাহ্‌ (দাদাজী)-কে নিবেদিত একটি দীর্ঘ উর্দু ক্বাসিদা। ১৯ অক্টোবর, শনিবার সন্ধ্যেবেলা ইস্কাটন গার্ডেন, ঢাকায় ইন্তেকাল।

১৯৭৫ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রকাশিত।

১৯৭৭ একুশে পদক।

১৯৮০ স্বাধীনতা পুরস্কার।

১৯৮৪ ইসলামিক ফাউন্ডেশন পুরস্কার।

(আবদুল মান্নান সৈয়দ—গবেষণাগ্রন্থ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : জীবন ও সাহিত্য' থেকে সংকলিত)

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

১. সাত সাগরের মাঝি	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৪৪
	ঃ দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৫২
	ঃ তৃতীয় প্রকাশ ঃ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮২ (১৯৭৫ ইং)
২. আজাদ করো পাকিস্তান	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ (১৯৪৬)
৩. সিরাজাম মুনীরা	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৫২
	দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৮০
৪. নৌফেল ও হাতেম	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৬১
	দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ডিসেম্বর ১৯৬৫
	তৃতীয় প্রকাশ ঃ জানুয়ারী ১৯৬৭
	চতুর্থ প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৬৯
৫. মুহূর্তের কবিতা	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৬৩
	দ্বিতীয় প্রকাশ (পরিমার্জিত সংস্করণ) অক্টোবর ১৯৭৮
৬. হাতেম তা'য়ী	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ মে ১৯৬৬
৭. পাখীর বাসা	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৫
৮. হরফের ছড়া	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৭০
	দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ১৯৭৬
৯. নতুন লেখা	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৬৯
	দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ ঈদ-উল-ফিতর ১৩৯৭ হি
১০. ছড়ার আসর (১)	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৭০
১১. ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৭৫
১২. হে বন্য স্বপ্নেরা	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৭৬
১৩. নয়া জামাত (সংকলন)	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ নভেম্বর ১৯৭৮
১৪. নয়া জামাত (৪টি খণ্ড) পাঠ্য বই	ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯৫১ ই (?)

www.pathagar.com

১৫. ফর্রুখ-রচনাবলী (১ম খণ্ড) ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৭৯
১৬. ইকবালের নির্বাচিত কবিতা ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮০
১৭. চিড়িয়াখানা ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ জুন ১৯৮০
১৮. কাফেলা ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ আগস্ট ১৯৮০
১৯. হাবেদা মরুর কাহিনী ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ সেপ্টেম্বর ১৯৮১
২০. সিন্দাবাদ (সংকলন) ঃ প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ১৯৮৪

যন্ত্রস্থ

১. দিলরুবা
২. ফুলের জলসা
৩. সাঁঝ-সকালের কিস্‌সা
৪. কিসসা কাহিনী

অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি [শিশু-কিশোর]

১. ছড়ার আসর (২) (৩)
২. আলোকলতা
৩. খুশীর ছড়া
৪. ছড়াছবির দেশে
৫. মজার ছড়া
৬. পাখীর ছড়া
৭. রংমশাল

অপ্রকাশিত [ব্যঙ্গ কবিতা, গান ও অনুবাদের পাণ্ডুলিপি]

১. অনুস্বার বিসর্গ (ব্যঙ্গ-কবিতা)
২. ঐতিহাসিক অনৈতিহাসিক (”)
৩. হাল্কা লেখা (”)
৪. তসবিরনামা (”)
৫. রসরঙ্গ (”)
৬. রাজ-রাজড়া (গদ্য ব্যঙ্গ নাটিকা)
৭. কাব্যগীতি (গীতি সংকলন)
৮. রক্ত-গোলাব (গীতি সংকলন)
৯. মাহফিল (হাম্‌দ-নাত-এর সংকলন)
১০. কোরান মঞ্জুষা (আল-কুরআনের অংশ-বিশেষের অনুবাদ)

www.pathagar.com

লেখক ও
লেখা-পরিচিতি

www.pathagar.com

www.pathagar.com

লেখক-পরিচিতি

১. মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন (মরহুম) ঃ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। সাহিত্য-পত্রিকা "সওগাত"-এর সম্পাদক।

২. আবুল হাশেম (মরহুম) ঃ কবি, ঔপন্যাসিক ও বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অন্যতম শিক্ষক।

৩. মোহাম্মদ আজরফ অধ্যক্ষ (মরহুম) ঃ শিক্ষাবিদ, দার্শনিক ও সাহিত্যিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অতিথি অধ্যাপক।

৪. সৈয়দ সিদ্দীক আহ্‌মদ ঃ ফর্‌রুখ আহ্‌মদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা।

৫. আবু জাফর শামসুদ্দীন (মরহুম) ঃ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক।

৬. আবদুল হক ঃ প্রবন্ধকার, সমালোচক ও গল্পকার। বাংলা একাডেমীর প্রকাশনা বিভাগের সাবেক পরিচালক।

৭. আবু রুশ্‌দ (মতিনউদ্দীন) ঃ কথাশিল্পী। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক।

৮. আবদুল আহাদ ঃ গায়ক ও সুরকার। রেডিও বাংলাদেশের নিজস্ব শিল্পী।

৯. সৈয়দা তৈয়বা খাতুন ঃ কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের স্ত্রী।

১০. কামরুল হাসান ঃ শিল্পী।

১১. আখতার ফারূক ঃ সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।

১২. শামসুল হুদা চৌধুরী (মরহুম) ঃ সংস্কৃতি-কর্মী, রাজনীতিক। প্রাক্তন মন্ত্রী।

১৩. আবদুল লতিফ ঃ গায়ক, গীতিকার ও সুরকার

১৪. আবদুল হালিম চৌধুরী ঃ গায়ক ও সুরকার।

১৫. আশরাফ সিদ্দিকী (ডক্‌টর) ঃ কবি ও গবেষক। বাংলা একাডেমীর প্রাক্তন মহাপরিচালক। এবং জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত।

১৬. আবদুর রশীদ খান ঃ কবি। বাংলাদেশ সরকারের অনুবাদ বিভাগের পাবলিকেশন্স রেজিস্ট্রার।

১৭. সরদার জয়েন উদ্‌দীন ঃ ছোটগল্পকার ও ঔপন্যাসিক। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র বাংলাদেশ -এর প্রাক্তন পরিচালক।

১৮. তৈয়বুর রহমান (এম.এ.) ঃ সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য। "সাত সাগরের মাঝি" (২য় প্রকাশ) ও "সিরাজাম মুনীরা" (১ম সংস্করণ)-এর প্রকাশক।

www.pathagar.com

১৯. মুফাখ্খারুল ইসলাম (মরহুম) ঃ কবি ও প্রবন্ধকার। দীর্ঘদিন বিভিন্ন সরকারী কলেজে অধ্যাপনা করেছেন।

২০. মুহম্মদ আবূ তালিব ঃ প্রবন্ধকার ও গবেষক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

২১. অধ্যাপক আবদুল গফুর ঃ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর প্রকাশনা বিভাগের সাবেক পরিচালক।

২২. জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী ঃ কবি, অনুবাদক ও প্রবন্ধকার। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর।

২৩. কাজী গোলাম আহমদ ঃ শিশু-সাহিত্যিক। প্রাক্তন সম্পাদক ঃ "ডাক প্রবাহ"।

২৪. সুনীলকুমার মুখোপাধ্যায় (ডক্টর) ঃ প্রবন্ধকার ও গবেষক। "কবি ফর্রুখ আহ্মদ" গ্রন্থের লেখক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

২৫. আবদুস সাত্তার (মরহুম) ঃ কবি ও গবেষক। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা দপ্তরের সাবেক সম্পাদক।

২৬. মোহাম্মদ মাহ্ফুজউল্লাহ্ ঃ কবি, সমালোচক ও সাংবাদিক। সাবেক "দৈনিক বাংলা"-র সহকারী সম্পাদক।

২৭. রফিকুল ইসলাম (ডক্টর) ঃ প্রবন্ধকার ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

২৮. শামসুল আলম (এ. জেড. এম.) ঃ প্রবন্ধকার ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর সাবেক মহাপরিচালক।

২৯. মুস্তফা নূরউল ইসলাম (ডক্টর) ঃ প্রবন্ধকার ও গবেষক। বাংলা একাডেমীর সাবেক মহাপরিচালক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

৩০. মুহিউদ্দীন খান (মওলানা) ঃ সাহিত্যিক, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ। "মাসিক মদীনা" ও অধুনালুপ্ত সাপ্তাহিক পত্রিকা "আজ" ও "নয়া যামানা"-এর সম্পাদক।

৩১. আবূ হেনা মোস্তফা কামাল (ডক্টর) (মরহুম) ঃ কবি, গীতিকার ও প্রবন্ধকার। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক এবং মুহসিন হলের প্রভোস্ট।

৩২. মীর নূরুল ইসলাম (মরহুম) ঃ সাংবাদিক, সাহিত্যিক। সাবেক "দৈনিক বাংলার বাণী"-র বার্তা সম্পাদক।

৩৩. শাহাবুদ্দীন আহ্মদ ঃ প্রবন্ধকার, গবেষক ও সমালোচক। প্রাক্তন সম্পাদক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। বর্তমানে গ্রন্থের সম্পাদক।

৩৪. গোলাম সাকলায়েন (ডক্টর) ঃ প্রবন্ধকার ও গবেষক। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক।

www.pathagar.com

৩৫. আখতার-উল-আলম ঃ কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। "দৈনিক ইত্তেফাক"-এর সহকারী সম্পাদক।

৩৬. সুলতান আহমদ ঃ সাংবাদিক। "দৈনিক ইনকিলাব"-এর বার্তা-সম্পাদক।

৩৭. মোবারক হোসেন খান ঃ অনুবাদক ও সঙ্গীত-গবেষক। রেডিও বাংলাদেশের কমার্শিয়াল সার্ভিসের সাবেক পরিচালক।

৩৮. ফজল-এ-খোদা ঃ কবি গীতিকার। রেডিও বাংলাদেশের সাবেক সহকারী পরিচালক।

৩৯. ফখরুজ্জামান চৌধুরী ঃ কবি, অনুবাদক ও প্রবন্ধকার। রেডিও বাংলদেশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা।

৪০. মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান ঃ সাংবাদিক। সম্পাদক, "জাহানে নও"।

৪১. তিতাশ চৌধুরী ঃ কবি ও প্রাবন্ধিক। ব্রাহ্মণবাড়িয়া সরকারী কলেজের অধ্যাপক।

৪২. হাসি সিদ্দিকী ঃ সাহিত্যিক। শুদ্ধ সঙ্গীত গোষ্ঠীর সহ-সভানেত্রী।

৪৩. শেখ তোফাজ্জল হোসেন ঃ শিল্পী, সাহিত্যিক। বর্তমানে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত 'অগ্রপথিক'-এর সম্পাদক।

৪৪. সাইয়েদা ইয়াসমিন বানু ঃ সাহিত্যিক। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কনিষ্ঠ কন্যা।

৪৫. মোহাম্মদ বরকতুল্লাহ (মরহুম) ঃ 'পারস্য প্রতিভা"-এর লেখক। প্রবন্ধকার ও সাহিত্যিক।

৪৬. আবুল কালাম শামসুদ্দীন (মরহুম) ঃ সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও সমালোচক। "দৈনিক আজাদ"-এর প্রাক্তন সম্পাদক। "দৈনিক বাংলা" "দৈনিক পাকিস্তান" থাকাকালে তিনি তার সম্পাদক ছিলেন।

৪৭. আবদুল কাদির (মরহুম) ঃ কবি, ছান্দসিক ও সমালোচক। "মাহে-নও" পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

৪৮. আবুল ফজল (মরহুম) ঃ প্রবন্ধকার, সাহিত্যিক ও শিক্ষাবিদ। ফর্‌রুখ আহ্‌মদের অন্যতম শিক্ষক।

৪৯. মুজীবুর রহমান খাঁ ঃ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। "দৈনিক আজাদ"-এর সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি।

৫০. সৈয়দ আলী আহসান (মরহুম) ঃ কবি, সমালোচক ও গবেষক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস-চ্যান্সেলর।

৫১. মনিরউদ্দীন ইউসুফ (মরহুম) ঃ কবি ও অনুবাদক।

৫২. আবদুল হাফিজ ঃ সমালোচক ও গবেষক। বাংলাদেশ বুক্‌স্ ইন্টারন্যাশনালের ম্যানেজার।

www.pathagar.com

৫৩. হাসান হাফিজুর রহমান (মরহুম) ঃ কবি, সমালোচক ও সাংবাদিক।

৫৪. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (ডক্টর) ঃ প্রবন্ধকার, সমালোচক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক।

৫৫. আল মাহমুদ ঃ কবি ও গল্পলেখক। বাংলদেশ শিল্পকলা একাডেমীর প্রাক্তন পরিচালক।

৫৬. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান (ডক্টর) ঃ কবি, সমালোচক ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক।

৫৭. আবদুল মান্নান সৈয়দ ঃ কবি, গল্প ও উপন্যাস লেখক, প্রবন্ধকার ও সমালোচক। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়-কলেজের বাংলা বিভাগের সাবেক অধ্যাপক।

৫৮. আফজাল চৌধুরী ঃ কবি ও প্রবন্ধকার। ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ঢাকা-র সাবেক পরিচালক।

৫৯. হাসান আবদুল কাইয়ূম ঃ শিশু-সাহিত্যিক। সাবেক পরিচালক, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬০. মুহম্মদ নূরুল হুদা ঃ কবি ও প্রবন্ধকার। উপ-পরিচালক, বাংলা একাডেমী।

৬১. সৈয়দ আবুল মকসুদ ঃ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। সাহিত্য পত্রিকা "সময়"-এর সম্পাদক। বাংলাদেশ সংবাদ সংস্থার সিনিয়র সাংবাদিক।

৬২. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ঃ প্রবন্ধকার ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক।

৬৩. মুকুল চৌধুরী ঃ কবি ও প্রবন্ধকার। অনুষ্ঠান সংগঠক। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক, প্রকাশনা বিভাগ, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ।

৬৪. ফাইজুস সালেহীন ঃ প্রবন্ধকার। সাহিত্য সম্পাদক, সাপ্তাহিক "সচিত্র স্বদেশ"।

৬৫. আহমদ ছফা (মরহুম) ঃ কবি, সমালোচক ও সাংবাদিক। সাপ্তাহিক "উত্তরণ" পত্রিকার সম্পাদক।

৬৬. ইবনে খালদুন (মরহুম ডক্টর হাসান জামান) ঃ প্রবন্ধকার, গবেষক ও বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ।

৬৭. শামসুর রাহমান ঃ কবি, সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। প্রাক্তন "দৈনিক বাংলা" ও প্রাক্তন সাপ্তাহিক "বিচিত্রা"-র সম্পাদক।

৬৮. সানাউল্লাহ্ নূরী (মরহুম) ঃ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক। 'দৈনিক দেশ' পত্রিকার সম্পাদক।

www.pathagar.com

লেখা-পরিচিতি

ব্যক্তি

১. তাঁর নাম ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ 'কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে "সওগাত"-এর ১৩৮১ (ই ১৯৭৪) সালের আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

২. আমার ছাত্র ফর্‌রুখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৩. অনমনীয় ফর্‌রুখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৪. আমার ভাই ফর্‌রুখ ঃ লেখাটি একটি সাক্ষাৎকার থেকে নেওয়া। সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছিলেন কবি-সাংবাদিক মতিউর রহমান মল্লিক। এটি সাপ্তাহিক "সোনার বাংলা"র ২৫ জুন ১৯৮২ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। এর প্রবন্ধ-রূপ দিয়েছেন কবি-পুত্র আহমদ আখতার। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৫. অপরাজেয় ফর্‌রুখ ঃ 'অপরাজেয় কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে "পূর্বদেশ"-এর ১৩৮১ (ই ১৯৭৪)-এর ৪ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

৬. ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ কালের শিকার' নামে "সওগাত"-এর ১৩৮১ (ই ১৯৭৪)-এর মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৭. আমার বন্ধু ফর্‌রুখ ঃ 'অনাচার অত্যাচারের বিপক্ষে সোচ্চার কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে 'সচিত্র স্বদেশ'-এর ২০ অক্টোবর ১৯৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৮. প্রেমিক ফর্‌রুখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৯. সংসারে ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ "সচিত্র স্বদেশ"-এর ২০ অক্টোবর ১৯৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত কবি-পত্নীর সাক্ষাৎকার ও কবি-পুত্র আহমদ আখতার গৃহীত কবি-পত্নীর সাক্ষাৎকার থেকে প্রস্তুতকৃত। প্রবন্ধরূপ দিয়েছেন ফাইজুস সালেহীন। পূর্বে অপ্রকাশিত।

১০. ফর্‌রুখ ভাই ঃ 'ফর্‌রুখ ভাই' নামে সাপ্তাহিক "বিচিত্রা"র ১৯৭৪-এর ১ নভেম্বর সংখ্যায় প্রকাশিত।

১১. এক বিস্ময়কর মানুষ ঃ 'ফর্‌রুখ ভাই স্মরণে' নামে "দৈনিক সংগ্রাম", ২৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১২. আপোষহীন ফর্‌রুখ ঃ ২০ অক্টোবর ১৯৮৩-এর "সচিত্র স্বদেশ"-এ 'জীবনে কখনো আপোষ করেন নি ফর্‌রুখ' নামে সাক্ষাৎকার হিসাবে প্রকাশিত।

১৩. এমন একটি মানুষ দেখি না ঃ 'গীতিকার হিসাবে ফর্‌রুখ ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী' নামে "সচিত্র স্বদেশ"-এর ২০ অক্টোবর ১৯৮৩ সংখ্যায় প্রকাশিত।

www.pathagar.com

১৪. ফর্‌রুখের গান ঃ নতুন লেখা। পূর্ব অপ্রকাশিত।

১৫. সাহিত্যপ্রেমিক ফর্‌রুখ ঃ ডক্‌টর আশরাফ সিদ্দিকীর ১৯৭৫-এর নভেম্বরে প্রকাশিত 'যা দেখেছি যা পেয়েছি যা জেনেছি' নামক স্মৃতিধর্মী প্রবন্ধ সংকলন থেকে গৃহীত। গ্রন্থে প্রবন্ধটির নাম ছিল "ফর্‌রুখ আহ্‌মদ'।

১৬. ব্যক্তি ফর্‌রুখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

১৭. আমাদের ফর্‌রুখ ভাই ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

১৮. অন্তরঙ্গ আলোকে ফর্‌রুখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

১৯. ফর্‌রুখ স্মরণে ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

২০. ফর্‌রুখের আশা ও স্বপ্ন ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

২১. আতিথ্য উদার আদর্শে নিরাপোষ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

২২. ফর্‌রুখ ভাইয়ের কথা ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

২৩. একটি আদর্শ একটি ব্যক্তিত্ব ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ একটি আদর্শের নাম' নামে ১৯৭৮-এর "দৈনিক সংগ্রাম" পত্রিকার অক্‌টোবর সংখ্যায় মুদ্রিত হয়।

২৪. আমার অনুভব একান্ত আমারই ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

২৫. অভ্রভেদী চোখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

২৬. অন্তরঙ্গ আলাপন ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : কবি ও ব্যক্তি' নামে প্রথমে "বিচিত্রা"-র ১৯৭৪-এর নভেম্বর সংখ্যায় ও পরে লেখকের "সাহিত্য ও সাহিত্যিক"-এ প্রকাশিত।

২৭. অনন্য পুরস্কার ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

২৮. শতাব্দীর অন্যতম সেরা মানুষ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

২৯. এক বিস্ময়কর নায়ক ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ প্রসঙ্গে' নামে "সওগাত"-এর ১৩৮১ (১৯৭৪ ই)-এর আশ্বিন-কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

৩০. স্বপ্নরাজ্যের দুঃসাহসী সিন্দাবাদ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৩১. মর্যাদাবোধের প্রতীক ফর্‌রুখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৩২. অন্তরঙ্গ আলোকে ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ : তাঁকে যেমন দেখেছি' নামে "দৈনিক বাংলা"-র ১৯৭৬-এর ১১ জুন সংখ্যায় প্রকাশিত।

৩৩. প্রথম ও শেষ আলাপ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৩৪. তিনি অসাধারণ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৩৫. যুগ-প্রবর্তক কবি ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৩৬. মেজমামা ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৩৭. অমর ডাহুক ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৩৮. তাঁর তুলনা তিনি নিজেই ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

www.pathagar.com

৩৯. আকাশের শাহীন তিনি ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৪০. শেষ মুহূর্ত ঃ একই নামে সাপ্তাহিক "জাহানে নও"-এর (?) সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪১. কিছু কথা কিছু স্মৃতি ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে "পাঞ্জেরী" নামক একটি সঙ্কলনে প্রকাশিত।

৪২. অশেষ স্মৃতি ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৪৩. সমুদ্র-নাবিক ফর্‌রুখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৪৪. আব্বাকে যেমন দেখেছি ঃ 'আব্বাকে যেমন দেখেছি' নামে "ঢাকা ডাইজেষ্ট"-এর নভেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

কবি

১. এক অমূল্য সম্পদ ঃ "হাতেম তা'য়ী" কাব্যগ্রন্থের পুস্তক পরিচয় হিসেবে ১৯৬৬ সালের আগস্ট মাসের সাপ্তাহিক "পাকিস্তানী খবর"-এ প্রকাশিত।

২. ফর্‌রুখের হাতেম তা'য়ী ঃ প্রথমে মাসিক "পূবালী"-তে ছাপা হয়, পরে লেখকের "দৃষ্টিকোণ" গ্রন্থে সংকলিত হয়।

৩. কবি ফর্‌রুখ : দুই সমীক্ষা ঃ প্রথম সমীক্ষাটি 'নবীন কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে ১৩৫৪ (ই ১৯৪৭)-এর "সওগাত"-এর বৈশাখ সংখ্যায় প্রকাশিত। দ্বিতীয় সমীক্ষাটি 'কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ স্মরণে' নামে "দৈনিক ইত্তেফাক"-এর ১৯৭৫-এর ১ কার্তিক (১৯ অক্‌টোবর) সংখ্যায় প্রকাশিত।

৪. বাংলাকাব্যে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ 'বাংলাকাব্যে কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে সাহিত্য পত্রিকা "দ্যুতি"-এর ১৩৬০ (১৯৫৩ ই) সালের ২য় বর্ষের ৩য় সংখ্যায় প্রকাশিত।

৫. তাঁর বিশ্বাস অকৃত্রিম ঃ ১৯৭৫ সালে আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত "ফর্‌রুখ আহ্‌মদের শ্রেষ্ঠ কবিতা"র ভূমিকা এবং "দৈনিক জনপদ"-এ 'কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে প্রকাশিত দুটি প্রবন্ধের সমন্বয়।

৬. নারঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা ঃ ১৯৬৭-তে "পাকিস্তানী খবর" ও পরে "সাত সাগরের মাঝি"-এর তৃতীয় সংস্করণে প্রকাশিত।

৭. ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ ১৯৮০-র "বই" পত্রিকার এপ্রিল-মে সংখ্যায় ও পরে লেখকের "সতত স্বগত" নামক প্রবন্ধ-গ্রন্থে প্রকাশিত।

৮. ঐতিহ্যের রূপকার ফর্‌রুখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

৯. আর এক অগ্নিবীণা ঃ লেখকের ১৯৭৫-এ প্রকাশিত "যা দেখেছি যা পেয়েছি যা জেনেছি" স্মৃতিচারণধর্মী প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত। লেখাটির নাম ছিল 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ'।

www.pathagar.com

১০. ফর্‌রুখ-মানস : তাঁর কবিতা ঃ তিনটি প্রবন্ধের সমন্বয়। প্রথম উপশীর্ষ নামের লেখাটি 'ফর্‌রুখ কাব্য বিচার' নামে "পূর্বাচল"-এর ১৩৮৪ (১৯৭৭ ই)-এর শ্রাবণ সংখ্যায় এবং তৃতীয় উপশীর্ষ নামের লেখাটি 'ফর্‌রুখ কাব্যে বাংলার নিসর্গ' নামে "পূর্বাচল"-এর কার্তিক ১৩৮৫ (১৯৭৮ ই)-এর সংখ্যায় প্রকাশিত। 'চরিত্র স্বরূপ' অংশটি নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

১১. ফর্‌রুখের কাব্য-নাটক ঃ রাজশাহী থেকে প্রকাশিত সাহিত্য সংকলন "পূর্বলেখ"-এ পুস্তক পরিচিতি হিসাবে মুদ্রিত।

১২. কাব্যনাট্যের নতুন দিগন্ত ঃ ১৯৬৯-এর জুন-এ প্রকাশিত লেখকের "কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ" গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

১৩. ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতা ঃ 'কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ আলোচনার খসড়া' নামে ১৯৭৮-এ প্রকাশিত লেখকের "শব্দের সীমানা" প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

১৪. চলে গেছেন অপরাজেয় ঃ সৈয়দ আবুল মকসুদ সম্পাদিত ১৯৭৪-এ প্রকাশিত 'সময়'-এ এবং পরে লেখকের ১৯৭৫-এর ডিসেম্বরে প্রকাশিত প্রবন্ধ-গ্রন্থ "আরণ্যক দৃশ্যাবলী"তে প্রকাশিত।

১৫. আধুনিক কবিতা ও ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ লেখকের ১৯৬৫-সালে প্রকাশিত "আধুনিক কবি ও কবিতা" প্রবন্ধ-গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত।

১৬. ফর্‌রুখ কবিতা : তার শিল্পরূপ ঃ লেখকের চারটি প্রবন্ধ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কবিতার বৈশিষ্ট্য ও পটভূমি' (প্রকাশ "সওগাত" আশ্বিন-কার্তিক ১৩৮১), 'সাত সাগরের মাঝি ঃ কাব্য বিবর্তনের ধারা' ("সাহিত্য ও সাহিত্যিক"-এ প্রকাশিত), 'ফর্‌রুখ-কাব্যে আঙ্গিক বৈচিত্র্য' (১৯৮২-এর ২৩ অক্‌টোবর "দৈনিক বাংলা"য় প্রকাশিত) 'রূপক প্রতীক' ("দৈনিক বাংলা"য় ও পরে "সাহিত্য ও সাহিত্যিক"-এ প্রকাশিত)-এর সমন্বয়।

১৭. ব্যতিক্রমী শিল্পী : 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ ব্যতিক্রমী শিল্পী' নামে 'দৈনিক বাংলা'র ২ কার্তিক ১৩৮২ (১৯৭৫ ই) সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৮. ন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গ কবি ঃ একই নামে লেখাটি প্রথমে "দৈনিক সংগ্রাম"-এর ১৩৮৯ (১৯৮২ ই)-এর ২২ শ্রাবণ সংখ্যায় প্রকাশিত এবং পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত ফর্‌রুখ আহ্‌মদ-এর স্মরণোৎসবে পঠিত।

১৯. বিষয় ও ছন্দ-সমীক্ষায় হাতেম তা'য়ী : "হাতেম তা'য়ী ঃ ঐতিহ্যের নব রূপায়ণ" নামে মাসিক "মাহে-নও" পত্রিকার (১৯৬৬ ই)-এর (?) সংখ্যায় প্রকাশিত।

২০. ফর্‌রুখের আকাঙক্ষা ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

www.pathagar.com

২১. ফর্‌রুখের অভিনবত্ব ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কাব্য-প্রতিভা' ও 'ফর্‌রুখ কাব্য কালের ব্যতিক্রম ফসল" নামক দুটি প্রবন্ধের সমন্বয়। প্রথমটি ২ কার্তিক (১৯৭৫ ই)-এর "দৈনিক বাংলা"য় ও দ্বিতীয়টি ১৬ কার্তিক ১৩৮৭ (১৯৮০ ই)-এর "দৈনিক সংগ্রাম"-এ প্রকাশিত।

২২. দরিয়ায় শেষ রাত্রি : প্রতিভূ কবিতা ঃ 'সম্পন্ন প্রতিমা' নামে লেখাটি প্রথমে "দৈনিক সংবাদ"-এর ১৩৮৫ (১৯৭৮ ই)-এর ৪ কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত।

২৩. কাফেলার ফর্‌রুখ ঃ 'ফর্‌রুখের নতুন গ্রন্থ কাফেলা' নামে "দৈনিক সংগ্রাম"-এর ৫ সেপ্টেম্বর ১৯৮২ সাহিত্য সংখ্যায় এবং পরে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' স্মরণিকায় প্রকাশিত।

২৪. আমাদের চেতনার উচ্চারণে ফর্‌রুখ ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

২৫. একজন স্ববিরোধহীন কবি ঃ 'একটি স্ববিরোধহীন কবিসত্তা' নামে "দৈনিক বাংলা" ১৯৭৬-এর জুন (৩০ জ্যৈষ্ঠ) সংখ্যায় প্রকাশিত।

২৬. তাঁর স্বপ্নরাজ্যে তিনি একা ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদদের কবিতা' নামে প্রথমে ত্রৈমাসিক "কণ্ঠস্বর" ও পরে ১৯৭৬-এ জিল্লুর রহমান সিদ্দিকী সম্পাদিত "পাঞ্জেরী"তে প্রকাশিত।

২৭. কাল-সচেতন ফর্‌রুখ : তাঁর কবিতা ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ' নামে "বইয়ের খবর" (পুনর্মূল্যায়ন সংখ্যা)-এর এপ্রিল-জুলাই ১৯৮১ সংখ্যায় প্রকাশিত।

২৮. ফর্‌রুখ-মানস পরিক্রমা ঃ 'ন্যায়ের পথে নিঃসঙ্গ কবি' নামে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ও ইসলামী সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা-র যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত স্মরণোৎসবে পঠিত।

২৯. ফর্‌রুখ-মানস ঃ তাঁর কবিকৃতি ঃ নতুন লেখা। পূর্বে অপ্রকাশিত।

কবি অমর

১. কবি ফর্‌রুখ আহ্‌মদের কি অপরাধ ঃ একই নামে ১৩৮০ (১৯৭৩ ই)-এর 'দৈনিক গণকণ্ঠ'-এর ১ আষাঢ় সংখ্যায় প্রকাশিত।

২. একটি মৃত্যু ঃ একটি জিজ্ঞাসা ঃ একই নামে 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর ১১ নভেম্বর ১৯৭৪ সংখ্যায় প্রকাশিত।

৩. নতুন পানিতে সফর এবার ঃ 'নতুন পানিতে সফর এবার হে মাঝি সিন্দাবাদ' নামে ১৯৭৪-এর ২০ অক্টোবর-এর "দৈনিক বাংলা"য় প্রকাশিত।

৪. জাতীয় চৈতন্যে ফর্‌রুখের প্রভাব ঃ 'ফর্‌রুখ আহ্‌মদ ঃ জাতীয় চৈতন্যে তার প্রভাব' নামে ১৯৭৯-এর অক্টোবর-এর 'দৈনিক দেশ'-এ প্রকাশিত।

ইফাবা—২০০২-২০০৩—প্র/৪৩৪৩ (উ)—৩২৫০

www.pathagar.com

ফররুখ আহমদ ব্যক্তি ও কবি

শাহাবুদ্দীন আহমদ সম্পাদিত